সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয়

(ঊনবিংশ-শতাব্দীর সমালোচনা-সাহিত্য)

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পি-এইচ. ডি.

ও

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, এম. এ.

কর্তৃক সম্পাদিত
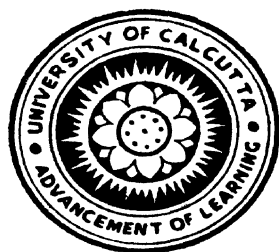
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬০

উৎসর্গ

যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন
প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষাজগতে এক যুগান্তরকারী
পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন
ও মাতৃভাষা-বিষয়ক সমালোচনায় উৎসাহ দিয়া
উহার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনের হেতু হইয়াছেন,
বাংলা দেশের সেই বিরাট মনীষী ও কর্মকুশল অধিনায়ক
স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে
গ্রন্থখানি উৎসর্গিত হইল।

সূচীপত্র

স্বীকৃতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাঙ্গলা সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির এক বিশেষ সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অনুসন্ধানের জন্য আমরা এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্-সংযুক্ত গ্রন্থাগার ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষগণ আমাদের এই কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটীর শ্রীগিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য বি. এ. ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীঅনাদিভূষণ দাস মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সমালোচন-গ্রন্থ-সঙ্কলনে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য অনুমতি-সাপেক্ষ প্রবন্ধগুলির জন্য অপরাপর মহোদয়গণ সানন্দে অনুমতিদান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী ডি. এস্‌সি., ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত পিএইচ্. ডি., প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বি. এস্‌সি., ডিপ্ প্রিণ্ট (ম্যান), প্রকাশন বিভাগের শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এম. এ. ও 'নাভানা'র শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সুবৃহৎ কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই জন্য তাঁহারা সকলে সমুচিত প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

ভূমিকা

১

আমাদের "সমালোচনা-সাহিত্য" নামে কয়েকটি সমালোচনা-প্রবন্ধের সমষ্টি বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার প্রায় দীর্ঘ দশ বৎসর পরে আর একটি সংগ্রহ 'সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয়' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ছাপাখানার বিলম্বই এই অনুচিত দীর্ঘ ব্যবধানের প্রধান হেতু। উভয় খণ্ড মিলিয়া ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটা ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীণ সঙ্কলন সংগৃহীত হইল এইরূপ বলা যাইতে পারে।

প্রথম খণ্ডে বাংলা সমালোচনার মূল তত্ত্ব সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। আমরা সেখানে দেখাইয়াছি যে ইংরাজী-প্রভাবিত আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উহার রসাস্বাদনের উপযোগী সমালোচনা-রীতি উদ্ভূত হইয়াছিল ও এই সমালোচনা-রীতি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য-অনুসরণ-প্রসূত ছিল না। সমালোচনার মানদণ্ড-নির্মিতিতে প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল ও সাহিত্যের নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি ছাড়াও যে চিত্তবিশুদ্ধি ও সমাজকল্যাণ-সাধনের কর্তব্য আছে উহাও পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং অন্তত আধুনিক সাহিত্যের প্রথম যুগে উহার সমালোচনার আদর্শের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে একটি নিজস্ব ও ঐতিহ্য-প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন মিলে। সে যুগের সাহিত্যেও যেমন, তেমনি সমালোচনাতেও ভারতীয় ভাবাদর্শ ও রসবিচার-পদ্ধতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বর্তমান খণ্ডে মূলসূত্রবিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা খুব বেশী নহে, ও উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিক চিন্তা ও অনুভূতি-গভীরতার ছাপ নাই। বরঞ্চ মনে হয় যে নূতন ও আধুনিক সাহিত্যোপযোগী বিচারসূত্র স্থিরভাবে নির্ধারিত হইবার পর, সমালোচক-গোষ্ঠী বিভিন্ন গ্রন্থকার ও রচনার দোষগুণনির্ণয় ও উৎকর্ষ-নিরূপণের প্রতিই মুখ্যভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ভূমিকাতে আমরা মূলসূত্র-আলোচনার প্রতি

বেশী গুরুত্ব আরোপ না করিয়া নূতন ধরণের রচনার বিচারে সমালোচক-গোষ্ঠী কি পরিমাণ মূল্যায়নশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহাই বিশেষভাবে অবধারণ করিতে চেষ্টা করিব। নবসৃষ্ট সাহিত্যের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে তৎ-সম্পর্কিত সমালোচনা-সাহিত্যও কিরূপ বৃদ্ধি ও বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাই মুখ্যভাবে আমাদের কৌতূহল উদ্দীপন করে।

সাহিত্যের মূলসূত্র

সাহিত্যবিচারের দার্শনিক ও রসতত্ত্বমূলক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে—পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যের সমালোচনা', 'সাহিত্যের আদর্শ', 'সাহিত্যে অভিশাপ' এই তিনটি প্রবন্ধে, শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর 'সমালোচনা' প্রবন্ধে, প্রিয়নাথ সেনের 'কাব্যকথা' প্রবন্ধে, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'নাটক ও উপন্যাস' ও দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'বাংলা উপন্যাসের বিশেষত্ব' প্রবন্ধদ্বয়ে ও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর মধ্যে স্থান-না-পাওয়া, অথচ সূক্ষ্ম-অনুভূতি-সম্পন্ন কয়েকটি অপরিণত রচনায়—যথা 'সংগীত ও কবিতা', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' ও 'কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন' এই তিনটি প্রবন্ধে। ইহাদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বসুর প্রথম প্রবন্ধটি এক সঙ্কীর্ণ ও নীতিবাদগ্রস্ত মনের প্রতিচ্ছবি। ইহাতে তিনি আর্যসাহিত্যে সমালোচনার অভাবের কারণ-নির্দেশ-প্রসঙ্গে সমালোচনার নিষ্ফলতা ও অনিষ্টকারিতার উপরেই জোর দিয়াছেন ও সমালোচনা যে প্রতিভা-স্ফুরণের সহায়তা করে না বরং অনেক সময় প্রতিকূল মতপ্রকাশ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের দ্বারা প্রচুর কাব্যসম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানে সমালোচনার বিকৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সমগ্র সমালোচনা-ক্রিয়াকেই হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই অশ্রদ্ধেয় মত উপস্থাপনার পর তিনি তাঁহার প্রথম উত্থাপিত প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। আর্যসাহিত্যে কাব্যের ফলশ্রুতিই উহার বিচারের একমাত্র মানদণ্ড ছিল। অর্থাৎ যে কাব্য সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, সামাজিক চিত্তে কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার উৎকর্ষ-বিচার, শ্রেষ্ঠত্ব-বিশ্লেষণ নিরর্থক। উহার অর্থবোধ-

সৌকর্যের জন্য টীকা-জাতীয় আলোচনাই যথেষ্ট। রামায়ণ ও মহাভারতকে যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমালোচকের নিকট স্বতঃসিদ্ধ, বিচারাতীত সত্য। কেবল চরিত্রায়ণের আদর্শ ও নীতিবোধের সমুন্নতির উদাহরণ আহরণের জন্যই বিদগ্ধ পাঠক উহাদের উল্লেখ করিবেন, উহাদের কাব্যোৎকর্ষ প্রতিপাদনের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। সমালোচনার ফলই হইবে মতভেদসৃষ্টি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রসাস্বাদন সার্বভৌমরুচি-সমর্থিত। এইজন্যই আর্যসাহিত্যে আধুনিক রীতির মতভেদ-কণ্টকিত, রুচিভেদজাত, বিপরীতমুখী আলোচনার অভাব। এই প্রসঙ্গে লেখক শ্রীজীব গোস্বামীর পরমাত্মসন্দর্ভ হইতে কাব্যবিচারের যে মানদণ্ডাত্মক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই আধুনিক আদর্শের সহিত চমৎকার-ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। দুঃখের বিষয়, এই জাতীয় সমালোচনার নিদর্শন আমরা সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যের মধ্যে পাই না। প্রবন্ধকার ফলশ্রুতিকে ধর্ম ও সমাজনীতির অনুসারী কল্পনা করিয়া সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় দিয়াছেন।

শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর 'সমালোচনা'-প্রবন্ধে ইহার বিপরীত বা পরিপূরক মত প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচনা পরিণত মননের প্রকাশ। প্রবন্ধকার সমালোচনার প্রয়োজন ও উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। হয়ত প্রতিভাবান লেখকের পক্ষে সমালোচনার সহায়তা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যাঁহারা প্রতিভার অধিকারী না হইয়াও গ্রন্থ-রচনায় যত্নশীল বা যাঁহারা শিক্ষানবীশ লেখক তাঁহাদের পক্ষে সমালোচনা যে অত্যাবশ্যকীয় তাহা নিঃসন্দেহ। যেমন প্রতিভাবান লেখক আছেন, তেমনি প্রতিভাবান সমালোচকেরও অসদ্ভাব নাই এবং সাহিত্যসাধনায় পথনির্দেশের দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করা উচিত। নিন্দা, প্রশংসা ও আদর্শনির্দেশ—সমালোচকের এই ত্রিবিধ কর্তব্য। সমালোচকের সহায়তা ব্যতীত সাধারণ পাঠক সাহিত্যের রস উপভোগ করিতে পারেন না। লেখক মনে করেন যে "কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষা, আনন্দবোধ তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র" ও সমালোচনা কাব্যের এই শিক্ষাপ্রদ দিকটাই পরিস্ফুট করে। আধুনিক কলা-কৈবল্যবাদের যুগে এই মত যে বিশেষ আদরণীয় হইবে না ইহা সহজেই অনুভবগম্য। এবং সমালোচনার প্রধান কাজ রসবোধের সহায়ক না হইয়া শুধু শিক্ষার পোষক

মাত্র এইরূপ মতবাদও ভ্রান্ত মনে হইবে। অবশ্য সমালোচক নানা তত্ত্ব ও দৃষ্টান্ত সমাবেশে, বিভিন্ন কবির তুলনার দ্বারা কাব্যের নীতির দিকটা বিশদ করিতে পারেন, কিন্তু ইহাও সৌন্দর্য-আস্বাদন বা রসানুভবের একটা উপায় মাত্র। রসকে অতিক্রম করিয়া ইহার কোন প্রাধান্য নাই। মোটের উপর এই প্রবন্ধ দুইটিতে মৌলিক চিন্তা বা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির কোন পরিচয় নাই—কাব্য ও সমালোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল তত্ত্বই ইহাদের আলোচ্য বিষয়।

'সাহিত্যের আদর্শ'-এ পূর্ণচন্দ্র বসু পাশ্চাত্য ও আর্যসাহিত্যের উদ্দেশ্য-ভেদ-অনুযায়ী প্রকৃতি-পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবিগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেক্সপিয়ার ও মিলটন এই বৈপরীত্য-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে প্রধানত তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছেন। শেক্সপিয়ারের নাটক ও মিলটনের মহাকাব্যে রজ ও তম-গুণপ্রধান চরিত্রের প্রাধান্য দেখা যায়; সেইজন্য যে ধর্মের প্রতি অনুরাগবৃদ্ধি কাব্যের প্রধান লক্ষ্য তাহা পাঠকচিত্তে সুস্পষ্টভাবে স্ফুরিত হয় না। বিশেষত ট্রাজেডিতে আসুরিক প্রকৃতির নর-নারীর প্রাদুর্ভাব ও ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রের অশুভ পরিণাম পাঠকের মনে একটা সংশয়-কুহেলিকার সৃষ্টি করে। মিলটনের সয়তান ভগবানকেও আচ্ছন্ন করিয়া মাথা তুলিয়াছে। পক্ষান্তরে আর্য কবির রচনায় ধর্মের অসাধারণ মনোহর আদর্শসমূহ এত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে ও পাপ-চরিত্রাবলীকে এরূপ ম্লান করিয়াছে যে উহাতে পাঠকের মনে ধর্মের একাধিপত্যই দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয় ও তাহার সাংসারিক জীবনেও ধর্মের প্রভাব বদ্ধমূল হয়। রামের চরিত্রের নিকট রাবণ নিষ্প্রভ, দ্রৌপদীর লোকোত্তর ক্ষমার জ্যোতিতে অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৃশংসতার কালিমা অদৃশ্যপ্রায় মনে হয়। পাশ্চাত্য ট্রাজেডিতে পাপের নিবিড় অন্ধকারে পুণ্যের একটু ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করে—পুণ্যের সম্পূর্ণ জ্যোতির্ময় পরিচয় এখানে নাই। এখানে অদ্ভুত ও ভয়ানক রসের প্রাধান্য, বিশ্ববিধানের প্রসন্ন স্বীকৃতিতে যে শান্তরসের উদ্ভব তাহা দ্বন্দ্বের প্রবল আন্দোলনে এখানে স্থির হইতে পারে না। তেমনি বীরত্বও আর্যসাহিত্যে পশুবলের সহচর নহে, ধর্মানুরাগেরই তেজোময় প্রকাশ। রামায়ণে রাম ও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ ধর্মাদর্শের প্রতীকরূপে সর্বাতিশায়ী বীরত্বেরও আধার।

আর্যসাহিত্যের স্বরূপ-উদ্ঘাটনে এই সমালোচনার যাথার্থ্য অবিসংবাদিত। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিভিন্ন লক্ষ্যের সহিত উহার ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও জীবন-পরিচয়ও যে অনিবার্যভাবে সংপৃক্ত, সে দিকটা সমালোচকের পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই। পাশ্চাত্য কবির উদ্দেশ্য বিসদৃশ ও অবাঞ্ছিত ঘটনা-পরিণতির মাধ্যমে জীবনের অতল-গভীর রহস্যের দ্যোতনা ও উহার যথার্থ পরিচয়-উদ্ঘাটন। উহার ধর্মাদর্শ প্রাচ্য কবির ন্যায় শাশ্বত ও স্থির নহে, বাস্তব জীবনের গতি-পরিণতির মধ্য দিয়া এক অপরিস্ফুট, গোধূলি-আলোকে ক্ষীণভাবে উপলব্ধ, সংশয়জড়িত বিশ্বনীতির আভাসন। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"—এই নীতিসত্য আর্য কবির ন্যায় পাশ্চাত্য কবির কণ্ঠে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষিত হয় না। সেখানে অধর্মের অনুতাপ, অস্বস্তি ও অচিরস্থায়িত্বের মধ্যেই ধর্মের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ নিহিত। ধর্ম আছেন কি না জানি না, তবে অধর্ম যে টেঁকে না ইহা নিঃসন্দেহ—পাশ্চাত্য কবির ইহাই প্রতিপাদ্য। সেখানে স্থির বিশ্বাসের শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্তে আছে অস্ফুট অনুভূতির নারায়ণী সেনা। জীবন এইরূপেই পাশ্চাত্য কবির নিকট দেখা দিয়াছে। তাহার ভাব-গগনে ধর্মসূর্য সংশয়-হিমানীতে ম্লান। দীর্ঘ সংগ্রামের পর, বহু চেষ্টায় কুহেলি-যবনিকা অপসারিত করিয়া তবেই তাহার কুণ্ঠিত প্রকাশ। প্রাচ্য সাহিত্যে ধর্মের তিলোত্তমা সর্বসৌন্দর্য-সমন্বয়ে অপরূপ-লাবণ্য-মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত; পাশ্চাত্য সাহিত্যে উহার উপাদান-কণিকার সংগ্রহ, উহার তিল-পরমাণুসমূহের বিশ্লিষ্ট সঞ্চয়ন। লোকশিক্ষার দিক দিয়া আর্যসাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য—লোক-চরিত্রজ্ঞান ও বাস্তব সত্যের কলাসৌন্দর্যবিধানের দিক দিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বও তুল্যভাবে স্বীকর্তব্য।

'সাহিত্যে অভিশাপ' প্রবন্ধেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের এইরূপ জীবন-দর্শনগত পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচ্য সাহিত্যে, বিশেষত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'য় ঋষি-প্রদত্ত অভিশাপ অধ্যাত্মরাজ্যের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের রূপক-প্রকাশ। মনের অতি সূক্ষ্ম অপরাধের বহিঃপ্রকটন ও ঐশী বিধানের মানদণ্ডে উহার ক্ষালনের উপায় এই অভিশাপ। বাহিরের শক্তিতে যাহার বিচার ও দণ্ড সম্ভব নয়, বহির্বিচারের সীমাবহির্ভূত মনের অবচেতন স্তরে লুক্কায়িত সেই

প্রমাদ-ব্যসন ঋষি-শাপের অন্তর্ভেদী রঞ্জনরশ্মিতে আবিষ্কৃত ও নিরাকৃত হয়। শকুন্তলার অদম্য যৌবনলালসা গান্ধর্ব-বিবাহের অসামাজিক আত্মতৃপ্তিতে পরিণতি লাভ করে। এই একান্ত স্বাভাবিক যৌবন-চাপল্য দণ্ডবিধির কোন ধারার মধ্যে পড়ে না, কোন স্থূল নিয়মও লঙ্ঘন করে না; এমন কি অভিভাবকের প্রসন্ন স্বীকৃতি ইহার স্বেচ্ছাচারিতার উপরও একটি স্নিগ্ধ আবরণ প্রসারিত করে। কিন্তু এই আত্মরতির মোহাবেশ যে কর্তব্যচ্যুতি ঘটায়, শোভন আচরণের যে ভারসাম্যকে বিচলিত করে তাহার ভৎ´সনা ও ধিক্কার ধ্বনিত হয় ঋষির অমোঘ শাপের মধ্যে। যেমন কর্তব্যচ্যুতির জন্য শকুন্তলাকে দুর্বাসাও অভিশাপ দেন, তেমনি দুষ্যন্তের উদ্দাম কামনা ও নিজ কৃতকর্মের বিস্মৃতি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে শকুন্তলা ও তাহার সহচর ঋষিবালকদ্বয়ের তীক্ষ্ণশ্লেষাত্মক তিরস্কারবাক্যের অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ হয়। রাজার নিজ প্রকৃতিগত তরলতার মধ্যেই অভিশাপের ফল প্রচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি অভিশাপ প্রয়োগ করিতে হয় নাই। দুর্বাসার শাপ শকুন্তলার উপর উচ্চারিত হইলেও ইহার প্রকৃত প্রয়োগ ও ফলশ্রুতি দুষ্যন্তের ক্ষেত্রে—এই অভিশাপের তীক্ষ্ণ, অগ্নিদিগ্ধ শর এই আসক্তিমত্ত প্রণয়িযুগলের একের হৃদয় ভেদ করিয়া অপরের স্মৃতিমূলের গভীরে বিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচ্য কাব্যের বিষয় যে মানবজীবন তাহা অনতিক্রম্য অধ্যাত্ম বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে কৃতকর্মের ফল এড়াইবার কোন সূক্ষ্মতম রন্ধ্রপথও খোলা নাই।

ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তরূপে ওথেলো-ডেসডেমোনার কাহিনী লেখক কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। ডেসডেমোনা মোহাবিষ্ট হইয়া পিতার প্রবল অসম্মতি ও বাধাকে উপেক্ষা করিয়া ওথেলোর প্রণয়াকৃষ্ট হইয়াছে। এই অসম প্রণয়ের ফলেই ট্রাজেডি ঘটিয়াছে। আর্য কবির হাতে পড়িলে অবাধ্য কন্যার দ্বারা অপমানিত ও মর্মপীড়িত পিতার দুঃসহ ক্রোধোচ্ছ্বাস অভিশাপ-বাক্যে ফাটিয়া পড়িত ও পরবর্তী ঘটনা এই অভিশাপের অনিবার্য ফলরূপে প্রতীয়মান হইত। সমস্ত মর্মান্তিক ঘটনা-পরম্পরা মানবের স্বেচ্ছাকৃত প্রতিহিংসা হইতে উন্নীত হইয়া এক ঊর্ধ্বতর অধ্যাত্মবিধানের অঙ্গীভূত হইত। কাহিনীর মধ্যে অমোঘ ধর্মতত্ত্বের ক্রিয়া প্রকটিত হইত। মানুষের ষড়যন্ত্র, মিথ্যাভাষণ, ঈর্ষ্যা, জিঘাংসা প্রভৃতি হীন, বিস্ফোরক বৃত্তিগুলি নিয়তির রহস্যলীলায় রূপান্তরিত হইত।

সমস্ত নাটকের ভাবরূপ ও স্বাদগুণ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইত। নারীহন্তা মূর্খ সরল ওথেলো আমাদের ঘৃণাভাজন না হইয়া অদৃষ্টের হাতে ন্যায়বিচারের শাণিত অস্ত্ররূপে প্রতিভাত হইত—সে ঘাতক না হইয়া বলিদানের নিয়োজক রূপে পরিচিত হইত। এক অভিশাপের প্রবর্তনের ফলে নাটকটি শ্বাসরোধ-কারী, ইতর চক্রান্ত ও রক্তকলুষিত নির্মম হত্যাকাণ্ডের বাতাবরণ ভেদ করিয়া দৈবলীলার ঊর্ধ্ব আকাশে বিচরণ করিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিত।

এই মন্তব্য একদিক দিয়া যথার্থ হইতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে শেক্সপিয়ারের ওথেলো নাটক যে উহার স্বরূপ হারাইয়া ফেলিত তাহাও নিঃসন্দেহ। প্রথমত পাশ্চাত্য নাট্যকার অবস্থাবিশেষে ও চরিত্রভেদে মানবপ্রকৃতির মধ্যে যে কিরূপ উন্মত্ত, ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে, প্রেম যে ভ্রান্তিচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া কেমন নিদারুণ জিঘাংসায় পরিণত হইতে পারে, তাহার দৈবপ্রভাবনিরপেক্ষ, সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন-প্রবৃত্তি-সংঘটিত রূপটি দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইহার কিছুটা অনুরূপ দৃশ্য আমরা কাপালিক-প্ররোচিত নবকুমারের অন্তরে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ-তুষানলের প্রজ্বলনে দেখিতে পাই। অবশ্য ওথেলোর সহিত তুলনায় নবকুমারের সন্দেহপরায়ণতা অত্যন্ত মৃদু ও ক্ষণস্থায়ী—ইহা ওথেলোর দাবানল হইতে প্রক্ষিপ্ত একটি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গমাত্র। তথাপি এই মর্মদাহী বহ্নিজ্বালা একই প্রকৃতির। নবকুমারের ক্ষেত্রে ইহার কোন মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে নাই, কেননা তাহার অপ্রকৃতিস্থতা সংশয়-নিরসনের অতীত বিকারে পৌছে নাই। সে কপালকুণ্ডলাকে খোলা-খুলি তাহার সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছে ও তাহার সদুত্তর পাইয়াছে। প্রাচ্য লেখক সংশয়-মুক্ত স্বামী ও মোহমুক্ত পত্নীকে এই রহস্যপারাবারের স্রোতে ভাসাইয়া সমস্ত লৌকিক বোঝাপড়ার অতীত এক অচ্ছেদ্য মৃত্যু-মিলনের তীর্থযাত্রী করিয়াছেন। নবকুমারের চিত্তে এই ঈর্ষ্যার ঝলক ভাগ্যের বিরাট ষড়যন্ত্রের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র—দৈবরোষের ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের এক প্রান্তে একটা ক্ষণিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। এখানে পতি পত্নীকে হত্যা করে নাই, কেননা উভয়েই এক দৈব-সংযোজিত জটিল ফাঁসে জড়াইয়া পড়িয়াছে। এক প্রকারেরই ঘটনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবির হাতে কিরূপ বিপরীতমুখী হইয়াছে ওথেলো ও কপালকুণ্ডলা তাহার চমৎকার উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, অভিশাপের কাব্য-সার্থকতা ও ন্যায়বিধানের পোষকতা অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রার উপর নির্ভর করে। অভিশাপমাত্রেই যে অধ্যাত্মজগতের রহস্যদ্যোতক হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। পুরাণে শত শত অভিশাপ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচ্য মহাকবি ইহার কয়েকটিকে মাত্র তাঁহাদের কাব্যের মূল প্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের অবতার রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের উপরও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কবি তাঁহাদের জীবনে এ অভিশাপ কেমন করিয়া ফলিল ও কোন্ সূক্ষ্ম ধর্মনীতির তাৎপর্য প্রকাশ করিল তাহা প্রদর্শন করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই। রামের সীতা-নির্বাসন যে সদ্যোবিধবা বালি-পত্নী তারার অভিশাপের ফল, বা শ্রীকৃষ্ণের যদুবংশ-উৎসাদন যে কুরুরাজপত্নীর শতপুত্রশোকবিমথিত অন্তরবেদনার অমোঘ-প্রতিশোধ-স্পৃহা-সঞ্জাত, এরূপ কথা কাব্যসত্য বা ন্যায়বিচারের অভিব্যক্তি—কোনটিরই পর্যায়ে পড়ে না। বিশেষত দুর্বাসা ঋষি ত অভিশাপ-উদ্গিরণের একটা সদা-জলন্ত হাপর-বিশেষ। তাঁহার শত শত অভিশাপের মধ্যে শকুন্তলা-বিষয়ক অভিশাপ-বীজটিই কাব্যকমণ্ডলুর পূতবারিপুষ্ট হইয়া ফুলে-ফলে অপরূপ শোভায় মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ অভিশাপ কোন অভ্যাস-রূঢ়, বদ্ধমূল পাপাচরণের প্রতি নহে, কোন স্পর্ধিত মর্যাদা-লঙ্ঘনের প্রতি নহে, বিরহ-বিধুর তরুণ মনের প্রেমাস্পদের স্মৃতিবিভোর উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততার প্রতি ; ইহার ক্ষালন হইবে কোন দুরূহ প্রায়শ্চিত্তে নহে, কোন উৎকট অসাধ্য-সাধনে নহে। প্রিয়বিরহের মৃদু সন্তাপে, অশ্রুবিধৌত নীরব আত্মবিচারণে, মিলন-সুন্দর পরিণতির প্রতীক্ষায়। কাজেই ইহা সহজেই কাব্যের বিষয় ও কলাসৌন্দর্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ওথেলোর যে ঈর্ষ্যানল চারিটি অঙ্ক ধরিয়া ক্রমাগত উত্তেজিত ও আহুতি-পুষ্ট হইয়া সর্বধ্বংসী লেলিহান শিখায় জলিয়া উঠিয়াছে, তাহা অঞ্জলিপরিমিত শান্তিবারি-সেচনে, কোন অনুকূল দৈবের আকস্মিক বরে নির্বাপিত হইবার নহে। উদ্যত খড়্গ উহার বলি না লইয়া ফিরিবে না। ওথেলো-তে হৃদয়সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উঠিয়াছে তাহাকে দৈবানুগ্রহে, শাশ্বত ঐশী বিধানে অমৃতে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে, তাহা পান করিতেই হইবে। সুতরাং ওথেলোকে শকুন্তলার ছাঁচে ঢালাই করিবার চেষ্টা করিলে তাহা মানবপ্রকৃতিবিরোধী ও কলাবিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইবে। অভিশাপের

বাজপাখী ক্বচিৎ কখনও কাব্য-পারাবতের সোনার দাঁড়ে আশ্রয় পাইলেও উহাই যে উহার নিয়মিত বিশ্রামস্থল ইহা মনে করিলে ভুল করা হইবে।

২

রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধে সাহিত্যতত্ত্ববিচারের একটা নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি অপরিণত রচনা ; ইহাদের মধ্যে সুলভ সাধারণ-সূত্র-সংকলন-প্রবণতা (cheap generalisation) ও ভাবোচ্ছ্বাসের অস্পষ্টতা বিশেষভাবে প্রকট। তথাপি এই অপরিপক্ক রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও যুক্তিসমাবেশ-কৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। 'সংগীত ও কবিতা'-প্রবন্ধে যুক্তিপ্রধান আলোচনা ও অনুভূতিপ্রধান কাব্যধর্মী রচনার মধ্যে পার্থক্যটি খুব গভীরভাবে না হউক খুব বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। "যে সকল সত্য মহারাজ 'কেন'-র প্রজা নহে, তাহাদের বাসস্থান কবিতায়"। কথোপকথনের ভাষা, দর্শনবিজ্ঞানের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার ভাষা ও বিশুদ্ধ অনুভবের ভাষা—লেখক গদ্য ও পদ্যের পরিধি-সীমান্ত এই বিভিন্নরূপ প্রয়োজনের ভিত্তির উপরই নির্ণয় করিয়াছেন। এই মুখবন্ধের পরে লেখক তাঁহার আসল বিষয়ে, কবিতা ও সংগীতের পার্থক্যনির্ণয়ে ব্রতী হইয়াছেন। কবিতা সুরমিশ্রিত বা ছন্দায়িত কথায় উপর ও সংগীত বিশুদ্ধ সুরের উপর নির্ভরশীল। এই পর্যন্ত কবিতা ও সংগীত সমধর্মী ; কিন্তু ভাব-প্রকাশের দিক দিয়া কবিতা সংগীত অপেক্ষা অনেক প্রাগ্রসর। ইহার কারণ কবিতা কেবল ছন্দের উপর নির্ভর না করিয়া ভাবপ্রকাশের উপরই জোর দেয়—এই ভাবের মধ্যে যে আবেগ স্পন্দিত তাহারই প্রকাশের জন্য ছন্দ-স্পন্দের প্রয়োজন। কিন্তু সংগীত সুরসর্বস্ব ও স্বভাব-মধুর বলিয়া ভাব সম্বন্ধে উদাসীন। উর্বর দেশের কৃষকের ন্যায় সংগীতও আলস্যপরায়ণ ও শিথিল-প্রযত্ন। সংগীত মনের একটি মাত্র স্থায়ী ভাবের, ক্ষণিক, প্রসারহীন উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি, ইহাতে গতিশীল ভাবপ্রবাহকে ধরিয়া রাখা যায় না। কবিতায় ভাবের গতি ও স্থিতি, ইহার চিত্রধর্মী মুহূর্ত ও পরিবর্তনশীল চেতনা উভয়েরই রূপায়ণ ঘটে। সংগীত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, কবিতা এক ভাবসীমান্ত হইতে অন্য ভাবসীমান্তে প্রসারণশীল।

কিন্তু এই তুলনামূলক আলোচনায় লেখকের সর্বাপেক্ষা মৌলিক মন্তব্য হইল সংগীতের অনড় রেখাজালে আবদ্ধ রূপকাঠিন্য, আর কবিতার নূতন নূতন শব্দজালগঠিত, নব নব ব্যঞ্জনাপূর্ণ অবয়বের বিচিত্র সুষমা—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের অনুভূতি। সংগীতের রাগ-রাগিণীর সুর বাঁধা, কোন নূতন আবেগের স্পন্দন, শিল্পিমনের কোন অভিনব আবেশ ইহার কাঠামোর কোন পরিবর্তন করিতে পারে না। কবিকে যদি ভাবপ্রকাশের জন্য কয়েকটি পূর্বনির্দিষ্ট শব্দের নব নব বিন্যাস করার অতিরিক্ত কোন স্বাধীনতা দেওয়া না হইত, তবে কবিতার যে দুর্দশা হইত, রাগ-রাগিণীর দৃঢ়বন্ধনে বন্দী সংগীতের সেই দুর্দশা ঘটিয়াছে। লেখক কবিতায় শব্দবিন্যাসের মত সংগীতের সুর-সংযোজনায়ও অনুরূপ অবাধ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছেন। লেখকের মৌলিক চিন্তা যথেষ্ট প্রশংসার্হ হইলেও, তাঁহার সাদৃশ্য-ভিত্তিক যুক্তিতে একটা বিরাট ফাঁক আছে। কবিতার শব্দ হইতে সংগীতের সুরের ব্যঞ্জনাশক্তি অনেক বেশী, কেননা সংগীতের ক্ষেত্রে এই ব্যঞ্জনা নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সুতরাং কবি কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ-সাহায্যে যতটুকু ভাব প্রকাশ করিতে পারেন, গায়ক নির্দিষ্ট কয়েকটি পর্দার সংযোগ-বিয়োগের সীমাহীন বিচিত্রতায় তদপেক্ষা আরও প্রবলতর ইন্দ্রজাল রচনা করিতে সক্ষম। শব্দভাণ্ডারের অপ্রাচুর্যের জন্য কবির যে অভিযোগ, সুরভাণ্ডারের অপ্রাচুর্যের জন্য গায়ক সেরূপ কোন অভিযোগের হেতু পান না। কবির পক্ষে ছন্দের বন্ধন যেরূপ, সুরস্রষ্টার পক্ষে রাগ-রাগিণীর নির্দিষ্ট সুরের বন্ধনও সেইরূপ—উভয়ত্রই বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আস্বাদন ও সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা। যেমন অক্ষরমালার সহিত স্বরগ্রামের তুলনা হয় না, তেমনি শব্দের সহিত সুরের তুলনাও অনুপযোগী ; ছন্দের সঙ্গেই রাগ-রাগিণীর সুরদেহের সত্যকার মিল। রবীন্দ্রনাথ গীতিকার রূপে যে নূতন নূতন সুরের সংযোজনা করিয়া ভাবানুরূপ মিশ্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন এই প্রবন্ধে সেই প্রেরণার আদিম আভাস লক্ষিত হয়। তবে রবীন্দ্র-সংগীতভাণ্ডারের রক্ষী যাঁহারা তাঁহারা যে রবীন্দ্রসৃষ্ট সুরের কোন সামান্যতম পরিবর্তনও অনুমোদন করেন না, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে এই স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে ও শুধু মার্গসংগীতের অভিজাত রাগিণী নহে, অর্বাচীন, সদ্যোজাত সংগীতেরও একটা অপরিবর্তনীয় রূপরেখায় বিধৃত থাকা প্রয়োজন।

'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা'-য় রবীন্দ্রনাথের যে অনির্দেশ্য রোমান্টিক ভাবকল্পনা তাঁহার 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত কাব্যধারায় উদাহৃত হইয়াছে তাহাই সমালোচনা-সূত্ররূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। রোমান্টিক সমালোচক রোমান্টিক কবির তত্ত্বানুভূতির ভিত্তিভূমিটি প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এ যেন কাব্যের বিচার নহে, উহার কোমল অনুভূতি, বাস্তব-অসহিষ্ণু আদর্শ-আকূতিরই ছন্দবিহীন পুনরুক্তি। তরুণ কবি অন্তরের ভাবমত্ততাটিকে এক বিচারাতীত স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রমাণনিরপেক্ষ স্বতঃ-অনুমোদন দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার নিকট বস্তুগত ও ভাবগত কবিতার পার্থক্য সাদা ও কালোর পার্থক্যের ন্যায় অতি সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ। ভাবগত কবিতা অতীন্দ্রিয়, আর বস্তুগত কবিতা ইন্দ্রিয়-নির্ভর; এবং যেহেতু অধ্যাত্ম দর্শনে অতীন্দ্রিয়ের স্থান উচ্চতর, সুতরাং কাব্যবিচারেও উহাদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সেই একই মানদণ্ডে নির্ধারণীয়। যে "বিষণ্ণ মুখ" ও "কোমল বিষাদ" আমরা তাঁহার প্রথম যুগের কাব্যে অনুভব করি, সমালোচনায় তাহারই ভাবোচ্ছ্বাসময় প্রশস্তি। অসীম দিগন্ত হইতে ভাসিয়া-আসা যে রূপপ্রবাহ আমাদিগকে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়া দেয় না, গভীর আনন্দের মধ্যে এক চির-অতৃপ্তির বেদনার রেশ রাখিয়া যায়, তাহাই আমরা কাব্যের ছন্দোময় বিলাপে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি। ইহাতেই যদি সত্য কাব্যপ্রেরণা থাকে, তবে রক্তমাংসময় বাস্তবের অতি-সন্নিহিত হইবার প্রয়োজন কি?—তরুণ কবির এই প্রশ্ন যৌবনস্বপ্নবিভোর সমালোচকের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মননশীলতার সুষ্ঠু পরিচয় তাঁহার 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' প্রবন্ধে সুপরিস্ফুট। সভ্যতা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরূপেরও কেমন পরিবর্তন ঘটে, তাহা কবি গভীর মনীষা ও সমাজ-বিবর্তনজ্ঞানের সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার এই বিষয়ে চিন্তাধারা এখনও হাতে-হাতে-ফেরা পুরাতন মুদ্রার ন্যায় সম্পূর্ণভাবে মৌলিকতাচিহ্নবর্জিত হয় নাই। মহাকাব্য সেই যুগের লেখা যখন রাষ্ট্রশাসনে ও কাব্যপ্রণয়নে উভয়ত্রই একাধিপত্য। মহাকাব্যের পূর্বেও বিশৃঙ্খল কাব্য-উপাদান যেখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহার পর সমগ্র জাতির একক প্রতিনিধিরূপে এক মহাকবি তাহাদিগকে

নীতিসূত্রগ্রথিত ও উদাত্তকল্পনাস্ফীত করিয়া মহাকাব্যের বিরাট ও সুগঠিত দেহে বিন্যস্ত করিলেন। তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীসমূহ যখন এক বৃহত্তর-সমন্বয়কারী জাতীয় চেতনায় সংহত হইল, তখনই মহাকাব্যের পটভূমিকা প্রস্তুত হইল। ট্রয় ও গ্রীসের যুদ্ধ ও রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া এইভাবে এক সর্বদেশব্যাপী জীবনবোধ ও সংস্কৃতি উদ্বর্তিত হইল। মহাভারত পরবর্তী বিবর্তনস্তরের প্রতিফলন বলিয়া ইহাতে ঐক্যের মধ্যে আবার নূতন বিভেদের বীজ উপ্ত হইয়াছে। যেখানে জীবনাদর্শ ও ধর্মনীতির কোন পার্থক্য নাই, সেখানে কেবল বংশগত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এক যুগাবসানসূচক মহাপ্রলয়ের অবতারণা করিয়াছে। তেমনি আদিভূত, নিয়মশৃঙ্খলাহীন, সংঘর্ষপীড়িত বাষ্পরাশির ঘূর্ণ্যমান অস্থিরতা হইতে গ্রহ-উপগ্রহে অবিভক্ত, একক সৌরমণ্ডলের উদ্ভব। বহিঃ-প্রতিবেশ, সমাজব্যবস্থা ও সাহিত্যসৃষ্টি একই নিয়মের অধীন হইয়া ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

ইহার পর অনিবার্য কারণেই মহাকাব্যের যুগ অন্তর্হিত হইল। জটিলতর অবস্থা ও ব্যাপকতর কর্মশীলতার সঙ্গে সঙ্গেই সার্বভৌম রাজা, অতিকায় মহাকাব্য ও সর্বগ্রাসী সৌরমণ্ডল অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু সংহতগঠন সংস্থায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। মহাদেশ সুবিন্যস্ত দেশসমূহে, মহাকাব্য নাতিবৃহৎ আখ্যানকাব্য ও গীতিকবিতায়, এবং সৌরমণ্ডল কেন্দ্রাবর্তিত গ্রহ-উপগ্রহে আপনাদের বিরাট অবয়বকে অংশীকৃত করিল। "একোঽহং বহুস্যাম্"—স্রষ্টার এই মূল নীতি আদিমসৃষ্ট পদার্থেও প্রকটিত হইল। আমরা কিন্তু এই বিবর্তনের প্রগতিশীলতায় সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িলাম। মহাকাব্য আমাদের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে খণ্ডকবিতা যে মহাকাব্যের অযোগ্য সন্ততি এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইল। রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকারভাবে একটি গভীরার্থক সংক্ষিপ্ত সূত্রে এই পরিবর্তনের ধারাটি নির্দেশ করিয়াছেন—"প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন ও তাহার পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচ্ছেদ"। যেমন রাজশক্তি সাধারণতন্ত্রের বহু কর্মচারীর মধ্যে বিভক্ত হইলে দুর্বল হয় না, যেমন সৌরচক্র নানা গ্রহ-উপগ্রহে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকে উন্নততর পর্যায়ে লইয়া যাইতেছে, যেমন একান্নবর্তী,

শিথিল-সংলগ্ন বৃহৎ পরিবারের সুপরিচালিত ও দৃঢ়বদ্ধ ক্ষুদ্রতর পারিবারিক সংস্থায় বিভক্তি পরিবার-জীবনের অধোগতির চিহ্ন নহে, সেইরূপ মহাকাব্যেরও নানা-কবি-রচিত বিচিত্র খণ্ডকাব্যে পরিণতি মানবের সৃষ্টিশক্তির অপকর্ষের পরিচয় বলিয়া মনে করা ভুল। কবিতার রাজ্যে "প্রথমে ছাড়া-ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ"।

এই শ্রমবিভাগের ফলে কবিতার রাজ্যে যে অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে তাহা লেখক সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। এখন অতি সূক্ষ্মতম, জটিলতম অনুভাব কাব্য-বীণায় স্পন্দন তুলিতেছে—"এখনকার কবিতায় এমন সকল ছায়া-শরীরী, মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায় যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না···এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণতঃ সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে"। এখনও "মানবহৃদয় নামে একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন"। "যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তিসকল সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত, ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না।···এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুটভাবে অনেক গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন"। মহাকাব্যের চাপে যখন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সঙ্কুচিত হয়, তখন ইহার পূর্ণ স্ফুরণের জন্যই বিভিন্ন ধরণের কবিতা মহাকাব্যের অঙ্গ হইতে, হিমালয়-গাত্র হইতে বিভিন্ন নদ-নদীর ন্যায়, নিঃসৃত হইয়া পড়ে। নিশ্চয়ই ইহা অবনতি নহে, উন্নতিরই লক্ষণ।

সভ্যতা ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে কবিতার প্রাদুর্ভাব ক্ষীণতর হয় এই পুনঃপুনঃ-উচ্চারিত অর্ধসত্যকে রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি-প্রয়োগে খণ্ডিত করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব। তিনি বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে একটি আপাত-অসম্ভব (paradoxical) উক্তি করিয়া উহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন। বিজ্ঞান আলো ছড়ায় ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নূতন নূতন অন্ধকার-বৃত্তই আমাদের গোচরীভূত করিতেছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে আমাদের রহস্যবোধ ফিকে হইবার পরিবর্তে আরও

গাঢ় ও ঘনীভূত হইতেছে। এক রহস্যের সমাধান দশটা নূতন রহস্যের গুহামুখ খুলিয়া দিতেছে। নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের পুরাতন জীবন-বোধকে বিপর্যস্ত করিয়া অসংখ্য নূতন প্রশ্নের উদ্রেক করিতেছে। এক একটা রহস্যের সমাধান জীবন যে কত রহস্যময় তাহাই প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং বিজ্ঞান কবি-কল্পনার বিরোধী ইহা সম্পূর্ণ অসত্য; বরং ইহা নূতন নূতন বিস্ময়বোধ, জীবনের অপরিসীম রহস্যের নূতন পরিচয় উদ্বুদ্ধ করিয়া কল্পনা-অনুশীলনের আরও বিস্তৃততর ক্ষেত্র রচনা করিতেছে।

প্রাচীন কবিরা জীবন-রহস্যকে শুধু কল্পনাবিলাসের সাহায্যে অনুভব করিয়া উহার একটা অতি-নির্দিষ্ট-অবয়ব-বিশিষ্ট প্রতিমা নির্মাণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং সকল কবির কাব্যে সেই একই প্রতিমার অনুকরণ দেখা যাইত। রাজপ্রাসাদের বহিঃতোরণে যেমন একই ধরণের চিত্রালঙ্করণ দেখা যায়, তেমনি ইহারা রহস্যনিকেতনের বহিরঙ্গনে দাঁড়াইয়া একই কল্পনার পুনরাবৃত্তির সাহায্যে তাঁহাদের বিস্ময়বোধ প্রকাশ করিতেন। সমস্ত পুরাণে দেব-দেবী, ঊষা-সন্ধ্যার অভিন্ন, অনুকরণাত্মক রূপায়ণ। কিন্তু আধুনিক কবি জ্ঞানের অস্ত্রে রহস্য-রাজপুরীর বাহিরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহার অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়াছেন ও অন্তঃপুরের বিচিত্র সাজ-সরঞ্জাম, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের নব নব প্রকরণের সহিত পরিচিত হইতেছেন। কাজেই তিনি সন্ধ্যা ও ঊষার মূর্তি নূতন ভাবে কল্পনা করিতেছেন, পৌরাণিক ছাঁচের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া নিজ মৌলিক অনুভবশক্তিতে উহাদের নানাবিধ রূপবৈচিত্র্য বিধান করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উর্বশী, অহল্যা, চিত্রাঙ্গদা, দেবযানী, কর্ণ, গান্ধারী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রসমূহ যে সম্পূর্ণ নূতন দেহলাবণ্য ও প্রাণোচ্ছলতা লইয়া আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতেই কি এই নবঘোষিত সত্যের আশ্চর্য পোষকতা পাওয়া যায় না? ইংরেজ কবি কীট্‌সের খেদোচ্ছ্বাসের—

> Do not all charms fly
> At the touch of cold philosophy!

সুনিশ্চিত খণ্ডন, সংশয়চ্ছেদী সদুত্তর আমরা রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে শুনিতে পাই।

প্রিয়নাথ সেনের 'কাব্যকথা' রসের নিত্যতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ হইয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের পক্ষসমর্থনে লিখিত। ইহাতে রস ও কাব্যসৌন্দর্য ও ইহাদের সহিত সত্যনিরূপণ ও নীতি-প্রতিপাদনের সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা সার্বভৌম ও বর্তমান যুগে অতি-পরিচিত সিদ্ধান্ত; কাজেই ইহার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিতর্কের প্রকৃত বিষয় হইল রাধাকমলবাবুর একটি উক্তি: 'রস ও বস্তু, তুইএরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। কাব্য যে গুণে স্থায়ী হয়, তাহা নিত্যরসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয় নিত্যরস ও নিত্য বস্তুর গুণে।' প্রিয়নাথ সেন রসের অনিত্যতার ইঙ্গিতে ও বস্তু ও রসের প্রতি সমান মর্যাদা আরোপে, একটা শাশ্বত সত্যের উল্লঙ্ঘনে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। যখন হৃদয়বৃত্তির কাব্যোত্তরণই রস, তখন এই বৃত্তির মধ্যে অনিত্যতা থাকিলেও তাহা রসে সংক্রামিত হইতে পারে না। সুতরাং অন্তরের ভাব রসরূপ পাইলে তাহা কাল ও রুচির পরিবর্তনের দ্বারা অস্পৃষ্ট ও চিরন্তন-আবেদনশীল।

বর্তমান যুগে রসের এই সার্বভৌমতা ঠিক স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ না করিয়া বিচারনির্ভর স্বীকৃতির পর্যায়ে ফেলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। পৃথিবীর কয়েকখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবশ্য যুগ-ও-রুচি-নিরপেক্ষ মহিমায় অধিষ্ঠিত আছে। ইহাদের মধ্যে প্রতিভার সর্বসমন্বয়কারী শক্তির, রসসৃষ্টি, বিষয়নির্বাচন, কাব্যরীতি, উদার মানবিকতা ও বিশ্ববিধানের স্বচ্ছ অনুভূতির এক সর্বাঙ্গসুন্দর একীকরণের যে স্বাক্ষর আছে তাহা অতিদুর্লভ বলিয়াই ইহারা সকল যুগের ও সকল জাতির মানুষের সশ্রদ্ধ ও সংশয়লেশহীন স্বীকৃতির অভিনন্দন লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখককে বাদ দিলে আর সকলকেই পরিবর্তনের স্রোতে আন্দোলিত হইতে হইয়াছে। মনে হয় যে ইহাদের ক্ষেত্রেও রসসিদ্ধির কারণ সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের ব্যক্তি-প্রতিভা নহে; ইহা ছাড়াও তাঁহাদের পাঠকবর্গের প্রসন্ন আতিথেয়তা, গ্রন্থের আদর্শের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতা তাঁহাদের যুগাতিসারী প্রভাবের একটা অন্যতম কারণ-রূপে বিদ্যমান ছিল। পরিস্থিতির এই দাক্ষিণ্য, লেখক-পাঠকের এই সমপ্রাণতা পরবর্তী যুগে আর সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্ত হয় নাই।

কাজেই দান্তে, মিলটন, গ্যেটে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস্, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি পরবর্তী যুগের মহাকবিরাও পরিপূর্ণ সার্বভৌম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন নাই—পাঠকের রুচি, আদর্শবোধ ও জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্যের উপরেই ইঁহাদের স্বীকৃতির তারতম্য ঘটিয়াছে। সেইজন্যই মনে হয় রসের নিত্যতা পরবর্তী কালের দৃষ্টান্তের দ্বারা পূর্ণরূপে সমর্থিত হয় নাই।

অবশ্য ইহা বলা চলে যে হয়ত ইঁহাদের ক্ষেত্রে বস্তু ও ভাব সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রসে পরিণত হয় নাই—রসের মধুরতার সঙ্গে খানিকটা উগ্র স্বাদ, ব্যক্তিমনের কতকটা সমতাহীন অনুভূতি-তীক্ষ্ণতা মিশ্রিত হইয়া সর্বস্বীকৃত রুচি-পরিতৃপ্তির কিছুটা ব্যত্যয় ঘটাইয়াছে। তা ছাড়া রসনিষ্পত্তিবিষয়েও প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক যুগের একটা পার্থক্য আছে। পূর্বে মানবের কয়েকটি আদিম স্থায়ী ভাবই রসের উপাদানরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল ও এই স্থায়ী ভাবগুলির সংখ্যা অনুসারে রসেরও নয়টি প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে মানবমনের ভাব আরও অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র ও অনেক সময় বিরোধী ভাবের সমাবেশে মিশ্র বা সঙ্কর ভাবেরও উদ্ভব হইয়াছে। ব্যক্তিমনের, আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের ব্যাপক প্রসারের জন্য যে সাধারণীকরণ রসপরিণতির প্রধান উপায় ছিল তাহাও আর পূর্বের মত সহজসাধ্য নহে। পৌরাণিক যুগেও রামসীতার চরিত্রকে যতটা সাধারণীকরণের আদর্শানুগত করা সম্ভব হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের জটিলতর, বৈপরীত্য-সংশ্লেষে গঠিত ও অননুকরণীয়তার মুদ্রাঙ্কিত চরিত্রে তাহা হয় নাই। আধুনিক যুগে আমরা কোন কাব্যবর্ণিত চরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ একাত্মতা অনুভব করি না; ব্যক্তিরহস্যের দ্যোতনাই আমাদের প্রধান আকর্ষণের বিষয়, সাধারণীকরণ নহে। অবশ্য ব্যক্তির মধ্যেই সার্বভৌমতার ব্যঞ্জনা থাকে, কিন্তু প্রতিনিধিত্বমূলক সত্তাই তাহার মুখ্য পরিচয় নহে। এখন কেবল প্রাচীন রসের অনুকরণে সমজাতীয় রস সৃষ্টি করিলেই যে তাহা আস্বাদ্যমান হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সীতা যে পরিমাণে পাতিব্রত্যের আদর্শ, বঙ্কিম-সৃষ্ট ভ্রমর, সূর্যমুখী ঠিক ততটা নহে, তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ তাহাদের আদর্শানুবর্তনের মধ্যে অনেকটা স্বাদবৈচিত্র্যের হেতু হইয়াছে। সুতরাং রসের নিত্যতা সম্বন্ধে প্রাচীন আলঙ্কারিকবৃন্দের সংস্কার সর্বকালীন সত্যরূপে উহার মর্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে

হারাইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। রসের অবিমিশ্র উৎকর্ষ মানিয়া লইয়াও পরবর্তী কালে প্রাচীন আদর্শানুযায়ী রসসৃষ্টির পক্ষে যে বাধা ঘটিয়াছে ও রসে মিশ্র অনুভব ও লৌকিক উপাদানের পরিমাণ যে ইহার অলৌকিকতার উপর খানিকটা সাময়িকতার প্রক্ষেপ বিধান করিয়াছে ইহাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

/ বস্তুপ্রাধান্য ও লেখকের ব্যক্তিগত মননের আধিক্য যে বর্তমান কালের সাহিত্যরসের অবিমিশ্রতার কিছুটা হানি করিতেছে তাহা সহজেই অনুভবগম্য। বস্তু ও মনন রসের মধ্যে নিশ্ছিদ্রভাবে গলিয়া যাইতেছে না, উহাদের কতকটা রসের পাত্রে তলানিরূপে রহিয়া যাইতেছে। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার, ভার্জিলের কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি পক্ষপাত ছিল না, নিজস্ব বিশিষ্ট ভাব-ভাবনাও প্রকাশব্যাকুলতায় তাঁহাদের শিল্পিজনোচিত নিরপেক্ষতাকে বিচলিত করে নাই। তাঁহাদের মধ্যে যে বাস্তব বর্ণনা ও জীবনদর্শন আছে তাহা সমসাময়িক জগতের সাধারণ সম্পত্তি, ব্যক্তিমনের তীব্র আত্মপ্রক্ষেপ নহে; উহা সম্পূর্ণভাবে রসের অধীন ও উহার আত্মসাৎকরণশক্তির দ্বারা সীমায়িত। আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও বিষয়-ব্যসন-পীড়িত, ভাবনা-ভার-পিষ্ট, জীবন-সমস্যার নবতম আক্ষেপে উদ্বেজিত। সমস্যাসচেতনতার ঘানি হইতে বিশুদ্ধ রসনির্যাস নির্গত না হইলেও তাঁহারা খুব বেশী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নহেন। ডিকেন্স, থ্যাকারে, হার্ডি প্রমুখ ঔপন্যাসিক; ব্রাউনিং, ম্যাথিউ আর্নল্ড-প্রমুখ কবি; ইবসেন, শ, গলস্‌ওয়ার্দি প্রভৃতি নাট্যকার রসসৃষ্টি অপেক্ষা মতবাদ-প্রতিষ্ঠার প্রতি অধিকতর মনোযোগী। তাঁহাদের সৌন্দর্যের আস্তরণের ভিতর হইতে উদ্দেশ্যপরতন্ত্রতার তীক্ষ্ণ অস্থিবহুল অঙ্গসংস্থানটি উঁকি মারিতেছে। এই বস্তুপ্রীতি কবির মনে প্রধান হইলে কিছুদিন পরে পরে নূতন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে। যুগসমস্যার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের বিষয়ের আবেদন হ্রাস পায়, সুতরাং রসের চিরন্তনতার পরিবর্তে বিষয়ের কালোপযোগিতা ও অভিনবত্বই প্রধান হইয়া উঠে। সুতরাং রাধাকমলবাবু রসের অনিত্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য না হইলেও বিষয়ের অনিত্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য অনস্বীকার্য। রস যদি বিষয়নির্ভর হয় ও রসপরিণতি অপেক্ষা বিষয়কে অধিক

গুরুত্ব দিলে, রসের অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধেও আগের মত নিঃসংশয় হওয়া যায় না।

৩

কতকগুলি প্রবন্ধ সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশিষ্ট লক্ষণ ও রূপ-ভেদ সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের 'নাটক ও উপন্যাস', দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'বাংলা উপন্যাসের বিশেষত্ব' ও কোন অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ছোট গল্প' এই জাতীয় প্রবন্ধের উদাহরণ। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি অতি সুচিন্তিত ও সারবান—ইহাতে আখ্যানমূলক ও কতকটা সমধর্মী দুইটি শিল্পরূপের উপস্থাপনা-রীতির পার্থক্য অতি চমৎকারভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান পার্থক্যের বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিয়াছেনঃ— (১) উপন্যাসে ঘটনা-সংস্থানে কিছুটা শিথিলতা, এমন কি আকস্মিকতাও থাকিতে পারে, নাটকে ঘটনা-সংযোজনা দৃঢ় ও কার্য-কারণ-সংবদ্ধ হইবে; বিশেষত অশুভশেষ নাটকে (tragedy) অশুভের ইঙ্গিত প্রথম হইতেই বীজাকারে থাকিবে। (২) নাটক অভিনয়ের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ও উপন্যাস ব্যাখ্যামন্তব্য-সংযোজনে বিস্তৃত হইবে। (৩) নাটক অব্যভিচারিভাবে বাস্তবানুসারী হইতে বাধ্য; উপন্যাস কখনও কখনও অদ্ভুতরসাত্মক হইলেও বিশেষ হানি নাই।

ইহার পর লেখক নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-লক্ষণসমূহ নির্ধারণ করিয়াছেন। উহার উপাখ্যানের বিস্তৃতি দর্শকের চিত্তপূর্তির ঠিক উপযোগী হওয়া প্রয়োজন —বেশী বড় হইলে আধার ছাপাইয়া যাইবে, খুব ছোট হইলে মন ফাঁক থাকিবে। অতি বৃহৎ হইলে পদ্মা বা সমুদ্রের মত রমণীয়তার পরিমিতিকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবে; অতি ক্ষুদ্র হইলে স্বাদুরসনিঃসরণের উপাদান কম পড়িবে। প্রতিমা খুব বৃহৎ বা খুব ক্ষুদ্র হইলে আমাদের সৌন্দর্যবোধের বাধা ঘটে। অবশ্য এই উক্তি সাধারণ নাটক সম্বন্ধে সত্য হইলেও শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির প্রকৃতি-নির্দেশের পক্ষে অপ্রযোজ্য। গ্রীক বা শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি এরূপ মাপ-জোক করিয়া, সর্ববিধ আতিশয্য বর্জন করিয়া রচিত হয় নাই। আগামেমনন বা কিং লিয়ার ঠিক যেন সমুদ্রের অগাধ গভীরতা ও উত্তাল স্রোতোবেগের

ছন্দে রচিত—মানবপ্রকৃতি এখানে সমস্ত সীমা ছাড়াইয়া, সৌন্দর্য-পরিমিতির অঙ্গসৌষ্ঠবকে অস্বীকার করিয়া এক বিরাট ঝঞ্ঝাবাত্যা, কল্পনাতীত বিপর্যয়ের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিরাটের রহস্যময় সুষমা প্রতিফলিত। তথাপি সাধারণ নাটকের নির্মিতি-কৌশল বিষয়ে ইহা একটি মূল্যবান নির্দেশ।

এই উপলক্ষ্যে প্রহসন সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "হাস্যরসের মুখ্য আশ্রয়, উপাখ্যানের মধ্যে কৌতুকাবহ ঘটনার সংঘটন; হাস্যরসোদ্দীপক কথোপকথন হাস্যরসের গৌণ আশ্রয় মাত্র"। এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় কি না তাহা সন্দেহ। অবশ্য ইহা সত্য যে প্রহসনে হাস্যরস স্বাভাবিক ঘটনা হইতে উদ্ভূত হইলে উহার আবেদন অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। শুধু যে-কোন অছিলায় পাত্র-পাত্রীর মুখে হাসির কথা দিলে তাহা নিতান্তই তুবড়িবাজীর মত একটা ক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণের হেতু হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে হাসির উপলক্ষ্য-স্বরূপ সম্ভব-অসম্ভব সব রকম হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করাতেও আর এক প্রকারের কৃত্রিমতা জন্মে। যে হাস্য-পরিহাস মুখ্যত ঘটনা-প্রসূত তাহা অগভীর। যাহা চরিত্রমূল হইতে উদ্ভূত তাহা স্থায়ী ও অকৃত্রিম। শেক্সপিয়ারের 'Comedy of Errors'-এ পরিহাস-রসিকতা অবস্থাঘটিত ভুল-ভ্রান্তি হইতে সঞ্জাত; এইরূপ ভ্রান্তি বাস্তব জীবনে খুব সুলভ নহে। সুতরাং ইহার কৌতুকরস কোন গভীর পরিণতি লাভ করে না। কিন্তু শেক্সপিয়ারের 'Merchant of Venice' বা 'As You Like It'-এ হাস্যরস প্রবাহিত হইয়াছে পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও জীবন সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। এই রসিকতার উৎসমূলে আছে জীবনের তির্যক অনুভূতি, কোন হাস্যকর প্রসঙ্গ নহে। তবে অবশ্য প্রহসনে আমরা বিশেষভাবে কৌতুককর, অসঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতিই প্রত্যাশা করি—কোন গভীর রসের এখানে বিশেষ অবসর নাই। সুতরাং মনে হয় একদিকে যেমন স্বাভাবিক ঘটনা-পরিস্থিতি, অন্যদিকে তেমনি সহজ কৌতুক-প্রবণ চরিত্র—উভয়ের সম্মিলনেই উচ্চাঙ্গের হাস্যরসসৃষ্টি সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, নাটকের মূল তাৎপর্য সদা-সক্রিয়ভাবে উহার সমস্ত ঘটনা-বিন্যাসকে নিয়মিত করিবে। এই কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রণ নাটকের পক্ষে যতটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অন্যরূপ সাহিত্য-শিল্পে ততটা নহে। অবশ্য বৈচিত্র্য-

সঞ্চারের প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে অন্য রস প্রবর্তন বাঞ্ছনীয় হইলেও যাহাতে মূল রসের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ না হয় লেখকের সে দিকে অতন্দ্র দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অনুষঙ্গী রস যাহাতে মূলকে ছাড়াইয়া না যায় নাট্যকার সে দিকে অবহিত হইবেন। নাটকের সংক্ষিপ্ত আয়তনের জন্য উহার মধ্যে আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে রস ঘনীভূত করার কৌশলের বিশেষ প্রয়োজন। এই মন্তব্যগুলি নাটক সম্বন্ধে সাধারণ সত্যের নির্দেশ দেয়।

নাট্যোৎকর্ষের প্রধান অঙ্গ হইল চরিত্র-কল্পনা ও এই কল্পনার সঙ্গতি-রক্ষা। সাধারণত নাট্যকারেরা প্রচলিত আদর্শের ছাঁচে তাঁহাদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকাকে ঢালাই করিয়া উহাদের সূক্ষ্মতর প্রকৃতি-পার্থক্য প্রদর্শনে মনোযোগী হন না, সকলকেই প্রায় অভিন্নরূপে অঙ্কিত করেন। নায়িকার রূপবর্ণনাতেই যখন বৈচিত্র্যের অভাব দেখা যায়, তখন তাহাদের অন্তঃ-প্রকৃতিচিত্রণে যে এই অভাব প্রকটতর হইবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। নাটকে পাত্র-পাত্রীর চরিত্রই হইল সমস্ত নাট্যঘটনার সংঘাত ও পরিণতির মূল কারণ; সুতরাং এখানে চরিত্র-স্ফুরণে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে সমস্ত নাটকীয় সংঘটনই কার্যকারণশৃঙ্খলাচ্যুত হইয়া পড়ে ও অস্বাভাবিকতা-দুষ্ট হয়। রূপকথার নায়কের চরিত্রবৈশিষ্ট্য থাকে না; কিন্তু উহার ঘটনাপ্রবাহ আমরা কৌতূহলের সহিত অনুসরণ করি। কিন্তু নাটকে চরিত্রের সহিত অসংশ্লিষ্ট ঘটনা নাট্যগুণবর্জিত বলিয়াই মনে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাট্যকার একটা কৃত্রিম, অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত আদর্শের অনুসরণে তাঁহার চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত পরিকল্পনা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন, যে জীবনসত্য তাঁহার মনে স্ফুরিত হইয়াছে তাহার প্রতি বিশ্বস্ততা হারান। ইহার কারণ নাট্যকারের শক্তির অভাব ততটা নহে, যতটা জনপ্রিয়তার প্রতি মোহ। দীনবন্ধু মিত্র যদি নিমে দত্তের চরিত্র-চিত্রণে এই ভ্রান্ত নীতির অনুবর্তন করিতেন, যদি তাহাকে আদর্শচরিত্র ভদ্রসন্তানরূপে অঙ্কিত করিতেন তবে বাংলা নাটক উহার অতি জীবন্ত, বাস্তব-প্রতিরূপ চরিত্র হারাইত।

চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষা উজ্জ্বল ও অন্তর্ভেদী কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে। আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু কল্পনাশক্তি আছে, কিন্তু সাধারণ

লোকের কল্পনা একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ বানাইতে গিয়াই কাবু হইয়া পড়ে। লেখকদের মধ্যেও এই শক্তির তারতম্য আছে। কেহ একটা দৃশ্য আঁকিতে গিয়া চিত্রধর্মী কল্পনার পরিচয় দেন; কেহ বা একটা গল্প বানাইয়া ঘটনা-সংযোজনায় কল্পনা-কুশলতা দেখান; আবার কেহ বা ইহার উপর আর এক ধাপ উঠিয়া কাল্পনিক দৃশ্য ও ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে দুই-একটি জীবন্ত চরিত্র সন্নিবেশিত করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছাড়া আর কেহ এই চরিত্রসমূহের আদি-অন্ত সুসঙ্গত সংলাপ ও আচরণ ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নির্ভুল, প্রাণরসোচ্ছল বর্ণনা করিতে পারেন না। তিনি চরিত্রগুলির সহিত এমন একাত্মভাবে মিশিয়া যান, যে উহাদের সূক্ষ্মতম, নিগূঢ়তম অন্তররহস্যও তাঁহার অনুভূতির নিকট স্ফটিকস্বচ্ছভাবে প্রতিভাত হয়, মনে হয় যেন তিনি উহাদের নিভৃত আলাপ ও আত্ম-উদ্ঘাটন-প্রক্রিয়া যবনিকার অন্তরাল হইতে শুনিয়া তাহারই হুবহু পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। দৈবশক্তির অধিকারী-রূপে তিনি প্রত্যেকের মনের অন্ধি-সন্ধি ও মনোভাব-প্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গীটি অবগত হইয়াছেন। যে চরিত্রটি যে ভাবে তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে, তাহাকেই তিনি যথাযথ রূপ দেন, তাহাদিগকে অলঙ্কৃত ও আদর্শায়িত করিবার প্রলোভনের নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করেন না। এই প্রবন্ধটিতে উৎকৃষ্ট নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ ও নাট্যকল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা মৌলিক না হইলেও নাট্য-কলা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে ও পাশ্চাত্য নাট্যকলা-অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট নাটকের প্রকৃতি ও নাট্যবিচারের মূল সূত্রগুলি পরিষ্কার-ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছে। বাংলা নাটকের প্রতি এই বিচার-মানদণ্ডের সার্থক প্রয়োগ বাঙ্গালী মনীষা পাশ্চাত্য সমালোচনা-রীতিকে যে কিরূপ নিপুণতা ও যথার্থ অনুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছে তাহারও প্রশংসনীয় নিদর্শন।

দেবেন্দ্রবিজয় বসুর 'বাংলা উপন্যাসের বিশেষত্ব' বাংলা উপন্যাস-সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। ইহাতে হয়ত হিন্দু-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের প্রতি অতি-পক্ষপাতের নিদর্শন মিলে, কিন্তু তথাপি ইহা বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে একটি অধুনা-উপেক্ষিত মূল তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছে। উপন্যাস যদি কোন একটি বিশেষ দেশের মানুষের জীবন-কাহিনী হয়, তবে বাঙ্গলার মানুষের জীবন-কথা কি পাশ্চাত্য দেশের সহিত একেবারে অভিন্ন হইবে ও উহার স্বাভাবিকতা ও গভীরতা কি একই মানদণ্ডে বিচার করা যাইবে? মনুষ্যপ্রকৃতি মূলত এক ইহা স্বীকার করিলেও দেশ, শিক্ষাদীক্ষা ও ঐতিহ্য-আচরণভেদে এই প্রকৃতির কি রূপ-বৈচিত্র্য গড়িয়া উঠে না? Conrad যে পূর্ব উপদ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবন-চিত্র আঁকিয়াছেন, দুর্গম রহস্যময় অরণ্য-প্রতিবেশ, প্রাচীন সংস্কার ও আদিমপ্রবৃত্তিপ্রধান, হঠাৎ-জ্বলিয়া-ওঠা ও হঠাৎ-স্তিমিত-হওয়া, দুর্বার ও অচিরস্থায়ী হৃদয়াবেগ যাহাদের জীবনযাত্রার ছন্দনিরূপণ করিয়াছে তাহাদের আচরণের সঙ্গতি-অসঙ্গতি, মনোরহস্যের গহনতা, নীতি ও ঔচিত্যবোধ কি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য জীবনছন্দানুসারী হইবে? এক সাধারণীকৃত মনস্তত্ত্ব-ক্ষেপণী কি সমস্ত হৃদয়-সমুদ্রের গভীরতার পরিমাপ করিবে? সকল দেশের মাটিতে কি একই রকম গাছ-পালা, ফল-ফুল উৎপন্ন হইবে? অতি-আধুনিক আন্তর্জাতিকতার যুগে আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য-পরিপোষক নীতি-প্রভাবগুলিকে অস্বীকার করিয়া এক সার্বভৌম মানবিকতার আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি, কিন্তু আমাদের মিলটা যে বাহিরের ও অমিলটা যে অন্তরের গভীর স্তরের এই সত্যটা ভুলিবার ভান করিতেছি। আর এখন যে আমরা আন্তর্জাতিকতার দিকে ঝুঁকিয়াছি ইহা স্বীকার করিলেও বঙ্কিমযুগের সাহিত্য-বিচারে মানবপ্রকৃতির সার্বভৌমতা-মূলক মানদণ্ডের প্রয়োগ কি কালানৌচিত্যবোধের (anachronism) চিহ্ন নহে? সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বা ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভের বাঙ্গালীর যে জীবন-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে অতি-আধুনিক যুগের সমাজনীতি, ন্যায়-অন্যায়-বোধ ও ধর্মসংস্কারহীন প্রবৃত্তি-পূরণপ্রবণতার আরোপ করিলে যে সত্য উপন্যাসের প্রাণ তাহারই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র-সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ সমালোচনার ধারা প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই যে দেবেন্দ্রবিজয় বাবু উহার সম্ভাবনাকেই প্রতিষেধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা তাঁহার দূরদর্শিতারই নিদর্শন। ইউরোপীয় ও বাংলা উপন্যাসের মৌলিক

পার্থক্য হিন্দুর সর্বাতিশায়ী ধর্মভাব—ইহারই জন্য হিন্দু লেখক উপন্যাসকে কেবল মনুষ্যচরিত্রবিশ্লেষণ বা চিত্তবিনোদনের উপায়রূপে ব্যবহার না করিয়া লোকশিক্ষা ও ধর্মভাব-উদ্দীপনের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করিয়াছেন। হিন্দু-সমাজে ধর্মভাবের প্রবলতার জন্য সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আদর্শচরিত্র, ধর্মপ্রাণ নর-নারীর উদ্ভব হইয়াছে ও সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনেই ইহারা উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইয়াছে। ইউরোপীয় উপন্যাসে চরিত্রসমূহ কোন পূর্বার্জিত, ঐতিহ্যবাহিত দৃঢ় সংস্কার-আচরণ দ্বারা সুরক্ষিত নহে, সুতরাং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণভাবে তাহাদের উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাদিগকে গভীরভাবে পরিবর্তিত করে। কিন্তু হিন্দু সমাজে অবিচল-সংস্কার-বর্ম-পরিহিত নারী-পুরুষ ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া না গিয়া উহার প্রতিরোধ করে ও শেষ পর্যন্ত প্রলোভনের উপর জয়ী হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করে। হিন্দুচরিত্রের এই মূল তত্ত্বটুকু না বুঝিলে বঙ্কিমের উপন্যাসে চরিত্র-বিবর্তনকে ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। শৈবলিনীর পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, কপালকুণ্ডলার সংসারে অনাসক্তি, স্বামি-সান্নিধ্যে শ্রীর অটল, অটুট ব্রহ্মচর্য, গোবিন্দলালের পাপদগ্ধ জীবনের পরিণামে ধর্মসাধনার বলে শান্তিলাভ, সীতারামের চরম মুহূর্তে আত্মিক বলের পুনরুদ্ধার—এ সমস্তই কেবল সাধারণ মনস্তত্ত্বের বিচারে স্বভাবানুগত বলিয়া মনে হইবে না, হিন্দুর বিশেষ জীবন-সাধনা, ধর্মপ্রভাবিত, সংযম-শাসিত জীবনযাত্রার পরিণতি-রূপেই ইহাদের সত্যতা অনুভব করা যায়।

/ দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য উভয়বিধ উপন্যাসের উপস্থাপনা-রীতিরও অনুরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দু ঔপন্যাসিক চরিত্র-বিশ্লেষণে বা ঘটনা-বিন্যাসে তথ্যের আতিশয্য বর্জন করেন—খুঁটিনাটি, অতিবিস্তারিত বিবৃতি-বর্ণনার পথ অবলম্বন করেন না। কেননা তাঁহার মতে, নর-নারীর মূল প্রকৃতি কেবল প্রবৃত্তি-প্রেরণা বা বহির্ঘটনার প্রভাব-সঞ্জাত নহে; ইহার মর্মমূলে আরও নিগূঢ়তর দৈবশক্তির লীলা বর্তমান। শুধু প্রবৃত্তি-বিশ্লেষণ ও কর্মবিচার দ্বারা এই রহস্যের আদি কারণে পৌছান যাইবে না। শৈবলিনীর নরকানুভূতির পিছনে শুধু তাহার চরিত্রের অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা বা বহির্জীবনের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপই নাই, আছে একটা গভীরতর,

রক্তকণাবাহিত, জন্মপরম্পরাপুষ্ট অধ্যাত্ম সংস্কার। আধুনিক পাশ্চাত্য লেখক ফ্রয়েডের অবচেতনতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া মানুষের আপাত-অসংলগ্ন, অহেতুক আচরণের মূলে অবদমিত যৌন আবেগের গোপন ক্রিয়া কল্পনা করেন। কিন্তু আধুনিক-চিন্তা-প্রভাবিত সমালোচক হিন্দু মনের অবচেতন-গভীরে ক্রিয়াশীল, যুগযুগান্তরব্যাপ্ত অধ্যাত্ম সংস্কারের প্রতি কোন মর্যাদাই আরোপ করেন না। যদি যুক্তিতর্কের অতীত, কার্যকারণশৃঙ্খলা-বহির্ভূত কোন সর্বব্যাপী, রহস্যময় প্রভাবের অস্তিত্বই মানিতে হয়, তবে তাহা কেবল যৌন অনুভূতিই হইবে, ধর্ম-অনুভূতি হইবে না—এরূপ চিন্তায় কোন সঙ্গতিবোধ নাই। যৌন প্রেরণা ছাড়াইয়া আরও এক পদ অগ্রসর হইলে যে স্রষ্টা মানবজীবনের মূলে ইহা স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাকে জানার কৌতূহল, তাঁহার সহিত পরিচয়-ব্যাকুলতা আরও পুরোবর্তী স্থান অধিকার করে। আদিম মানুষের মনে যৌনবোধ ও ধর্মবোধ পাশাপাশি বাস করে; কোন জাতি হয়ত প্রথমটির অনুশীলন করিয়াছে এবং অন্য কোন জাতি হয়ত দ্বিতীয়টির সাধনায় ব্রতী হইয়াছে। এক্ষেত্রে একটিকে বিজ্ঞানসম্মত সত্য আর একটিকে অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে করা অ-বৈজ্ঞানিক মনেরই পরিচয়।

দেবেন্দ্রবিজয় বাবু অবশ্য ইউরোপীয় ও বাংলা উপন্যাসের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া অনেকটা প্রমথ চৌধুরীর 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধের ন্যায় কিছুটা অতিরিক্ত রং ফলাইয়াছেন, বিরোধকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন, আংশিক সত্যকে চরম উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। "বিলাতী উপন্যাস বিশ্লেষণপূর্ণ, দেশী উপন্যাস সংগঠনমূলক। বিলাতী নভেল অধিকাংশ realistic, দেশী উপন্যাস idealistic। দেশী উপন্যাস সৃষ্টি করে, বিলাতী উপন্যাস ধ্বংস করে। দেশী উপন্যাস আদর্শ গড়ে, বিলাতী উপন্যাস আদর্শ ভাংগে। দেশী উপন্যাস সমাজ সংস্কার করে, বিদেশী উপন্যাস সমাজ-বিপ্লব ঘটায়। দেশী উপন্যাস আমাদের দূরবীক্ষণ দেয়, বিলাতী উপন্যাস অনুবীক্ষণ করায়।......দেশী উপন্যাসে মনুষ্যত্বের ও পুরুষকারের স্ফূর্তি পায়—বিলাতী উপন্যাসে তাহা লোপ পায়। দেশী উপন্যাসে অদৃষ্ট ও দৈবের কথা মৌখিক, আত্মনির্ভরতার কথা, মনুষ্যত্বের কথা আন্তরিক; বিলাতী উপন্যাসে আত্ম-নির্ভরতা মৌখিক, অবস্থার আধিপত্য আন্তরিক।"......এই বিপরীত উক্তির

প্রবল স্রোতে সত্যের সূক্ষ্ম পরিমিতি-বোধ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার শেষ মন্তব্যটি আপাতদৃষ্টিতে অযথার্থ বলিয়া বোধ হওয়ার জন্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইউরোপীয় সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গান, আর বাংলা সাহিত্যে দৈব ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্কোচন —ইহাই আমাদের সাধারণ মত। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে এই মত সর্বথা প্রযোজ্য নহে লেখক তাহাই বলিয়াছেন। একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ইহার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। ইউরোপীয় উপন্যাসে প্রবৃত্তির অমোঘ শক্তি, প্রতিবেশের সর্বগ্রাসী প্রভাব লক্ষ্য করিলে মানবের স্বাধীনতার যে বিশেষ কোন মূল্য আছে এরূপ ধারণা জন্মে না। এই বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রামে তাহার পতন অনিবার্য বলিয়াই মনে হয়। জোলা, ব্যালজাক, গলস্‌ওয়ার্দি প্রভৃতির রচনায় মানুষকে যেন প্রবৃত্তি ও আবেষ্টনের হাতে অসহায় ক্রীড়াপুত্তলিরূপে দেখান হইয়াছে—determinism বা অদৃষ্টবশ্যতা যেন মানবের বিধিলিপি। পক্ষান্তরে বঙ্কিমের উপন্যাসে ভগবৎ-কৃপা সর্বদাই মানবের আত্মিক শক্তিকে আরও বলবান করিয়া তাহার প্রতিরোধ-ক্ষমতার বৃদ্ধি করিতেছে, ত্যাগ-তিতিক্ষা-আত্মসংযমের আদর্শের অদৃশ্য প্রভাব আকাশ-বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া দুর্বল, প্রলোভন-ক্লিষ্ট, সংগ্রাম-জর্জর মানবের মনে অপরাজেয় আশার সঞ্চার করিতেছে। মানবাত্মার শক্তি যেন দেহ-সীমাকে অতিক্রম করিয়া সর্ব শক্তির উৎসের সঙ্গে নিজ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক-বিষয়ে সচেতন আছে। সুতরাং পাপীর পতন হয়, কিন্তু সে একেবারে পাপ-পঙ্কে তলাইয়া যায় না; উদ্ধারের এত উপায় তাহার চারিদিকে প্রসারিত যে যে-কোন একটিকে অবলম্বন করিয়া সে আত্মবিশুদ্ধিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কাজেই হিন্দু দৈবনির্ভর হইয়াও আত্মশক্তিতে আস্থাশীল; পাশ্চাত্য দেশের মানব সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইয়াও প্রতিবেশ-সংগ্রামে পরাভূত ও পুনরুদ্ধারের আশাহীন। অবশ্য এই সাধারণ সত্যের যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে।

শিল্পচাতুর্য অপেক্ষা মানবকল্যাণসাধন শ্রেষ্ঠতর গুণ এই অভিমত অনুযায়ী লেখক মানবের চিত্তবৃত্তির উন্নতি-বিরোধী, শুধু শিল্পগুণসম্পন্ন উপন্যাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন। অবশ্য এখানে কল্যাণকে

উদার ও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে—শুধু সমাজপ্রচলিত সঙ্কীর্ণ নীতি-সমর্থনই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হইতে পারে না।

প্রকৃতি-চিত্র-বিষয়ে হিন্দু ও পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিকের পার্থক্যও তাহাদের বিশিষ্ট জীবনদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট। পাশ্চাত্য লেখক সাধারণত প্রকৃতিকে কোন স্থির অধ্যাত্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখেন না। উহার রমণীয়তা তাহার মনে দাম্পত্য-প্রণয়-মুগ্ধতার ভাব জাগায়, নিবিড় আশ্লেষ-স্পৃহায় সে সমস্ত সংযম-বন্ধনকে অস্বীকার করিয়া তাহার নিবিড়তম রহস্য ভেদ করিতে উৎসুক। পক্ষান্তরে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সে বিহ্বল ও অভিভূত হইয়া পড়ে—এই ভীষণতার যবনিকার অন্তরালে যে মমতাময়ী মূর্তি প্রচ্ছন্ন তাহাকে অনুভব করার শক্তি তাহার নাই। হিন্দু লেখক প্রকৃতিকে মাতৃভাবে কল্পনা করিয়া তাহার অধ্যাত্ম সাধনানুভূতির বলে তাহার প্রসন্ন ও উগ্র উভয় মূর্তিতেই সমভাবে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। সে প্রকৃতিবিমুখ বলিয়াই উহার সর্ববিধ ভাব-বৈলক্ষণ্যে অবিচল; পাশ্চাত্য লেখক প্রকৃতির প্রতি অত্যাসক্তির জন্যই উহার অন্তর-রহস্যে প্রবেশ করিতে অক্ষম। পাশ্চাত্য লেখক প্রকৃতিকে জয় করিতে চাহে বলিয়াই প্রকৃতি তাহার নিকট প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত; হিন্দু লেখক প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় আত্মসমর্পণ করে বলিয়াই প্রকৃতির দুর্বোধ্যতা তাহাকে কখনই পীড়িত করে না।

আধুনিক সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা প্রধান ত্রুটি, বর্তমান সমালোচকের নিকট তাহাই তাঁহার প্রধান গুণ। তাঁহার উপন্যাস কেবল পাশ্চাত্য শিল্প ও জীবনবোধের নির্বিচার অনুবর্তন না হইয়া হিন্দুর বিশিষ্ট জীবনদর্শনের আলেখ্য। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-রচনায় ব্রতী না হইলে হিন্দুর জীবনচর্যার চরম তাৎপর্য, তাহার জীবনযাত্রার নিজস্ব ছন্দোরূপটি অনুদ্‌ঘাটিতই থাকিয়া যাইত।

ছোট গল্পের শিল্পরূপ ও জীবনপ্রেরণাটিও এক অজ্ঞাত লেখক কর্তৃক অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে যে-সমস্ত মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা এখন সর্বজনবিদিত জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে; কিন্তু সে যুগে ইহার মধ্যে যে খানিকটা অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারপ্রাজ্ঞতা ছিল তাহা

অস্বীকার করা যায় না। অন্তত ছোট গল্প যে উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নহে, ইহাতে যে অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিমিতিবোধ ও শিল্পনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ইহাতে ব্যবহৃত নানা প্রয়োগ-পদ্ধতি যে একই উদ্দেশ্যসাধনের বিভিন্ন উপায়মাত্র এই সত্য সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

৪

এইবার বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনার দোষ-গুণ-বিচারে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য কিরূপ অগ্রগতির নিদর্শন দেখাইয়াছে তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে অনেক স্থলেই মূল রচনা ও উহার সম্বন্ধীয় সমালোচনার মধ্যে কালগত ব্যবধান অতি সামান্য, রচনার অভিনবত্ব সমালোচকের নিকট প্রায়ই অপরিচিত, পরিভাষা-সংকলনে ও মানদণ্ড-প্রয়োগে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাব। তথাপি এই দ্বিধাগ্রস্ত সমালোচনার অনিশ্চিত পদক্ষেপ মোটের উপর সত্যনির্ধারণের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে, সমালোচ্য গ্রন্থের একটা যথার্থ ধারণাই পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ রচনার সহিত ব্যাপক পরিচয়, বিশেষত প্রাচ্য কাব্যবিচারসূত্রের সার্থক স্বীকরণ সমালোচকের মনকে রসাস্বাদনের উপযোগী ও অনুকূল করিতে সহায়তা করিয়াছে। গ্রন্থের বা কবির কল্পনা-বৈশিষ্ট্যের গভীরে অনুপ্রবেশ না করিলেও মোটের উপর এই আলোচনা বাঙ্গালী পাঠকের রসবোধ ও বিচারশক্তিকে যে উদ্রিক্ত করিয়াছে তাহা সর্বথা স্বীকার্য।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' ও মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এ সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সমালোচক বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই বিচিত্র রচনাসম্ভারের সমগ্র তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই তাঁহাকে ইহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কোন্ নববসন্তের প্রেরণায়, কোন্ দক্ষিণী হাওয়ার আমন্ত্রণে, সমাজ-প্রভাব ও চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কোন্ অনুকূল স্ফুরণে এই অপর্যাপ্ত পত্রপুষ্পস্তবক বাংলা সাহিত্যের শীর্ণ রিক্ত শাখায় বিকশিত হইয়াছে,

ইহারা যে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি অপেক্ষা ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত, ইহারা যে মধুঋতুর প্রথম উপহার ও আগন্তুক কুসুমোৎসবের আবাহনী সংগীত মাত্র, ইহারা যে বাংলা সাহিত্যের কবিকল্পনার এক আমূল রূপান্তরের প্রারম্ভিক সূচনা—এই-সমস্ত গভীর তত্ত্ব এই সমকালীন সমালোচকদের মনে উদিত হয় নাই, উদিত হওয়া সম্ভবও ছিল না। সদ্যফোটা ফুলের সৌরভমত্ত মধুমক্ষিকা পুষ্পপরাগের সূত্র অনুসরণে মধুক্ষরণের কেন্দ্রীয় উৎসে উপনীত হইবার প্রয়োজন অনুভব করে না—অতিসন্নিহিত রস আস্বাদন ও সঞ্চয়েই সে তৃপ্ত। কাজেই এই-সমস্ত সমালোচনায় আমরা বাংলা কাব্যের নবযুগের কোন নির্দেশ পাই না; কোন চূড়ান্ত মূল্যায়নেরও উদ্যোগ দেখা যায় না। অপ্রত্যাশিত আনন্দে বিহ্বল ও কতকটা দিশাহারা সমালোচক পরিণত প্রজ্ঞা অপেক্ষা বিস্ময়োচ্ছ্বাসেরই অধিক পরিচয় দিয়াছেন। তুলনার কথা মনে করিয়া তাঁহারা বাংলা ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়াছেন। এই নবসৃষ্ট সাহিত্যে পুরাতন-নিষ্ঠার ত্বকের অন্তরালে যে বিদেশীয় ভাবাঙ্কুর বিকশিত হইতেছে ও পাশ্চাত্য রসধারা যে নিজ অনভ্যস্ত যাত্রাপথের সংকেত খুঁজিতেছে এই অন্তরালবর্তী সত্য-সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত ছিলেন না। কাব্যজগতের এক-একটি আবির্ভাবকেই তাঁহারা অভিনন্দন জানাইয়াছেন, সন্ততি-পরম্পরা-সূত্রে এক নূতন বংশপ্রতিষ্ঠার কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। প্রভাতের শুকতারার পিছনে যে উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী আলোক-শোভাযাত্রায় নিজ নিজ স্থান গ্রহণ করিবার জন্য নিঃশব্দে প্রস্তুত হইতেছে, সৌরজগতের ন্যায় কাব্যজগতেরও এই রহস্য প্রথমদ্রষ্টা সমালোচকের নিকট অজ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এ উহার সমালোচনা একই বৎসরের (১৮৫৮ খৃঃ অঃ) ঘটনা। কবির রন্ধনশালায় প্রস্তুত খাদ্য সদ্য সদ্যই সমালোচকের পাত্রে পরিবেশিত হইয়াছে ও সমালোচকও ভোজন-ব্যাপারে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করেন নাই। কাজেই সমালোচনার মধ্য দিয়া ভোজন-রসিকের প্রথম স্বাদুতা-বোধই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সমালোচক 'পদ্মিনী' কাব্যের ভাবগৌরব ও প্রাঞ্জল ও মনোহর প্রকাশভঙ্গীর প্রশংসা করিয়াই

তাঁহার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে আখ্যানের সৌন্দর্য সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কবির কৃতিত্ব খর্ব হয় না। রঙ্গলাল শব্দালংকার অপেক্ষা অর্থালংকারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রকৃত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপমা স্থলে স্থলে অভিনব, স্থলে স্থলে সংস্কৃত কাব্যরীতির সুনিপুণ অনুসরণ। তাঁহার নায়িকা পদ্মিনী কেবল নায়িকার সাধারণ ধর্মের প্রতিকৃতি নহে, পরন্তু ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। ছন্দসন্নিবেশে কবি অক্ষরবৃত্তের অনুসরণ করিয়াছেন, সংস্কৃত রীত্যনুযায়ী মাত্রাবৃত্ত-প্রণালীর প্রয়োগ করেন নাই ; ইহাতে সমালোচক কথঞ্চিৎ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা এইজন্য লঘুগুরুভেদ-জ্ঞানের অভাবের জন্য যে প্রবাদমূলক নিন্দাবাক্য প্রচলিত আছে, কবি তাহারই বিষয়ীভূত হইয়াছেন। সে যুগে প্রত্যেক নূতন কবিকে যে ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনার সম্মুখীন হইতে হইত, এই কবিপ্রতিভার চরম মানদণ্ডের দ্বারা যে তাঁহার মূল্যবিচার হইত রঙ্গলালের ক্ষেত্রেও তাহা উদাহৃত হইয়াছে। "তিনি ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিত-ভাষা-সম্পন্ন নহেন, কবিকঙ্কণের ওজোগুণও ইনি প্রাপ্ত হয়েন নাই···পদ্মিনী উপাখ্যান অন্নদামঙ্গল হইতে লঘু।" স্থানে স্থানে কঠিন ও বিকট শব্দ ব্যবহার করিয়া ইনি রসেরও হানি করিয়াছেন।

কাব্যটির দোষ সম্বন্ধে দুইটি মন্তব্য করা হইয়াছে। প্রথমত কবির প্রস্তাবনার অনৌচিত্য, স্নানার্থী ব্রাহ্মণের মুখে এই দীর্ঘ আখ্যানের আরোপ। দ্বিতীয়ত, পদ্মিনী কর্তৃক আলাউদ্দিনের প্রতি লিখিত প্রেমাভিনয়মূলক পত্রে কুরুচি-প্রকাশ। আধুনিক সমালোচক এই জাতীয় ত্রুটিতে হয়ত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিবেন না। যে ইতিহাস-রসের উদ্দীপনা, ক্ষাত্র শৌর্যের ওজস্বী প্রকাশ, গাঢ়বদ্ধ ভাবঘনতা ও সময় সময় ছন্দোবৈচিত্র্যের ভাবানুযায়ী সার্থক প্রয়োগ, বিশেষত বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতা আধুনিক সমালোচকের নিকট কাব্যের প্রধান গুণ, সে সম্বন্ধে এই সমালোচনায় বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়' এই কাব্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে কবির ছন্দকুশলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিন্তু এই প্রসঙ্গেই তাঁহার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ অনুসরণ না করার জন্য ক্ষোভও ধ্বনিত হইয়াছে। উদ্ধৃতাংশের কাব্যগুণ সম্বন্ধে সমালোচক সম্পূর্ণ নীরব।

ইহার পর 'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এ ১৮৫৮ হইতে ১৮৬১ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত অনেকগুলি সংখ্যায় মধুসূদনের কাব্য ও নাটক আলোচিত হইয়াছে। মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা'কে দিয়া এই সমালোচনার আরম্ভ। প্রারম্ভে মধুসূদনের বহুভাষাবিৎ পাণ্ডিত্যের পরিচয় ও তাঁহার কৈশোর জীবনের ইংরেজী রচনার ঈষৎ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার পর বাংলা কাব্যের তৎকালীন হীনতা সম্বন্ধেও কিছুটা সাধারণ মন্তব্য সংযোজিত হইয়াছে। ইহার পর লেখক নাটকের অঙ্কানুযায়ী বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নান্দী ও সূত্রধারকে বর্জন করার জন্য লেখক নাট্যকারের প্রশংসা করিয়াছেন ও বকাসুরের গাম্ভীর্য ও তাহার প্রাচীন যোদ্ধার উপযুক্ত রূপসজ্জা-কৌশলের সপ্রশংস উল্লেখ হইয়াছে। এখানে কিন্তু সমালোচক নাট্যগুণ অপেক্ষা অভিনয়দক্ষতার দ্বারাই অধিক প্রভাবিত হইয়াছেন মনে হয়। কিন্তু বকাসুর যে নাটকে অনাবশ্যকীয় চরিত্র তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার পর দাসী ও বকাসুরের সহিত কথোপকথনে শর্মিষ্ঠাচরিত্রের যে স্থৈর্য, মনস্বিতা ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতি সমালোচক উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন ও ইহাকেই নাটকের শ্রেষ্ঠ অংশ রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। রাজা ও মাধব্যের পরিহাসরসসিক্ত সংলাপ নাটকের আকর্ষণের হেতু হইয়াছে, কিন্তু এই দৃশ্যগুলির নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাহা লেখক আলোচনা করেন নাই। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর সহিত যযাতির প্রণয়-প্রকাশ সম্বন্ধে লেখক নাট্যকারের রুচিসংযম ও অভিপ্রায়সিদ্ধিকুশলতা-বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন। বালক পুরুর দৃপ্ত, নির্ভীক উক্তি তাহার চরিত্রের সার্থক দ্যোতনারূপে অভিনন্দিত হইয়াছে। দেবযানী ও শুক্রাচার্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়া উভয়েরই চরিত্র, একের সন্তানবাৎসল্য ও অপরের অসংযত অভিমান-প্রবণতা—স্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সর্বশেষে মধুসূদনের নাট্যগ্রন্থন-কৌশল ও সমস্ত আনুষঙ্গিক রসের মূল রসের অনুযায়ী করার ক্ষমতার প্রশংসা করিয়া সমালোচক প্রবন্ধটির উপসংহার করিয়াছেন। প্রবন্ধের শেষে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের রচনা দ্বারা মধুসূদন যে বাংলা নাট্যসাহিত্যে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাহা বলা হইয়াছে। "মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতির অবিকল অনুভব করিয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার উদ্ভাষণ যে কবির

প্রকৃত ধর্ম তাহা দত্তজর উপলব্ধি হইয়াছে।" এই নাট্যসমালোচনা নাটক-পরিকল্পনার সমগ্রতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিচ্ছিন্ন দৃশ্যাবলীর উৎকর্ষ বিশ্লেষণ করিয়াছে ; তবে সাধারণ দর্শকের বিচারবুদ্ধি যাহাতে অভিনয়-দর্শনের মোহে আত্মবিস্মৃত না হয় সেজন্য নানা মূল্যবান নির্দেশ ইহার মধ্যে আছে। 'শর্মিষ্ঠা'র পর 'একেই কি বলে সভ্যতা' লিখিয়া মধুসূদন শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এইরূপ মন্তব্য অত্যুচ্ছ্বাসবিড়ম্বিত মনে হইতে পারে। মনে হয় 'শর্মিষ্ঠা'র সমালোচকের যে প্রশংসার পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হইয়াছিল, প্রহসনটির একটিমাত্র বিন্দু-সংযোগে তাহা উপচাইয়া পড়িয়াছে।

'পদ্মাবতী' সম্বন্ধে সমালোচকের প্রশংসা অনেকটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি উহার মামুলি রসিকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ও যদিও আখ্যানের রম্য বিন্যাসকৌশলকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, তথাপি সমগ্র নাটকটিতে 'শর্মিষ্ঠা'রই প্রতিচ্ছায়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আবার যে গুণকীর্তন করিয়াছেন তাহাতে তিনি ইহার উৎকর্ষের কলাশিল্পসম্মত দার্শনিক ভিত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। "কল্পনাশক্তির প্রধান লক্ষণ এই যে বিশ্বব্যাপার দর্শনানন্তর বিভিন্ন আধারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘটনা একাধারে সমাহার-করণ, দত্তজ তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য় তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন"। একটি অতি ক্ষুদ্র প্রহসনের মধ্যে এই বিশ্বরূপদর্শন ও ইহা হইতে লব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীকরণের অনুভব স্তুতির আতিশয্য বলিয়াই মনে হয়।

'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে'র আলোচনায় সমালোচক প্রধানত অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতি-বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিয়াছেন। অন্ত্যানুপ্রাস যে কাব্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, সংস্কৃত কাব্যে ইহার যে বিশেষ নিদর্শন নাই ও বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র তাঁহার আশ্চর্য ছন্দকুশলতা সত্ত্বেও যে মাঝে মধ্যে ভাবোপযোগী কবিতা-রচনায় ব্যর্থ হইয়াছেন সমালোচক দৃষ্টান্ত ও যুক্তি-সহযোগে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অন্ত্যানুপ্রাসের অনুরোধে কবি-কল্পনার কিরূপ স্বাধীনতা-সংকোচ ঘটে ও দীর্ঘ কাব্যে কিরূপ বিরক্তিকর একঘেয়েমির সঞ্চার হয় তাহাও তিনি উদাহৃত করিয়াছেন। প্রতি চতুর্দশ অক্ষরের শেষে অর্থ-সমাপ্তির অনুরোধে "মনোগত ভাবের সংকোচ হইয়া উঠে,

কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বলভাব খর্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়।… (কবি) কদাপি পাদপূরণের জন্য বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না"। অন্ত্যানুপ্রাস-প্রয়োগে বোধগম্যতা বাড়ে ইহা স্বীকার করিয়াও সমালোচক বলিয়াছেন যে মনস্বী পাঠকের জন্য বোধসৌকর্যের এইরূপ কৃত্রিম সহায়তা অপ্রয়োজনীয়—"বালকের দুগ্ধফেন ভীমের উপযুক্ত খাদ্য নহে।" অন্ত্যমিলের দোষ-গুণ-সম্বন্ধে এরূপ সুচিন্তিত ও সু-বিন্যস্ত আলোচনা আধুনিক যুগেও আদরণীয় হইত।

যতি-সম্বন্ধে মন্তব্যে লেখকের সূক্ষ্ম বিচার ও ধ্বনিতত্ত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্‌ক্তির মধ্যস্থলে যতি-স্থাপন সংস্কৃত কাব্যেও দেখা যায়। এই অর্থসমাপ্তিজ্ঞাপক যতি ধ্বনিপ্রবাহনিয়মিত, সুখশ্রাব্যতামূলক বিরামের বিরুদ্ধতাচরণ করে না। চতুর্দশ-অক্ষর-সমন্বিত অমিত্রাক্ষর পঙ্‌ক্তিতে অষ্টমাক্ষরে যতির আরোপ হইলেই ছন্দের নিয়মটি প্রতিপালিত হয়। অর্থের অনুরোধে অষ্টমাক্ষরের পূর্বেও যতি স্থাপিত হইলে, যতক্ষণ অষ্টমাক্ষরের পরে পুনরায় স্বরবিরতির ব্যবস্থা থাকে ততক্ষণ কোন ছন্দোবৈলক্ষণ্য ঘটে না। এখানে অমিত্রাক্ষরের যতি-তত্ত্বের সার সত্যটি চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগের ছান্দসিকগণের নিকট হয়ত পর্ব ও মাত্রাবিভাগের আরও সূক্ষ্মতর তাৎপর্য, বৈচিত্র্যবিধানের নিগূঢ়তর কলাকৌশল প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু হেমচন্দ্রের 'মেঘনাদবধ'-এর উপর লেখা ভূমিকার বহু পূর্বে অমিত্রাক্ষর ছন্দের এই স্বরূপ-নির্ণয় যে প্রশংসনীয় ছন্দবোধের পরিচয় বহন করে তাহা নিঃসন্দেহ। এক সম্পূর্ণ অভিনব ছন্দরীতির প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই উহার তত্ত্বরহস্যের আবিষ্কার বাঙ্গালী সমালোচকের অভূতপূর্ব কৃতিত্বের নিদর্শন।

কাব্যটির রচনাকৌশল ও কবিত্ব-সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য লেখক পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি মনে করেন যে মধুসূদনের কবিতা-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্বতন প্রশংসা 'তিলোত্তমা'-র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'তিলোত্তমা'র পূর্বে মধুসূদন নাটক লিখিয়াছিলেন, কবিতা বিশেষ লেখেন নাই। সুতরাং সমালোচকের অভিপ্রায় এই যে

নাট্যবিষয়ক প্রশংসা কাব্যেও সমভাবে সুপ্রযুক্ত। এই মন্তব্য আধুনিক যুগে খুব গ্রহণীয় না হইতে পারে, এবং ইহাতে 'তিলোত্তমা'র বৈপ্লবিক মৌলিকতার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। তথাপি ইহার রসবিচার-মূলক যে দুই একটি উক্তি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে লেখকের অনুভবশক্তি বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। মধুসূদন অন্যান্য কবি হইতে যে-সমস্ত ভাব আহরণ করিয়াছেন, তাহাই "তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা-বৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না; প্রত্যুত সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়"। অল্প কথায় 'তিলোত্তমা'র স্বভাব-সৌন্দর্য ও কল্পনা-বৈশিষ্ট্যের যথার্থতর মূল্যায়ন বোধ হয় অসম্ভব। পৌলোমীর খেদোক্তিতে কাব্যের মধ্যে যে বিরল লালিত্যগুণ আছে তাহার সার্থক প্রকাশ হইয়াছে। ভূগোলতত্ত্বসম্বন্ধীয় অপৌরাণিক কল্পনা, দেব-দেবী-পরিচয়ে ঈষৎ অনৌচিত্যবোধ, ও স্বর্বেশ্যা তিলোত্তমার প্রতি 'সতী'-শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি সামান্য দোষত্রুটি কাব্যের গুণাধিক্যের জন্য ধর্তব্যের মধ্যেই নহে এই মন্তব্য করিয়া লেখক তাঁহার রচনার উপসংহার করিয়াছেন।

'মেঘনাদবধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য-সম্বন্ধে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। 'মেঘনাদবধ'-এ মধুসূদন ইন্দ্রজিৎকে শৌর্যগুণবিভূষিত করিয়া, আদর্শ প্রেমিক ও স্বদেশবৎসল বীররূপে অঙ্কিত করিয়া কবিগুরু বাল্মীকির বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে বাল্মীকি-প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে সাফল্যের সহিত অপনোদন করিয়াছেন। আবার সীতা-চরিত্রের অপরূপ করুণরসসিক্ত আলেখ্য অঙ্কন করিয়া পাঠকের সহানুভূতিকে তাঁহার সপক্ষে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। 'ব্রজাঙ্গনা'-সম্বন্ধে সমালোচক কেবল বলিয়াছেন যে কবিত্বের অনির্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে মধুসূদন খ্রীষ্টান হইয়াও বৈষ্ণবোচিত ভাবরসের সার্থক উদ্বোধন করিয়াছেন। এই অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি হইতে লেখকের সমালোচকোচিত মনীষার পরিচয় না মিলিলেও তাঁহার রসানুভবশক্তির যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়।

ইহার পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে সর্বপ্রথম 'মেঘনাদবধ'-এর উৎকর্ষ-বিশ্লেষণ ও রসবিচারের

সার্থক চেষ্টা দেখা যায়। হেমচন্দ্রই মেঘনাদবধ-এর ধ্বনিগাম্ভীর্য, বিচিত্র রসস্ফুরণদক্ষতা, ত্রিভুবন-সঞ্চারিণী কল্পনা, প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনাশক্তি ও মহৎ-চরিত্র-সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উহার উৎকর্ষের স্বরূপ নিরূপণ করেন। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের অপরিহার্য তুলনার দ্বারা তিনি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রে পরিপাটি-শব্দবিন্যাস ও মধুর-তরল, শ্রুতিসুখকর ধ্বনিপ্রবাহ আছে, কিন্তু ভাবের রোমাঞ্চকর বিশালতা, উদ্বেলিত লহরী-লীলা ও আকাশস্পর্শী সমুন্নতিতে তিনি আদৌ মধুসূদনের সমকক্ষ নহেন। "যাহাতে অন্তর্জাত হয়, হৃদয়কম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয় তাদৃশ ভাব 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'অন্নদামঙ্গল'-এ কৈ ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গাবেগ কৈ ? বিদ্যুচ্ছটাকৃত বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা কৈ ?...'বিদ্যাসুন্দরে'র শব্দাবলীতে 'মেঘনাদবধ' বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোদ্ধবর্গের উৎসাহবর্ধন জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক, ধনুষ্টংকারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না।"

হেমচন্দ্রের মতে মধুসূদনের রচনার দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা ও কর্কশতা-জনিত নহে। বাক্যের জটিলতাদোষ ও দূরান্বয়ই তাঁহার প্রধান দোষ। পুঞ্জীভূত উপমা-সমাবেশ, নামধাতুর প্রয়োগ ও বিরামযতি-সংস্থাপনের দ্বারা ধ্বনিপ্রবাহ-ভঙ্গও তাঁহার দোষের মধ্যে গণ্য। এই দোষগুলি-সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচনা মধুসূদনকে বুঝিবার পথে হেমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশীদূর অগ্রসর হইয়াছে। দূরান্বয় এখন আর শিক্ষিত মন ও সজাগ কানের নিকট বোধের পরিপন্থী বলিয়া মনে হয় না। উপমার আতিশয্য মহাকাব্যের সুদূরবিস্তৃত বাতাবরণ-নির্মিতির পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয়, নামধাতুর প্রয়োগ ধ্বনিপ্রবাহকে অবিচ্ছিন্ন রাখার উপায় ও যতি-সংস্থাপনের অনিয়ম বৈচিত্র্য-সঞ্চারের হেতু। তথাপি এই দোষনির্দেশের পিছনে যে খানিকটা যথার্থ অনুভূতি আছে তাহা অনস্বীকার্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য ও কলাকৌশল অনুধাবন বিষয়ে হেমচন্দ্র বিবিধার্থসংগ্রহের সমালোচক হইতে আরও সূক্ষ্মদর্শী ও অনুভবশীল। পূর্বোক্ত সমালোচক বিরামের স্থান অষ্টম অক্ষরের পরে নির্দেশ করিয়াছিলেন ও

অর্থযতি যেখানেই পড়ুক না কেন তাহার সঙ্গে এই নিত্যবিধির কোন অসামঞ্জস্য দেখেন নাই। অর্থাৎ তিনি পয়ারের বিধিবদ্ধ বিরতিকে সম্পূর্ণভাবে অমিত্রাক্ষরে আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু হেমচন্দ্র তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরের পরেও বিরাম-যতির স্থান নির্দেশ করিয়া অমিত্রাক্ষরে ধ্বনিপ্রবাহের প্রায় অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এর সমালোচক যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখ করিয়া বঙ্গকবিদের উহার অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর সাধারণ কথোপকথনে যে পর্যন্ত হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদের অভ্যাস না আসে, সে পর্যন্ত কাব্যে উহার প্রবর্তন-চেষ্টায় কৃত্রিমতাই উৎপন্ন হইবে। হেমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি মধুসূদনের কাব্যবিচারে মূলনীতি-নির্দেশক ও রসানুভবপোষক।

'মেঘনাদ'-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ও দুঃসাহসিক সমালোচনা আসিয়াছিল কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রথম যৌবনের এই দুঃসাহসের জন্য আত্মগ্লানি অনুভব করেন ও নিজ ঔদ্ধত্যসূচক এই প্রবন্ধটিকে পরবর্তী রচনা-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। তিনি মধুসূদনের ন্যায় চিরপ্রতিষ্ঠিত মহাকবির প্রতি এই অশ্রদ্ধা ও আক্রমণকে নিজ অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনার নিদর্শন-রূপেই অভিহিত করেন। কিন্তু বাস্তবিক এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হইলেও ইহার মূলনীতি প্রতিপাদনে ও স্বমতপ্রতিষ্ঠায় তরুণ লেখকের যে অসামান্য উপস্থাপনা-কৌশল উদাহৃত হইয়াছে তাহা কেবল প্রগল্‌ভ তরুণের অবিনয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারের একটা নূতন দিক ইহার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ও লেখকের মতবাদের প্রয়োগ-প্রমাদকে বাদ দিলে ইহার একটা চিরন্তন মূল্য আছে বলিয়াই এই প্রবন্ধটিকে পরিত্যক্ত রচনার বিস্মৃতি-কোণ হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা ইহাকে এই সংকলনের মধ্যে স্থান দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ নীতিরূপে যাহা বলিয়াছেন তাহা যেমন মৌলিক তেমনই সত্য। মধুসূদন যে এই নীতির আওতায় পড়েন তাঁহার এই অভিমতটিই ভ্রান্ত।

ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, সাহিত্যপ্রকরণের

বিভিন্ন আদর্শকে অবলম্বন করে কেন সমালোচক এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। প্রতিভাবান, অকৃত্রিম-প্রেরণা-বিশিষ্ট লেখক অনিবার্য আত্মপ্রকাশের জন্যই এক-একটা বিশিষ্ট ফর্ম গ্রহণ করেন—কেহ বা গীতিকবিতা, কেহ বা ট্রাজেডি, কেহ বা মহাকাব্যের রূপাবয়ব নিজ বিশেষ অনুভূতির অনুকূল, নিজ অন্তর-আবেগের সর্বাপেক্ষা উপযোগী আধার হিসাবেই নির্বাচন করেন। যাঁহারা অনুকরণপ্রবণ, তাঁহারা কিন্তু এত সূক্ষ্ম বিচার না করিয়াই প্রচলিত যে রূপটি অধিক জনপ্রিয়, প্রতিভাবান লেখকের বিশিষ্টচিহ্নাঙ্কিত তাহাকেই গ্রহণ করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেন। ময়ূরপুচ্ছশোভিত দাঁড়কাকের ন্যায় নিজ বহিরাড়ম্বরের নীচে নিজ আন্তর রিক্ততাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহেন। "যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই।" যিনি যথার্থ শিল্পী তিনি নিজ হৃদয়াবেগের বসন্তপবনে নানা বর্ণের ফুল ফুটান; যাঁহার যথার্থ শিল্পপ্রতিভা নাই তিনি প্যাটার্ন-অনুযায়ী পশমের ফুল বুনিতে বসিয়া যান।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত যুক্তি ও উদাহরণ দিয়াছেন তাহাদের সারবত্তা সর্বথা স্বীকার্য। ট্রাজেডির বিজয়স্তম্ভ শুধু হতাহতের স্তূপের উপর নির্মিত নহে, জীবনের নিগূঢ় দুঃখ ও ব্যর্থতাবোধই উহার সত্যকার উপকরণ। মহাভারত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমাধিস্থল বলিয়াই ট্রাজেডি নহে, বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবের অন্তরের শূন্যতাবোধ, বিরাট উদ্যমের অতৃপ্তিকর পরিণতিই উহাকে ট্রাজেডির মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রতি মহাকবি স্ব স্ব যুগ ও সমাজের উচ্চতম আদর্শ চিত্রিত করিবার জন্য মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। যুদ্ধ উহার মুখ্য প্রেরণা নহে, আনুষঙ্গিক ঘটনাবিন্যাস মাত্র। সুতরাং যাঁহারা মহাকাব্যকে কেবল যুদ্ধবর্ণনার উপলক্ষ্যরূপে মনে করেন, তাঁহারা উহার অন্তঃপ্রকৃতি বিষয়ে বোধহীন।

রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ'-কে এই শেষোক্ত প্রবণতার উদাহরণ-রূপে লইয়া মারাত্মক ভ্রম করিয়াছেন। তিনি 'মেঘনাদবধ'-এ আদর্শ চরিত্র বা ভাবসমুন্নতির মেরুদণ্ড খুঁজিয়া পান নাই। লক্ষ্মণ কর্তৃক হীন, কাপুরুষোচিত উপায়ে মেঘনাদের বধসাধনের মধ্যে মহাকাব্য-রচনার যথার্থ ভাবগৌরবমূলক প্রেরণা কোথায়? ইহার সহিত তুলনায় বরং 'বৃত্র-

সংহার'-এ দেবকার্যে দধীচির আত্মবলিদান মহাকাব্যোচিত পরিকল্পনা বলা যায়। এমন কি হোমারের 'ইলিয়ড'-এ, যেখানে কোন চরিত্রই আদর্শ-স্থানীয় নহে, যেখানে বীর যোদ্ধবৃন্দ ঈর্ষ্যা, অভিমান, বর্বরতা প্রভৃতি দোষে কলঙ্কিত, সেখানেও জাতীয় গৌরবকল্পনাই যে মহাকাব্যিক মহিমার মূল কারণ তাহা অনুভব করা যায়। মেঘনাদবধের কোন চরিত্রেই আদর্শোচিত অমরতা নাই, কোন চরিত্রই আমাদের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে না। বরং 'চন্দ্রশেখর'-এ প্রতাপচরিত্রে যে কালজয়ী প্রভাব আছে তাহা মধুসূদনের মহাকাব্যে কোথায়ও দেখা যায় না। ভারতের অমর কবি-সৃষ্টি-সমূহ আমাদের মানসলোকে যে ভাস্বর ভাবপরিমণ্ডল রচনা করিয়াছে, 'মেঘনাদবধ' হইতে তাহাতে একটি রশ্মিও বিচ্ছুরিত হয় নাই—'আমাদের চতুর্দিক্‌ব্যাপী সেই কবিত্বজগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন ?'

মাইকেল নূতন মহৎ চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিয়া পুরাতন মহৎ চরিত্রকে যে বিনষ্ট করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার অপরাধের মাত্রা আরও বাড়িয়াছে। তাঁহার রচনায় ধূমকেতুর অস্বাভাবিক দীপ্তি আছে, ধ্রুব-জ্যোতি সূর্যের চিরন্তনতা নাই। তাঁহার মনে যখন কোন মহৎ ভাব-প্রেরণা জাগে নাই, তখন তাঁহার পক্ষে সরস্বতীর আবাহন মহাকাব্যিক প্রথার গতানুগতিক অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাঁহার স্বর্গ-নরক-বর্ণনাও সেই পর্যায়ভুক্ত। "মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটা-কতক দীন দরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন।" সর্বশেষে যুদ্ধবর্ণনা বাঙালীর ধাতুপ্রকৃতির বিরোধী বলিয়া তিনি বাঙালী পাঠককে 'মেঘনাদবধ'-এর মত একটা আদর্শহীন, কৃত্রিম মহাকাব্য পরিহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মধুসূদনের অমর মহাকাব্যের প্রতি এইরূপ প্রতিকূল মন্তব্য যে আধুনিক পাঠকের নিকট তাঁহার প্রতিভা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ন্যায় প্রমাণ-নিরপেক্ষ তাহাদের অত্যন্ত আশ্চর্য ঠেকে। এই বিরূপ সমালোচনার উত্তর

১২৮৮ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা' নামক প্রবন্ধে মিলিবে। এখানে সমালোচক রাম ও রাবণের চরিত্রাঙ্কনে প্রচলিত সংস্কারের যে উল্লঙ্ঘনকে রবীন্দ্রনাথ গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন তাহাকেই কাব্যের বীজরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। মাইকেলের রাবণ ভক্তি ও প্রীতির আধার, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার ভর্ৎসনায় নিজ অপরাধবোধে নিরুত্তর, শিবের প্রতি সমস্ত অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্যে ভক্তিসম্পন্ন, বিপদে ধীর ও অক্ষুণ্ণ মনোবল ও চিত্ত-সংযমের অধিকারী। এ রাবণ কামনার ক্রীতদাস নহে, ঐশ্বর্যমত্ত নহে, যথেচ্ছাচারে নিরঙ্কুশ নহে, শোকের অনলে দগ্ধ হইয়া পবিত্র, গভীর জীবন-বোধে স্থিতপ্রজ্ঞ, বিশ্ববিধানের অলঙ্ঘনীয়তায় ও রহস্যময়তায় বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়াছিলেন যে জাগ্রত মানবতাবোধের যুগ ঊনবিংশ শতকে দেবোপম আদর্শ চরিত্র, পরিপূর্ণ, দোষলেশহীন গুণের আধার মানবমনে গভীর রেখাপাত করিতে পারেন না, কেননা তাঁহাদের মধ্যে শাশ্বত আদর্শের পুনরাবৃত্তি আছে, নূতন-যুগ-প্রেরণার বিশিষ্ট আবেদন নাই। তাই এ যুগের নায়ক অদৃষ্ট-বিড়ম্বিত, অপ্রতিবিধেয় অন্তরজ্বালার সহিত অকুতোভয়ে ব্যর্থ-সংগ্রামরত, দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত মানবাত্মার প্রতীক। তাই ভগবানের অবতার, সত্ত্বগুণপ্রধান, ধর্মতেজে উজ্জ্বল রামচন্দ্র এ যুগের মহাকাব্যের নায়ক নহেন; সে নায়ক কলঙ্কলাঞ্ছিত, মনোবেদনার কণ্টকমুকুট-ভূষিত, দৃপ্ত-আত্মস্বাতন্ত্র্যে অনমনীয়, মানবজীবনের নিয়তিবিহিত ব্যর্থতাবোধে করুণ ও মহান রাবণ। আর যদি রবীন্দ্রনাথ এযুগের মহাকাব্যে সম্পূর্ণ অপাপ-বিদ্ধ, সর্বগুণসম্পন্ন নায়ক দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তবে দীপ্ত ক্ষাত্রশৌর্যের প্রতিমূর্তি, প্রেমে মধুর, ভক্তিতে নম্র, কর্তব্যে দৃঢ়, আচরণে অপ্রগল্ভ, সংগ্রামে ন্যায়নিষ্ঠ, মরণে বরণীয়, তরুণ প্রাণধর্মের ভাস্বর বিগ্রহ ইন্দ্রজিৎ তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল কেমন করিয়া? ইন্দ্রজিৎ কোন ধর্মনীতির মূর্ত বিকাশ, কোন লোকোত্তর দিব্যগুণের, কোন অতি-মানবিক মহিমার অধিকারী নহে বলিয়াই কি সে কবি-কাঙ্ক্ষিত অমরতার স্বর্গে স্থান পাইল না? রাবণ ও ইন্দ্রজিতে যাঁহার মন উঠিল না, আশঙ্কা হয় তাঁহাকে এই মানবতাপ্রধান যুগে নায়কহীন কাব্যলোকেই বিচরণ করিতে হইবে। তাঁহার কল্পিত আদর্শের দাবী মিটাইতে

স্বর্গ হইতে কোন বিশুদ্ধজ্যোতি দেবতা নামিয়া আসিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

মধুসূদনের নৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুমোদন ছিল না বলিয়াই কবির কাব্যনীতি তাঁহার নিকট কৃত্রিম বলিয়া মনে হইয়াছে। যদি তিনি 'মেঘনাদবধ'-এর মধ্যে যথার্থ মহাকাব্যিক প্রেরণা-সূত্রটি ধরিতে পারিতেন, যদি তিনি বুঝিতে পারিতেন যে এ যুগে দেবচরিত্র নহে, নিয়তি-পীড়িত মানবই মহাকাব্যের প্রকৃত নায়ক, অন্যায়যুদ্ধে লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদের বধ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নহে, ইহার মধ্যে মানবজীবনের রহস্যময়, বেদনাবিধুর পরম তাৎপর্যটি আভাসিত আছে, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের সরস্বতী-আবাহনে, স্বর্গ-নরকবর্ণনায়, যুদ্ধকাহিনীতে এবং পুঞ্জীভূত উপমা-সমাবেশের পিছনে যে কল্পনার ঐশ্বর্যলীলা প্রকটিত তাহাতে কোন কৃত্রিমতার সন্ধান পাইতেন না। চশমা ঠিক না হইলে চশমার ভিতর দিয়া দেখা সমস্ত দৃশ্যই যে বিকৃতরূপে প্রতিভাত হয়, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা, উহার সমস্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারকুশলতা সত্ত্বেও, তাহারই নিদর্শন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধটিতে লেখক রবীন্দ্রনাথের আপত্তিগুলি পূর্ব হইতে অনুমান করিয়া উহাদের খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে নিষ্পাপ ইন্দ্রজিতের অকালমৃত্যু তাঁহার পিতার অপরাধ-বীজের অঙ্কুরিত ফল; রাবণ পাপাচরণের দ্বারা নিয়তিচক্রের যে অলঙ্ঘনীয় গতিবেগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই তলে নিষ্পেষিত হইয়া ইন্দ্রজিতের নিধন। পিতার অনাচারের ফল রক্তকণাবাহিত হইয়া পুত্রপৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরাক্রমে সঞ্চারিত হয়, ইহাই পাপপ্রলোভনকে অতিক্রম করার সর্বপ্রধান হেতু। সুতরাং 'মেঘনাদবধ কাব্য' অদৃষ্টবাদ, বিজ্ঞানতত্ত্বানুমোদিত জীবন-সত্যের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। প্রমীলা-চরিত্রেও কবি নারীজাতিকে প্রাধান্য দিয়া নারী-পুরুষের মধ্যে সমাজ-প্রচলিত বৈষম্য দূর করিতে চাহিয়াছেন ও তন্ত্রসাধনার মর্মকথাকে চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপ দিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার প্রেমলীলার যে অপরূপ মাধুর্য তাহা দম্পতির মধ্যে এই রুচিসাম্য ও শক্তিসাম্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কবির কল্পনানেত্রে ভবিষ্যৎ সমাজের বন্ধনসূত্রটি উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাকে এই তাৎপর্যপূর্ণ প্রেমচিত্রাঙ্কনে প্রণোদিত করিয়াছিল।

এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে মধুসূদনই সর্বাধিক আলোচিত কবি। এতাবৎ অনালোচিত 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বীরেশ্বর গোস্বামীর প্রবন্ধের বিষয়—ইহাতেই মধুসূদনের গ্রন্থপঞ্জী-আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। এই পত্রাবলীর আলোচনার প্রারম্ভে সমালোচক ওভিডের নিকট মধুসূদনের ঋণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'ওভিডের অনুসরণে কোথায় কোথায় যে অনৌচিত্য দোষও ঘটিয়াছে তাহা বলিয়াছেন। বিশেষত হিন্দুসমাজে প্রাচীন যুগে নায়িকার পক্ষে পত্রব্যবহার কতখানি স্বাভাবিক তাহারও বিচার করিয়াছেন। এ বিচার অতি-পাণ্ডিত্যদোষদুষ্ট (pedantic) বলিয়াই মনে হয়। আধুনিক যুগের কবি প্রাচীন কালের নায়িকাকে দিয়া পত্র লেখাইলেও নায়িকার মনোভাবস্ফুরণে, মনস্তত্ত্ববিন্যাসে ও প্রকাশভঙ্গীতে যে পরবর্তী যুগের আবেগ-ছন্দের, প্রণয়জ্ঞাপনরীতির প্রভাব পড়িবে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কালানৌচিত্যের অজুহাতে এই রীতিকে নিন্দনীয় মনে করিলে রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী', 'কর্ণ ও কুন্তী', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি সমস্ত পুরাণাশ্রিত কবিতাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিতে হয়। দ্বিতীয়ত, রুচির দোহাই পাড়িয়া অবৈধ প্রেমচিত্রকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলে সরস মনস্তত্ত্ব, প্রণয়ের সর্বগ্রাসী একাধিপত্যের উপর নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে মানবপ্রকৃতির একটা কৌতূহলোদ্দীপক, বিচিত্র মনস্তত্ত্বদ্যোতক বিকাশই অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যায়। সুতরাং আদিরসের কবিতায় রুচির মাত্রা ঠিক রাখিয়া, সৌন্দর্যবোধের সর্বপাবনকারী স্পর্শে অভিষেক করিয়া কবি নিষিদ্ধ প্রেমের কথা তাঁহার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন। সমালোচক এই ব্যাপারে অনেকটা সঙ্কীর্ণ, অনুদার মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। তারা, শূর্পণখা, ও কতকটা উর্বশীর পত্র তিনটি রুচিবিকারের নিদর্শন বলিয়া ইহাদের সৌন্দর্যের প্রতিও তিনি অনেকটা অন্ধ হইয়াছেন।

কিন্তু এই জাতীয় সামান্য দূষণপ্রবৃত্তির কথা বাদ দিলে সমালোচক কাব্যটির উৎকর্ষ-প্রতিপাদনে যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতা ও রসগ্রাহিতার প্রমাণ দিয়াছেন। শকুন্তলা-চরিত্র-কল্পনায় মধুসূদন ব্যাস ও কালিদাসের সহিত তুলনায় মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। সমালোচক তুলনায় কালিদাসের চিত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন ও মধুসূদনের শকুন্তলার মিলন-ব্যাকুলতাকে ধৈর্যের অভাবের

জন্য মহত্ত্বহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে মধুসূদন শকুন্তলার পূর্ণ চরিত্র দেখান নাই—রাজসভায় প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে তাহার তেজস্বিতা, অভিমানপ্রবণতা ও আত্মমর্যাদাবোধের যে পরিচয় পাই, তাহা মধুসূদনের কাব্যসীমাবহির্ভূত। সে প্রেমবিবশা নায়িকার ন্যায় তাহার প্রণয়ীর স্মৃতিধ্যানে বিভোর, নিজের অযোগ্যতার কথা ভাবিয়া শঙ্কিত, রাজাধিরাজের সহিত তাহার ব্যবধান-সম্বন্ধে হীনম্মন্যভাবে সচেতন। যে ভাববিলাসমগ্নতা শকুন্তলাকে দুর্বাসার শাপের বিষয়ীভূত করিয়াছিল মধুসূদন তাহার চরিত্রের সেই দিকটাই ফুটাইয়াছেন—দুর্বাসার আগমনের প্রাক্‌কালে যে মধুর স্মৃতিরোমন্থন তাহাকে বহির্জগৎ-সম্বন্ধে অচেতন করিয়াছিল তাহারই ভাবমুগ্ধ বাণীরূপ, সেই প্রণয়কল্পনারই উদ্বেগ-ব্যাকুল আবর্তন মধুসূদনের পত্রে অভিব্যক্ত। রুক্মিণীর পত্রে, তারার ন্যায় রূপের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান নাই; শকুন্তলার ন্যায় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নাই। রুক্মিণী সামাজিক মর্যাদায় দ্বারকাধীশের সমপর্যায়ভুক্তা; শ্রীকৃষ্ণ দেব, আর রুক্মিণী মানবী, এইজন্য রুক্মিণীর ভক্তিবিহ্বল আত্মসমর্পণে কোন হীনতাবোধ নাই। শকুন্তলা সর্বদাই এই হীনত্ববোধের দ্বারা ত্রস্ত। কাজেই উহাদের পত্রে ভাষা ও ভাবের পার্থক্য উভয়ের চরিত্র ও অবস্থানুযায়ী সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছে।

দ্রৌপদী-চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য সুসঙ্গতই হইয়াছে। দ্রৌপদীর পত্রে তাহার যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তাহার প্রণয়বিবশা, বিরহ-কাতরা, স্বামীর প্রতি ঈষৎ সন্দিগ্ধচিত্তা ও মৃদুশ্লেষপ্রবণা মূর্তি—ইহাতে তাহার ক্ষাত্রতেজপূর্ণ, প্রতিহিংসায় অটলসংকল্প দিক্‌টির কোন পরিচয় নাই। এই পত্রটি বিশেষ করিয়া দ্রৌপদীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যদ্যোতক নহে, যে-কোন প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকার পক্ষে উপযোগী। ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে অবস্থাভেদ ও চরিত্রপার্থক্যের নিদর্শন প্রায় অনুপস্থিত। সমস্ত বীরাঙ্গনা-কাব্যে অনেকগুলি দ্বৈত-চরিত্রের উপস্থাপনায় উহার রসবৈচিত্র্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—এই মন্তব্যও লেখকের সূক্ষ্মদর্শিতার নিদর্শন। "রুক্মিণী ও শকুন্তলায়, তারা, উর্বশী ও শূর্পণখায়, কৈকেয়ী ও জনায়, দুঃশলা ও ভানুমতীতে উক্তরূপ সাদৃশ্য আসিয়া নায়িকা-চরিত্রের বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়াছে। একেবারে স্বাতন্ত্র্য নাই, এরূপ নহে, তবে খুব স্পষ্ট নহে।"

মধুসূদনের নবপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে সমালোচকদের প্রাথমিক সংশয় যে সম্পূর্ণ অপনোদিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ মিলিবে নিম্নলিখিত প্রশস্তিবাচক ও বিচারযাথার্থ্যমূলক উদ্ধৃতিতে: "শব্দবিন্যাসের অপূর্ব কৌশল, ছন্দের ঝংকার, ভূরিতা, লালিত্য ও মাধুর্য, উপমার সুন্দর ও অলংকার-বিশুদ্ধ প্রয়োগ, ভাষায় ভাবের অনুগামিতা—এই সকল মাইকেলের রচনার সাধারণ গুণ; এবং এই সকলের অনুকরণ অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য।" 'মেঘনাদবধ'-এর সহিত তুলনায় 'বীরাঙ্গনা'-য় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-বিন্যাস যে আরও শ্রুতিমধুর, বিচিত্র ভাবানুগামী, ও কেবল রণক্ষেত্রের নহে, জীবনের গভীর-আবেগময়, অন্তরঙ্গ ভাব-পরিবেশের সহিত নিগূঢ় সঙ্গতি-বিশিষ্ট হইয়াছে, ইহার মধ্যে জীবনের উগ্র ও মধুর উভয়বিধ ভাবেরই যে সহজ-সুষমাপূর্ণ, কৃত্রিম-আস্ফালনহীন প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই মধুসূদনের ক্রমপরিণত শিল্পবোধ ও জীবনানুসারিতা অভিব্যক্ত হইয়াছে। বর্ণনার দিক দিয়া লেখক 'বীরাঙ্গনা' অপেক্ষা 'মেঘনাদবধ'-এরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে মহাকাব্যের বর্ণনারীতির সহিত পত্রকাব্যের ঘরোয়া ও ভাবপ্রধান পরিবেশের বর্ণনারীতির পার্থক্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য। এই পার্থক্য কেবল পরিসরগত নহে, কাব্য-ভঙ্গীগতও বটে। মহাকাব্যে বর্ণনাই প্রধান, চরিত্রের ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা-কৃত গৌণ; পত্রকাব্যে চরিত্রের আত্মপ্রকাশের ফাঁকে ফাঁকে ও এই মুখ্য প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যতটুকু বর্ণনাকে স্থান দেওয়া চলে, কবি সেই সুনির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। কাজেই সুস্পষ্টতা ও বর্ণোজ্জ্বলতার পরিমাণ যে মহাকাব্যেই আপেক্ষিক প্রাধান্য লাভ করিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রধানত সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ও তাঁহাদের কাব্যই বিস্তারিতভাবে সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই সমালোচনাগুলি পড়িতে পড়িতে বঙ্কিম-যুগের সহিত আধুনিক যুগের সমালোচনা-দৃষ্টিভঙ্গীর যে গুরুতর ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার

প্রতিই বিশেষ করিয়া চোখ পড়ে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার সমালোচক-গোষ্ঠীর নিকট হেম ও নবীনের যে কবি-প্রতিষ্ঠা, তাঁহাদের প্রতি যে সশ্রদ্ধ, উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিমূলক মনোভাব, তাঁহাদের উপর যে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা-আরোপ—এ সবই যেন আমাদের নিকট বাড়াবাড়ি বলিয়া ঠেকে। আমাদের পূর্বসূরীদের নিকট যে রচনা কাব্যধারার মূল-প্রবাহ-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহা আমাদের নিকট এক সঙ্কীর্ণ, স্রোতোহীন শাখাপথ বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিম ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত মনীষী সমালোচক 'বৃত্রসংহার' ও 'কুরুক্ষেত্র'-এর সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তাঁহাদের বিচার-মানদণ্ডে এই কাব্যদ্বয় বাংলা কাব্যের চরম উৎকর্ষ ও যুগপরিণতির দৃষ্টান্তরূপে অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। কি কল্পনাবৈভব, কি অনুভূতি-গভীরতা, কি উন্নত ভাবাদর্শ, কি সূক্ষ্ম নীতিবোধ ও হিন্দু অধ্যাত্মসংস্কারের শ্রেষ্ঠতম রূপায়ণ—সব দিক দিয়াই ইহারা শীর্ষস্থানীয়, চরম গৌরবের অধিকারী। এই সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকমণ্ডলী ইহাদের ভাষার স্থূলতা, কল্পনার অসমতা, ছন্দবিন্যাসের স্খলন প্রভৃতি দোষের প্রতি একেবারেই অ-চেতন। প্রশংসার উচ্ছ্বসিত স্রোতে, তৃপ্তিবোধের অখণ্ড পূর্ণতায় এই-সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। আমাদের বিচারে যে-সমস্ত কাব্য দ্বিতীয় শ্রেণীর, যাহাদের প্রকাশ-স্থূলতা আমাদের রুচিবোধকে অহর্নিশ পীড়িত করে, যাহাদের জীবনাদর্শ মধুসূদনের সহিত তুলনায়ও অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক-তাৎপর্যহীন বলিয়া মনে হয়, যাঁহাদের কল্পনার বিশালতা ও আখ্যানবস্তুর বিস্তার আমাদিগকে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না করিয়া কথঞ্চিৎ সহনশীল করিয়াছে মাত্র, তাহারা বঙ্কিম-প্রমুখ সমালোচকের চক্ষে এরূপ অতিমানবিক পর্যায়ে উন্নীত হইল কেন ইহা আমাদের গভীর অনুধাবনের বিষয় হওয়া উচিত। অবশ্য বঙ্কিমযুগের সমালোচকগোষ্ঠীর দৃঢ় ধারণা ছিল যে মধুসূদনের অনুসরণে রচিত বিরাটকায় মহাকাব্যজাতীয় রচনাতেই বাংলা কবিতার মহত্তম প্রতিশ্রুতি, অগ্রগতির সুনিশ্চিত আশ্বাস নিহিত, এবং হেম-নবীনের কাব্যে ইহারই বাস্তব নিদর্শন তাঁহাদিগকে অপরিমিতভাবে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব যে বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সম্পূর্ণভাবে মোড় ফিরাইয়া দিবে, পুরাতন ধারাকে শুকাইয়া-মজাইয়া

বাংলা কাব্যতরণীকে গীতিকবিতার উচ্ছ্বসিত প্রবাহে আধুনিকতার সঙ্গম-তীর্থে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, কাব্য-বিচারে নূতন রুচি ও মানদণ্ডের প্রবর্তন করিবে, সাহিত্যজগতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনপ্রবাহের অনাগত ভবিষ্যৎ যে তাঁহাদের ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই। বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তে যুগপরিসমাপ্তির লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ও মধুসূদন-হেম-নবীনে নবযুগের আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন; কিন্তু এই নবাগত কবিবৃন্দ শীঘ্রই যে আবার পুরাতনের পর্যায়ে পড়িবেন, নব-জাগরণের মধ্যাহ্নে আবার নূতন সূর্য উদিত হইয়া নবোদিত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীকে যে অকাল-গোধূলিচ্ছায়াচ্ছন্ন করিবে এই অসম্ভব সম্ভাবনা যদি তাঁহার মনে উদিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে ক্ষীণদৃষ্টিত্বের দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ছাড়াও বঙ্কিম-গোষ্ঠীর সহিত আধুনিক গোষ্ঠীর দৃষ্টি-পার্থক্যের আরও গভীরতর কারণ আছে। বঙ্কিমের দৃঢ় ধারণা ছিল যে তিনি যেমন প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতির পুনর্মাজন ও নব প্রয়োগকে তাঁহার উপন্যাসের মূল প্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি কবিতাও এই যুগযুগান্তর-বাহিত অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের রহস্য-উদ্‌ঘাটন ও সত্য-প্রতিপাদনকেই নিজ মুখ্য বিষয়রূপে অবলম্বন করিবে। ভবিষ্যতের কাব্য যে সনাতন পৌরাণিক পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে, কাব্যগগনে উদিত সমস্ত নূতন গ্রহ-উপগ্রহ যে পুরান-সৌর-মণ্ডলের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হইয়া নূতন নূতন আলোকধারা-বিকিরণে পুরাতন সত্যকেই উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবে এ বিষয়ে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। বাঙলার সমাজ-চেতনা ও ভাব-ধারাও তাঁহার এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিল। হিন্দুধর্মের তত্ত্ব, হিন্দু-সমাজের মূলনীতি, হিন্দু-অধ্যাত্মবোধের অক্ষুণ্ন যুগোপযোগিতা-প্রতিপাদন, আধুনিক চিন্তাধারার সহিত হিন্দু-জীবনদর্শনের সামঞ্জস্য-বিধান—ইহাই সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষা ও কবিকল্পনার একান্ত সাধনার বিষয় ছিল। বিধর্মী মাইকেলের হিন্দু-পৌরাণিক জীবনাদর্শে প্রত্যাবর্তন তাঁহার অনুমানকে প্রত্যক্ষ সত্যের সমর্থন যোগাইয়াছিল। আর বিজাতীয়-সংস্কারপ্রভাবিত মাইকেলের হাতে হিন্দুর নিয়তিবাদ ও কর্মফল, তাহার পরলোকতত্ত্ব ও

স্বর্গনরক-কল্পনা, তাহার জীবন-সাধনা ও উহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি যে বিকৃত রূপ লাভ করিয়াছিল, হেম-নবীনের কবিতায় তাহার বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান-ও-দর্শন-সমর্থিত, সূক্ষ্মনীতিবোধসম্পন্ন রূপান্তরই বঙ্কিমের সাদর স্বীকৃতি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিল। মাইকেলের রতিরঙ্গমত্ত উমা-মহেশ্বরের পরিবর্তে হেমচন্দ্রের তত্ত্বালোচনাতৎপর শিবদুর্গা, সতীবিরহকাতর, অথচ সৃষ্টিরহস্যের মূলকারণজ্ঞ মহাদেব ও নবীনচন্দ্রের ধর্ম ও রাজনীতিবিশারদ, ত্রিকালদর্শী শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যটিকে উজ্জ্বল, অবিকৃত ও লোকচিত্তহারী রূপে উপস্থাপিত করিয়া বঙ্কিমের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। কল্পনার বিশালতা, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অভ্রভেদী মহিমা শিল্পরূপের সমস্ত অপূর্ণতার উপর ভাস্বর যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়া মানবিক সহজ ও সুকোমল বৃত্তিগুলির স্ফুরণ, দয়া-মায়া-প্রীতি-মমতার যথাযথ ও আদর্শানুসারী বিকাশ, প্রাচীন আখ্যায়িকার মধ্যে নব জীবনাদর্শের দ্যোতনা, শচীর মহিমা, ইন্দুবালার সরলতা, সুভদ্রার শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সেবাপরায়ণতা, শৈলজার নিষ্কাম প্রেম, ব্যাসদেবের সুমহান জ্ঞানযোগ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি ও কর্মযোগের সমন্বয়—এ-সমস্তই যেন, হিন্দুসমাজের শাশ্বত গৌরব, হিন্দুধর্মের একটি যুগোপযোগী, নবশক্তিদৃপ্ত, দিগ্বিজয়ী রূপকে প্রকটিত করিয়াছে। বঙ্কিম ও বঙ্কিমভাবপুষ্ট সমালোচকবৃন্দ এই মহনীয় চিত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে চিত্রে রং ও রেখা-বিন্যাসের ত্রুটির দিকে তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই, কিংবা আন্তর্জাতিক আদর্শ বা যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ের অপ্রতিরোধনীয় তরঙ্গ যে অদূর ভবিষ্যতে এই চিত্রকে ম্লান করিয়া বা মুছিয়া দিবে এই সম্ভাবনাও তাঁহাদের অনুভবশক্তির অতীত ছিল। এই মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ও সূক্ষ্ম শিল্পবোধের তারতম্যের জন্যই হেম-নবীনের কাব্য-বিচারে আমাদের পূর্বসূরীদের সহিত বর্তমান যুগের সমালোচকদের এত গুরুতর ব্যবধান ঘটিয়াছে।

অবশ্য এই মতভেদের ব্যাপারে আধুনিক সমালোচকই যে অভ্রান্ত বা অধিকতর সত্যানুসারী এরূপ দাবীও ঠিক যুক্তিযুক্ত নহে। হেম-নবীনের ভাব-প্রতিবেশ, তাঁহাদের কাব্য ও নীতির আদর্শ হইতে আমরা এতদূরে সরিয়া আসিয়াছি যে যে সহজ একাত্মতা কবি ও সমালোচকের মধ্যে নিগূঢ়তম যোগসূত্র, যাহার বলে সমালোচক কবিচিত্তের তলদেশ পর্যন্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি

প্রেরণ করিতে পারে, তাহা অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়াছে। আমরা যেন দুই বিভিন্ন জগতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছি। হেম ও নবীনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে, এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাদের সহিত আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির অভাব ঘটিয়াছে। আমরা আর ধর্মনীতির অলঙ্ঘনীয়তা, নিয়তি ও কর্মফলের রহস্যপরিণামী, অবিচ্ছেদ্য সংযোগের তত্ত্বকে অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়া গ্রহণ করি না। বিশেষত পৌরাণিক দেব-দেবীর পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যতই গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম-নিয়মাধীন জীবননীতি নিহিত হউক না কেন, উহার এক দিকে অলৌকিকত্ব, অপর দিকে বস্তুগত স্থূলতা আমাদের মনে এক বিসদৃশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যে অনুকূল ও বিশ্বাসপ্রবণ মনোভাব না থাকিলে দেবতত্ত্ব আমাদের অন্তরে সত্যরূপে প্রতিভাত হয় না তাহারই অভাব-বশতঃ আমরা হেম-নবীনের প্রতি সুবিচার করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে পৌরাণিক মূর্তিরূপের পরিবর্তে উপনিষদের যে সূক্ষ্ম ভাবরূপ, দেবতার শরীরী উপস্থিতির পরিবর্তে তাহার অদৃশ্য ব্যাপ্তি ও ইঙ্গিতময় সত্তার রহস্য-অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছেন তাহারই ফলে পুরাণ-বর্ণিত দেবের মানবিক আচরণ আমাদের নিকট নিগূঢ় সত্যের বাহন হইয়া উঠিতেছে না। আমরা এখন কাব্যের নিকট ধর্মপ্রভাবিত সামগ্রিক জীবন-তাৎপর্য চাহি না, চাহি ক্ষণিক বিচ্ছিন্ন ভাবদ্যোতনা, মুহূর্তের অনুভূতির দীপ্ত ঝলক। জীবন এত বিচিত্র ও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে যে উহাকে বিশেষ কোন নির্দিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে বাঁধা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নানা পর্যায়ের কাব্যে নানা বিভিন্ন তত্ত্বের সহায়তায় জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কোন একটি তত্ত্বের প্রতি অবিচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁহাকে জীবন-সত্যের সন্ধান দেয় নাই। আমরা পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের সমগ্রতা হইতে নহে, উহাদের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-আখ্যান হইতে এক-একটি যুগোপযোগী, মানবের স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অনুকূল আংশিক সত্যপরম্পরা অনুভব করিয়াই সন্তুষ্ট হই। কাজেই পৌরাণিক ধর্মপ্রভাবিত জীবন-নীতি, যতই সূক্ষ্মদর্শিতা ও যাথার্থ্যের সহিত প্রতিপাদিত হউক না কেন, উহা আমাদের বিমুখ চিত্তের দ্বার হইতে অভ্যর্থনাহীনভাবে ফিরিয়া আসে।

এই মহাকাব্যজাতীয় রচনাগুলিকে কেবল মানবের জীবনচিত্র-রূপে লইলেও উহাতেও আমাদের অতৃপ্তির একটি কারণ থাকে। উহাদের চরিত্রসমূহ সরল, অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতাহীন, ও শ্রেণীগত গুণের আধার; উহাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় স্পর্শ নাই। শচীর উগ্রতাহীন সহজ মহিমা, ইন্দুবালার অতিপেলব, জীবনের রূঢ়স্পর্শ-বিমুখ কমনীয়তা, ইন্দ্রের দেবসুলভ মহত্ত্ব, বৃত্রের ঈষৎ আত্মশ্লাঘাপ্রবণ, স্থূলবুদ্ধি সরলতা, এমন কি ঐন্দ্রিলার উদ্ধত, প্রভুত্বপ্রিয় দম্ভ—এ সবই সুপরিচিত শ্রেণী-দ্যোতক। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে আধুনিকতার লক্ষণ সুপরিস্ফুট, সূক্ষ্ম রোমান্টিক ভাব-কল্পনা ও বৃহৎ পটভূমিকায় প্রসারিত দৃষ্টি তাঁহার মধ্যে মূর্ত; কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণও আধুনিক চরিত্ররূপে প্রতিভাত হন। অন্যান্য চরিত্রসমূহ হয় বিদেশী ছাঁচে ঢালা না হয় অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ, গার্হস্থ্যজীবনের নর-নারীতে দ্রবীভূত। সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে বর্তমান যুগের আকাঙ্ক্ষিত কোন মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল জাগে না। যেমন চরিত্র-চিত্রণে, তেমনি বর্ণনায়ও বহির্মুখী, ঘটনাতরঙ্গতাড়িত কাব্যমনোভাবের পরিচয় পাই। এই বর্ণনায় ও আখ্যানবিবৃতিতে যে প্রচুর কবিত্বশক্তি ও যথাযথ চিত্রণ আছে তাহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে। কিন্তু ইহাদের যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি তাহা আমাদের ঠিক মনোমত নহে, তাহা আমাদের অভিলষিত সূক্ষ্ম ও অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনার আদর্শে পৌঁছে না। হেমচন্দ্রের পাতাল, বিশ্বকর্মার শিল্পশালা, দধীচির আশ্রম, ব্রহ্মলোক ও কৈলাস-বর্ণনায় বা নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণের বাল্যলীলা, অভিমন্যুর কুরুক্ষেত্র-সংগ্রাম ও প্রভাসে প্রলয়োচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস-বর্ণনায় যে কবিত্বশক্তি ও বিন্যাসনৈপুণ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাকে অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পুরাণতত্ত্বের প্রভাব, বস্তুসংস্থিতির আধিক্য ও মাঝে মধ্যে ছন্দ ও শব্দনির্বাচনের স্খলন আমাদের মনের বিমুখতাকে জয় করিতে অসমর্থ হয়। আমরা চাই বস্তুভারবর্জিত বিশুদ্ধ রসনির্যাস, স্থূলের অভিভবমুক্ত সূক্ষ্ম ভাবরূপ; হেম-নবীনের কাব্যে বস্তুর মধ্যেই রসকে, স্থূলের মধ্যেই সূক্ষ্মকে, ঘটনাপুঞ্জের অন্তরালে ভাবব্যঞ্জনাকে খুঁজিবার শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের সমগ্র প্রতিবেশ ও পরিকল্পনাকে স্বীকার না করিলে উহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য, উহাদের রন্ধ্রপথে প্রবহমান রসধারাকে অনুভব করা

দুরূহ। হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের বহিরাবরণকে মানিয়া লইয়াই উহার অভ্যন্তরে সংরক্ষিত সার্বভৌম সত্যটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। বঙ্কিম সমাজ ও সাহিত্যকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন সেই দৃষ্টি আমাদের বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার সহিত কাব্যবিচারে আমাদের এতটা অনৈক্য দেখা দিয়াছে।

বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' ১২৮১ ও ১২৮৪ এই তিন বৎসরের ব্যবধানে দুইটি সুবৃহৎ প্রবন্ধে 'বৃত্রসংহার'-এর দুই খণ্ডের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি এই সমালোচনায় প্রতি সর্গের বিষয়বস্তু-গ্রন্থন ও বিশেষ কাব্যমহিমার উল্লেখ করিয়া সমগ্র গ্রন্থটি আমাদের সহিত পাঠ করিয়াছেন। প্রথম খণ্ডে ঐন্দ্রিলা ও বৃত্রাসুরের সংলাপ সম্বন্ধে, তিনি, হেমচন্দ্রের কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অতি উচ্চ ধারণা থাকা সত্ত্বেও, একটি সারবান মন্তব্যের দ্বারা ত্রুটি দেখাইয়াছেন—"গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে (ইহাকে) মর্ত্যভূমে সামান্যা বঙ্গগৃহিণীর স্বামিসম্ভাষণ বলিয়া কখন কখন ভ্রম হয়।" শচীর বিলাপ ও পূর্বস্মৃতি-রোমন্থনে যে তাঁহার দেবী-চরিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে তাহা বঙ্কিম চমৎকারভাবে দেখাইয়াছেন। কামদেবের প্রতি চপলা ও শচীর ব্যঙ্গ উভয়ের চরিত্র-দ্যোতক; কন্দর্পের উত্তরও সর্বাংশে চরিত্রানুযায়ী। যুদ্ধবর্ণনায় হেমচন্দ্রের কাব্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বঙ্কিম এ বিষয়ে মধুসূদন অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ মধুসূদনের যুদ্ধ পৌরাণিক-আদর্শানুসারী; আর হেমচন্দ্রের যুদ্ধ সেনাসমাবেশ ও সৈনাপত্য-কৌশলে আধুনিক গতিচ্ছন্দের পরিচয়বাহী। মধুসূদনে শুধু রণসজ্জাসমারোহ ও ধ্বনিমুখরতা—আসল যুদ্ধতরঙ্গের জোয়ার-ভাটার কোন চিহ্ন নাই, হেমচন্দ্রে প্রকৃত যুদ্ধের ভাগ্যবিপর্যয়, উহার হৃৎ-স্পন্দনের দ্রুত ও মন্থর লয়, বাহিনীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ, উপমা-সাহায্যে ও উত্তেজনাময় বর্ণনাভঙ্গীর দ্বারা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। তার পর তিনি কবির নিয়তিবাদ, দেবশক্তির অতীত এক সর্বনিয়ন্ত্রী, উদাসীন মহাশক্তি পরিকল্পনার সমুচিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই নিয়তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কাহারও অধীন নহে, ইহার অনপনেয়-মসী-অঙ্কিত মানচিত্রের রেখামাত্রও কেহ পরিবর্তন করিতে পারেন না। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণভূত ও মর্মমূলশায়ী যে ধর্ম, নিয়তি তাহারই প্রতিচ্ছায়া; এই ধর্মের চির-অবিচল অক্ষরেখা বিচলিত হইলেই নিয়তির চিত্রপটে পরিবর্তন

সম্ভব। বৃত্র এই সৃষ্টিমর্মনিহিত ধর্মের বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াই তাহার নিয়তি-নির্দিষ্ট সৌভাগ্যকালের পরিধি সঙ্কোচ করিল। ইন্দ্রের দীর্ঘযুগব্যাপী ধ্যান ভঙ্গের পর তিনি যে প্রাকৃতিক পরিবর্তনসমূহ লক্ষ্য করিলেন তাহার বর্ণনায় বৈজ্ঞানিক সত্য ও কবিকল্পনার অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে; অত্যুচ্চ বিজ্ঞান ও অত্যুচ্চ কাব্য যে পরস্পরবিরোধী নহে, পরন্তু পরস্পরের আশ্রয়স্থল তাহাই এখানে অতি কৌতূহলোদ্দীপকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইন্দুবালা-চরিত্রের মনোমুগ্ধকর ও সুকোমল-ভাব-পরিপূর্ণ, বীণাধ্বনিবৎ সুমধুর বর্ণনার বঙ্কিম শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। কৈলাসপুরের বর্ণনায় সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহের কক্ষাবর্তন ও তাহারও ঊর্ধ্বে শব্দবর্ণহীন, জলবিম্ববৎ মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, বিশ্বপ্রতিবিম্বের ছায়াসমবায়গঠিত শিবপুরীর মহান্ চিত্রকে কবি যে ছন্দোময়ী-বাণী-সংযোগে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কাব্যশক্তির এক অতুলনীয় প্রকাশ। দেবলোকের মহিমান্বিত পুরাণ-কল্পনার সহিত ততোধিক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষ সত্যের এক অপরূপ সমাবেশ কবির ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত ও তাহার প্রকাশশক্তির ইন্দ্রজালে বিধৃত হইয়াছে। হয়ত ছন্দগতির নিস্তরঙ্গতার, ধ্বনিপ্রবাহের সীমিত মাত্রার জন্য কবি-কল্পনার উত্তেজনা শব্দসংগীতসঞ্জাত পরিপূর্ণ ঊর্ধ্বায়নে (sublimation) স্থির হইতে পারে নাই; কিন্তু এখানে কল্পনা নিজের দুঃসাহসে নিজেই স্তম্ভিত হইয়া আত্ম-প্রসারণের স্বচ্ছন্দ লীলাকে সংযত করিয়াছে। কবি এই বিরাট কল্পনার রূপায়ণে সমস্ত উচ্ছ্বাসবাহুল্য পরিহার করিয়া নিজ অনুভব-গরিমাকে সম্ভ্রম-কুণ্ঠিত আনুগত্যের সহিত অনুসরণ করিয়াছেন। হয়ত অন্য কোন রীতি এখানে অপ্রযুক্ত হইত। বজ্র ও বিদ্যুতের বিবাহ-পরিকল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রেরই উদ্ভাবনা—হেমচন্দ্র দ্বিতীয় খণ্ডে এই নির্দেশকেই কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

প্রথম খণ্ড আলোচনা শেষ করিবার পূর্বে বঙ্কিম ছন্দ-সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা আমাদের মনে সংশয়াত্মক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে যাঁহার মনীষা এত ক্ষুরধার ও বিচিত্রগতি ছন্দ-সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এত স্থূল ও অদূরদর্শী কেন? মহাকাব্য-রচনায় একই ছন্দের প্রয়োগকে তিনি নিন্দনীয় মনে করিয়াছেন ও ছন্দের বৈচিত্র্য-সম্পাদনকেই সমর্থন করিয়াছেন। ছন্দপ্রয়োগ বিষয়েও তিনি মধুসূদন-অপেক্ষা হেমচন্দ্রের

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের নিকট যে ছন্দবৈচিত্র্য হেমচন্দ্রের কাব্যের মহাকাব্যীয় মর্যাদালাভের প্রধান অন্তরায়, বঙ্কিমের নিকট তাহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। হয়ত মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ সংস্কার তিনি সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এমন কি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগেও হেমচন্দ্র দেশী রীতির অনুবর্তন করিয়া মধুসূদন অপেক্ষা সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। এই মন্তব্য পড়িতে পড়িতে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চিন্তা করি যে সমালোচনা-সম্রাটেরও লৌহবর্মে কোথাও একটা ভ্রান্তির প্রবেশদ্বারস্বরূপ ফাঁক ছিল। পুনশ্চ তিনি অক্ষরবৃত্ত অপেক্ষা সংস্কৃত কবিতার রীত্যনুযায়ী মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন ও ভারতচন্দ্র ও অধুনা-বিস্মৃত বলদেব পালিতের দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। "অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন।" আশ্চর্য, হোমারেরও কখন কখন ছন্দপতন ঘটিয়া থাকে।

'বৃত্রসংহার', দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিম পরিত্যক্ত আলোচনার সূত্র কুড়াইয়া লইয়া আবার প্রতিসর্গের ঘটনাধারা অনুসরণ করিয়াছেন ও উহার মধ্যে প্রশংসার্হ স্থলগুলি চিহ্নিত করিয়াছেন। দেবশিবিরের বর্ণনাকে বঙ্কিম "মণিময়" আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছেন। দধীচির আত্মবলিদানের দৃশ্য সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"সুশীতল সাগরবৎ এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে—ইহার অতলরসপ্রবাহে মন ডুবিয়া যায়।" ঊনবিংশ সর্গে বিশ্বকর্মার শিল্পশালা-বর্ণনায় হেমচন্দ্র যে অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশস্তিজ্ঞাপন উপলক্ষ্যে বঙ্কিম বলিয়াছেন, "সেই শিল্পশালায় প্রবেশ করিলে…(অগ্নির গর্জনে, মুদ্গরের আঘাতে, ধূমের তরঙ্গে, ধাতু-নিঃস্রবে, রবে, মহাকোলাহলে…) আমাদের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, কর্ণ বধির হইয়া যায়।" "ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ"—লাপ্লাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও হার্বার্ট স্পেনসরের উহার বিচিত্র ব্যাখ্যার আধারে বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র "কাব্যের মোহময় সুধা সঞ্চিত" করিয়া উহার চরম সৌন্দর্যবিধান করিলেন। রুদ্রপীড়ের নিধন-বার্তায় বৃত্র ও ঐন্দ্রিলার বিভিন্ন মানস প্রতিক্রিয়া উহাদের চরিত্রের সহিত সর্বাংশে সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশ সর্গে দৈত্যপুরীর উপর আসন্ন সর্বনাশের করাল ছায়া-বিস্তারের দ্যোতনায় হেমচন্দ্র যেরূপ শ্রেষ্ঠ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহার রসগ্রাহিতায় বঙ্কিমও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ সমালোচনাশক্তি উদাহৃত করিয়াছেন—"কৃতান্তের কালছায়া আসিয়া সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে, গভীর মানসিক অন্ধকারে অসুরপুরী গাহমান হইয়াছে—কালসমুদ্র উদ্বেলনোন্মুখ দেখিয়া কূলস্থ জন্তুসমূহের ন্যায় অসুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

এই বিস্তারিত আলোচনা শেষ করিয়া বঙ্কিম কাব্যের মূলনীতি ও 'বৃত্রসংহার' কাব্যের নিগূঢ় অর্থতাৎপর্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও কাব্যের ফলশ্রুতিনিরূপণে আশ্চর্য মর্মগ্রহণশক্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। এই জীবনরহস্যভেদের মানদণ্ডে তিনি 'বৃত্রসংহার'-এর সহিত 'পলাসির যুদ্ধ'-এর তুলনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন " 'পলাসির যুদ্ধ' উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, কিন্তু কতকগুলি সুমধুর, ওজস্বী গীতিকাব্যের সংকলন মাত্র।" 'বৃত্রসংহার'-এর প্রথমে আমরা বাহুবলের আস্ফালন ও অসুরশক্তির জয় দেখিয়া জগতের নীতি-বিধানের প্রতি কতকটা সংশয়াপন্ন হইয়া পড়ি। কিন্তু পরে বুঝিতে পারি যে ধর্মবলের সহায়তা ভিন্ন কেবল কায়িক শক্তি ক্ষণভঙ্গুর ও অকিঞ্চিৎকর। কবি আমাদের এই নীতিতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন শাশ্বতনীতিনিয়মিত অন্তর্জগতের সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা। সৌন্দর্যের কাব্যানুগত সংজ্ঞা দিতে গিয়া বঙ্কিম বলিয়াছেন, "যে কোন মহৎধর্মের সহিত যে কার্য কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট তাহাই সুন্দর।......সুন্দর কার্যই সুনীতিসঙ্গত।" পরশুরামের ধর্মানুরোধে মাতৃহত্যাও এই সৌন্দর্যের সংজ্ঞায় পড়ে। অনেক কার্য স্বতঃসুন্দর না হইয়াও উন্নতনীতিসংশ্লিষ্ট হইয়া সুন্দর হইয়া উঠে। "অনেকগুলি জটিল ও দুরূহ নৈতিকতত্ত্ব অনির্বচনীয়-সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমাময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য; কিন্তু সৌন্দর্য নৈতিকতত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন।" 'বৃত্রসংহার'-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই বিশ্ববিধানের পরিস্ফুটনের দ্বারা সৌন্দর্যসৃষ্টি, জীবনতত্ত্বের বৃন্তবিধৃত সৌন্দর্যপুষ্পের চয়ন। এই কাব্যের রঙ্গভূমিতে অতিমানব-শক্তি-বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াশীলতার জন্য কবি এই অলৌকিক শক্তিরও অপ্রাচুর্য, শাশ্বত

নীতিবলের নিকট ইহারও অভিভব দেখাইবার বিশেষ স্থযোগ পাইয়াছেন। এই যে সর্বব্যাপী, সর্বাতিশায়ী ঐশী নিয়ম ইহা আরও কতকগুলি স্থকুমার, মানবহৃদয়ানুকূল গৌণ তত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া কাব্যে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। শুধু ধর্মানুমোদিত বাহুবলের প্রসঙ্গ কাব্যের স্থূলচর্ম বা মেরুদণ্ড—ইহার সহিত দেবগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধারকামনায় উদাহৃত দেশবাৎসল্য, স্ত্রীবুদ্ধির অতি-অহঙ্কারপ্রসূত প্রলয়ঙ্করিতারূপ সাংসারিক ভূয়োদর্শিতা, দধীচির পরোপকারিতা ও নিয়তির অচিন্তনীয়, অপরিমেয় শক্তিরহস্য মিশিয়া কাব্যের মূল তত্ত্বের উপর রক্তমাংসের লাবণ্য ও প্রাণলীলার ছন্দস্থষমা অর্পণ করিয়াছে। এইখানেই কাব্যের মহত্ত্বের মূল উৎস।

সর্বশেষে কাব্যমধ্যে স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য ও অঙ্কনকুশলতা যে বাঙ্গালী জীবনের বাস্তব রূপ হইতে লব্ধ কবি-প্রেরণা ইহাই বঙ্কিম বিস্তারিত আলোচনা-সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। "বাঙলার স্ত্রীগণ রমণীকুলের গৌরব; বাঙলার পুরুষগণ পুরুষনামের কলঙ্ক।" স্থতরাং বঙ্গকবি স্বাভাবিক কারণেই পুরুষচরিত্র অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্র অঙ্কনেই অধিকতর পারদর্শী হইবেন। ইহার উদাহরণস্বরূপ তিনি শচী ও ইন্দুবালা চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শচীর স্বভাবমহিমার সহিত প্রমীলার কাব্যানুরঞ্জিত প্রেমসোহাগিনী ও সংগ্রামোন্মুখা মূর্তি তুলনীয় নহে। আর "শচীর পার্শ্বে ইন্দুবালা দেবদারুতলায় নবমল্লিকার ন্যায়, সিংহীর অঙ্কলালিত হরিণশিশুর ন্যায় অনির্বচনীয় স্থকুমার।" বঙ্কিমের স্ত্রীপুরুষের আপেক্ষিক উৎকর্ষবিষয়ক অভিমত হয়ত স্ত্রীজাতির অতি-অনুরাগী ছাড়া আর সকলে সার্বভৌম সত্যরূপে মানিতে প্রস্তুত হইবেন না; তথাপি ইহার মধ্যে যে সমাজতত্ত্বঘটিত আংশিক সত্য আছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। হয়ত বর্তমান সমাজে স্ত্রীপুরুষের সাম্যবোধ-প্রসারের ফলে আধুনিক মহিলাসমাজ এই অতিস্তুতির যুক্তিগত সমর্থন হারাইবেন। বঙ্কিমের এই সমালোচনা সে যুগের বিচারে 'বৃত্রসংহার'-এর কিরূপ উত্তুঙ্গ স্থান ছিল তাহার নিদর্শন। বঙ্কিমের সহিত আমাদের মতভেদের যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে সে সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা পোষণ করিয়াও আমরা যে সমালোচনার উচ্চতম আদর্শ হইতে স্খলিত হই নাই সে বিষয়ে কি আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি?

হেমচন্দ্রের ‘দশমহাবিদ্যা’-র ‘বান্ধব’-এ প্রকাশিত সমালোচনাটি একেবারে হুবহু বঙ্কিম-রীতির অনুসরণ। আলোচনা-প্রসঙ্গে সমাজ-কল্যাণের তারতম্য-ভিত্তিক কাব্যোৎকর্ষ-নির্ণয়ের যে মানদণ্ড উপস্থাপিত হইয়াছে তাহাও সম্পূর্ণ বঙ্কিম-প্রভাবিত। এই মানদণ্ড-স্থিরীকরণে একটা অত্যাবশ্যক কথাই বাদ গিয়াছে—সেটা হইল কবিতাটি কাব্যগুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে কি না। উৎকৃষ্ট কবিতার শ্রেণীবিভাগে মানবের ধর্ম ও নীতি-বিধায়ক কাব্যকে না হয় শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া গেল। কিন্তু কাব্যগুণেরই যদি অভাব থাকে, তবে মানব-কল্যাণের আদর্শ দ্বারা তাহা পূরণ করা যায় কি না তাহাই জিজ্ঞাস্য। ‘দশমহাবিদ্যা’-র পৌরাণিক আখ্যান কেমন করিয়া ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের দ্বারা নূতন তৎপর্যমণ্ডিত হইয়াছে, দেবীর দশরূপ-কল্পনায় পুরাণের অনুস্মৃতির সহিত কবির মৌলিক চিন্তা কি পরিমাণে মিশ্রিত হইয়াছে এবং এই কল্পনার যথাযথতাই বা কিরূপ তাহার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও মনীষাপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে আদৌ কবিতা হইয়াছে কি না, ইহার কাব্য-গুণের নিদর্শন সত্যই উৎকৃষ্ট-পর্যায়ভুক্ত কি না এই মৌলিক প্রসঙ্গটিই বাদ পড়িয়াছে। কাব্যে ছন্দবিন্যাস ভাবানুযায়ী হওয়ায় কবিকে প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাবের প্রকাশ যে অতি দুর্বল, শব্দযোজনা যে অনেক স্থলেই অনুপযোগী, মনন বা আবেগের প্রবাহ যে প্রায় সর্বত্র নিরুচ্ছ্বাস ও বাধা-বিড়ম্বিত, কবি-কল্পনা যে কোথাও স্বচ্ছন্দচারী নহে, আক্ষরিক নীরস অর্থকে ছাড়াইয়া ভাবব্যঞ্জনা যে বিশেষ কোথায়ও স্ফুরিত হয় নাই—এ বিষয়ে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কোন উল্লেখমাত্র নাই। বাস্তবিক ‘দশমহাবিদ্যা’ অতি বিরল স্থল ব্যতীত অন্যত্র অতি আড়ষ্ট ও লালিত্যহীন রচনা—দেবীর দশরূপের মধ্যে কোনটিই কবির তুলিকায় চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় থাকিতে পারে, সাধকের ভক্তিপ্রবণ চিত্তের ছাপ থাকিতে পারে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-প্রয়োগের অভিনবত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত গুণের তুলনায় কবিত্বশক্তি যে অত্যন্ত গৌণ তাহা নিঃসন্দেহ। বঙ্কিম-সমালোচনার আদর্শ যে সকলের অনুসরণীয় নহে, এই প্রবন্ধটি সেই বিষয়েই আমাদের সতর্ক করিয়া দেয়।

৬

হেমচন্দ্রের পরে নবীনচন্দ্রই সর্বাধিক আলোচিত কবি। তাঁহার 'পলাসীর যুদ্ধ' 'রঙ্গমতী' ও বিশেষত কাব্যত্রয়ী সমকালীন সমালোচকগোষ্ঠীকে সপ্রশংস বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়াছিল। তাঁহার বর্ণনা-শক্তি, গৈরিক নির্ঝরিণীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত আবেগের বেগবান প্রবাহ, পরিকল্পনার বিশালতা ও রচনাভঙ্গীর বলিষ্ঠ সরলতা তাহার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সমালোচকবর্গকে প্রায় অন্ধ করিয়াছিল। বাইরনের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য শুধু রচনাভঙ্গীমূলক নহে, উভয়ের অন্তরে একইরূপ দুর্দমনীয় আবেগের প্রপাত প্রবাহিত, মৌলিক প্রকৃতিতে উভয়েই অনেকটা এক। সুতরাং সে যুগে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, বাংলা কাব্যের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি যে অনেকটা তাঁহার উপর নির্ভরশীল এই ধারণা বহু-প্রচলিত ছিল, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। তাঁহার গীতিকবিতার বিস্তর প্রশংসা করা হইয়াছে—কিন্তু বর্তমান যুগের মানদণ্ডে তাঁহার বিশুদ্ধ গীতিপ্রতিভার পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। তিনি মূলত আখ্যান-কাব্যের কবি, আখ্যান-কাব্যের বিস্তার ও সরল গতিপ্রবাহই তাঁহার কবিধর্মানুগত; তাঁহার যাহা কিছু গীতিকবিতা তাহা আখ্যানবৃন্তে বিধৃত ভাবপুষ্পের ন্যায়, আখ্যায়িকা-সরোবরে স্বতঃ-উদ্ভূত পদ্মের ন্যায় বিকশিত হইয়াছে। 'অবকাশরঞ্জিনী'র ন্যায় বিশুদ্ধ ভাবমূলক ও আখ্যানসম্পর্কহীন কাব্যে তাঁহার গীতিপ্রবণতা দৃঢ়-আশ্রয়চ্যুত লতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত ও অতিপল্লবিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি প্রকৃতপক্ষে গীতিমিশ্র আখ্যানকাব্যেরই কবি, এবং তাঁহার দোষগুণ সবই এই মানস প্রবণতার সহিত সংশ্লিষ্ট। বহু-বিস্তৃত আখ্যায়িকার গ্রন্থন-নৈপুণ্য তাঁহার বিশেষ ছিল না; শিল্পিজনোচিত একাগ্রতা ও সামগ্রিক লক্ষ্যের সহিত তিনি ইহার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ স্থান নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তথাপি রোমাঞ্চকর কাহিনীর উদ্দীপনা, উহার দ্রুত গতির ছন্দানুবর্তনই তাঁহার কবিত্বশক্তির মূল উৎস ছিল। উহারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিজ কবিপ্রাণের অতর্কিত ভাবপরিবর্তন, তাঁহার হঠাৎ-উচ্ছ্বসিত আবেগমূর্ছনা, তাঁহার অসম কাব্যপ্রেরণার ক্ষণিক তরঙ্গশীর্ষারোহণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার কাব্যিক অমরতার পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার

অ-গভীর, অথচ ভাবোচ্ছ্বাসময় প্রকৃতি-প্রীতি, বহিঃপ্রকৃতির ক্রীড়াশীলতা ও দুরন্ত আবেগের সহিত মানবমনের সাম্যানুভূতিও তাঁহার কাব্যোৎকর্ষের আর একটি উপাদান। আমরা 'আলঙ্কারিক' শব্দটি সাধারণত অপ্রশংসাসূচক অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি; উহার মধ্যে কবিতার সূক্ষ্মতর, অন্তর্মুখী উৎকর্ষের অভাবই যেন ব্যঞ্জিত হয়। কিন্তু অলঙ্কারের একটা প্রশংসার্হ প্রয়োগও আছে; কাব্য সম্পূর্ণভাবে অন্তর্জীবন-নির্ভর হইবার পূর্বে উহার মধ্যে যে একটা বলিষ্ঠ বহির্মুখী প্রেরণার সার্থক প্রকাশ থাকিতে পারে, তাহাই অলঙ্কার-সাহায্যে রূপ লাভ করে। আধুনিক বাংলা কাব্য জন্মিয়াই প্রৌঢ়; প্রথম যৌবনের আতিশয্য, বাহিরের দিকে আত্মপ্রসারণ, ভাব অপেক্ষা রূপের প্রতি পক্ষপাত, সৌন্দর্যস্রোতে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন অবগাহন—বাংলা কাব্যে ইহাদের উদাহরণ বড় একটা নাই। নবীনচন্দ্র এই যৌবনধর্মের অনিন্দ্য না হইলেও একজন শ্রেষ্ঠ প্রতীক; তাঁহার কাব্যে অলঙ্কার এক অনন্য কবিগুণ-বিকাশের হেতু হইয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবিপ্রকৃতি সম্বন্ধে উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে বিস্ময়ানন্দ-প্রকাশের যতটা অবসর আছে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বা পাঠকের নিকট অনন্যভূত কোন রহস্য-উদ্ঘাটনের তাদৃশ অবসর নাই। তাঁহার কবিতা সকলেরই বোধগম্য, সর্বচিত্তে আনন্দ-বিধায়ক; সমালোচকের একমাত্র কাজ হইল সকলের অনুভববেদ্য এই আনন্দটির প্রকৃতি-ও-কারণ-নির্দেশ। 'পলাসীর যুদ্ধ'-এর উপর কালীপ্রসন্ন ঘোষের আলোচনা ঠিক এই জাতীয়। সমালোচক প্রথম কাব্যটির কল্পনার মৌলিকতার উল্লেখ করিয়া সর্গগুলির বিষয় ও কাব্যরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথম সর্গের গাম্ভীর্য একটু অসাধারণ প্রকৃতির—বিষাদ-উদ্দীপনের মধ্যে আশা ও আতংকের দ্বন্দ্ব ও শোকের ক্রমঘনীভূত ছায়াপাত এই গাম্ভীর্যের হেতু।… যেন বাঙলার দুঃখ প্রকৃতির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত চরাচরের চিত্তে এক রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার উদ্রেক করিয়াছে। জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবনে ষড়যন্ত্রকারীদের বর্ণনা একাধারে স্ফুটোজ্জ্বল চিত্রসৌন্দর্য ও বিভিন্নরূপ চরিত্রের আভাসনে মনোজ্ঞ। দ্রুত ও অতর্কিত চিত্রপরিবর্তনদক্ষতাও লেখকের বিচিত্র-অঙ্কনপটুতা ও কৌতূহল-উদ্দীপনশক্তির নিদর্শন। জগৎশেঠের চক্রান্ত-

কুটিল, হিংসা-দ্বেষ-চতুরতা-আত্মগোপনশীলতার উৎসারে ধূম্র-আবিল মন্ত্রণালয় হইতে ক্লাইভের রূপ ও চরিত্রবর্ণনা ও ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবির্ভাব ও ভবিষ্যতের যবনিকা-উত্তোলন—এই দুই দৃশ্য যেন জগতের দুই বিপরীত সীমায় অধিষ্ঠিত। পলাসীর যুদ্ধে চিন্তাশীলতা নাই, সতর্ক প্রমাদবর্জন-প্রবণতা নাই। আছে বল্‌গাহীন হৃদয়োচ্ছ্বাসের তরঙ্গের পর তরঙ্গোৎক্ষেপ, সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি-অসতর্ক প্রয়োগের মধ্য দিয়া মনে এক অনির্বচনীয় আকুলতার সঞ্চার। কবি হঠাৎ এক প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যান এবং সমস্ত প্রসঙ্গকে এক অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য-সূত্রে গ্রথিত করার পরিবর্তে তাৎকালিক প্রসঙ্গেই একাত্মভাবে বিলীন হইয়া যান। কবির এই অসাবধানতার মধ্যেই তাঁহার সহৃদয়তার পরিচয় নিহিত। "তরংগের পৃষ্ঠে তরংগের ন্যায় উদ্বেল হৃদয়-সমুদ্রে মুহুর্মুহু ভাব-পরিবর্তন হইতেছে, আর আত্মবিস্মৃত কবি সেই সমস্ত চঞ্চল ভাবকে বর্ণতুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন।" তাঁহার কবিতা চল-সৌদামিনীর ন্যায় স্ফূর্তিমতী ও হৃদয়-গ্রাহিণী। নবীনচন্দ্রের কাব্যরূপের ইহা একটি চমৎকার বাণীচিত্র। কবি নৃত্যগীতের তরল রস বর্ণনার মধ্যেও এক অস্ফুট, অথচ সদা-ব্যাপ্ত বিষাদের ছায়া মিশ্রিত করিয়াছেন, এবং আদি ও করুণ রসের চিরপ্রথাগত বিরোধকে এক আশ্চর্য সমন্বয়ে গ্রথিত করিয়াছেন।

'পলাসীর যুদ্ধ'-এর চতুর্থ সর্গের যুদ্ধ-বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে অপরূপ ও অনন্য-সাধারণ। এরূপ ওজস্বী ও রক্তে উন্মাদনা-সঞ্চারী রচনা অন্যত্র দুর্লভ। দুঃখের বিষয় আমরা আজকাল প্রেম ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অনুভূতির শমরসপ্রধান বর্ণনায় এত অভ্যস্ত হইয়াছি, যে এই রণবাদ্যের উদ্দীপনাময় সঙ্গীত আর আমাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ লাভ করে না। এই সর্গের শেষে অস্তাচল-গামী সূর্যের প্রতি কবির যে খেদোক্তি তাহা অনুশোচনার গভীরতায় ও ভাবসন্নিবেশের যাথার্থ্যে বাংলা কাব্যে অতুলনীয়।

সমালোচনার পরিসমাপ্তিতে সমালোচক কাব্যের কয়েকটি ক্ষুদ্র ত্রুটি ও পরানুকরণের নিদর্শন দিয়াছেন। গুরুতর ত্রুটির মধ্যে একটির উল্লেখ করিয়াছেন—"ইহাতে পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ়নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন এক চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না"।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১২৮৮ সনে 'রঙ্গমতী'র উপর একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্রের কাব্যাবলীর মধ্যে 'রঙ্গমতী'র স্থান আজকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। ইহার গ্রন্থনশিথিলতা, স্থানে-অস্থানে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য ও রোমান্সসুলভ অবাস্তবতা ইহার কাব্যোৎকর্ষের পরিপন্থী-স্বরূপ। এরূপ একখানি অসার্থক কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা নবীন-চন্দ্রের সমসাময়িক প্রতিষ্ঠারই পরিচয়। এই কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে নিসর্গ-বর্ণনায় কুশলতা, ও নীতিকবিতার উন্নত মানই প্রধান কারণরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। ইহার আখ্যান-বস্তুর গ্রন্থনে প্রাসঙ্গিকতা ও পারম্পর্যের অভাব ও স্বপ্নকল্পনা ও বাস্তববোধের অসংলগ্ন সংমিশ্রণ—ইহার প্রধান দোষ—সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। সর্বোপরি আশ্চর্য এই যে 'পলাসীর যুদ্ধ'-এর সহিত তুলনায় সমালোচক ইহার মধ্যে অগ্রগতির নিদর্শন উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি প্রথমোক্ত কবিতায় বিশ্লেষণ ও পরবর্তীটিতে আশ্লেষণের পরিচয় পাইয়াছেন। " 'পলাসীর যুদ্ধ' কেবলমাত্র সুপদ্যের সমষ্টি ; তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। 'রঙ্গমতী কাব্য'-এর কেন্দ্র আছে, বীজ আছে, সুতরাং কবি কাব্যসোপানে আর এক পদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন"। এইরূপ বিচার আমাদের নিকট অযথার্থ ও বিভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। সামগ্রিক বিচারে 'পলাসীর যুদ্ধ' 'রঙ্গমতী' হইতে যে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুরুক্ষেত্র'-এর সমালোচনা আধুনিক যুগের সঙ্গে তাঁহার ব্যবধানই মর্মান্তিকভাবে প্রকট করে। হীরেন্দ্রনাথ কাব্যটির শব্দবিন্যাস, ছন্দসঙ্গীত, উপমা-প্রয়োগ, রসবৈচিত্র্য-সম্পাদন ও চরিত্রের উদাত্ত কল্পনা—এই সমস্ত দিক হইতেই আলোচনা করিয়া কাব্যটির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়াছেন। মনে হয় যে তিনি হিন্দুধর্মের গৌরবময় আদর্শের দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হইয়াছিলেন, শুধু ভাবগৌরবের প্রতি এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ কবিত্বশক্তির বিচারকে গৌণ স্থান দিয়াছিলেন ও অতিরঞ্জিত ভাবপ্রবণতা ও সংযত-গম্ভীর আবেগ-প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসময়তা যে জোয়ারের জলের ন্যায় শীঘ্রই নিঃশেষিত হয়, বাগ্‌বিস্তারই যে স্থায়ী আবেগসঞ্চারের সৃষ্টি

উপায় নহে, স্বল্পপরিমিত, ব্যঞ্জনাগর্ভ উক্তিই যে পাঠকচিত্তে প্রভাববিস্তারে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ এই সাহিত্যিক সত্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। হয়ত ইহার মূলে সে যুগ ও এ যুগের মনোভাবমূলক পরিবর্তন-রূপ গভীরতর কারণ বর্তমান। যে পাঠকগোষ্ঠীর হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ও অত্যাজ্য সংস্কারে পরিণত অনুরাগ আছে তাহাদের নিকট ভাবানুষঙ্গের অনিবার্য পরিণতিরূপে এই আদর্শের জয়গান এক অনুকূল গ্রহণশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করিবে—অতি পবিত্র মন্ত্র-আবৃত্তি বা কীর্তনসঙ্গীত যেমন ভক্তের অন্তরে এক প্রবল,, সর্বগ্রাসী ভাবহিল্লোল বহাইয়া দিয়া তাহার সাহিত্যিক বিচারবুদ্ধিকে, নির্লিপ্ত রসবোধকে নিমজ্জিত করে, এ ব্যাপার অনেকটা সেই প্রকারের। কিন্তু যে সমস্ত আধুনিক পাঠকের মনে সেই প্রবল ভক্তিসংস্কার অনুপস্থিত, যাঁহারা নিছক কাব্যোৎকর্ষ ও অপ্রমত্ত সঙ্গতিবোধের মানদণ্ডে কবিতার বিচার করেন, তাঁহাদের অভিমত যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার রূপ গ্রহণ করিবে না তাহা সহজেই অনুমেয়।

সমালোচক কাব্যটির শব্দবিন্যাসকৌশল ও উপমাপ্রয়োগনিপুণতার যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাদের সব কয়টিই যে প্রথম শ্রেণীর তাহা স্বীকার করা যায় না। এগুলির উৎকর্ষ স্বীকার করিলেও সমগ্র কাব্যটিতে যে অসম প্রেরণা, যে অপটু শব্দনির্বাচন, উচ্ছ্বাসের যে অসংযম ও ভাবের যে সমুন্নতিহীন সাধারণতা আছে তাহাতে উহাকে কোন মতেই প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায় না। বিশেষত হীরেন্দ্রনাথ কাব্যের ছন্দ-মাধুর্যের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে অপ্রযুক্ত মনে হয়—কাব্যটির ছন্দপ্রবাহে আড়ষ্টতা ও গতিশৈথিল্য উহার প্রধান ত্রুটি। ৪২৮ পৃষ্ঠার শেষে রণকোলাহলের বর্ণনামূলক উদ্ধৃতিটি যে মধুসূদন এমন কি হেমচন্দ্রের সহিত তুলনায় অত্যন্ত খঞ্জগতি ও স্থূল শব্দপ্রয়োগে ব্যঞ্জনাহীন তাহা পড়িলেই পরিস্ফুট হইবে। রসসৃষ্টির নিদর্শনজ্ঞাপক উদ্ধৃতিগুলিও ঠিক সার্থকতার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণীয় নহে। ৪৩০-৪৩২ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত জরৎকারু, সুভদ্রা ও শৈলজার উক্তিসমূহ কাব্যগুণরিক্ত, অলঙ্কারমুখর ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র—উহাদের মধ্যে কবিকৃতির স্মরণীয় সূক্ষ্মতা বা আবেগের মর্মস্পর্শী প্রকাশ লক্ষণীয় নহে। অভিমন্যু-উত্তরার যে কৈশোর প্রেমের আতিশয্য সমালোচককে

প্রশংসা-বিহ্বল করিয়াছে তাহা আধুনিক পাঠকের রুচিতে অশোভন ও বিষয়-মহিমার অনুপযোগী মনে হয়। মনে হয় যে গার্হস্থ্য জীবননিষ্ঠা ও বাল্য-বিবাহানুষ্ঠান আমাদের জীবনচর্যা হইতে যে পরিমাণে অপসারিত হইতেছে, সেই পরিমাণে কৈশোর প্রেমের খুঁটিনাটি ছেলেমানুষী আমাদের কাব্য-সাহিত্য হইতেও বর্জিত হইতেছে। সেই জন্যই বোধ হয় আমরা অভিমন্যু-উত্তরার প্রেমাভিনয়ে সেরূপ উৎসাহিত হইতে পারি না। উত্তরার শোক মর্মস্পর্শী সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রমীলার স্বল্পভাষী বিদায়োক্তি যে উত্তরার শোকোন্মত্ত প্রগল্‌ভতা হইতে উন্নততর শিল্পকলার নিদর্শন তাহা নিঃসন্দেহ।

কাব্যের চরিত্রায়ন সম্বন্ধেও সমালোচক সমভাবেই উচ্ছ্বসিত। এখানে সত্য সত্য চরিত্রসৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। কবি পুরাতন চরিত্রকেই নিজ যুগোপযোগী ভাবাদর্শ অনুযায়ী রূপ দিয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে যে দিব্য প্রজ্ঞার রহস্যময় ইঙ্গিত ছিল, তাঁহার মহনীয় লীলার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত ভক্তিপ্রস্রবণের যে প্রথম ক্ষীণ ধারার প্রারম্ভিক স্ফুরণ ছিল, নবীনচন্দ্রের কাব্যে তাহাই সুস্পষ্ট ও পরিণত রূপ লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণ এখানে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ও ভারতরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতার আদর্শস্বপ্নবিভোর দেশপ্রেমিকরূপে দেখা দিয়াছেন ও তাঁহার প্রবর্তিত ভক্তিধর্ম নরনারীর হৃদয়কে শত অজস্র ধারায় প্লাবিত করিয়া সাগরসঙ্গমসন্নিহিতা মহাস্রোতস্বিনীর বেগ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের যে প্রেমধর্ম শ্রীকৃষ্ণকে দেবতার সুদূর, অনধিগম্য আসন হইতে নামাইয়া ভক্তহৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে, সাধারণ মানবের প্রতিদিনের চিন্তা, কর্ম ও আত্মবিস্মৃত আহ্বান-আকূতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, নবীনচন্দ্রের কাব্যের নর-নারী, তাঁহার সুভদ্রা, শৈলজা, সুলোচনা, এমন কি প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ের জ্বালায় কৃষ্ণদ্বেষিণী জরৎকারু পর্যন্ত সেই ভক্তি-স্রোতের বিস্তৃতীকরণের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে এই কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অবতরণের, কৃষ্ণলীলার জ্ঞানগম্ভীর, তত্ত্বজটিল, মহান কর্মসাধনার উৎস হইতে নামকীর্তনের সহজ, সরল, আবেগপ্লাবিত আত্মসমর্পণের শেষ-পর্যায়-পরিণতির ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। যে যুগে আদর্শকল্পনাপ্রভাবিত ভাবান্তরঞ্জন প্রেমের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ও আমূল চারিত্রিক পরিবর্তনের

সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিত, জীবন-অভিজ্ঞতার বাষ্পবেগ-উৎক্ষিপ্ত হইয়া মানুষ মানবিকতা হইতে দেবত্বে উন্নয়নের অনায়াস নভোবিহারের স্বপ্ন দেখিত, সুভদ্রা ও শৈলজা সেই নিঃশেষে অবসিত রোমান্টিক যুগের প্রতিনিধি। বাঙলা দেশ সে দিন পর্যন্তও এই জাতীয় চরিত্রে বিশ্বাস করিত ; এখন তাহারা বাস্তব জীবনে দুর্লভ বলিয়া কবি-কল্পনার কাছেও আবেদনহীন। স্পেনসারের উনা, ব্রিটোমার্ট, প্রভৃতি চরিত্রের ন্যায় ইহাদেরও কোন ব্যক্তি-চরিত্র নাই, ইহারা নির্দিষ্ট, নির্ভেজাল গুণের মূর্ত বিকাশ মাত্র। আমরা উহাদের চরিত্রের বিচার করি না, সার্থক কবিকল্পনা-প্রয়োগে, সুকুমার ভাব ও ভাষার সহযোগিতায়, উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শটি কিরূপ জ্যোতির্ময় অধ্যাত্ম সত্তায় সংহত হইয়াছে তাহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য। সুভদ্রা ও শৈলজা যে আদর্শ ভাবপরিমণ্ডলের অধিবাসী, তাহাদের ভাব ও ভাষা অনুরূপ সূক্ষ্ম, অপার্থিব, জ্যোতির্ময় উপাদানে রচিত বোধ হয় না। তাহাদের কথা-বার্তায় আছে স্থূল নীতিপ্রাধান্য, অক্ষমভাবে প্রকাশিত আদর্শবাদের আতিশয্য, সেবাধর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসমূলক মুখরতা। সুতরাং এই সমস্ত চরিত্রের পরিকল্পনার মহিমা কাব্যপ্রকাশের মধ্যে সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয় নাই, ঘূর্ণ্যমান ভাববাষ্প ভাস্বর জ্যোতির্মণ্ডলে সংহত হয় নাই। কাজেই কেবল আদর্শের প্রশস্তিজ্ঞাপন করিয়াই সমালোচকের কর্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। হীরেন্দ্রনাথ কাব্যটির কবিত্বগুণ সম্বন্ধে যেরূপ নিঃসংশয় হইয়াছেন, তাহাতে আধুনিক যুগের সমালোচক সায় দিবে না।

পূর্বোক্ত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশিত হইয়াছে বীরেশ্বর পাঁড়ে-র "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত'-প্রবন্ধে। ইহাতে লেখক নবীনচন্দ্রের পুরাণ-বিরোধী ঐতিহাসিক কল্পনার অসত্যতা ও স্ববিরোধের প্রতি তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন ও চরিত্র-পরিকল্পনায় অসঙ্গতির প্রতিও দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি কবিকল্পনার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াও, উহার যে কেবল সর্বজনবিদিত চরিত্রের উন্নয়নের জন্যই প্রযুক্ত হওয়া উচিত এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিযোগ এই যে নবীনচন্দ্র নিজ স্বৈরাচারী কল্পনা-প্রয়োগে প্রত্যেকটি চরিত্রের অবনতি ঘটাইয়াছেন। বিশেষত সুভদ্রা-চরিত্র যে অত্যুচ্চ আদর্শবাদের জন্য সনাতন পাতিব্রত্য-ধর্মের প্রতি অবহেলা করিয়াছে ইহাই

তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং হীরেন্দ্রনাথ হইতে বীরেশ্বরের মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দণ্ডায়মান। নবীনচন্দ্রের সত্যিকার স্থান এই অতি-প্রশংসা ও অতিনিন্দার মধ্যবর্তী স্তরে, এবং এই স্থান-নির্ণয়ে যেমন তাঁহাকে পুরাণের খুঁটিতে বাঁধা অবিধেয় হইবে, তেমনি তাঁহার উন্নত ভাবাদর্শকে কাব্যগুণ-সংশ্লিষ্ট না করিয়া প্রশংসা করিলেও অন্যায় হইবে। এই দুইটি প্রবন্ধ পরস্পরের অতিরেক সংশোধন করিয়া কবির সত্যমূল্যনির্ধারণে আমাদের সহায়ক হইয়াছে।

৭

কতকগুলি সমসাময়িক নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে যুগের নাট্যবিচার-পদ্ধতির কিছুটা ধারণা করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুঝলে কি না' নামক প্রহসনের বিচারে ঐ জাতীয় নাটকের উদ্দেশ্য ও সাফল্য-লক্ষণ সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা হইয়াছে। প্রহসনের দুই পরস্পর-সাপেক্ষ অভিপ্রায়—মনোরঞ্জন ও দোষ-উদ্‌ঘাটনের দ্বারা সমাজ-সংশোধন। এই আমোদ ও নীতি এরূপ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত যে যে দোষ-প্রদর্শনে শ্রোতার আমোদ না হয় তাহা প্রহসনের বিষয়রূপে অসার্থক। যে সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে নিন্দা ও উপদেশ অকাযকরী, প্রহসন-প্রযুক্ত শ্লেষ তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অমোঘ। প্রহসনকার নিজ উদ্ভাবনাশক্তির দ্বারা এক ব্যক্তির চরিত্রে একাধিক দোষ ও গুণের সমাবেশ করিয়া তাহাকে প্রকৃত ব্যক্তির হুবহু অনুকরণে পর্যবসিত হইতে দেন না; কিন্তু এই ছদ্মবেশের ভিতর দিয়াও আমরা প্রহসনের নায়কের মধ্যে কোন না কোন পরিচিত ব্যক্তির ছায়াপাত লক্ষ্য করি। সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রহসন একসঙ্গে ব্যক্তি-নির্ভর ও নৈর্ব্যক্তিক। এই প্রহসনে অটলকৃষ্ণ বসুর চরিত্রে নানা দোষের সমাবেশ দেখান হইয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত দোষের মধ্যে ধর্মের ভান বা ভণ্ডামির তেমন সুষ্ঠু প্রয়োগ হয় নাই। অন্যান্য দোষগুলিও কেন্দ্রসংহত না হইয়া যদৃচ্ছ আরোপের সমষ্টি মাত্র হইয়াছে। তাহার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের দৃশ্যও কৌতুককর হইলেও কৃত্রিম ও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, ঘটনার অনিবার্য পরিণতিরূপে প্রতিভাত হয় না। প্রহসনটি নিকৃষ্ট স্তরের; কিন্তু

উহার আলোচনায় প্রহসনের সাধারণ গুণনির্ণয়ের ও মন্তব্য-যাথার্থ্যের মধ্যে উন্নত সমালোচনাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে।

'বিবিধার্থসংগ্রহ'-এ ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৩ শকের মধ্যে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সমাজ-সচেতন নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটকাবলী আলোচিত হইয়াছে। ভূমিকায় সংস্কৃত-অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দিষ্ট নাটক বা রূপকের সাধারণ লক্ষণ ও ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সমালোচক সেই পটভূমিকায় 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমত প্রহসনটি আলঙ্কারিকগোষ্ঠীর নির্দেশ অনুযায়ী দুই অঙ্কে শেষ না হইয়া কেন ষড়ঙ্ক নাটকে সম্প্রসারিত হইয়াছে তাহার জন্য লেখক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন; বাংলা নাটকের মর্যাদাহীনতাই হয়ত ইহার কারণ এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। নাটকের জয়দেবীয় সঙ্গীতের প্রশংসা করিয়া লেখক অনৃতাচার্য ঘটকের চরিত্র-কল্পনায় অসঙ্গতি দেখাইয়া নিজ সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কুলপালকের কন্যাগুলির অ-বয়োচিত লঘুতা ও প্রগল্‌ভতাও তাহার নিন্দাভাজন হইয়াছে। বিবাহে নিমন্ত্রিতা প্রতিবেশিনী নারীদের হাস্যকৌতুক, ফলারের লক্ষণ, বিরহী পঞ্চানন ও অভব্যচন্দ্রের চিত্র—এ সমস্তই তাঁহার বাস্তবানুস্তৃতির সুন্দর নিদর্শনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আলোচনায় বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সরস বিশ্লেষণ আছে, সমগ্র নাটকের নাটকীয়ত্বের কোন সংশ্লেষমূলক বিচার নাই। 'বেণীসংহার'-নাটক প্রসঙ্গে সমালোচক উহার স্বভাবানুকারিতা, বিভিন্ন পাত্র অবলম্বনে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যস্ফুরণের প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু সুশৃঙ্খল নাটকীয় বিন্যাসে নাট্য-কারের ব্যর্থতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে ছাড়েন নাই। পয়ারাদি ছন্দের অনুবর্তন কাব্যে স্পৃহণীয় হইলেও যে অভিনয়যোগ্য নাটকে স্বাভাবিকতা ও রসস্ফূর্তির হানিকর এই অভিমত-প্রকাশও সমালোচকের বিচারবুদ্ধির নিদর্শন।

'রত্নাবলী' নাটকে অনুবাদের মধ্যেও যে লেখক "রসোদ্দীপক ভাব, সুচারু ভঙ্গী ও কোমলতম বাক্যবিন্যাসে" অপূর্ব পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন ও স্থানে স্থানে বাংলাভাষার রীতিসুলভ মৌলিক ভাব প্রবর্তনেও মূলের রসহানি করেন নাই তাহার জন্য তিনি সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। বিদূষক, রাজা উদয়ন, মহিষী বাসবদত্তা প্রভৃতি সকলের চরিত্র ও সংলাপ

স্বাভাবিক ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। কিন্তু চরিত্রাঙ্কনে সাগরিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

সর্বশেষে তর্করত্নের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে নাট্যকার অভিনয়-সৌকর্যার্থ মূলের যে রসভাবাদি পরিবর্তন ও নূতন সন্নিবেশ করিয়াছেন সমালোচক লেখকের গুণমুগ্ধ হইয়াও তাহার সমর্থন করেন নাই। "আমরা কালিদাসে অন্যের ভাব আরোপিত হইলে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়া থাকি"। মূল-বহির্ভূত একটি গীতসন্নিবেশে নাট্যকার যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়াছেন। এই মন্তব্য ছাড়া নাটকটির নাটকীয় গুণের কোন বিচার হয় নাই—বোধ হয় ইহা কালিদাসের অনুবাদ বলিয়া ইহার নাটকীয়তার স্বতন্ত্র বিচার নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই সমালোচক মনে করিয়াছেন।

এই নাট্যসমালোচনায় যদিও স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও যথার্থ বিচারের চিহ্ন পাওয়া যায়, তথাপি ইহার মধ্যে সামগ্রিক রসানুভবশক্তি ও আঙ্গিকসন্নিবেশজ্ঞানের বিশেষ নিদর্শন নাই। ইহা এখনও প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হয় নাই এরূপ মন্তব্য অযৌক্তিক হইবে না।

৮

এইবার কয়েকটি একক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনার বিচার করা হইবে। প্রথম ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য কৃত বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'-র আলোচনা। ইহা আকারে সংক্ষিপ্ত ও ইহার মধ্যে কোন গভীর কাব্যতত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। তথাপি ইহার মধ্যেও সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আছে। প্রথমত, কাব্যটির জাতি-নিরূপণের চেষ্টা। "ভারতী দেবীর মূর্তি দ্বিবিধ ও তাহার অর্চনাও দ্বিবিধ।...শারদীয়া ভগবতীর ন্যায় তিনি কখনও স্থূল বাহনে অবতীর্ণ হয়েন; কখন 'সৌরখরতরকরজাল-সংকলিত' সিংহাসনেও অবতীর্ণ হয়েন।" বিহারীলালের কাব্য এই দ্বিতীয় প্রণালীর। 'বঙ্গসুন্দরী'র সূক্ষ্ম-ভাবতত্ত্বগঠিত, অশরীরীপ্রায় কাব্য-সত্তার এটি একটি চমৎকার নির্দেশ। দ্বিতীয়ত কাব্যবিচারে কাব্যের সামগ্রিক গঠন-সুষমাই প্রধান হওয়া উচিত —কোন অংশের সৌন্দর্যবিশ্লেষণ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নহে। এই মানদণ্ডে কাব্যটির বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে ইহাতে বঙ্গ-

নারীর যে কয়েকটি প্রকারভেদ দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে তাহা আকস্মিক চয়ন, কোন নীতিনির্দিষ্ট সমাবেশ নহে, ইহা রত্নগ্রথিত হার নহে, কয়েকটি রত্নের যোগসূত্রহীন একত্রীকরণ মাত্র। ছন্দের মাধুর্যের প্রশংসা করিয়া সমালোচক উহাকে 'চুটকি' জাতীয় বলিয়াছেন ; কাব্যমধ্যে কিছু প্রাঞ্জলতার অভাবও লক্ষ্য করিয়াছেন। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, অতীন্দ্রিয় ভাব হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অবতরণ-কৌশলেও কবি তাদৃশ পারদর্শী নহেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মোটের উপর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ না হইলেও কাব্যের মর্ম্মপ্রকাশক।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানস বিকাশ' নামে অধুনা-বিস্মৃত কবিতাগ্রন্থের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা তাঁহার অন্তর্ভেদিতা ও দূরপরিক্রমা যুগপৎ এই উভয় শক্তিরই পরিচায়ক। তাঁহার মনন যে কত গভীর ও সুদূরবিসর্পিত তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই কবিতাগুচ্ছকে অবলম্বন করিয়া তিনি ভারতীয় কাব্যের সমাজবিবর্তনানুসারী প্রকৃতিভেদের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যুগযুগান্তরসঞ্চারী মনীষা ও ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত। রামায়ণ অনার্যবিজয়ী আর্যজাতির প্রথম নীতিগাথা ; মহাভারত বিজেতা আর্যজাতির প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। কালিদাসের মহাকাব্য ও নাটক সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত জাতির চরম উন্নতি ও আত্মপ্রসাদের নিদর্শন। ধর্ম্মমোহাভিভূত ও বাস্তববোধ ও বিচার-শক্তিহীন জাতির রচনা পুরাণসমূহ। আবার বঙ্গদেশে জলবায়ু ও জীবন-চর্যার প্রভাবে কাব্য অতিকোমলতাপূর্ণ, প্রণয়-মধুর, গার্হস্থ্য সুখে নিবিষ্টচিত্ত গীতিকবিতার রূপ লইয়াছে।

তাহার পর বাংলার গীতিকবিদিগকে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি প্রাধান্য আরোপের ভিত্তিতে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জয়দেব বহিঃপ্রকৃতিপ্রধান ও বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতিপ্রধান শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম নানা উপমা-প্রয়োগে এই উভয় কবির স্বরূপপার্থক্যটি চমৎকারভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। হয়ত এই উপমা-প্রয়োগের মধ্যে অতিরিক্ত কাব্যোচ্ছ্বাসের কিছুটা নিদর্শন আছে, কিন্তু ইহার পিছনে যে গভীর সত্যানুভূতি ও মর্মজ্ঞতার পরিচয় মিলে তাহা অনস্বীকার্য।

বঙ্কিম এই দুই শ্রেণী ব্যতীত আধুনিক ইংরেজীসাহিত্যপ্রভাবিত কবি-সম্প্রদায়কে এক নূতন তৃতীয় শ্রেণীতে স্থাপন করিয়াছেন। বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রবর্তনের এত অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ে এরূপ অভ্রান্ত মানদণ্ডের নির্দেশ, এরূপ আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় অভিমতের উপস্থাপনা বঙ্কিমের অসাধারণ অনুভবশক্তি ও অনুপ্রবেশশীলতার প্রমাণ। প্রাচীন কবিরা সঙ্কীর্ণ বিষয়-পরিধির মধ্যে প্রগাঢ় রসসৃষ্টি ও গভীর অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। "এখনকার কবিরা জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। ...তাঁহাদের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী ও দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদের কবিতাও বহুবিষয়িণী ও দূরসম্পর্ক-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে।...যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।" অল্প গভীরার্থক কথায় একটা সমস্ত যুগ-প্রবণতার মর্মোদ্‌ঘাটন এক বঙ্কিমচন্দ্রেই সম্ভব।

এই সাধারণ উপস্থাপনার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ বঙ্কিম আর একটি নূতন তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির যে সহজ সম্বন্ধ আছে তাহা আশ্রয় করিয়া যে সমস্ত কবি এই উভয় উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারেন তাঁহারা সুখী আর বহিঃপ্রকৃতির অতিরেকে ইন্দ্রিয়-পরতা (sensuousness), ও অন্তঃপ্রকৃতির অতিরেকে আধ্যাত্মিকতা (abstraction) দোষ জন্মে। অবশ্য বঙ্কিম আধ্যাত্মিকতা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আধুনিক সমালোচক সেই অর্থ বুঝাইতে "মননাধিক্য" বা "অমূর্ত ভাবের আতিশয্য" এইরূপ পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করিবেন।

এই উভয় প্রবণতার উদাহরণস্বরূপ তিনি একদিকে কালিদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির ও অপরদিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। মধুসূদনে জয়দেবীয় ইন্দ্রিয়পরতা ও আধুনিক চিন্তাবিস্তৃতির প্রভাব প্রায় সমপরিমাণেই মিশ্রিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি জয়দেব ও আধুনিক কবির রচনা হইতে কয়েকটি প্রেমকবিতা উদ্ধার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'মানসবিকাশে'র 'প্রেমপ্রতিমা'য় প্রেমের জয় আবেগ অপেক্ষা দূরপ্রসারিণী ও বহুবিষয়সঞ্চারিণী চিন্তাশক্তির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা'-র প্রেমকবিতা খানিকটা ইন্দ্রিয়ানুসারী, খানিকটা যুক্তিজালসমর্থিত। বৈষ্ণব প্রেমকবিতা ভাবে একনিষ্ঠ ও গভীর রসাত্মক।

বঙ্কিমের পরিসমাপ্তিসূচক মন্তব্য সবিস্তারে উদ্ধার-যোগ্য। "প্রথমে, জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতিভক্তি ইন্দ্রিয়পরতায় দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায়শেখরে বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্‌বর্তিনী ও সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সংকীর্ণ পথে—নিকট সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সংকীর্ণ পথে গতি অত্যন্ত বেগবতী। তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতায় সেই গতি পরিসর-পথবর্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই, নদীর স্রোতের ন্যায় বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে। চতুর্থ, 'মানসবিকাশে', আধ্যাত্মিকতাদোষ ঘটিয়াছে"। সমগ্র কাব্যমণ্ডল-বেষ্টনকারী, কবিসৃষ্টির রহস্যভেদী এরূপ সমালোচনা যে কোন দেশের সমালোচনা-সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত 'রাম বসুর বিরহ' ও 'পাক্ষিক সমালোচনা'-য় প্রকাশিত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর উপর প্রবন্ধ একই বিষয়ের দ্বি-মুখী আলোচনা। উভয়ত্রই প্রেম-কবিতার বিচার হইতেছে নীতি-আদর্শের মানদণ্ডে। রাম বসুর বিরহ-সঙ্গীত আদর্শ প্রেমের বর্ণনা নহে; ইহাতে প্রধানত ভোগসুখবঞ্চিতা নায়িকার তীব্র শ্লেষ ও প্রগল্‌ভ বাক্‌চাতুরী আছে। অনেক স্থলে এই পরকীয় প্রেম নীতিবিচারে অপবিত্র। এই প্রেমের খেদ ও অনুযোগ যৌবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, হৃদয়াবেগের পরিবর্তনশীলতা ও মিলনলিপ্সার অতৃপ্তিমূলক। ইহা স্বার্থপরও বটে, কেননা নায়কের দুঃখ জন্মাইয়া ইহা তাহার সহানুভূতি পাইতে ব্যগ্র। সুতরাং উচ্চ, আত্মবিসর্জনশীল প্রেমের কথা রাম বসুর বিরহ-সংগীতে নাই। এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিপ্রধান প্রেম তৎকালীন উচ্চ-আদর্শহীন সমাজ-মানসের সত্য প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই নীচু সুরের মধ্যে ইহার শিল্পকৌশল, প্রকাশের রমণীয়তা, "প্রতারিত অনুরাগের অভিমান-অনুযোগ-প্রকাশের এমন সুন্দর ভঙ্গী", সুরসিকা নায়িকার শ্লেষমধুর, তীক্ষ্ণ হৃদয়-উদ্‌ঘাটন বাংলা সঙ্গীতে বিরল। সমালোচনাটি

অল্পপরিসরের মধ্যে রাম বসুর বিরহগীতের সুরবৈশিষ্ট্য ও সামাজিক মনোভাবের যথার্থ অনুবর্তনশীলতার মনোজ্ঞ পরিচয়।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ভাবোচ্ছ্বাসময় গদ্যকাব্যের শীর্ষস্থানীয়-রূপে অভিনন্দিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন রুচিপরিবর্তনের ফলে ইহা প্রায় বিস্মৃতি-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবুকতাপূর্ণ প্রবন্ধগুলিও বোধ হয় একই কারণে অধুনা অনেকটা উপেক্ষিত। যুক্তি ও মননপ্রধান যুগে প্রেম লইয়া এতটা উচ্ছ্বাসের আতিশয্য আমরা ঠিক প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি না। মনে হয় যেন শিথিল-গ্রথিত গদ্যকাব্যের সচ্ছিদ্র পাত্র হইতে ভাবোচ্ছ্বাসের তরল রস চুঁইয়া পড়িয়া নিঃশেষিত হয়। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক সিদ্ধেশ্বর রায় কতকগুলি সাধারণ-সত্য-প্রকাশক মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে কবির হৃদয়-আলোড়নকারী ভাবরাশি তাঁহার নিজ কাব্যেই প্রকাশোপকরণের দুর্বলতা হেতু সম্যক্ অভিব্যক্ত হয় নাই; আবার শব্দসাহায্যে এই ভাব অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত করা আরও দুরূহ। ছন্দোবন্ধ ও সুললিত শব্দপ্রয়োগ কাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ নহে; কেননা ছন্দোবন্ধরচিত একটি মাত্র পংক্তিতে অলৌকিক কবিত্বের সারনির্যাস নিহিত থাকিতে পারে। আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া লেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষের নীরব কবির কল্পনার পুনরুক্তি করিয়াছেন, তিনি প্রকাশমাত্রহীন, অন্তরকন্দরগুপ্ত কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ উদ্ভট কল্পনাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। কবিহৃদয়ের তীব্র ও তড়িৎ-গতি ভাবসমূহ, ছন্দ-অলঙ্কারের সাহায্য বিনাও, অন্যের অনুভবনীয় হইতে পারে—তবে ছন্দ-অলঙ্কার থাকিলে তাহা সোনায় সোহাগা।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের রচনাটি এই জাতীয় ছন্দ-অলঙ্কারহীন কাব্যের নমুনা। তিনি শুধু ছন্দ নহে, বাক্যের ও কল্পনা-সহচরী চিন্তার বন্ধনও ছিন্ন করিয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কলাসংযমের সমস্ত নির্দেশকে অতিক্রম করিয়া নিজ স্বাধীন ইচ্ছার বশে দুর্দমনীয় স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। এবং ইহাই নাকি প্রকৃত কবিত্বের লক্ষণ। এইরূপ অদ্ভুত মতবাদের সহায়তায় কোন রচনার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না তাহা

সন্দেহের বিষয়। কাব্য কোন এক নিগূঢ় অন্তর্জগতের নিয়মের বশবর্তী না হইলে ইহা এক অসংলগ্ন খেয়ালের পর্যায়ভুক্ত হয়। ইহা যে প্রচলিত নিয়মের অতীত কোন এক আত্মপ্রেরণাসম্ভূত নিয়ন্ত্রণকে, প্রকাশের কোন একটা রহস্যময় আকর্ষণকে মানিয়া চলে তাহা নিঃসন্দেহ ও সেই নিগূঢ় কেন্দ্রশক্তির উদ্ঘাটনই প্রকৃত সমালোচনা।

দাম্পত্য সম্বন্ধ মনুষ্যজীবনে সার্থকতা লাভের একটা প্রকৃষ্ট উপায়, সেই জন্য প্রেম বা স্ত্রীপুরুষের মিলনাকৃতি একটা সার্বভৌম জাগতিক নিয়ম-রূপে কাব্যের উপযুক্ত বিষয়। প্রেম সম্বন্ধে বিস্তৃতি ও গভীরতার মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধিতা নাই—যে প্রেম যত গভীর হইবে তাহার বিস্তৃতিও সেইরূপ সর্বজীবব্যাপ্ত হইবে। এই আদর্শের মানদণ্ডে বিচার করিলে চন্দ্রশেখর বাবুর প্রেম সংকীর্ণ ও একমাত্র পাত্রে আবদ্ধ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে চন্দ্রশেখরের প্রেম যেমন শৈবলিনী-কেন্দ্রচ্যুত হইয়া সমুদয় জগতে, সর্বমানবপ্রীতিতে প্রসারিত হইয়াছে, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এ প্রেমের সেইরূপ মুক্তি ও বিশ্বজনীন প্রসার ঘটে নাই। সমালোচক ইহাকে গ্রন্থের ত্রুটি-রূপে গণ্য করিয়াছেন। গ্রন্থে কাব্য ও দার্শনিকতার অপরূপ সমন্বয় হইয়াছে। "এই গ্রন্থের ভাষা সুললিত, রসাক্ত, সহজ এবং পরিষ্কার" এবং স্বতঃই হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে যে কথ্যভাষার ব্যবহার হইয়াছে ইহা গ্রন্থের দোষ না হইয়া গুণরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। মাঝে মধ্যে অন্যভাষা হইতে শব্দ গ্রহণও দূষণীয় নহে। গ্রন্থে উচ্ছ্বাসের অকৃত্রিমতা ও প্রসঙ্গোচিত মাত্রাসঙ্গতি বিষয়ে কোন আলোচনাই হয় নাই। সমালোচক মূল গ্রন্থ অপেক্ষা উহার পটভূমিকার উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। এককালে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, অধুনাবিস্মৃত একখানি গ্রন্থের প্রতি সমকালীন মনোভাবের প্রকাশ-রূপেই এই আলোচনার যাহা কিছু মূল্য।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' বঙ্কিমের যুগোত্তরণী সমালোচনার সুরের প্রতিধ্বনি। দৃষ্টিভঙ্গী ও বক্তব্য বিষয় প্রায় এক, তবে অক্ষয়চন্দ্র গভীর তত্ত্ব অপেক্ষা ঘরোয়া সুর ও মজলিসী রসিকতারই দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে শেষ খাঁটি বাঙালী কবি—বঙ্কিমের এই ধূয়াই অক্ষয়চন্দ্রে বারবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের দুরন্ত, বেগবান, কৌতুকময় ভাষা, তাঁহার

রঙ্গময়, দ্বেষহীন ব্যঙ্গ সম্বন্ধেও অক্ষয়চন্দ্র নূতন না হইলেও সারবান্ কথা শোনাইয়াছেন। তাঁহার স্বভাববর্ণনে কৃতিত্বের পরিচয়স্বরূপ তাঁহার গঙ্গা ও বর্ষা বর্ণনামূলক কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। গুপ্ত কবির তপসে মাছ ও আনারস বর্ণনায় ভোগ্যবস্তুর সহিত যে তাঁহার আস্বাদনরসাত্মক অভেদত্ব সাধিত হইয়াছে তাহাও সমালোচক আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি সহজ বিশ্বাসের ন্যায়, তাহা কোন সাময়িক উত্তেজনাসঞ্জাত নহে, বা অপরের প্রতি বিরাগের উলটা পিঠ নহে। তাঁহার ঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরের পিতা হইবার সাধ, তাঁহার সহিত মুখোমুখি আলাপ করিবার আকূতি ও সময় সময় তাঁহার প্রতি ব্যঙ্গপ্রয়োগ কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্ব-সম্ভূত নহে, স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির প্রকাশ। এই আলোচনায় ভাবের মৌলিকতা অপেক্ষা ভঙ্গীর অন্তরঙ্গতাই সবিশেষ লক্ষণীয়।

রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রথম রসানুভবমূলক, ভাবতাৎপর্যময় অভিব্যক্তি প্রিয়নাথ সেনের 'মানসী' প্রবন্ধে। 'মানসী' যেমন রবীন্দ্রমানসের প্রথম পূর্ণায়ত প্রকাশ, প্রিয়নাথ সেনের সমালোচনাও সেইরূপ রবীন্দ্রকাব্যবিচারের প্রথম সার্থক প্রয়াস। 'মানসী' কবিতাসমূহে অপরূপ সৌন্দর্য-বৈচিত্র্যের সমাবেশ সমালোচককে মুগ্ধ করিয়াছে। 'মানসী' সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম উক্তি ইহাতে ভাষা ও ভাবের মধ্যে প্রকৃতির স্বহস্তরচিত আত্মীয়তা-বন্ধন ও ইহার মর্মগত সত্যবিষয়ক। এই ভাব ও ভাষা কবি-অন্তরে যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে, বিশ্বজগৎ হইতে যে সৌন্দর্যের বার্তা কবি-প্রাণে পৌছিয়াছে তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। "তাঁহার নির্বাচিত শব্দগুলির ভিতর যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য জাগিয়া রহিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ মোহ তাহাদের ভিতর বিদ্যমান"। ইহাদের মধ্যে বহির্জগতের সৌন্দর্যের সঙ্গে কবি-প্রাণের মুগ্ধ উপভোগ যেন এক অবিচ্ছেদ্য মিলনে জড়িত হইয়াছে।

'মানসী'-তে কবির ছন্দনির্মাণক্ষমতার আশ্চর্য নিদর্শন পুঞ্জীভূত। তিনি পুরাতন পয়ার ছন্দের মধ্যে নূতন জীবনীশক্তি ও স্রোতোবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন ও নূতন ভাবপ্রকাশের উপযোগী অসংখ্য নূতন ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছেন। ছন্দের মধ্য দিয়া অন্তরের অধীর, অনির্বচনীয় আকুলতা

উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচক 'মানসী'র বিভিন্ন কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের মধ্যে যে ব্যঞ্জনাশক্তির চরম বিকাশ হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'বর্ষার দিনে' কবিতায় "বর্ষার মেঘরুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাবৃটের চিরসন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং মানবজীবনের অনিবার্য বিষাদ সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে।" ইহার মধ্যে আছে "অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া ও পবিত্র, অপার্থিব বিষাদ।" "ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মন্থর গতিতে সন্ধ্যার হৃদয়-ধ্বনি অনুভূত হয়, এবং তাহার আলুলায়িত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে"।

রবীন্দ্র-কাব্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'অহল্যা'র ভিতর এই প্রথম সমালোচক "জড় জগতের সহিত একটি অসীম ধাতুগত সহানুভূতি অনুভব করিয়াছেন। উহাতে হুইটম্যানের সৃষ্টি-বিশাল প্রাণের সহিত যেন শেলীর গীতিপ্রাণতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে।" কবিতাটির মধ্যে "চিত্রের বিশালতা, স্নেহপ্রীতিময়ী কল্পনা, উষার ন্যায় শুভ্র আলোকময়ী দৃষ্টি ও কবি-হৃদয়ে বিশ্বব্যাপিনী করুণা" লক্ষ্য করিয়া সমালোচক উহার প্রাণ-রহস্যের মূল-গভীরতাতেই অবতরণ করিয়াছেন। "বিদায়" কবিতাটির আলোচনায় সমালোচক যেন কবির সহিত পাল্লা দিয়াই চিত্রকল্পনাগত উপমার সাহায্যেই উহার অনির্দেশ্য আবেদনটি ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে বক্তব্যটি যতটা পল্লবিত হইয়াছে ততটা পরিস্ফুট হয় নাই।

কাব্যগ্রন্থটির প্রেম-কবিতা সম্বন্ধে সমালোচক ইহাদের অকৃত্রিম, অথচ মধুর উন্মাদনায় পূর্ণ, সর্বপ্রকার আতিশয্যবর্জিত আবেদনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা একদিকে ইন্দ্রিয়লালসা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতার মিথ্যা আড়ম্বর হইতে সমভাবে মুক্ত। ইহাদের মধ্যে হৃদয়ের সত্য আবেগ প্রগাঢ় অনুভব-শক্তির সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহারা জীবনরসোচ্ছল। অতল মানব-হৃদয়ের মর্মোচ্ছ্বাস ইহাদের মধ্যে তরঙ্গিত।

মানসীর প্রেমকবিতাগুচ্ছ দুইটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথমটিতে "নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ, বিরহের সুন্দর মোহ ও জ্বালা" প্রধান বর্ণনীয়

বিষয়। দ্বিতীয় স্তরে মানব-জীবনের পরিণত প্রেম, যাহাতে জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তি—তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাব-পার্থক্যের অনুরূপ ছন্দ-বিভিন্নতাও দুই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে লক্ষণীয়।

সমালোচক যে বন্ধুপ্রীতি ও ভাবমুগ্ধতার প্রভাব সত্ত্বেও কবির অন্ধ, নির্বিচার স্তাবকমাত্র নহেন তাহার প্রমাণ পাই "নারীর উক্তি" কবিতাটির প্রতিকূল সমালোচনায়। ইহার "আরম্ভ অবিকল Browningএর মত হইলেও, পরে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণশক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browningএর কথার ধারই ইহাতে নাই এবং ইহার ভিতর মানবজীবনের কোন রহস্য উ ঘাটিত হয় নাই"।

উপসংহারে সমালোচক কবিতা-গ্রন্থটির ফলশ্রুতির আলোচনা করিয়াছেন। 'মানসী'র সৌন্দর্য বস্তুজগতে ও ভাবজগতে, অনুভবে ও অভিব্যক্তিতে, কল্পনায় ও রচনায় সমভাবে নিহিত। ইহার ফল যেমন একদিকে পাঠকের হৃদয়কে আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া বিশাল বিশ্বানুভবে ছড়াইয়া দেয়, তেমনি অপরদিকে উহাকে নিঃসঙ্গ ধ্যানগভীরতায় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুর-মধ্যে সমাহিত করে। যে যুগে রবীন্দ্রকাব্যের অভিনবত্ব সমালোচক-মহলে প্রশংসা-নিন্দার এক অহেতুক ও বিভ্রান্তিকর এলো-মেলো হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই যুগে এই বহুসাহিত্যবিৎ ও রসবিদগ্ধ সমালোচক সমস্ত অবান্তর আলোচনা বর্জন করিয়া স্থির ও অপ্রমত্ত, সার্বভৌম-নীতি-প্রতিষ্ঠিত বিচারের মানদণ্ডে উহার পরীক্ষায় অগ্রণী হইয়াছেন। এই পথিকৃৎ সমালোচক রবীন্দ্ররচনার মূল ভিত্তি নিরূপণ করিয়া রবীন্দ্র-সমালোচনার ভবিষ্যৎ গতি ও পরিণতির দিশারীর মর্যাদা লাভ করিয়াছেন।

৯

এইবার কতকগুলি উপন্যাস-ও-কাব্য-চরিত্রের একক ও তুলনামূলক আলোচনা-সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধের বিচার করিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে খুব নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই, চরিত্রগুলির পর্যালোচনার দ্বারা উহাদের স্বরূপনির্ধারণই লেখকদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই অভিপ্রায়ে চরিত্রসমূহ যে যে উপন্যাসের অংশ তাহাদের বিষয়বস্তুর সারসংকলনের সাহায্যে উহাদের

বিকাশ ও পরিণতি এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পরিস্ফুট করার প্রয়াসই এই প্রবন্ধপর্যায়ে লক্ষণীয়।

পূর্ণচন্দ্র বসু 'শৈবলিনী' প্রবন্ধে শৈবলিনী ও দলনীর বিভিন্নমুখী প্রণয়-অভিজ্ঞতার কথা নানা উপমা-অলংকার-সংযোগে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে চরিত্রদ্বয়ের উপর নূতন কোন আলোকপাত হয় নাই। শৈবলিনী ও প্রতাপের বাল্যপ্রণয়ের পরিণতির স্তরগুলি—যাহা উপন্যাস-মধ্যে সংকেতের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে তাহাদের—একটা পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন করিতে সমালোচক চেষ্টিত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাতেই এই আকর্ষণের রহস্য স্ফুটতর হইতে পারে নাই। কেবল শৈবলিনী যে বিবাহের পরেও প্রতাপের প্রতি অনুরাগিণী ও তাহার প্রবৃত্তিবেগ যে দুর্দমনীয় এই বার্তাটুকু বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের বিস্ময়সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তাহার নিকট একটা অতর্কিত রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য যে গোপন রাখিয়াছিলেন সমালোচক এই কৌশলটুকুই আমাদের অবগত করাইয়াছেন। গৃহত্যাগের পর প্রতাপ সম্বন্ধে শৈবলিনী-চিত্তে ভাবসংঘাত-পরম্পরা, আশা-নৈরাশ্যের দোলা-দ্বন্দ্ব সমালোচক আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। ফষ্টরের নৌকা হইতে উদ্ধারের পর যখন প্রতাপের গৃহে তাহার সহিত শৈবলিনীর প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন প্রতাপের দৃঢ় প্রত্যাখ্যানে শৈবলিনী গুরুতর আঘাত পাইয়া চন্দ্রশেখরের চিন্তায় নিজ অনুতাপবিদ্ধ মনকে নিয়োজিত করিল। কিন্তু এ অনুতাপ তাহার সাময়িক ; প্রতাপের আশা সে যে ছাড়িতে পারে নাই তাহার প্রমাণ নবাব-দরবারে তাহার আপনাকে প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া পরিচয়দান। সে বন্দী প্রতাপের উদ্ধারসাধন করিতে গিয়াছে শুধু উপকারের প্রত্যুপকার সাধনের জন্য নহে, প্রতাপের উপর তাহার চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কিন্তু চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষে সন্তরণের সময় সে যে প্রতাপের নিকট চরম আঘাত পাইল তাহাতেই তাহার আমূল মানস বিপর্যয় ঘটিল, তাহার চিন্তা-প্রবাহ আবার চন্দ্রশেখর-অভিমুখী হইয়া বিপরীত স্রোতে সঞ্চারিত হইল।

এই মর্মমূলউৎপাটনকারী অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরই শৈবলিনীর কৃচ্ছ্র-সাধন, উন্মাদ ও প্রায়শ্চিত্তের অধ্যায় রচিত হইয়াছে। সে প্রতাপকে ভুলিবার ও চন্দ্রশেখরকে অন্তরে প্রতিষ্ঠার দুরূহ সাধনই কায়মনোবাক্যে গ্রহণ

করিয়াছে। এই সাধনার স্বরূপেই তাহার অনুভূতিতে নরক-বিভীষিকা প্রকটিত হইয়াছে। পর্বতসানুদেশে মহাবাত্যাবর্ষণের তুমুল আলোড়ন অন্তর্জগতের আরও ভয়াবহ বিপর্যয়ের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। "একদিকে বাহ্যপ্রকৃতির শাসন, অন্যদিকে ধর্মপ্রকৃতির মহাদণ্ড। এরূপ ধর্মীয় গাম্ভীর্যের গৌরব যদি প্রাকৃতিক গাম্ভীর্যের পর চিত্রিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য চিত্রের শেষ রক্ষিত হইত না, এবং ধর্মেরও গৌরব তাদৃশ উজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হইত না"। "এমন জলন্ত হৃদয়-দহনের একখানি পরিস্ফুট চিত্র দিবার জন্যই যেন কবি শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ দিয়াছিলেন"।

শৈবলিনীর প্রবল প্রকৃতি, যেমন তাহার পাপপ্রবৃত্তির অনুসরণে তেমনি তাহার অনুতাপ ও চিত্তসংবরণের দিকেও, চরম শক্তিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তাহার অন্তরে পাপের বিদ্যুৎ ও অনুতাপের অগ্নিশিখা সমান তেজে প্রজ্বলিত হইয়াছে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করেন তাঁহারা শৈবলিনী-প্রকৃতির সমগ্রতার সহিত ইহাকে মিলাইয়া দেখেন না। এই শেষোক্ত মন্তব্যটি শৈবলিনী-চরিত্র-পরিস্ফুটনে একটি মূল্যবান উপাদান সংযোজনা করিয়াছে। সমালোচকের সুদীর্ঘ বাগ্-বিস্তার বর্তমান যুগে নিরর্থক বোধ হইলেও, ইহার মধ্যে কিছুটা অপরিজ্ঞাত তথ্য, বিচারের কিছুটা নূতন ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঁচকড়ি ঘোষের 'জয়ন্তী' 'সীতারামে'র স্ত্রী-চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণ, জয়ন্তী ইহাদের মধ্যে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে। আলোচনায় নূতনত্ব কিছুই নাই, জ্ঞাত তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি। 'সীতারাম'-এর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সমালোচক বলিয়াছেন "ঐতিহাসিক অস্ফুট একটু ছায়ার উপর কবি ঐ তিনখানি অদ্ভুত ভাবুকতাময় মহাকাব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন"। রমা ও নন্দার চরিত্রে উপন্যাসে যাহা আছে তদতিরিক্ত বিশ্লেষণকুশলতার দ্বারা আবিষ্কৃত আর কোন নূতন তথ্য নাই। শ্রী সম্বন্ধে জয়ন্তীর প্রভাবে তাহার যে চিত্ত-পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সুদীর্ঘকাল কর্মসন্ন্যাস অনুশীলনের ফলে তাহার যে আত্মসংযম ও নিষ্কাম ধর্ম আয়ত্ত হইয়াছিল, সমালোচক তাহারই একটু

অকথিত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীর অগাধ, দেবপূজাকল্প স্বামিপ্রেম জয়ন্তীর জ্ঞানযোগকে মুহূর্তের জন্য অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ন্তীর শিক্ষার ফলে এই স্বামিপ্রেম উৎসাদিত হইয়া তাহার স্থলে ভগবৎ-ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই জন্য সীতারামকে সম্মুখে পাইয়াও, তাহার দুর্নিবার কামনার আকর্ষণেও শ্রীর সংযম বিচলিত হয় নাই। জয়ন্তী সম্বন্ধে লেখক তাহার দশটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই তাহার ধর্মসাধনার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন—ধর্মসাধনার অতিরিক্ত তাহার আর স্বতন্ত্র চরিত্র বিশেষ কিছু নাই। যেটুকু আছে তাহা তাহার বিচারের দৃষ্টে তাহার অপরিত্যাজ্য স্ত্রী-সুলভ লজ্জা-সংস্কারের অতর্কিত উচ্ছ্বাসেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বঙ্কিম পাথরের নীচে যে একটু মানবিকতার ফল্গুধারার পরিচয় দিয়াছেন. সমালোচক সে সম্বন্ধে নীরব। আসল কথা, জয়ন্তী ভগবানের শিল্পশালার তৈয়ারী তীক্ষ্ণধার অস্ত্ররূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মানস গঠনের ওঠা-নামার ইতিহাসটি প্রচ্ছন্নই রহিয়া গিয়াছে। এমন কি শ্রীর মানস উন্নয়নের পরিণত রূপটিই আমরা দেখি, তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের স্তরটি অনুদ্ঘাটিত। জয়ন্তী সত্যিকার ঔপন্যাসিক চরিত্র নহে, সে ধর্মশাস্ত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উপন্যাস-ক্ষেত্রে আগন্তুক ও মানবিক ও ঐতিহাসিক সংঘর্ষের সহিত নিতান্ত আকস্মিকভাবেই জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য তাহার নিজের জন্য নহে, শ্রী ও সীতারামের সম্পর্ক-বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করিবার জন্য। চুম্বকের ইতিহাস জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, চুম্বকাকৃষ্ট লৌহকণাগুলির প্রকৃতিধর্মবিরোধী·তির্যক সঞ্চালনরেখাটিই আমাদের অনুসরণীয়। এ যুগে যেমন জড়শক্তি লইয়া নানা পরীক্ষা চলিতেছে, অতীতে সেইরূপ ধর্মসাধনা লইয়া নানারূপ পরীক্ষা জন-সমাজে প্রচলিত ছিল। এই পরীক্ষার ফলেই আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি নানা ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ও উহাদের সাধনারহস্যের বিচিত্র প্রকাশ। স্বামীপরিত্যক্তা ও স্বামীত্যাগিনী, প্রবল ধর্মসংস্কার-অভিভূতা স্ত্রী নিজ জীবনকে নানা অপরীক্ষিত সাধনার পথে পরিচালিত করিবে ইহা এ যুগে যেরূপ অবিশ্বাস্য সে যুগে তাহা ছিল না। গুরুবাদই ছিল এই সমস্ত সংসারবন্ধনহীনা স্ত্রীলোকের প্রধান অধ্যাত্ম সান্ত্বনা ও অবলম্বন। শ্রীর সৌভাগ্য যে সে

জয়ন্তীর মত খাঁটি গুরুর হাতে পড়িয়াছিল। জয়ন্তীর মত সন্ন্যাসিনীও সে যুগে অপ্রাপ্য ছিল না। সুতরাং শ্রী ও জয়ন্তীর মিলনের পর যাহা ঘটিয়াছে তাহা গাণিতিক তত্ত্বের মত অনিবার্য। প্রত্যেক যুগ ও জাতির বাস্তব কর্মক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া একটা অদৃশ্য ভাবপরিমণ্ডল থাকে; তাহা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত, কিন্তু সংস্কার ও অনুভূতির দ্বারা বোধগম্য। জয়ন্তী এই ভাবপরিমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত একটি জ্যোতীরেখা; সংসারের চারিদিকে আবর্তনশীল অধ্যাত্ম গ্রহমণ্ডলী হইতে বিকীর্ণ একটি ভাব-প্রেরণা। সে মানবিক জগতে অতিমানবিক সত্তার প্রক্ষেপ। তাহার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়, কেবলমাত্র মানবিক বৃত্তির সমবায়ে তাহাকে পুনর্গঠন করা যায় না। অন্যত্র সে অবাস্তব; বাঙলার যুগযুগান্তরের সংস্কারপুষ্ট সমাজ-চেতনায় সে পরীক্ষিত সত্য। ইহাই তাহার যথার্থ পরিচয়।

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রবন্ধটি একদিকে কল্পনাময়, অন্য দিকে তীক্ষ্ণযুক্তিসংবলিত সমালোচনার নিদর্শন। তিনি প্রথমত উপন্যাসটিকে ধর্মগ্রন্থরূপে অভিহিত করিয়া উহার শিক্ষার কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রফুল্ল যেন 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলনতত্ত্বে'র নীতির মূর্ত বিগ্রহ, সর্ববিধ বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য। তাহার পর তিনি গ্রন্থটিকে রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভবানী-পাঠক বুদ্ধি, প্রফুল্ল বিবেক বা ধর্ম-বোধ ও দস্যুরা দুষ্প্রবৃত্তি বা রিপুর প্রতীক্। যতদিন বিবেক বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, ততদিন লোকহিতের অজুহাতে দেবীর নামে দস্যুবৃত্তি চলিত ও লুণ্ঠনের ধন বিতরিত হইত। ধর্মকে নামমাত্র রাজা করিয়া তাহার আশ্রয়ে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইত। কিন্তু দেবী যখন ভবানী-পাঠকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই রাণীগিরির অভিনয় হইতে বিরত হইল ও নিজ সাধনা-লব্ধ শক্তিকে অন্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিল, তখন দেবীর মনে, তাহার সংসারে ও বাঙলা দেশে শান্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইল। কিন্তু এই রূপক-প্রয়োগের মধ্যে খানিকটা অসঙ্গতি ও কষ্টকল্পনা দেখা যায়। বাঙলা দেশে শান্তিস্থাপন অন্তত দেবীর মত-পরিবর্তনের ফল নহে। হয়ত ইহাতে ভবানী-পাঠকের দল ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু

দেশে অন্য দস্যুদলের ত অভাব ছিল না। ইহার কৃতিত্ব গীতার নিষ্কাম ধর্মের দ্বারা অপ্রভাবিত ইংরাজ সরকারের শাসন-দক্ষতা। আসল কথা, প্রফুল্লের শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র হইল আপনার মন ও পরিবার-জীবন। যে ধর্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া আত্মসংযমে অভ্যস্ত হইয়াছে সে নিজের দুরন্ত প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে পারে ও যে পরিবার-জীবনে তাহার প্রবৃত্তি-সমূহের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, নিজ নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্তে ও আচরণ-কুশলতায় তাহার উন্নয়ন সাধন করিতে পারে। কিন্তু দেশশাসনের ক্ষেত্রে এই অনুশীলিত একক আত্মার সক্রিয়তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। প্লেটোর দার্শনিক রাজার দিন চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে; আধুনিক যুগের জটিল সমাজব্যবস্থায় ও শক্তির বহু-বিভাজনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন অচল। প্রফুল্লকে জোর করিয়া পারিবারিক জীবন হইতে ছিনাইয়া আনিয়া রাজ্য-পরিচালনার কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আর পরস্বাপহরণ ও এই অসদুপায়ে অর্জিত ধনের বিতরণ ছাড়া তাহার রাজকার্যের অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অরাজকতার যুগে এইরূপ এক একটি হঠাৎ-রাজা স্বল্পকালের জন্য গজাইয়া উঠে। ইহারা অরাজকতার বন্যার জল বৃদ্ধি করিয়া এই বণিত জলের দ্বারাই দেশব্যাপী মরুতৃষ্ণার কিছুটা নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। ইহা রাজ্যশাসন নহে, রাজ্যশাসনের ক্রীড়া-অভিনয়। দেবী যে এই বিপদসঙ্কুল ও দুর্নীতিগ্রস্ত খেলা ছাড়িয়া নিজ সত্যিকার কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়াছে ইহাতে তাহার সুস্থ বাস্তববোধেরই পরিচয়।

প্রফুল্ল-চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সমালোচক ইহার অপরিস্ফুটতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। প্রফুল্লের পূর্বজীবনের কোন ইতিহাস আমরা পাই না, তাহার দশবৎসরব্যাপী শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে তাহার ব্যক্তিত্বের কোন বিকাশ নাই, তাহার স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাহার বুদ্ধির যে প্রশংসা শুনি তদনুরূপ কোন কার্যের পরিচয় মিলে না। সমালোচক এই সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট শ্লেষের প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি কোন অবস্থাতেই প্রফুল্ল-চরিত্রে কোন মহত্ত্ব, কোন অসাধারণ ধর্মপরায়ণতা দেখিতে পান নাই। তাহার স্বামিপ্রেম সাধারণ নারীর ন্যায়, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দৈবনির্ভর, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা পরোক্ষ প্রশস্তির বিষয়।

ব্রজেশ্বরের চরিত্রও একেবারে হেয়, সে পিতার নিকট কাপুরুষ, পত্নীর নিকট অভিমানী বীরপুরুষ। সমালোচকের এই তীক্ষ্ণ মন্তব্য পরবর্তী যুগের সমালোচনায় অনেকাংশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে প্রফুল্লের ব্যক্তিত্ব প্রকটভাবে পরিস্ফুট নহে, ইহা ক্ষণিক আভাসে, বহিরারোপিত প্রভাবের বিরুদ্ধে অতর্কিত প্রতিক্রিয়ায় ঈষৎ ব্যঞ্জিত। সে মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্বশুরবাড়ীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; প্রত্যাখ্যানের বেদনা ও অপমান নীরবে সহ্য করিতে সক্ষম; অতর্কিত বিপদে দিশাহারা না হইয়া উহার স্বীকরণ-পটু; শিক্ষা-দীক্ষার নিরোধের মধ্যে নিজ সধবার আচার-পালনে তৎপর; রাণীগিরির মর্যাদা-বহনে শান্ত ও সহজ; স্বামী ও শ্বশুরের সহিত আচরণে কুলবধূর সংস্কারে অবিচল। দেবীর রুদ্ধ হৃদয়াবেগ মুক্তি পাইয়াছে ত্রিস্রোতা নদীর উপর বজরার ছাদে বীণাবাদনে। উহাতে কেবল উহার কলানৈপুণ্যের পরিচয় নাই, উহার সমস্ত অন্তরাত্মা, উহার নারীচিত্তের সমস্ত অবদমিত আকূতি ও মাধুর্য, কৃত্রিম আদর্শ ও প্রক্ষিপ্ত শিক্ষা-দীক্ষার বিরুদ্ধে তাহার সহজ সত্তার অনিবার্য মুক্তিকামনা এই সঙ্গীত-মূর্ছনার স্বরে স্বরে দ্রবীভূত হইয়া বহিঃনিষ্ক্রমণ করিয়াছে। এইখানেই দেবী জীবন্ত ও প্রাণোচ্ছল, শুধু দার্শনিক মতবাদের অমূর্ত বাহন মাত্র নহে। দেবীর প্রাণময়তা কোথাও স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিত নহে, বাধা ঠেলিয়া, পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনার অবরোধ টুটিয়া ইহার ক্ষণিক চমকিত প্রকাশ। ব্রজেশ্বর অসাধারণ নহে, অত্যন্ত সাধারণ; কিন্তু সে ঠিক হেয় নহে। যে পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিল তাহারই অংশে উহার জন্ম। অবস্থাবিশেষে নিরপরাধ পত্নীর পরিত্যাগও যে বীরোচিত আচরণ হইতে পারে, ভগবান রামচন্দ্রই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আধুনিক কালের নীতিবোধ অতীত যুগের আচরণের বিচার-মানদণ্ডরূপে প্রয়োগ করিলে তাহাতে সব সময় সত্যনির্ধারণ হয় না।

এই জাতীয় চরিত্র-বিশ্লেষণের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'গিরিজায়া' প্রবন্ধ। প্রত্যেক জীবিত মনুষ্যের ন্যায় ঔপন্যাসিকের প্রতিটি জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্তের পিছনে খানিকটা অব্যক্ত রহস্যের আভাস থাকে। উহাদের কার্য হইতে উহাদের চরিত্র সবটুকু বুঝা যায় না, কার্যের অন্তরালে

ক্রিয়াশীল কারণগুলির সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলেই তবেই ইহার সমগ্র সত্তারহস্য পরিস্ফুট হয়। বঙ্কিমের যুগে মূল কারণসমূহকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াই কার্য বিবৃত হইত; লেখক আভাসে ইঙ্গিতে এই কারণের উপর একটা চকিত আলোকপাত করিলেও প্রধানত পাঠকের কল্পনা ও অনুমানশক্তির উপর ইহার পূর্ণ প্রকটন ছাড়িয়া দিয়াছেন। গিরিজায়া এইরূপ একটি চরিত্র—অকস্মাৎ উপন্যাস মধ্যে আবির্ভূত হইয়া উপন্যাসের ঘটনাজাল ও চরিত্রলীলার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হইয়াছে। বঙ্কিম ইহার সম্বন্ধে সব কথা আমাদের খুলিয়া বলেন নাই, কিন্তু অলক্ষ্যপ্রায় অর্থবহ ইঙ্গিতের সাহায্যে পাঠকের বোধশক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে একটি সম্পূর্ণ চিত্রাঙ্কনে প্রণোদিত করিয়াছেন। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সেই আদর্শ পাঠক ও সমালোচক যিনি কবির প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়টি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিয়া, তাঁহার প্রতিটি ইঙ্গিতকে মানবচরিত্রাভিজ্ঞতার পারম্পর্যসূত্রে গাঁথিয়া কবির অর্ধস্ফুট সৃষ্টিকে আমাদের নিকট পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমের মর্মকথাটি পাঠক-সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন।

গিরিজায়ার গানই তাহার প্রথম পরিচয়টি আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছে। সে ভিখারিণী, "চিরানন্দময়ী, চঞ্চল-প্রকৃতি," প্রগল্‌ভবাক্‌। তাহার রসিকতা শুধু তাহার বাচনভঙ্গী নহে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতির গঠনের সহিত জড়িত। অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা ও অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি তাহার চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। ব্যোমকেশের অত্যাচারের প্রতিরোধ যেমন তাহার দংশনজ্বালা তেমনি তাহার রসোক্তির দ্বারাও প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি হেমচন্দ্রের অন্যায় আচরণের প্রতি ক্রোধও মর্মভেদী শ্লেষের আকারে অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়।

কিন্তু গিরিজায়ার আসল পরিচয় যে সে প্রেমিকা। প্রেমপ্রবণতার মনোবৃত্তি লইয়াই সে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেমের সংঘর্ষময় সম্পর্কে যোগদান করিয়াছে। সে এই অল্পবয়সে প্রেম সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না—মৃণালিনীর অশ্রুসিক্ত গানের অর্থ সে নিমেষেই বুঝিয়াছে। তাহার গানের কথায়, ছন্দে, সুরে তাহার প্রেমোৎসুক্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইহার সহিত তাহার রঙ্গপ্রিয়তা ও কৌতূহল যোগ দিয়া তাহার প্রণয়াকুলতাকে

আরও পরিস্ফুট করিয়াছে। শিষ্য যেমন গুরুর নিকট শুশ্রূষু, সেও তেমনি মৃণালিনীর প্রণয়-রহস্য জানিতে উৎসুক। মৃণালিনীর দুঃখে সে সমদুঃখিনী, জ্যোৎস্নাফুল্ল পূর্ণিমা রজনীও তাহার খেদসঙ্গীতে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই প্রেমপ্রবণতা তাহার হয়ত অজ্ঞাতসারে দিগ্বিজয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার প্রেমিকা-চরিত্রটি উদ্‌বারিত করিল। অবশ্য তাহার চরিত্রানুযায়ী, এই প্রেমের প্রকাশ মধুররসসিঞ্চনে নহে, সম্মার্জনীর জ্বালাময় অঙ্গমার্জনে।

গিরিজায়ার প্রণয়ানুভূতি কেমন ধীরে ধীরে ঘনীভূত ও ভাববিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে সেই স্তর-পরম্পরাও লেখক উদঘাটিত করিয়াছেন। মনোরমার সহিত হেমচন্দ্রের অন্তরঙ্গতাকে সে স্বভাবতই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে এবং এ বিষয়ে স্বগতোক্তির মাধ্যমে আলোচনায় তাহার প্রণয়লক্ষণসচেতনার পরিচয় মিলে। হেমচন্দ্রের অভিমান সে ধরিতে পারে নাই, কিন্তু ইহার জন্য তাহার বদ্ধমূল পূর্বধারণাই দায়ী। সে মৃণালিনীর প্রণয়ের উদার ক্ষমাশীলতা ও অবিচলিত একনিষ্ঠতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে ও তাহার নিকট উন্নততর প্রণয়াদর্শের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। এ শিক্ষার ফল আমরা উপন্যাসে দেখি না। কিন্তু এটুকু অনুভব করি যে মৃণালিনী ও মনোরমার মধ্যে প্রেমের যে মহনীয়, আত্মত্যাগতৎপর আদর্শ বিকাশলাভ করিয়াছে, গিরিজায়া তাহার অশিক্ষিত, স্বভাব-কোমল হৃদয়ের অপরিস্ফুট প্রেমপ্রবণতা লইয়া সেই উঁচু স্বরে নিজ স্বর মিলাইয়াছে, প্রেমানুভূতির বলে সে আভিজাত্য-মর্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার এই ভাবোন্নতি সত্ত্বেও বেচারা দিগ্বিজয়ের পৃষ্ঠে ঝাঁটার দাগ মিলাইবে কিনা সন্দেহ।

সর্বশেষে সমালোচক একটি কূট প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে গিরিজায়া মৃণালিনীর প্রেমকে অসামাজিক জানিয়াও উহার সমর্থন করিল কেন? গিরিজায়ার সহজ-প্রবৃত্তিশাসিত, নৈতিক-দায়িত্বহীন ভিক্ষুক-জীবন তাহাকে মানব-রচিত, কৃত্রিম সমাজনীতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে শিক্ষা দেয় নাই—যে কোন প্রেম উহার ভগবদ্দত্ত রাজকীয় সনন্দ লইয়া উহার আনুগত্য লাভ করিয়াছে। মণিমালিনীর মুখে যে সংশয়-প্রকাশ সঙ্গত, গিরিজায়ার মনে সে সংশয় ছায়াপাত করিতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভবের বহু পূর্বেই গিরিজায়াকে বৈষ্ণবী সাজাইয়াছেন, তাহার মুখে ব্রজবুলি-রচিত

পদাবলীর গান আরোপ করিয়াছেন। হয়ত চৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই বৌদ্ধ সহজিয়াবাদের একটা রূপান্তরিত, মিলনাকৃতির রূপকে অভিব্যক্ত অধ্যাত্মসাধনার সুর বাংলার জনসাধারণের কণ্ঠে গীত হইত। জয়দেব এই লোকসঙ্গীতের সুরের সঙ্গেই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্ব সংযোজনা করিয়া ইহাকে অধ্যাত্ম অনুভূতির উন্নততর পর্যায়ে লইয়া গিয়াছিলেন। গিরিজায়া সেই যুগের মানুষ, যখন বৌদ্ধ নেড়ানেড়ী প্রেমভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে উন্নীত হয় নাই; সে তাহার ভিক্ষাবৃত্তি, ভ্রাম্যমাণ জীবন, সঙ্গীতানুরাগ, সহজ প্রেমাকর্ষণ, দূতীসুলভ সাহস ও প্রগল্‌ভতা লইয়া সেই রূপান্তরেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। আরও মনে রাখিতে হইবে যে সেই সুদূর রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও ধর্মসংমিশ্রণের যুগে, যখন বল্লালী শাসন প্রবর্তিত হইলেও দৃঢ়ীভূত হয় নাই, যখন হিন্দুরীতি ও সংস্কারগুলি বৌদ্ধ ও অনার্য প্রথা ও আচারের সহিত সবে মিশিতে সুরু করিয়াছে, যখন স্বয়ংবরের স্মৃতি ও প্রেমসম্বন্ধে স্বাধীন ইচ্ছার অনুবর্তন সমাজ-মনে উজ্জ্বল ছিল, তখনকার যুগের বিবাহনীতিকে পরবর্তী আদর্শে বিচার করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হইবে না। বঙ্কিমের ইতিহাস-জ্ঞানের সহিত তাঁহার নীতিবোধের যে একটু সংঘর্ষ জাগিয়াছিল, তাহাই মণিমালিনীর অস্বস্তিতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি এই সংশয়কে বিশেষ আমল দেন নাই। গিরিজাপ্রসন্নের ন্যায় এরূপ সূক্ষ্মদর্শী ও রসগ্রাহী সমালোচক যে এই প্রশ্নকে এতটা গুরুত্ব দিয়াছেন ইহাতে রসবিচারের উপর বদ্ধমূল নীতিসংস্কারের অলঙ্ঘনীয় প্রভাবই সূচিত হইয়াছে। দ্বাদশ শতকের বাঙালী যে ঠিক রঘুনন্দনের স্মৃতির অনুশাসনে জীবনকে নিয়মিত করিত না এরূপ কল্পনাও আমাদের নিকট অসম্ভব মনে হয়।

প্রমীলা ও ইন্দুবালা চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় সমালোচক বিশেষ নূতন কোন কথা বলেন নাই। তবে তিনি দেখাইয়াছেন যে এই দুইটী নারী-চরিত্রের পার্থক্য শুধু কবির স্বাধীন কল্পনাপ্রসূত নহে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারাও প্রভাবিত। রাবণ ও বৃত্রের মধ্যে একটা অবস্থাগত বিভিন্নতা আছে। রাবণ দিগ্বিজয়ী বীর, সে দেবতাকে পরাভূত করিয়াছে, কিন্তু স্বর্গ অধিকার করে নাই। তাহার জয় নিজ গৌরববৃদ্ধির জন্য, রাজ্যলিপ্সায় নহে। ইন্দ্রজিৎ সেই বিশুদ্ধ বীরকীর্তিবিস্তারের ইচ্ছা দ্বারাই

অনুপ্রাণিত। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ উভয়েই অজেয় এই দৃঢ় বিশ্বাস শুধু তাহাদের নহে, তাহাদের পরিজনবর্গের মধ্যেও বদ্ধমূল। বৃত্র ও রুদ্রপীড় স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছে—এই নবজিত রাজ্য হারাইবার আশঙ্কা তাহাদের সর্বদাই প্রবল। বিশেষত দেবতার প্রতি-আক্রমণ স্বর্গে সর্বদাই একটা যুদ্ধের অশান্তি জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। বৃত্র শুধু শিবদত্ত ত্রিশূলের জন্যই অজেয়; ত্রিশূল হারাইলে তাহার ব্যক্তিগত বীরত্ব তাহার রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট কি না তাহা অনিশ্চিত। বিশেষত বৃত্রের স্বর্গাধিকার কাল-সীমিত। রুদ্রপীড়ের নিজ অজেয়ত্ব সম্বন্ধে সেরূপ কোন দৈব আশ্বাস নাই। দেব-দৈত্যের যুগব্যাপী যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী কখনও এক পক্ষে, কখনও অপর পক্ষে আশ্রয় লইয়াছেন। সুতরাং মেঘনাদ সম্বন্ধে প্রমীলার যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, রুদ্রপীড় সম্বন্ধে ইন্দুবালার তাহা নাই। প্রমীলা মেঘনাদের বিরহ-কাতরা, কিন্তু তাহার ভাগ্য সম্বন্ধে আতঙ্কহীনা। ইন্দুবালা বিরহ অপেক্ষা যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফল সম্ভাবনাতেও আরও বেশী আতঙ্কিতা। সুতরাং অবস্থা-পার্থক্যে উহাদের মনোভাবেরও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

চরিত্রের দিক দিয়াও শুধু সাহসিকতা ও কোমলতাই এই দুই নায়িকার একমাত্র পার্থক্য নহে। প্রমীলা নিজ প্রেমাবেশে এত নিবিষ্টচিত্ত, যে লঙ্কার দারুণ দুর্ভাগ্য ও অশোকবনে বন্দিনী অপহৃতা সীতার অসহায় অবস্থা তাহার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই বা তাহার আত্মপ্রসাদকে লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই। ইন্দুবালা নিজের দুঃখ অপেক্ষা পরের দুঃখের কথাই বেশী ভাবিয়াছে—তাহার প্রেম পরার্থপর, সম্পূর্ণভাবে দেহলালসাবর্জিত।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' আমাদের সাধারণ ধারণারই সমর্থক প্রবন্ধ। কাব্যোচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ইহার মনন-স্বচ্ছতা কিছুটা আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বঙ্কিমের উপন্যাস তাঁহার সমসাময়িক বা স্বল্পপরবর্তী পাঠকগোষ্ঠীর চিত্তে কিরূপ প্রচুর ভাবালোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাদের কল্পনাকে কিরূপ প্রবল দোলা দিয়াছিল এই জাতীয় প্রবন্ধে তাহারই নিদর্শন আছে। "কুন্দ চটুল স্রোতস্বিনী, সূর্যমুখী গভীর সমুদ্র; কুন্দ উষাময়ী, সূর্যমুখী সন্ধ্যাময়ী; কমল পরিপূর্ণ প্রফুল্লতার মূর্তিময়ী কল্পনা" ইত্যাদি উচ্ছ্বাসময় উপমা ও বৈপরীত্যনির্দেশ আজকাল আর চরিত্রের পূর্ণরহস্য-

দ্যোতকরূপে গৃহীত হয় না—এই জাতীয় আলঙ্কারিক প্রয়োগে জীবনের একটা সাধারণ পরিচয় নিহিত থাকিলেও ইহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্পূর্ণ প্রকটন হয় না। সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অধুনা-পরিত্যক্ত এই ভাবাতিরেকপ্রধান সমালোচনার নিদর্শনরূপে বর্তমান পাঠক-সমাজের কৌতূহল উদ্দীপন করিবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কালিদাস ও শেকসপীয়র' নামে উভয় মহাকবির তুলনামূলক প্রবন্ধটি সূক্ষ্ম অনুভূতি, সরস রচনাভঙ্গী ও সংস্কৃত পণ্ডিতসুলভ আলঙ্কারিকতার সম্পূর্ণ বর্জনের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। হরপ্রসাদের রুচি এমন উদার, সার্বভৌম ও পক্ষপাতিত্বমুক্ত যে তিনি উভয়ের আলোচনায় সত্যনিষ্ঠার আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছেন। কালিদাসের গুণাবলীর জন্য তিনি তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলেও তাঁহার ত্রুটি-অপূর্ণতা, প্রতিভার সীমিত ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতেও তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। কালিদাসের সুন্দর-চিত্রাঙ্কনের আশ্চর্য ক্ষমতার তিনি সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই সুন্দরের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া তিনি যে জীবনের অসুন্দর জটিলতার ও মহান ভাবগাম্ভীর্যের রাজ্যে এক পদও অগ্রসর হন নাই তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। 'কুমারসম্ভব'-এ তিনি হিমালয়ের বিশালতাকে বিলাস-কাননের রমণীয়তায় পর্যবসিত করিয়াছেন। মনুষ্যজীবনের কোমল, সুন্দর ভাবগুলিই তিনি ফুটাইয়াছেন, উহার সমস্যাজর্জর, অন্তর্দ্বন্দ্বক্লিষ্ট, অনুতাপজ্বালাময় দিকগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। এই সমস্ত দিক দিয়া তিনি শেক্‌সপীয়রের সহিত তুলনায় অনেক ন্যূন।

সৌন্দর্য ছাড়াও কল্পনাজনিত আনন্দ আরও তিন কারণে উদ্ভূত হয়—প্রকাণ্ড, সুন্দর ও নূতন ভাবের প্রবর্তনায়। এগুলিতে কালিদাস শেকস্‌পীয়রের সমকক্ষ নহেন। কালিদাসে বিরাটের স্পর্শ একমাত্র পার্বতীর তপস্যায় ও মহাদেবের ধ্যানভঙ্গজনিত, রুদ্রানলদীপ্ত ক্রোধে; হৃদয়বৃত্তির জটিলতা, পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়া হইতে যে সৌন্দর্যের জন্ম, তাহা কালিদাসে বিরল। কল্পনার নূতনত্ব, মানবেতর প্রাণিসৃষ্টি, এরিয়েল, কালিবান, অবারন, টিটানিয়া প্রভৃতি পরীগোষ্ঠীর অদ্ভুতরসাত্মক ক্রিয়া ও মনোভাব প্রদর্শনও শেকস্‌পীয়রে যে পরিমাণে আছে, কালিদাসে তাহা নাই। অবশ্য ইহার কারণ এই যে

ভারতীয় কল্পনায় দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষঃ, অপ্‌সরা প্রভৃতি অলৌকিক জাতি-সমূহ মানব হইতে বিশেষ পৃথক নহে, ইহারা মানবেরই সমধর্মী ও আত্মীয়। উর্বশী পুরুরবার সহিত নিবিড় দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ। অবশ্য মানুষ ও অপ্‌সরার প্রেম স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু তাহার কারণ উহাদের প্রকৃতিধর্মের বিভিন্নতা নহে, রাজার প্রণয়মত্ততার জন্য রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে তাহারই নিবারণোদ্দেশ্যে উর্বশীর স্বেচ্ছায় সম্পর্ক-বিচ্ছেদ। হিন্দু পুরাণ ও কাব্যে মানব ও অতিমানবের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই এবং উহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন উপাদানে গঠিত নহে। সুতরাং এই জাতীয় চিত্রাঙ্কনে হিন্দু কবির বিস্ময়রস-স্ফুরণের জন্য বিশেষ কলাকৌশল ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

বাহ্যজগৎবর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়; শেক্‌সপীয়রের বহির্জগৎবর্ণনা নাটকীয় প্রয়োজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভা, বিমানারোহণে রামসীতার বায়ুভ্রমণ, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম কালিদাসের বর্ণাঢ্য, চিত্রোজ্জ্বল বর্ণনাশক্তির অতুলনীয় নিদর্শন।

গীতিকাব্য শেক্‌সপীয়র লেখেন নাই; যে দুই একটি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে ম্লান। 'মেঘদূত'-এর মত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর গীতিকাব্য শেক্‌সপীয়রের বিচিত্র রচনা-ভাণ্ডারে মিলিবে না। পক্ষান্তরে কালিদাস নাটকেও কাব্যোচিত সৌন্দর্যসৃষ্টির রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি শকুন্তলার কৈশোর জীবনের প্রেমমুগ্ধ মাধুর্য দেখাইয়াছেন, তাহার প্রত্যাখ্যাত প্রেমের অন্তর্বেদনা, তাঁহার ধৈর্যশীল প্রতীক্ষার আত্ম-নিরোধের উপর নীরবতার যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। 'শকুন্তলা'র প্রথম দুইটি অঙ্কের নাট্যপ্রয়োজন অপেক্ষা কাব্য-আবেদনই সমধিক। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের একটিমাত্র দৃশ্যও নাট্যপ্রয়োজনাতিরিক্ত নহে। শেক্‌সপীয়র কাব্যকে নাটকের অধীন করিয়াছেন, কালিদাস নাটকের মধ্যেও কাব্যসৌন্দর্য-সৃষ্টির কোন উপলক্ষ্যই অবহেলা করেন নাই। এই তুলনামূলক আলোচনা যেমন হরপ্রসাদের গভীর রসানুভূতির পরিচয় দেয়, তেমনি তাঁহার পাণ্ডিত্য-বর্জিত, তত্ত্বজটিলতাহীন, সরস ও সুখপাঠ্য রচনাভঙ্গীরও নিদর্শন দেয়। এমন সোজা কথায় এমন গভীর আলোচনার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল।

১০

সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতির প্রয়োগ এই যুগেই আরম্ভ হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ইহার প্রথম নিদর্শন। এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র ইতিহাসটিকে দ্রুত পর্যবেক্ষণের বিষয়ীভূত করিয়াছেন। ইহাতে কালানুক্রমিক তথ্যবিন্যাস আছে, সাহিত্যের গভীর মর্ম-উদ্ঘাটন নাই। তথাপি এই তথ্যবিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করিয়াছেন উহাতে সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনার বীজরূপের দর্শন পাই। তিনি প্রারম্ভে মহাকাব্যের অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণ বিবৃত করিয়া কালিদাসের কবিত্বশক্তির প্রশস্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। কালিদাসের রচনা সরল, মধুর, ললিত ও স্বতঃস্ফূর্ত, ও উহা সর্বাঙ্গসুন্দর এইরূপ সাধারণ প্রশংসা ছাড়া তাঁহার মন্তব্যে কালিদাসের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয়ের কোন প্রয়াস নাই। ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়'-এ রচনার প্রগাঢ়তা ও সারল্যের আপেক্ষিক অভাব ও মাঘের 'শিশুপালবধ' 'কিরাতার্জুনীয়'-এর অনুসরণ—ইহা ছাড়া এই দুই মহাকবি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। মাঘের বর্ণনা বহুবিস্তৃত, প্রারম্ভ-রমণীয় ও অন্তে বিরক্তিকর এই মন্তব্যের দ্বারাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীহর্ষের রচনা "মাধুর্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ক", ও তাঁহার অতিরিক্ত অনুপ্রাসপ্রিয়তার জন্য কাব্যে কর্কশতাদোষ ঘটিয়াছে—এই প্রতিকূল সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল এই প্রশংসা করিতেও সমালোচক কুণ্ঠিত হন নাই ও এই উভয় উক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেন নাই। 'ভট্টিকাব্য'-এ ব্যাকরণের নিয়ম উদাহৃত করাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া কবি কাব্যগুণের বিশেষ অনুশীলন করেন নাই ও সেইজন্য ইহার অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও কর্কশ। 'গীতগোবিন্দ' সম্বন্ধে কবির কবিত্বশক্তি তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের সমতুল্য নহে, সুতরাং ইহা মহাকাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না—ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের অভিমত। খণ্ড কাব্যের মধ্যে তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। 'মেঘদূত'-এর মধ্যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ঋতুসংহার'-এ কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্যের

লক্ষণ বর্তমান, সুতরাং কালিদাস যে ইহার রচয়িতা তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গদ্যকাব্যের মধ্যে 'কাদম্বরী' ও 'দশকুমারচরিত'-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'কাদম্বরী'-র 'বর্ণনাসকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ; রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়, কিন্তু শব্দশ্লেষ, বিরোধাভাসের অতিপ্রয়োগ ও দীর্ঘ-সমাস-বিড়ম্বিত বাক্য-গ্রন্থনের জন্য ইহাতে দোষস্পর্শ ঘটিয়াছে। 'দশকুমারচরিত'-এ "বর্ণনা যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে।"

নাটকের মধ্যে 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে ও এই অভিমতের সমর্থনে সার উইলিয়ম জোন্স ও গ্যেটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 'বিক্রমোর্বশী' সম্বন্ধেও বর্ণনার মনোহারিত্ব প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। ভবভূতির তিনখানি নাটক 'বীরচরিত', 'উত্তরচরিত' ও 'মালতীমাধব'-এর মধ্যে 'উত্তরচরিত'-এরই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে—" 'শকুন্তলা' আদিরসবিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, 'উত্তরচরিত' করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। 'মালতীমাধব'-এ ভবভূতি নিজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে আত্মপ্রত্যয়মূলক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করেন নাই ও ইহার নাটকীয় উৎকর্ষ সম্বন্ধেও তাহার অভিমত ঠিক অনুকূল নহে। 'রত্নাবলী'কে তিনি নাটক হিসাবে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন ও 'মৃচ্ছকটিক'-এর প্রশংসা করিয়াও ইহাকে সর্বাংশে প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরিশেষে সংস্কৃত কাব্য যে আদিরস ও শান্তরসে নিপুণ, কিন্তু বীর ও ভয়ানক রসে তাদৃশ নিপুণতা দেখাইতে পারে নাই মন্তব্য করিয়াই তিনি প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে মন্তব্যসমূহ যথাযথ হইয়াছে, কিন্তু কোথায়ও মূল তত্ত্বের আলোচনা বা গভীর অনুপ্রবেশের পরিচয় নাই।

চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'-য় কিন্তু এই গভীর অনুপ্রবেশশক্তি সুস্পষ্ট। তিনি এই প্রবন্ধে দুষ্মন্ত-চরিত্রকেই প্রধান চরিত্ররূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দুষ্মন্তের অদ্ভুত আত্মসংযমের নিদর্শন দিয়া তাঁহার চরিত্র-মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্তের মন যখন প্রেমলালসায় পরিপূর্ণ, যখন তিনি শকুন্তলার রূপ-ধ্যানে বিভোর, তখনও তাঁহার বাহ্য আকৃতি ও কায়িক চেষ্টায় তাঁহার এই প্রণয়-তন্ময়তার কোন লক্ষণই প্রকাশিত হয় নাই।

তাঁহার মুখের উপর মনের প্রতিবিম্ব একেবারেই পড়ে নাই; তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠায়ও বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। যখনই কর্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে, তখনই তিনি তাঁহার প্রেমচিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কর্তব্যসাধনে রত হইয়াছেন। দুষ্মন্তের চরিত্র-মহিমার এই একদিকের প্রকাশ।

তাঁহার চরিত্রের তুঙ্গতম সমুন্নতি প্রকাশ পাইয়াছে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান-দৃশ্যে। চন্দ্রনাথ বসু এই দৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া একটি সার্বভৌম ইতিহাস-তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণ-মুনি-ঋষির প্রতি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও চরিত্র-বিধি অনুযায়ী অসাধারণ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল মানুষের ন্যায় তিনি এই ভক্তিবিহ্বলতার নিকট নিজ স্বাধীন চিন্তা ও ধর্মবোধ বিসর্জন দেন নাই। ঐতিহ্যানুসারিতা, অতীত প্রথার সশ্রদ্ধ অনুবর্তনের মধ্যেও তাঁহার মোহমুক্ত মনের সত্যনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই ঋষির রোষ উৎপাদন করিয়া ও অভিশাপ-বর্ষণের সম্মুখীন হইয়াও তিনি ঋষির অসঙ্গত আদেশ প্রতিপালন করেন নাই, নিজ স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি, নিজ অন্তরের ধর্মবোধপ্রণোদিত অনুশাসনকেই শিরোধার্য করিয়াছেন। যে রূপমুগ্ধ রাজা অরণ্য-আশ্রমে শকুন্তলার রূপলাবণ্যে একেবারে অভিভূত, তাঁহাকে দেখিবার ছল খুঁজিতে তৎপর, সেই রাজাই রাজসভায় সেই উপযাচিকা শকুন্তলাকে বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আশ্রমে যে শকুন্তলা প্রাপনীয়া বলিয়াই লোভনীয়া ছিল, রাজসভায় সেই শকুন্তলাই পরস্ত্রীবোধে সরাসরি, কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেই, পরিত্যক্তা হইল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে মানব-মন যে ধর্মযাজকের অনুশাসন অতিক্রম করিয়া প্রগতিশীল ন্যায় ও ধর্মবোধের অনুসরণ করিয়াছে, দুষ্মন্তের মধ্যে তাহারই প্রথম ইঙ্গিত পাই। "দুষ্মন্ত সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাস-লক্ষিত নিয়তির কবি-কল্পিত প্রতিমা"। কালিদাস জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাত-সারেই হউক ইতিহাসের এই বিবর্তনক্রমের রহস্য ভেদ করিয়াছিলেন, কেননা "কবি-প্রতিভায় ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিহিত থাকে"। দুষ্মন্তের ইচ্ছা-শক্তি জীবনব্যাপী অনুশীলনের দ্বারা, নিজ অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধির অস্খলিত অনুসরণের সাহায্যে এতই শক্তিশালী হইয়াছে যে তিনি অনায়াসে এই প্রবৃত্তির মোহকে অতিক্রম করিতে পারেন। দুষ্মন্তের মনোগঠনপ্রণালীই

শকুন্তলা-নাটকে নাটকীয়ত্বের প্রধান কেন্দ্র—শকুন্তলা নায়িকা হইলেও নাটকের মুখ্য চরিত্র নহে, কেননা তাহার যাহা কিছু চিত্তপরিবর্তন, তাহার প্রত্যাখ্যান-দুঃখের শান্ত স্বীকরণ ও স্থির, অনুযোগহীন প্রতীক্ষা সবই যবনিকার অন্তরালে সাধিত হইয়াছে, আমাদের প্রত্যক্ষভাবে দেখান হয় নাই। দুষ্মন্ত-চরিত্রই যদি নাটকের প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় হয়, তবে যে শাপ-প্রভাবে তাহার ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ, নিগূঢ় রহস্যের এই উদ্ঘাটন সম্ভব হইয়াছে তাহাই নাটকের মূলীভূত ঘটনা, তাহাই সমস্ত নাট্যপরিণতির বীজ-উপাদান।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তরচরিত' সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠার নিদর্শন। ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবশীলতা ও নাট্যাকৃতির সামগ্রিক বিচার ও মর্মানুপ্রবেশের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই অতুলনীয়। ভবভূতি অন্যান্য সংস্কৃত নাট্যকার হইতে যেন এক নূতন স্তরের জীবনবোধসম্পন্ন রচয়িতা। তিনি শুধু নাটকের বাহ্য ঘাত-প্রতিঘাত বা ঘটনা-পরিণতি দেখাইয়াই তৃপ্ত নহেন; তিনি মানব-হৃদয়ের নিগূঢ়, দুর্নিরীক্ষ্য, অন্তর্মুখী ভাবসমূহও প্রকটন করিয়াছেন। এমন কি তিনি নাটকমধ্যে অভিনব কলা-কৌশল, অন্তরের প্রতিবিম্বরূপ, ভাবসারগঠিত, রূপকধর্মী চরিত্র প্রবর্তন করিয়া বিস্ময়কর মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-এ বহিঃপ্রকৃতি নাটকে প্রবেশ করিয়াছে, চরিত্ররূপে নহে, রস-উদ্দীপনের উপায়রূপে, নায়িকার রমণীয় ভাব-সৌকুমার্যের পরিপোষকরূপে। উহাদের বাদ দিলে নাটকের মূল সমস্যা ক্ষুণ্ণ হইত না, নায়িকার যে চরিত্র-মাধুর্য, তাহার অরণ্যমধ্যে সংসার পাতিবার, মমতাজাল বিস্তার করিবার যে মুগ্ধ আগ্রহ, তাহার ন্যূনতা ঘটিত। কিন্তু ভবভূতির নাটকে বহিঃপ্রকৃতি যেমন বাসন্তী-তমসার রূপ ধরিয়া নাট্যকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ অন্তরের আবেগ-বিহ্বলতা ছায়াসীতারূপে নাটকের ভাব-বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। ভবভূতি বহির্জগৎকে অন্তরে প্রবেশ করাইয়াছেন, অন্তর্জগৎকে বাহ্য আকৃতি দিয়া জীবন্ত, সক্রিয় শক্তিরূপে প্রতিভাত করিয়াছেন। এই Symbolism, ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগ ভবভূতিকে প্রায় আধুনিক-চেতনাসম্পন্ন, নিগূঢ় অনুভূতি-প্রকাশের মৌলিক রূপকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভবভূতির ছায়া-সীতার পরিকল্পনা শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে নহে, এমন কি আধুনিক সাহিত্যেও তুলনারহিত।

শকুন্তলায় নাটকের দ্বন্দ্ব সাধারণভাবে স্বভাবানুগত, উহার মধ্যে কোন সূক্ষ্ম, অসাধারণ অন্তর্গূঢ়তা নাই। সংসারে যেমনটি ঘটিয়া থাকে কালিদাস তাঁহার সৌন্দর্যময় প্রতিবেশে, তাঁহার আদর্শনিষ্ঠ জীবন-পরিচিতির পটভূমিকায় তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা এক একটি ভাবাদর্শের মনোহর প্রতীক্, কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন অনন্য ব্যক্তিসত্তা নাই, হৃদয়ে কোন অতলস্পর্শ আবেগের সমুদ্র-কল্লোল শোনা যায় না। ভবভূতির রাম ও সীতা কিন্তু কেবল বাল্মীকির সৃষ্টির অনুবর্তন নহে। উহাদের প্রেমের প্রগাঢ়, সর্বব্যাপী অনুভূতি, চিত্তের অনুরাগ-সর্বস্বতা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবান্তরের ঢেউয়ে অন্তরের তরঙ্গসঙ্কুলতা, স্মৃতিরোমন্থনের নিবিড়তা ও শোকোচ্ছ্বাসের উদ্বেলতা —এই সমস্তই এই চরিত্র দুইটিকে রূপগত ও মনস্তাত্ত্বিক অনন্যতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস খুব সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, শুধু কেবল রমণীয় ভাবাবেগের কাব্য-প্রকাশ মাত্র হয় নাই। মুহূর্তে মুহূর্তে অভিমান, অনুযোগ, অনুতাপ, সহানুভূতি, একাত্মতার অনুভব, ভাবাবেগপ্রাবল্যে আত্মবিস্মৃতি ও কল্পনাবিভ্রান্তি মনোভাব-প্রকাশের ছন্দের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে, যেন বায়ুহিল্লোলে গভীর সরোবরের জল বঙ্কিম তরঙ্গরেখায় আন্দোলিত হইয়াছে। এমন কি সংলাপের মধ্যে কোন পাত্র-পাত্রীর ক্ষণিক নীরবতা, সম্বোধনভঙ্গীর এক-আধটু ব্যতিক্রম—সমস্তই নিগূঢ় উদ্দেশ্যনিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের পূর্বে বক্তা যেন নিজ অন্তরের গভীরে ডুব দিয়া আপনার তাৎকালিক মনোরহস্যটি অনুভব করিয়া লইতেছে, এবং সেই আভ্যন্তরীণ ছন্দে ভাবপ্রকাশের সুরটি বাঁধিয়া তুলিতেছে। নাট্যঘটনার গতিনিরূপক শ্লোকগুলিও যেন এক অন্তর্গূঢ় বাষ্পোচ্ছ্বাসে উত্তপ্ত, সূক্ষ্ম অনুরণনে, অন্তরশায়ী আবেগের মূর্ছনায় ব্যঞ্জনাময়। প্রেমপ্রকাশের ভাষা ও উপমা-নির্বাচনও সাধারণ ভাণ্ডার হইতে গৃহীত নহে, কবির নিজস্ব অনুভূতির মুদ্রাঙ্কিত। 'উত্তরচরিত'-এর এই রচনাবৈশিষ্ট্যটি ভূদেবের সমালোচনায় অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির সহিত অনুভূত ও অদ্ভুত ভাষা-নৈপুণ্যের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ইহাই বাল্মীকি রামায়ণের বিরোধী মিলনান্ত পরিণতির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। এই

অঙ্কে রামসীতার পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে যতটুকু ভুল বোঝা বা অভিমান-জনিত চিত্তবিকৃতি ছিল তাহা কেমন করিয়া পূর্বস্মৃতি উদ্বোধন ও মাধুর্যরসের প্লাবনে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া উভয়ে উভয়ের প্রগাঢ়, অপরিবর্তিত প্রেমের সত্য পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাহাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চরিত্রবোধের মাধ্যমে পরিস্ফুট হইয়াছে। চিত্তের পরিপূর্ণ নির্মলতা সম্পাদনের পরেই পরস্পরের মিলন নাটকীয় ঔচিত্যের আদর্শে সুসঙ্গত হইয়াছে। সমগ্র অরণ্যভূমি যেন মূর্তিমতী হইয়া রামসীতার এই কাম্যতম মিলনের সহায়তা করিয়াছে। বাসন্তী, তমসা, ভাগীরথী, পৃথিবী সমস্ত এই অন্তরের লীলানাট্যে অংশ গ্রহণ করিয়া তাহার মধুর পরিণতি ঘটাইয়াছে। ছায়াসীতার পরিকল্পনা অপূর্ব মনস্তত্ত্বকৌশলের নিদর্শন—রামের অন্তরস্থিতা চিরোজ্জ্বলা সীতামূর্তিই যেন তাঁহার অনুশোচনা ও বিরহবেদনার তীব্রতার অভিঘাতে স্বতন্ত্র সত্তারূপে বাহিরে আসিয়াছে ও তাঁহার দ্বিধা-বিভক্ত মনের এক অংশের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এ সেই বৈষ্ণব কবির হিয়ার মাঝার হইতে পরাণ-পুত্তলির বহিঃনিষ্ক্রমণ। সংস্কৃত নাটকের রূপময় জগতে এই অরূপ, অতীন্দ্রিয় অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাব-কল্পনার প্রবর্তন, মূর্তিহীন মায়ার প্রতি বাস্তব সত্তার আরোপ, স্বপ্নসঞ্চরণের বিভ্রমকে দিবালোকের সত্য অনুভূতিতে উন্নয়ন—ভবভূতির অপূর্ব কৃতিত্ব। এই কলা-কৌশল ও মনস্তত্ত্বের সার্থক নাটকীয় প্রয়োগের রসানুভবের ও অপরূপ ব্যাখ্যা-সমন্বয়ের জন্য ভূদেবও সমালোচনা-সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকারের যোগ্য। দুঃখের বিষয় ভূদেব ও বঙ্কিমের পর সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় আর বিশেষ কোন সক্রিয়তা বা অগ্রগতির নিদর্শন দেখা যায় না। আশা করিতে ইচ্ছা হয় যে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন রসগ্রাহী পণ্ডিতমণ্ডলী এই পরিত্যক্ত সূত্র পুনর্যোজনা করিয়া বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিবেন।

১৩৫৯ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচনা

সাহিত্য-পরিচয়

প্রথম খণ্ড

সাহিত্যের সমালোচনা

পূর্ণচন্দ্র বসু

আর্যসাহিত্যে সমালোচনা নাই

ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আমাদের সংস্কৃত আর্যসাহিত্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে, যাহা আমাদের আর্যসাহিত্যে নাই। ইউরোপীয় সাহিত্যের গৌরব যে 'ট্র্যাজিডি', আর্যসাহিত্যে নাই।

আমরা পরীক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি যে, সেই ট্র্যাজিডি ইংরাজীতে বহুলরূপে অধীত হওয়ায়, ভদ্রসমাজের মধ্যে আত্মহত্যা, খুন প্রভৃতি পাতক-ভয় অনেকাংশে উপনীত হইয়াছে এবং সমাজে সেই সেই অনিষ্টাপাত আর বিরল ঘটনা নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও খুনান্ত নাটক-নভেল প্রচলিত হওয়ায়, সেই সাহিত্য অধ্যয়নের কুফল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন আর কেহ কাহাকে মানে না; আমাদের পুত্রকন্যাদিগকে এবং গৃহবধূগণকে ধম্‌কাইতে বা শাসন করিতে আর আমাদের সাহস হয় না। ভয় দেখাইতে গেলেই তাহারা অমনি বিষের বাটি, না হয় ছুরি হাতে করিয়া বসে। এ বড় সর্বনাশের কথা।

আর্যসাহিত্যে যে শুদ্ধ 'ট্র্যাজিডি' নাই, এমন নহে; ম্যাক্সমূলার তাঁহার প্রসিদ্ধ "ধর্মের উৎপত্তি ও উন্নতি" বিষয়ক Hibert

Lectureএর মধ্যে ভারতে ধর্ম্মের উৎপত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"প্রকৃত 'ইতিহাস' শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা ভারতীয় সাহিত্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।" একপ্রকার নাই বলিবার কারণ এই, সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে যে দুই-একখানি ইতিহাস আছে, তাহা আর ধর্তব্যের মধ্যে নহে। ইংরাজীর রাশি রাশি ইতিহাস-গ্রন্থের সহিত তুলনায় তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। সে সকল ইতিহাস কেবল আসুরিক ব্যাপারে ও বীরত্বের বিবরণে পরিপূর্ণ। আর্যসাহিত্য সে প্রকার ইতিহাস রক্ষা করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে নাই। কেবল পাপচিত্রের বিবরণ রক্ষা করার ফল কি? সেরূপ ইতিহাস * অধ্যয়নের ফল 'ট্র্যাজিডি' পাঠের কুফলেরই সমান। ইংরাজীতে যাহাকে History বলে, তাহা অনুবাদ করিবার সময় আমাদের বাঙ্গালা লেখকেরা অন্য শব্দের অভাবে ঐ 'ইতিহাস' শব্দই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তদবধি ইতিহাস বলিতে সেই বিলাতী ভাবের ইতিহাসই এক্ষণে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু আর্যসাহিত্যে যে 'ইতিহাস' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। আর্যসাহিত্যে আরও এক বিলাতী সামগ্রীর অভাব দৃষ্ট হয়। সে সামগ্রী সমালোচন-সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্যে সমালোচন-সাহিত্য প্রচুর। এক সেক্সপীয়রের গুণকীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়া জার্মান এবং বিলাতী লেখকগণ অসংখ্য বই লিখিয়াছেন। বিলাতী সাহিত্যে একখানা বই বাহির হইতে যত দেরী, বই বাহির হইলেই অমনি তাহার অসংখ্য সমালোচনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইরূপ সমালোচন-রীতি এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। তজ্জন্য কোন কোন লেখককে একেবারে স্বর্গে তোলা হইয়াছে। এরূপ সমালোচন-সাহিত্য সংস্কৃতে দেখা যায় না। ব্যাস, বাল্মীকির গুণকীর্তন লইয়া আর্যসাহিত্যে

* এস্থলে 'ইতিহাস' শব্দের অর্থ প্রধানতঃ রাজবংশ এবং যুদ্ধাদির বিবরণ; সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, সভ্যতা প্রভৃতির ইতিহাস নহে। এ সকল ইতিহাস ইউরোপেও সেদিন মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং সে সকল ইতিহাসের কথা ধর্তব্য নহে।

সমালোচন-গ্রন্থ কই ? কালিদাসাদির সমালোচন-গ্রন্থ কোথায় ? সে সাহিত্য-মধ্যে রীতিমত সমালোচনার স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই ; আছে কেবল অলংকারশাস্ত্র-মধ্যে দোষগুণের পরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তের উল্লেখ। আর আছে, টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের পুস্তকারম্ভে সামান্য ভূমিকা। ভাষ্যকে ঠিক সমালোচনা বলা যায় না। তাহা গ্রন্থস্থ প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা, সংগতি এবং তাৎপর্য। ইংরাজীতে যাহা commentary, ভাষ্য তদধিক আর কিছুই নহে। আর ভাষ্যকারগণের সামান্য ভূমিকা গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফলমাত্র, সেই অধ্যয়নফলের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, তাহা রীতিমত সমালোচনা নহে। সমুদয় গ্রন্থ অধীত না হইলে তাহা ভালরূপে বোধগম্য হয় না। এই যৎসামান্য সমালোচনা ছাড়িয়া দিলে কি বলিতে পারা যায় না যে, আর্যসাহিত্যে ইউরোপীয় সাহিত্যের মত সমালোচন-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অভাব ? সে অভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা আমরা পরে বলিব। অগ্রে বিলাতী সমালোচন-সাহিত্যের কথা একবার আলোচনা করা যাউক।

অধ্যয়ন ফল

জ্ঞানালোচনার সংগে সংগে ইউরোপে এখন দিন দিন অজস্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন :—

"Poets are not blackberries."

কিন্তু যে পরিমাণে আজিকালি কবিতা প্রস্তুত হইতেছে, তাহা কালজাম অপেক্ষাও প্রচুর। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যাহা প্রভূত পরিমাণে জন্মে, তাহা প্রভূত পরিমাণে বিনষ্ট হয়। সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। দিন দিন অজস্র কবিতা প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই ফেলা যাইতেছে। তৎসম্বন্ধে এডিনবর্গ-বীক্ষণ কি বলিয়াছেন, দেখুন :—

"There is nothing of which Nature has been more bountiful than poets. They swarm like the spawn of the codfish, with a vicious fecundity that invites and

requires destruction. To publish verses is become a sort of evidence that a man wants sense ; which is repelled not by writing good verses, by doing what Lord Byron has done ; by displaying talents great enough to overcome the disgust which proceeds from satiety and showing that things may become new under the reviving touch of genius."—

Ed. Rev. No. 43, page 68.

একথা স্বীকার্য ; ইহা স্বীকার্য যে, লোকে লিখিতে শিখিলেই অগ্রে কবিতা লিখিয়া একবারে কবি হইতে চাহেন। ডাক্তার ব্রাউন অগ্রে বিস্তর কবিতা লিখিয়া পরে দার্শনিক বিষয়ের বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি এক্ষণে আর কেহ পড়ে না, কিন্তু তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতাগুলি চির-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ডাক্তার ব্রাউনের মনে যে কবিত্ব ছিল, তাহা তাঁহার দার্শনিক বক্তৃতার স্থানে স্থানে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাউন যদি এই বক্তৃতাগুলি না দিতেন, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার স্থানই হইত না। কত নবীন লেখকের যে কবিতাপুঞ্জ চিরবিস্মৃতির নীরে নিমগ্ন হইতেছে, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। সর্বসংহারক কালই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। আবার সেই কাল আজিও কালিদাসাদিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। কাহাকে কেহ ঠেলিয়া উঠাইতে পারে না। কবিবর হেমচন্দ্রের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য সেদিন বহু চেষ্টা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাব্যাবলি কি অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন নহে ? সেই কাব্যাবলি মধ্যে যদি প্রকৃত কবিত্ব থাকে, কাল তাহা রক্ষা করিবে। যদি না থাকে, তবে প্রস্তরের স্মৃতিচিহ্নও তাঁহাকে কবি করিতে পারিবে না। বড় বড় কবিদিগের কাব্যের মধ্যে যে সকল অমূল্য রত্ন আছে, সেই সকল রত্নই তাঁহাদিগের অবিনশ্বর স্মৃতি। তাই কত দূরবর্তী ভূতকালের ধ্বংসাবশেষ হইতে কাল সেই সকল কবিগণকে আজিও রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কবির সম্মান কি একজনে দেয় ? যুগে

যুগে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকে। কুলেখক ও কুকবিগণকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইবার জন্য এডিনবর্গ-বীক্ষণ যে সম্মার্জনীর আবশ্যকতা উল্লেখ করিয়াছেন, তদপেক্ষা গুরুতর সম্মার্জনী কালের হস্তে আছে। আমাদিগের এমন আশংকা হয় না যে, কুলেখকগণ কখন জগতের প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন। সকল গ্রন্থের দোষ-গুণ, গ্রন্থ পড়িবার পরেই তাহার ফলাফলে আপনি বাহির হইয়া পড়ে। এককালে বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কতই সমাদর ছিল। তখন কেহ তাহাদের দোষ দেখিতে পান নাই। কিন্তু এক্ষণে সেই উপন্যাসাবলি-পাঠের ফলাফল দেখিয়া লোকে তাহাদের কতই দোষ বাহির করিতেছেন। দোষ বাহির করিবার সময় বলিতেছেন, সেই চিত্রাংকনে যে সৃষ্টি-চাতুর্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দুর্লভ; কিন্তু সে সকল কিসের সৃষ্টি? বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির ন্যায় কতকগুলি বিলাতী হিন্দু নারীর অদ্ভুত সৃষ্টি। তাহাতে তাঁহার কি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা, কি লিপি-নৈপুণ্য, তাহা কেহ অস্বীকার করে না। আমরাও "কাব্যসুন্দরী"তে সেই সৃষ্টি-চাতুর্য, সেই স্বভাব-চিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছি। তা বলিয়া, আমরা সেই সৃষ্টি-চাতুর্যের এবং স্বভাব-চিত্রের ভালমন্দের বিচার করি নাই। সেই ভালমন্দের বিচার এখন সেই কাব্যাবলির অধ্যয়নফলে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র "বিদ্যাসুন্দর" রচনায় যে লিপি-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তা বলিয়া বিদ্যাসুন্দরের অধ্যয়নফল যে ভাল, একথা কেহ বলে না। সেই অধ্যয়ন-ফলই নবীন সেনের, রবীন্দ্রনাথের, গিরিশচন্দ্রের এবং হেমচন্দ্রের কাব্যা-বলির গুণাগুণ কালক্রমে প্রকাশিত করিয়া দিবে। লোকে যদি এখন অন্ধ হইয়া থাকে, পরে সে অন্ধতা ঘুচিয়া যাইবে। এই অধ্যয়নফলই ঠিক করিয়া দিবে, কাহারা কুলেখক, আর কাহারা প্রকৃত কবি।

জগতের সকল সুলেখকের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা যখন দুঃসাধ্য, তখন কুলেখকের কথা উল্লেখযোগ্যই হয় না। মহাকবি মিল্টনও একদা দুঃখ করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন :—

"Fit readers find, though few."

সেক্সপীয়রের পূজা কতকাল পরে আরম্ভ হয়, তাহা ইংরাজী কৃতবিদ্যগণের অবিদিত নাই। বহু গুণাকর কবিগণের প্রতিষ্ঠা যখন জগতে সহজে স্থাপিত হয় না, তখন সামান্য লেখকের সমাদর হওয়া কেমন কঠিন, তাহা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। কুলেখকগণের গৌরব কোন বিশেষ কারণবশত কিছুদিনের জন্য ঘোষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই বিশেষ কারণ তিরোহিত হইলেই আর প্রতিষ্ঠা তিষ্ঠিতে পারে না।

অধ্যয়নফল-দ্বারা আমরা গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিব বটে, কিন্তু আবার অধ্যয়নফলের গুণাগুণ কিরূপে নিরূপিত হইবে? কি কুগ্রন্থ, কি সুগ্রন্থ, উভয়েরই অধ্যয়নফল থাকিতে পারে। লেখার ও রচনার গুণে এবং উদ্দীপনার গুণে যে রসের সঞ্চার হইবে, সেই রসের রসিক-মাত্রেই ত অধ্যয়নফল উৎপন্ন হইবে। সেক্সপীয়রের 'ট্রাজিডি' সমুদয়ের কি উদ্দীপনা, রসের সঞ্চার এবং অধ্যয়নফল নাই, না বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলির অধ্যয়নফল নাই? কথা এই, সেই অধ্যয়নফলের ভালমন্দের বিচার করে কে? এইখানেই সুরুচিসম্পন্ন সমালোচনার প্রয়োজন। সহৃদয়, সদ্ভাব এবং সুনীতি-সম্পন্ন সমালোচনা এই অধ্যয়ন-ফলের তারতম্য তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝাইয়া না দিলে কুরুচিসম্পন্ন পাঠকের মন শীঘ্র ফিরিতে পারে না। সেরূপ সমালোচনা-অভাবে সে কার্য্য কালের হস্তে গিয়া পড়ে। পড়াতে ফল এই হয় যে, গ্রন্থের প্রকৃত গুণাগুণ বাহির করিতে অনেক বিলম্ব হয়। বীরেশ্বর পাঁড়ে-প্রণীত—"ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" প্রকাশিত না হইলে নবীন সেনের কাব্যাবলির প্রকৃত গুণাগুণ কি প্রকাশিত হইত না? হইত; তবে কাল-বিলম্বে। এজন্য এক্ষণে আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের যে দিনকাল পড়িয়াছে, তাহাতে সুরুচি-সম্পন্ন সমালোচনার একান্ত আবশ্যকতা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের তরুণ-বয়স্ক ইংরাজী কৃতবিদ্য-গণের রুচি ও রসজ্ঞতা এমনই দূষিত হইয়া পড়িয়াছে যে, সেই দোষ ভাল করিয়া দেখাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। নহিলে, অনেক অহিন্দু এবং সমাজ-বিপ্লবকারী কাব্যরসে মাতিয়া গিয়া তাঁহারা অনেক সামাজিক অমঙ্গলের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

সুরুচিসম্পন্ন সমালোচকের হস্তে এক্ষণে গুরুভার ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সকলেই কি সমালোচন-কার্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন? সমালোচন-কার্য বড়ই গুরুতর। যে সকল সমালোচক এইরূপ অধ্যয়নফল ধরিয়া সমালোচনা না করেন, তাঁহাদের সমালোচন-কার্য সুনিয়মিত ও সুপরিচালিত হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা প্রায়ই বিপথগামী হইয়া পক্ষপাতী, না হয় একদেশদর্শী হইয়া পড়েন। কর্ণধার-বিরহে যেমন তরণী নদী-তরঙ্গে নানাদেশে বিতাড়িত ও বিক্ষিপ্ত হয়, তাঁহারাও তেমনি ইতস্তত পরিচালিত হন সুনীতি ও সুরুচি তাঁহাদিগকে চালিত করিতে পারে না। অনেক সমালোচক মনে করেন, আমরা নিরপেক্ষভাবে অতি বিচক্ষণতার সহিত সমালোচনা করিব। কিন্তু তাঁহাদের সেই নিরপেক্ষভাব কি ধরিয়া অবধারিত হইবে? যিনি কেবল গ্রন্থের অধ্যয়নফল ধরিয়া বিচার করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ হইতে পারেন। সেই অধ্যয়নফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই সমালোচক কোন দিকে আর হেলিয়া পড়িবেন না। তথাপি কাব্য-সমালোচনা কিরূপ দুরূহ কার্য, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

সমালোচনা কিরূপ দুরূহ কার্য

মানবের জীবন সুখদুঃখময়। এই জীবনের দিবাভাগ আছে;—সুখসূর্য উদিত হইলে মানব হাসিতে থাকে। জীবনের রজনীও আছে; কিন্তু সেই রজনীরও আবার জ্যোৎস্না আছে। মানব এই জ্যোৎস্নায় বসিয়া কবির সমুদয় আনন্দ ভোগ করেন। এক এক দিন এমন সময় উদিত হয়, যখন তাঁহার জীবন, মন ও হৃদয় কবিত্বে পরিপূর্ণ হয়। কবির ভাবপ্রবাহ ও কল্পনা তাঁহার মানসাকাশে ক্রীড়া করিতে থাকে। কে না এক এক দিন সন্ধ্যাকালে বৃক্ষমূলে বসিয়া কত সুবর্ণময় কল্পনা-রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন? তখন এই মর্ত্যধাম পৃথিবী কত কল্পনায় পরিপূর্ণ বোধ হয়, তখন ঐ সুবর্ণরঞ্জিত সন্ধ্যা-গগনকে স্বর্গরাজ্যের আভাস-মাত্র বোধ হইতে থাকে; তখন বিহঙ্গগণ মধুর রবে অন্তরে মধুরতর সুখের লহরী উৎপাদন করিয়া দেয়। তরুণ বয়সে যখন কল্পনা

এইরূপ অনুরঞ্জিত হয়, যখন সকলেই একবার কবির ভাবে প্রকৃতিকে এবং নিজের জীবনকে অবলোকন করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবসমূহে কি কবিত্ব নাই? কবির হৃদয়ে এই ভাবের স্ফূর্তি এক দিনে হয় না। কত চিন্তা, কত ভাব, কত কল্পনা, এক একবার একত্র দলে দলে হৃদয়-গগনকে আচ্ছন্ন করে। হৃদয় এক একবার ভাবে উছলিয়া পড়ে। কত সুবর্ণ চিত্র দূর হইতে প্রলোভন দেখাইতে থাকে। কত চিত্রের উপর চিত্র, কত সুখস্বপ্ন হৃদয়ে নাচিতে থাকে। সে সকল কি ঠিক আঁকা যায়, না তাহাদিগের চঞ্চল ছায়া হৃদয়ে পতিত হয়? সে ছায়া কেমন মনোরম সকলে ঠিক বুঝিতে পারে না। আঁকিতে গেলে তুলিকায় ঠিক বর্ণ আসে না। ভাব জড়িত হইয়া যায়; চিত্র বিচিত্র হইয়া পড়ে। চিত্র যতদূর আসে, তরুণ লেখক তাহাই কল্পনায় পূর্ণ করিয়া লন; ভাবেন তাহাই অনুরূপ ছায়া। সমালোচক ইহার কি বুঝিবেন? তিনি সেই সমস্ত অনুচ্ছায়ার অনুরূপ চিত্র মনোমধ্যে কল্পনা করিতে অসমর্থ। তাঁহার নিকট সকলই জড়িত এবং বিশৃঙ্খল বোধ হয়। তিনি সমুদয় চিত্র দোষপূর্ণ বলিয়া কলঙ্কিত করেন। তাঁহার এই গঞ্জনায় কত তরুণ কবি হৃদয়-বেদনায় ব্যথিত হইয়া আর কল্পনা-পথে ভ্রমণ করিতে সাহসী হন না। সেরূপ ব্যথিত না হইলে তাহাদিগের তরুণকালের ভাবসমূহ ক্রমশঃ হয় ত বিস্তারিত হইত, হৃদয়ে কবিত্বের স্ফূর্তি হইত এবং তরুণ চিন্তা ও কল্পনা ক্রমশ পরিস্ফুটতা লাভ করিত। কিন্তু অনেকে হয়ত কঠিন সমালোচনার তীব্র বাক্যে এরূপ বিমর্দিত হইয়া যান যে, আর কবিতার নামোল্লেখ করিতেও চাহেন না।

কবির হৃদয় কেমন কোমল পদার্থ, তাহা সমালোচকগণ বুঝেন না। না বুঝিয়া তাঁহারা অতি তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণ বর্ষণ করেন। সেই বাণে কত সুকুমারহৃদয় তরুণ কবি চিরদিনের জন্য নিহত হইয়াছেন। এইরূপ বাণ 'কাউপারের' এবং 'কার্ক হোয়াইটের' কোমল হৃদয়ে বর্ষিত হয়। বিশুদ্ধরুচি, ভাবপূর্ণ কাউপার সেই বাণের ব্যথায় পাগল হইয়া যান। কার্ক হোয়াইটের হৃদয় এরূপ কোমল পদার্থ ছিল যে, সে হৃদয়-কুসুম বিকশিত-প্রায় হইতেছিল, এমন সময়ে এক প্রচ্ছন্ন দেশ হইতে

বিদ্রূপ-বাণ তৎপ্রতি বর্ষিত হইল। কার্ক হোয়াইট সেই যে ভগ্ন-হৃদয় এবং ভগ্নোদ্যম হইলেন, আর তিনি উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়-কমল কোরকেই ভগ্নবৃন্ত হইয়া পড়িয়া গেল। লর্ড বাইরণও যখন একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লইয়া প্রকাশ্যে উদিত হন, তখন সমালোচকগণ অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বাইরণকেও চিনিতে পারেন নাই। না পারিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু যে তেজ বাইরণের হৃদয়ে ছিল, তাহা সহসা নিভিবার নহে। বাইরণ উঠিলেন, উঠিয়া তীব্রতর বাণে সমালোচক-গণকে পরাস্ত করিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল, বাইরণ মনুষ্যদ্বেষী হইলেন এবং তাঁহার উচ্চতর মানসিক শক্তিনিচয় এক তিক্ত রসে বিষাক্ত হইয়া গেল। কিন্তু অগ্নি কিছুতেই চাপা রহিল না।

সমালোচন-কার্য নিরপেক্ষভাবে প্রচারিত হইলেও যে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাই উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সমালোচনা নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়া বড়ই সুকঠিন। সমালোচকগণ প্রায়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। পক্ষপাতী সমালোচনার যে কত দোষ, তাহা বর্ণনাতীত। যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে বিলাতী সমালোচকের ভূষিত হওয়া আবশ্যক, পোপ এবং এডিসন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।* কিন্তু কয়জন সমালোচককে সে সমস্ত গুণে ভূষিত দেখা যায়? সমালোচন-কার্য যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা অনেকেরই জ্ঞান নাই, অথচ বলিতে গেলে, এমন লোক নাই, যিনি সমালোচনা করিতে সাহসী না হন। বড় বড় লেখকের উপর সকলেই এক একবার বিচারাসনে বসিয়া মনের অহংকার পূর্ণ করিতে চান। বিদ্যাবুদ্ধি যেমন তেমন হউক, সমালোচন-স্থলে দুই এক কথা বলিতে কেহই সংকুচিত হন না। কিন্তু সেই দুই এক কথায় যে কতদূর অপকার সাধিত হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

শুদ্ধ তর্ক এবং বিচারপূর্ণ প্রস্তাবের সমালোচনা অনেক পণ্ডিতে সুসম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু যে সমস্ত প্রস্তাবের বিচার সমালোচকের রুচি, কবিত্বানুভাবকতা এবং কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করে, তাহা পণ্ডিত কর্তৃক সুসম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন বিষয়। তর্ক এবং বিচারের

* Vide spectator No. 291 and Pope's Essays on Criticism.

সংগতি ও অসংগতি অনেক লোকেই বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাহার বিচারে বুদ্ধির কার্য অতি অল্প, তাহার বিচার করিতে সাধারণ লোকে সমর্থ নহেন। সেক্সপীয়ার এবং মিল্‌টনের কবিত্ব লোকে বহুকাল বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা বহুকাল অনাদৃত হইয়াছিলেন। কোন নবীন লেখকের রচনা অথবা প্রস্তাব প্রথম প্রকাশিত হইলে অনেকেই তাহা অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দেন। লোকের সেই অবজ্ঞা-ভাবের মধ্যে যত প্রকার প্রচ্ছন্ন ভাব থাকে, তাহার সকল প্রকাশিত হইলে সেই অবজ্ঞাকারীদিগের উপরেই অবজ্ঞা জন্মে। যাঁহারা সুখ্যাতি করেন, তাহাদিগের মধ্যেও অনেক অসার লোক থাকেন। কেহ কেহ অখ্যাতি করা ভাল দেখায় না বলিয়া সুখ্যাতি করেন, কেহ কেহ বা অখ্যাতি করিবার বিচারশক্তি নাই বলিয়া অথবা অপর কোন গুহ্য কারণবশত সুখ্যাতি করেন। অনেকে বিদ্বেষী হইয়া হয় ত নিন্দা করেন। সমালোচনার কায এইরূপেই প্রায় সর্বত্র সম্পন্ন হয়। গিবন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লিখিয়া পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবকে দেখাইলে সকলেই তদীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছিলেন। গিবন বলেন, লোকের এই সমস্ত উক্তি শুনিয়া আমি মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না। "অনেকে আমার খাতিরে প্রশংসা করিতেন, অনেকে অহংকারে পূর্ণ হইয়া বিস্তর দোষ বাহির করিতেন।" কবি টম্‌সনের বন্ধুগণও তাঁহার তরুণ বয়সের কবিতাবলির মধ্যে দোষ ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই, অথচ এই কবিতাবলির মধ্যে তাহার উৎকৃষ্ট শীতঋতু-বর্ণনও পরিদৃষ্ট হয়। সমালোচকগণ যখন আবার কোন নূতন বিষয় অথবা নূতন প্রণালী দেখেন, তখন তাঁহারা বিচার-মূলীয় সাদৃশ্যের অভাবে অথবা কুসংস্কার-প্রভাবে এইরূপ ধন্ধিত হইয়া যান যে, তাঁহারা ঠিক বিচার করিতে না পারিয়া সেই নূতন বিষয় অথবা প্রণালীর উপর গালি বর্ষণ করেন। রেন্‌লডস্‌ যখন ইতালীর চিত্র-প্রণালীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই প্রণালী মত একখানি চিত্র আঁকিলেন, তাঁহার পূর্ব শিক্ষক হড্‌সন্‌ সেই চিত্রখানি দেখিয়া বলিলেন, "রেন্‌লডস্‌, তুমি পূর্বে যখন ইংলণ্ডে ছিলে, তখন ত

এতদপেক্ষা ভালরূপে চিত্রিত করিতে পারিতে!" আর একজন চিত্রকর যিনি নেলারের চিত্রকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তিনি ঐ ইংলণ্ডের র‍্যাফেল্‌কে নিতান্ত অবজ্ঞাবাক্য উক্তি করিয়াছিলেন। বেকনের দার্শনিক প্রস্তাবসকল বহুদিন লোকে বুঝিতে পারে নাই। তদীয় জীবিতকালে তদ্বিরচিত ইতিহাস এবং তাঁহার নানাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিরই সমাদর হইয়াছিল। ধূমকেতু সম্বন্ধে কেপ্‌লার যখন তাঁহার প্রস্তাবসকল প্রথম প্রচারিত করেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে গাঁজাখোর বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কোপার্নিকস্‌, পণ্ডিতের এই প্রকার বিদ্রূপভয়ে, আপনার গ্রন্থাবলি প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গোপন রাখিয়াছিলেন,—কোন মতে প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। অধ্যাপক সিজেস্‌বেকের বিদ্রূপে লিনিয়স্‌ একদা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার পরমোন্নতি-সাধক সুবিখ্যাত সিডিন্‌হাম্‌ কলেজে অধ্যাপকের পদ হইতে বহিষ্কৃত হন।*

ইতিহাসের সমালোচনা যে নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হওয়া একেবারে অসম্ভব, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক প্রস্তাব পরিদৃষ্ট হয় নাই। হ্যালাম্‌, তোমারও লেখনীতে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে!

অনেক সমালোচককে নিতান্ত উপহাসপ্রিয় বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহারা বোধ করি মনে করেন, হাস্য ও বিদ্রূপ না করিতে পারিলে সমালোচন-কার্য সুসম্পন্ন হয় না। উপহাস-প্রিয়তা বিচারকের একটী দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সাহিত্য-সংসারে সে নিয়ম খাটে না কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যিনি নিতান্ত উপহাসপ্রিয়, তিনি সকল প্রকার প্রসংগ লইয়াই রহস্য করিয়া বসেন। অতি গভীর প্রসংগ হইতেও তিনি উপহাসের বিষয় খুঁজিয়া বাহির করেন এবং যে স্থলে কোন দোষ নাই, সে স্থলেও উপহাসগুণে দোষ বলিয়া লোকের

* For more instances, see Disraeli's Literary Character, chapters vi and vii.

নিকট প্রতীয়মান করেন। এরূপ আমোদ নিতান্ত দোষই বলিতে হইবে। সমালোচকের এরূপ দোষ থাকা নিতান্ত নিন্দনীয়। এ প্রকার সমালোচকেরা সর্ব্ববিধ গ্রন্থকারেরই মাথা খাইয়া বেড়ান। আজিকালি বংগদেশে এরূপ সমালোচকের অভাব নাই। আশ্চর্য এই, বংগপ্রিয় পাঠকগণ ইঁহাদিগেরই স্পর্ধা বাড়াইয়া দিতেছেন।

এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রতিভার পথ-প্রদর্শন-কার্যে এবং গ্রন্থের বিচার-কার্যে সমালোচনা কত অশুভ ফল সমুৎপাদন করিয়াছে। নবীন লেখকের উৎসাহ ভংগ করিয়া ইহা সাহিত্য-সংসারে বিলক্ষণ ক্ষতি করিতেছে। এমন কি, সমালোচনা যে কাব্যের প্রশংসা করে, তাহারও সৌন্দর্যের হ্রাস হয়। সে কাব্যের সৌন্দর্যের নবীনত্ব যায়। পাঠক পড়িতে পড়িতে কেবল সমালোচন-প্রদর্শিত সৌন্দর্য মাত্র উপলব্ধি করেন। সে সৌন্দর্যও একজন দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়া তাহার উপলব্ধিতে তত আনন্দ বোধ হয় না। সে সৌন্দর্য আর নূতন বোধ হয় না ; কবিত্বও পুরাতন বোধ হইলে তাহার আদর কমে। অন্যবিধ নূতন সৌন্দর্য বাহির করা দুষ্কর হয়। কারণ, সে কাব্যকে অন্য আলোকে আর দেখিতে পারা যায় না। দেখিতে গেলেই সেই সমালোচন-প্রোক্ত পুরাতন ভাব মনে আইসে। এই প্রশংসাবাদ আবার অধিকতর হইলে লোকের মনে বিপরীত ফল হয়। লোকে ততদূর প্রশংসা সহিতে পারে না। সুতরাং খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাব্যের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে যায়। উহার ফল এই দাঁড়ায়, প্রশংসা করিয়া যাহার আদর বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহার ক্রমশ পাকচক্রে অনাদর ঘটিয়া উঠে। এই প্রকারে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট কবিও হতাদর হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের প্রতি লোকের ভক্তি কমিয়া যায়। কিন্তু যে সকল মহাকবির আজিও সমালোচনা লিখিত হয় নাই, তাঁহাদিগের প্রতি মানবের ভক্তি চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহারা আজিও সকলের মনে সমান পূজার্হ হইয়া রহিয়াছেন। বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের এই ভাগ্য। যে কাল হইতে আধুনিক সমালোচনা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিবে, সেই কাল হইতে তাঁহারা মানবের বিচারস্থানীয়

হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা মানবের ভক্তিভাজন হইয়া রহিয়াছেন। বিচারস্থানীয় হইলেই তাঁহাদিগের দোষ-গুণ লইয়া নানা অখ্যাতি ও সুখ্যাতি প্রচারিত হইবে। তখন মানব আর তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবেন না, তাঁহাদিগের বিচারক হইয়া দাঁড়াইবেন। কতকগুলি লোক তাঁহাদিগের পক্ষপাতী হইবেন, আর কতকগুলি তাঁহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইবেন। বিচারকের পদে অভিষিক্ত হইয়া এক্ষণে মানবকুল অনেক সাহিত্যসুখ বিনষ্ট করিয়াছেন। প্রাচীন কালের মত গ্রন্থকারগণও এখন আর হৃদয় খুলিয়া অবারিতভাবে লিখিতে পারেন না ; এখন তাঁহাদিগের লেখনী কাঁপিতে থাকে, তাঁহারা একবার লিখিয়া সাতবার বিচার করিয়া দেখেন। এই বিচারে অনেক সরলভাব-সৌন্দর্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভয়ে হৃদয়ের এখন সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হয় না। সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ গ্রন্থসকলও এখন তত উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে না। কিন্তু প্রাচীনকালে যখন ঋষিগণের মনে এরূপ ভয়ের কিছুই ছিল না, তখন তাঁহারা কেমন সরল অন্তরে হৃদয় খুলিয়া সুস্বর সংগীতে গান গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন, আমাদিগের এই গান সকলেই ভক্তি সহকারে শুনিবেন। যাহাতে সকলের মনে ভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁহারা এরূপ প্রগাঢ়ভাবে সংগীতের রচনা করিতেন। তাঁহারা জানিতেন, আমরা পৃথিবীর উপদেশক ও গুরু ; পৃথিবীর বিচারপ্রার্থী, বাদী বা প্রতিবাদী নহি। তাঁহারা জানিতেন, আমাদিগের পক্ষসমর্থনার্থ কোন সমালোচকের আবশ্যকতা হইবে না। আমাদিগের কাব্য আপনার গুণ আপনি গাহিবে। ব্যাস ভাবিতেন, আমি বাল্মীকির মত কিরূপে লোকের ভক্তিভাজন হইব। লোকের মনে ভক্তি সংচারের জন্য তাঁহারা ব্যগ্র হইতেন।

সমালোচনা ও প্রতিভা

সমালোচনায় যে প্রতিভার উদ্রেক হয় না, তাহার প্রমাণ ত পড়িয়াই রহিয়াছে। পূর্বকালে যখন কবিকুল-চূড়ামণিগণ উদিত হইয়াছিলেন, তখন সমালোচনা কোথায় ছিল ? বাল্মীকি ও ব্যাসের পূর্বে অলংকার-

শাস্ত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় না। কবিগণ প্রতিভা-প্রভাবে যে সমস্ত সুশোভন সৃষ্টিকাণ্ড এবং সুদৃশ্যনিচয় রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমালোচকগণ কি তাহার কিছু সহায়তা করিয়াছিলেন? কবিগণ কেবল প্রতিভার যাদুবলে মুহূর্ত-মধ্যে আলাদিনের রাজপ্রাসাদ-সকল সৃজন করিয়াছেন—যাহার সুন্দর সৃষ্টি-কৌশল আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, আজিও তাঁহাদিগের আশ্চর্য সৃষ্টি-শক্তির পরিচয় দিতেছে। আরিষ্টটল, আরিষ্টার্কাস্‌ এবং লঙ্গাইনাসের বহুকাল পূর্বে গ্রীসের উৎকৃষ্ট কবিগণ Rhapsodists দেশে দেশে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা সমালোচনার ধার ধারিতেন না, সমালোচনার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির ভয় রাখিতেন না, এবং আলংকারিকগণের সাধুবাদের প্রত্যাশা করিতেন না। তাঁহারা যেখানে যাইতেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যে এবং গাম্ভীর্যে মোহিত হইয়া সংগীত ধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ করিতেন। ধীর মহীধরের প্রকাণ্ডতায় তাঁহারা প্রকৃতির বল ও গাম্ভীর্য দেখিতেন, গগনের প্রসারে প্রকৃতির বিস্তীর্ণতা দেখিতেন, স্থির জলাশয়ের মধ্যে তরুলতার সৌন্দর্য দেখিতেন, এবং মেঘমালার সুবর্ণ-ছবিতে প্রকৃতির রমণীয়তা অনুভব করিতেন। প্রকৃতির মহাকাব্য-গ্রন্থ তাঁহাদিগকে অলংকারের নিয়মাবলি শিক্ষা দিয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির বীণাধ্বনি শুনিয়া যে সুমধুর রবে গান গাহিয়া গিয়াছেন, তাহাতে চিরদিন জগৎ মোহিত হইয়া আছে। সেই প্রকৃতির বরপুত্রগণ যাহাদিগকে আপনাদিগের কবিতা শুনাইতেন, তাহারাই মোহিত হইত, মোহিত হইয়া ভাবিত, ইঁহারা দৈববলেই এমন সুধারবে গান গাহিতে পারেন। তাঁহারা যেখানে যাইতেন, সেইখানেই আনন্দধ্বনি ঢালিয়া দিতেন, সকলেই তাঁহাদিগের সমাদর করিত। প্রাচীনকালের এই মহার্ঘ-কাব্যনিচয় কোন পূর্বপদ্ধতিক্রমে রচিত হয় নাই। রামায়ণে, মহাভারতে এবং ইলিয়দে যে বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশল, যে চমৎকার কল্পনা এবং মনোহর চিত্রাবলি পরিদৃষ্ট হয়, এখনকার মার্জিতরুচিসম্পন্ন এবং অলংকার-পরিশুদ্ধ কাব্যাবলিতেও তাহা লক্ষিত হয় না। বাস্তবিক এই প্রাচীন কাব্যনিচয়ের যাহা যাহা ধর্ম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাই এখনকার কাব্যশাস্ত্রের নিয়মরূপে পরিগণিত

হইয়াছে। পরবর্তী সমালোচক সেই নিয়মের অনুসরণ করিয়া অন্য কাব্যের পরীক্ষা করিতে যান। ইদানীন্তন কবিগণ সেই প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ করিতে যান। প্রাচীন কবিগণ যে প্রকৃতির আদর্শ ধরিয়া নিজ নিজ কাব্যাবলি রচনা করিয়া গিয়াছেন, আশ্চর্য এই, ইদানীন্তন কবিগণ সেই প্রকৃতিকেও তুচ্ছ করিয়া প্রাচীন কাব্য-সমূহের আদর্শে নিজ নিজ কাব্য লিখিয়া থাকেন। যেন একদিন প্রকৃতি ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, তথাপি এই প্রাচীন কাব্যসমূহ সেরূপ হইতে পারে না। এমন কি, তাঁহাদিগের দোষাবলিও গুণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পূর্ব-রচিত অলংকার-শাস্ত্র কি এই প্রাচীন কবিগণের প্রতিভাকে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছিল, না তাহা স্বতই বিস্ফুরিত হইয়াছে? প্রাচীন কবিগণের উৎকৃষ্ট প্রতিভা এবং চমৎকার কল্পনা যে স্বতই বিস্ফুরিত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। স্বতই বিস্ফুরিত হইয়া তাহার যে ফল ফলিয়াছে, এই মার্জিত, আলংকারিক সময়ের ফল সেরূপ হইতে দেখা যায় না।

যুনানী দৃশ্যকাব্যও স্বতই বিস্ফুরিত হইয়াছে। এস্কাইলস, ইডরিপাইডিস, সফোক্লিশ প্রভৃতি গ্রীসের উৎকৃষ্ট নাট্যকারগণ সকলেই এরিষ্টটলের পূর্বে উদয় হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। ডেনিস, রাইমর, জনসন প্রভৃতি সমালোচকগণের বহুকাল পূর্বে সেক্সপীয়রের দৃশ্যকাব্য সমুদয় বিরচিত হয়। এরিষ্টটল প্রভৃতি সমালোচকগণের গ্রন্থাবলি তিনি যে কখন অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, এমন প্রতীত হয় না। যদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তবে যে তাঁহাদিগের গ্রন্থনির্দিষ্ট কোন নিয়মের বশীভূত না হইয়া নিজ কাব্যাবলি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা আশ্চর্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার পূর্বে কুইন্টিলিয়ন্ ও হোরেস্, লঙ্গাইনস্ ও এরিষ্টটলের থাকা আর না থাকা, সমান হইয়াছিল। তাঁহাদিগের গ্রন্থাবলি যদি তিনি পড়িয়া থাকেন সে অধ্যয়নে কোন ফল দর্শে নাই। তিনি আপনার জন্য এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন। অলংকার-শাস্ত্র তদীয় প্রতিভার বিস্ফুরণ-পথে কিছুই সহায়তা করে নাই। যদি তাঁহার

প্রতিভার বিস্ফুরণ-পথে কেহ কিছু সহায়তা করিয়া থাকে, তবে মার্লো প্রভৃতি তদীয় পূর্ব নাটককারগণ একদিন সে সম্মান পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু অলংকার-শাস্ত্রে ও সমালোচনায় যে তাঁহার প্রতিভার কিছুই স্ফূর্তি হয় নাই, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। য়ুনানী-বিয়োগান্ত নাট্যকারগণ এবং সেক্সপীয়র যে সমস্ত চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কোন সমালোচক তাহার বাহ্য রেখা পূর্বে অঙ্কিত করেন নাই। এই সমস্ত চিত্র এবং তাঁহাদিগের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি সেই নাট্যকারগণের ভাবময়ী সৃষ্টি। তাঁহারা এই সকল সৃষ্টিকাণ্ড রাখিয়া গেলে পরে সমালোচক তাঁহাদিগের কৌশল এবং গুণাগুণ পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

তবেই সমালোচনা-দ্বারা প্রতিভার স্ফূর্তি হওয়া দূরে থাক, তদ্দারা প্রতিভা মার্জিত এবং সৎপথে নিয়োজিতও হয় না। কারণ, প্রতিভা চিরকাল নিজপথ নিজেই আবিষ্কার করিয়া কত শত সুবর্ণময় প্রদেশ লোক-লোচনের সমক্ষে ধারণ করিয়াছে। যে নিয়মে যে পথে প্রতিভা চলে, তাহা অন্য কেহ নির্দেশ করিয়া দিতে পারে না। কবির হৃদয়ে যে সৌন্দর্যের বীজ রোপিত আছে, তাহা সময়-ক্রমে নিজেই কুসুমিত হইয়া পড়ে। অগ্নি হইতে ধূম যেমন সহস্র তরংগ-রংগে সুন্দরভাবে উত্থিত হয়, প্রকৃত কবি-কল্পনার অসংখ্য ভাবসমূহ এবং সৃষ্টিকাণ্ড সেইরূপ মোহনীয় বেশে স্বতই উদিত হইয়া থাকে। কবি যাহা দেখেন, সমালোচকের সাধ্য কি যে, তাহা অনুমান করিয়া আনেন? কবি যে কল্পনাবলে স্বর্গের উপর স্বর্গ সৃষ্টি করেন, সমালোচকের সামান্য কল্পনায় তাহার কি পরিমাণ হয়? সমালোচক সে দৃষ্টি কোথায় পাইবেন, যে দৃষ্টি-প্রভাবে কবি মানব-প্রকৃতির অতি গূঢ়তম বিষয়সকল আলোকিত করিয়া দেন, যে দৃষ্টি স্বর্গের দিকে উত্থিত হইয়া ইন্দ্রধনুর রঞ্জিত বর্ণে এবং মেঘমালার সুন্দর আকারে স্থাপিত হয়, যে দৃষ্টি-প্রভাবে কবি এমন কত শত অতিরঞ্জিত স্বর্বর্ণময় দেশ, কত নূতন নূতন জগৎ আবিষ্কার করেন—ঐ তারামণ্ডিত গগনক্ষেত্র যাহা মানবচক্ষু হইতে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে? কবির কল্পনা-দর্পণে যে সমস্ত নিত্য

এবং চিরস্থায়ী রাজ্যের ছায়া আসিয়া পতিত হয়, সমালোচক কি তাহা দেখিতে পান? কবি যে সকল চিত্র অংকিত করিয়া দেন, সমালোচক কেবল তাহারই সহিত অন্য চিত্রের তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন মাত্র। বর্তমান দেখিয়া সমালোচক ভবিষ্যৎ গণনা করিতে বসেন। কিন্তু প্রতিভা সে গণনায় আবদ্ধ থাকিবার নহে। সমালোচক যে ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেন, প্রতিভা হয়ত সে দিক্ দিয়াও যান না। সমালোচক ইলিয়দ দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যৎ মহাকাব্য-সমুদায় ইলিয়দের নিয়মে প্রস্তুত হইলে সুন্দর হইবে। কিন্তু যে সমালোচক রামায়ণ ও মহাভারত দেখিয়াছেন, তিনি বলিবেন, ভারতের নিকট ইলিয়দ অতি সামান্য কাব্য; সকল মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতের মত হওয়া আবশ্যক; নইলে তাহা মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইবে না। হোমর, ব্যাসের নিয়মে চলেন নাই। ইহারা স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্র দেশে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি-কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাসের বর্তমানে হোমরের ভবিষ্যৎ নিয়মিত হয় নাই। আবার হোমর যে নিয়মে চলিয়াছিলেন, য়ুনানী বিয়োগান্ত নাট্যকারগণ সে নিয়মে দৃশ্য-কাব্য সমূহ বিরচিত করেন নাই। তাঁহাদিগের কাব্যপ্রণালী বিভিন্ন নিয়মে চালিত হইয়াছিল। এরিষ্টটেল বলিয়া ভাবিলেন, সকল বিয়োগান্ত কাব্য সফোক্লিশের ছাঁচে প্রস্তুত হইলে তবে সুন্দর হইবে। তিনি অনুমান করিতে পারেন নাই, যে সেক্সপীয়র এবং কাল্দেরণ যে প্রণালীতে নাটক লিখিবেন, তাহাও সুন্দর হইবে। সফোক্লিশের বর্তমানে কাল্দেরণের ভবিষ্যৎ অনুমিত হয় নাই। এরিষ্টটেলের সৃষ্টি সফোক্লিশের নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে নাই। কিন্তু লোপডিভেগা এবং কাল্দেরণ, সফোক্লিশের নিয়মে প্রচলিত হন নাই। তাঁহাদিগের প্রতিভা এক এক স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। কিছুকাল পূর্বে ইংলণ্ডের সকল সমালোচনাপত্রে এই নিয়ম স্থিরীকৃত হয় যে, ইতিহাস কখন উপন্যাসের সহিত মিশিতে পারে না। ইতিহাস এবং উপন্যাস—ইহারা স্বতন্ত্র পথে চলিবে। কিন্তু স্কট্ যখন ওয়েভার্লীর একখানি সরল উপন্যাস সুন্দরভাবে বর্ণিত করিলেন, তখন সমালোচকের নিয়ম চির-

দিনের জন্য একেবারে বিভিন্ন হইল। স্কট্ অনায়াসে উপন্যাসের সহিত ইতিহাসের বিবাহ দিলেন। সমালোচকগণ আশ্চর্য হইয়া স্কটের প্রতিভার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদবধি সহস্র সহস্র উপন্যাস ওয়েভার্লীর ছাঁচে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সমালোচক কি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, স্কটের প্রতিভা কোন্ পথে চলিবে? স্কট্ একদিন জেমস্‌কে (স্কটের গ্রন্থ প্রকাশক) জিজ্ঞাসা করিলেন, "জেমস্, আমার 'লর্ড অব্ দি আইলসে'র বিষয় লোকে কি বলে?" জেমস্ কথা কহিলেন না। স্কট্ আবার বলিলেন, "কেন জেমস্, আজ তুমি নীরব হইয়া রহিয়াছ? বল লোকে কি বলে, আমার কাছে তোমার গোপন কি? অথবা আমি বুঝিতে পারিতেছি, কিরূপ হইয়াছে; আচ্ছা তার জন্য ভাবনা কি? তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি সব ছাড়িয়া দিব? এ পথে সুবিধা হইল না, আমি আর এক নূতন পথ বাহির করিব।" স্কট্ যে নূতন পথ কল্পনা-চক্ষে বাহির করিলেন, তাহা যাদুবিৎ টমাস্ দি রাইমার এবং মাইকেল স্কট্‌ও যাদুবলে অনুমান করিতে সমর্থ হন নাই।

প্রতিভাসম্পন্ন লোক যাহা রচনা করেন, তদ্দ্বারা সাহিত্যে অনেক সৃষ্টি সম্ভূত হয়। সেই সৃষ্টিদ্বারা সমালোচকগণ পরিচালিত হন এবং সেই সৃষ্টির রস সমাজকে আর্দ্র করিয়া ফেলে। তদ্দ্বারা সমাজে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই সমাজকে কিয়ৎপরিমাণে সংগঠিত করে। কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, তাঁহারা যে বিষয় গ্রহণ করেন, সেই বিষয়েই তাঁহাদের হৃদয়াবেগ, ভাবরাশি, চিন্তা ও মানসিক সৃষ্টি এক এক নব প্রণালীক্রমে প্রবাহিত হয়। ভগবান্ কপিলের সৃষ্টি, পতঞ্জলি-দেবের সৃষ্টির সহিত সমান নহে, অথচ দুইজনই সাংখ্যমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপ নানাবিধ বেদশাখা, বেদশাখা-সৃষ্টির বিভিন্নতা। তদ্রূপ কণাদ অক্ষপাদের সহিত, শংকর পূর্ণপ্রজ্ঞের সহিত, গিবন্ মেকলের সহিত, ব্যাস বাল্মীকির সহিত কালিদাস ভবভূতির সহিত, বিভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই নূতন নূতন আদর্শের সৃষ্টি করিয়া নূতন পথ বাহির করিয়াছেন। তাই পৌরাণিক কাব্যসমূহে আমরা বহুবিধ আদর্শের সৃষ্টি দেখিতে পাই।

সেই সেই আদর্শ ও পথ ধরিয়াই তাঁহার বিচার সিদ্ধ হয়। যাঁহার গ্রন্থাধ্যয়নে বা শ্রবণে যেরূপ ফল উৎপন্ন হয়, যিনি সেই ফল দ্বারা লেখকের হৃদয় যেরূপ অধিকার করিতে পারেন, সাহিত্য-সংসারে তাঁহার স্থান ও মর্যাদা তদ্রূপ। কালক্রমে আবার এই ফলাফলের ভাল-মন্দের বিচার সিদ্ধ হয়। আর্যসাহিত্যে ঠিক তাহাই হইয়াছিল। আর্যসমাজ আর্য সাহিত্যের ফলাফলের সাক্ষী।

সমালোচনার আবশ্যকতা ও নীতি

প্রাচীন ভারতে যখন অহিন্দু সংস্কার সকল আর্যগণের মনে প্রবিষ্ট হয় নাই; যখন সকলেই হিন্দু রীতিনীতি, হিন্দু আচার ব্যবহার বিলক্ষণ বুঝিতেন, যখন তদ্বিষয়ে কোন কুসংস্কার মনে উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন আর্যসাহিত্যের সমালোচনার তত প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই গ্রন্থের অধ্যয়নফল ও সামাজিক ফল ধরিয়া বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন এবং সেই বিচারে সুকবিগণকে চিনিয়া লইতে পারিতেন। কোন গ্রন্থ ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহার ফলশ্রুতি দ্বারা তাহা অবধারিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই, এক্ষণে ইংরেজী বিদ্যা আমাদিগকে বিভিন্ন অবস্থায় নিপাতিত করিয়াছে। সেই অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে সে কার্যে কোন্ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? সেই কর্ণধার আর্য-সমালোচক। আর্য-সমালোচক কি নীতি দ্বারা চালিত হইয়া গ্রন্থের তাৎপর্য গ্রহণ করিতেন? সেই নীতি এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :—

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিংগং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥"

শ্রীজীবগোস্বামিনঃ পরমাত্মসন্দর্ভধৃত বচনম্।

পরম ভক্ত জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমদ্ভগবদগীতার তাৎপর্য নির্ণয়ে বৃত হইয়া চিরপ্রসিদ্ধ আর্যরীত্যনুযায়ী এই সকল লিংগের অনুগামী হইয়াছিলেন।

প্রথমত গ্রন্থের উপক্রম বা আরম্ভ কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখিতে

হইবে। এই উপক্রমেই গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের প্রয়োজন অতি সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন কি না, তাহা বিচার্য। কারণ তাহাই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। যেমন রামায়ণের প্রতিপাদ্য রামায়ণের প্রারম্ভেই নারদোক্তিতে বিবৃত হইয়াছে, গীতার প্রতিপাদ্য গ্রন্থের প্রারম্ভেই বেদবাক্য ব্যক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ গ্রীক্ মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য হোমর ইলিয়দের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন। মিণ্টনের Paradise Lost-এও তদ্রূপ।

দ্বিতীয়ত দেখিতে হইবে গ্রন্থের প্রারম্ভে যাহা লিখিত হইয়াছে, উপসংহারে সেই প্রতিপাদ্য ঠিক প্রতিপন্ন হইয়াছে কি না।

তৃতীয়ত গ্রন্থের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইলে দেখিতে হইবে, গ্রন্থমধ্যে কোন্ কথা আগাগোড়া ও পুনঃ পুনঃ পর্যালোচিত হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের অভ্যাস গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম এইরূপ গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থত দেখিতে হইবে গ্রন্থের অপূর্বতা বা Originality গ্রন্থের বিষয়, রচনা-প্রণালী, ভাষা প্রভৃতি কতদূর অপূর্ব। ভাষার, রচনার এবং বিষয়ের দোষগুণ এই অপূর্বতা পরীক্ষাস্থলে বিচার্য হইয়া পড়ে। যদি ভাষা, রচনা এবং বিষয় অপূর্ব না হয়, তাহা হইলে ত সেরূপ গ্রন্থের প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীরাধার বিরহ ত অনেক বৈষ্ণব কবি গাইয়াছেন, কিন্তু মাইকেলের "ব্রজাংগনার" বিরহ-গীতি কি অপূর্ব নহে? তাহার রচনা, ভাষা, ভাব সকলই নূতন ও অপূর্ব।

পঞ্চমত গ্রন্থের "ফলম্" বা ফলশ্রুতি বিশিষ্টরূপে বিচার করা উচিত। কারণ, এই ফলশ্রুতির উপরেই গ্রন্থের প্রয়োজনসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। গীতা পাঠ করিয়া যদি গীতার ফলশ্রুতি না জন্মিয়া থাকে, তবে গীতা পাঠ বৃথা, এবং গীতা রচনাও বৃথা। আমরা কি দেখিতে পাই না, এই গীতাপাঠের ফলস্বরূপ কত লোক সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন? সন্ন্যাসধর্মের অর্থ বনবাস নহে। প্রকৃত সন্ন্যাস বিশুদ্ধ আন্তরিক ব্যাপার। তাহাই গীতাপাঠের ফল। গীতাপাঠের ফল কর্ম-সন্ন্যাস ও জ্ঞান।

ষষ্ঠত গ্রন্থের অর্থবাদ। গ্রন্থখানি কিরূপ অধিকারীর অর্থসাধক এবং বাস্তবিক সেইরূপ অধিকারীর উপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা

বিচার্য। সেই অর্থবাদ গ্রন্থমধ্যে ব্যক্ত থাকিলে, সেই গ্রন্থের বিচার সেই অধিকারীর উপযোগিতা ধরিয়াই সিদ্ধ করিতে হইবে। যাহা স্ত্রীজাতি বা অজ্ঞজনগণের জন্য লিখিত, তাহা তদ্রূপেই বিচার্য। যাহা জ্ঞানিগণের জন্য রচিত, তাহা জ্ঞানিগণের পক্ষে কতদূর উপযোগী—তাহা যে সামান্য জনগণের জন্য বা বালকের জন্য নহে—তাহা বিশেষরূপে বিচার করা উচিত।

সপ্তমত সেই অর্থবাদ-মত গ্রন্থের রসাদির সঞ্চার এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া যথারীতিক্রমে উপক্রম হইতে উপসংহারে গ্রন্থ উপনীত হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে হইবে। গ্রন্থখানি যদি দার্শনিক বা যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবে সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে দেখিতে হইবে, সেই প্রমাণ ও যুক্তির কিরূপ বৃদ্ধি সাধিত হইয়া তাহার উপসংহার করা হইয়াছে। গ্রন্থের এই প্রকার যুক্তিযুক্ত বিকাশ, বিবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিই তাহার উপপত্তি। এই উপপত্তি গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতে উপসংহার পর্যন্ত রচনার পরস্পর সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া ক্রমে রসের ঘনতা সাধন করে। ঘনতা সাধন করিয়া যথানিয়মে উপসংহারে উপনীত করে। তদ্দ্বারাই গ্রন্থের অধ্যয়নফল উৎপাদিত হয়। সেই ফলানুসারেই গ্রন্থ বিচার্য। গ্রন্থ পাঠের বা শ্রবণের ফল যদি কিছুই না হয়, তবে তাহার উপপত্তির বিশিষ্ট দোষ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। কি দার্শনিক গ্রন্থ, কি কাব্যাদি, কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, কি অপরবিধ বর্ণনা বা যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব যাহাই হউক না কেন, গ্রন্থখানি সুরচিত হইলে, তাহার অধ্যয়নফল ও ফলশ্রুতি (impression) অবশ্যই উৎপাদিত হইবে। সেই ফলশ্রুতি বা অধ্যয়ন-ফলদ্বারা গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার। যে গ্রন্থ রচনার রীতিদ্বারা ফল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই রীতিদ্বারা অপরাপর সদৃশ গ্রন্থের বিচার না করিলে, সমালোচনা কি পরীক্ষা অবলম্বন করিবে? সেই অধ্যয়ন-ফল বা ফলশ্রুতি ভাল হইলে গ্রন্থখানিকে ভাল বলিতে হইবে, মন্দ হইলে মন্দ বলিতে হইবে, আর যদি অধ্যয়ন-ফল কিছু না হয়, তবে সেই গ্রন্থ-রচনা কিছুই হয় নাই—তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

তবেই দেখা যাইতেছে, আর্যদিগের গ্রন্থরচনায় একমাত্র উদ্দেশ্য

ছিল ;—সেই উদ্দেশ্য ফলশ্রুতি বা অধ্যয়নফল। কি উপক্রম-উপসংহার, কি অভ্যাস, কি অপূর্বতা, কি অর্থবাদ, কি উপপত্তি—গ্রন্থের সর্বাংশেরই লক্ষ্য এই ফলশ্রুতি। যদি গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য ফল উৎপন্ন হয়, তবেই গ্রন্থরচনায় সাফল্যলাভ হইয়াছে, নতুবা নহে। বাগ্মীরা যে বক্তৃতা দেন, তাহার কি উদ্দেশ্য ? কথকেরা যে কথা ক'ন, তাহার উদ্দেশ্য কি ? সকলেরই উদ্দেশ্য, কোন বিশেষ ফল উৎপন্ন করিবার জন্য। গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হয়। গ্রন্থ পড়িলাম, অথচ পাঠের ফল কিছু হইল না ; সে গ্রন্থকে কি বলিব ? সুতরাং অধ্যয়ন বা শ্রবণ-ফলই গ্রন্থরচনার প্রধান লক্ষ্য। অতএব এই লক্ষ্য ধরিয়াই সকল গ্রন্থ ও প্রস্তাব বিচার করা উচিত।

এই অধ্যয়ন বা শ্রবণ-ফল মন্দ বলিয়াই বিলাতী সাহিত্যের 'ট্র্যাজিডি' এবং আসুরিক লোকচরিত্রপূর্ণ ইতিহাস-রচনা আর্যসাহিত্যে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা বলিয়া আমরা অপরবিধ ইতিহাস এবং মহাজনগণের জীবনচরিতের নিন্দা করিতে পারি না। সে সকল গ্রন্থ বিস্তর আবর্জনাপূর্ণ হইলেও সুপাঠ্য এবং তাহাদের অধ্যয়ন-ফল মন্দ নহে। আর্যসাহিত্যেও মহাজনগণের এবং ঋষিচরিত্রের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। সেরূপ আখ্যায়িকা পাঠের ফল বিস্তর ও বিশুদ্ধ। বিলাতী সাহিত্যের মান বিলাতী সমাজে থাকিতে পারে ; কারণ, সে সমাজের রীতিনীতি ও ধর্মাধর্মের বিচার স্বতন্ত্র। আর্য-সমাজে বিভিন্ন রীতিনীতি এবং বিভিন্ন ধর্ম প্রচলিত। ধর্মনীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি এবং সমাজরক্ষিণী শক্তি। সমাজনীতি তাহারই অনুগামিনী। সমাজতত্ত্বে আমরা একথা বুঝাইয়াছি। সেই নীতিদ্বয়ের বিরোধী যাহা, তাহাই সমাজ বিপ্লবকারী ও অধর্ম-সাধক। কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন—বিদ্যার সমস্ত অংশই ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির অনুকূল হওয়া চাই। যাহা অনুকূল নহে, তাহা তদ্বিরোধী, এজন্য পরিত্যাজ্য। বিলাতী সাহিত্য ও ইতিহাস আর্যসমাজের সংঘর্ষে আসাতে তাহা এক্ষণে ভিন্ন কষ্টিতে পরীক্ষিত হইতেছে। সেই কষ্টি অধ্যয়নফল বা ফলশ্রুতি। সেক্সপিয়ার হউন,

মিল্টন হউন, যিনিই হউন না কেন যাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি হিন্দু সমাজ-নীতি এবং ধর্মনীতির বিরোধিনী হইবে, তিনি প্রকৃত হিন্দুর নিকট তদুপযুক্ত সমাদর লাভ করিবেন। আবার যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ সেই ছাঁচে ঢালা হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, তাহাদেরও ফলশ্রুতি অনুসারে গুণাগুণের বিচার। তাই আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলির আদর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইংরাজী ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালার অপরাপর উপন্যাস ও কাব্যাদির দশাও যে তদ্রূপ হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর্যসাহিত্যে সমালোচনা নাই কেন ?

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সংস্কৃত আর্যসাহিত্যে সমালোচন-সাহিত্য এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কেন নাই, তাহা বোধ হয় এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। অধ্যয়ন বা শ্রবণফল ধরিয়া যে সাহিত্যের কাব্যাদি সকল-গ্রন্থের বিচার, সে সাহিত্যের সমালোচনা ত পড়িয়াই রহিয়াছে। গ্রন্থ-পরীক্ষার এমন সহজ নীতি আর দ্বিতীয় পরিদৃষ্ট হয় না। এই নীতিদ্বারা একেবারেই গ্রন্থের গুণাগুণ অবধারিত হয়। গ্রন্থ-অধ্যয়ন বা শ্রবণের সমষ্টি-ফল যাহা, তাহাই গ্রন্থের সম্যক্ সমালোচনা। তদ্দ্বারা গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার স্বতই সম্পন্ন হইয়া যায় এবং জানা যায়—"যাহার ফলশ্রুতি বা অধ্যয়নফল ভাল, তাহাই ভাল গ্রন্থ; যাহার অধ্যয়ন-ফল মন্দ, তাহা মন্দ গ্রন্থ; এবং যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা গ্রন্থই নহে।" রস সর্ববিধ গ্রন্থেরই আছে। সেই রসের পরিপুষ্টি সাধন হইলেই ফলশ্রুতি ঘটে। সমালোচনার এই মূল নীতি ইউরোপীয় সাহিত্য সমাজে প্রচারিত না থাকাতে, সে সমাজের সাহিত্য-সমালোচনাও সুনিয়মিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্যই সে সমাজে সমালোচনার এত ধূমধাম ও বাড়াবাড়ি। কিন্তু এই সহজনীতি আর্যসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া সংস্কৃত আর্যসাহিত্যে আর স্বতন্ত্রাকারে সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা হয় নাই।

সাহিত্যের আদর্শ

(পূর্ণচন্দ্র বসু)

আর্য সাহিত্যের প্রকৃতি

ধর্মপ্রাণ আর্য্যজাতি সাহিত্যে ও ধর্মের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস প্রকাণ্ড মহাভারত লিখিয়া পতিপ্রাণা গান্ধারীর মুখে গাইলেন—

"যতো ধর্মস্ততো জয়।"

যেখানে ধর্ম সেইখানেই জয়। তাঁহার সেই ছত্র কাহার না মুখস্থ আছে, যে ছত্রে তিনি ভগবানকে কীর্তন করিয়া প্রেমোল্লাসে পাইয়াছেন—

"জয়োহস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাম্ পক্ষে জনার্দনঃ।"

ভগবানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, এবং যাহারা ভগবানের আশ্রিত, তাহাদিগেরই জয় হউক। কেবল এই কথা সংগীত হইয়াছে, এমন নহে, প্রকাণ্ড মহাভারতে সেই ধর্মপথই, সেই ভগবদাশ্রিত দেবপথই প্রবল হইয়াছে। মনুষ্যের পাপচিত্রও উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে, কুরুপক্ষীয় চিত্র অপেক্ষা আর কোন্ চিত্র উজ্জ্বল? কিন্তু তদপেক্ষাও আর এক উজ্জ্বলতর চিত্র আছে—সে চিত্র পাণ্ডবপক্ষীয় কৃষ্ণার্জুনসহায় ধর্মপথ; এই চিত্রের বর্ণগৌরবে পাপচিত্র নিষ্প্রভ; ধর্মের জয়ে পাপ বিধ্বস্ত একেবারে সমূলে নিপাতিত। পবিত্র কুরুক্ষেত্র নামক ধর্মক্ষেত্রে পাপ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর এক প্রকাণ্ড চিত্র বাল্মীকির। বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণ ভক্তির সুপ্রসারিত মহাদেশ—সে দেশেও ধর্ম বিজয়ী। ধর্মের বিজয়-পতাকা অযোধ্যা হইতে লংকার প্রান্তদেশ পর্যন্ত উড়িতেছে। রাক্ষসকুল এত যে প্রবল, তাহা ভাবভক্তির প্রবলতর তরঙ্গে নিপাতিত হইয়াছে। রামপক্ষের পুণ্যময় রাজ্য, কি লংকা, কি অযোধ্যা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামরাজ্যের সময় হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ কি,

লংকার শেষ সীমা পর্যন্ত পুণ্যক্ষেত্র। মহাদণ্ডকারণ্যেও আর অসুরভয় নাই। কোথায় অরণ্যে বসিয়া কোন শূদ্র তপস্যা করিতেছে, সেও রামচন্দ্রের স্পর্শে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

পৌরাণিক কাব্য ছাড়িয়া, প্রকৃত সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতরণ কর; সেখানেও সেই দৃশ্য। যে ক্ষেত্রের অধিনায়ক, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবিগণ, সে ক্ষেত্রেও সেই ধর্মের জয়। কলিদাস কি ধর্মময় তুলিকারূপে কুমারের অতুলনীয় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন! সেখানে উমার তপস্যা, হিমালয়ের শিবানুরাগ কেমন অসাধ্যসাধন করিয়াছে! সেই বর্ণগৌরবে সমগ্র কাব্য উদ্ভাসিত। আর শকুন্তলা,—বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলা—যাহার চিত্রে জগৎ মুগ্ধ, সেই শকুন্তলায় কিসের চিত্র? তাহাতে ঋষির আশ্রমচিত্র, শকুন্তলার সহৃদয়তার চিত্র,—যে সহৃদয়তা সমস্ত পশুপক্ষীকেও প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিল; শকুন্তলার প্রচার প্রেমানুরাগের চিত্র—যে জগৎবিসারী প্রেমানুরাগ এক প্রবল পতিভক্তিতে সমুন্নত হইয়া তাহাকে তপস্বিনী করিয়াছিল। আর ধর্মময় চিত্র দুষ্মন্তের যিনি প্রবল ধর্মানুরাগে পূর্ণ হইয়া তেমন জগৎফলামভূতা, ঋষিজনপ্রেরিতা, তদাত্মসমর্পিতা, অনায়াসলব্ধা, লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে সভার মধ্যে সর্বসমক্ষে কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আবার যখন সেই শকুন্তলাকে মনে পড়িল, তখন তাহার অনুতাপচিত্র দেখিলেই কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়? কালিদাস সেই ধর্মানুতাপ চিত্র "চিত্রদর্শন" অংকে কত উজ্জ্বল বর্ণে অংকিত করিয়া গিয়াছেন। আর যদি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ধর্মানুতাপ দেখিতে চাও, তবে দেখ ভবভূতির "ছায়ার" অংকে। রামের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়চিত্র সেই অংকে প্রতিফলিত। সেই সমস্ত চিত্র দেখিয়া বল দেখি, আর্যসাহিত্য পড়িয়া তোমার হৃদয় পূর্ণ হয় কি না? সহস্র পাপকলংকে তোমার হৃদয় কলুষিত থাকুক না কেন, তবু এই আর্যসাহিত্য পাঠে তোমার হৃদয় একটু ধর্মানুরাগে উত্তপ্ত হইবেই হইবে। আর্যসাহিত্যের ইষ্টার্থ বা অধ্যয়নফলে এতই সুন্দর, এতই উৎকৃষ্ট এতই শান্তিরসপরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ!

আর্য ও ইংরাজী সাহিত্য

কিন্তু ইউরোপীয় বা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের ফল কিরূপ? যে আদর্শ আর্য সাহিত্যের প্রাণ ও গৌরব, যাহা সেই সাহিত্যকে জগৎললামভূত সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই উচ্চাদর্শের ধর্মনৈতিক সুন্দর আদর্শ কি আমরা ইংরাজী সাহিত্যে দেখিতে পাই? তাহাতে মনুষ্যসমাজ ও মানবপ্রকৃতির চিত্র আছে বটে, কি সে চিত্র কি ততই ধর্মগৌরবে পূর্ণ? ইংরাজী সাহিত্যে স্থলে স্থলে ধর্মসৌন্দর্য নাই, এমত নহে; কিন্তু তাহা এত নিবিড়বনাচ্ছন্ন যে, তাহার কান্তি তত পরিদৃশ্য হয় না। ঘন বনমধ্যে যেন একটী নবমল্লিকা নিভৃতে তাহার সৌন্দর্য লইয়া বিলীন হইয়াছে। চারিদিকে কণ্টকপূর্ণ বিটপী লোকলোচনের অপ্রিয়তা সাধন করিয়াছে। চারিদিকে হিংস্র জন্তুগণের মহাভীষণ রবে অরণ্য পরিপূর্ণ—এতই পরিপূর্ণ যে, সে রবে পক্ষীর সুকণ্ঠ নিঃসৃত কাকলী মিলাইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়গণ স্পর্দ্ধা করেন যে, আমরা প্রকৃতির চিত্রকর, যেন প্রকৃতি চিত্র প্রাচ্য-সাহিত্যে নাই। প্রকৃতি-চিত্র আর্যসাহিত্যে আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও আছে; তবে প্রভেদ এই ইংরাজী সাহিত্যে সেই প্রকৃতির সমলা নগ্নমূর্তি, আর্য-সাহিত্যে তাহার ধর্মোন্নত মধুরিমা। ইংরাজী সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির পাশব ও আসুরিক বর্ণগৌরব, আর্যসাহিত্যে সেই প্রকৃতির দেবতুল্য ভাবের উৎকর্ষ। মানব প্রকৃতি দেবভাবে সমুন্নত হইয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে, তাহা আর্যচরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই সৌন্দর্যে তাহার আসুরিক ভাব প্রচ্ছন্ন, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত। ইংরাজী সাহিত্যে মানব প্রকৃতির পাশব ভাবের এবং ঐন্দ্রিয়িক প্রবৃত্তিসমূহের এত প্রাধান্য যে, তাহাতে তাহার দেবভাব সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী কাব্য সাহিত্যের যিনি অগ্রগণ্য, ইংরাজ জাতির গর্বস্বরূপ সেই সেক্সপিয়ারের দৃশ্য কাব্যের আলোচনায় এ কথা প্রতিপাদিত করা যাইতেছে। আমরা তাঁহার কাব্যবিশেষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু তাহার সমগ্র নাট্যাবলির অধ্যয়নফলস্বরূপ যাহা পাই, তাহারই বিষয় বলিতেছি।

সেক্সপিয়ার ও মানবপ্রকৃতি

সেক্সপিয়ার পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জগতের জনসমাজ এবং মানব-প্রকৃতির চিত্রকর; কেবল চিত্রকর নহেন, তিনি একজন মহাকবি। তিনি সেই জনসমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও লোকজনের সজীব চিত্র দিয়াছেন। চিত্র সকল এত পরিপাটী. এত প্রকৃত. এত প্রস্ফুটিত, যেন ফটোগ্রাফের মত বোধ হইতে থাকে। তাঁহার নাটকীয় ব্যক্তিগণকে যেন সজীব মনে হয়। এ বড় কম ক্ষমতার কার্য নহে। তাঁহার যে সকল নাটক বিয়োগান্ত নহে, তাহাদিগের ধাতু এই প্রকার। কিন্তু কবির প্রধান সম্পত্তি তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি। এই দৃশ্যকাব্যসমূহে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এ রাজ্যে তিনি শুদ্ধ চিত্রকর নহেন, এখানে তাঁহার সৃষ্টিচাতুর্য দেদীপ্যমান। কাব্যরসে তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি উচ্ছলিত, সৃষ্টি চাতুর্যে তাহা পরিশোভিত। এজন্য ট্র্যাজিডিসমূহই তাঁহার যশের প্রধান নিদানস্বরূপ হইয়াছে। ট্র্যাজিডি ও কমিডি, এই উভয়বিধ রচনা কৌশলে তিনি ইউরোপীয় কাব্যজগতে অসামান্য কবি। তাঁহার এই অগ্রগণ্য ট্র্যাজিডিসমূহ সম্বন্ধেই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

সেক্সপিয়ার মানব প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য এবং সর্বত্র কৃতকার্য কিনা সে কথার বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। তবে তিনি যাহা বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত, আমরা তাহারই কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। মানব প্রকৃতিও জনসমাজের চিত্রাঙ্কনে তিনি অসাধারণ কবিরূপেই সুবিখ্যাত। কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁহার মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্রাঙ্কনে মোহিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন—

"হে প্রকৃতি! হে সেক্সপিয়ার, তোমরা কে কাহার অনুচিত্র!"

যদি তিনি মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিয়া থাকেন, তবে তিনি কিরূপ চিত্র দিয়াছেন? মানব প্রকৃতি দোষগুণের আধার;—তাহাতে একাধারে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব বিদ্যমান। আহার, নিদ্রা, রোগ, শোক, কামাদি রিপুর সহিত মানব পশুবৎ; বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচারাদি

সম্পন্ন হইয়া মানবের মনুষ্যত্ব এবং দয়া, দাক্ষিণ্য ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি গুণে মনুষ্য দেবতুল্য। এই ত্রিবিধগুণে—এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে মানব প্রকৃতি সমলা। খ্রীষ্টধর্মানুসারেও মানবের পাপাংশই অধিক। জনসমাজের অধিকাংশ লোকে কিছু শ্রেষ্ঠগুণের পরিচয় নাই, সমাজের অধিকাংশই রাজসিক এবং তমোগুণান্বিত; সুতরাং জনসমাজ অধিকতর সমল। যিনি সেই মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিতে যাইবেন, তাঁহাতে ততোধিক সমলা প্রকৃতিরই ছবি আঁকিতে হইবে এবং যাঁহাকে জনসমাজের চিত্র দিতে হইবে, তাঁহাকে রাজসিক ও তমোগুণান্বিত সাধারণ লোকসমাজেরই প্রতিকৃতি দিতে হইবে, নহিলে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্র যথাযথ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয় জনসমাজ যে সকল বিশেষ দোষগুণের আধার, তাহাতে যে বিশেষ প্রকার তমঃ ও রজোগুণের বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপীয় কবির চিত্রে তাহারই প্রকৃত ছবির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সেক্সপিয়ারে যদি প্রকৃতি যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার চিত্রগুলিতে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের আলোকান্ধকার এবং দোষ-গুণই ঠিক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আলোক আঁধার এবং দোষগুণ সেইরূপ পরিমাণে প্রতিবিম্বিত, যেরূপ পরিমাণে প্রকৃতিতে তাহা জাজ্বল্যমান। তাহার কমও নহে, বেশীও নহে। পরিমাণের ন্যূনাধিক ঘটিলে চিত্র প্রকৃতির যথাযথ প্রতিবিম্ব হইবে না। ইউরোপীয় জনসমাজে ও লোকচরিত্রে যে পরিমাণে এবং যে প্রকার বিশেষ দোষ গুণের সমাজে সেক্সপিয়ার তাহারই অনুকৃতি। তৎকালে খৃষ্টানের মনে মানবপ্রকৃতি যতদূর পাপ-মলিন, ততদূর মলিনতা সেক্সপিয়ারে। চিত্রকররূপে সেক্সপিয়ার এইরূপ; কিন্তু সেক্সপিয়ার ত নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকর নহেন; তিনি যে স্রষ্টা; তিনি কিসের সৃষ্টি করিয়াছেন?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবির সৃষ্টিভেদ

জনসমাজকে তন্ন তন্ন করিয়া যিনি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যেন তাহার যথাযথ ফটোগ্রাফ ছবি তুলিতে

পারেন, তিনি অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, তাহাতে দোষের ভাগই প্রচুরপরিমাণে বর্তমান। কবি জগতের শিক্ষাদাতা। কবি কিরূপে শিক্ষা দিবেন? যাহাতে জনসমাজের সেই দোষের পরিমাণ কমে, এমন উপায় তাঁহাকে করিতে হইবে। জনসমাজকে অধিকতর সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন করা কি উপায়ে সম্ভবে, তাহারই নির্ণয় করা কবির কার্য। কবি সেই উপায়াবলম্বনে জগতের গুরু। এই উপায়ের ভেদেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কবির প্রভেদ। এই উপায়াবলম্বনে কবি সৃষ্টিকর্তা ও শিক্ষাদাতা। পাশ্চাত্য কবি যাহার সৃষ্টি করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, প্রাচ্য কবি তাহা করেন নাই; প্রতি কবি বিভিন্ন জগতের সৃষ্টিকর্তা। একজন মানবসমাজের রজঃ ও তমোগুণকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার কুফল কত ভয়ানক; অন্য জন সত্ত্বগুণকে সমুজ্জ্বল করিয়া সেইদিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সাত্ত্বিক রাজ্য কি সুখের আলয়। একজন ঘোর নরকের সৃষ্টি করিয়া তাহার দাহ ও যন্ত্রণা দেখাইয়া লোক-সমাজকে পাপ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য জন স্বর্গের সৌন্দর্য ও সুখের দিকে লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই রাজ্যে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়ারে নরক ও তাহার যন্ত্রণার সৃষ্টি, প্রাচ্য কবি ব্যাস বাল্মীকি পুণ্যময়, পবিত্র স্বর্গের সৃষ্টিকর্তা। বহুকাল পূর্বে তাঁহারা নিজ নিজ সৃষ্টি কৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে কোন্ কবি অধিকতর কৃতকার্য হইয়াছে, লোকসমাজের ফলাফল দর্শনে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। হিন্দু জনসমাজে, কি ইউরোপীয় জনসমাজ অধিকতর ধর্মশীল, অধিকতর সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ অধিকতর দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও ভক্তিগুণে সম্পন্ন? কোন জনসমাজের ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল? এই প্রশ্নের সমাধান করিলেই সেই কবিগণের সৃষ্টির ফলাফলও নির্ণীত হইবে।

পাশ্চাত্য কবির উপকরণ তদীয় সৃষ্টির অনুকূল। তাঁহার উপকরণ ট্র্যাজিডি। ট্র্যাজিডি যে ধরণের রচনাপ্রণালী, তাহাতে নরকের সৃষ্টিও তাহার দাহ এবং যন্ত্রণা দেখাইবার উপযোগী। ট্র্যাজিডি অসুর-

সৃষ্টির যত উপযোগী, দেবসৃষ্টির তত উপযোগী নহে। কারণ ট্র্যাজিডিতে মানবীয় প্রচণ্ড পাশব প্রবৃত্তিকে এত প্রবলা করিতে হয়, যেন তাহা খুনে আসিয়া পর্যবসিত হয়। অনেক সময়ে সেই প্রচণ্ডতা প্রায় অতিমানুষী হইয়া পড়ে। আমরা সচরাচর সংসারক্ষেত্রে রিপু প্রাবল্যের যে প্রকার দৃষ্টান্ত পাই, তাহাতে খুন দেখিতে পাই না। খুন জনসমাজে কিছু সর্বদাও সচরাচর ঘটিতেছে না। বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত জনপূর্ণ সমাজে দুই দশটা খুন ঘটে। সেই খুনে দেখিতে পাওয়া যায়, হয় লোভ, না হয় বিদ্বেষ, না হয় হিংসা, না হয় স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ জনিত কোপাগ্নি, অতিমানুষী সীমায় উঠিয়া খুনে পর্যবসিত হইয়াছে! সেক্সপিয়ার সংসারক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত পাইয়া তাঁহার ট্র্যাজিডির সৃষ্টি-রাজ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি লেডি ম্যাক্‌বেথ ও লর্ড ম্যাকবেথের সৃষ্টি করিয়াছেন। ওথেলো এবং ইয়েগো, রোমিও এবং জুলিয়েট, ব্রুটাস এবং রিচার্ড প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অমানুষী সৃষ্টি—ট্র্যাজিডির সম্যক্ উপকরণ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নরক-যন্ত্রণা ও দাহ। এই সৃষ্টির মধ্যে রিপু প্রাবল্য আসুরিক সীমায় আসিয়াছে। সিগেল (Schlegel) বলিয়াছেন, লেডি ম্যাকবেথ একটা (Female Fury) স্ত্রী-অসুরী। তত সাহস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নির্দয়তা কেবল অসুরেই সম্ভব। সেই লেডি ম্যাকবেথ বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে আমি যাহাকে স্তন পান করাইতেছি, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারি। আমাদের পূতনাসুন্দরীর সঙ্গে তাহার কত সাদৃশ্য! পূতনা স্তনপান করাইয়া না শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে গিয়াছিল? ততই বিশ্বাসঘাতকতা, ততই দেবদ্রোহিতা পূতনায়ও লক্ষিত হয়। যে আসুরিক প্রেমে প্রজ্বলিত হইয়া জুলিয়েট সুন্দরী রোমিওর কাছে নানা বাকছলে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার যৌবনলালসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি যদি সেইরূপ করিয়া একজন রাম বা লক্ষ্মণের কাছে যাইতেন, তাঁহার কি দশা ঘটিত? নিশ্চয় সুর্পণখার মত তাঁহার দশা ঘটিত। সুর্পণখা বিফল হইয়া মহাসমরাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, জুলিয়েট আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ

করিয়াছিলেন। সামান্য সূত্রে ইয়াগোর চাতুরীজাল এত অমানুষী সীমায় আসিয়াছিল যে তাহাতে তাহার অন্নদাতা ওথেলোকে স্ত্রী-হত্যা পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। রিচার্ড না বলিয়াছিল যে, আমি যখন প্রকৃতির হস্তে বিকলাংগ হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, তখন আমি কর্তব্যেরও অসুর হইয়া উঠিব। প্রকৃতপক্ষেও সেক্সপিয়ার তাহাকে অসুররূপেই প্রদর্শিত করিয়াছেন। আর আমরা কত বলিব?

শুদ্ধ সেক্সপিয়ারে কি আসুরিক আদর্শ? বিলাতী শ্রব্য কাব্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহাকবি মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে (Paradise lost) কি আদর্শ দিয়াছেন? তুমি বোধ হয় বহুকাল পূর্বে কলেজে মিল্টনের কিয়দংশ পড়িয়াছিলে? পরে, ঘরে বসিয়া তাহার অপরাংশের অধ্যয়ন শেষ করিয়া থাকিবে? সেই পাঠের কি রূপ স্মৃতি তোমার অন্তরে জাগিতেছে? তোমার অন্তরে সেটানের (Satan) ভীষণ আসুরিক মূর্তি ব্যতীত আর কোন মূর্তি তত জাজ্বল্যমান? শয়তান মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সর্বশক্তিমান রূপে কার্য করিতেছে। ত্রিভুবন তাহার কর্মক্ষেত্র সেই কর্মক্ষেত্রে তাহার অপরিমেয় শক্তি ও কৌশলে ভগবানের সৃষ্টি বিপর্যস্ত। যে ভগবান বাস্তবিক সর্বশক্তিমান সেই বজ্রধর মিল্টনের মহাকাব্য যে কোথায় আছেন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সয়তানের প্রভূত বিক্রম ও আসুরিক ক্ষমতা, তাহার দেব-দ্রোহিতা ও দেবদ্বেষ কাব্যময় উজ্জ্বল বর্ণে অংকিত। সয়তানের পরই "এড্যাম" এবং "ইভের" দেবদ্রোহিতা এবং দেবভক্তির বিচ্যুতি চিত্র-সয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া কেমন তাহারা পাপে অনুরক্ত হইল, এবং তাহার ফলাফল কি হইল, পাপের এই বিষময় পরিণাম দেখাইবার নিমিত্ত মিল্টনের এত প্রয়োজন। মিল্টনের মনে মানব প্রকৃতির যে তমোময় মলিন ভাব, সেই প্রকৃতিকে চিত্রিত করিবার জন্য, তাঁহার মহাকাব্যের সৃষ্টি। তবে তিনি তাহার দেবভাব দেখাইবেন কিরূপে? যে প্রকৃতির প্রভূত বল আসুরিক প্রবৃত্তি স্রোত, যে অদম্য কুপ্রবৃত্তি স্রোত কোন নৈতিক শাসনে শাসিত নহে, সেই আসুরিক প্রকৃতির পাপময় চিত্র মিল্টন আঁকিয়াছেন। যেমন কুরুপক্ষে গদাধারী আসুরিক

দুর্যোধনই প্রবল, যাহার প্রাবল্যে লোভী দ্রোণ ও কর্ণের সামরিক বীর্য অধীন হইয়া যথেষ্ট কার্য করিতেছে, কোন নৈতিক শাসন ও কাহারই সুপরামর্শ মানিতেছে না—গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সেই আসুরিক বলপ্রধান কুরুপক্ষ যেমন দেবদ্রোহী হইয়া ধর্মের বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভারতের মহা-ব্যাপার এবং তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়া পৃথিবী তোলপাড় করিতেছে, তদ্রূপ ভয়ংকর চিত্র মিল্টনের মহাকাব্য ; এই চিত্রে কলংকারোপ করে, এমত প্রতিযোগী দেব চিত্র নাই।

আর্য সাহিত্যের সৃষ্টির সম্পূর্ণতা

এই পাপপূর্ণ সংসারের অনুচিত্র আঁকা তত কঠিন নহে। কারণ পাপপূর্ণ সংসার তো পড়িয়া রহিয়াছে—যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই পাপের কলংকিত মূর্তি। সেই মূর্তি দেখিয়া তাহার ফটো তোলা। সেক্সপিয়ার এ ফটো তুলিয়া তো সন্তুষ্ট হয়েন নাই ; তিনি তদপেক্ষা অনেক দূর আসিয়াছেন। তিনি সেই ফটো হইতে লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সামান্য সংসারে নাই, অথবা যদি থাকে, ক্বচিৎ কখন তেমন আসুরিক সৃষ্টি জন্মে। আর্যকবি ঠিক ইহার বিপরীত দিক দেখান। তিনি দেখান, ধর্মের অসাধারণ মূর্তি। যে সকল ধর্ম-মূর্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ছবি আর সাহিত্যে দিবার প্রয়োজন কি? একবার চক্ষু চাহিলেই চারি দিকে সে প্রকার সামান্য মূর্তি বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। সাহিত্যে যে ছবি আঁকিবে, তাহা চিরদিনের জন্য অংকিত থাকিবে। সেই ছবিতে অসামান্য রূপ সমাবেশ চাই। সেই, অসামান্য রূপ সামান্য চিত্রের রূপ দেখিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। এই অমানুষী রূপ-সৃষ্টির আদর্শ আর্য কবিগণ তিলোত্তমায় দেখাইয়াছেন। তিলোত্তমা যেমন বাহ্য রূপের সৃষ্টি, আর্য সাহিত্যের আদর্শ সকল তেমনি মানসিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি। তিলোত্তমা পড়িতে যে সেক্সপিয়ার জানিতেন না, এমত নহে—তিনি অনেকগুলি বাহ্য তিলোত্তমা পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিলোত্তমা মিরাণ্ডা "of

every creature's best" রোসালিণ্ড এবং হর্মিয়ন্। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্যের তিলোত্তমা পড়িতে গিয়া তিনি আর্য কবিগণের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। তাঁহার মিরাণ্ডা শকুন্তলার নিকট পরাভূত হইয়াছেন। তাঁহার রোসালিণ্ড, হার্মিয়ন্, ইস্যাবেলা ও হেলেনা তত অসামান্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি নহে। কিন্তু ট্রাজিডিতে তিনি আর এক প্রকার তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়া লেডি ম্যাকবেথ প্রভৃতি যত আসুরিক দৈত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রোমিও, জুলিয়েট, টাইবল্ট্, ইয়াগো, ওথেলো, ম্যাকবেথ্, গণারিল্, জন্, রিচার্ড দি থার্ড প্রভৃতি নহিলে কি ট্রাজিডির ভয়ংকর চিত্র ও খুন সংঘটিত হয়? আমাদের সাহিত্যে এরূপ ভয়ংকর রিপুপরবশ অসুরের সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাহারা অসুর বলিয়াই কলংকিত হইয়াছে। তাহারা ধর্মদ্বেষী ও দেবদ্রোহী। মিল্টনের মহাকাব্যে একমাত্র প্রকাণ্ড অসুরের সৃষ্টি, কিন্তু আমাদের মহাকাব্যদ্বয়ে তদ্রূপ কত শত অসুর। বৃত্র, তারক, রাবণাদি অসুর ও রাক্ষসসমূহ দেবদ্রোহী হইয়া কি তুমুল কাণ্ডই না ঘটাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অসুরনাশন দেব, গন্ধর্ব ও ধর্মবীর সকলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং লোকের দৃষ্টি সেই অসুর হইতে সুরসৌন্দর্যের দিকেই পতিত হয়। তাহাতে ধর্মের জয় হয়। আর্যসাহিত্যে ধর্মের জয় অতি উজ্জ্বল মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রিপুর প্রমত্ততা ও পাপের বিক্রমকে মূর্তিমান করিয়া প্রদর্শন করা যদি মহাকবির পরিচায়ক হয়, তবে তাহার সহিত জিতেন্দ্রিয়তা এবং ধর্মকেও মূর্তিমান করিতে কি কবিত্বের পরিচয় হয় না? মানবপ্রকৃতির এক দিককে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া অন্যদিককেও সমুজ্জ্বল করা উচিত। তাহা হইলেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেওয়া হয়। ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রে শুধু সয়তানকে মূর্তিমান করিয়া দেখাইলে কি হইবে? তাহার সঙ্গে ভগবানের অষ্ট ঐশ্বর্য ও সৌম্য মূর্তিরও শোভা দেখান উচিত। তবে ত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শোভা ও ভীষণ মূর্তি জাজ্বল্যমান হইবে। আর্যসাহিত্যে এইরূপ সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য।

তাহাতে প্রকৃতি পুরুষের পার্শ্বে সংসারের কদম্বমূলে পরিশোভিতা। তাহাতে মূর্তির দুই দিকই সমান উজ্জ্বল। দেহের সকল অবয়ব সমান পরিস্ফুট ও সমপরিমাণবিশিষ্ট। তাহাতে স্কন্ধকাটার সৃষ্টি নাই। সেক্সপিয়ারে অসুরনাশন চিত্রেরও সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির তত বর্ণগৌরব নাই যদ্দ্বারা ম্যাকডফ্ কি ব্যাঙ্কো ম্যাকবেথের উপর উঠিতে পারে। রিচার্ড দি থার্ড, জন্ প্রভৃতির প্রতিযোগী চিত্র কই? তাঁহার আসুরিক কৃষ্ণমূর্তি সকল অসামান্য সৃষ্টি, তদ্বিপরীত শ্বেত মূর্তি সকল অতি সামান্য চিত্র। সুতরাং কৃষ্ণকায়গণই অধিকতর মূর্তিমান হইয়াছে। পাপের গৌরব ও ঘোর ঘটায় ধর্মনিষ্প্রভ।

পুণ্যাদর্শের আবশ্যকতা ও উৎকর্ষ

পাপের ঘৃণিত মূর্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া মানবকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া ইউরোপীয় ট্র্যাজিডির আসুরিক সৃষ্টি সার্থক করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা কতদূর পাপনিবারণ হয়, সে কথার বিচার না করিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে, ট্র্যাজিডি-পাঠের সেইরূপ সুফল সম্ভাবিত তাহা হইলেই বা কি হইল? মানবকে শুধু পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই কি যথেষ্ট হয়? মানবের পারমার্থিক ক্ষুধা কিরূপে সন্তৃপ্ত হয়? যে পারমার্থিক লালসায় উত্তেজিত হইয়া মানব জগৎকে শোভিত করিয়াছে, জগতে শান্তি ও অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছে, মানবের সেই পারমার্থিক লালসা যে অত্যন্ত প্রবলা। মানব-অন্তর যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তিরসের আধার; সে রসের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানব অহরহ ব্যস্ত রহিয়াছে। জেল দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, লোককে ধর্মশীল করিতে হইবে। কিসে সদ্বৃত্তিসমূহের তৃপ্তি-সাধন হয়, তাহার উপায় কি? তন্নিমিত্ত কি ধর্মাদর্শ সৃষ্টির আবশ্যকতা নাই? একজন পরম পবিত্র পুণ্যবান লোকের চরিত্রপাঠে যত পরিতোষ ও আনন্দ জন্মে, এবং মন যত আকৃষ্ট হয়, তত কি পাপ-চরিত্রের ভীষণ পরিণাম—কল্পনায় হইতে পারে? মহাজনের উদারতায়

এবং দানবীরের মহত্ত্বে মন যত মোহিত হয়, অন্তরের যত স্ফূর্তি হয়, তত কি আর কিছুতে হইতে পারে? পাপকণ্টক কাটিয়া মনুষ্যের মনে সুবীজ রোপণের বিশিষ্ট উপায়—পুণ্যের পবিত্রতাদর্শন ও ধর্মাদর্শ।

পাপের ঘৃণিত মূর্তি সর্বদা দেখিলে যেমন পাপস্পর্শ ঘটে, তেমনি ধর্মের পুণ্যজ্যোতি সর্বদা দেখিলে মনের মলিনতা অপনীত হইয়া পবিত্রতার সঞ্চার হয়। ধর্মময় যুধিষ্ঠির ও রামের চিত্র সর্বদা কল্পনায় রাখিলে কি মন পবিত্র হয় না? অথচ যুধিষ্ঠির ও রামের পবিত্রতা সচরাচর মানবে পরিদৃষ্ট হয় না। তাহাদের পুণ্যময় চিত্র অসাধারণ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইলেও, মানব সমাজ তাঁহাদের আদর্শে উন্নীত ব্যতীত কিছু অবনত হইবে না। পুণ্যের আকর্ষণ এমনি, পবিত্রতার লাবণ্য এমনি, ধর্মের জ্যোতি এমনি যে, অতিমানুষ হইলেও তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মানব সেই ক্ষমতায় নীয়মান না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদের অতিমানুষ—ধর্ম ভুলিয়া গিয়া মানবসমাজ সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, সেই লাবণ্যে মোহিত হয়, এবং সেই জ্যোতিতে আলোকিত হয়। মানব—প্রকৃতিতে যে দেবত্বের সমাবেশ আছে, সেই দেবত্বের সহিত এই আকর্ষণ-শক্তি। নহিলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৌরাণিক ধর্মবল কিরূপে হিন্দুসমাজকে চালাইয়া আসিতেছে, তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে? হিন্দুসমাজ আজিও অসাধারণ ধর্মভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সাহিত্যে অতিমানুষের উপকরণ

যাহা অলোকসাধারণ, তাহাই অতিমানুষ। অতিমানুষ না হইলে প্রাকৃত জনগণের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। যাহা সর্বদা ও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, সুতরাং অনেককাল স্মরণ থাকে। যাহা সাধারণ লোকের কল্পনাতীত, তাহাই কবির সৃষ্টি-রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং কবির সৃষ্টি প্রায় অদ্ভুত হইয়া পড়ে। অদ্ভুতকে আরও অদ্ভুত এবং চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি প্রকৃতির সীমা একটু অতিক্রম করিয়া অতিমানুষে আসিয়া পড়েন।

লেডি ম্যাকবেথ সেই একটু প্রকৃতি-অতীত সীমার দৃষ্টান্ত। ওথেলো ও কিয়দংশে অস্বাভাবিক চিত্র। তদ্রূপ রিচার্ড্ দি থার্ড, গনারিল্, ব্রুটস্, জন্ প্রভৃতি। মহাকাব্যের কল্পনায় এই অতি-প্রাকৃতিক বা অতিমানুষী কল্পনা কিছু অধিকতর দেখা যায়। কারণ, অতি অদ্ভুত নহিলে লোকের চিরস্মরণীয় হয় না। মিণ্টনের সয়তানের কল্পনা অতি অদ্ভুতে পরিপূর্ণ। অতি অদ্ভুত বলিয়া সেই সৃষ্টি এত মহান্ ও প্রকাণ্ড যে, মানবকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। তদ্রূপ এড্যাম এবং ইভের সরলতা এবং পবিত্রতা অতি অদ্ভুত। তাঁহার নরকের চিত্র যত অদ্ভুত ও বিস্তৃত, Paradise এর বর্ণনা তত নহে। এজন্য তাঁহার নরকচিত্রই অধিকতর স্মরণীয় হইয়াছে।

পাপের অতিমানুষ চিত্রের দোষ এই, মিণ্টনের সয়তানের মত, তাহার প্রকাণ্ডতা, উচ্চতা এবং গাম্ভীর্যে মন এত আকৃষ্ট হয় যে, সেই চিত্রকে যতদূর ঘৃণার্হরূপে সৃষ্টি করা অভিপ্রেত, তাহা তত ঘৃণার্হ বোধ হয় না। কারণ তাঁহার প্রকাণ্ডতা বা অদ্ভুতরসে কতকটা চিত্তরঞ্জন ঘটে। সয়তানের অদ্ভুত ও বৃহৎ কল্পনায় মন মোহিত হওয়াতে, তাহা তত ঘৃণার্হরূপে প্রতীয়মান হয় না। অথচ সয়তান স্বয়ং পাপমূর্ত্তি। কিন্তু অতিমানুষ পুণ্যের চিত্রে এরূপ কুফল ফলে না। পুণ্যচিত্র মাত্রই ত সাধারণ জনগণের চিত্তরঞ্জন, তাঁহাতে সেই চিত্রে অদ্ভুতের সঞ্চার হওয়াতে সামান্য জনগণ দ্বিগুণ মোহিত হয়। প্রাকৃতিক কি না, এ বিষয়ে তাহারা বিচার করিতে যায় না। অতিমানুষ পুণ্যের পবিত্রতায় তাহাদের মন এত মোহিত হইয়া পড়ে যে, সে বিচার অন্তরে স্থান পায় না, বা মুখেই উদিত হয় না। সেই পবিত্রতা তাহাদের কল্পনাকে চিরদিন অধিকার করিয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনুষ্যের পশুবৃত্তি। দয়া, দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি তাহার দেবভাব। কাম, ক্রোধ, লোভাদির অতি অদ্ভুত কল্পনা আসুরিক এবং দয়া, ধর্ম্ম, ভক্তি প্রভৃতির অতি অদ্ভুত কল্পনাই দেবোচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই আসুরিক কল্পনার সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য্যে দিব্য কল্পনা বিমলিন ও প্রচ্ছন্ন, কিন্তু আর্য সাহিত্যে

ঠিক তাহার বিপরীত। তথায় পাশব মানবপ্রকৃতি, দিব্য প্রকৃতির ছটায় নিষ্প্রভ। রামের পুণ্যজ্যোতি মানবকল্পনাকে এত অধিকার করিয়াছে যে, রাবণের চিত্র আর স্মরণ থাকে না, তাহা যেন পাপান্ধকারে বিসর্জিত হয়। ভরত ও রামের প্রগাঢ় পুণ্যরসে মন এত বিগলিত হয় যে, তাহাতে কৈকেয়ী ও মন্থরাকে অধিকতর ঘৃণিত বোধ হয়। তাহাদের পাপ কল্পনা, ভরত ও রাম এবং কৌশল্যা ও সীতার চরিত্রকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পাপের নিশান্ধকারে অস্ত গিয়াছে।

অতিমানুষ ধর্মাদর্শ যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরে, অতিমানুষী ভ্রাতৃভক্তি তেমনি ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবে। পিতৃভক্তি পুরু ও ভৃগুরামে। ভৃগুরাম বুঝি পিতৃভক্তির অবতার ছিলেন। তিনি সেই পিতৃভক্তিতে চালিত হইয়া পিত্রাদেশ-পালনার্থ মাতৃহত্যা পযন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মাতাকে পুনর্জীবিতা করিতে পারিবেন, এমন আশা ছিল বলিয়া তিনি মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বাস্তবিক তিনি সেই মাতাকে পুনর্জীবিতা করিয়াছিলেন। এতদ্বারা সামান্য জনগণের মনে পিত্রাদেশের গৌরব-বৃদ্ধি করাই কবির উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্য বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়াছে। মহাকাব্যের সৃষ্টি-চাতুয দেখাইতে হইলেই অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করা চাই। তাই অদ্ভুত রসেই গাম্ভীযসাধন হয়। মিণ্টনের সয়তান সৃষ্টিতে যেমন অদ্ভুতের প্রকাণ্ড রচনা দেখা যায়, আমাদের মহাকাব্যেও তেমনি অদ্ভুত কাণ্ড সকল বর্ণিত হইয়াছে। না হইলে রসের প্রগাঢ়তা হয় না। পিতৃভক্তির অতিমানুষী পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্যই তদ্রূপ অদ্ভুত মাতৃহত্যার কাণ্ড কল্পিত হইয়াছে। পরশুরাম সেই পিতৃভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। মাতৃভক্তির অবতার পঞ্চপাণ্ডব। পিতৃগণের প্রতি ভক্তিবশত ভগীরথ কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছিলেন। পতিভক্তির দৃষ্টান্ত আমাদের আর্য সাহিত্যে অসংখ্য ;—সতী, পার্বতী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কুন্তী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী প্রভৃতি। তাঁহাদের

অমানুষ প্রেম ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। দানবীর কর্ণ, বলি ও হরিশ্চন্দ্র। অমানুষ সত্যপালন রামচন্দ্র। অমানুষ ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ।

আর্য-সাহিত্যের একদিকে এই সমস্ত ধর্মাদর্শের পবিত্র সৌন্দর্য, অন্য দিকে আসুরিক সৃষ্টিসমূহে পাপের ঘৃণিত মূর্তি ও ভীষণ পরিণাম। এক দিকে পাপের দমন, অন্যদিকে পুণ্যের আকর্ষণ—এই উভয়বিধ চিত্রে সম্পন্ন হইয়া আর্য সাহিত্যের আদর্শ যেমন জনসমাজকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে, তেমনি পুণ্যের পথে আকৃষ্ট করে। সে আদর্শ মানবকে কেবল নিষ্পাপ নহে, তাহাকে দেবতা করিতে চাহে। তদপেক্ষা উচ্চাদর্শ আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না।

এই দেখুন, আর্য সাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র মানচিত্র আমাদের এই কথা কেমন সমর্থন করিতেছে।

ভীমসেনের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভংগ হইলে, যখন তিনি শোণিতাক্ত হইয়া কাতরস্বরে রোদন করিতেছিলেন, তখন অশ্বত্থামা তাঁহার সন্তোষার্থ পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক আনিবার জন্য সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ঘোর নিশীথে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া যে বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হন তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই হত্যাকাণ্ড ও শিশুমস্তকচ্ছেদনের কথা শুনিলে কাহার শরীর না শিহরিয়া উঠে? যে দুর্যোধনের সান্ত্বনার্থ তিনি এ কার্যে লিপ্ত হন, তিনি পর্যন্ত তাহাতে সন্তোষলাভ করা দূরে থাক্, বরং বিষণ্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কুরুপক্ষীয় এই ভয়ানক আসুরিক বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া কাহার মনে ঘৃণার সঞ্চার না হয়? কিন্তু এই পাপচিত্রের পরই পাণ্ডবপক্ষে কেমন এক বিপরীত সুন্দর দৃশ্য অভিনীত হইতেছে! দ্রৌপদী পঞ্চ শিশুর হত্যা শুনিয়া কাঁদিয়া অধীরা হইয়াছেন; তাঁহার কাতরতা দেখিয়া অর্জুন তাঁহার প্রবোধার্থ এই বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন,—"দেবি! আমি এখনি তোমাকে সেই নৃশংসের পাপমুণ্ড আনিয়া দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি স্নান করিলে তাহার পাপ-কার্যের কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে।" তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তিনি অশ্বত্থামাকে আবদ্ধ করিয়া আনিয়া দ্রৌপদীর সমক্ষে উপনীত করিয়া

দিলেন। সেই পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী তাঁহার পঞ্চশিশুহন্তাকে দেখিয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত আছে।

পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর এত দূর ক্ষমা, এত দূর ধর্মানুরাগ দেখিলে কাহার চিত্ত না মোহিত হয়! এই অমানুষী সহৃদয়তা, ক্ষমা ও ধর্মানুরাগের চিত্র নিশ্চয়ই অশ্বত্থামার ঘোর বীভৎস চিত্রকে ঢাকিয়া ফেলে, এবং চিত্তকে এত উদারতায় পূর্ণ করে, এত শান্তরসে আর্দ্র করে, এত ধর্মানুরাগে অনুরক্ত করে যে, সেই পাপচিত্রের স্মৃতি যেন মন হইতে অপনীত হয়, এবং ধর্মের প্রভূত বল—যে বলে দ্রৌপদী গুরু-পুত্রকে দেখিবামাত্র উত্তেজিত হইলেন, শোক তাপ সব দূরে গেল—সেই বল অন্তরে অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে।

সাহিত্যে রসের ক্ষেত্র

ট্র্যাজিডির উচ্চতা ভয়ানক এবং করুণ রসে। কিন্তু ট্র্যাজিডির পরিণামে খুন ঘটাতে বীভৎস রসের ঘোর সঞ্চারে কি ভয়ানক, কি করুণ, উভয়কে মন্দীভূত করে। স্বচক্ষে খুন দেখিলে, কি খুনের নাম শুনিলে, কি স্মৃতিপথে খুনের উদয় হইলেই অমনি বীভৎসের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে এবং হৃদয় কম্পিত হয়। সেই ভাব একেবারে তিরোহিত না হইলে আর অনুকম্পার উদয় হয় না। অনুকম্পা কাহার জন্য হয়? যে ব্যক্তি খুন হয়, সর্বস্থলে যে তাহার প্রতি অনুকম্পা হয়, এমত নহে। একটী প্রকৃত ঘটনা লইয়া দেখ, "নবীন-এলোকেশী"র খুনে পাপীয়সী এলোকেশীর প্রতি সাধারণ লোকের অনুকম্পা উদয় হয় নাই, নবীনই অনুকম্পার ভাগী হইয়াছিল। তদ্রূপ "হ্যামলেট" নাটকে খুনকারী ছোট হ্যামলেটের প্রতিই অনুকম্পার উদয় হয়। লর্ড ম্যাকবেথ্ নিহত হইলে কি তাহার নিমিত্ত তত অনুকম্পা হয়, না কীচক ও দুঃশাসন বধে তাহাদের প্রতি অনুকম্পার সঞ্চার হয়? কিন্তু যেখানে ধর্ম্মপক্ষ নিগৃহীত বা নিহত হয়, সেইখানেই সেই নিগৃহীত ও নিহত ব্যক্তি অনুকম্পা-ভাজন হন। সাবিত্রী, সীতা দময়ন্তী, শকুন্তলা, কৌশল্যা, কুন্তী, উত্তরা, পঞ্চ পাণ্ডব, ডেস্‌ডিমোনা,

কিং লিয়র, কনস্ট্যান্স্, অফেলিয়া প্রভৃতি এ কথার প্রশস্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু ট্র্যাজিডির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তদধিক আর কিছু হয় না। ট্র্যাজিডি পাপের শেষ নরককুণ্ড, এবং পাপ ক্রমে ক্রমে কেমন ঘোর ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে, তাহা দেখাইবার যেমন প্রকৃষ্ট উপায়, বিভিন্ন অবস্থায় পুণ্যের জ্যোতি কেমন ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা সম্যকরূপে প্রদর্শন করিবার তেমন উপায় নয়। "কিং লিয়রে"ও তাহা ঘটে নাই। রাজা নিগৃহীত হইয়া কেবলমাত্র অনুকম্পা-ভাজন হইয়াছেন। একদিকে কর্ডেলিয়া, অন্য দিকে অপর দুই কন্যার চরিত্র এবং সংসারের গতি বিলক্ষণ বিকাশ করিয়া দেখাইবার নিমিত্তই যেন রাজার নাটক-মধ্যে সমাবেশ। যেরূপে রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠিরের চরিত্র নানাবিধ দুরবস্থায় দলে দলে পদ্মফুলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই চরিত্রের স্ফূর্তি হইয়াছে, এক মহান্ ধর্মাদর্শের সৃষ্টি হইয়া শান্ত-রসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা যেমন আর্য্য সাহিত্যের অন্তর্গত মহাকাব্যের প্রকাণ্ড প্রসারে সম্ভাবিত হইয়াছে, এমত আর কিছুতেই হয় নাই। "শকুন্তলায়" দুষ্মন্ত-চরিত্রে যে ধর্মভাব বিদ্যমান, তাহা যুধিষ্ঠির কিম্বা রামের উচ্চতায় উঠে নাই। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডির কথা দূরে থাক্, তাহার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ত একথা মূলেই সম্ভাবিত নহে; এমন কি, বিলাতী, ল্যাটিন এবং গ্রীক মহাকাব্যে কি সেরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়? তাহাতে শৌর্য-বীর্যের বিকাশ আছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং রামের মত তেমন ধর্মবীরত্বের প্রকাণ্ড মূর্তির সৃষ্টি কই? রাম এবং যুধিষ্ঠির মানবের কল্পনাকে একেবারে জুড়িয়া বসে,—যেন সেখানে আর কিছুরই সমাবেশ হইবার যো নাই। তাঁহারা কি কেবল লোকের অনুকম্পা-ভাজন না ধর্মবীরের প্রকাণ্ড চিত্র? তাহাদের সেই সমগ্র-কল্পনা-বিস্তৃত চরিত্র দর্শনে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, পাঠকের মনে এত শান্তরসের সঞ্চার হয় যে, তাহাতে অনুকম্পা আর স্থান পায় না।

অনুকম্পায় ডেস্‌ডিমোনা উদ্ভাসিতা। রাজা লিয়র এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন যে, তাঁহার দুরবস্থায় কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়।

কনস্ট্যান্স্ পুত্রশোকে পাগলিনী, যেমন পাগলিনী পতিবিয়োগবিধুরা উত্তরা। তাহারা সকলেই পরকে কাঁদাইয়া বড় হইয়াছে। তাহারা নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইয়াছে। কিন্তু সেই পর্যন্তই শেষ। ট্র্যাজিডির ঘোর অন্ধকার ক্ষেত্রে ডেস্‌ডিমোনা একটী ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। দিনদেবের প্রখর জ্যোতি যখন রাহুগ্রস্ত হয়, যখন সেই রাহুর ছায়াপাতে দিবসের মুখ ম্লান হয়; দিবা দ্বিপ্রহর যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন যেমন একটী ক্ষুদ্র তারকার সামান্য জ্যোতি দেখা যায়, ডেস্‌ডিমোনা সেইরূপ একটী নক্ষত্র। নাটকের কৃষ্ণতায় তাহার শ্বেতচিহ্ন একটু ফুটিয়াছে। অনুকম্পা সেই চিহ্নকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ট্র্যাজিডির কার্যই এইরূপ। ট্র্যাজিডি পাপ ছবির ঘোর অন্ধকারে ধর্মের একটু জ্যোৎস্না ফুটাইতে চাহে। কিন্তু তাহাতে ধর্মের সম্যক ছবি ও তেজ দেখা যায় না। ট্র্যাজিডি একাধারে তত স্থান পায় না। ধর্মের ঈষদাভাষ ব্যতীত তাহার মুখের সম্যক বিকাশ করিয়া দেখাইতে গেলে, ট্র্যাজিডির রসভংগ ঘটে। ভয়ানকই তাহার প্রধান রস, করুণা তাহার পরিণাম। সেই রসে ধর্ম যতদূর ফুটে, ততদূর পর্যন্তই তাহার সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্মকে অধিকতর ফুটাইতে গেলে শান্তিরসের আবির্ভাব ঘটে; তার ট্রাজিক রস থাকে না। এজন্য ট্র্যাজিডি শান্তিরসকে প্রবল করিতে পারে না। শান্তিরস প্রবল হইয়াছে—আর্য সাহিত্যে, নাটকে ও মহাকাব্যে। সুতরাং তাহাতে ধর্মের জ্যোতি সম্যক্ বিকীর্ণ হইয়াছে।

সাহিত্যে বীরত্ব

ট্র্যাজিডিতে পাপচিত্র যেমন ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে,—পাপের গতি ক্রমে ক্রমে যেমন উচ্চতায় উঠিয়াছে, আর্যসাহিত্যে ধর্ম তদ্রূপ। আর্যসাহিত্যে ধর্মের বীরত্ব। মিল্টনে যেমন পাপের বীরত্ব ও জয়, আর্যমহাকাব্যে তেমনি ধর্মের বীরত্ব ও জয়। সেই বীরত্বকে সম্যকরূপে ফুটাইবার জন্য, তাহার পার্শ্বে আর দ্বিবিধ বীরত্বের বিকাশ আছে। এক বীরত্ব ভীমের শারীরিক বলবীর্য, অন্য বীরত্ব

অর্জুনের শৌর্য ও সামরিক বীরত্ব। ভীমের মহাশক্তি দুর্যোধনে ছিল বলিয়া, দুর্যোধন ভীমের প্রতিযোগী। ভীমের বীরত্ব ধর্মাধীন, দুর্যোধনের বীরত্ব তাহা নহে। সেইরূপ অর্জুনের প্রতিযোগী কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিযোগী দ্রোণ। কর্ণের আসুরিক বীরত্বের প্রতিযোগী ঘটোৎকচ। ভীষ্মের প্রতিযোগী সমস্ত পাণ্ডববীর, যেমন অভিমন্যুর প্রতিযোগী সমস্ত কুরুবীর। কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতিযোগী কে? তিনি অর্জুনের বা ভীমের ন্যায় বীরত্বে প্রবীণ নহেন। সে বীরত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি কর্ণের কাছে অপ্রতিভ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বীরত্বে প্রধান, সে বীরত্বের উচ্চতায় অর্জুন, ভীম, সকলেই অবনত। অবনত বলিয়া ভীম ও অর্জুনের গৌরব এবং সামরিক বীরত্ব হইতে তাঁহার ধর্ম-বীরত্বের পার্থক্য। সেই ধর্ম্ম বীরত্বের উচ্চতা কুরুপক্ষে কেবল বিদুর ও ভীষ্মদেবে ছিল; পাপপক্ষে তাঁহাদের বীরত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্মতেজ কেমন ক্রমশই উচ্চতায় উঠিয়াছে, তাহা পাণ্ডবপক্ষে প্রতীয়মান। ধর্মের এই প্রশান্ত আদর্শ আর্যসাহিত্যে। আর আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের মহান চরিত্রের আলোচনায় প্রতীত হয়, পাপপক্ষের বল ও কৌশল যত কেন শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না, তাহা দৈববল ও কৌশলের নিকট একেবারে পরাভূত। দৈববল সর্ব্বোচ্চ বল, দেব-পক্ষই সর্বোৎকৃষ্ট পক্ষ। দেববীর্য মানবীয় সর্ববিধ বীর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পার্থিব সকল বলের উপর দৈববল বিজয়ী। ধর্ম অবশ্য দৈববলের আশ্রিত, সেই দৈবাশ্রিত ধর্মপক্ষের সমকক্ষ কি পাপপ্রবণ ও পার্থিব বলে বলীয়ান্ কুরুপক্ষ হইতে পারে? কুরুপক্ষে ধর্মের বীরত্ব ছিল না, সুতরাং দেবপক্ষেরও সহায়তা ছিল না; এই নিমিত্ত তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

সাহিত্যে দেবত্ব

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম কি ভারতের নায়ক?—না, ভীম যে যুধিষ্ঠির কর্তৃক শাসিত; অর্জুনও তদ্রূপ; নিজে যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণাধীন। তবে ধরিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই ভারতের নায়ক। যিনি

বিশ্বরাজ ও ব্রহ্মাণ্ডপতি, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান, ভারতক্ষেত্রে তিনি ধনুর্ধারী হয়েন নাই বটে, কিন্তু সর্বঘটে ও সর্বস্থানেই তাঁহার শক্তি ও কৌশল অখণ্ডনীয় এবং বিজয়ী। সহস্র সহস্র নারায়ণী সেনা এক নারায়ণের সমতুল্য নহে। সমস্ত কুরুবীর তাঁহার কৌশল-শক্তিতে পরাভূত! মহাভারতের মধ্যে যেমন পদে পদে তাঁহাকে অনুভব করা যায়; মিল্টনের মহাকাব্যে কি সেরূপ হয়? তথায় ভগবান নির্জীব ও অদৃশ্য। তিনি তেমনই নির্জীব, যেমন রামচন্দ্র মাইকেলের "মেঘনাদবধে"। কিন্তু এই রামচন্দ্র রামায়ণের মহাকাব্যে কি মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন?

মহাভারতে যে পর্ব, রামায়ণেও সেই কাণ্ড। প্রভেদ এই, রামায়ণে এক রামচন্দ্রে সকল বীরত্ব একত্রীভূত; মহাভারতে যাহা ভীমের বল, অর্জুনের বীরত্ব এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্মগৌরব, সে সমস্তই একেবারে রামচন্দ্রে সমাবিষ্ট। তিনি তদপেক্ষাও অধিক। রামচন্দ্রে শুধু যে বল, বীর্য ও ধর্ম, এমত নহে; তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের দেবশক্তিও দেদীপ্যমান। এই রামচন্দ্রের প্রভূত শক্তিকে বিশিষ্ট করিয়া ব্যাস কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব-পক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামচন্দ্র রামায়ণের মধ্যে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তাঁহার মূর্তি যেমন উজ্জ্বল, তেমন উজ্জ্বল রামায়ণে আর কে? বাল্মীকি সেই রামচন্দ্রে সমস্ত বলবীর্য ও শক্তি নিহিত করিয়া দিয়া, আবার সে সমুদায় একে একে বিশেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যে ত্রিবিধ বীরত্ব ভারতের ভীমার্জুন ও যুধিষ্ঠিরে, সেই ত্রিবিধ বীরত্ব রাম, লক্ষ্মণ ও হনূমানে। রামে একদা সর্ববিধ বীরত্ব; —আবার লক্ষ্মণ ও হনুমানের পার্শ্বে তাঁহার ধর্মবীরত্ব অধিকতর জাজ্বল্যমান। ধনুর্ভংগপণে ও অসুরনাশনে তাঁহার ও ভীমের বীরত্ব সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। ভার্গববিজয়ে ও রামায়ণের যুদ্ধকালে তাঁহার অসামান্য শৌর্য ও সামরিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অথচ তিনি ধর্মবীরত্বে লক্ষ্মণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্মবীর রামচন্দ্রের বীরত্বের পরিচয় অযোধ্যা হইতে তাঁহার বনগমনকালে যেমন, বনে বনে আশ্রমবাসী ঋষিগণের কাছে, সুগ্রীবপক্ষীয় বানর

জাতির কাছে, এবং রাক্ষস কুলের কাছেও তেমনি। সেই বীরত্বে সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান এবং রাক্ষসপক্ষীয় মারীচ প্রভৃতি সমুদায় ধর্মপ্রাণ রাক্ষসকুলও অবনত। মন্দোদরী বারম্বার রাবণকে সন্ধি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। কেন করেন? কেবল কি রামকে মহাবীর জানিয়া সকলে রামের বিক্রমে ভীত হইয়াছিলেন? তদপেক্ষা অন্য এক বিক্রম রামচন্দ্রে ছিল। সে বিক্রম তাঁহার দৈববল। যে বলের তেজ রামচন্দ্রে ছিল, সেই দৈববলের বিক্রম অনুভব করিয়া মন্দোদরী পর্যন্ত বলিয়াছিলেন,—

"আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাম জন্ম, বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী, প্রকৃতি-প্রবর্তক, সৃষ্টিকর্তা, পরমপুরুষ সনাতনই হইবেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস-শোভিত, সেই ক্ষয়রহিত, পরিমাণশূন্য সত্যপরাক্রম, অজেয়, সর্বলোকেশ্বর, শ্রীমান্, মহাদ্যুতি, লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক-সকলের হিতকামনায় মানুসরূপ ধারণ করিয়া বানররূপাপন্ন দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস পরিবারগণের সহিত মহাবল, মহাবীর্য, ভয়াবহ, দেবশক্র রাক্ষস-রাজকে বধ করিয়াছিলেন।" লংকাকাণ্ড—১১৩ অধ্যায়।

তবেই এক রামচন্দ্রে বাল্মীকি, সমগ্র পার্থিব বল দৈববলের সহিত নিহিত করিয়া, তাঁহাকে এক অদ্বিতীয় বীররূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে সৃষ্টির বিশ্লেষণ—শ্রীকৃষ্ণ, ধর্মপুত্র, অর্জুন ও ভীম। এক এক অপূর্ব মহান্ সৃষ্টি, সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও পরমেশ্বরের বল একাধারে সন্নিবিষ্ট। তত বড় মহাকল্পনা আর কি হইতে পারে? ট্র্যাজিডি এত উচ্চতায় কি উঠিতে পারে? ধর্মের এত উচ্চ গৌরবে, ট্র্যাজিডির উপনীত হওয়া অসম্ভব। বিলাতী আসুরিক ও পার্থিব বলবীর্যপূর্ণ-কল্পনা-সমন্বিত মিল্টন্ কখন সে উচ্চতায় যাইতে পারেন নাই। তিনিই শিব গড়িতে গিয়া তাঁহার মহাকাব্যে ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রীক এবং লাটিন মহাকাব্যে পার্থিব বল ও আসুরিক বীর্য। অন্য দেশীয় মহাকাব্যে এই বাল্মীকির সৃষ্টি ও সুরসৌন্দর্য কোথায়! এই ধর্মাদর্শ, বীরত্ব-সৃষ্টি ও সুরশোভাবিকাশের বিস্তারিত লীলাক্ষেত্র রামায়ণ

ও মহাভারতে। আর্যকবিগণ এই মহাকাব্যের মহাসাগর হইতে বারি আহরণ করিয়া এক এক ক্ষুদ্র কাব্যের সৃষ্টি করিয়া ভূলোকে মন্দাকিনীর স্বর্গস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই স্রোতে অবগাহন করিলে লোকে স্নিগ্ধ হয় ও অমৃতাস্বাদন করে। সে অমর সুধা কি আর কোন জাতির সাহিত্যে পাওয়া যায়? তাহা কেবল ভারতের অমূল্য নিধি, অপূর্ব সৃষ্টি ও দিব্য সৌন্দর্য। তাহার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যে জগৎ মোহিত!

সাহিত্য, ১৩০২

সাহিত্যে অভিশাপ

পূর্ণচন্দ্র বসু

বিলাতী সাহিত্যে অভিশাপ নাই

আর্যভারত ভিন্ন আর কোন দেশের সাহিত্যমধ্যে অভিশাপ পরিদৃষ্ট হয় না। শুধু পরিদৃষ্ট নহে, আর্যসাহিত্যমধ্যে অভিশাপের ছড়াছড়ি। ছড়াছড়ি কি? অভিশাপ আর্যসাহিত্যের অস্থি-মজ্জা। অভিশাপের উপকরণে আর্যসাহিত্যের অনেক কাব্য-নাটক সংগঠিত হইয়াছে। পুরাণাদি অভিশাপে ভরা; সেই অভিশাপ সুতরাং পৌরাণিক কাব্যাবলির মূলমন্ত্র হইয়াছে। কাব্যের মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের মূল এই অভিশাপ। তাই আমরা দেখিতে পাই, কালিদাসের প্রধান কাব্য-নাটকে এই অভিশাপেরই স্ফূর্তি ও পরিবর্ধন। আর্যসাহিত্যেই কেবল অভিশাপ আছে, অন্য দেশীয় সাহিত্যে তাহা নাই কেন, এ কথা কি কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যদি না ভাবিয়া থাকেন, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, বিলাতী সাহিত্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে, যাহা আর্যসাহিত্যে নাই। এক্ষণে দেখাইব, আর্যসাহিত্যে আবার এমত সকল সামগ্রী আছে, যাহা বিলাতী সাহিত্যে নাই। তন্মধ্যে এই অভিশাপ প্রধানত গণ্য। প্রধানত বলি এই জন্য, যেহেতু, এই অভিশাপই এই দুই সাহিত্যের প্রকৃতি বিভিন্ন করিয়া দিয়াছে। কিরূপে দিয়াছে, তাহা এই প্রস্তাবে আলোচ্য।

অভিশাপ সামাজিক শাসন

ধর্মপ্রাণ আর্যজাতির সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ধর্মার্থ গৃহীত হইত এবং আজিও হইয়া থাকে। ধর্মের প্রতি হিন্দুর প্রবৃত্তি আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত যত কাম্য কর্মের শেষে সেই সেই কর্মের ফলশ্রুতি আছে। আর্যসাহিত্যের ফলশ্রুতি দ্বারা যেমন সেই সাহিত্যের বিশেষত্ব ও ধর্ম নির্ণীত হয়, সেই ফলশ্রুতি তেমনি প্রতি কাম্য-কর্মের ও ব্রতানুষ্ঠানের বিশেষ ফলাফল নির্দেশ করিয়া দেয়। হিন্দুর সাহিত্য-পাঠ যেমন বৃথায়

নহে, শুধু চিত্তরঞ্জনমাত্র নহে, তাহার কাম্য-কর্মানুষ্ঠানও তেমনি বৃথায় নহে। সর্বথা তাহার ধর্ম-প্রবৃত্তির উন্মেষসাধন ও উত্তেজন করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ধর্মপথে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত আর এক বিশেষপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। পাছে হিন্দু ঘুণাক্ষরে ধর্মপথ হইতে বিচলিত হন, তাই তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে, কাব্য-নাটকে এবং সর্ববিধ সাহিত্যে অভিশাপের ভীষণ মূর্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অভিশাপভয় লোকের অন্তরে অন্তরে লাগে। সেই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে অতি সাবধানে সংসারকার্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা রাজ-দণ্ড ভয় নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অতি গুরুতর দণ্ডভয়। লোকে রাজদণ্ড এড়াইতে পারে, কিন্তু শাপভয় এড়াইতে পারে না। কে কবে লোকের অহিত করিয়া, লোকের মনোবেদনা দিয়া পরের অভিশাপ হইতে নিস্তার পাইয়াছে? অভিশাপ যে অতি গোপনে মনে মনে প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিজে রাজাও প্রজার অভিশাপ-ভয়ে ভীত। গুরুর শাপ লঘুতে লাগে, লঘুর শাপ গুরুতে লাগে। তজ্জন্য হিন্দু অনেক সময়ে অনেক অধর্মাচার ও রূঢ় কার্য হইতে আপনা-আপনি নিরস্ত হন। এ কিছু কম সামাজিক শাসন নহে? পাছে হিন্দুকে শাপগ্রস্ত হইতে হয়, পাছে সেই শাপের ফলাফল কালবিলম্বে ভোগিতে হয়, এই ভয়ে হিন্দু সশঙ্কিত। এই আশঙ্কা ও দেবকোপ-ভয় সর্বলোক-মনে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত সর্বত্রই অভিশাপ পরিদৃষ্ট হয়।

ধর্ম-লঙ্ঘনের ফল অভিশাপ

হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি ধর্মের গতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বেদ-বেদান্তের অতি সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ়তম ধর্মতত্ত্ব-সকলের ব্যাখ্যা করিবার জন্য আর্য দর্শনশাস্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার নির্ণীত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে হিন্দুর সমস্ত কর্তব্যপথ এত সুন্দর ও পরিপাটীরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তজ্জন্য তাহার কর্তব্য-অবধারণের আর কোন সাহায্য আবশ্যক হয় না। সেই কর্তব্যপথ হিন্দুধর্মের মহা শিক্ষাপ্রণালী। যে মুনি-ঋষিগণ দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরেরা এই কর্তব্যপথের পরম গুরু ও নেতা।

সামান্য লোকে কর্তব্যাকর্তব্য-নির্ণয়ে অসমর্থ বলিয়া আর্যসাহিত্যে সকল শাস্ত্রের শিক্ষাদাতা আপ্তগণ ও ঈশ্বরেরা। ঈশ্বর-বাক্য ও ঈশ্বরসম আপ্তগণের বাক্য বলিয়া তৎপ্রতি কাহারই সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। এই কর্তব্য-পথে তাপস জনগণেরও যখন ঈষৎ পদস্খলন হইয়াছে, অমনি তাঁহাদিগকে দেবকোপ-ভাজন হইয়া শাপগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। সুতরাং এই অভিশাপ হিন্দুর কর্তব্যাকর্তব্যের অতি সূক্ষ্ম পাপ-কলঙ্ক সমস্ত নির্দেশ করিয়া দেয়; দেখাইয়া দেয়, তাপসজনেরাও ধর্মের ক্ষুরধারে পড়িয়া কোথায় অতি সূক্ষ্ম পাপে পতিত হইলেও তাহাদিগকে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ ধর্মপথে পরিবর্ধিত হইতে হইত। কারণ:—

"Man's glory consists not in never falling, but in rising every time he falls."

তপস্বিগণ জীবের এই স্বভাবসিদ্ধ ধর্মপথে বিচরণ করিতে করিতে একেবারে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত না হইতে পারিলে ঋষিত্বে উপনীত হইতে পারিতেন না। অভ্যাসযোগে এই ধর্মপথ সহজ হইয়া আইসে। ধর্মপথে কোথায় একটু বাধিতেছে, তাহা তাঁহাদের দেবচরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণ সেই চরিত্র বিশিষ্টরূপে দেখাইবার জন্য কোথায় ঋষিগণের পদস্খলন হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দেয়। সম্পূর্ণ ঋষিত্ব লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা লাভ করিতে হয়। শাপান্ত হইলে তবে সেই বিশুদ্ধতা লব্ধ হয়। দেবর্ষি নারদ সেইরূপ ঋষিত্ব লাভ করিবার পূর্বে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যে দুর্বাসা এত লোককে শাপ দিয়াছিলেন, তিনিও এককালে তদীয় শ্বশুর ঔর্বঋষি-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ, হিন্দুর নিকট স্বর্গও চরমগতি নহে। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মত্ব লাভ করিবার পূর্বে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন বশিষ্ঠকর্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপদই ঋষির পরম পদ।

অধ্যাত্ম-রাজ্যের অলংঘ্য নিয়ম

এ সংসারের কার্যক্ষেত্রে ধর্মাধর্মের অলংঘ্য ফলাফল কি সকল সময় পরিদৃশ্যমান হয়? যাঁহার যেরূপ শিক্ষা ও অন্তদৃষ্টি, তাঁহার কাছে

এই ফলাফল সেইরূপে প্রতীয়মান হয়। আগুনে হাত দিলেই হাত পুড়িবে; তেমনি কার্যমাত্রেরই ফল আছে। সেই ফল কখন কখন বাহিরে প্রকাশিত হয়, কখন হয় না। কি চিন্তা, কি প্রবৃত্তি, কি চেষ্টা, কি কার্য, মানুষের সর্ব বিষয়েরই ফল ও ভোগ আছে। তাহারা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে অধোগামিনী, না হয় ঊর্ধগামিনী করিতেছে; হয় পাপপথে, না হয় পুণ্যপথে লইয়া যাইতেছে; তাহার সূক্ষ্ম শরীরকে অনবরতই গড়িয়া আনিতেছে। সেই গড়নের ফলাফল আমাদের প্রকৃতির অলংঘ্য নিয়মে ঘটিয়া থাকে; কেহ বাধা দিতে পারে না। কারণ, তাহা প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতি শক্তিরূপা; সেই শক্তির প্রাণ সর্ব-শক্তিমান্। সর্বশক্তিমানের নিয়ম কে লংঘন করিতে পারে? সেই নিয়মদ্বারাই তিনি ফলাফল-দাতা। প্রকাশ্যে অনেক গোপনীয় দুষ্কৃতি ও পাপ অশাসিত ও অদণ্ডিত থাকে, থাকিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে। যখন চার পোয়া হয়, তখন ভগবানের অলংঘ্য নিয়মে, প্রকৃতির স্বভাব-বশত ধরা পড়ে; ধরা পড়িয়া শাসিত ও দণ্ডিত হয়। কারণ, প্রকৃতির অধীশ্বর-পুরুষ ভগবান্ সর্ব-ফলাফলদাতা। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন :—

> "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

পুরাণে অধ্যাত্ম-রাজ্য প্রকটিত।

এ নিয়মের অতিক্রম করা কোন পাপীর সাধ্যায়ত্ত নহে। পাপী রাজার দণ্ডবিধি হইতে নিস্তার পাইতে পারে, কিন্তু ধর্মের সূক্ষ্ম রাজ্যের দণ্ডবিবিতে ধরা পড়ে,—পড়িবেই পড়িবে। অভিশাপ এই দণ্ডবিধির সামান্য মুখভারতী মাত্র—ভগবানের অস্ফুট দণ্ড-প্রচার মাত্র। সে মুখভারতী যে স্থলে না প্রকাশিত হয়, সে স্থলে গোপনে গোপনে উচ্চারিত হয়। অন্তরে অন্তরে পাপ পরিবর্ধিত হইলে সময়ক্রমে সেই পাপের ফলাফল পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দুধর্মের কর্ম-ফলবাদের নিগূঢ় রহস্য এই।

সেই কর্মফলবাদই পাপপুণ্যের রহস্য ও অলংঘ্য নিয়ম প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। পুরাণ তাহা প্রকাশ করিয়াছে। বাহ্য অবয়বে ছবি আঁকিয়া দেখাইয়াছে। লোকচরিত্রে দেদীপ্যমান করিয়া দেখাইয়াছে। যে ফল স্থূল জগতে সকল সময় প্রকটিত হয় না, সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগতে তাহা কেমন প্রকটিত হয়, পুরাণ তাহাই স্থূল অবয়বে লোকচরিত্রে দেখাইয়া দেয়। গীতা যে অধ্যাত্ম-রাজ্যের অকাট্য নিত্য নিয়মাবলী খ্যাপন করিয়াছে, বিশাল মহাভারত তাহা বাহ্য দৃষ্টান্তে ও লোকচরিত্রে জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছে। সমস্ত পুরাণই এইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যের ধর্মনিয়ম-প্রকাশক; সেই ধর্মরাজ্যকে বাহ্য অবয়বে প্রকটিত করিয়া দেখায়। যাহা এইরূপ করে, তাহাই পুরাণ; তাহাই সেই পুরাণ বেদের পুরাণ কথা। তাই তাহার নাম পুরাণ। তাহাই ভারত-সৃষ্টি —মহাভারত—ভারতীর মহাসৃষ্টি—মুখভারতীর দেদীপ্যমান বিশাল দৃশ্যপট—গীতার অধ্যাত্মরাজ্যের প্রকট দৃশ্য। তাহাই পঞ্চম বেদ— পঞ্চম বেদ বলিয়া পুরাণ কথা। পুরাণ এইরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বের স্থূল অবয়ব বিকাশ করিয়া লোক-শিক্ষা দেয়।

অভিশাপ অধ্যাত্ম রাজ্যে দণ্ড-বিধান

পৌরাণিক সাহিত্য তবে অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিত্য নিয়মের প্রকটরূপ —যে রূপ সকল সময়ে, সকলের চক্ষে প্রতীয়মান নহে, সেই রূপের প্রকট ছবি। যে অধ্যাত্ম-রাজ্যে মানুষের সমস্ত চিন্তা, প্রবৃত্তি, চেষ্টা ও কর্মের ফলাফল প্রকৃতির অলংঘ্য নিয়মে সতত ফলিতেছে, সেই রাজ্যের বৃহৎ দৃশ্যপট পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। এই ফলাফলের যে সংস্কার-সকল হৃদয়ের অধ্যাত্মদেশে গোপনে অংকিত হয়, সেই চিত্রই গুপ্তচিত্র এবং চিত্রগুপ্ত তাহার দেবতা—সংযমপতি ধর্মরাজ যমের লেখক—The Recording Angel। কিসের লেখক? সেই কর্মফলের সংস্কার-সমুদায়ের লেখক। সেই চিত্রগুপ্তের বৃহৎ পটের বর্ণরাগ। সমস্ত দেখিতে চাও ত পুরাণের প্রতি চাহিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, মানুষের এমত কার্য নাই, এমত চিন্তা নাই, এমত প্রবৃত্তি নাই, এমত চেষ্টা নাই, যাহার

ফলাফল হয় না। ভরত হরিণকে ভালবাসিয়া তাহার এতদূর তীব্র চিন্তা করিয়াছিলেন যে, জন্মান্তরে তিনি মৃগরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পুরাণে কর্মফলবাদের ফলশ্রুতি এইরূপ। পৌরাণিক আর্যসাহিত্যে তবে অধ্যাত্ম-রাজ্যের বৃহৎ পট বিস্তারিত। সেই পটে কি দেখা যায়? দেখা যায়, এ জগতের বাহ্য দৃশ্যের মধ্যে আর এক সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগৎ বিদ্যমান—যে জগতে কেবল সর্বনিয়ন্তৃস্বরূপ কর্মফলদাতা ভগবান্ একাই রাজা—মহারাজ রাজরাজেশ্বর—সর্ব-অধীশ্বর। তাই ভগবতীর নাম রাজরাজেশ্বরী। আমরা নরলোকে কেবল নরেরই কর্তৃত্ব দেখিতে পাই, কিন্তু ভগবানের সেই সূক্ষ্ম কর্তৃত্ব তত দেখিতে পাই না। তিনি যে এই বৃহৎ দৃশ্যের অন্তরালে বসিয়া এই বিশ্বলীলা করিতেছেন; এই পুতুলের নৃত্য দেখাইতেছেন, তাঁহার সেই গোপনীয় হস্ত কয়জন লোক দেখিতে পায়? তাঁহার অস্ফুরিত বাক্য সময়ে সময়ে শাপবাক্যে উচ্চারিত হয়।

আর্যসাহিত্যের সহিত বিলাতী সাহিত্যের প্রভেদ

আর্যসাহিত্যের সহিত অপর দেশীয় সাহিত্যের প্রভেদ এই যে, অপর দেশীয় সাহিত্যে কেবল বাহ্য জগতের নরলোকের ক্রিয়াকাণ্ডের বাহ্য দৃশ্য, আর্যসাহিত্যে সেই দৃশ্য-মাঝে সেই নটবর ভগবানের গুপ্ত লীলা। অপর দেশীয় সাহিত্য নরলোকের কর্তৃত্ব দেখায়, আর্যসাহিত্যে সেই অহঙ্কারপূর্ণ কর্তৃত্বের ভিতর ভগবানের নিরহংকার কর্তৃত্ব দেখায়। যাহা লোকে দেখিতে পায় না, আর্যসাহিত্য তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। যাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, তাহা দেখাইলে কি হইবে? তাহা দেখাইবার ফলাফল ত জগতে আপনা-আপনি ঘটিতেছে। যাহা লোকে দেখিতে পায় না, অথচ যাহার ফলাফল প্রভূত, তাহারই দৃশ্যপট আঁকা আর্যকবির কার্য। সেই মহাকবি ব্যাস, বাল্মীকি ও তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া যাঁহারা আর্যকাব্য লিখিয়াছেন, সেই কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি। তাঁহারা যে কাব্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন, সে কাব্যে নরনারায়ণ একত্র সংলিপ্ত,—এই জগতের সংসারলীলায় একত্র কার্য

করিতেছেন। ভগবান্ নরের দেহ-রথের সারথি। তিনি সারথি বলিয়া নর রথী। তিনি বীরের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছেন বলিয়া অর্জুন বীর। তিনি অর্জুনকে দিয়া—নরের হস্ত দিয়া কুরুক্ষেত্র-রণে সমগ্র পাপীর ও অসুরের নিধন সাধন করিতেছেন। তিনি নিজে নিরস্ত্র, কিন্তু তাঁহার মহাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র-সকল নরের হাতে। অভিশাপ সেই অস্ত্রের ক্ষীণ রব। যাবতীয় ঘটনা-সমূহের সহিত ভগবান্ ধর্মের সূক্ষ্ম সূত্র দিয়া জগতের সমস্ত ঘটনাকে একসূত্রে বাঁধিতেছেন। শুদ্ধ ইহকাল নহে, শুদ্ধ পরকাল নহে, পূর্বজন্মের সহিত মানবের জীবনকে একসূত্রে বাঁধিতেছেন। তাই ভাগবত দেখায়, ভরতের পুণ্যপ্রকৃতি কত উচ্চে উঠিয়াও কোন্ কর্মদোষে কিপ্রকার মৃগরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই ঘটনাপূর্ণ বিশ্বের সমুদায়ই মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত—ভগবানের বিশ্ব-লীলার মহাকাব্য। এই পরিদৃশ্যমান ভারতের মধ্যে কুরুক্ষেত্ররূপ মানব-সমাজের কর্মক্ষেত্রের যে মহাযুদ্ধ ও সেই যুদ্ধের ফলাফল তাহাই মহাভারত। লৌকিক ঘটনাসমূহ যে কার্যকারণের অভিনয়, তদভ্যন্তরে ভগবানের এই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য কর্তৃত্ব। নটবর নারায়ণ প্রধান কর্তা, নর অর্জুনরূপে নিমিত্ত-কারণ মাত্র। মহাভারত ভগবদ্গীতায় এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া স্থূল অবয়বে তাহা জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছেন। এই তত্ত্বই সমস্ত জাগতিক ঘটনার গূঢ় রহস্য। আর্যসাহিত্য সেই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করে। এই তত্ত্ব লইয়াই তবে অপরাপর দেশীয় সাহিত্যের সহিত আর্যসাহিত্যের প্রভিন্নতা। অপর দেশীয় সাহিত্যে লৌকিক ঘটনাময় বাহ্য দৃশ্য ; পৌরাণিক কাব্য ও সাহিত্যে ধর্মের সূক্ষ্ম রাজ্যের নিগূঢ় কথা। একটী দৃষ্টান্ত দেখ।

বিলাতী সাহিত্যে অভিশাপ নাই কেন?

শেক্সপিয়ারের ওথেল নাটক পড়িয়া আমরা কেবল মনুষ্যে সামান্য ঘটনা-যোজনার ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, ডেস্‌ডিমোনা পিতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে এক বিজাতীয় মূরের সহিত প্রণয়াসক্তা হইয়াছিলেন। সর্বদেশেই এরূপ ঘটনা পিতামাতার অনুমোদনীয় নহে—

পিতামাতা কি, কোন সমাজে কাহারই অনুমোদনীয় হইতে পারে না। বলিতে গেলে, ডেস্‌ডিমোনা মুরের সহিত প্রেমাসক্ত হইয়া সমাজের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অপ্সরা-তুল্য ডেস্‌ডিমোনা যে একজন কালা মুরকে ভালবাসিবে, এ কথা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যখন ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়া উঠিয়াছিল, তখন পিতার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, মুর কোন যাদু-বিদ্যা-প্রভাবেই তাঁহার দুহিতাকে ভুলাইয়াছে। অতএব যাদুকারী মুরের বিপক্ষে যাদুর অপরাধে আদালতে নালিশ রুজু হইল। কারণ, সেকালে যাদুকরের প্রভূত শাস্তি হইত। সেই মকর্দমায় দেখিতে পাই, কন্যা প্রমাণ করিয়া দিল, স্বামীর সে অপরাধ সম্পূর্ণ মিথ্যা; সে নিজেই মুরের বীরত্বে বশীভূত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। কাজেই মুরের প্রণয়ে অন্ধ হইয়া কন্যা প্রকাশ্য আদালতে পিতার যথোচিত অপমান করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। শেক্সপিয়ার দেখাইলেন, পিতা নীরবে ঘাড় পাতিয়া সেই অপমান বহন করিয়া আদালত হইতে কালামুখ লইয়া পলাইতে পথ পাইলেন না। এ সময় অবশ্য পিতার মনে যে দারুণ ব্যথার উদয় হইয়াছিল, তিনি রাগে, অপমানে, লজ্জায় যেরূপ অভিভূত হইয়া আদালত হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়। তৎপরে আমরা দেখিতে পাই, ডেস্‌ডিমোনার সহিত ওথেলর মিলন সম্পূর্ণ বিষময় হইয়া উঠিল; এতদূর যে, শেষে সেই মুর নিজ পতিপ্রাণা প্রণয়িনীকে স্বহস্তে অনায়াসে হত্যা করিয়াছিল। এই ঘটনাপূর্ণ দৃশ্য বাহ্য লৌকিক ইতিবৃত্ত মাত্র। কিন্তু ইহার তলদেশে যে এক সূক্ষ্ম ইতিবৃত্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা শেক্সপিয়ারে নাই। সে বিষয় ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। সে তত্ত্ব শেক্সপিয়ার দেখাইতে পারেন নাই। সে তত্ত্ব কি আর্য কবি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে বা দেখাইতে পারেন?

অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।

এই নাটক যদি আর্যকবির হাতে পড়িত, তাহা হইলে তাহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইত। পিতাকে সেইরূপ প্রত্যাখ্যান ও অপমান করাতে,

পিতার মনে যে অরুন্তুদ বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বেদনা হেতু তিনি রাগে কন্যাকে অবশ্যই সেই দণ্ডে মনে মনে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। এই অভিসম্পাত কি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নহে? সেই প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার শেক্সপিয়ার কই প্রদর্শন করিয়াছেন? এ চিত্র আঁকিতে ধর্মের সূক্ষ্ম দৃষ্টি চাই, মানুষের অধ্যাত্ম-প্রকৃতি বুঝা চাই। এ প্রকৃতি-চিত্রের চিত্রকর বিলাতী কবি নহেন, পৌরাণিক আর্যকবি। আর্যকবি হইলে এ স্থলে দেখাইতেন যে, পিতা কন্যাকে তখনই শাপ দিয়া বলিতেছেন, তুই অধঃপাতে যা, অমন মেয়ে যেন তেরাত্রের মধ্যে ঐ মুরের হাতে নিহত হয়। আর্যকবি যাহা দেখাইতেন, শেক্সপিয়ারের নাটকে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেক্সপিয়ার তাহার নিগূঢ় রহস্য দিতে পারেন নাই—কোন্ কার্যের কোন্ ফল দেখাইতে পারেন নাই। আর্যকবি সেই অভিশাপের নিদারুণ বাক্যাবলি প্রকাশ করিয়া তাহার ভীষণ পরিণাম ও প্রতিফল দেখাইতেন। দেখাইতেন সেই সমাজ-ধর্মবিরুদ্ধ বিবাহের পরিণাম বিষময় হইবেই হইবে। পিত্রাদেশ অবহেলা করিলে যে পাতক হয়, সেই পাতকের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের অধোগতি যে পিতৃ-অভিশাপের ফল, সেই পিতৃ-অভিশাপেই ডেস্‌ডিমোনার নৃশংস হত্যা ঘটিয়াছিল। পিতৃ-শাপ ফলিয়া গেল, ধর্মের জয় হইল। ধর্মের জয় আর্যকবি দেখান। ধর্মের জয় মহাভারত ও রামায়ণে; কালিদাসের শকুন্তলায়। সে ফল দেখাইলে ওথেল নাটকের ভাগ্য ফিরিয়া যাইত। শেক্সপিয়ার সে নাটক যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে সকল দোষ সেই মুরের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। সে নাটক পড়িলে এখন লোকে সেই মুরকেই ঘৃণা করে। তদ্রূপ ঘৃণাস্পদ করাইবার জন্যই শেক্সপিয়ার সে নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যদি তন্মধ্যে পিতৃ-অভিশাপ স্থান পাইত, তাহা হইলে লোকে কাহাকে দূষিত? লোকে কি জ্ঞান করিত না, মুর কেবল ধর্মের নিমিত্ত-কারণ মাত্র? কর্মফলদাতা ভগবানের হইয়া সে হত্যা করিয়াছে। যেমন কর্ম, তেমনি ফল ফলিয়াছে। আর্য কবি যদি

ওথেল নাটক-মধ্যে ঐ অভিসম্পাতটুকু দিয়া নাটক লিখিতেন, তাহা হইলে এক্ষণে যেরূপ অধ্যয়ন-ফল হইতেছে, ঠিক তাহার বিপরীত ফল ঘটিত। তাহা হইলে ঐ ওথেল নাটক কি অভিশাপ-মূলক শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকের ন্যায় একখানি ধর্ম-নাটকরূপে প্রতীত হইত না? সুতরাং যে সকল বিলাতী নাটক অভিশাপমূলক হওয়া উচিত ছিল, তাহাতে অভিশাপের গন্ধমাত্র নাই। না থাকাতে তাহাদের অধ্যয়ন-ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ফলশ্রুতি বিপরীত হইয়াছে। তাই বলিয়াছি, যদ্দারা ধর্ম উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইতে পারে, বিলাতী কবি তাহা দেখাইতে পারেন না। তাহা আর্য-কবির কার্য এবং আর্যসাহিত্যের প্রধান সম্পত্তি। সেই সাহিত্যে সূক্ষ্ম ধর্মরাজ্যের অকাট্য নিয়মের অলংঘ শাসন এবং ঘটনার সহিত ঘটনার নিগূঢ় রহস্য ধর্মের সূক্ষ্ম সূত্রে পরিদৃশ্যমান। তদ্‌ভিন্ন অপর দেশীয় সাহিত্যে মানবীয় ঘটনাবলি ও মানুষ-ব্যাপার সূক্ষ্ম ধর্মরাজ্যের আবরণ মাত্র।

শকুন্তলার অভিশাপ

আর্য-কাব্যসাহিত্যের অধিকাংশই পৌরাণিক-সাহিত্যাবলম্বনে বিরচিত। তাহা সেই সাহিত্যেরই বিস্তৃত পট। শুধু পট নহে; কাব্য যেরূপ রসের খেলা, সেই রসের খেলা খেলিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করে। রসের দ্বারা মন ভিজাইয়া ফেলে। শুধু মুখের কথায় কবি উপদেশ দেন না, লোকচরিত্রে রসের অবতারণা করিয়া তিনি লোকশিক্ষা দেন। তিনি পৌরাণিক ইতিহাসকে নিজ কাব্যরসে আপ্লুত করিয়া অধ্যাত্ম-জগতের নিগূঢ় তত্ত্বসকল দ্বিগুণ বলে লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেন। সেইরূপ কবি—কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি। আজ আমরা কালিদাসের একখানি দৃশ্যকাব্যদ্বারা এ কথা বুঝাইতে চাই। তাঁহার যে কাব্য সর্বজন-সমাদৃত, সেই "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"ই আমরা গ্রহণ করিলাম। শকুন্তলার অভিশাপ আমাদের সমালোচ্য।

হিন্দু জনসমাজ ত্রিবিধ শাসনাধীন, (১) জাতিভেদের দুর্দান্ত শাসন,

(২) রাজশাসন, (৩) ধর্ম শাসন। কি জাতিভেদের শাসন, কি রাজ-শাসন, কোন শাসন-দণ্ডে মনুষ্যসমাজের সমুদায় অপরাধ দণ্ডনীয় হয় না। হইতেও পারে না। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর শাসন ধর্মের। ধর্মাধর্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সর্ববিধ অপরাধ ও পাপ শাসিত হয়। এ শাসন-দণ্ডের শিথিলতা হইতে পারে না; কারণ, এ শাসন-দণ্ড ভগবানের অলঙ্ঘ্য-নিয়মাধীন। ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি অন্তর্যামী হইয়া সর্ববিধ পাপেরই দণ্ড দিয়া থাকেন। কারণ, মনুষ্যের সর্ববিধ পাপেরই ভোগাভোগ-বশতঃ অন্তঃপ্রকৃতি হয় ক্রমশঃ নীচগামিনী, না হয়, ঊর্ধ্বগামিনী, হইতেছে। নীচগামিনী হইবার সময় কষ্টভোগ এবং ঊর্ধ্বগামিনী হইবার সময় আনন্দভোগ। অপর দুই শাসন মানব-প্রতিষ্ঠিত; এজন্য তত প্রবল নিয়মাধীন নহে। কিন্তু ধর্মাধর্মের অলঙ্ঘ্য নিয়মে সর্ববিধ অপরাধই শাসিত হয়। এমন কি, ঘুণাক্ষরে ধর্মের লঙ্ঘন দেখিলে স্বভাবতই মানুষের ক্রোধ উদ্রিক্ত হয়। অন্যায় দেখিলে কাহার না ক্রোধ জন্মে? এই ক্রোধ কিসের ব্যঞ্জক? ধর্মের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ-বশতঃ অধর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ ক্রোধরূপে দেখা দেয়। সৎক্রোধ ধর্মানুরাগের ফল; পাছে ধর্ম লজ্জিত হয়, তাই সেই আত্যন্তিক ধর্মানুরাগবশতঃ ক্রোধ কোনরূপ অন্যায়াচার সহ্য করিতে পারে না। অন্যায়ের শাসন জন্য যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহাই সৎক্রোধ। সেই সৎক্রোধ অধর্মাচার ও অন্যায় কার্যের শাসনার্থ দণ্ড দিতে উদ্যত হয়। দুর্বাসা ঋষির ক্রোধ এইরূপ ছিল। তাঁহার ধর্মানুরাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, তিনি ঘুণাক্ষরে অধর্মাচার দেখিতে পারিতেন না। পুরাণে আমরা যে অনেক ঋষি-চরিত পাঠ করি,সকলেই কি এক রকমে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সকল ঋষি এক রকমে সিদ্ধি লাভ করেন নাই। কেহ অত্যন্ত ভক্তিপ্রভাবে, কেহ বা জ্ঞান প্রভাবে কেহ বা শুধু ধর্মানুরাগে ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। নারদের ভক্তি, বাল্মীকির হৃদয়তারল্য, ব্যাসের জ্ঞান, এবং দুর্বাসার ধর্মানুরাগ প্রসিদ্ধ। দুর্বাসার ধর্মানুরাগ এত প্রবল ছিল যে, দুর্বাসা সেই ধর্মানুরাগ-বলেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্মমতে, ঋষিদিগের মধ্যে

এক এক জনের এইপ্রকার বিশেষ বিশেষ গুণ ও স্বভাব তাঁহাদিগের পূর্বাজন্মার্জিত প্রালব্ধ হেতু। সেই প্রালব্ধ হেতু এ জন্মে যাঁহার যেপ্রকার প্রারব্ধ হইয়াছিল, তদনুসারেই এক এক জনের জীবন বিশেষ বিশেষ স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল। বহু জন্মের পুণ্যসঞ্চয় না হইলে কেহ একেবারে ঋষিত্বে উঠিতে পারে না। সেই জন্যই দুর্বাসার ধর্মানুরাগ অত্যন্ত তরুণ বয়স হইতে প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি একদা স্বীয় বাক্‌দুষ্টা পত্নীকেও অভিশাপে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। সেই পত্নী তাঁহার শাপে অনুদিন ভস্মীভূতা হইয়া প্রাণান্ত হইয়াছিলেন। সেই শাপ তাঁহার প্রবল ধর্মানুরাগের ফল। বাস্তবিক, দুর্বাসা সমুদায় ধর্মানুরাগময়—ধর্মের তৃণমাত্র লঙ্ঘন তাঁহার অসহ্য ছিল। তাই, পৌরাণিক কবি যেখানে ধর্মাচারের কিছুমাত্র লঙ্ঘন দেখিয়াছেন, সেইখানেই দুর্বাসার সংক্রোধে পূর্ণ হইয়া ঋষির আবির্ভাব দেখাইয়াছেন। দুর্বাসা অনেক কাল গত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঋষিত্ব বিনষ্ট হয় নাই, হইবার নহে। সেই ঋষিত্বপ্রভাবে দুর্বাসা পৃথিবীতে অমর হইয়া আছেন। আর্যকবি যেখানে দুর্বাসাকে আপন কাব্যমধ্যে আনিয়াছেন, বুঝিতে হইবে, দুর্বাসা সশরীরে জীবিত থাকিলে, সেখানে যে ব্যবহার করিতেন, কবি অধর্মের প্রতি সেইরূপ সংক্রোধ দেখাইয়াছেন। কাব্যমধ্যে যেখানে দুর্বাসা যে শাপ দিলেন, সেখানে সে শাপ দুর্বাসার নহে, সে শাপ সেই কবির নিজের; কবি দুর্বাসার ভাবে পূর্ণ হইয়া ধর্মলঙ্ঘনকে অভিসম্পাত করিলেন। সে অভিসম্পাতের অর্থ কি? যাহা ধর্মত নিন্দনীয়, যাহাতে দেবকোপ সঞ্জাত হয়, তাহাই অভিশাপ-যোগ্য। যাহা রাজনীতি বা জাতিভেদের সামাজিক শাসনে শাসনীয় নহে, অথচ ধর্মবিচারে প্রতিষিদ্ধ, অভিশাপদ্বারা কবি তাহারই নিন্দা ও প্রতিষেধ করেন। ইংরাজীতে যাহার নাম Moral condemnation, কবির শাপবাক্য সেই Moral condemnation। এই দেখুন, পদ্মপুরাণের কবি শকুন্তলাকে উপলক্ষ করিয়া দুর্বাসার মুখ দিয়া কিরূপ অভিসম্পাত করিতেছেন :—

"দূরাদুচ্চৈর্বভাষেহথ কেয়ং পর্ণোটজে স্থিতা।
বিলোকয়তু মাং প্রাপ্তমতিথিং ভোজনার্থিনম্ ॥
ইত্যুচ্চৈর্মুহুরাভাষ্য ন প্রোপ্যাতিথিসংক্রিয়াম্ ॥
তপোধনশ্চ কোপাশু শশাপ ক্রোধনো মুনিঃ ।
যং ত্বং চিন্তয়সে বালে মনসাঽনন্যবৃত্তিনা।
বিস্মরিষ্যতি স ত্বাং বৈ অতিথৌ মৌনশালিনীম্ ॥"

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।

"দুর্বাসা দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—কে এই পর্ণোটজে আছে; চাহিয়া দেখ; ভোজনার্থী অতিথি উপস্থিত। বারংবার উচ্চৈঃস্বরে এইপ্রকার আভাষণপূর্বক অতিথি-সৎকার না পাইয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন :—

"হে বালে! তুমি যেমন অতিথির কথায় উত্তর দিলে না, তেমনি একাগ্রচিত্তে যাঁহার ধ্যান করিতেছ, সে তোমায় ভুলিয়া থাকিবে।"

ভুলিয়া থাকিবারই কথা। এ শাপ না দিলেও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া থাকিতেন। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ইউরোপীয় সমাজে এইরূপ ভুলিয়া থাকার বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এই স্থলে বিবাহ কেবল কামজ, কেবল চক্ষের নেশা হেতু সম্পন্ন হয়, সে স্থলে সেই নেশা কাটিয়া গেলেই, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই, লোকে পরিণীতাকে একেবারে ভুলিয়া থাকে। এই সত্য উক্তি শাপবাক্যে প্রকটিত হইয়াছে। গল্পের মধ্যে কবি আপনি কিছু বলিতে পারেন না বলিয়া দুর্বাসা ঋষিকে আনাইয়া সেই মহার্ঘ সামাজিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে ইউরোপীয় সমাজে এইপ্রকার কামজ নেশাজনিত গান্ধর্ব-বিবাহের মত বিবাহ প্রচলিত, সেখানে প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়, বিবাহের কিছু দিন পরেই পতিপত্নীর ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। পতি পত্নীকে ভুলিলেন। কোন কোন স্থলে এই বিবাহবশতঃ ব্যভিচারের সূত্রপাত হওয়াতে একেবারে বিবাহ-বন্ধনের ছেদন (Divorce) সংঘটিত হইয়া গেল। এইরূপ সংঘটনে এক পক্ষে, না হয় অন্য পক্ষে, মনে মনে শাপ দেওয়া-দিয়ি ঘটিয়া থাকে। তাহাই কবি দুর্বাসার মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন। পদ্মপুরাণের কবি ধর্মাচরণ-লংঘনের

প্রতি অভিসম্পাত দেখাইলেন, নাট্যসাহিত্যেরও কবি দুর্বাসার মুখে এইরূপ শাপবাক্য আরোপ করিয়াছেন :—

"আঃ কথমতিথিঃ মাম্ অভিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা তপোনিধিং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥"

"আঃ কি আস্পর্ধা! আমি অতিথি বলিয়া উপস্থিত হইলাম, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অবমাননা করিলি? তুই যে পুরুষকে অনন্যমনে চিন্তা করিতে করিতে অতিথিরূপে উপস্থিত এই তপোধনের অভ্যর্থনা করিলি না, তজ্জন্য মদ্যাদিপানে মত্ত ব্যক্তি প্রথমে যে বাক্য প্রয়োগ করে, পুনরায় তাহাকে সেই বাক্য বলিতে বলিলে সে যেমন কোনক্রমেই তাহা স্মরণ করিয়া আর বলিতে পারে না, তেমনি তোর সেই প্রিয় ব্যক্তিকে যথেষ্টরূপে স্মরণ করিয়া দিলেও সে ব্যক্তি কোন মতেই তোকে স্মরণ করিবে না।"

কাম-রিপুর ঘোর প্রমত্ততা হেতু যে গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পন্ন হয়, যে প্রমত্ততাই সেই বিবাহকে পাপবিবাহরূপে নিন্দনীয় ও হেয় করিয়াছে, যে কামান্ধতা ও প্রমত্ততার পাপমোহে অভিভূতা থাকিয়া শকুন্তলা অতিথিসৎকারের ধর্মকর্মে মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই, সেই প্রমত্ততা ও মাদকতাই যে শাপের হেতু, পদ্মপুরাণ তাহা তত স্পষ্টরূপে খুলিয়া বলেন নাই *। নাট্যকার তাহা অঙ্গুলি-নির্দেশ-পূর্বক বিশদরূপে ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ মোহজনিত বিবাহই কামজ বিবাহ। গান্ধর্ব-বিবাহ সেইরূপ কামজ বিবাহ। এ ত বিবাহ নহে, ঘোর রিপুর চরিতার্থতা-সাধন। এজন্য অনেক বিলাতী বিবাহের মিলন মধুর Honey-moon পর্যন্তই স্থায়ী হইতে দেখা যায়। তৎপরেই বিচ্ছেদ। তাই মনু গান্ধর্ব-বিবাহকে এইরূপ কামলক্ষণাক্রান্ত রূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

"ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ॥"

মনু। তৃতীয় অধ্যায়। ৩২।

* এ প্রস্তাব প্রধানতঃ নাটকীয় গান্ধর্ব বিবাহ অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে। নাটকীয় বিবাহ, বর কন্যা উভয়েরই কামজ মিলন। পুরাণে শুদ্ধ বরপক্ষ কামজ, অভিশাপও তাহাই দেখায়; কন্যাপক্ষে কামজ কিনা, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত নাই।

"কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগবশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। ইহা কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সংঘটিত হয়।"

তাই মেধাতিথি বলিয়াছেন ঃ—

"তস্যেয়ং নিন্দা, মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ। মিথুনপ্রয়োজনো মৈথুন্যঃ।"

নিন্দনীয় কামসম্ভূত মৈথুনেচ্ছাই গান্ধর্ব্ব বিবাহের হেতু। সুতরাং সে বিবাহ কখন চিরজীবনের বন্ধনস্বরূপ হইতে পারে না। মৈথুনেচ্ছা চরিতার্থ হইলেই এই বিবাহ-বন্ধনের শৈথিল্য হইবেই হইবে এবং যে স্থলে সামাজিক নিয়মে পতিপত্নীর একতর ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, সে স্থলে সেই বিবাহ-বন্ধনের একেবারে ভঙ্গ হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিলাতি বিবাহে প্রকৃতপক্ষে অনেক স্থলেই তাহাই ঘটিতে দেখা যায়। এই নিন্দনীয় মৈথুনেচ্ছা-জনিত প্রমত্ততা লোককে ধর্ম্মের প্রতি অন্ধ করে। এই কামান্ধতাই রোমিও জুলিয়েটের মিলনের কারণ। এই কামান্ধতায় প্রমত্ত হইয়া হার্মিয়া পিত্রাদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক লাইসেণ্ডারকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, এরূপ বিবাহ-জনিত মিলন দুদিনের জন্য চক্ষের দেখা মাত্র। এতদ্দ্বারা কি চিরদিনের সহচর ও সহচরীকে নির্বাচন করা যায়? কালিদাস বুঝাইয়া দিলেন, অভিশাপের বিষয় সেই কামজ মোহ ও প্রমত্ততা, যদ্দ্বারা লোকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু হিন্দু-বিবাহ যে ধর্ম্মপথ; সে পথ মোহ-সম্ভূত হওয়া বিধেয় নহে। তবে কেন হিন্দুবিবাহ-প্রণালীর অন্তর্গত গান্ধর্ব্ব ধর্তব্য হইয়াছে? তাহার কারণ এই, লোকসমাজে বিবাহ যতরূপে ঘটিতে পারে, সেই অষ্টবিধ বিবাহই হিন্দুবিবাহরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিবাহ যদি চিরজীবনের বন্ধন-স্বরূপ হয়, তবে তাহাতে তত সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। যেরূপে দম্পতিদ্বয় মিলিত হউক না কেন, তাহারা যদি চিরজীবনের জন্য সেই বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সংসার-ধর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, তবে তাহা তত সামাজিক অনিষ্টের কারণ হইতে পারে না। তথাপি গান্ধর্ব্ববিবাহ কামজ বলিয়া নিন্দনীয় হইয়াছে এবং কেবল ক্ষত্রিয়-রাজকুলের জন্য

বিহিত হইয়াছে। হিন্দুরাজকুলেও ইহা হেয় বলিয়া গণনীয় এবং ক্বচিৎ ঘটিতে দেখা যায়। ইহার হেয়ত্ব কোথায়, কেন এ বিবাহ নিন্দনীয়, তাহাই কালিদাস স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহা চিরদিনই হেয় কালিদাসের সময়েও তাহা অবশ্য হেয়রূপে গণনীয় ছিল। সেই জন্য কালিদাসেরও তাহা অনুমোদনীয় নহে। তাই কালিদাস শুধু যে শকুন্তলা নাটকে এ বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন নহে; তিনি যে কয়েক খানি প্রধান পৌরাণিক কাব্য লিখিয়াছেন, সে সমুদায় কাব্যে একই বিষয়ের অভিশাপ। কামজ প্রমত্ততা হেতু ইন্দ্রিয়লালসাপূর্ণ কামান্ধতার প্রতি যে দেবকোপ শকুন্তলায় দুর্বাসার বাক্যে প্রকাশিত, সেই দেবকোপ উর্বশীর প্রতি এবং নলদময়ন্তীর প্রতি ঘটিয়াছিল। আর যদি সেই দেবকোপের জ্বলন্ত অগ্নি দেখিতে চাও, দুর্ব্বাসা-বাক্য অপেক্ষাও মহাজ্বলন্ত শিখায় উদ্দীপ্ত ও উদ্গীর্ণ হইতে দেখিতে চাও, তবে একবার চাও—ধূর্জ্জটির ললাটদেশে। সেই দেবকোপের জ্বলন্ত অগ্নি উদ্গীর্ণ হইয়া সাক্ষাৎ কামকে ভস্মীভূত করিতেছে। এইখানে কালিদাস পৌরাণিক কবিকে অবলম্বনপূর্ব্বক স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছেন, মানবের কোন্ রিপু ভস্মীভূত হইবার সুযোগ্য সামগ্রী। মহাযোগী ত্রিলোচনকে বাহ্যসৌন্দর্যে মোহিত করিবার জন্য মদন ও বসন্তের সহায়তায় উমা যখন তৎসমক্ষে উদয় হইলেন, তখন সেই মহাযোগী কি করিলেন?—

> "অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্‌বলবন্নিগৃহ্য।
> হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্॥
> স দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
> দদর্শ চক্রীকৃতচারুচাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্॥
> তপঃপরামর্শবিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখস্য তস্য।
> স্ফুরন্নুদর্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥"

"অনন্তর ত্রিলোচন জিতেন্দ্রিয়ত্বহেতু বলবৎ ইন্দ্রিয়ক্ষোভ নিগৃহীত করিয়া স্বীয় চিত্তবিকারের হেতু অন্বেষণের নিমিত্ত চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, কন্দর্প স্বীয় বামপদ আকুঞ্চিত এবং স্কন্ধদ্বয় সন্নত করিয়া গুণাকর্ষণ-

মুষ্টি দক্ষিণ চক্ষুর প্রান্তভাগ পর্যন্ত আনয়নহেতু চক্রীকৃত শরাসন ধারণপূর্বক অবস্থিত রহিয়াছেন। তপস্যার প্রতি আক্রমণ করাতে তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎকালে ভ্রূকুটির আবির্ভাবে তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয়চক্ষু হইতে জাজ্বল্যমান শিখাশালী অগ্নি বহির্গত হইল।"

উমার বিমোহন রূপ দেখিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত মহাযোগীর মনে যে মোহের উদয় হইয়াছিল, পৌরাণিক কবি সেই মোহকে শরীরী করিয়া মদনরূপে দেখাইয়াছেন। এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য মানুষ-মাত্রেরই মনে সঞ্জাত হওয়া স্বাভাবিক। রূপের সহিত চিত্তের যে সম্বন্ধ, তাহা বিধিনির্বন্ধ, তাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষণিক স্বাভাবিক চিত্ত-বিকারে পাপপুণ্য কিছুই নাই। তবে তপস্যাপ্রভাবে সেরূপ চিত্ত-বিকার ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া আইসে। কিন্তু পাপ কোথায়? পাপ, তৎপরে আসক্তি হেতু সঞ্জাত হয়। এইটুকু বুঝাইবার জন্য শুদ্ধসত্ত্ব মহাযোগীর মনে হিন্দু পৌরাণিক কবি বিকারের আবির্ভাব দেখাইলেন। কিন্তু পাছে সেই স্বাভাবিক চিত্তচাপল্য পাপাসক্তিতে পরিণত হয়, তাই তিনি বলিলেন, শরীরী মদনকে মহাদেব সূক্ষ্ম জ্ঞাননেত্রে দেখিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। কি, সে তপোবিঘ্ন ঘটাইতে আসিয়াছে? যেই মাত্র যোগীর মনে সেই চিত্তচাপল্য হেতু মদনাবির্ভাব অনুভূত হইল, অমনি যোগী তাহা জ্ঞান-বলে বুঝিতে পারিলেন। সেই সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক মানস-ব্যাপার স্থূল অবয়বে দেখানই কবির উদ্দেশ্য। তখন মহাযোগী স্বীয় জ্ঞানাগ্নিতে সেই মোহকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিয়া মোহিনী প্রকৃতিদেবী উমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই কথা ইংরাজী কবি ঠিক বুঝাইবার জন্য এইরূপ বলিতেছেন :—

"Then with strong effect Siva lulled to rest,
The storm of Passion in his troubled breast."

ইহাই কবি-কল্পনা। কবি যখন দেবদেব মহাদেবকে শরীরী মহাযোগিরূপে মনুষ্যাকারে দেখাইয়াছেন, তখন সেই শরীর-ধারণজনিত যে চিত্তবিকার স্বভাবতই সঞ্জাত হইবে, তাহা মানবধর্ম। সেই

মানব-ধর্ম বজায় রাখিয়া কবি দেবসম্ভব জ্ঞানাগ্নির সঞ্চারদ্বারা সেই মানব-ধর্মের শমতা দেখাইলেন। মানবে ইহাই দেবত্ব ও তপঃসঞ্জাত দেববল। মানবের স্বাভাবিক মদনাবির্ভাব স্থায়ী ইন্দ্রিয়লালসা ও রিপুরূপে পরিণত হওয়াই পাপ। মহাযোগী সেই রিপুকে ক্ষণকালের জন্যও অন্তরে স্থান দিলেন না। কারণ, যে মোহ শরীর-ধারণের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা উদয় হইবামাত্র জ্ঞানিগণ দমন করিয়া ফেলেন। অশান্ত প্রমত্ত ঐন্দ্রিয়িক জনগণ সেই মোহের বশীভূত হয়। সেই মোহের বশবর্তিনী হইয়া নাটকীয় শকুন্তলা অতিথিসৎকাররূপ ধর্মাচরণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন, দময়ন্তী দেবগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, উর্বশী পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিতে গিয়া পুরূরবার নামোচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। যক্ষ নিজ কর্তব্য অবহেলা করাতে যক্ষরাজ তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। আর ডেসডিমোনা অনুচ্চারিত পিতৃশাপে পতিত হইলে, যার জন্য সেই অভিশাপগ্রস্তা, সেই তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে নিহত করিয়াছিল।

কালিদাসের সময়েও যে কামজ গান্ধর্ব-বিবাহ কিরূপ শাপযোগ্য ছিল, তাহা আমরা তাঁহার "অভিজ্ঞান-শকুন্তলে" দেখিতে পাই। শাপযোগ্য কি ? "কুমারে" দেখিতে পাই, দেবগণ ষড়যন্ত্র করিয়া যখন উমার সহিত ত্রিলোচনের সেইরূপ কামজ মিলন ঘটাইতে গেলেন, তখন সেই মহাযোগীর কোপাগ্নিতে মদন একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। উমা তদ্রূপ মিলন অসম্ভব দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সুতরাং "কুমারে" যাহা মদনভস্ম, "শকুন্তলা"য় তাহাই দুর্বাসার অভিশাপ। সেখানে যেমন কামার্তা উমা অপদস্থা, এখানে তেমনি প্রেমবিহ্বলা শকুন্তলা অভিশপ্তা। প্রভেদ এই, দুর্বাসা একজন ঋষি, মহাদেব স্বয়ং ঈশ্বর। একজন মনুষ্য-আকারে দেবতা, অন্যজন দেবতা মনুষ্য-আকারে আকারিত। সেই দেবসম মনুষ্যচক্ষে মদনোত্তোজিতা উমা এবং প্রেমবিহ্বলা শকুন্তলা কিরূপ অবস্থাপন্না হইয়াছিলেন, তাহারই চিত্র "কুমারে" এবং "অভিজ্ঞানশকুন্তলে।" ব্রহ্মচারীর রূপ ধরিয়া সেই মহাদেব উমাকে যখন পরীক্ষা করিতে

আসেন, তখন তিনি কিরূপ মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—

"অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্ভবাগ্ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥"

কুমারসম্ভব। ৫। ৩০।

"অনন্তর একদিন মৃগচর্ম ও পলাশদণ্ডধর জটাধারী এক ব্রহ্মচারী পবিত্র ব্রহ্মময় তেজে জ্বলিতে জ্বলিতেই যেন পার্বতীর তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাক্য ভয়সম্পর্কপরিশূন্য; বোধ হইল, যেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্বয়ং দেহ ধারণপূর্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন।"

আর দুর্বাসা যখন শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহাকে প্রিয়ংবদা কি বলিয়াছিলেন ?—

"কো অন্নো হুদবহাদো দহিউং পভবিস্সদি গচ্ছ পাএসু পণমিঅ নিবত্তেহি ণং জাব অহং অগ্ঘোদঅং উবকপ্পেমি।"

"হুতাশন ব্যতীত অন্য আর কে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? তুমি সত্বর যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া ফিরাইয়া আন। আমিও উহাঁর জন্য অর্ঘোদক সাজাইয়া রাখি।"

দুর্বাসা এইরূপ ধর্মের জ্বলন্ত দীপশিখা। এ ত দুষ্মন্ত নহে যে, রূপ দেখিয়া একেবারে গলিয়া যাইবেন, আর নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই!

এইরূপ সৃষ্টি-সকল পুরাণ লোক-লোচনের সমক্ষে ধারণ করে। পদ্ম-পুরাণের সেই সৃষ্টিতে বর্ণ-প্রয়োগ করিয়া কবি তাহা নাটকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। তিনি অগ্রে শকুন্তলার অপূর্ব রূপের সৃষ্টি করিলেন, তাঁহাকে সুন্দরী সাজাইলেন; তাঁহাকে ততোধিক রূপে ভূষিতা করিলেন, যত অধিক রূপসী প্রকৃতি-সুন্দরী উমা। এই দেখুন উমা কিরূপ সুন্দরী :—

"সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়েব॥"

"বিধাতা যেন সমস্ত উপমাবস্তু পার্বতীর শরীরের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন।"

আবার দেখুন শকুন্তলাও সেইরূপ উপকরণে গঠিত। দুষ্মন্ত মোহিত হইয়া বলিতেছেন :—

"চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥"

"সেই ক্ষীণাঙ্গী শকুন্তলাব শরীর-সৌন্দর্য চিন্তা করিয়া ইহাই অবগত হওয়া গেল যে, বিধাতা জগতের তাবৎ নির্মাণ-সামগ্রী একত্র আহরণপূর্বক সমস্ত রূপরাশি এক স্থানে দেখাইবার জন্যই একটী স্ত্রীরত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।"

উমার রূপ বাড়াইবার জন্য যেমন তাঁহার দুই পার্শ্বে জয়া বিজয়া রহিয়াছেন, শকুন্তলারও দুই পার্শ্বে তেমনি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। কিন্তু উমার সেই রূপ-প্রভা মনুষ্যের চিত্তে কিরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা "কুমারে" নাই। দেবগণ সেই রূপকে অতুল সৌন্দর্যরূপে দেখিয়াছিলেন মাত্র। শকুন্তলার কবি সেই সৌন্দর্য মানুষের সমক্ষে ধরিলেন। দেখাইলেন, সে রূপে সামান্য মনুষ্য কি? জিতেন্দ্রিয় দুষ্মন্ত—যিনি হাজার হাজার রূপ দেখিয়াও স্থিরচিত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়প্রভাব জয় করিতে পারিয়াছিলেন, আজ তিনিও কি না শকুন্তলার রূপ দেখিয়া চিত্তকে স্থির রাখিতে পারিলেন না। সেই অপূর্ব রূপ-রাশির পদতলে সেই রাজরাজেশ্বর দুষ্মন্ত কৃপাভিখারী। একজন তত বড় জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয়-রাজ সেই রূপে পরাভূত! শুধু কি সেই রূপ? কবি নাটকের উপক্রমে সুন্দরীগণের লীলা-রসের যে চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, আর কোন দেশীয় সাহিত্যে কি তদনুরূপ চিত্রের সৃষ্টি আছে? সেই অপূর্ব সুন্দরীগণের পূর্বরাগপূর্ণ অসামান্য সৃষ্টির সমক্ষে দুষ্মন্তের মত ক্ষত্রিয় বীর দণ্ডায়মান। হায়! সে বীরত্ব আজ রমণীর কাছে পরাজিত! ক্ষত্রিয় বীরের এই পরাভব-চিত্র দেখাইয়া, কবি তৎপার্শ্বেই আর এক বীরত্বের গৌরব-ছবি আঁকিলেন। শকুন্তলার সমক্ষে একজন ঋষি দণ্ডায়মান। মানুষে ও ঋষিতে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে, রাজর্ষি ও পরমর্ষিতে কত বিভিন্নতা, তাহা এই স্থলে প্রতীত। যে ধর্মের বিক্রম দুষ্মন্তে অকৃতকার্য, সেই সংযম ধর্মের গৌরব ব্রাহ্মণের চিত্তে আজ পূর্ণ প্রভাবে সমুদিত। ব্রাহ্মণের কত বড় শিক্ষা, কত বড় সংযম-

অভ্যাস, কত বড় তপস্যা—যে তপস্যা তাঁহাকে পৃথিবীর অতুল রাজবীর হইতেও বল-বীর্যবান্ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণবীরের, সেই সংযমবীরের সেই ধর্মবীরের, সেই তপস্যাবীরের সমক্ষে শকুন্তলার প্রেমপূর্ণ,—প্রেমপূর্ণ কি? প্রেমবিহ্বলা মোহিনী মূর্তি স্থাপিত করিয়া কবি সেই তপস্যা-প্রভাব, সেই সংযম-প্রভাব, সেই ধর্মপ্রভাব দেখাইলেন। যিনি ভগবানের সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, তিনি কি মানুষের রূপে মুগ্ধ হন? শকুন্তলা সে বীরের নিকট পরাজিত। ব্রাহ্মণ-বীরত্ব ক্ষত্রিয়-বীরত্বের উপর জয়লাভ করিল। কি শকুন্তলার রূপ, কি ক্ষত্রিয়-বীরত্বের গৌরব সকলই সেই সংযম-বলের নিকট পরাভূত। কবি, সেই অতুলনীয় শকুন্তলা-দুষ্মন্তের গৌরবিত ছবির পার্শ্বে এই শকুন্তলা-দুর্বাসার অতুল-গৌরবিত ছবি দেখাইলেন। দেখাইবামাত্র পূর্ব ছবির রাগরঞ্জন বিমলিন হইয়া গেল। ঋষির ধর্মবলের নিকট ক্ষত্রিয়-বীরের ধর্মবল হীনতর; ঋষির ভগবৎপ্রদীপ্ত অন্তঃসৌন্দর্যের নিকট শকুন্তলার অপূর্ব বাহ্যরূপরাশি অতি বিমলিন। সেই রূপরাশির মোহে ঋষির চিত্ত বিগলিত হওয়া দূরে থাক্, সুন্দরীর চিত্তে নিজ রূপরাশির মত ধর্মসৌন্দর্য নাই বলিয়া যখন তিনি ধর্ম লংঘন করিলেন, অমনি ধর্মবলে বলীয়ান্ ঋষির ধর্মকোপ জাগরিত হইল। রূপের প্রভাব, সে কোপের কিছু কি শমতা করিতে পারিয়াছিল? যিনি ধর্মের পবিত্ররূপ দেখিয়াছেন, তিনি কি পাপ-রূপে মুগ্ধ হইতে পারেন? কে কবে রূপসীকে দেখিয়া—রূপসী কি? অসামান্য রূপসীকে দেখিয়া নির্দয়ভাবে শাপ দিতে পারিয়াছে? চিত্তের সেই ধীরতা ও স্থৈর্য কেবল দুর্বাসার ছিল। এ কি সামান্য সংযম-অভ্যাস ও ধর্মবলের কথা! তাঁহার ধর্মবল যে সর্ববলোপরি বিজয়ী হইয়া উঠিল। তাই বলি, এরূপ ধর্মবলের চিত্র পুরাণ ভিন্ন কি আর কোন দেশের কোন সাহিত্যে আছে? না, কল্পনায় আনিতে পারিয়াছে? হিন্দু পৌরাণিক সাহিত্যের এতই ধর্মগৌরব! এ দৃশ্য দেখিলে কত না ধর্মবলে মন উত্তেজিত হয়। শকুন্তলা-দুষ্মন্তের মদনোন্মত্ত ছবি কোথায় তলিয়া যায়? সে ছবিতে কলঙ্কপাত করে। কল্পনায় পাপ-দৃশ্য ডুবিয়া গিয়া ইহাই ভাসমান হয়। পুরাণ এই পর্যন্ত

আসিয়াই স্থির হয় নাই। অন্যদিকে দুষ্মন্তের কামোন্মত্ততার পরিণাম ও ফলাফল আঁকিয়া ধর্মগৌরব আরও উজ্জলিত করিয়া দেখাইয়াছে। সে চিত্র পরে দেখাইতেছি।

যদি বল, নাটকে ত এ দৃশ্য ধৃত হয় নাই? এই অভিশাপ-ব্যাপার নেপথ্যে হইয়া গেল। নেপথ্যে অভিশাপ হইবারই কথা, যেহেতু প্রকাশ্য রংগভূমিতে অভিশাপ-প্রদান হিন্দু অলংকার-শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ। সাহিত্যদর্পণকার সেই কথাই বলিয়াছেন। যে সাহিত্যে শাপ-ব্যাপার আছে, সে সাহিত্যে সেই ব্যাপারের বিধি-নিষেধ-সাধক বিধানও আছে। কিন্তু যে বিলাতী সাহিত্যে শাপের গন্ধমাত্র নাই, সে সাহিত্যের অলংকার-শাস্ত্রে তাহার বিধি-নিষেধ-সাধক বিধানও নাই। সে যাহা হউক, নেপথ্যে যখন অভিশাপ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল, বলিতে পার, সে ব্যাপারের দৃশ্যপট পাঠকের বা শ্রোতার মনে কিরূপে উদিত হইতে পারে? কিন্তু আমরা বলি, সেই অভিশাপের শব্দ-মাত্র যথেষ্ট। নেপথ্যে এরূপ কার্যের অভিনয় হয় এই জন্য যে, তদ্বারা লোকলোচন হইতে অভিনয়ের নির্দয়তা ও ভীষণতা অপসারিত হয় মাত্র। অভিনয়ে সে ব্যাপার দেখিলে পাছে লোকে তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হইয়া রংগভূমির শান্তিভংগ করে, তাই তাহার প্রকাশ্য অভিনয় দেখান নিষিদ্ধ। নেপথ্যে শাপ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেলে, শ্রোতৃবর্গের তৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার আর অবকাশ থাকে না। কিন্তু যেই শ্রোতৃবর্গ সেই ভয়ংকর অভিশাপের রব কর্ণগোচর করিলেন, অমনি তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন। কি? এমত অসামান্য সুন্দরীরত্ন অভিশপ্ত! কে সে অভিসম্পাত করিল?—দুর্বাসা। অমনি কল্পনা শকুন্তলা-দুর্বাসা-চিত্র চিত্তে অনুরঞ্জিত করিয়া দিল। কল্পনায় সে চিত্র উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইল। কলিকাতায় যে এত খুন হয়, কে কবে সে খুনের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছে? কাগজে পড়িবামাত্র তাহাদের অনুচিত্র কল্পনা আঁকিতে বসে। অমনি সেই ভয়ানক ব্যাপারে গাত্র শিহরিয়া উঠে। এ কথা আমরা "সাহিত্য-চিন্তা"য় বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। তাই বলি, পৌরাণিক বিবরণেরও যে ফল, নেপথ্যে

অভিশাপেরও সেই ফল। কল্পনায় সমভাবেই শকুন্তলার সমক্ষে দুর্বাসা সমুদিত ও জাজ্বল্যমান। সেইরূপে জাজ্বল্যমান, যে রূপের বর্ণগৌরবে রবিবর্মা সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ-চিত্রের কিরূপ ফল, তাহা উক্ত হইল; কিন্তু দুষ্মন্ত যে বহু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াও অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়লালসার বশবর্তী হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই কামোন্মত্ততার প্রতি নাট্যকার অভিসম্পাতের উল্লেখ করেন নাই কেন? বলিতে গেলে তাঁহারই ত সমূহ পাপলালসা। তিনি না একজন সুধার্মিক জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন? তবে কেন ঋষিকন্যা সুন্দরী শকুন্তলাকে দেখিয়াই তাঁহার এতদূর কামোন্মত্ততা ও মোহ উপস্থিত হইল? যে ইন্দ্রিয়লালসা একজন সুন্দরীকে দেখিয়া উত্তেজিত হইল। তাহা ত তদ্রূপ অপর সুন্দরীকে দেখিয়াও হইবে। তবে তাঁহার সেই কামপ্রবৃত্তির সীমা কোথায়? এত মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াও যিনি সন্তুষ্ট নহেন, তিনি ত প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তির দাসত্ব-দোষও পাপ। ধর্মের আদেশ প্রবৃত্তির সংযম, দাসত্ব নহে। তাই ধর্মের উপর হিন্দু-বিবাহ স্থাপিত। কিন্তু নাটকীয় শকুন্তলার প্রেম যথার্থ প্রেম, সে প্রেমের উৎপত্তি রূপজ অনুরাগে বটে, এবং তজ্জন্যই তাহা সেই এক কারণে দূষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যেরূপে উপজাত হউক না কেন, সেই অনুরাগ ও কাম ক্রমে প্রকৃত প্রেমে পরিণত হইয়াছিল *। তাহা উৎপত্তি-স্থানে কামজ বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু বহুমহিষী-পতি দুষ্মন্তের ইন্দ্রিয়-লালসার কি কিছু খণ্ডনযুক্তি আছে? নিজে দুষ্মন্ত সেই শকুন্তলার প্রতি অনুরাগকে পাপানুরাগ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। নিজ বয়স্য মাধব্যের কাছে শকুন্তলার বিবরণ কতক কতক প্রকাশ করিয়া, তাই শেষে সেই বয়স্যের নিকটেই সেই পাপ ঢাকিবার জন্য বলিয়াছিলেন, আমি শকুন্তলা-সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই অলীক বলিয়াই জানিবে। তবে নাট্যকার তাঁহার সেই ইন্দ্রিয়লালসার প্রতি

* "সাহিত্য-চিন্তা"র ৭৫ পৃষ্ঠায় কামের সহিত প্রকৃত প্রেমের বিভিন্নতা প্রকাশিত হইয়াছে।

শাপ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন না কেন? যদি শকুন্তলার সামান্য অপরাধ শাপযোগ্য হয়, তবে ত দুষ্মন্তের গুরু অপরাধ আরও শাপযোগ্য। দুষ্মন্তের প্রতি অভিশাপ ত পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়। এমন কি, মহাভারতে দুর্বাসার শাপ নাই, কিন্তু তাহাতেও যে দুষ্মন্তের গুরু অপরাধের অভিশাপ আছে; তবে সে শাপ নাটকে নাই কেন? সেই কথাই এখন আলোচ্য।

বলিয়াছি ত নাটকীয় শকুন্তলা-প্রেমের উৎপত্তিস্থানেই দোষ ছিল, তাই সে প্রেম উৎপত্তি-স্থানেই অভিশপ্ত হইয়াছিল। রূপজ-কামানুরাগে সঞ্জাত হইয়া যে স্থলে সেই অনুরাগ দোষার্হ ধর্ম-বিস্মৃতি-জনক মোহে পরিণত হইয়াছিল, সেই স্থলে যেন শকুন্তলাকে উদ্বুদ্ধ করিবার ও জ্ঞান দিবার জন্য দুর্বাসার শাপ প্রযুক্ত হইয়াছিল। তদ্রূপ দুষ্মন্তের পাপানুরাগ যখন এতদূর মোহে পরিণত হইয়াছিল যে, তদ্বারা ধর্মের হানি ও সামাজিক অনিষ্টপাতের কারণ হইয়াছিল, তখনই দুষ্মন্ত অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাণের এগুলি বড় সূক্ষ্ম ধর্ম-নৈতিক তত্ত্ব। তাহাই পাপ, যাহার কর্মফল মন্দ। কর্মফল ধরিয়াই শাস্ত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার হইয়াছে। এজন্য ধর্মশাস্ত্র যাহাকে পাপ বলিয়াছেন তাহাকেই পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই পুরাণের অভিসম্পাত-সকলের তাৎপর্য বুঝা যায়। পুরাণ ধর্মশাস্ত্র; এজন্য তাহা অধ্যাত্মবিদ্যাই প্রকাশ করে। পৌরাণিক অভিশাপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বাবলির সুন্দর দ্যোতক। যে স্থলে পাপজনক মোহ ও ধর্মের গ্লানি, সেই স্থলেই অভিশাপ।

মহাভারত পুরাণ-শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ ব্যাস সেই ভারতমধ্যে সকল পৌরাণিক-রহস্যজনক ইতিহাসই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে সকল উপন্যাসের সারাংশভাগ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছে। শকুন্তলার উপাখ্যান প্রধানতঃ পদ্মপুরাণেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্যাস তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজ কাব্যে তাহার স্থান দান করিয়াছেন। এজন্য মহাভারতীয় উপাখ্যানে আমরা শকুন্তলার সার মর্ম অবগত হইতে পারি। ধর্মাচার লংঘনবশত শকুন্তলার সামান্য অপরাধ মহাভারতীয়

উপাখ্যানে অভিশপ্ত হয় নাই। কিন্তু দুষ্মন্তের গুরু অপরাধ উপেক্ষণীয় নহে। এজন্য সেই অপরাধ শকুন্তলা কর্তৃকই অভিশপ্ত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সংগস্তেষূপজায়তে।
সংগাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।" ২—৬২।৬৩

"যে যে বিষয় সতত ভাবনা করে, তাহার তাহাতে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামের উদ্ভব, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশের উৎপত্তি হয়।"

গীতা অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পাপপথের এইরূপ ক্রম দেখাইয়াছেন। সেই ক্রম দুষ্মন্ত-চরিতেও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চরিতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে শকুন্তলা তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার শকুন্তলার প্রতি প্রগাঢ় চিন্তা এবং সেই চিন্তা হইতে আসক্তি জন্মে। সেই আসক্তি কামে পরিণত হয়। সেই কাম হইতে তাঁহার কিরূপ ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিতেছি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার শকুন্তলাসক্তিকে নিজেই পাপাসক্তি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই আসক্তি-সন্তৃপ্তির দ্বার মুক্ত করিবার পন্থা মাত্র—গান্ধর্ব-বিবাহ। সে বিবাহ দ্বারা শকুন্তলার সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি স্ত্রীজাতির নিকট নানা প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। বয়স্য মাধব্যের নিকট কতক কতক খুলিয়াই, শেষে সকলই অলীক বলিয়া ঢাকিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, তিনি স্বারাজ্য-মধ্যে অতি সুধার্মিক, জিতেন্দ্রিয় নরপতি বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন! তাই তিনি নির্জনে যে পাপকার্য করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা গোপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সবাই জানে, জিতেন্দ্রিয় রাজর্ষি দুষ্মন্ত পরস্ত্রীর মুখাবলোকনে পরাংমুখ। তাই তিনি একদা গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"প্রথিতং দুষ্মন্তস্য চরিতং তথাপীদং ন লক্ষ্যে।"

"কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পরপরিগ্রহসংশ্লেষপরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ।"

"দুষ্মন্তের সকল কার্যই সর্বজনবিদিত; তথাপি ইহা কেন মনে হইতেছে না?"

"হে তপস্বিন্, আপনি জানিবেন যে, শশাংক কুমুদিনীকে আর দিবাকর পদ্মিনীকেই প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন, তেমনি জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণও পরস্ত্রী মুখাবলোকনে পরাঙ্মুখ।"—অভিজ্ঞান-শকুন্তল, পঞ্চম অঙ্ক।

তিনি কেবল স্বীয় মহিষীগণ ব্যতিরেকে আর কোন ললনার মুখাবলোকনে পরাংমুখ। তবে তিনি কিরূপে শকুন্তলার সহিত নির্জন বিবাহের কথা প্রচার করিতে পারেন? সে কথা প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে আর কে রাজর্ষি বলিবে? পরিবারবর্গ ও মহিষীগণই বা সেই লজ্জাকর ব্যাপার শুনিয়া কি বলিবে? তিনি যে সেই গান্ধর্ব-বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী কে? তিনি মনে করিতেন, তাহা মৃগয়া-সম্বন্ধীয় একটি গোপনীয় ঘটনা মাত্র। ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য তিনি স্ত্রীজাতির নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার আবার পালন করা কি? পালন করিতে গেলেই ত সেই রহস্য প্রচারিত হইয়া পড়িবে। এজন্য সেই প্রতিজ্ঞা-সকল চিরদিনই অপালিত ছিল। এই পাপকার্যের সমস্ত বিষয়ই তাই তিনি বিস্মৃতিনীরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। তাই বলিয়াছি, দুর্বাসা শাপ না দিলেও তাঁহাকে শকুন্তলাকে ভুলিয়া থাকিতে হইয়াছিল। এপ্রকার বিবাহের নিয়মই এইরূপ। তাই মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্বাসার শাপ অভাবেও দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া ছিলেন। তাহাতে আরও প্রকাশিত, সর্বশেষে ধর্মপত্নী শকুন্তলার সান্ত্বনা-জন্য দুষ্মন্তকে বলিতে হইয়াছিল :—

"প্রিয়ে! নির্জন কাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না; দোষৈকদর্শী লোক পাছে তোমাকে কুলটা, আমাকে কামপরবশ এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে জারজ মনে করে, এই ভয়ে আমি এতক্ষণ এতদ্রূপ বিচার করিতেছিলাম। তুমি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার প্রতি যে সকল কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে, আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।"—কা, সিং কৃত অনুবাদ।

শকুন্তলার কথা যখন তিনি এইরূপ বহুদিন ভুলিয়া গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকার্য্য করেন, মনে করেন, যা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, আর আমি কখন এরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইব না, এমন সময় সহসা একদিন শকুন্তলাকে লইয়া কণ্বশিষ্যদ্বয় একেবারে প্রকাশ্য রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। দুষ্মন্ত তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। যতই তাঁহারা রাজবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, ততই তাঁহার রাগ বাড়িতে লাগিল। শকুন্তলা আবার গর্ভবতী। সেই গর্ভ দেখিয়াই ত তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, কে তাহার গর্ভ করিল? আমি ত একদিন মাত্র স্পর্শ করিয়াছিলাম। কই তাহার হাতে ত সে রাজাঙ্গুরীয় নাই। তা হবেই ত, একদিনের প্রার্থনায় যে সম্মত হয়, তাহার চরিত্র কিরূপ হইবে? তাই তিনি রাগে গর্-গর্ করিয়া 'দূর দূর, বেশ্যা' বলিয়া তাঁহাকে রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কণ্বশিষ্যদ্বয় শকুন্তলাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে, রাজা তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে 'বেশ্যা বেশ্যা' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, এমত নহে, সেই শিষ্যদ্বয়কেও তৎসঙ্গে উত্তম মধ্যম কটূক্তি বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন?

"কত বেশ্যা আছে, এই কামসেবায় ভ্রমণ করে। রাজরাজের মহিষী হইতে কাহার না অভিলাষ হয়? এমন ব্রাহ্মণও অনেক আছে, যাহারা কপট তাপস বেশে ঐ সকল গণিকার সহিত ভ্রমণ করে এবং তাহাদের উপার্জ্জনের বিপুল ভোগ সম্ভোগ করে।"

রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যদ্বয় কি করিলেন?

"নিশম্য নৃপতের্বাক্যং শিষ্যৌ কণ্বস্য তাপসৌ।
শেপতুর্বিরহেণাস্যাঃ পশ্চাত্তাপমবাপ্স্যসি।"

শিষ্যেরা রাজাকে এই কথা বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন:—

"ইহার বিরহে তোমায় পশ্চাৎ অনুতপ্ত হইতে হইবে।"

এই বলিয়া সেই ব্রহ্মবাদী তাপসদ্বয় সক্রোধে চলিয়া গেলেন।

গীতার কথা মাত্রায় মাত্রায় ফলিয়া গেল। কাম হইতে ক্রোধ,

ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি। ক্রোধের সংগে সংগেই মোহ উপস্থিত হয়। সেই মোহবশত লোকের পূর্ব উপকারাদি কিছু স্মরণ থাকে না। ক্রোধে লোক অন্ধ হইয়া পড়ে। ক্রোধ পরম শত্রু। সেই ক্রোধ লোককে অকথ্য কথনে প্রবৃত্ত করায়। সুতরাং, সেই ক্রোধ-হেতু আজ রাজার মনে যে মোহ ও আত্ম-বিস্মৃতির উদয় হইয়াছিল, তাহাই শাপযোগ্য। আজ কণ্বশিষ্যদ্বয় সেই জন্য রাজাকে শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অন্য শাপ নহে, তাঁহারা শাপ দিলেন—"রাজন্, তোমাকে এই শকুন্তলা-বিরহে কাঁদিতে হইবে।" এ শাপ না দিলেও তাহাই ঘটিত। কারণ, তিনি আজ ক্রোধভরে শকুন্তলাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন; কিন্তু সময়ক্রমে এমন কাল উপস্থিত হইবে, যখন তাঁহাকে সেই সাধ্বী সতীর জন্য অনুতাপ করিয়া কাঁদিতে হইবে। এ শাপ তাঁহার মোহ-জনিত কার্যের ফল-স্বরূপ আপনিই ফলিয়া যাইবে। যেমন দুর্বাসার শাপ ফলিয়া গিয়াছে—রাজাকে শকুন্তলা-প্রেম ভুলিয়া থাকিতে হইয়াছে, যেমন দুর্বাসা শাপ না দিলেও তাহা অধ্যাত্ম-নিয়মে ফলিত, তেমনি এই শিষ্যদ্বয়ের শাপ সেই আধ্যাত্ম-নিয়মে স্বতই ফলিয়া যাইবে। সুতরাং পুরাণে আমরা যে-সকল শাপ-বৃত্তান্ত পড়ি, তাহা অধ্যাত্ম-নিয়মেরই দ্যোতক। তাহাদের ফলাফল সেই নিয়মানুসারে অবশ্যম্ভাবী। প্রভেদ এই, কোন স্থলে সে ফল ফলিতে দেখা যায়, কোন স্থলে দেখা যায় না। যেখানে দেখা যায় না, সেখানে সেই ফল অন্তরে অন্তরে ঘটে। তাহা অধ্যাত্ম-জগতে সূক্ষ্মরূপে দেখা দেয়, বাহিরে প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য মানুষ ভিতরে ভিতরে অধোগামী হইতে থাকে। কালক্রমে সেই অধোগতির ফল দেখা দেয়।

পদ্মপুরাণে কণ্বশিষ্যদ্বয়ের এইরূপ শাপবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। নাটক ত সেই পুরাণ-অবলম্বনে রচিত, তবে তাহাতে সে শাপ দৃষ্ট হয় নাই কেন? তাহার কারণ, নাটক ত আর পুরাণ নহে। নাটকে প্রকাশ্য রংগভূমিতে অভিশাপ হওয়া নিষিদ্ধ। তজ্জন্য সে শাপ নাটকে নাই। দুর্বাসার শাপ স্ত্রীলোকের উপর, সুতরাং তাহা অনায়াসে নেপথ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে যে প্রকাশ্য রাজসভায় এই

শকুন্তলার সাক্ষাৎ ব্যাপার অভিনীত হইতেছে; তবে কিরূপে সে শাপ প্রদত্ত হইতে পারে? তথাপি ঠিক্ সেই শাপ না হউক, শারংগরব তদনুরূপ বাক্য রাজাকে বলিয়াছিলেন। রাজা যখন বলিলেন :—

"হে তাপস! আচ্ছা, আমরাই যেন প্রতারক ও আমাদের বাক্য বিশ্বাসজনক নহে, কিন্তু বলুন দেখি, এই তাপস-কন্যাকে প্রতারণা করায় আমার কি লাভ হইবে?" তখন শারংগরব বলিলেন—"বিনিপাতঃ। তোমার নিপাত লাভ হইবে।" এইরূপ কটূক্তি কি অভিশাপ নহে?

কিন্তু সেই সতীলক্ষ্মী তাপস-কন্যা শকুন্তলাকে রাজা যে, বেশ্যা বেশ্যা বলিয়া দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাহাতে কি সেই সতীর মনে দারুণ বেদনার উৎপত্তি হয় নাই? সেই বেদনাতে তিনি কি বলিয়াছিলেন? সেই সতীলক্ষ্মী কুপিত পতিকে নিজে ত শাপ দিতে পারেন না, তাই তাঁহাকে পাকত এইরূপ অভিশাপ-বাক্য প্রয়োগ করিলেন। পদ্মপুরাণে আছে :—

"যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিষ্যসি।
কণ্বশাপেন তে মূর্দ্ধা শতধৈব ফলিষ্যতি॥"

"হে দুষ্মন্ত! আমি পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করিতেছি, যদি আমার কথায় মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে কণ্বশাপে আপনার মূর্ধা বিদীর্ণ হইবে।"

সাধ্বী আপনার কথায় পতির প্রতি দারুণ শাপবাক্য প্রয়োগ করিতে না পারায় পিতার উপর ঠেশ দিয়া বলিলেন। কিন্তু সে শাপ বাস্তবিক তাঁহার নিজেরই। মহাভারত এ কথার প্রমাণ। মহাভারতে শকুন্তলা বলিতেছেন :—

"হে দুষ্মন্ত! তুমি যদি আমার কথায় অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।" সম্ভবপর্ব। ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অভিনয়ে এরূপ স্থলে নেপথ্যে কোন কথা রাজার সঙ্গে ঘটিতে পারে না বলিয়া নাটকে এইরূপ শাপবাক্য উচ্চারিত হয় নাই। শাপবাক্য উচ্চারিত না হউক, শকুন্তলা এই স্থলে যেরূপ কোপোজ্জলিত হইয়া রাজাকে অগ্নিসম বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা শাপেরও অধিক। তদপেক্ষা শাপ দেওয়া ভাল ছিল। তিনি রাজাকে বলিয়াছিলেন :—

"অনজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ কিল সব্বং পেক্খসি। কোণাম অণ্ণো ধম্মকঞ্চুঅব্যবদেসিণো তিণাচ্ছন্নকূবোবমস্স তুহ অণুআরী ভবিস্সদি।"

"হে অনার্য! আপনার হৃদয়ের ন্যায় অনুমান করিয়া সকলকেই দর্শন করিয়া থাকেন; ধর্মকঞ্চুকের আবরণ দিয়া তৃণাচ্ছন্ন কূপতুল্য আপনার ন্যায় শঠতাচরণ করিতে কোন্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়?"

প্রকাশ্য রাজসভায় দাঁড়াইয়া "অনার্য" "শঠ" "প্রতারক" প্রভৃতি বাক্যে রাজাকে কটূক্তি করিতে কেবল সংসারানভিজ্ঞা তাপসকন্যা শকুন্তলাই সাহসিনী হইয়াছিলেন। না হইবেন কেন? তখন কি শকুন্তলার জ্ঞান ছিল? সাধ্বী শঠ, বেশ্যা প্রভৃতি-রবে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়া গায়ের জ্বালায় সেইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। শকুন্তলার তখনকার রোষকষায়িত ভাব দেখিয়া রাজা স্বগত কি ভাবিতেছেন দেখুন:—

"বনবাসাদবিভ্রমঃ পুনরত্রভবত্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি—
"ন তির্যগবলোকিতং ভবতি চক্ষুরালোহিতম্।
বচোঽপি পরুষাক্ষরং ন চ পদেষু সংগচ্ছতে।"

"বনবাসহেতু ইঁহার কোপ বিভ্রমশূন্য, যেহেতু ইনি বক্রভাবে অবলোকন করেন না, ইঁহার চক্ষুও অতিশয় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, বাক্যও অত্যন্ত নিষ্ঠুরাক্ষর-বিশিষ্ট এবং উহা লক্ষ্যীকৃত মাদৃশ পুরুষগণের প্রতি সংগত হয় না।"

এই ভাবে তিনি যেন শাপ দিতে উদ্যত, এমতই বোধ হইয়াছিল। তাঁহার মনোগত অগ্নিপরীত অভিশাপ যেন সেই কোপোজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত হইতে আসিতেছিল। অথচ ব্যক্ত হইবার যো নাই বলিয়া যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল। শকুন্তলা মনে মনে যেন দারুণ অভিসম্পাত করিতেছিলেন। সে অভিসম্পাত ফুটিয়া বাহির হইলেই মুখরিত হইয়া বলিত—"হে রাজন্, আমার বুক যেমন বিদীর্ণ হইয়াছে, তোমার শির যেন তেমনি বিদীর্ণ হয়।" নাটক পদ্মপুরাণের ইতিহাসাবলম্বনেই রচিত, সুতরাং বুঝিতে হইবে, নাটকে যদি পুরাণোক্ত অভিশাপ-বাক্য প্রকাশ্যে উচ্চারিত হইবার যো থাকিত, তাহা হইলে ঠিক্ সেই অভিশাপই শকুন্তলা উচ্চারণ করিয়া বলিতেন। নাটক সে অভিশাপ ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার ফলাফল

বিলক্ষণ দেখাইয়াছে। দুষ্মন্ত শেষে শকুন্তলার বিরহে একান্ত কাতর হইয়া যখন গীতোক্ত বুদ্ধিনাশ-হেতু উন্মাদপ্রায় হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার মূর্ধা শতধা বিদীর্ণ হইয়াছিল। সেই ফল দেখিয়াও অনুমান করিতে হয়, যাহা সেই ফলোৎপত্তির কারণ, তাহাই শকুন্তলার অভিশাপ। রাজা দুষ্মন্ত নিজ কর্মদোষেই সেই অভিশাপভাগী হইয়া শত অনুতাপবাক্যে সেই অভিশাপেরই ফলশ্রুতির পরিচয় দিয়াছেন।

অলংকার শাস্ত্র

অলংকারশাস্ত্র কাহাকে বলে, আমি আজ সেইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অলংকারশাস্ত্রের নাম শুনিলে ইংরাজিওয়ালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে। সাধারণলোকে মনে করে, অলঙ্কার রসের শাস্ত্র, ইহা পড়িলে লোকে রসিক হয়; অর্থাৎ যেখানে সেখানে রসের কথা কহিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আলঙ্কারিকেরা যে অর্থে রসশব্দ ব্যবহার করেন, সাধারণলোকে সে অর্থে ব্যবহার করেন না। সুতরাং লোকের যে সংস্কার অলঙ্কার পড়িলে ইয়ার হওয়া যায় তাহা ভুল। ইংরেজিওয়ালারা অলংকারশাস্ত্রের উপর চটা কেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। এককালে ইউরোপে অলংকারশাস্ত্রের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় শিশিরো হাপদেবতা ছিলেন, লোন্‌জাইনস্ গুরু ছিলেন। কিন্তু সে অলংকার পাঠে লোকে কেবল বর্ণবিন্যাস করিতে শিখিত মাত্র, আর কোনরূপ ফল দর্শিত না। যখন পদার্থবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল, তখন লোকে অলংকারশাস্ত্র অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিল। যিনি পদার্থবিদ্যার প্রথম পথ দেখান, তিনি অর্থাৎ লর্ড বেকন্ আলংকারিকদিগের প্রতি অত্যন্ত চটা ছিলেন। সুতরাং লর্ড বেকনের বাঙ্গালি শিষ্য প্রশিষ্য বৃদ্ধপ্রশিষ্যগণও অলংকার শাস্ত্রের উপর চটিয়াছিলেন। কিন্তু বেকন্ অলংকার শাস্ত্রের উপযোগিতা মানিতেন, যিনি কেবলমাত্র ঐ শাস্ত্রের আলোচনায় জীবনাতিবাহিত করিতেন বেকন কেবল তাঁহারই উপর চটা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ অলংকারশাস্ত্র সাপ কি বেঙ, কিছুমাত্র না দেখিয়া, অলংকার-শাস্ত্রের নাম শ্রবণমাত্রেই কাণে আঙ্গুল দেন। সংস্কৃত ইংরেজিওয়ালারা বলেন, অলংকারশাস্ত্রে রসবোধ না হইয়া কেবল কতকগুলা নীরস বাগাড়ম্বর শিক্ষা হয় মাত্র; কতকগুলা অলঙ্কার, কতকগুলা দোষের নাম, কতকগুলা কাব্যভেদের নাম মুখস্থ করিয়া মরিতে হয় মাত্র এবং

ঐ কবিতার শব্দ শক্ত্যুথ বস্তুধ্বনি কবিউক্তিত অলংকারধ্বনি কাব্যলিংগ ভাবিক পরিসংখ্যা উদাত্ত অথবা ইহার সংসৃষ্টি অথবা অংগাংগীভাব সঙ্কর এই লইয়া বৃথা দন্তকচকচি হয় মাত্র। আসল যাহাতে রুচির পরিবর্তন ও পরিমার্জন হয় তাহা অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে হয় না।

আমরা বলি যদি তাহা না হয় তবে ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষ নহে, অলঙ্কার শিক্ষার দোষ। সময়ে সময়ে অলঙ্কারগ্রন্থেরও দোষ; অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহৎ, শুদ্ধ যে রুচিপরিবর্তনই অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ নহে। উহা পদার্থবিদ্যাদির ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে।

শব্দশাস্ত্র মোটামুটি ধরিতে গেলে, তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও অলংকার। যাহাদ্বারা শব্দগুলি কিরূপ ব্যুৎপত্তি হয়, তাহার প্রণালী অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরুক্ত; যাহাদ্বারা শব্দসমূহ বাক্যমধ্যে কিরূপে নিবেশিত হয়, তাহার প্রণালী জানা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ। এবং এই সকল বাক্য পরস্পর যোজনা করিয়া বক্তৃতা করিবার. গ্রন্থ লিখিবার এবং প্রবন্ধাদি লিখিবার প্রণালী যাহাদ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহার নাম অলংকার। সুতরাং ব্যাকরণাদি যেরূপ উপযোগী অলংকারও সেইরূপ। অনেকে বলিবেন অলংকার না পড়িয়া কি বক্তৃতা করা যায় না, না গ্রন্থ লেখা যায় না, না সকল গ্রন্থকারই আলংকারিক। যদি না হয় তবে অলংকারশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? আমরা বলি ব্যাকরণ না পড়িলেই কি কথক হওয়া যায় না, না বাক্য রচনা করা যায় না, ন্যায়শাস্ত্র না পড়িলে কি তর্ক করা যায় না, না তর্কশক্তির উদ্ভাবন হয় না, তবে কি ব্যাকরণ ও ন্যায় কার্যেরই না। উহা কি অপাঠ্য মধ্যে গণ্য হইবে, তাহা নহে। অলংকারশাস্ত্রের এমত উদ্দেশ্য নহে যে, উহাতে লোককে বক্তৃতা করিতে শিখাইবে, উহাতে কেবল বক্তাকে বিশুদ্ধ প্রণালী দেখাইয়া দেয় মাত্র। যেমন ব্যাকরণ পাঠে অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের প্রতি বিতৃষ্ণা দেয় এবং শুদ্ধ প্রয়োগের উপায় দেখাইয়া দেয়, যেমন ন্যায়শাস্ত্র তর্ক করিবার সূত্রাদি শিখাইয়া দেয় এবং তর্কদোষ ধরিবার উপায় দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ অলংকারেও বক্তৃতার উৎকৃষ্ট প্রণালীও দেখাইয়া দেয়।

অলংকারশাস্ত্র পড়িলে অবক্তা বক্তা হইতে পারেন না, অকবি কবি হইতে পারেন না। কিন্তু কবি যদি অলংকার শিখে, তাহা হইলে অনিন্দনীয় কবি হয়, ও বক্তা যদি অলংকার শিখে, তাহা হইলে সে অনিন্দনীয় বক্তা হইতে পারে। স্বভাব যাহা দেন নাই তাহা শাস্ত্রপাঠে কখন জন্মে না, সংগীতশাস্ত্রে সুপটু লোক যেমন কোথায় তাললয়বিরোধ দেখিলে চটিয়া যান, সেইরূপ অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও কাব্যে বা বক্তৃতায় সুরুচিবিরুদ্ধ কোন দোষ দেখিলেই চটিয়া যান। অলংকার পাঠে অরসিক লোক রসিক হয় না; রসিকতাও স্বভাবপ্রদত্ত।

সমাজে যাহা সুরুচি বলিয়া পরিচিত অলংকার পড়িলে লোক তাহা অবগত হন। যেমন একখানি চিত্র দেখিলেই লোকে খুসি হয়, অথবা অখুসি হয়, কিন্তু কেন খুসি বা অখুসি হইল তাহা বলিয়া দিবার জন্য একজন বিচারক চাই, সেইরূপ কোন গ্রন্থ পড়িয়া কেহ খুসি হয় কেহ অখুসি হয়; কিন্তু কেন যে ওরূপ হইল তাহা সকলে আপনি বুঝিতে পারে না। যে খুসি অখুসির প্রকৃত হেতু বলিয়া দিতে পারে সেই ব্যক্তির অলংকারশাস্ত্র পাঠের ফল হইয়াছে, তিনি সামাজিক কিন্তু আলংকারিক সামাজিক হইতেও উচ্চতর, তিনি সামাজিকদিগের উচ্চতর রুচির পথ দেখাইয়া দেন।

আলংকারিকের কার্য অতি গুরুতর। তাঁহাকে সামাজিকের রুচিসংস্কার করিতে হয়; কবির রুচিসংস্কার করিতে হয়; লোকের রুচিসংস্কার করিতে হয়; সেই সংগে অভিনয়কারীদিগেরও রুচিসংস্কার করিতে হয়। আলংকারিক রুচিশাস্ত্রের ফিলাজফার, রুচি কোন পথে যাইবে, কোনটী সৎরুচি, কোনটী কুরুচি এই সমস্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হয়। যদি সত্য বটে "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।" প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূল নিয়মের অনভিজ্ঞতা হেতু ভিন্নতা জন্মে। সেই মূল নিয়মের প্রদর্শক আলংকারিক।

নৃত্য গীতাদি দেখিবার, সুদৃশ্য দ্রব্য দেখিবার, উত্তম কবিতা শুনিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, যে মনোবৃত্তি থাকা প্রযুক্ত এই সকল প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম রুচি। রুচি শব্দটি বোধ হয় ঠিক ব্যবহার হয় নাই, উহার

ইংরেজি নাম Aesthetic faculty। মনুষ্যমাত্রেরই এই মনোবৃত্তি আছে, কিন্তু অসভ্যদেশে ইহার সুবিকাশ হয় না, অত্যন্ত সভ্যদেশে সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র ইহার পুষ্টিসাধন শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন। সে পুষ্টিসাধন কিরূপ হইবে।

মনে কর থিয়েটার দেখিতে গিয়াছি বা যাত্রা শুনিতে গিয়াছি, যাত্রাওয়ালার বা থিয়াটারওয়ালার উদ্দেশ্য পয়সা, লোককে হাসাইয়া বা কাঁদাইয়া, তাহাদিগকে আমোদ দিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করা। সুতরাং অধিক লোকে যাহা ভালবাসে তাহারা সেইরূপ যাত্রা বা অভিনয় করিবে। যিনি কবি তিনি অর্থকাম হউন আর না হউন অনেকে যাহা ভালবাসিবে তিনিও তাহাই লিখিবেন। যদি এইরূপ চলিয়া যায় তাহা হইলে ক্রমে সে যাত্রা বা অভিনয় জঘন্য হইয়া উঠিবে; কারণ যাহাতে দুই একটি কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হয় সাধারণ লোকে সেই সকল জিনিস দেখিতে ভালবাসে। যদি দর্শকবৃন্দের মধ্যে বহু-সংখ্যক সুরুচিসম্পন্ন লোক না থাকেন তাহা হইলে নাটকাদি এই সকল উত্তেজক বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়। আট দশ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে যাত্রা কবি যে অতি জঘন্য হইয়াছিল, এবং এখনও যে আমাদিগের রংগভূমি সকল আরও জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারও এই মাত্র কারণ যে দর্শকগণের মধ্যে সুরুচিসম্পন্ন লোক অতি বিরল। ইংলণ্ডে সেক্‌সপীয়ারের পূর্বে ইংলণ্ডের রঙ্গভূমিরও অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল, তখন থিয়েটারে এমত চীৎকার হইত, যে এক মাইল পর্যন্ত লোক ঘুমাইতে পারিত না, গোলমাল, মারধোর, রক্তারক্তি হইত, সময়ে সময়ে দর্শকবৃন্দ তাহাতে যোগ দিয়া মহা আমোদ করিয়া উঠিতেন, ক্রমে সুরুচিসম্পন্ন লোক থিয়েটারে যত যোগ দিতে লাগিলেন, ততই ঐ সকল গোলমাল কমিয়া আসিল। পরে যখন সেক্‌সপীয়ার বেন্‌-জন্‌সন্‌ প্রভৃতি মহাকবিগণ রুচিবিষয়ে টেক্কা দিতে লাগিলেন, তখনই ইংলণ্ডীয় নাটকের সমুন্নতি লাভ হইতে লাগিল। অতএব দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক সুরুচিসম্পন্ন লোক থাকা আবশ্যক, কিন্তু যদি সমাজে লোক থাকা পর্যন্তই হয়, এবং আলংকারিক লোক না থাকে,

তাহা হইলে কাব্যাদি একঘেয়ে মারিয়া যায়; রুচির পরিবর্তন হয় না সুতরাং সকলেই এক রুচির অনুসরণ করে। এই সময়ে অলঙ্কারের কারিকা প্রস্তুত হয়, ক্রমে কারিকা মতে কাব্যলেখা আরম্ভ হয়, কবি প্রতিভা সম্যক্ স্ফূর্তি হয় না। কালিদাসের পর ভারতবর্ষীয় রঙ্গভূমির এই দশা হইয়াছিল। অতএব দেশের মধ্যে শুদ্ধ সামাজিক থাকিলেই রুচি নামক মনোবৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা হয় না, উহার জন্য আলঙ্কারিক চাহি। নূতন নূতন সুরুচিপদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারেন এরূপ লোক চাই, চলিত কাব্যগ্রন্থ সকল হইতে নূতন নূতন ভাব সঙ্কলন করিতে পারে এরূপ লোক চাই, কবিদিগের মত নূতন নূতন পদার্থ মনোনীত করিতে পারেন এরূপ লোক চাই। যিনি তাহা পারেন তিনি যথার্থ আলঙ্কারিক। কারিকা পড়িয়া আলঙ্কারিক হয় না। কারিকা যে সময়ে লিখিত হয় উহা সেই সময়ের পক্ষে খাটে, পরবর্তী সময়ের লোক যদি সেই কারিকা সকলের অনুরূপ করে তাহা হইলে কাব্যশাস্ত্রের অধোগতি হয়। পরবর্তী সময়ের লোক যদি ঐ কারিকার পরিবর্ত ও উন্নতিসাধন করিতে পারে তাহা হইলে কাব্যশাস্ত্রের উন্নতি হয়। কারিকায় ঐতিহাসিকজ্ঞান হয় উহাতে রুচি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হয় না। উহাতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে অমুক সময়ে রুচির অবস্থা এইরূপ ছিল।

[বংগদর্শন]

সমালোচনা

শরচ্চন্দ্র চৌধুরী

সৃষ্টিতে সমালোচনা নাই তখন কেবল বিস্ময়, কেবল আনন্দ। বিশ্বব্যাপিনী তমসার কোলে প্রথম যে দিন জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল একে একে বা যুগপৎ ভাসিয়া উঠিল, তখন কেহ সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহার চিত্ত অভাবনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, অবেদ্য বিস্ময়ে অভিভূত হইত। জ্যোতিষ্কগণ স্থিতিশীল হইলে কি গতিশীল হইলে ভাল হয়, মাসরূপ বিহঙ্গের এক পক্ষ শুক্ল আর এক পক্ষ কৃষ্ণ হওয়াতে সুবিধা হইয়াছে কি অসুবিধা হইয়াছে, এ কথা ভাবিবার অবসর তখন সে কম্পিত চিত্তে স্থান পাইত না। তাহার পরে বিস্ময়ের নিবিড় গাঢ়তা ক্রমে যেমন অপনীত হইতে লাগিল, জীব যেমন বিশ্ব-যন্ত্রে আপনার স্থান চিনিয়া, আপনার সুখ-দুঃখে আপনার ভোগের মাত্রা বুঝিয়া, প্রথমে যাহা নির-বচ্ছিন্ন অনুগ্রহ ছিল তাহাতে আপনার একটা দাবী অনুভব করিয়া ভাল মন্দ বিচারের অবসর পাইল, তখন তাহার গায়ে একটা অতৃপ্তির বাতাস আসিয়া লাগিল, তাহার হৃদয়ে একটা সমালোচনার তাড়না স্ফুরিত হইয়া উঠিল। তখন বিস্ময় এবং আনন্দের বিপরীত ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল, কেহ সৃষ্টি-কৌশলে অসামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিল, কেহ বা—

> "স্বর্ণে ন গন্ধঃ ফলমিক্ষুদণ্ডে,
> নাকারি পুষ্পং খলু চন্দনস্য।
> বিদ্যাবিনোদী নহি দীর্ঘজীবী,
> ধাতুঃ পুরে কোঽপি ন বুদ্ধিদাতা॥"

বলিয়া আপনাকে বিশ্বস্রষ্টা হইতেও অধিক বুদ্ধিমান মনে করিতে লাগিল।

ভারতের (অথবা জগতের) আদি কবির কণ্ঠ হইতে প্রথম যে দিন

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীঃ সমাঃ"

বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইলেন, তখন কবি নিজেই বুঝি বা আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইলেন, এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ স্বর্গীয় ধ্বনি কিরূপে কোথা হইতে উত্থিত হইল।" সেই দিনের পর কত যুগযুগান্তর অতীত হইয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কত সালঙ্কত মাধুর্যগর্ভ কবিতার কতরূপ সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কবিতাটি পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় সমালোচনার অতীত রহিয়া কণ্ঠে কণ্ঠে আজিও ধ্বনিত হইতেছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি-কার্যের সমালোচনা হইয়াছে, কিন্তু বাল্মীকির প্রথম কবিতার সমালোচনা আজিও হয় নাই।

শিশু মাতৃ-কুক্ষি হইতে ধরণীর কোলে অবতারিত হইয়াই এক অভিনব বিস্ময়ের রাজ্যে প্রবেশ করে। তখন তাহার নিকট সকলেই নূতন, সকলেই অপরিচিত, সকলেই এক একটি বিস্ময়ের আকর। মাতা, ধাত্রী, সূতিকা-সংগিনী, জল, বস্ত্র, গৃহ, দীপ-শিখা,—যাহার উপরে তাহার দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই সে মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কে?" তখন ভাল মন্দ বলিয়া তাহার জ্ঞান নাই; সুন্দর কুৎসিত বলিয়া তাহার বোধ নাই, খঞ্জ-কুব্জ-সুঠাম কলেবরে তাহার ভেদজ্ঞান নাই; তখন সে যাহা দেখে যাহা শুনে, তাহাই শোভন, মোহন, অপূর্ব, বিস্ময়কর।

ক্রমে মানুষ, গরু, বিড়াল, কুক্কুর শিশুর পরিচিত হইতে লাগিল, ক্রমে পরিধিও দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল। শিশু যে দিন প্রথম বাদ্য আবিষ্কার করিল—যে দিন তাহার হাতের বালা (খাড়ু) দুধের বাটীর কানায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিল, সে দিন তাহার কি যে আনন্দ, তাহার মুখভরা হাসি এবং পুনঃ পুনঃ সেই শব্দ উৎপাদন করিবার চেষ্টাই—সে বিষয়ের প্রমাণ। শৈশবের অনন্ত বিস্ময়-ব্যাপার অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সর্ব প্রথমে একখানি ছিন্ন শিশু-বোধকে ছাপার অক্ষরে গংগার বন্দনা এবং গুরুদক্ষিণা পাঠ করিয়া যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, উচ্চতম কাব্যে আজ অনুসন্ধান করিয়াও সে আনন্দ পাই

না, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইল বলিয়া মনে করি না। নিরন্ন দরিদ্র আজ হঠাৎ রাজভোগের অধিকারী হইল,—যাহার শাকান্ন জুটিত না, আজ অসংখ্য উপকরণে সজ্জিত অন্নস্থালী তাহার সম্মুখে উপস্থিত। সে যাহা মুখে দিতেছে, তাহাই তাহার রসনা উপাদেয় অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, আজ তাহার বাছিয়া খাইবার অবসর বা শক্তি নাই। কিন্তু কিছুদিন গেলেই আর সে অবস্থা থাকে না, তখন সে পক্কান্নে ঘৃতের দুর্গন্ধ পায়, সন্দেশের ভালমন্দ বিচার করে, মিষ্টান্নের দোষ বাহির করিয়া দেয়।

এই দৃষ্টান্তগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কিছুরই আরম্ভে, বিরলত্বে বা একত্বে সমালোচনার অবসর নাই; সেখানে পরিণতি, বৈচিত্র্য এবং বহুত্ব বর্ত্তমান, সেখানেই সমালোচনা আসিয়া দেখা দেয়। আর একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, সেখানে বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা আছে, যেখানে পুরুষকার প্রদর্শনের অবসর আছে, সেখানে ভাল বা মন্দ করিবার স্বাধীনতা আছে, সেখানেই সমালোচনা চলে, অন্যত্র নহে। কৃত্রিমতাই সমালোচনার বিষয়, প্রকৃতি ইহার অধিকারের বাহিরে। প্রকৃতির কার্যে আলোচনা চলে, তত্ত্বানুসন্ধান চলে, কিন্তু সমালোচনা চলে না। সমালোচনার তিনটি অংগ—প্রশংসা, নিন্দা এবং আদর্শ—নির্দেশ; কিন্তু প্রকৃতির কর্ণ এই তিনেতেই বধির। সুতরাং প্রকৃতিকে ছাড়িয়া—সমগ্র বিশ্ব-ব্যাপারকে ছাড়িয়া, সমালোচনাকে কেবল মানবীয় কার্যাবলীর গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু গণ্ডীর ভিতরে আছে বলিয়া যে সমালোচনাকে কাজ না পাইয়া অবসরে বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, এমন নহে। মানবের কার্য যেখানে বর্ত্তমান, সমালোচনাও সেখানেই রহিয়াছে; মানবের কার্য যেমন অশেষ, সমালোচনাও সেইরূপ অশেষ মূর্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। এমন কার্য নাই, যাহা একেবারে নিন্দা-প্রশংসা-বর্জিত, যাহার একটা না একটা নিন্দা বা প্রশংসা না হইতে পারে।

মানবীয় কার্য অশেষ হইলেও তাহার মধ্যে কয়েকটিকে প্রধান বলা

যাইতে পারে। ধর্ম প্রধান বটে, কিন্তু ইহাকে গুণ বলিব কি কর্ম বলিব বুঝি না; সম্ভবতঃ উভয়ই বলিতে হইবে। ধর্ম কর্ম হইলেও তাহা আধ্যাত্মিক সাধনের ব্যাপার; তাহার একগুণে বাহিরে প্রকাশ পাইলে শতগুণ ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়, সুতরাং তাহার তলা না পাইয়া সেখানে সমালোচনা নিরস্ত নির্বাক্ থাকে। বিজ্ঞান তত্ত্বান্বেষণে ব্যাকুল, মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করাই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের ভাগ্যে বিশ্রাম লেখা নাই; বহুদিনের অনুসন্ধানে যেমন একটি নূতন তত্ত্বের সংবাদ তাহার প্রাণে আসিয়া পঁহুছিল, সে আবার তাহার পেছনে পেছনে ছুটিল। এই অনুসন্ধানেই বিজ্ঞানের আনন্দ, বিশ্রামে তাহার মৃত্যু। বিজ্ঞান এইরূপে প্রাণপাত করিয়া যে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছে, তাহাই মানব-জাতির স্থায়ী সম্পত্তি, তাহাই উন্নতির নিদান, তাহাই কার্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার মাপকাঠি। যে কার্য বিজ্ঞানের অনুমোদিত তাহাতেই সাফল্যের আশা করা যায়, বিজ্ঞান-বিরোধী কার্যে পণ্ডশ্রম পাত্র। বিজ্ঞানই যখন সমালোচক, অর্থাৎ কার্যের বিজ্ঞান-সম্মত বিচারই যখন সমালোচনা, তখন তাহার আলোচনা সম্ভাবিত হইলেও সমালোচনা সম্ভাবিত নহে। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভ্রান্তি প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু স্বয়ং বিজ্ঞান আবিলতাশূন্য, অগ্নি-দ্রাবিত সুবর্ণের ন্যায় শ্যামিকাপরিবর্জিত, বিশুদ্ধ। অগ্নি শীতল, এই কথা বলিলেই তাহার সমালোচনার প্রয়োজন, কিন্তু অগ্নিতে দাহিকাশক্তি আছে, একথা কেহ বলিলে যাহা বুঝি, নিজের মনে মনেও তাহাই অনুভব করি, সুতরাং ইহার আবার সমালোচনা কি? এস্থলে বিজ্ঞান বলিতে আমি জড়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্তই বিজ্ঞানই বুঝিয়া লইতেছি।

যাহাতে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালনা হয়, যাহাতে মানব-হৃদয়ের ভাব-সম্পদ্ প্রকাশিত, স্ফুরিত এবং অভিব্যক্ত হয়, যাহার সম্পাদনে কর্তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, যাহা পাঁচজনে করিলে পাঁচরকম করিতে পারে, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষ কর্তার শিক্ষা রুচি, উদ্দেশ্য, যোগ্যতা, আগ্রহ এবং অভিনিবেশের উপরে নির্ভর করে, এবং যাহার ফলাফল পরোক্ষভাবে

বা প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র সমাজের বা মানবমণ্ডলীর স্বার্থকে স্পর্শ করে, মানবের সুখ-সৌভাগ্যের পথকে প্রশস্ত করে, মানবের সৌন্দর্য পিপাসাকে বর্ধিত ও পরিতৃপ্ত করে, এমন সকল কার্যই সমালোচনার বিষয়ীভূত।

এই কথাগুলি ঠিক হইলে মানবীয় কার্যাবলীর অতি অল্প বাদে প্রায় সমস্তই সমালোচনার আমলে আসিয়া পড়ে। এমন কি, কে কিরূপে আহার করে, কে কি ভাবে চলে, কে কি প্রকারে কথা কহে ইত্যাদি বিষয়েরও সমালোচনা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং নাম করিয়া সমালোচ্য কার্যের অবধি নিয়োগ করা অসম্ভব। কিন্তু এ সমস্ত প্রকৃত সমালোচন পদের বাচ্য নহে। সাধারণতঃ কাব্যাদি সাহিত্য, চিত্র, সংগীত, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার-বিদ্যার যে সমালোচনা তাহাই সুধী-সমাজে সমালোচনা বলিয়া পরিচিত, পরিগৃহীত এবং সম্মানিত।

কেহ বলিতে পারেন, পূর্বকালে সমালোচনা ছিল না, তাই বলিয়া কি প্রাচীন সাহিত্যের আদর কিছু কমিয়াছে? বর্তমান প্রণালীর সমালোচন পূর্বকালে ছিল না বটে, তবে সমালোচন যে ছিলই না, একথা বলা যায় না। কথিত আছে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে এক গ্রন্থ লিখিয়া আর একজন পণ্ডিতকে তাহা শুনাইয়াছিলেন, গ্রন্থ শুনিয়া পণ্ডিত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। গৌরাঙ্গ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনিও ঠিক ঐ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গের গ্রন্থ যখন এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তখন সেই গ্রন্থই সকলে পড়িবে, তাঁহার গ্রন্থ কেহ পড়িবে না। গৌরাঙ্গ এই কথা শুনিয়া হাসিলেন, এবং সেই পণ্ডিতকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য তাঁহার নিজের গ্রন্থখানি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, সে কালে যে কেবল সমালোচনা ছিল, এমন নহে, সেই সঙ্গে অসাধারণ উদারতা এবং অসীম স্বার্থত্যাগও ছিল। এখন সেরূপ উদারতা এবং স্বার্থত্যাগ আছে কি না, গ্রন্থকারগণ এবং সমালোচকবর্গ ই বলিতে পারেন।

প্রাচীন কালে বোধ হয় কেবল সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ

লিখিবার প্রথা বড় একটা ছিল না, টীকা-টিপ্পনীতে প্রসঙ্গ উপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রন্থকারের মতামত সমালোচিত হইত। তখন সমালোচনার বড় বেশী প্রয়োজনও হইত না, কেন না গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেন, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া, উপযুক্ত ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কাযেই তাঁহাদের গ্রন্থে অন্যের সমালোচনার জন্য তেমন অবকাশ থাকিত না। কিন্তু আজকালকার এই ব্যস্ততার দিনে, এই অভিনবতার যুগে সে ভাবের কি আশা করা যায়, না তাহা সম্ভব হয়? কার্লাইল্ এক স্থলে বলিয়াছেন, একখান ভাল গ্রন্থ লিখিতে বসিলে তাহাতে গ্রন্থকারের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়, গ্রন্থ সমাপনান্তে কিছু দীর্ঘকাল বিশ্রাম না করিলে গ্রন্থকার পুনরায় লেখনী গ্রহণে সমর্থ হন না। আমাদের দেশে গ্রন্থকারদিগের মধ্যে কাহারও এ অবস্থা ঘটে কি না জানি না। কিন্তু অনেকের যে সেরূপ দুরবস্থা ঘটে না, ইহা তাঁহাদিগের লেখনীর অবিরাম গতি দেখিয়া বুঝিতে পারি। তাঁহাদের গ্রন্থ-বাহুল্য দেখিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ বলিব কি দশভুজ বলিব ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। তাঁহাদের সকল গ্রন্থই যদি সমান সারবান্ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মস্তিষ্কের সবলতা অসাধারণ বলিতে হইবে। ভগবান্ করুন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধিযুক্ত, বঙ্গসমাজকে উপকৃত, এবং বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে থাকুন।

কিন্তু প্রতিভার সম্ভব ত সর্বত্র হয় না, বাংগালীর মধ্যে প্রতিভাশালী লেখক আছেন বলিয়া আমার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ গ্রন্থকার এদেশে জন্মিতে পারেন না, এ কথা ত কল্পনাই করা যায় না। প্রতিভার বাক্য অর্থের অনুসরণ করে না, অর্থ ই প্রতিভার বাক্যের সংগে সংগে চলে, প্রতিভার উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই সাহিত্যের আইন-কানুন বা অলংকার শাস্ত্রের সৃষ্টি, এ কথা অবশ্য সত্য হইতে পারে; কিন্তু যাহাদের প্রতিভা নাই, পরিশ্রম আছে, সাহিত্য-সেবায় কি তাহারা অধিকার

পাইবে না? অথবা অধিকারের অপেক্ষাই বা কে করে? তাহারা আপনাদের পথ আপনারাই প্রস্তুত করিতে জানে। পুস্তকের বিক্রয় ধরিয়া যদি সাহিত্য-বিস্তারের পরিমাণ অবধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আজিও বটতলার দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অবশ্য বিজ্ঞানকে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, প্রতিভাও এমন সর্বশক্তিশালিনী নহে। বিজ্ঞানের একটা নিয়ম এই, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর বিস্তার যত বাড়ে, গভীরতা তত কমে। প্রতিভাশালী লেখকদিগের গ্রন্থ সম্বন্ধে এ কথা খাটে কি না, তাহা তাঁহারা নিজেই বিচার করিয়া দেখিবেন, অন্যের কথার অপেক্ষা করিবেন না। কিন্তু আমি যে সমালোচনার প্রয়োজন মনে করিতেছি, তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অ-প্রতিভ অর্থাৎ প্রতিভাবিহীন লেখক এবং সাধারণ পাঠকের জন্য। সমালোচনায় যে উপকার হয়, অনেক লেখকই তাহা প্রত্যক্ষ করেন। ইহা অতি স্বাভাবিক; নিজের দোষ সকল সময়ে নিজের চক্ষে পড়ে না, অন্যে দেখাইয়া দিলে তবে তাহা সংশোধন করিবার কারণ ঘটে। প্রতিভা যত বড়ই হউক না কেন, তাহার কার্যে দোষ থাকিতে পারে না, ইহা বলিলে মানুষকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্ট জীব পূর্ণপ্রজ্ঞ হইতে পারে না। যাহা হউক, প্রতিভাশালী লেখক সমালোচনের বাঁধাবাঁধি স্বীকার না করিলেও প্রতিভা যখন দুর্লভ, সুতরাং শ্রমশালী লেখকের স্থান এবং উপকারিতা যখন সমাজে আছে, তখন অন্ততঃ তাঁহাদের উপকারের জন্যও সমালোচনার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেকে পুস্তক লেখেন পুস্তক লেখার জন্য—হৃদয়ের একটা অদম্য উত্তেজনাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য। নূতন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া গ্রন্থকারকে উপদেশ দেওয়া এবং গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্যম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে যাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা যাঁহারা কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। যদি সমালোচনার বহুল প্রচার থাকিত, তাহা হইলে অনেক লোকই যথাকালে এবং যথা পরিমাণে সাবধান হইতে পারিতেন, নিজের যোগ্যতা বুঝিবার একটা সুযোগ পাইতেন। বংকিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দুই একজনকে চাবুক মারিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই চাবুক বংগ-সাহিত্যের কত উপকার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া কত জনের পৃষ্ঠ সাবধান হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কে করিতে পারে? সময়ের একটা কথায় যতটা উপকার হয়, অসময়ের চাবুকেও তত উপকার করিতে পারে না।

গ্রন্থের সমালোচনা ভাবী বংশের জন্য রাখিয়া না দিয়া গ্রন্থকারের জীবিতকালে হওয়াই ভাল,—ইহাতে তাঁহার নিজেরও লাভ, সমাজেরও লাভ। অতি অল্পসংখ্যক স্বভাব-সংগীত ছাড়া প্রায় সমস্ত সাহিত্যেরই উদ্দেশ্য সমাজের শিক্ষা, সমাজের অভাব-মোচন। সমাজের প্রয়োজন কি, তাহার সাধনে কোন উপায়টি প্রশস্ত, এবং সেই উপায়-প্রদর্শনে আমার যোগ্যতা কতটা, এই তিন বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা গ্রন্থকার মাত্রেরই অপরিহার্য। সমালোচনের পথ উন্মুক্ত থাকিলে এই ত্রিবিধ জ্ঞানলাভ যতটা সহজ হয়, নিজের সর্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করিলে ততটা সহজ হয় না। অনেক কার্য এমন আছে, যাহার আরম্ভেই একটা পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে জিনিষটা ত ভাল হয়ই না, সমালোচন দ্বারা পরে তাহার সংশোধনেরও সম্ভাবনা থাকে না। "এখন ত একটা গড়িয়া তুলি, পরে দোষগুণ দেখিয়া সংশোধন করিয়া লইব।" এইরূপ ধারণা লইয়া কাজ করিলে ড্রেডনটের মত যুদ্ধ-জাহাজ বা তাজমহলের মত স্মৃতি-মন্দির কখনও নির্মিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। বরং তাহাও সম্ভব—ড্রেডনট বা তাজমহল ভাংগিয়া নূতন করিয়া নির্মাণ করা কষ্টসাধ্য হইলেও মানুষের পক্ষে অসাধ্য না হইতে পারে; কিন্তু একটা জাতীয় ভাষা একবার গঠিত হইয়া গেলে আবার তাহাকে ভাংগিয়া পুনর্গঠন করা কঠিন ত বটেই. সম্ভব কিনা তাহাও বিবেচ্য।

বংগভাষা এখনও গঠনের অবস্থাতেই আছে; এ গঠনের ক্রিয়া কবে সম্পূর্ণ হইবে, কবে এই বিচিত্র প্রাসাদের উপরে চূড়া বসিবে, তাহা ত্রিকালজ্ঞ না হইলে কেহ বলিতে পারিবেন না। কিন্তু এখন যদি ইহাতে দোষবাহুল্য থাকিয়া যায়, এখনই যদি ইহার অংগে অংগে

অপূর্ণতা প্রবেশ করে তবে ভাষা একবার জমাট বাঁধিয়া গেলে আর তাহা দূর করিবার সুবিধা পাওয়া যাইবে না। যদি ভবিষ্যতেও এদেশে প্রতিভার অভ্যুদয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস থাকে, যদি বর্তমান সাহিত্য দ্বারা বাঙালীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র এবং মনস্বিতাকে চিরদিনের জন্য পরিস্ফুরিত এবং পরিচালিত করিবার আশা থাকে, যদি ভারতের ভাষা-সমিতির মধ্যে আদর্শ, গাম্ভীর্য শক্তি, সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, মাধুর্য, ভাবপ্রবণতা এবং স্বাভাবিকতার নিমিত্ত মাতৃভাষার জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনা করিয়া রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে হইবে, স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিয়া একতা স্থাপন করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারকে সংযত করিয়া বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের আদেশের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলেই সমালোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে বহু লোকের কর্তৃত্ব এবং অধিকার রহিয়াছে, যাহার সম্পাদনে এবং উন্নতি-বিধানে বহু লোকের সাহায্য একান্ত অনিবার্য, একতা এবং শৃঙ্খলতার অভাবে তাহা কখনই কোথাও সুসম্পাদিত হয় নাই, হইবেও না, এই একতা এবং শৃঙ্খলা কেবল বিজ্ঞানই দিতে পারে, আর সমালোচনাই সাহিত্যের সেই বিজ্ঞান।

প্রতিভা কেবল লেখকেরই থাকে, পাঠকের থাকিতে পারে না, এমন নহে। পাঠকের মধ্যেও প্রতিভাশালী লোক অনেক থাকেন, এবং লেখনী হাতে লইলে তাঁহারাও সাহিত্য-সমাজে উচ্চাসন অধিকার করিতে পারেন। অবসর ও রুচির অভাবে, আর কেহ হয়ত কালির আঁচড়ে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া লেখনী গ্রহণ করেন না। যাহা হউক, পাঠকের প্রতিভা না থাকিলেও চলে, কেহ ইচ্ছা করিলে সাধারণ বুদ্ধি লইয়া পরিশ্রম করিলে গ্রন্থকারও হইতে পারেন, কিন্তু বিনা প্রতিভায় পরের বুদ্ধি ধার করিয়া সমালোচক হওয়া যায় না। সমালোচক সাহিত্য-রাজ্যের শাসক, বিচারক এবং বিধি-প্রবর্ত্তক। তাহার প্রতিভার উপরেও প্রভুত্ব করিতে হইবে, প্রাকৃতিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, সে নিজে প্রতিভাসম্পন্ন

না হইলে সেরূপ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, সেরূপ নিরপেক্ষতা, সেরূপ সহানুভূতি, সেরূপ ন্যায়পরতা, এবং যুগপৎ লেখক ও পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার সেরূপ ক্ষমতা কোথায় পাইবে? আর তাহা যদি না থাকে তাহা হইলে অযোগ্য বিচারকের বিচার-বিভ্রাট দেখিয়া তাহার প্রতি সাধারণের মনে যেমন ঘৃণা ও অনাস্থা জন্মে, এইরূপ সমালোচনের প্রতিও পাঠক-সমাজের সেই ভাবই জন্মিয়া থাকে।

নিন্দা, প্রশংসা এবং আদর্শ-নির্দেশ, এই তিনই প্রকৃত সমালোচনের কার্য। কিন্তু অনেকেরই ধারণা সমালোচনের অর্থই কেবল নিন্দা, কেবল ভর্ৎসনা, কেবল বিদ্রূপ। এই ধারণা আছে বলিয়াই গ্রন্থ-কারেরা সমালোচনার নামে শিহরিয়া উঠেন এবং কেবল বিজ্ঞাপনদাতার সমালোচনেই পরিতৃপ্ত থাকা নিরাপদ মনে করেন। এরূপ ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। গ্রন্থের দোষ থাকিলে তাহা এরূপ ভাষায় এরূপ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, যাহাতে লেখকের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথা না পায়। কিন্তু অনেক স্থলে সমালোচনা পড়িলে বোধ হয়, দোষ প্রদর্শন একটা উপলক্ষ মাত্র, গ্রন্থকারের হৃদয়ে যন্ত্রণা উৎপাদন করাই যেন প্রধান উদ্দেশ্য। সুস্থদেহে একটা বিস্ফোটক জন্মিলে সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, এমনভাবে অস্ত্রটি প্রয়োগ করা, যাহাতে রোগী কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব না করে; এই যন্ত্রণা পরিহারের জন্য কত রকম বোধ-হারক ঔষধেরও আবিষ্কার হইয়াছে। কিন্তু একটি বিস্ফোটকের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চিকিৎসক যদি রোগীর সর্বাঙ্গ কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত করেন, তাহা হইলে রোগী কি চিকিৎসককে আশীর্বাদ করিবে, না এরূপ চিকিৎসা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিবে? বাক্যাঘাতের যন্ত্রণা যে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা হইতে কিছু ন্যূন, এমন কথা মনে করি না। যিনি সমালোচকের উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রোগীকে বাঁচাইয়া রোগ সারাইতে হইবে, আপনার প্রত্যেক বাক্যের সমালোচনা আপনাকেই করিতে হইবে। নিন্দাতেই হউক, আর প্রশংসাতেই হউক, মাত্রা অতিক্রম করা কিছুতেই সংগত নহে, অতিরঞ্জন কোন পক্ষেরই উপকার করে না।

কেহ কেহ মনে করেন, কেবল দোষ-ঘোষণা করিলেই সমালোচনের কার্য শেষ হইল, গুণ-কীর্তনে লাভ কি? কিন্তু বাস্তবিক গুণেরও সমালোচনের প্রয়োজন আছে। কাব্যের সৌন্দর্যে সকলের হৃদয়ই আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু যে যে পরিমাণে বুঝে, সে সেই পরিমাণেই আকৃষ্ট এবং উন্নত হয়। কেবল কাব্যে কেন সাহিত্যে অনেক অংশই সকলে সমান ভাবে এবং একরূপে বুঝে না।

বুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার তারতম্য ত আছেই, তা ছাড়া শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, প্রবৃত্তি, সংসর্গ, আলোচনা এবং অভিনিবেশের তারতম্যানুসারে একই কথা ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বুঝে। কোন কোন তীর্থযাত্রী স্বাধীনভাবে স্বৈরগতিতে নানা তীর্থ,—নানাদেশ ভ্রমণ করে, সাথীর অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই সাথীর উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সাথী যেখানে লইয়া যায় সেখানেই তাহারা যায়, সাথী যাহা দেখায় তাহাই তাহারা দেখে, সাথী ছাড়া এক পদও তাহারা অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। পাঠকদিগের মধ্যেও এইরূপ দুইটি শ্রেণী আছে, এক শ্রেণীর পাঠক আপনা-আপনি সাহিত্য-কাননের সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, আর এক শ্রেণীর পাঠক সাথী অর্থাৎ সমালোচকের কাঁধে ভর দিয়া চলেন। সাথী না থাকিলে সেইরূপ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকের পক্ষেও সাহিত্য-সৌন্দর্য বুঝিবার চেষ্টা ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং তাঁহারা সাহিত্য-পীঠের ষোল আনা ফললাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ছাত্র-চরিত্রের সংগে পরিচিত আছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, যাহারা ন্যায্য বিষয় আগে নিজেই বুঝিবার চেষ্টা করে, কেবল যেখানে বুদ্ধি একেবারেই প্রবেশ করে না, সেইখানেই টীকাটিপ্পনী মিলাইয়া দেখে; আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে যাহারা প্রত্যেক বাক্যটি পড়িয়াই টীকার পুস্তক খুলে, নিজে নিজে বুঝিবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখে না; এইটি হইল অভ্যাসের কথা; আর বুদ্ধি এবং শিক্ষার অল্পতা যাহাদের আছে, তাহাদিগকেও কাজে কাজেই অন্যের উপরে নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং অর্থ, ভাব এবং সৌন্দর্য

বুঝাইবার জন্য সমালোচনের বিশেষ প্রয়োজন। বঙ্গভাষায় কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হয়, কিন্তু সমাজে তাহার আশানুরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। বুঝাইবার লোকের অভাব—প্রকৃত সমালোচনের অভাবই কি তাহার একটা কারণ নহে?

দোষ-উদ্ঘাটন হইতে সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ আরও কঠিন; আবার আদর্শ-নির্দেশ সর্বাপেক্ষা কঠিন। যে সমালোচনা এই সকল কার্য সম্পাদন করিতে যতদূর সমর্থ তাহা সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট।

আদর্শ-প্রদর্শন কেবল উপদেশে হয় না। সত্যবাদী হও, এ একটা নীরস-নির্জীব-মাধুর্য-বিহীন উপদেশ কাহারও প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাহার প্রভাবে গঠিত এবং পরিচালিত করিতে পারে না। কিন্তু ঐ উপদেশই যখন নল, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতির চরিত্রে মূর্তি পরিগ্রহ করে, যখন সত্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তাহার পশ্চাতে একটি রক্তমাংস-সৌন্দর্যময় জীবন্ত উদাহরণ আসিয়া দাঁড়ায়, তখন বাস্তবিকই অন্তত ক্ষণকালের নিমিত্তও সত্যের জন্য জীবন দিতে পারিলে জন্ম সার্থক বোধ হয়।

আদর্শ দেখাইবার, সুতরাং শিখাইবার দুইটি উপায় আছে; প্রথমত কাব্যাদিতে চিত্রিত চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ দ্বারা মনস্তত্ত্বের সূত্রগুলি, মানবীয় কার্যের উৎসগুলি, মানবীয় ভাব-কুসুমের বৃন্ত-দল-কেশরাদি খুলিয়া পুংখানুপুংখরূপে এক একটি চক্ষের সম্মুখে ধরা; আর দ্বিতীয়ত সেই সকল সামগ্রী উপাদানস্বরূপ গ্রহণপূর্বক কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদিতে আদর্শ বা লক্ষ্যের অনুরূপ চরিত্র চিত্রিত করা। প্রথমোক্ত কার্যে সমালোচক বিষয়ের ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য বিচার করেন, ভাবের পৌর্বাপর্য, মাত্রা, অনুপাত এবং যোগ্যতা অবধারণ করেন; আর কবি এই বিচার এবং সাধারণকে কংকালস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ভাষারূপ রক্তমাংসের সাহায্যে আপনার শক্তি এবং রুচির অনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করেন। অতএব সাহিত্যের শীর্ষ-ভূষণস্বরূপ কার্যের কথাই যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, সমালোচনা এবং কাব্য পরস্পরবিরোধী নহে, বরং সমালোচনা কাব্যের

পুরোবর্তী সাহায্যকারী। সমালোচক হইলেই কবি হওয়া যায়, এ কথা মিথ্যা ; কিন্তু কবিকে সমালোচক হইতেই হইবে, এ কথা নিতান্তই সত্য। "নিরংকুশাঃ কবয়ঃ" এ কথা সর্বত্র সমানভাবে খাটে না। কবি ইচ্ছা করিলে অবশ্য তাঁহার সৃষ্ট তিন হস্ত দীর্ঘ সূর্পনখাকে সাত শত যোজন দীর্ঘ নাসা অনায়াসে দিতে পারেন ; কিন্তু সে কুৎসিত মূর্তি দেখিবামাত্র লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ বাণ তাহার নাসা ছেদন করিবে।

সমালোচন যখন কাব্যের শত্রু নহে, বরং একটা প্রবল সহায়, তখন ইহাকে আর অধিক কাল উপেক্ষা করা কি উচিত ? বিধি-ব্যবস্থা-শূন্য রাজ্য যেমন, সমালোচনা-শূন্য সাহিত্য-সমাজ কি সেইরূপ নহে ? সূত্র এবং দৃষ্টান্ত, এই দুইটির সাহায্যে সকল প্রকার শিক্ষা সম্পাদিত হয়। সূত্র বিষয়টা বলিয়া দেয়, দৃষ্টান্ত তাহার অর্থ বিশদভাবে হৃদয়ংগম করিয়া দেয়। সূত্র বুঝিয়া দৃষ্টান্ত দেখা ছিল প্রধান প্রথা, দৃষ্টান্ত দেখিয়া সূত্র বুঝা হইয়াছে নূতন প্রথা। জীবন-ধারণ যেমন আহারের উদ্দেশ্য, তৃপ্তি-বোধ তাহার আনুষংগিক মাত্র ; সেইরূপ আমি মনে করি কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষা, আনন্দ-বোধ তাহার আনুষংগিক অবস্থা মাত্র। সমালোচনই এই শিক্ষার সূত্র, কাব্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অলংকার-শাস্ত্র এই শিক্ষার শৃংখলাবদ্ধ সূত্র সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অলংকার শাস্ত্রের নাম লইয়া আমি সংকুচিত হইতেছি। হয় ত কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদের অলংকার গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাই ত পর্যাপ্ত। আমি এই ভয়েই আদ্যোপান্ত সমালোচন শব্দের ব্যবহার করিতেছি। আজ আমরা যাহাকে সমালোচনা বলিতেছি, কালে তাহাই বংগভাষায় অলংকার-শাস্ত্র হইবে। যে অলংকার আছে, তাহা আমাদের দিদিমার অলংকার, মার গায়ে তাহা খাটিবে না, আমাদের নবযৌবনা মার অংগে সেই অলংকারই শোভা পাইবে, কিন্তু শোভা দিতে পারিবে না। আমাদের স্বভাব-সুন্দরী মার অংগে অংগে সৌন্দর্য-রাশি উথলিয়া পড়িতেছে ; এই নবীন দেহের নবীন অলংকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে গঠিত হইবে, প্রেম-ভক্তিতে বিধৌত হইবে, শক্তি-সৌন্দর্যে মাজিত হইবে, তবে ত শোভা পাইবে! জগদম্বার কৃপায় আজ বাঙালী জাতির

রূপ ভাল, না গুণ ভাল? ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।

আমরা সমুদ্র-তীরবাসী লোক। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সীমা নাই; পদতলে চাহিয়া দেখি, সেই খানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাই বস্তু, তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চতুর্দিকে ভাষার অনধিগম্য সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন কাজকর্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা বেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় যেন, ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি,—কে জানে কোথায়? ওই যে, দূর দিগন্তে সূর্যের মৃদু রশ্মি-রেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক্ হইতে আসিতেছে। সে জন্মভূমির সকল কথা ভুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে—অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুট ভাব। ইচ্ছা করে ঐ সমুদ্রে সাঁতার দিই, সেই দূর দ্বীপ হইতে বাতাস ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, সেই দূরদিগন্তের অস্ফুট সূর্য-কিরণের দিকে আমাদের নেত্র থাকে, আর আমাদের পশ্চাতে এই ধূলিময়, কীটময়, কোলাহলময় উপকূল পড়িয়া থাকে। সাঁতার দিতে দিতে মনে হয় যেন পশ্চাতের উপকূল আর দেখা যাইতেছে না ও সম্মুখে সেই দূর দেশের তট-রেখা যেন এক এক বার দেখা যাইতেছে ও আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিন কাজ কর্ম করিয়া আমরা বিশ্রামের জন্য কোথায় আসিব? এই সমুদ্র-কূলেই কি নহে? সমস্ত দিন দোকান বাজারের মধ্যে রাস্তা গলির মধ্যে থাকিয়া দুই দণ্ড কি মুক্ত বায়ু সেবন করিতে আসিব না? আমরা জানি যে, যেখানে সীমা আরম্ভ সেই খানেই আমাদের কাজকর্ম, যুঝাযুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে, সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সে দিকে চাহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতা আমাদের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে, সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন

প্রকাণ্ড রহস্যের মধ্যে নিজেকে রহস্য বলিয়া বোধ হয়—সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। সমুদ্রে সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা আমাদের সাধ্যের অতীত! অনেক উপকূলবাসী চিরজীবন এই উপকূলের কোলাহলে কাটাইয়াছেন, অথচ এই সমুদ্র-তীরে আসেন নাই, সমুদ্রের বায়ু সেবন করেন নাই। তাঁহাদের হৃদয় কখন স্বাস্থ্য লাভ করে না। হৃদয়কে এই সমুদ্র-তীরে আনয়ন করা, এই সমুদ্রের বক্ষে ভাসমান করা ভাবগত কবিতার কাজ। ভাবগত কবিতায় হৃদযের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক্ বা না থাকুক্ সে জগৎ সত্য জগৎ, অলীক জগৎ নহে।

ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষন্ন সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে, দূর হইতে সংগীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে, আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সংগীত, বসন্ত-বায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে? কেন, সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে বা সুস্নিগ্ধ জলে স্নান করিলে ত আমাদের মন ঐরূপ উদাস ও আকুল হইয়া উঠে না! যখন আহার করি তখন সুস্বাদ ও উদর-পূর্ত্তির সুখ মাত্র অনুভব করি, আর কিছু নয়। কিন্তু জ্যোৎস্না-রাত্রে কেবল মাত্র যে, নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে, জ্যোৎস্নায় একটা কি অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্ত্তমান রাজ্যে গিয়া পৌছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া

আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারিদিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি অথচ জ্যোৎস্না আমরা পাইতেছি না। ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করি, জ্যোৎস্নাকে আমরা আলিংগন করি, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ধরিবার উপায় নাই। বসন্ত বায়ু হু হু করিয়া বহিয়া যায়। কে জানে কোথা হইতে বহিল! কোন্ অদৃশ্য দেশ হইতে আসিল, কোন্ অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেল! আসিল, চলিয়া গেল, বড়ই ভাল লাগিল; কিন্তু তাহাকে দেখিলাম না শুনিলাম না, সর্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেই পারিলাম না। শরীরে যে স্পর্শ হইল, তাহা অতি মৃদুস্পর্শ, কোমল স্পর্শ, কঠিন ঘন স্পর্শ নহে, কাজেই উপভোগে নানা প্রকার অভাব রহিয়া গেল। মধুর সংগীতে মন কাঁদিয়া ওঠে সেই জন্যেই। আবার জ্যোৎস্না রাত্রে সে সংগীত পুষ্পের গন্ধের সংগে, বসন্তের বাতাসের সংগে দূর হইতে আসিলে মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। অন্যান্য অনেক ঋতু অপেক্ষা বসন্ত ঋতুতে সকলি অপরিস্ফুট, মৃদু, কিছুই অধিক মাত্রায় নহে ;—

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদু মন্দ গতি
বাহির হয়েছে কিবা ঋতুকুল পতি।
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল,
অংগে ঘেরি পরাইছে পল্লব দুকুল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস,
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে তবু পথ ভুলে,
গন্ধমদে ঢলি পড়ে এ ফুলে ও ফুলে।
মনের আনন্দ আর না পারি রাখিতে,
কোথা হতে ডাকে পিক রসাল শাখিতে,
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে,
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন গভীরে।

কোথা হইতে বাতাস উদাস হইয়া বাহির হইল, কোথায় সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, অতি ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তাহার পদক্ষেপ।

কোকিল কোথা হইতে সহসা ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার স্বর কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। একদিকে উপভোগ করিতেছি আর একদিকে তৃপ্তি হইতেছে না, কেন না উপভোগ্য সামগ্রী সকল আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নহে। একদিকে মাত্র সীমা, অন্যদিকে অসীম সমুদ্র। মনে হয়, যদি ঐ সমুদ্র পার হইতে পারি, তবে আমাদের বিশ্রামের রাজ্যে, সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। যদি জ্যোৎস্নাকে, যদি ফুলের গন্ধকে, যদি সংগীতকে ও বসন্তের বাতাসকে পাই তবে আমাদের সুখের সীমা থাকে না। এইজন্যই যখন কবিরা জ্যোৎস্না, সংগীত, পুষ্পের গন্ধকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমাদের এক প্রকার আরাম অনুভব হয়; মনে হয় যেন এইরূপই বটে, যেন এইরূপ হইলেই ভাল হয়!

So young muser, I sat listening
To my Fancy's wildest word—
On a sudden, through the glistening
Leaves around a little stirred,
Came a sound a sense of music,
Which was rather felt than heard.
Softly, finely, it enwound me—
From the world it shut me in—
Like a fountain falling round me
Which with silver water thin
Holds a little marble Naiad
sitting smilingly within.

সংগীত যদি এইরূপ নির্ঝর হইত ও আমরা যদি তাহার মধ্যে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত; মুহূর্তের জন্য কল্পনা করি যেন এইরূপই হইতেছে, এইরূপই হয়!

পৃথিবীতে না কি সকল সুখই প্রায় উপভোগ করিয়াই ফুরাইয়া যায়, ও অবশেষে অসন্তোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এইজন্যই যে সুখ

আমরা ভাল করিয়া পাই না, যে সুখ আমরা শেষ করিতে পারি না, মনে হয় যেন সেই সুখ যদি পাইতাম, তবেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। এমন লোক দেখা গিয়াছে, যে দূর হইতে সুকণ্ঠ শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। কেননা তাহার মন এই বলে যে, অমন যাহার গলা না জানি তাহাকে কেমন দেখিতে, ও তাহার মনটিও কত কোমল হইবে! ভাল করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে না কি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়; কাহারো বা গলা ভাল মন ভাল নহে, নাক ভাল চোক ভাল নহে, তাই আমরা বড় বিরক্ত, বড় অসন্তুষ্ট হইয়া আছি; সেই জন্যই দূর হইতে আমরা আধখানা ভাল দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকিটুকু নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি না কেন, রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁসিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি ততই ত ভাল।

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোন কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন, এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে, কবিত্বের পাড়ে ততই ভাংগন ধরিবে! প্রমাণ কি? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না। তাঁহাদের মতে, বোধ করি, এমন সময় আসিবে, যখন কোন কাব্যই লেখা হইবে না।

সভ্যতার সমস্ত অংগে যেরূপ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অংগেও যে সেইরূপ পরিবর্তন হইবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কবিতা সভ্যতা-ছাড়া একটা আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আসমানদার নয়। তাহার সমস্ত ঘর বাড়িই আস্‌মানে নহে। তাহার জমিদারীও যথেষ্ট আছে।

সভ্যতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশের সভ্য অবস্থায় এক জন ব্যক্তিই সর্বেসর্বা হয় না। দেশ বলিলেই একজন বা দুই জন বুঝায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে একজন বা দুইজন বুঝায় না। ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। এখন একজন ব্যক্তিই লক্ষলোকের সমষ্টি নহে। এখন শাসনতন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে একটি রাজার খেয়াল, শিক্ষা ও মনোভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; এখন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে দেখিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র দেখিয়া বল যে, এ ত খুব অল্প কাজই করিতেছে, তাহা হইলে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের সকল অংগই পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভ্যসমাজে দশটাকে মনে মনে তেরিজ করিয়া একটাতে পরিণত কর। কবিতাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। সভ্য দেশের কবিতা এখন যদি তুমি আলোচনা করিতে চাও, তবে একটা কাব্য, একটি কবির দিকে চাহিও না। যদি চাও ত বলিবে "এ কি হইল! এ ত যথেষ্ট হইল না! এদেশে কি তবে এই কবিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়ত প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করিতে যাইবে। যদি মহাভারত, কি রামায়ণ, কি গ্রিসীয় একটা কোন মহাকাব্য নজরে পড়ে, তবে বলিবে "পর্যাপ্ত হইছে, প্রচুর হইয়াছে!" এক মহাভারত বা এক রামায়ণ পড়িলেই তুমি প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ভাবটি পাইলে। কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পড়িলে পাঠের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। মনে কর ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে যত কবি আছে সকলকে মিলাইয়া লইয়া এক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কবিতা-পাঠক-শ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক একটা মহাকাব্য রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্যগুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলণ্ডের সাহিত্যে মানব-হৃদয় নামক একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। তাঁহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে একত্রে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশগুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তিনি নিতান্ত ভ্রমে পড়েন। তিনি বলেন, সভ্যতার সংগে সংগে কাব্য অগ্রসর হইতেছে না। তিনি কি করেন? না, একটি সাধারণ তন্ত্রের শাসনপ্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মত প্রভূত ক্ষমতা কাহারো হস্তে নাই, রাজার মত একাধিপত্য কেহ করিতে পায় না ও তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, "দেশের রাজ্যপ্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা বাড়িতেছে বটে, কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বরংচ উল্টা!" কিন্তু

সভ্যতা বাড়িতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞানও বাড়িতেছে কবিতাও বাড়িতেছে।

রাজ্যতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণ তন্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা বাড়ে। যতদিন ছোটখাট সোজাসুজি রকম থাকে, ততদিন সাধারণতন্ত্রের ন্যায় অতবড় বিস্তৃত রাজ্য-প্রণালীর তেমন আবশ্যকতা থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না, তখন সে রাজার দিন ফুরায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। কবিতার রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় এমন সকল ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায়, যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না; এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে যাহা সাধারণতঃ সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীনকালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যুঁথি জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোন ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না, আজকাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্র-কায়া, সাধারণতঃ চক্ষুর অগোচর, তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বনফুলটি পর্য্যন্ত ফুটে। এক কথায়—যাহাকে লোকে, অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই হউক বা চক্ষুর দোষেই হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে, বা একেবারে দেখেই না, এখনকার কবিতা তাহার অতি বৃহৎ গূঢ়ভাব খুলিয়া দেখায়। আবার যাহাকে অতি বৃহৎ, অতি অনায়ত্ত বলিয়া লোকে ছুঁইতে ভয় করে, এখনকার কবিতায় তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অতএব এখনকার উপযোগী মহাকাব্য একজনে লিখিতে পারে না, একজনে লিখেও না।

এখন শ্রম-বিভাগের কাল। সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রম-বিভাগ। কবিতাতেও শ্রম-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইয়াছে।

পূর্বে একজন পণ্ডিত না জানিতেন এমন বিষয় ছিল না। লোকেরা যে বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করিত, তাঁহাকে সেই বিষয়েরই উত্তর দিতে হইত, নহিলে আর তিনি পণ্ডিত কিসের? এক অরিষ্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজ্য-নীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সময়ে বিদ্যাগুলি হ-য-ব-র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁসাঘেঁষি করিয়া থাকিত। বিদ্যাগুলি একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিত, এক একটা করিয়া পণ্ডিত তাহাদের কর্তা। পরস্পরের মধ্যে চরিত্রের সহস্র প্রভেদ থাক্, এক অন্ন খাইয়া তাহারা সকলে পুষ্ট। এখন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, সকলেরই নিজের নিজের পরিবার হইয়াছে; একত্রে থাকিবার স্থান নাই; একত্রে থাকিলে সুবিধা হয় না ও বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি সকল একত্রে থাকিলে পরস্পরের হানি হয়। কেহ যেন ইহাদের মধ্যে একটা মাত্র পরিবারকে দেখিয়া বিদ্যার বংশ কমিয়াছে বলিয়া না মনে করেন। বিদ্যার বংশ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, একটা মাথায় তাহাদের বাসস্থান কুলাইয়া উঠে না। আগে যাহারা ছোট ছিল, এখন তাহারা বড় হইয়াছে। আগে যাহারা একা ছিল, এখন তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে।

যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তি সকল সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত, ঘটনা-বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোযায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। গীতি-কাব্য মহাকাব্যের পূর্বেও ছিল কি না সে পরে আলোচিত হইবে। এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুট ভাবে অনেক গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তর-রাম-চরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল। গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য যখন এতদূর বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে, মহাকাব্যের অল্পায়তন স্থানে তাহারা ভাল স্ফূর্তি পায় না, তখন তাহারা পৃথক্ হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অশুভ আশংকা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মত বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন, পর্বত, সমুদ্র ছিল না, পশু পক্ষী পতংগ ছিল না; সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌর জগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে। ইহার কোন অংশ সেই মহা সৌর-চক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে, জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌর জগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্য-তন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে; তাহা হইলে আর কাহারে সন্দেহ থাকিবে না যে, এখানকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর উন্নততর। জগতেরও উন্নতি পর্য্যায়ের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। সৌরজগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথক পৃথক হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দূর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র-সম্মিলিত বাষ্পরাশি গত অবস্থার পূর্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদিভূত সমূহের অস্ফুট ভাবে পৃথক ভাবে বিশৃংখল সংচরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাতে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃংখল পার্থক্য, পরে একত্র সম্মিলন, ও তাহার পরে শৃংখলাবদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃংখল পৃথক সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণী বদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃংখল পৃথক পৃথক ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রী-করণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃংখল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা; কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়া ছাড়া বিশৃংখল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীতসমূহ। সৌর জগতের কবিতাকে

যে ভাবে দেখা আবশ্যক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেইভাবে দেখা কর্তব্য। নহিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ তীরের মত অগ্রসর হইতেছে, কেবল কবিতাই যে উজান বাহিয়া উঠিতেছে, এমন কেহ না মনে করেন। এখন বিশেষ ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, সংসার খাট হইয়া আসিতেছে। কারণ Tennyson বলিতেছেন—

"The individual withers and the world is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন, কেবল "makes the darkness visible." বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন। অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্ সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারে মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয় কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীজকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ রক্ত বিন্দুতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিতেছে। মহাদেব রহস্যরাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে, যে, নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অজ্ঞ, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহস্যকে রহস্য বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, সে

রহস্যের একটা কল্পিত আকার আয়তন ইতিহাস, ঠিকুজি কুষ্ঠি পর্য্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে, এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের পৌত্তলিকতা সেবা করিতেন। এখনকার কবিরা জ্ঞানের অস্ত্রে তাহার আকার আয়তন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরো রহস্য করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিত্ত প্রাচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার পক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। পৌরাণিক সৃষ্টি সমূহ দেখিলে আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া আসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহা কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখানকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া যেরূপ করিয়া উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সংকীর্ণ হইয়া আসে ? কত লোকে সন্ধ্যা ও উষাকে কল্পনায় কত ভাবে কত আকারে দেখে, এক সময়ে এক রকমে দেখে, আর এক সময়ে আর এক রকমে দেখে, কিন্তু পূর্বোক্তরূপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয় উষা ও সন্ধ্যা যখনি তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

কাব্যকথা

প্রিয়নাথ সেন

তর্ক করিবার একটা নেশা আছে। অনেকেই তাহাতে একটু ঝাঁজাল আমোদ অনুভব করেন। তাই প্রায়ই দেখা যায়, সভা-সমিতিতে, সংবাদ বা সাময়িক-পত্রে কোনও না কোনও বিষয় লইয়া একটা অনাবশ্যক আন্দোলন চলিতেছে। স্বীকার করি, জীবনে তর্ক বা আলোচনার বিষয় অনেক আছে। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাদের মীমাংসা এখনও হয় নাই। চিরসমস্যার ন্যায় তাহারা আবহমানকাল মীমাংসার নাগাল অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এবং যতদিন না মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহাদের বর্ত্তমান সীমা অতিক্রম করিতেছে, ততদিন সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যেমন বেদান্ত এবং সাংখ্যের মতদ্বন্দ্ব। কিন্তু মীমাংসার আশা না থাকিলেও মানুষ তাহার নিজের প্রকৃতির অলংঘ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া সেই অন্ধকার ঘরে ইচ্ছায়—অনিচ্ছায় মীমাংসার তল্লাস করিবেই। সুতরাং তদ্বিষয়ক তর্ক বা আলোচনা কখন থামিবে না—নিয়তই চলিবে।

আবার এমনও অনেক বিষয় আছে, যাহা এত সূক্ষ্ম এবং জটিল তথ্যে পরিপূর্ণ, যে মীমাংসিত হইলেও তাহাদিগকে বুদ্ধির আয়ত্ত করা এতই দুষ্কর যে মাঝে মাঝে তাহাদের পুনরালোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যেমন আমাদের ষড়্‌দর্শনের অনেক কথাই। সুতরাং তর্ক বা আলোচনার বিষয় অনেক আছে; এবং তাহাতে ব্যাপৃত থাকা মানুষের একটী প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

কিন্তু এ সকল ছাড়া, এমন অনেক বিষয় আছে যাহাদের চরম মীমাংসা বহুকাল হইতে নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে। তাহাদের পুনরালোচনায় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা নাই। পরন্তু তর্কবাগীশ মহাশয়েরা হয় পাণ্ডিত্য ফলাইবার ইচ্ছায়, নয় বুদ্ধির সংকোচ

বা প্রকৃতিগত খেয়ালের বশবর্তী হইয়া সেই সকল মীমাংসিত প্রশ্নের ধ্রুব সত্যকে আরও পরিষ্কার এবং সুগম করিবার ভাণে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য—ধূলিমধ্যে প্রোথিত করেন; এবং তাহাদের লইয়া বুদ্ধির ডিগবাজী খেলিতে থাকেন।

সবুজ পত্রে "বাস্তব", "সাহিত্যের বাস্তবতা" প্রভৃতি প্রবন্ধে "সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি" এই পুরাতন এবং সুমীমাংসিত প্রশ্ন পুনরালোচিত হইয়াছে। "বাস্তব" কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। রসসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কবির মুখে এই কাব্যকথা প্রকৃত এবং শিক্ষণীয় তথ্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রবাবু পাণ্ডিত্য না ফলাইয়া সরল সহজ ভাষায় এবং পদ্ধতিতে আলোচ্য বিষয়ের মর্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইতস্ততঃ না করিয়া—পাণ্ডিত্যের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ না লইয়া—দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, রস-সাহিত্যের বস্তু রস! "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—তা আমাদের সাহিত্যের নবরসই লও, আর ইউরোপীয় সাহিত্যের emotionই লও। যে সাহিত্যে রস আছে, তাহা বস্তুহীন নহে—তাহা বাস্তব এবং তাহাই—কেবল মাত্র তাহাই কাব্য। তাহার পর কথা উঠিল কাব্যের দর লইয়া। ইহার উত্তর খুব সোজা এবং সংক্ষিপ্ত; রসই যদি কাব্যের বস্তু হইল, তবে কাব্যের যাচাই করিতে হইলে রসের যাচাই করিতে হয়! রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটী উপভোগ করিয়াছে, আজও তাহা বাতিল হয় নাই। এই চির এবং অভ্রান্ত সত্যের প্রতিবাদ করিলেন—পণ্ডিত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

তিনি বলিলেন, "রস ও বস্তু, দুইয়েরই মধ্যে একটা নিত্যতা আছে, একটা অনিত্যতাও আছে। কাব্য যে গুণে স্থায়ী হয়, তাহা নিত্য রসের গুণে বলিলে ঠিক বলা হয় না। কাব্য স্থায়ী হয়—নিত্য রস ও নিত্য বস্তুর গুণে।" রসের মধ্যে একটা অনিত্যতা আছে, ইহা কোন ক্রমেই আমাদের বুদ্ধির গোচর করিতে পারি না। কতক রস কি নিত্য এবং কতক অনিত্য? অথবা এক রসেরই অংশবিশেষ নিত্য এবং অপর অংশ অনিত্য? আমরাও আজ পর্যন্ত জানি রস মাত্রেই নিত্য

এবং আমাদের ধারণা, "রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে"। এই কথায় রবিবাবু তাহাই বুঝিয়াছেন এবং বলিয়াছেন; মানব-হৃদয়ে রসমাত্রেরই আবহমান কাল একটী অপরিবর্তনশীল প্রভাব লক্ষিত হয়। আমাদের হৃদয়-বৃত্তিসমূহের স্ফুরণকে অলংকার শাস্ত্রের পারিভাষিক ভাষায় রস বলে। সুতরাং রসের মূল মানবের স্বভাবজ হৃদয়-বৃত্তিসমূহ—ভক্তি, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন একটী বৃত্তি পাত্র-বিশেষে কম বা বেশী হইতে পারে—অচিরস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু যতদিন মানুষ থাকিবে, ততদিন মানুষের হৃদয়বৃত্তি-সঞ্জাত রসও থাকিবে—সেই .অর্থেই রস নিত্য এবং তাহার মূল্যও নিত্য। কিন্তু রসের বস্তু বা আধার সম্বন্ধে এই কথা সর্বত্র এবং সর্বথা খাটে না। রসের বস্তু কল্পনা করা যাইতে পারে এবং প্রায়ই কাব্যাদিতে কল্পিত হইয়া থাকে; কিন্তু রস মানবের স্বভাবজাত চিত্তবৃত্তির অনুরূপ—প্রতিকৃতি মাত্র। তাহা ছাড়া বাস্তব বা কল্পিত বস্তুর দর মানবের বিচার-সাপেক্ষ; এবং যদিও আমরা Swift-এর মতের একেবারে প্রতি-পোষক নই, ইহা অনেকটা সত্য, মানুষ উড়িতে যেরূপ সক্ষম, বিচার করিতেও সেইরূপ সক্ষম—"Mankind is as much fitted to reason as to fly." প্রাতিদিনের ঘটনায় দেখিতে পাই, আজ যে বস্তু, যে ঘটনা, যে মত সকলের শিরোধার্য, কাল তাহা পদদলিত। কিন্তু প্রেম, ভক্তি, ও ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতির প্রভাব এবং মূল্য বাল্মীকির সময়েও যাহা, Kipling-এর সময়েও তাহাই। রসের যুগ বা জাতি নাই—সত্যযুগেও যাহা—কলিযুগেও তাহা। হিন্দুর নিকট যেরূপ—ম্লেচ্ছের নিকটও সেইরূপ।

রসোদ্ভাবনই কবির মর্য্যাদা, কাব্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। বস্তু-সমাধানে কবির কৃতকার্যতা থাকিতে না পারে, তাহাতে আসিয়া যায় না। কিন্তু রসোদ্ভাবনে অসামর্থ অমার্জনীয়। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহার বস্তু যৎকিঞ্চিৎ—সামান্য এবং চিত্তকে আকৃষ্ট করে না; কিন্তু রসের প্রাবল্য এবং প্রাচুর্য্যে রসোদ্ভাবনের গুণে তাহারা সাহিত্য-সংসারে এক একটী উজ্জল রত্নবিশেষ। পদ্য কাব্যে Byron, Shelley,

Keats প্রভৃতি এবং গদ্য কাব্যে Victor Hugo, Dickens, Thackeray, Ruskin, বঙ্কিম প্রভৃতি হইতে ইহার প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

Shakespeare লিখিত Tempest নাটকের ঘটনা-সংস্থান-বস্তু সামান্য। পাত্রপাত্রীদের মধ্যেও কেহ বা মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট—কেহ বা মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের—আবার কেহ বা মানুষ হইয়াও, মানুষের সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা হইতে বঞ্চিত; কিন্তু এই সকল উদ্ভট পাত্র-পাত্রী লইয়া, যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বনে মহাকবি মানবের চিত্তবৃত্তির কি অপূর্ব খেলা দেখাইয়াছেন! নাটকের বস্তু সামান্য হইলেও—একাধিক বিচিত্র রসের বিস্ময়কর উদ্বোধনে সাহিত্য-জগতে Tempest-এর তুল্য দ্বিতীয় নাটক নাই।

ফরাসী কবি (Coppe) কোপে লিখিত Passant (পথিক) নামক নাট্যকাব্যের আখ্যানবস্তু কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নাটিকা আগাগোড়া মধুররসে সিক্ত। একবার পাঠ করিলে হৃদয় তৃপ্ত হয় না—পুনঃ পুনঃ আকৃষ্ট হইয়া একাধিকবার পড়িতে হয়।

কালিদাসের "মেঘদূত" রসের ভাণ্ডার—কিন্তু ইহার বস্তু কি? এবং Coleridge এর Ancient Mariner ইংরাজী সাহিত্যে তুলনা রহিত—বস্তু-গৌরবে নয়, রসের গুণে। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বিখ্যাত ফরাসী কবি এবং সমালোচক রেমিতিগুরমে বলেন, কাব্যকলায় বস্তু সম্বন্ধে আদর বা অনুরাগ শিশু বা অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কাহারও নাই। ফরাসী ভাষায় সর্বাপেক্ষা সুন্দর কবিতার বস্তু কি? Odyssey কি এবং L'edrication Sentimental এরই বা কি?

সবুজ পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী রবিবাবুর মত সহজ কথায়, সাহিত্যিক প্রশ্নের সাহিত্যিক হিসাবে মীমাংসা করিতে না গিয়া হিন্দুদর্শন এবং পুরাণাদির আবাহন করিয়াছেন। তাহাতে তর্কের আড়ম্বর না কমিয়া অবাস্তব কথায় তাহা স্ফীতদেহ হইয়াছে।

"বস্তুতন্ত্রতা" শব্দের গোত্র আবিষ্কার করিয়া তিনি সাধারণ বঙ্গীয় পাঠককে বাধিত করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ হইলেও সাহিত্যে উহার চলন বিশেষ সুবিধাজনক এবং বাঞ্ছনীয়। প্রমথবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এখন সেকথা পরিহার করিয়া প্রকৃতমনুসরামঃ। আমরা দেখাইয়াছি সাহিত্যে রস নিত্য এবং মুখ্য বস্তু; এবং সকলেই স্বীকার করিবেন,—রবিবাবু ও রাধাকমলবাবুও স্বীকার করেন—রস একটী অবলম্বনকে—বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে। কিন্তু রসের প্রাধান্য স্বীকার কর, বা বস্তুর প্রাধান্য স্বীকার কর—রস-সাহিত্যেরও কার্য কি—উদ্দেশ্য কি? সকল কলাবিদ্যার যে কার্য—যে উদ্দেশ্য—রসসাহিত্যেরও তাহাই—সৌন্দর্য সৃষ্টি করা; যাহাই সৌন্দর্যের উপাদান, তাহাই সাহিত্যে গ্রাহ্য। সাহিত্য-মন্দিরে কোন পদার্থেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ নাই যদি তাহাদের দ্বারা সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়; এবং যাহাতেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় তাহাতেই সাহিত্যের অধিকার—কোথাও তাহার হাত বাড়াইবার বারণ নাই। এক সৌন্দর্য-সৃষ্টির অনুমতি। পত্র লইয়া ত্রিভুবনে যত্র-তত্র সাহিত্যের অবারিতগতি—এবং সেই অনুমতি-পত্রের বলে ত্রিভুবনে যাহা, তাহা সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। সুতরাং সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র। বাস্তব ঘটনা—কল্পিত ঘটনা—মানব চরিত্র-প্রকৃতির দৃশ্য—কর্তব্যের কঠোর পথ—স্বপ্ন বা খেয়ালের আকাশকুসুম সকলই কাব্যের বিষয়। কেবল সৌন্দর্যের উদ্ভাবন হইলেই হইল; অর্থাৎ উদ্ভাবিত রস এবং বর্ণিত বস্তুকে সৌন্দর্যের আলোকে মণ্ডিত করিতে হইবে। যে আলোকের উপাদান এবং প্রকৃতি Wordsworth চিরদিনের জন্য তাঁহার অনুপম সুন্দর ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন:—

> "The light that was never seen on sea or land,
> The consecration and the Poet's dream!"

সে আলোক প্রতিভার আলোক। গ্রীক পুরাণে আখ্যাত আছে Prometheus স্বর্গ হইতে অগ্নি আহরণ করিয়াছিলেন। সেইরূপ

কবি-প্রতিভা উচ্চতর স্বর্গ হইতে সৌন্দর্যের চিরোজ্জ্বল, অনির্বাণ, নিত্য নব আলোক বিকীর্ণ করে। এবং কবির স্বপ্ন, স্বপ্ন হইলেও কেবল স্বর্ণ হইতে স্বর্ণতর (more golden than gold) নয়, বাস্তব হইতে বাস্তবতর। কিন্তু ইহাতে রাধাকমলবাবুর ভাবনা হইয়াছে—লোকশিক্ষার কি হইবে? আমার ত বিবেচনায় যখন সমস্ত জীবনই সাহিত্যের ক্ষেত্র—তখন এই প্রশ্নের উত্তর চক্ষুর সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। জীবন বা জগৎ হইতে লোক যদি শিক্ষা পায়, তবে সাহিত্য হইতেও পাইবে। এবং জীবনে যাহা জটিল—সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অসম্বদ্ধ, নানা ঘটনা-সংঘে আবৃত—প্রচ্ছন্ন—লুক্কায়িত, সাহিত্যে তাহা পরিষ্কার—পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল। একটা কথা চিরকালই প্রচলিত—সাহিত্য জীবনের দর্পণ! বাস্তবিকও তাই! কিন্তু কেবল দর্পণ নহে। সাহিত্য জীবনকে সংশ্লিষ্টভাবে (Synthetically) এবং বিশ্লিষ্টভাবে (Analytically) দেখায়। বাস্তব জগতের পাত্র-পাত্রী অপেক্ষা আমরা সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীদের নিকট হইতে বহুবিধ এবং অধিক মূল্যের শিক্ষালাভ করি। কাল্পনিক হইলেও, তাহারা বাস্তব হইতে বাস্তবতর! তাহারা আমাদের জীবনের অংশ —হৃদয়ের সন্নিহিত। একবার মনে মনে স্মরণ কর দেখি, রামায়ণ ও মহাভারতের পাত্র-পাত্রী—Shakespeare, কালিদাস, ভবভূতি, —বংকিমের। তুমি জীবনে প্রতাপের ন্যায় মনোমুগ্ধকর বরেণ্য আদর্শ দেখিয়াছ? জীবনও কাহাকে বলে না—সাহিত্যও কাহাকে বলে না—আমার নিকট হইতে শিক্ষা লও বা শিক্ষা লইও না। যদি কেহ শিক্ষালাভ করে, তাহাতে জীবন বা সাহিত্য দুইয়েরই কোন আপত্তি নাই—দুইয়েরই কেহ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হয় না। Victor Hugoর কাব্য সম্বন্ধে Swinburne বলিয়াছেন—"As the laws that steer the world, his works are just." যদি জগতের বিধিসকল ন্যায় ও যুক্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহা হইলে জগৎ হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাহিত্য হইতেও পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য! এবং Victor Hugoর কাব্য জগতের

অনুরূপ বলিয়াই তাহা হইতেও সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। তাহা হইতে তুমি, আমি অজ্ঞাতসারে বা অতর্কিতভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারি; কিন্তু সাহিত্য সে বিষয়ে উদাসীন। আত্রেয়ীর বাণী কেবল গুরুশিক্ষা সম্বন্ধে খাটে না, সকল শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে—"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

শিক্ষাদানে সাহিত্যের এই স্বাধীনতার উল্লেখ John Stuart Mill তাঁহার Poetry and its Varieties নামক প্রবন্ধে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। কবিতা এবং উদ্দীপনার পরস্পর পার্থক্য দেখাইতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন :—

"Poetry and eloquence are both alike the expression or utterance of feelings. But if we may be excused the antithesis, we should say that eloquence is heard, poetry is over-heard. Eloquence supposes an audicnce; the peculiarity of poetry appears to us to lie in the poet's utter unconsciousness of a listener. Poetry is feeling confessing itself to itself in moments of solitude, and embodying itself in symbols, which are the nearest possible representation of the feelings in the exact shape in which it exists in the poet's mind. Eloquence is feeling pouring itself out to other mind, courting their sympathy, or endeavouring to influence their belief or move them to passion or to action."

'All Poetry is of the nature of soliloquy.'

বঙ্গীয় সাহিত্যে এই কথার সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "উদ্দীপনা" নামক প্রবন্ধে। "দুইটি রসাত্মক বাক্য—কবিতা রসাত্মিকা আত্মগতা কথা। উদ্দীপনা রসাত্মিকা অন্যোদ্দিষ্টা কথা। নির্জনে বিরলে চিন্তাই কবিতার প্রসূতি; এবং অনেক লোকের সহিত আলাপে ও কথোপকথনেই উদ্দীপনার জন্ম হইয়া থাকে। উদ্দীপনা সর্বদাই লোককে ডেকে কথা কন। পরের

মনোবৃত্তি সঞ্চালন, ধর্মপ্রবৃত্তি উত্তেজন, অন্যের মনে রস উদ্ভাবন, অন্যকে কোন কার্য্যে লওয়ান, এইরূপ একটি না একটি তার চির উদ্দেশ্য। তিনি সর্বদাই ডাকিতেছেন। কবিতা সেই প্রকৃতির নহেন।

"তিনি কখন * * * ভূরি প্রস্ফুটিতা যূথিকা লতারূপে বন আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কাহাকে ডাকেনও না, কাহাকে কিছু ঢালিয়াও দেন না, চতুর্দিক গন্ধে আমোদিত হইতেছে; তিনি সেই গন্ধ বিস্তার করিয়াই সুখানুভব করিতেছেনে। তাহাতেই চরিতার্থ হইতেছেন। সে গন্ধ কেহ ঘ্রাণ লইল কি না, সে শোভা কেহ দেখিল কিনা, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই।"

কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা—ইহা একটী পুরাতন সাহিত্যিক বৈধর্ম—heresy—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ফরাসী কবি এবং সমালোচক Baudelaire (বাদলেয়ার) যাহাকে heresie de lensignment বলিয়াছেন। "প্রদীপ" পত্রে উল্লিখিত "রস্কিন" প্রবন্ধে এই প্রশ্নেরই আলোচনায় যাহা লিখিয়াছিলাম, এস্থলে সংগত বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"সত্যনিরূপণ বিজ্ঞানের কার্য—শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাহা সাধ্য। সৌন্দর্যসৃষ্টি বা উদ্ভাবন কলাবিদ্যার উদ্দেশ্য—রুচি (Taste) আমাদিগকে তাহার পথ দেখাইয়া দেয়। নীতি আমাদিগকে কর্ত্তব্য বিষয় শিক্ষা দেয়—এবং ইহা বিবেকের কার্য। এমন হইতে পারে যে, সত্য বা নীতির অপলাপে সৌন্দর্যের পূর্ণ বা অবিকৃত বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কলাশাস্ত্র হইতে আমরা সত্যের উদ্ভাবন বা কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের উপায় ঠিক করিয়া লইতে পারি না। বিজ্ঞান বা নীতির উদ্দেশ্যের সহিত যখনই কলাবিদ্যা সংগত হইয়াছে, তখনই তাহার নিজ উচ্ছেদ বা বিলোপ অনিবার্য। সত্যেরও মর্যাদা আছে, কর্তব্যেরও মর্যাদা আছে; সৌন্দর্যের তাহা অপেক্ষা কোনরূপ ন্যূন নহে। কলাশাস্ত্রে সৌন্দর্যের স্থান সকলের উপর। বালক-জীবনের সমস্ত মধুময় মোহ, উজ্জ্বল কল্পনা, বিচিত্র শোভা অর্দ্ধস্ফুট কুসুম-কোরকবৎ কোমল ও কমনীয় —কবিত্বের সারদান করিয়া অপূর্ব প্রতিভাবান লেখক কেনেথ

গ্রেহাম (Kenneth Graham) মহাশয় যে "গোল্ডেন এজ" (Golden Age) নামক অতি সুন্দর ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে আমরা কল্পনা-প্রিয় বালকের এই অমূল্য আবিষ্কারের সন্ধান পাই, সত্যের অপেক্ষাও উচ্চতর পদার্থ আছে—(There are higher things than truth) ইহার উদাহরণ কল্পনাশাস্ত্রের প্রতিছত্রে—যে শাস্ত্রে সৌন্দর্য সত্যের অপেক্ষা উচ্চতর।" কিন্তু বাঙালী পাঠককে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ফ্রান্স পর্যন্ত এতদূরে দৌড়াইতে হইবে না। আমাদের ঘরের লোক, আমাদের আধুনিক বংগ-সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বংকিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? অনেকে উত্তর দিবেন, নীতিশিক্ষা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে 'হিতোপদেশ' 'রঘুবংশ' হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতির বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

"কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কিজন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ-উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা; কিন্তু নীতি নির্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

ইহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করি না, তবে এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, বংকিম ইদানীন্তন বাংলার অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখক ন'ন—সর্ববিষয়ে তাঁহার মানসিক স্বাস্থ্য (sanity) আদর্শস্থানীয়, তাঁহার বিচারশক্তি এবং রসগ্রাহিতা সর্বতোমুখী এবং অনিন্দ্য। তিনি যে কলাবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ভ্রমাত্মক মতকে প্রশ্রয় দেন নাই; ইহা তাঁহারই উপযুক্ত এবং আমাদের

সৌভাগ্য। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, বংগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ইতস্তত না করিয়া অসংকোচে পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা নয়।

এই সৌন্দর্য লইয়াই কবির ধ্যান-ধারণা—কবির জীবন। কোনকালে কোন কবি তৎকর্তৃক উদ্ভাবিত সৌন্দর্যে চির-পরিতৃপ্ত নয়। যাহা এখন চরম সৌন্দর্যরূপে প্রতিভাত, পরক্ষণেই অভিনব সৌন্দর্যের মন্দির স্বপ্নে কবির হৃদয় চঞ্চল,—অনিবার্য ঔৎসুক্যে দোদুল্যমান,—"পাইলেও পাই পাই মেটে না পিয়াস।" সৌন্দর্যের দিগ্‌বলয়ের পরিধি নাই—সীমা নাই,—তাহার অনন্ত বিকাশ কাহারও দ্বারা কখন সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় না।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল"

এবং ইহার প্রভাবও অসীম। "He Bantepente tout chose"—সৌন্দর্যের অশেষ শক্তি—সকলই করিতে পারে,—পশুকেও মানুষ করিতে পারে—লোকশিক্ষা কোন ছার! ওপরে উদ্‌ধৃত বংকিমবাবুর কথাগুলি স্মরণ কর।

সৌন্দর্যকে সংজ্ঞার (definition) মধ্যে আনা অসম্ভব—যদিও ইহাকে অনুভব করিতে সময় লাগে না। পার্থিব হইয়াও ইহা অপার্থিব। মানুষের চির আনন্দের সামগ্রী হইলেও ইহা দ্বারা মানুষের কোন অভাবই পূরণ হয় না—জীবনের কোন কাজেই লাগে না। হিতবাদীদের (Utilitarians) গাত্রে কালি ছিটাইবার জন্য লিখিত হইলেও, Theophile Gautier সৌন্দর্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য এবং আমার বিবেচনায়—অভ্রান্ত সত্যের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত। যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় না—যাহা কিছু মানুষের ব্যবহারে আসে তাহাই অসুন্দর—কুৎসিত, কারণ উহা কোন না কোন অভাবের পরিচায়ক এবং মানুষের সকল অভাবই নীচে এবং তাহা দীন দুর্বল

প্রকৃতির ন্যায় হেয়। বাটীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থান শৌচাগার। তথাপি আমরা কিছুতেই তত মুগ্ধ নহি—কিছুতেই আমরা তত তীব্র ও অসীম আনন্দ উপভোগ করি না—যেমন সৌন্দর্যে। ইহাদের মধ্যে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর একটী রহস্য আছে বলিয়া বোধ হয়। Goethe-এর কথাই সত্য! তিনি বলিয়াছেন—"সৌন্দর্য নিসর্গের গূঢ় নিয়ম সকলের অভিব্যক্তি, সৌন্দর্যের সান্নিধ্য ব্যতিরেকে যাহারা কখনই প্রকাশ পাইত না।" ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, আমাদের জাগ্রত-চেতনার অন্তরে যে অব্যক্ত-চেতনা আছে, তাহা সৌন্দর্যের মোহময় স্পর্শে সেই সকল প্রচ্ছন্ন নিয়মের সংগে অস্পষ্ট সহানুভূতি অনুভব করে এবং অনির্দিষ্ট ভাবসংঘের আঘাতে চঞ্চল হয়। হৃদয় এই অবস্থায় কিছুই ধরিতে ছুঁইতে পায় না বলিয়া উৎকট ঔৎসুক্যে বিচলিত হইয়া পড়ে এবং পূর্ণ উপভোগের অভাবে পরিতৃপ্তি পায় না। কিন্তু ইহা দর্শনশাস্ত্রের প্রশ্ন—আমাদের অনধিকার চর্চা।

সেই সৌন্দর্য-সৃজনই কবির আত্মপ্রসাদ,—রবিবাবু যে আত্মপ্রসাদের উল্লেখ করিয়াছেন। উহাই তাঁহার আদিম এবং একমাত্র অবলম্বন। অসংখ্য লোকের বাহবা বা প্রশংসা তাঁহার কাযে তাঁহাকে সে পরিমাণে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, যেমন তাঁহার নিজ হৃদয়ের প্রীতি। যখন তিনি সেই প্রীতিলাভ করিলেন তখন তাঁহার আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না—তাঁহার নিজের আনন্দ তাঁহার কৃতকার্যের সফলতা সম্বন্ধে চরম সংকেত—তৎপ্রতি চরম ব্যবস্থা (sanction)। যখন সৌন্দর্য তাঁহার লেখনীমুখে আবির্ভূত, তখন তিনি বাগ্‌দেবীর সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হ'ন—বাগ্‌দেবীর "ভর" তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। Coleridge যথার্থই বলিয়াছেন—"Poetry has been to me its own exceeding great reward." লোকপ্রশংসা আসুক বা না আসুক, যতক্ষণ না তাহার সৃষ্টি কবির হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে ততক্ষণ তিনি অন্ধকারে। গোড়ায় তিনি সাধারণের প্রশংসার জন্য চেষ্টিত নন—অবজ্ঞার ভয়ে ভীত নন।—"তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ!"

সেই রস সাহিত্যকে—সেই আনন্দের সৃষ্টি বিশাল দেবমন্দিরকে—সৌন্দর্যের অসীম পীঠস্থানকে, কে পাঠশালার সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবে? আশা করি কেহ নয়—রাধাকমলবাবুও নন—অন্তত পুনরালোচনায়!

নাটক ও উপন্যাস

(ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য)

নাটক ও উপন্যাস উভয়ই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত হয়; এই নিমিত্ত উপাখ্যানগত পারিপাট্য উভয়েই থাকা আবশ্যক। উভয়ের মধ্যে নিত্য সাদৃশ্য এই। নাটক ও উপন্যাস এ দুয়ের মধ্যে নৈমিত্তিক সাদৃশ্যও থাকিতে পারে। নাটকের উপাখ্যান সম্ভবানুযায়ী হওয়া চাই, উপন্যাসের উপাখ্যান সম্ভবানুযায়ী হইতে পারে, অসম্ভব অর্থাৎ অদ্ভুত-রসাত্মকও হইতে পারে। নাটকের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি থাকা চাই, উপন্যাসে সেরূপ না থাকিলেও চলে। নাটকের ঘটনাপরংপরার দ্বারা নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের প্রকৃতি ক্রমশ পরিস্ফুট করিতে হয়, উপন্যাসে সে প্রকৃতি কিরূপে নানা উপাদান সহযোগে উত্তরোত্তর সংরচিত হইয়াছে, তাহা পর্যন্তও দেখাইতে পারা যায়। অশুভশেষ নাটকের ঘটনা—পরংপরা আদ্যোপান্ত দৈবদুর্বিপাক-রূপ সূত্রে গাঁথিতে হয়, অশুভশেষ উপন্যাসের উপাখ্যান মানবসংঘটিত বা অকস্মাৎ দৈব দুর্ঘটনায় সহসা পরিসমাপ্ত হইতে পারে।

এই কয়েক বিষয়ে উপন্যাস নাটকের লক্ষণ ধারণ করিতে পারে, এবং ধারণ করিলে অতি রমণীয় হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া উপন্যাসের পক্ষে এ সকল লক্ষণ এককালে অপরিহার্য নহে।

নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে যে নিত্য বৈষম্য আছে, তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। (১) নাটকে নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্বয়ং বক্তা, উপন্যাসে গ্রন্থকারই প্রধান বা একমাত্র বক্তা।

এই নিত্য বৈষম্য হইতে আর একটী গুরুতর নৈমিত্তিক বৈষম্য জন্মে। নাটক-রচয়িতা দর্শকমণ্ডলীর অলক্ষিতে থাকিয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে পারেন, উপন্যাস-রচয়িতাকে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে

আসিয়া ইন্দ্রজাল পুনঃ পুনঃ বিস্তারিত ও পুনঃ পুনঃ সংকোচিত করিতে হয়। নাটক-রচয়িতা কল্পিত জগতের সৃষ্টি করিয়া তথায় দর্শকমণ্ডলীকে প্রারম্ভাবধি শেষ পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখিতে পারেন, উপন্যাস-রচয়িতাকে এই জগতে প্রত্যাবর্তন করিবার পথ স্বকীয় শ্রোতৃবর্গকে পুনঃ পুনঃ ছাড়িয়া দিতে হয়। নাটক-রচয়িতা আপনার কল্পনাযন্ত্র উচ্চে চড়াইয়া বাঁধিতে পারেন, উপন্যাস-রচয়িতাকে সে যন্ত্র নামাইয়া বাঁধিতে হয়। নাটকের রস বিশেষ গাঢ় হইতে পারে, উপন্যাসের রস অপেক্ষাকৃত তরল না করিলে চলে না।

অতএব পাঠকবর্গ দেখিবেন, নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে লক্ষণ-বিশেষে নিত্য সাদৃশ্য আছে, লক্ষণ বিশেষে নিত্য বৈষম্য আছে, লক্ষণ বিশেষে বৈষম্য বা সাদৃশ্য থাকিতে পারে। যে সকল লক্ষণ বিশেষে বৈষম্য বা সাদৃশ্য ঘটিতে পারে, তাহার অধিকাংশেই উপন্যাস-রচয়িতার সুবিধা অধিক, অল্পাংশে নাটক-রচয়িতার সুবিধা অধিক। উপন্যাস-রচয়িতা কেবল উপাখ্যানটী পরিপাটী করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা হইলে তাহাতে রসের প্রগাঢ়তা ভিন্ন, নাটকের অন্য তাবৎ লক্ষণ দিতে পারেন। নাটক-রচয়িতাকে উপাখ্যানের পারিপাট্য করিতে হয়, এবং তদতিরিক্ত আরও কয়েকটী ভূষায় স্বরচিত কাব্যকে অলংকৃত করিতে হয়; কেবল রসের প্রগাঢ়তা বা তরলতার অংশে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ নিজায়ত্তি থাকে এই মাত্র। অল্প কথায় বলিতে গেলে উপন্যাস রচনাস্থলে কবির অবশ্য-কর্তব্য অনেক, নাটক-রচনাস্থলে অবশ্য-কর্তব্য বহুবিধ।

নাটক ও উপন্যাস উভয়ের মধ্যে এই লক্ষণ-ভেদ কেবল এক কারণেই উদ্ভূত হয়।(১) নাটক দৃশ্যকাব্য, উপন্যাস শ্রব্যকাব্য।(১)নাটকের অভিনয় দেখিতে হয়, উপন্যাস পড়িতে বা শুনিতে হয়। অভিনয় একাসনে বসিয়া না দেখিলে রসভংগ হয়, উপন্যাস আদ্যোপান্ত একাসনে শেষ না করিতে পারিলেও তত হানি নাই। আবার, অভিনয় ও অভিনয়ের উপকরণের আয়োজনে সময় লাগে, উপন্যাসের শ্রবণে বা অধ্যয়নে মধ্যে মধ্যে বিরামের আবশ্যকতা নাই। এই প্রযুক্ত নাটক-

রচনা সংক্ষেপে হওয়া চাই, উপন্যাস অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলেও হানি হয় না। নাটকের অভিনয়ে চিত্রপট ও অংগভংগী প্রভৃতি বাহ্যোপকরণের সহায়তা থাকে, নাটকরচনা সংক্ষেপে সম্পন্ন হইতে পারে। উপন্যাসে কবিকে কেবল বাগ্‌বিস্তারদ্বারা দেশ, কাল, মুদ্রা প্রভৃতি রসোদ্দীপক উপকরণের সৃষ্টি করিতে হয়, উপন্যাস সুতরাংই বৃহৎ হইয়া পড়ে। নাটক কেবল স্থূল স্থূল সারবান ব্যাপারে রচিত হওয়া উচিত; উপন্যাসে এ নিয়মের শৈথিল্য হইলে হানি নাই, এবং স্থল বিশেষে হওয়াও আবশ্যক।

নাটক দৃশ্যকাব্য, উপন্যাস শ্রব্যকাব্য। যে সকল ব্যাপারের প্রতিকৃতি চক্ষে দেখা যায়, যাহার অভিনয় মানুষে করে, তাহা সম্ভবানুরূপ হওয়া বিধেয়। যাহা শুনা যায়, তাহা অদ্ভুত হইলেও হানি নাই। যাহার অভিনয় মানুষে করে, যাহাতে সাংসারিক ব্যাপারেরই প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়, তাহার নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের মানবোচিত প্রকৃতি থাকা আবশ্যক। যেখানে মানবোচিত প্রকৃতি-সম্পন্ন নানা ব্যক্তির কল্পনা থাকে, এবং সেই ব্যক্তিগণ আপনাপন প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচরণ করিতেছে এরূপ বর্ণনা থাকে, সেখানে তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি প্রত্যেকের ব্যবহারের অনুরূপ হওয়া বিধেয়। নাটক সংক্ষেপে ও সারবান ব্যাপারে রচিত হওয়া উচিত, নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের প্রকৃতি বিবিধ উপাদান সহযোগে ক্রমে রচনা করিবার স্থল নাটকের মধ্যে হইতে পারে না। অশুভশেষ নাটকের রস অতি প্রগাঢ়। সেরূপ প্রগাঢ় রসাত্মক রচনা মানবসংঘটিত বা অকস্মাৎ দৈবদুর্ঘটনায় পরিসমাপ্ত করিলে নিতান্ত কৃত্রিমের ন্যায় দেখায়, সুতরাং রসভংগ হয়। উপন্যাস অপেক্ষাকৃত পাতলা জিনিস, তাহাতে সেরূপ কৃত্রিম ভাব থাকিলেও চলিতে পারে, তথাপি তাহাও একটা ত্রুটির মধ্যে গণ্য হইবে।

পাঠকগণ দেখিবেন, উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে ভেদ নির্বাচনের সংগে নাটকের প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া আসিয়াছে। ফলত একমাত্র কারণে নাটকের প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া দেয়। সে কারণ, নাটক

দৃশ্যকাব্য। পাঠকগণ নাটকের উল্লিখিত লক্ষণগুলি মনে রাখিয়া বিচার করিলে আরও দেখিতে পাইবেন, বাংগলা ভাষাতে অদ্যাপি একখানিও নাটক রচিত হয় নাই। নাটক নামে যে রাশি রাশি গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়া পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, তাহার সকলগুলিই উপন্যাস মাত্র, এবং সকলগুলিই সুরচিত উপন্যাস নহে।

নাটকের লক্ষণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে তাহাদের বিশেষ বর্ণনা করিতেছি।

উপাখ্যান।

নাটকের উপাখ্যান,—সর্বপ্রকার কাব্যরচনারই উপাখ্যান—অনতি-বৃহৎ ও অনতিকালব্যাপক হওয়া বিধেয়। উপাখ্যান অতি বৃহৎ বা বহুকালব্যাপক হইলে তাহার রসের পূর্ণোপলব্ধি হইবার ব্যাঘাত জন্মে; এবং অতি ক্ষুদ্র বা অত্যল্পকালব্যাপক হইলে তাহার রসের পুষ্টি সাধন হয় না। উপাখ্যানের আয়তন এমন হওয়া উচিত যে, যেন তাহাতে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মন ঠিক ভরাট হইতে পারে, অধিক ছোট হইলে মনে খালি থাকে, অধিক বড় হইলে মনে তাংড়ায় না। এই কথাটী পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রসের বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। যে প্রতিমা অতি বৃহৎ হয়, তাহার অংগ-প্রত্যংগ পরম শোভনীয় হইলেও তাহা অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। পদ্মানদীকে কেহ কখনই রমণীয় বলে না। অকূল জলধি অদ্ভুত রসোদ্দীপক বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। আবার, অতি ক্ষুদ্র প্রতিমা বা ক্ষুদ্র নদী স্বয়ং কখনই মনোহর হইতে পারে না; ইহারা দেখিতে ভাল হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিমার বা প্রকৃতিদেহের অপেক্ষাকৃত আয়ত ছবির উপকরণস্বরূপ হইয়াই ইহারা সুন্দর হয়। রসনেন্দ্রিয়ের ভোগসুখসম্বন্ধেও এই নিয়ম দেখা যায়। তবে রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে এমন অল্প দ্রব্য আছে, যাহার একাংশগত স্বাদু সর্বাবয়বগত স্বাদু হইতে পৃথক্। কিন্তু রসনেন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে এমন বহুতর দ্রব্য আছে, যাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়া যথোচিতরূপে স্বাদুবোধের নিমিত্ত মুখমধ্যে একাধিক সংখ্যায় অর্পণ করা আবশ্যক হয়। আলিংগনাদি স্পর্শনেন্দ্রিয়-সুখ-সম্বন্ধেও এই নিয়ম কতদূর রক্ষা পায়, তাহা পুত্রবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই নিকটে বিদিত আছে।

উপাখ্যানকে যথাবিধি আয়ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে অংগ-প্রত্যংগের দ্বারা পরিবর্ধিত করিতে হয়। মূল উপাখ্যানের দৈর্ঘ্য-পরিমাণ যথাবিধি আয়ত হইয়াও যদি ইহার বিস্তৃতির অংশে শীর্ণতা দোষ থাকে, তবে এই কৌশলের অবলম্বনই সেই দোষ সংশোধনের একমাত্র উপায়। নারিকেল বৃক্ষের অপেক্ষা অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ অধিক সুন্দর, একটী নারিকেল বৃক্ষের অপেক্ষা নারিকেলের বাগান অধিক রমণীয়।

অংগ-প্রত্যংগের পৃথক্ পৃথক্ আয়তন উপাখ্যানের মূলভাগের আয়তনের যথাযোগ্য হওয়া চাই। মূলভাগের সহিত অংগ-প্রত্যংগের যোজনাগুলি অকৃত্রিমবৎ হওয়া বিধেয়, এবং সেই নিমিত্ত মূলভাগের প্রকৃতির সংগে অংগ-প্রত্যংগের প্রকৃতিও একবিধ হওয়া আবশ্যক।

অশুভশেষ নাটকের উপাখ্যান রচনায় কল্পনা-শক্তির সমধিক প্রয়োজন। এই প্রকার নাটক যে অমংগল ঘটনায় পরিসমাপ্ত হয়, তাহাই এই প্রকার নাটকে প্রাণ-স্বরূপ। কেহ কেহ এমন বিবেচনা করিতে পারেন যে, নাটকে নায়ক-নায়িকার আকাংক্ষা তৃপ্তি না করিয়া আকাংক্ষা ভংগ করিলেই নাটক অশুভশেষ হইতে পারে। কিন্তু ফলে তাহা নহে। উপাখ্যানের চরম ভাগে ইচ্ছামত অমংগল ঘটাইয়া দিলেই হয় না। উপাখ্যান যে দুর্দৈব ঘটনায় পরিসমাপ্ত হইবে, উপাখ্যানের অনুষ্ঠান হইতেই তাহার সূত্রপাত করিতে হয়। অশুভ-শেষ নাটকের চরমভাগে দুর্বিপাক রূপ যে কালপুরুষ প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার দেহের অমংগল ছায়া উপাখ্যানের আদিপ্রান্ত পর্যন্ত পতিত হওয়া আবশ্যক; নাটকের জন্মলগ্নেই তাহার অদৃষ্ট-নিরূপক কুগ্রহের লক্ষণ থাকা চাই। উপাখ্যান যতই পরিবর্ধিত হইতে থাকে,

তাহার অংগপ্রত্যংগের যতই সমাবেশ হইতে থাকে, ভাবী দুর্বিপাকের পূর্বলক্ষিত সেই ছায়া ততই বিস্তৃত ও ঘনীভূত হওয়া উচিত, এবং নায়ক প্রভৃতি প্রধান পাত্রগণের প্রকৃতি ও আচরণ তদ্দ্বারা ততই আচ্ছন্ন হওয়া বিধেয়। এরূপ করিবার প্রধান কৌশল, সেই দুর্বিপাককে অদৃষ্টলিপির ন্যায় অনিবার্য করা; নায়ক বা নায়িকাকে সেই দুর্বিপাক ঘটাইবার উপযোগী প্রকৃতি অর্পণ করিয়া উপাখ্যানগত ঘটনার সহযোগে সেই প্রকৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ করা, এবং অবশেষে সেই বিকসিত প্রকৃতির ফলস্বরূপ চরম অমংগলের সংঘটন করা। অশুভশেষ নাটকের উপাখ্যান আদ্যোপান্ত দুর্দৈবরূপ সূত্রে গ্রন্থন করিতে হয়, নতুবা তাহার শেষ প্রান্তে ইচ্ছামত অমংগল ঘটাইয়া দিলে সে অমংগল রচনা নিতান্ত কৃত্রিমের ন্যায় দেখায়, সুতরাং সর্বাবয়ব-সংগতি-মূলক রসের ত্রুটি জন্মায়।

আমরা এস্থলে নাটকের উপাখ্যানের বিষয়ে যে যে কথা বলিলাম, প্রহসনের উপাখ্যানের সম্বন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ তারতম্য করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রহসন হাস্যরসাত্মক কাব্য। মনুষ্য এই কর্মভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যত প্রকার রসের আস্বাদন করে, তন্মধ্যে হাস্যরস সর্বাপেক্ষা লঘু ও তরল। সেই প্রযুক্ত কর্মভূমির প্রতিকৃতি-স্বরূপ রংগভূমিতেও হাস্যরস লঘু ও তরল, এবং সেই প্রযুক্ত অন্যান্য রসের আশ্রিত উপাখ্যানের অপেক্ষা প্রহসনের উপাখ্যান অল্পায়ত হওয়া প্রয়োজনীয়। কেবল রসকে আশ্রয় করিয়াই কাব্য রচনা হয়, অতএব সেই রসের বহুবিধ প্রকৃতিভেদে কাব্যেরও বহুবিধ প্রকৃতিভেদ হইবে। প্রহসনের রচনা সম্বন্ধে আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণের একটী বিশেষ ভ্রম লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রচারিত প্রহসন মাত্রকেই দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকারগণে মনে করেন, প্রহসনের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের মুখ হইতে হাস্যরসোদ্দীপক উক্তি-প্রত্যুক্তি বাহির করিতে পারিলেই প্রহসন হইল। কিন্তু বাস্তবিক প্রহসনে আরও গুরুতর উপকরণের প্রয়োজন থাকে। প্রহসনের উপাখ্যান

এমন ভাবে রচনা করিতে হয়, অঘটন ঘটাইয়া নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তি-গণকে এমন অবস্থায় ফেলিতে হয় যে, যেন তাহা হইতেই হাস্যরসের প্রচুর তরংগ উঠিতে পারে। কথকদের মুখে রামায়ণে ও মহাভারতে এরূপ কৌতুকাবহ অবস্থার বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়; সম্প্রতি রুক্মিণী-হরণ নামে যে নাটক প্রচারিত ও কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছে তাহার বর্ণিত ব্রাহ্মণ দূতের দ্বারকা হইতে বাটী প্রত্যাগমন স্থলে এইরূপ কৌতুকাবহ ঘটনা বর্ণনা আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কাব্যরত্নাকর স্বরূপ সেক্সপিয়র হইতে যে প্রহসন-বিশেষের উপাখ্যান সংকলন পূর্বক ভ্রান্তিবিলাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ কৌতুকাবহ ঘটনার আদর্শস্থলীয়। হাস্যরসের মুখ্য আশ্রয়, উপাখ্যানের মধ্যে কৌতুকাবহ ঘটনার সংঘটন; হাস্যরসোদ্দীপক কথোপকথন হাস্যরসের গৌণ আশ্রয় মাত্র।

মূল তাৎপর্য

সুরচিত নাটকমাত্রেরই এক একটি মূল তাৎপর্য থাকে। এই মূল তাৎপর্যই নাটক দেহের জীবাত্মা স্বরূপ। ইহারই আকর্ষণ-বলে ভাব, অলংকার প্রভৃতি পরিপোষক পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া নাটকের স্থূল দেহের রচনা হয়। আমাদের মনোগত অভিপ্রায়ের সম্যক প্রকাশের নিমিত্ত উদাহরণের প্রয়োজন করে। কিন্তু আমরা বাংলা ভাষায় প্রচারিত নাটকের মধ্যে উদাহরণ কোথায় পাইব? আমরা এই যে তাৎপর্যের কথা বলিতেছি, তাহা কেবল সুরচিত নাটকের মধ্যেই পাওয়া যায়। তথাপি আমরা উদাহরণ স্বরূপ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের প্রণীত নাটকেরই উল্লেখ করিব। নাটক-রচনার দোষগুণ দেখাইবার নিমিত্ত ইঁহারই প্রণীত গ্রন্থের সহায়তা লওয়া আমাদের পক্ষে সমধিক কর্তব্য। ইঁহার প্রশংসা করিতে আমাদের আনন্দানুভব হইবে, ইঁহার অপ্রশংসা করিতে আমাদেরই ক্লেশ বোধ হইবে।

পাঠক-বর্গ লীলাবতী গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। লীলাবতী গ্রন্থের মূল তাৎপর্য উৎকৃষ্ট প্রকৃতির প্রতি

উৎকৃষ্ট প্রকৃতির যে আকর্ষণ হয়, অধম প্রকৃতির সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রকৃতির যে বিপ্রকর্ষণ হয়, তাহাই প্রদর্শন করা। এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি এত প্রবল হইতে পারে যে, বহু বাধা সত্ত্বেও তাহার চরিতার্থতা ঘটে। লীলাবতী নাটকের জীবাত্মা স্বরূপ এই ভাব নানা অবয়ব ধারণ করিয়া লীলাবতী নাটকের সুরচিত অংগ-প্রতংগ মাত্রেই প্রকাশ পাইতেছে। ললিত-লীলাবতীর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ, প্রাচীন উপদেশে উপদিষ্ট হরবিলাস ও নব্য উপদেশে উপদিষ্ট ললিত ও উভয়ের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ, অযত্ন-শিক্ষিত, মাদকপরতন্ত্রতাদোষে কলংকিত শ্রীনাথ আর বহুযত্নশিক্ষিত সর্বদোষরহিত ললিত, এ উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ, নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ এ উভয়ের পরস্পর প্রথমে আকর্ষণ ও অবশেষে বিপ্রকর্ষণ, নদের চাঁদ ও শ্রীনাথের পরস্পর বিপ্রকর্ষণ; লীলাবতী নাটকের সমগ্র অবয়বে সেই একই তাৎপর্যের প্রকাশ হইতেছে। এই নাটক-দেহের যে কোন প্রধান স্থানে অংগুলি স্পর্শ করিবে, সেইখানেই তাহার অভ্যন্তর-সঞ্চারী ভাবপ্রবাহের স্পন্দন দেখিতে পাইবে।

লীলাবতী নাটকের আমরা যেরূপ তাৎপর্য দিলাম, তাহাতে অনেকের প্রীতি জন্মিতে না পারে। তাঁহারা এমন কথা বলিতে পারেন, লীলাবতী নাটকের তাৎপর্য যদি এইরূপ হইল, তবে প্রচলিত অধিকাংশ নাটকের ও তাৎপর্য এই, এবং প্রচলিত অধিকাংশ নাটকের হইতে লীলাবতীর কোন বিশেষ নাই। আমরাও এই কথা বলি, কারণ আমাদের চক্ষে লীলাবতী নাটকের এমন কোন গুণবত্তা নাই যে, তাহাকে প্রচলিত অধিকাংশ নাটক হইতে বিশেষ করিতে পারা যায়, তবে পাত্রগণের উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং অন্য দুই একটী সামান্য বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারে এই মাত্র।

নাটকের মূল তাৎপর্য দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত আমরা লীলাবতী নাটকের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ আর একটী কাব্য রচনার উল্লেখ করিব। কিন্তু আমাদের প্রথমত কিঞ্চিৎ শংকাবোধ হইতেছে, কারণ আমরা আনন্দিত হৃদয়ে যে নাটকের তাৎপর্য প্রকাশ করিতে উদ্যত

হইতেছি, তাহা অনেক লোকের নিকটে বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া পরিচিত আছে। এই গ্রন্থখানিও দীনবন্ধু বাবুর প্রণীত, এবং যদিও ইহার প্রহসন নাম দেওয়া আছে, তথাপি আমরা ইহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ইহাকে নাটক বলিয়াই জ্ঞান করি। আমরা সধবার একাদশী নামক গ্রন্থের কথা বলিতেছি, এবং ইহার তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

সধবার একাদশীতে যদিও অটলবিহারী নায়ক এবং নিমেদত্ত তাহার সহায়স্থলীয়, তথাপি নিমেদত্ত যেরূপ স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং প্রকৃতির প্রগাঢ়তা ও গুরুত্ব অংশে যেরূপ প্রাধান্য হইতে পারেন না। সমুদায় ইতর আকাংক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক একান্ত হৃদয়ে ভারতী দেবীর উপাসনা না করিলে অভীষ্ট বরলাভের সম্ভাবনা থাকে না।

নাটক-রচয়িতার চক্ষে নাটকের মূল তাৎপর্য ম্লান দেখাইবার দ্বিতীয় কারণ, রচয়িতার যথোচিত আত্মসংযমনের অসদ্ভাব। কবি কল্পনা-শক্তিবলে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যখন রসের অবতারণা করিতে থাকেন, তখন সেই রসস্পর্শে তিনি আপনিই উন্মত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সুকবি কখনই এরূপ হইতে দেন না। তিনি প্রভূত ধৈর্যবলে আপনার চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখেন, এবং মূল তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ় রাখিয়া কেবল যথাযোগ্য পরিমাণে রসের আয়োজন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন।

নাটক-রচয়িতার পক্ষে এই জাতীয় আরও একটী বিপদের সম্ভাবনা থাকে। নাটকের রস আদ্যোপান্ত একভাবে রাখিলে দর্শকমণ্ডলীর মনে সে রসের যথেষ্ট স্ফূর্তি হয় না। এই প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে অন্য রসের সংযোজন দ্বারা প্রধান রসের ভার লাঘব করার প্রয়োজন হয়। সুকবি মাত্রেই এরূপ স্থলে আনুষংগিক রসকে খর্ব করিয়া মূল তাৎপর্যকে প্রধান রাখিতে পারেন; নিকৃষ্ট কবিগণ এই আনুষংগিক রস অনুচিত পরিমাণে ঢালিয়া মূল তাৎপর্যকে ডুবাইয়া দেন।

নাটকের এই মূল তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার উপকরণের

সমাবেশ করিতে হয়। উপকরণের সকল গুলিই যে সেই তাৎপর্যের অভিমুখ হইয়া বিন্যস্ত হওয়া আবশ্যক, এমন নহে। মালায় গ্রথিত পুষ্পের ন্যায় কোন উপকরণ এ দিকে, কোন উপকরণ ওদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের যোজনাগুলির তাৎপর্য নাটকের মূল তাৎপর্যের প্রতিপোষক হওয়া বিধেয়।

নাটক দৃশ্যকাব্য, এই নিমিত্ত অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নাটক অধিক সারবান হওয়া উচিত। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি নায়কাদি পাত্রগণকে বৃথা জল্পন করাইয়া গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন না। তিনি প্রতি পদবিন্যাসেই আপনার অভীষ্ট ফলের সন্নিহিত হইতে থাকেন। যেখানে অন্য লোকে বৃহদাড়ম্বর ও বহু বাক্য ব্যয় করে, সেখানে তিনি দুই একটী কথার দ্বারাই মর্মস্পর্শ করিতে কৃতকার্য হয়েন।

এইরূপ অল্পের মধ্যে অধিক রসের অবতারণা নাটকের মধ্যে একটী অপূর্ব উপায় দ্বারা সাধিত হইতে পারে। সে উপায়, নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের আন্তরিক অবস্থা সূচক বাহ্য লক্ষণের বর্ণনা। নাটকোচিত এইরূপ বাহ্য লক্ষণের বর্ণনা বাঙলা নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ এস্থলে একটীর উল্লেখ করিতেছি।

লীলাবতী নাটকে সারদাসুন্দরীর নিকটে লীলাবতী আপনার বিবাহ সম্বন্ধের কথা বলিতেছিল; বলিতে বলিতে ললিতমোহনকে তাহার পিতা দত্তক পুত্র লইবে স্মরণ হইয়া শিহরিয়া উঠিল। সারদা-সুন্দরী লীলাবতীকে শিহরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সখি, শিহরিলে কেন?" ললিতকে পোষ্য পুত্র লইলে লীলাবতীর সকল আশারই মূলে যে কুঠারাঘাত পড়িবে, গ্রন্থকার তাহা সারদাসুন্দরীর এই প্রশ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে এই ভংগীর তাৎপর্য তেমন পরিস্ফুট হয় নাই।

সেক্সপিয়রের রচিত নাটকে এরূপ ভংগী-বর্ণনার অনেক সুন্দর উদাহরণ আছে। এক স্থলে নায়ক শোকাভিভূত হইয়া মুমূর্ষু হইয়াছে; "আমার শ্বাসরোধ হইতেছে, আমি মরিলাম" সে সময়ে নায়ক এরূপ কোন বাক্যে আপনার তাৎকালিক অবস্থা ব্যক্ত না

করিয়া, পারিষদবর্গকে কহিতেছে, "আমার জামার বন্ধক খুলিয়া দাও।"

রাজা দুষ্মন্তের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে যখন শকুন্তলা নিতান্ত অনিচ্ছায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চরণে কুশাংকুর বিঁধিয়া তাঁহার গমনের যে ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, তাহাও নাটকোচিত এই বাহ্য লক্ষণ বর্ণনার উদাহরণ স্থল।

সুকবি রচিত নাটক মাত্রেই এই বাহ্যোপকরণের সন্নিবেশ থাকে, এবং এই বাহ্যোপকরণের সন্নিবেশবশত নাটকের রচনা সমধিক সারবান ও নাটকের রস সমধিক গাঢ় হয়।

প্রকৃতি কল্পনা।

এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল নাটক প্রচারিত হইতেছে তাহার অধিকাংশের নায়ক প্রভৃতি প্রকৃতিগণ, রক্তমাংস বিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ মনুষ্যের প্রকৃতির ন্যায় দেখাইতে পারে, এরূপ সুকৌশল সহকারে রচিত হয় না। এ বিষয়ে আমাদের নাট্যকারগণ ঠিক অমাদের প্রতিমাকার ও চিত্রকরগণের ন্যায়। প্রতিমাকারেরা দশভূজা ভগবতীর যেরূপ আকার করে, পার্শ্ববর্তিনী লক্ষ্মী সরস্বতীরও তেমনি করে, এবং প্রতিমার মধ্যে সখী থাকিলে, তাহাদেরও সেইরূপ করে। সকলেরই সমান নাক, সমান চক্ষু, মুখের ভাব সমান ; তবে হাতের সংখ্যা, বর্ণ ও অংগ-ভংগীর বিষয়ে যে তারতম্য থাকে, এই মাত্র। সে তারতম্যও কেবল সেই সকল দেবমূর্তির ধ্যানে নিরূপিত আছে বলিয়া বটে। আমাদের দেশের চিত্রকরেরাও এই প্রণালীতে চিত্র কার্য সমাধা করে। জগন্নাথের পটে দেখ, কে জগন্নাথ কে বলরাম তাহা চিনিবার কোন উপায় থাকে না, তবে জগন্নাথের বর্ণ কাল, আর বলরামের বর্ণ গৌর। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ছবি দেখ, গোপিনী সকলের মূর্তি এক প্রকার। কে যে শ্রীরাধিকা সে পর্যন্ত চিনিয়া উঠা কঠিন হয় ; তবে শ্রীরাধিকাকে আকারে কিছু ছোট করে এবং নীল বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয়। দশভূজা প্রতিমার চালে যে সকল চিত্র থাকে, তাহাদেরও দশা এই।

আমাদের দেশের শিল্পকারগণে প্রকৃতি বুঝিয়া মূর্তি গড়িতে জানে না। স্ত্রীলোকেরা আলিপনা দিবার সময়ে যেরূপে মনুষ্য আঁকে, আমাদের চিত্রকরগণ তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল আঁকিতে জানে, এই মাত্র। বালকেরা কাদা লইয়া যেরূপে ঠাকুর গড়ে, তাহাতে অংগ-প্রত্যংগের গঠন প্রায়ই হয় না; আমাদের প্রতিমাকারগণ অংগ-প্রত্যংগের সেই গঠনগুলি করিয়া রং মাখাইয়া দেয় এই মাত্র। চক্ষের ভাব, মুখের ভাব, শরীরের ভাব, আমাদের শিল্পকারেরা এ সকলের কোন ধার ধারেন না। আমাদের দেশের লোকেরাও, মূর্তিতে যে প্রকৃতি প্রকাশ হয়, তাহা বড় বুঝেন না। অনেকে বর্ণ দেখিয়াই সুন্দর কুৎসিত বিবেচনা করেন; কেহ কেহ বা অংগ সৌষ্ঠবেরও প্রতি দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু মুখের ভাবে ও অংগ-প্রত্যংগের ভংগীতে প্রকৃতি প্রকাশের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া সৌন্দর্য্য বা অসৌন্দর্যের বিচার দুই একজন ভিন্ন কাহাকেও করিতে দেখা যায় না। এই ত্রুটি আমাদের দেশের কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। অন্য কবিদের ত কথাই নাই, ভারত-চন্দ্রও নায়িকার রূপ-বর্ণনাতে কেবল কয়েকটি অবয়ব মাত্রের নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং কাব্যের নায়ক-নায়িকার সদৃশ উত্তমাংগের বাহ্য-ভাব বর্ণনাতেও যখন আমাদের কবিগণ এই রীতি অবলম্বন করেন, তখন তাহাদের আন্তরিক ভাব-বর্ণনাতেও যে সেইরূপ করিবেন, তাহা কোন বিচিত্র?

কেবল যে কবিত্ব শক্তির অভাবে, আমাদের কাব্যকারগণের বর্ণনাতে এই ত্রুটি জন্মে এমন নহে, উপদেশের দোষেও এই ত্রুটির অনেকটা জন্মিয়া থাকে। নায়ক-নায়িকার প্রকৃতি রচনার সময়ে তাঁহারা সৎ প্রণালী অবলম্বন না করিয়া অসৎ প্রণালী অবলম্বন করেন। নায়ক নায়িকাকে কিরূপে বর্ণনা করিলে জনসমাজে বিদ্যা প্রকাশ ও চাতুরী প্রকাশ অধিক হইবে, তাঁহারা তাহারই চর্চা অধিক করেন। সুতরাং তাঁহাদের নায়ক নায়িকার স্বভাবের অনুযায়ী না হইয়া কৃত্রিম ও তৎপ্রযুক্ত কতকগুলি কল্পিত-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। যেমন অনেক প্রতিমাকার দেব-প্রতিমা গড়িবার সময়ে প্রতিমার চক্ষু যথার্থই আকর্ণ-বিশ্রান্ত করিয়া প্রতিমার সমুদায় মুখাবয়ব কদাকার করে, তেমনি

আমাদের গ্রন্থকারগণও নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি করিবার সময়ে তাহাদিগকে অনুচিত পরিমাণে গুণ-বিশেষ অর্পণ করিয়া তাহাদিগকে কদর্য করিয়া তুলেন। নতুবা ভারতচন্দ্রের সদৃশ কবিগণেও যে তাদৃশ নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, ইহার কবিত্ব-শক্তির অভাবে ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতচন্দ্রের ন্যায় রসানুভাবক ব্যক্তির হৃদয়ে কদাপি সুন্দরী রমণী মূর্তি অংকিত হয় নাই, এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে না। উপদেশের শক্তি অনেক সময়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষাও প্রবল হয়।

নায়ক-নায়িকা বা অন্য প্রকৃতিগণের রচনা বিষয়ে যে এ প্রণালী মূলে অবলম্বিত হইতে পারে না, এমন নহে। সামান্য উপন্যাসে এ প্রণালী চলিতে পারে, কিন্তু নাটকে কোন ক্রমেই চলিতে পারে না। সামান্য উপন্যাসের প্রধান সামগ্রী তাহার উপাখ্যান, এবং উপাখ্যানের ঘটনা-পরম্পরা বিনা আশ্রয়ে রচিত হইতে পারে না। এই প্রযুক্ত সামান্য উপন্যাসে গল্পের আশ্রয় স্বরূপ নায়ক-নায়িকা প্রভৃতি প্রকৃতিগণ যেমন তেমন হইলেও চলিতে পারে, এই প্রযুক্ত অনেক উপকথায় বর্ণিত ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি-বিশিষ্ট না হইলেও, উপকথা-শ্রোতৃবর্গের নিকটে সরস বোধ হইতে পারে। কিন্তু নাটকে সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়, এবং সাংসারিক ব্যাপার স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া উপস্থিত হয়, নাটকের নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া রংগভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। আমরা এখনকার প্রচারিত নাটক-সমস্তকে উপন্যাসের মধ্যে গণনীয় বলিয়া যে পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি, তাহার একটী প্রধান কারণ, তাহাদের বর্ণিত নায়ক-নায়িকাগণ নিতান্ত অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম।

যেখানে আমাদের কবিগণ অসদুপদেশের বশীভূত না হইয়া কল্পনা-শক্তিকে অবাধে ও আনন্দে বিহার করিতে দিতে পারিয়াছেন, সেখানে তাঁহাদের চিত্তপটে দুই একটী স্বভাবানুযায়ী প্রকৃতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, এবং তাঁহারা আপনাপন শক্তির অনুসারে লেখনীর দ্বারা সেই প্রতি-

বিশ্বকে গ্রন্থমধ্যে অংকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নায়ক-নায়িকার আনুষঙ্গিক প্রকৃতির রচনাস্থলেই তাঁহাদের কল্পনাশক্তির এই স্বাধীন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকংকনের ভাঁড়ু দত্ত, ভারতচন্দ্রের মালিনী, দীনবন্ধু বাবুর নিমে দত্ত আমাদের এই কথার উদাহরণ স্থল। নায়ক প্রভৃতি প্রকৃতিগণের রচনা করিবার সৎপ্রণালী কি, তাহা আমাদের এই শেষোক্ত কথাগুলিতেই সংক্ষেপে নির্দেশিত হইয়াছে। সুকবি আপনার কল্পনাশক্তিকে সংযত করিয়া রাখেন বটে, কিন্তু তাহাকে লৌহশৃংখলে বন্ধনপূর্বক তাঁহার বক্ষে পাষাণ চাপাইয়া রাখেন না। যে নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এই জগতের গূঢ়তত্ত্ব বিশেষের স্বতঃস্ফূর্তি হয়, তাহাদের প্রতি তিনি কদাপি কৃতঘ্ন আচরণ করেন না, হৃদয়-সিংহাসন হইতে তাহাদিগকে অবতারিত করিয়া তথায় ইতর নায়ক-নায়িকাকে অধিষ্ঠিত করেন না। সে নায়ক-নায়িকার মূর্তি যদি অলংকারবিহীন হয়, তাহারা দেখিতে যদি সামান্য সৌন্দর্যবিশিষ্ট হয়, তথাপি তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক অলংকারভূষিত ও অধিক শোভনীয় নায়ক-নায়িকাকে গ্রহণ করেন না। তিনি অলৌকিক গুণশালী নায়ক-নায়িকার রচনা করিতে আকাংক্ষী হয়েন না, তিনি যেরূপ নায়ক-নায়িকাকে আপনার মনের ভিতরে দেখিতে পান, তাহাদিগকেই গ্রন্থের মধ্যে আবির্ভূত করিয়া তৃপ্ত থাকেন। তাঁহার হৃদয় দর্পণস্বরূপ; সে দর্পণের উপরে সূক্ষ্ম নিয়ম-তন্তু-রচিত এই জগতের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তিনি তাহাকেই মন্ত্রবলে স্থুলাবয়ব প্রদানপূর্বক ইতরজনগণের সাক্ষাৎকার করেন। তিনি দেবলোক হইতে মর্ত্যভূমিতে সমাচার বহন করিবার দূত স্বরূপ; তাঁহার বিচিত্র শ্রবণ যন্ত্রে যে দৈববাণীর ধ্বনি হয়, তিনি তাহাকেই মানবী ভাষায় সমাহৃত করিয়া মানব-মণ্ডলীতে ঘোষণা করেন। সে প্রতিবিম্ব ও সে ধ্বনির উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করিয়া তিনি তাহাকে কদাপি মলিন ও তাৎপর্য-বিহীন করেন না।

প্রকৃতির সংগতিবোধ

নাটকের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের রচনায় স্বাভাবিক প্রতিভার প্রয়োজন করে। সে প্রতিভা সকলের থাকে না। যাঁহারা বিধাতার বিশেষ কৃপাপাত্র, তাঁহারাই সে প্রতিভারূপ অমূল্য ধনে ধনী। অলংকার-শাস্ত্র পড়িলে তাহা জন্মে না; তবে যেখানে তাহা জন্মিয়া আছে, অলংকারশাস্ত্রের উপদেশে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রযুক্ত আমরা নাটকের পাত্র-রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে নিতান্ত নিষ্ফল হইবে বিবেচনা করি না।

অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিবার শক্তিকে কল্পনা বলে। কবির কল্পনা শক্তিতে আরও একটী সামগ্রীর প্রয়োজন; অপ্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে এমন ভাবে বিন্যাস করা আবশ্যক যেন তাহা হইতে সরস রচনার সৃষ্টি হইতে পারে। নাটকে যে সকল অপ্রত্যক্ষ পদার্থ আহৃত হয়, তন্মধ্যে পাত্রগণের প্রকৃতি সর্বপ্রধান। পাত্রগণের প্রকৃতি রক্ষা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ না করিলে কোন ক্রমেই সম্ভবে না, এবং তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা প্রকৃতরূপে প্রকৃতি বোধ না থাকিলেও সম্ভবে না।

পাঠকগণ আপনাপন সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। কল্পনা-শক্তি সকলেরই আছে; কল্পিত পদার্থের বিন্যাস পূর্বক সরস রচনা করিবার শক্তি সকলেরই আছে; সকল মনুষ্যই অল্প বা অধিক পরিমাণে কবি। প্রকৃতি বোধ সকলেরই আছে; সকল ব্যক্তিতে নাটকোচিত কবিত্ব আছে। তবে আমাদের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিতে এই শক্তিগুলি অল্প পরিমাণে আছে; কবিদের বিশেষত নাট্যকবিগণের এই শক্তিগুলি অধিক পরিমাণে থাকে। আমরাও অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে রমণীয় অট্টালিকা ভাবিতে পারি, সে অট্টালিকার সম্মুখে স্বচ্ছনীল সরোবর বসাইতে পারি, সরোবরে মরালশ্রেণী ভাসাইতে পারি, সরোবরের কূলে নিভৃত লতাকুঞ্জ সাজাইতে পারি। অন্তত আমরা

স্বপ্নাবস্থায় এরূপ অনেক করিয়া থাকি। কবিগণও এইরূপ করেন, কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক স্পষ্ট দেখিতে পান, অপেক্ষাকৃত অধিক পদার্থের কল্পনা করিতে পারেন এবং ইচ্ছানুসারে তাহাদিগকে মানস-চক্ষুঃসমীপে রাখিয়া ইচ্ছানুসারে তাহাদের রসাত্মক বিন্যাস করিতে পারেন। আমরা ইচ্ছা করিয়া যে সকল সামগ্রী কল্পনা করিব তাহাদের সংখ্যা অল্প, ইচ্ছা করিয়া তাহাদের যে যে সরস বিন্যাস করিব, তাহার সংখ্যা আরও অল্প এবং আমাদের স্বপ্নাবস্থায় যে কল্পনা-শক্তির উদ্রেক হয়, তাহা আমাদের এককালে আয়ত্ত-বহির্ভূত। আমাদের কল্পনা-শক্তি স্বভাবত সংকুচিত ও ম্লান, অবস্থাভেদে যখন বিস্তারিত ও উজ্জ্বল হয় তখন আর আজ্ঞানুবহ থাকে না। কবিদের কল্পনা শক্তি স্বভাবতই বিস্তৃত ও উজ্জ্বল, আর সর্বদাই তাঁহাদের আজ্ঞানুবহ থাকে।

স্থানের কল্পনা বিষয়ে ও ঘটনার কল্পনা বিষয়ে জনসাধারণের যে শক্তি থাকে, প্রকৃতি-জ্ঞান বিষয়ে শক্তি তাহার অপেক্ষাও অল্প থাকে। আমরা সরোবরের তীরে লতাকুঞ্জ রচনা করিতে সহজে পারি, সে কুঞ্জের ভিতরে সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে হরিণ শিশু রাখিতে অনায়াসে পারি, কিন্তু সে লতাকুঞ্জে পতি-পরিত্যক্তা জানকীকে ও পতি-পরিত্যক্তা শকুন্তলাকে রাখিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের প্রকৃতি সংগত কথোপকথন করাইতে দুরূহ বা অসাধ্য বোধ করি। সৃষ্টির বাহ্যমূর্তি কল্পনা করা যত কঠিন, মানব হৃদয়ের ভাব-রাশি অনুভব করা তাহার শতগুণ কঠিন। মানব হৃদয়ের ভাব-রাশির প্রকৃত অনুভব নাটক-কবিদের চিত্তপটে স্বতই হইয়া থাকে। স্বতই হয় বলিয়া তাঁহারা অনায়াসেই পাত্রগণের প্রকৃতি রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। লতাকুঞ্জ মধ্যে সীতা ও শকুন্তলা পরস্পরের সহিত যে কথা কহিবেন তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইবে না, কিন্তু নাট্যকবির কর্ণগোচর হইবে। তিনি সরস্বতীর বরপুত্র ; দেবীর বর-প্রভাবে ইতর লোকের শ্রবণ-শক্তির অতীত ধ্বনি সমস্তও তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তাঁহাকে আমাদের ন্যায় অনুমানে লিখিতে হয় না। ইতর লোকে সীতা-

শকুন্তলার কথোপকথন অনুমানে লিখিবে, সীতার মুখ দিয়া এইরূপ কথা বাহির করিলে ভাল হয়, শকুন্তলার মুখ দিয়া এইরূপ উত্তর বাহির করিলে ভাল হয়, এই সকল বিবেচনা করিয়া লিখিবে। নাট্যকবি রূপ ভাল-মন্দের কিছুই বিবেচনা করিবেন না। তিনি সীতা শকুন্তলাকে আপনার সম্মুখে দেখিতে পাইবেন, উভয়ের ভাব ভংগি পরিচ্ছদ প্রত্যক্ষবৎ দেখিবেন, উভয়েরই মুখাবয়বে উভয়ের প্রকৃতি গত মানসিক ভাবের চিহ্ন দর্শন করিবেন, উভয়েরই তৎকালোচিত উক্তি-প্রত্যুক্তি শ্রবণ করিবেন।

মনুষ্যমাত্রের প্রকৃতিতে আদ্যোপান্ত একটী সংগতি থাকে। যে, যে প্রকৃতির মনুষ্য, সে, সেই ভাবে বসিবে দাঁড়াইবে, চলিবে, কথা কহিবে, গান করিবে, লিখিবে; সেই ভাবে বসিবার সময়ে অংগ-প্রত্যংগের ব্যবস্থা করিবে, দাঁড়াইবার সময়ে শরীরের ভংগি করিবে, চলিবার সময়ে পা ফেলিবে, হাত দোলাইবে, গান করিবার সময়ে মুখভংগি করিবে, লিখিবার সময়ে কলম চালাইবে। এই সংগতি এত অধিক যে যাঁহাদের শক্তি আছে তাঁহারা কোন প্রকৃতির এক অংশ দেখিয়া অন্যান্য অংশও অনুভব করিতে পারেন। জ্যামিতি-শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, বৃত্ত-চাপের অবয়ব হইতে সমুদায় বৃত্তের অবয়ব রচনা করা যাইতে পারে। যাঁহারা জ্যামিতি শাস্ত্র জানেন না, তাঁহারাও এক গাছি বলয়ের ভগ্নাংশ দেখিয়া অনুভবের দ্বারা সমুদায় বলয়গাছটী কত বড় ও কিরূপ ছিল, তাহা বলিতে পারেন। এই জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? গোল সামগ্রীর পার্শ্ববর্তী দুই ভগ্নাংশের মধ্যে একটী সংগতি থাকে। সেই সংগতির জ্ঞান হইতে একটী ভগ্নাংশের অনুরূপ অপর ভগ্নাংশটীর অনুভব হয়। মনুষ্য-প্রকৃতিতেও এই প্রকার সংগতি থাকে। যাহাদের প্রকৃতি-ঘটিত সংগতি বোধ আছে, তাহারা কোন প্রকৃতির একাংশ দেখিয়া অন্যান্য অংশেরও অনুমান করিতে পারে। নাট্যকবিগণ বিধাতার নিকট হইতে এই শক্তি লাভ করেন। তাঁহারা কোন পাত্রের প্রকৃতির একাংশ কল্পনা করিয়া অন্যান্য অংশ যেরূপ হইবে, তাহাও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে সমর্থ

হয়েন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সীতা-শকুন্তলার পূর্ব চরিত হৃদয়ংগম করিয়া অবস্থা বিশেষে তাঁহাদের ভাবী চরিত কি প্রকার হইবে, তাহাও অনুমান করেন।

তবে সকল নাট্যকবির সর্বপ্রকার প্রকৃতিই সংগতি বোধ হয় না। কোন কবি অধিক সংখ্যক, কোন কবি অল্প সংখ্যক প্রকৃতির সংগতি অনুভব করিতে পারেন। কেহ বা দুষ্মন্তের সদৃশ পাত্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, কিন্তু শকুন্তলার সদৃশ নায়িকার প্রকৃতি অনুভব করিতে তত সমর্থ নহে; কেহ বা ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমর্থ নহে; কেহ বা নিমে দত্তের সদৃশ পাত্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, কিন্তু অটল বিহারীর সদৃশ নায়কের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমর্থ নহে। বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির সংগতি-বোধ কবি বিশেষে থাকে; নতুবা নাট্যকবিগণে যাবতীয় প্রকৃতির সংগতি বুঝিতে পারেন না। এই প্রযুক্ত নাট্যকবি-বিশেষের কোন কোন পাত্র সমধিক স্পষ্ট ও সুন্দররূপে বর্ণিত হয়, এবং অন্যান্য পাত্র অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ও অপ্রশংসনীয় হয়। প্রকৃতির সংগতি-বোধই নাট্যকবির সর্বপ্রধান গুণ, এবং অন্য সহস্র গুণ সত্ত্বেও যদি তাঁহার এই গুণের অভাব থাকে, তবে তাঁহার নাটক রচনা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃতির সংগতি কি প্রকার সামগ্রী, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিবার আকাংক্ষা রহিল।

বাংলা উপন্যাসের বিশেষত্ব

(দেবেন্দ্রবিজয় বসু)

নভেল বা উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীর সম্পত্তি। এ শতাব্দীতে অনেক নূতন দ্রব্যের আমদানী হইয়াছে। শিক্ষিত লোকের কাছে এ শতাব্দীর বড় আদর। কেননা তাহাদের বিশ্বাস, এ শতাব্দীতে রেলওয়ে টেলিগ্রাফের সৃষ্টির সহিত, সেইরূপ দ্রুত গতিতে, সমগ্র মানবজাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উন্নতি হউক আর না হউক, একটা যে ঘোরতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই শতাব্দী মধ্যে মানবজীবনের গতি অন্য পথে ফিরিয়াছে। এ শতাব্দীর মূল মন্ত্র—স্বার্থ; কার্য—Struggle for existence অথবা Trampling the weak। ইহার একমাত্র যোগ অর্থ সংগ্রহ—একমাত্র সাধনা, আত্মসুখ-বৃদ্ধি। এ শতাব্দীর অভিধান হইতে 'পরকাল' কথা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—'ইহকাল' সার হইয়াছে। উৎকট সুখ, আমোদ বা ভোগের দিকে একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। এ শতাব্দীতে নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞান কেবল মানুষের বিনাশের জন্য নানারূপ নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। দর্শন—ঈশ্বর ও পরকাল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাস—রক্তাক্ষরে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিতেছে।

সুতরাং সাহিত্যও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। এই সুখভোগ প্রবৃত্তি সাহিত্যকেও নূতন করিয়া সংগঠিত করিয়াছে। পূর্বে সাহিত্য আমাদের শিক্ষার উপকরণ যোগাইত। আর আমাদের জ্ঞানবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি ও আর সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন হইত। এখন বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ জন্য সাহিত্যের উপরও লোকের দৃষ্টি পড়িল—বিলাস-কামনা মানুষকে চারিদিক হইতে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। যখনই একটু অবসর পাইল তখনই

মানুষ কেবল আমোদ খুঁজিতে লাগিল। সাহিত্য সেবা করিতে হইবে, সেও আমোদের জন্য—আরামের জন্য।

আমাদের দেশেও বিলাতী সভ্যতার অনেকগুলি উপকরণের আমদানী হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্যেও বিলাসের উপকরণ প্রবেশ করিয়াছে। অনেকটা সেই কারণে আমরা বাংলা সাহিত্যেও অনেক নভেল বা উপন্যাস দেখিতে পাই।

সে যাহা হউক, প্রথম অবস্থার নভেল যেরূপই থাকুক, দ্বিতীয় স্তরে উহার অনেক অবস্থা পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা সেই দ্বিতীয় স্তরের কথাই বলিব। গল্প আবালবৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জন করে, সুতরাং গল্প উপলক্ষ্য করিয়া দ্বিতীয় স্তরে অনেক প্রতিভাশালী লোক সাধারণকে নৈতিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সহজ করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, সমাজতত্ত্বের কূট বিষয় সাধারণের বুদ্ধিগম্য করিতে চেষ্টা করিলেন—মানুষের হৃদয় বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন, বাহ্যজগতের সহিত মানব মনের সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে লাগিলেন। কেহ বা উপন্যাসকে আপনার কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তির শিল্পচাতুর্যের বা উৎকৃষ্ট কবিত্ববিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র করিয়া লইলেন। অন্যদিকে অনেক হৃদয়বান লোক উপন্যাসরূপ উপকরণ দ্বারা সাধারণকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিলেন। এখন অনেক উপন্যাস হইয়াছে, যাহার গল্পাংশ নামমাত্র বা উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু যাহাতে ভাবিবার, বুঝিবার বা চিনিবার জিনিষ অনেক আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেও ইউরোপে উপন্যাস ছিল, আর আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আগেও এদেশে উপন্যাস ছিল। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর উপকরণে কিছু বিশেষত্ব আছে। ওদেশের ইলিয়ড্, ইনিয়ত, অডেসির সহিত আমাদের দেশের মহাভারত, রামায়ণ বা পুরাণের বিশেষত্ব আছে। ওদেশের বাকেসিওর, ডিকামিরণ, ডনকুইকসট্ প্রভৃতির সহিত এদেশের কাদম্বরী বা দশকুমার চরিতের পার্থক্য আছে। সে দেশের ঈষপের গল্পের সহিত আমাদের দেশের পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ বুঝিলে আমরা আধুনিক দেশী

ও বিদেশী নভেলের পার্থক্য বুঝিতে পারিব। কেন না যে কারণে পূর্বে উক্তরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছিল। সে কারণ এখনও অনেকটা বিদ্যমান আছে।

এই বিশেষত্বের প্রথম কারণ, হিন্দুর ধর্মভাব। এই ধর্মভাব কিরূপ হিন্দুর হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া আছে—ইহা কিরূপে হিন্দুর প্রত্যেক কার্য নিয়মিত করিতেছে, তাহা আর হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। এই জন্য, উপন্যাস লিখিতে গিয়াও হিন্দু এই ধর্মভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই। হিন্দুর কাব্য ইতিহাস প্রায় সকলই ধর্মগ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর নাটক নভেলেও এই ধর্মভাব প্রবেশ করিয়াছে। আগেকার কথা ছাড়িয়া দাও, এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রাপ্ত দেশে এখন থিয়েটারে ধর্মগ্রন্থ অভিনীত হইতেছে, উপন্যাসে ধর্মতত্ত্ব বুঝান হইতেছে, কাব্যে (কুরুক্ষেত্র প্রভৃতিতে) ধর্ম প্রবেশ করিয়াছে।

আরও এক কথা আছে। পিতৃমাতৃভক্তি, সন্তান-বৎসলতা, দাম্পত্য প্রণয়, দেশভক্তি প্রভৃতি আমাদের যে সকল মনোবৃত্তি আছে ঈশ্বরে ভক্তি অথবা সাধারণ ধর্ম প্রবৃত্তিও সেইরূপ আমাদের মনের একটা অতি প্রধান বৃত্তি। এই ভক্তি-বৃত্তি বা ধর্মভাব কতরূপে মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইতে পারে—কিরূপে তাহা মানুষের অন্য সমস্ত বৃত্তির উপর একাধিপত্য করিতে পারে, তাহা জগতের মধ্যে কেবল হিন্দু কবিই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, বশিষ্ঠ, প্রভৃতির চরিত্র-সৃষ্টি কেবল একমাত্র হিন্দু কবিই করিতে পারিয়াছিলেন। আজিও হিন্দু-কবি ধর্মজীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করেন। ধর্মবৃত্তির স্ফূর্তি, পরিণতি ও প্রভাব দেখাইতে যত্ন করেন। তাই বিল্বমংগলে, দেবী চৌধুরাণীতে বা চন্দ্রশেখরে কবি ধর্ম-চরিত্র অংকিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপে ধর্ম-প্রবৃত্তির বুঝি এত স্ফূর্তি হয় নাই। সেখানে এত নভেল, নাটক ও কাব্য সৃষ্টি হইলেও, একখানা নভেল কি নাটকে এই ধর্ম-বৃত্তির গতি ও কায দেখাইতে চেষ্টা করা হয় নাই। হুগো, ব্যালজাক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—লেখকগণ মানুষের এক একটা বৃত্তি লইয়া, অন্য সমুদায় বৃত্তিগুলিকে তাহাতে ডুবাইয়া, শুধু একটি

বৃত্তিকে অত্যন্ত প্রবল করিয়া কৌশলে তাহার গতি ও পরিণতি এবং মনুষ্য হৃদয়ের উপর তাহার আধিপত্য বুঝাইয়াছেন। যেন এই বৃত্তি-গুলিকে একে একে লইয়া, তাহাদের রক্ত মাংসের শরীর দিয়া মানুষ সাজাইয়া তাহার কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কেহই ধর্ম-বৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। এই ধর্ম-বৃত্তির বিশ্লেষণ হিন্দুর নিজের সম্পত্তি আর ইহাই বিলাতী ও দেশী উপন্যাসের পার্থক্যের প্রধান কারণ।

এই পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ—হিন্দুর দর্শন। হিন্দু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার এই দুইটি শক্তি মানুষকে নিয়মিত করে। ইউরোপীয় দার্শনিকগণ Free will & Necessity লইয়া বহুদিন ধরিয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়া, শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে Necessity-ই সব; অর্থাৎ মানুষ সব ঘটনাচক্রের দাস—অবস্থার ক্রীড়া-পুত্তলি, তাহার স্বাধীন ইচ্ছা নাই—কেননা, সে ইচ্ছাও এই অবস্থার দ্বারা নিয়মিত। সুতরাং হিন্দুর অদৃষ্টবাদ ও ইউরোপের অদৃষ্টবাদে অনেক প্রভেদ। আর এই প্রভেদ জন্য দেশী ও বিলাতী চরিত্র-সৃষ্টিতেও প্রভেদ জন্মিয়াছে। বিলাতী দর্শন মতে মানুষ যেন কাদার ডেলা, কি মোমের বাতি, ঘটনার পর ঘটনা আসিয়া তাহাকে বাছিয়া ছাঁকিয়া একরূপ করিয়া গড়িয়া লয়। বিলাতী দর্শনকার মানুষের পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না। মাতৃগর্ভে তাহার প্রথম জন্ম হয়—এবং সে কেবল পিতামাতার নিকট কিছু সংস্কার লইয়া এই সংসারে প্রথম প্রবেশ করে। কাজেই সংসার তাহাকে গড়িয়া লয়।

হিন্দুর মতে মানুষ পূর্বজন্মার্জিত সংস্কার আচরণে আবৃত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে আবরণ বড কঠিন। শম্বুকের বাহিরের খোলার মত কঠিন। সংসারের ঘটনার পর ঘটনার আঘাতে তাহা ভাংগিয়া যায় না, তাহার আকার বড় পরিবর্তন হয় না। যদি ভাংগে তবে বোধ হয় তাহার জীবত্ব পর্যন্ত লোপ হয়। হিন্দুর মতে মানুষ অদৃষ্টরূপ হল (Hall) মার্কা রূপা। তাহাতে বড় খাদ চড়ে না।

এই দুই দার্শনিক মতের পার্থক্য হইতে দেশী ও বিলাতী উপন্যাসে

. কাব্যে চরিত্র-সৃষ্টির প্রভেদ হইয়াছে। বিলাতী উপন্যাস-লেখক ঘ নার পর ঘটনা আনিয়া তাহার দ্বারা মনুষ্য চরিত্র গড়িয়া লন—বা : ত্রের কার্যপ্রণালী দেখাইয়া দেন। মানুষের চারিদিকের অবস্থাগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দ্বারা চরিত্র সৃষ্টি করেন। *

হিন্দু-উপন্যাস-লেখককে সেরূপে মনুষ্য চরিত্র বুঝাইতে হয় না। হিন্দু-উপন্যাস-লেখক দেখাইতে চান যে, বাহ্য ঘটনায় বা অবস্থায় মনুষ্যকে বড় পরিবর্তিত করে না। সে অবস্থাগুলি অর্থাৎ মানুষের চারিদিকের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অবস্থাগুলি তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে; কিন্তু অভিভূত করিতে পারে না—ভাঙ্গিতে পারে কিন্তু নোয়াইতে পারে না।

এই জন্যই দেখা যায়, হিন্দু কবি প্রায়ই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন। পূর্বেকার রামায়ণ, মহাভারত হইতে আধুনিক উপন্যাস পর্যন্ত সর্বত্রই হিন্দু কবির চেষ্টা, আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি। অদৃষ্ট ও পুরুষাকারের সহিত যুদ্ধে, পুরুষাকারের জয় ঘোষণা করাই হিন্দু কবির প্রধান উদ্দেশ্য। আদর্শ চরিত্রে পুরুষাকারের প্রাধান্য দেখান হয়, সংসারের বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের সহিত সংগ্রাম করিয়া, মানুষ আপনার মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে, ইহাই দেখান হয়। এই আদর্শ চরিত্র মানুষের শিক্ষার স্থান। এই

"উচ্চতর আদর্শ সৃজন,
জীবনের আঁধার সাগরে
নাবিকের আলো নিদর্শন।"

---

* Literature is following, as it always must, the metaphysics or antimetaphysics which prevail in its time; and we observe accordingly a marvellous decline in the poetical value of the writings now held up to our admiration. A crude and violent Realism, falsely so-called, usurps the place of honor, while trifling personal gossip fills our journals and is advertised as the most notable attraction at every railway bookstall.

Ninteenth Century, May, p. 719.

কিন্তু ইউরোপীয় কবিগণ কাব্যে বা উপন্যাসে প্রায়ই এরূপ আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, অর্জুন প্রভৃতির ন্যায় আদর্শ চরিত্র কোন পুরাতন ইউরোপীয় কাব্যে চিত্রিত হয় নাই। পূর্বেকার কথা যাউক, আমাদের দেশের চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সত্যানন্দ, সূর্যমুখী, লবংগলতা, প্রফুল্ল ও শ্রীর মতও আদর্শ চরিত্র-চিত্র বিলাতী নভেলে বড় বেশী পাওয়া যায় না। * এই আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, মানুষকে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দেওয়া। হিন্দুর আজিও শিক্ষার প্রবৃত্তি আছে, তাই এ আদর্শ চরিত্র চিত্র চলিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের লোক কাব্য ও উপন্যাসের শিক্ষা বড় চাহে না। তাহারা আমোদ চায়, চিত্ত-রঞ্জন চায়। সেইজন্য ইউরোপে আদর্শ চরিত্র বড় চিত্রিত হয় না।

পূর্বোক্ত হিন্দুর দর্শনের বিশেষত্ব হইতে উপন্যাসে আর একরূপ বিশেষত্ব হইয়াছে। হিন্দু কার্যানুসন্ধান করেন—ইউরোপীয় দার্শনিক কারণানুসন্ধান করেন। হিন্দুর চিন্তাপ্রণালী a'priori, ইউরোপীয় চিন্তাপ্রণালী a Posteriori। হিন্দু সেইজন্য উপন্যাস ও কাব্যে চরিত্র সৃষ্টি করেন—ইউরোপীয় কবি দার্শনিক চরিত্র-বিশ্লেষণ করেন মানুষ বিশেষ অবস্থা অনুবর্তী ঘটনার সহিত কিরূপ সংগ্রাম করে, চরিত্র সৃষ্টি করিয়া হিন্দু-কবি তাহাই দেখান। বিলাতী কবি, ঘটনার দ্বারা—অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্র কিরূপে পরিবর্তিত হয়, গঠিত হয় আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয়, তাহাই দেখান। হিন্দুর চরিত্র-চিত্র synthetic। বিলাতী কবির চরিত্র-চিত্র analytic। একজন প্রাণ-বিশিষ্ট জীবের বিশেষত্ব দেখান; আর একজন শবচ্ছেদ করিয়া ভিতরের শিরা, ধমনি বা হৃদয়ের অবস্থান বা বিশেষত্ব বুঝাইয়া দেন। একজন স্থপতি—বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দর্শককে মোহিত করেন; আর একজন, পুরাতন প্রাসাদ ভাংগিয়া, তাহার কোন্ স্থান জীর্ণ হইয়াছে,

* পণ্ডিত চূড়ামণি রাস্কিন তাঁহার Queen's Gardens শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে বিলাতী কবি সেক্সপীয়র বা স্কট্ কেহই বড় আদর্শ নর-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই, কয়টি বিলাতী আদর্শ নারী চরিত্র পুষ্টি করিয়াছেন মাত্র। অন্য কবির ত কথাই নাই।

দেখাইয়া দেন বা ইটকাঠের পরিমাণ করেন। একজন জীবন্ত মানুষকে দেখান, সমাজতত্ত্ব বুঝান ; আর একজন মানুষ মারিয়া তাহার শবচ্ছেদ করিতে বসেন, সমাজ ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরের ক্ষত বাহির করেন। একজন, গড়েন, আর একজন ভাঙ্গেন। এই কারণে দেশী উপন্যাসের আর এক বিশেষত্ব হইয়াছে। ইউরোপীয় কবি চরিত্র বুঝাইবার জন্য বাহ্য জগতের সহিত মানবমনের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য বাহ্য ঘটনা-গুলিকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন। এই ঘটনার সহিত মানব-মনের ঘাতপ্রতিঘাত পুংখানুপুংখরূপে অংকিত করেন। রামা মুদী বা পুঁটে তেলী যে কোন লোকের হউক, চরিত্র লইয়া তাহার বিশ্লেষণ করিতে বসেন। সে কোন দিন কি দিয়া ভাত খাইল, কোন মুখে গিয়া কাহার সহিত কিরূপ কথা কহিল, খুঁটীনাটী সমস্তই বিলাতী কবি অংকিত করেন। বিলাতী পাঠকের ও ধন্য সহিষ্ণুতা, ধন্য পরচর্চা-প্রবৃত্তি যে সেই সব পড়িয়া আমোদ পান।

হিন্দু কবি কখনও এত খুঁটীনাটী বিচিত্র করিতে চান না। আর সেরূপ খুঁটীনাটী চিত্রিত করার তাহার প্রয়োজনও হয় না। হিন্দু-কবি ওয়েলপেন্টিং করেন—বিলাতী কবি ওয়াটার—কলার পেন্টিং করেন। কাছে হইতে ওয়েল পেন্টিং বড় কদাকার দেখায়। বোধ হয় যেন কতকগুলা রং যথেচ্ছা লাগান হইয়াছে—যেন রং ধেবড়ে আছে প্রায় যেন কালীঘাটের পট। তাহাতে একটা সূক্ষ্ম লাইন নাই—সব মোটা। কিন্তু সেই চিত্রই আবার দূরে উপযুক্ত স্থানে ধরিলে অমূল্য বলিয়া মনে হইবে—কবিত্বের, সৃষ্টি-কৌশলের চরম বিকাশ বলিয়া বোধ হইবে। ওয়াটার-কলারের ছবি হঠাৎ চটকদার বটে তাহাতে সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম লাইনগুলি বেশ ফুটান থাকে, কাছ হইতে বেশ সুন্দর বোধ হয়। কিন্তু ওয়াটার পেন্টিং যত ভাল হউক না, তাহার ওয়েল-পেন্টিংয়ের সহিত তুলনাই হয় না। ওয়াটার-কলার পেন্টিংয়ের মূল ছবি বুঝাইবার জন্য আস্‌পাশ যেমন পরিষ্কার করিয়া আঁকিতে হয়, বিলাতী নভেল-লেখক সেইরূপ আসপাশে অধিক লক্ষ্য রাখেন। যে ওয়েলপেন্টিং করে তাহার সেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয় না।

এই বিশেষত্বের আর এক ফল—দেশী উপন্যাস খুব বড় হয় না। যে চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে বা যে ঘটনা চিত্র করিতে দেশীয় কবির বিশ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হয়—বিলাতী কবির সেখানে অন্তত এক শত পৃষ্ঠা চাই। অল্প করিয়া, সহজ করিয়া সমস্ত বুঝান উচ্চ দরের কবির কাজ। কোন সমালোচক বলিয়াছেন, "Talent for easy writing—which is easy reading is almost unknown among German Novelist." জার্মান নভেল লেখক কেন—প্রায় সকল ইউরোপীয় নভেল লেখকের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। উক্ত সমালোচক (G. Gordon) বলিয়াছেন,—

"Can any one point out to us one of their novelists, who is capable of making his hero and heroine enter a room, at the very climax of their fate, without delaying the catastrophe, to tell us, that it is a square room, with four walls, and three windows, that each window has two white muslin curtains, carefully tacked back, that there are six chairs and a sofa ; * * * We may be thankful if we are spared a description of the artificial ivy in the windows, and the vienna pianoforte, if the scene lies among such luxuries." অর্থাৎ ইউরোপীয় নভেল-লেখকগণের খুঁটীনাটীর দিকে দৃষ্টি এত অধিক যে, বিয়োগান্ত উপন্যাসে বিষাদের শেষ ভীষণ দৃশ্য দেখাইবার সময় ও আনুসংগিক সামান্য বিষয়ের বিবরণ না দিয়া থাকিতে পারেন না। এই সমালোচক আর একস্থানে বলিয়াছেন,—"If men write profusely, what do the women do ? If they use ten words when five would do and tell how many branches there are on every tree in the landscape, the women, good souls, count the leaves on each twig with an abundance of exclamations and expletives which take away one's breath."

অর্থাৎ বিলাতে এই বিষয়ে মহিলা উপন্যাস লেখকগণ, পুরুষ উপন্যাস-

লেখকদের ছাপাইয়া উঠিয়াছে, একজন ডালে ডালে বেড়ায়—আর একজন পাতায় পাতায় যায়। সুখের বিষয় যে, বিলাতী অনুকরণ-প্রবৃত্তি বসে আমাদের দেশে উপন্যাসে এখনও এ দোষ বড় দেখা যায় নাই।

এই বিশেষত্ব হইবার আর এক কারণ, হিন্দু অল্প কথায় চিরকালই অনেক ভাব ব্যক্ত করিতে পারে। পূর্ব হইতেই হিন্দু কবি-দার্শনিক-দিগের মধ্যে এই প্রথা প্রবর্তিত আছে। সূত্র যুগে এই প্রথার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। টীকা বা টীকার সূত্র না হইলে সূত্র বুঝা যায় না। অনেক সময় মল্লিনাথ না থাকিলে কাব্যও বুঝা যাইত না। কাজেই পূর্ব হইতেই আমাদের দেশে অল্প কথায় অনেক ভাব বুঝাইবার ক্ষমতার চর্চা হইয়াছিল। হিন্দু কবি সেই জন্য আজিও বিলাতী শিক্ষা পাইয়াও এতদূর খুঁটিনাটীর দিকে যাইতে চাহেন না। ইহা আমাদের শুভগ্রহ সন্দেহ নাই। কেন না, "Art is long, life is short."। যে শিক্ষা চাহে, বৃত্তির অনুশীলন চাহে, কাব্য-উপন্যাস হইতে যে কেবল জ্ঞানার্জন করিতে বা চিত্তবৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্তি হয়, যে অসার আমোদ চাহে না—ঠাকুরাণী দিদির গল্প চাহে না, শ্যাম রাম কি দিয়া খায়, কেমন করিয়া শোয়, এ জানিতে ইচ্ছা করে না, লোকের কুৎসা করিয়া বা কুৎসা পড়িয়া সময় নষ্ট করিতে চাহে না—সংগী জুটিল না, সুতরাং তাস পাসা খেলা হইল না, বলিয়া নভেল পড়িয়া সময়টা কোন রকমে কাটাইতে চাহে না—তাহার পক্ষে ইহা শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে। তাহাকে অবগাহন জন্য বিস্তীর্ণ নদীতে নামিয়া সারা নদী ঘুরিয়া, বিঘত প্রমাণের অধিক জল না পাওয়ায়, বৃথা ফিরিয়া আসিতে হয় না। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করাই প্রকৃত কবিত্ব, যে তাহা পারে না, সে প্রকৃত কবি নহে। উহার উপন্যাসে যতই চটক থাকুক্ না কেন, প্রকৃত কবিত্ব তাহাতে নাই। "Brevity is the soul of wit." বিলাতী কবি তাহা বুঝে না।

হিন্দুর উপন্যাসে বা কাব্যে বর্ণনা-বাহুল্যের অভাবের আর এক কারণ আছে। হিন্দুর দূরদৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি উৎকট বিষয়গুলি হিন্দুর কাছে, এমন কি সামান্য কৃষকের কাছেও, এ সকল তত্ত্ব

প্রতিভাত। জ্ঞানের গভীরতা না থাকার জন্যই বলা, আর যে কারণেই বলা—এই সকল বিষয় হিন্দুর নিকট আলোময়। প্রাচীন আর্যঋষির শিক্ষা তাহার হাড়ে হাড়ে এইরূপ বিঁধিয়াছে। সে সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্যন্ত সমস্ত জগৎটাকে ভগবানের কৃপায় হস্তামলকবৎ দেখিতে পায়। যাহার এত দূরদৃষ্টি, সামান্য বিষয়ে তাহার কাজেই অমনোযোগ।

ইহা ছাড়া আর এক কথা আছে। কবির দর্শন দুইরূপ—এক দূরদর্শন, আর এক সূক্ষ্মদর্শন। একজন, দূরবীক্ষণ ধরিয়া আমাদের চর্ম-চক্ষের অগোচর বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের দূরস্থিত বিষয় দেখাইয়া দেন। উচ্চ হইতে আমাদের ডাকিয়া লইয়া উপরে তুলিতে চেষ্টা করেন। আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া আমাদের আহ্বান করেন। ব্যক্ত জড়ের অন্তরালে অব্যক্ত আত্মা দেখাইয়া জগতের সহিত, সংসারের সহিত আমাদের নূতন সম্বন্ধ পাতাইয়া দেন। আর একজন অনুবীক্ষণ ধরিয়া আমাদের সাধারণ চক্ষের অগোচর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বস্তুটীকেও দেখাইয়া দেন। হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশের অতি সংগোপনে লুক্কায়িত ভাবগুলির গতি ও প্রবৃত্তি বুঝাইয়া দেন ; বাহ্যজগতে সামান্য ফুল বা তৃণের মধ্যে এমন সৌন্দর্য এমন উদ্দীপনা, এরূপ ভাব দেখান যে, তাহা "Too deep for tears" হয় ; আমাদের অধীর করিয়া তুলে। তাঁহারা বিন্দুর মধ্যে ব্রহ্ম দেখেন, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নীচজাতীয়, দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় অভিভূত মানুষের মধ্যেও ব্রহ্মাস্ত্র বিধাতার বর্মহস্ত দেখান—সমস্ত জগতের অলংঘ্য নিয়মের ছায়াপাত করান।

এই দূরদর্শন হিন্দু কবির, আর সূক্ষ্মদর্শন পাশ্চাত্য কবির। আমাদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এই দূরদর্শন আছে। আর ইউরোপের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শেষোক্ত কবির রচিত, তাহাতে অন্তর্দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শন আছে। এ সূক্ষ্মদর্শনের জন্য বৃথা বাগাড়ম্বর প্রয়োজন হয় না—খুঁটি-নাটি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় না। যিনি প্রকৃত কবি—তাঁহার এরূপ কাব্যাংশে দোষ হয় না।

অতএব দেখা গেল, বিলাতী উপন্যাস Analytic বা বিশ্লেষণপূর্ণ, দেশী উপন্যাস Synthetic বা সংগঠন মূলক। বিলাতী নভেল

অধিকাংশ Realistic, দেশী উপন্যাস—Idealistic। দেশী উপন্যাস সৃষ্টি করে, বিলাতী উপন্যাস ধ্বংস করে। দেশী উপন্যাস আদর্শ গড়ে,—বিলাতী উপন্যাস আদর্শ ভাংগে। দেশী উপন্যাস সমাজ সংস্কার করে—বিদেশী উপন্যাস সমাজবিপ্লব ঘটায়। দেশী উপন্যাস আমাদের দূরবীক্ষণ দেয়, বিলাতী উপন্যাস অনুবীক্ষণ করায়। দেশী উপন্যাস অয়েল-পেন্টিং আর বিলাতী উপন্যাস ওয়াটার-কলার পেন্টিং। দেশী উপন্যাস শিক্ষা দেয়, বিলাতী উপন্যাস আমোদ দেয়। দেশী উপন্যাস ধর্মবৃত্তি অংকিত করে, ভক্তিবৃত্তির গতি ও কার্য দেখায়—বিলাতী উপন্যাস ধর্মবৃত্তির চিত্র অংকিত করে না, ধর্মতত্ত্ব বুঝায় না, কেবল বিষয়-বাসনা বাড়ায়। আমরা বিলাতী উচ্চশ্রেণীর উপন্যাসের কথা বলিতেছি, নতুবা বলিতাম যে, বিলাতী উপন্যাসে আমাদের অধর্ম বৃত্তি অংকিত করে, উত্তেজিত করে। দেশী উপন্যাসে মনুষ্যত্বের ও পুরুষাকারের স্ফূর্তি পায়—বিলাতী উপন্যাসে তাহা লোপ পায়। দেশী উপন্যাসে অদৃষ্ট ও দৈবের কথা মৌখিক, আত্ম-নির্ভরতার কথা, মনুষ্যত্বের কথা আন্তরিক; বিলাতী উপন্যাসে আত্ম-নির্ভরতা মৌখিক, অবস্থার আধিপত্য আন্তরিক। বিলাতী নভেলে বর্ণনায় বাহুল্য; দেশী উপন্যাসে বর্ণনা নিয়মিত। বিলাতী উপন্যাস, পণ্ডিতবর রাস্‌কিনের কথিত "Books of the hour", দেশী উপন্যাস—"Books for all times"। বিলাতী উপন্যাস নভেল, দেশী উপন্যাস নাটক। বিলাতী উপন্যাস ইতিহাস বা জীবন-চরিত, দেশী উপন্যাস কাব্য। বিলাতী উপন্যাসের কবি দ্রষ্টা (seer), তিনি মানবচরিত্র তত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব পর্যালোচনা করেন; দেশী উপন্যাসের কবি স্রষ্টা (creator) তিনি কাল্পনিক প্রকর্ষ-চরিত্র (ideal) সৃষ্টি করেন, অথবা নূতন ও কাল্পনিক সৌন্দর্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন। বিলাতী উপন্যাস Theorem বা উপপাদ্য, নির্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা চরিত্র বিশেষের নির্দিষ্ট কার্য-প্রণালী দেখান হয়; দেশী উপন্যাস Problem বা সম্পাদ্য, নির্দিষ্ট ঘটনার দ্বারা চরিত্র বিশেষের অনির্দিষ্ট কার্য-প্রণালী স্থির করা হয়। বিলাতী নভেলের চরিত্র প্রবৃত্তিবশে, অবস্থার বশে, necessity-র বশে, ঘটনা বিশেষে

অভিভূত হইয়া কার্য করে; দেশী উপন্যাসের চরিত্র নিবৃত্তির বলে, free will এর বলে, পুরুষাকারের জোরে, সংস্কারের বলে অবস্থাকে বশীভূত করিয়া, ঘটনাকে আয়ত্ত করিয়া কার্য করিতে পারে; তাহাই প্রধানত দেখাইতে চেষ্টা করা হয়। বিলাতী নভেলে নায়ক-নায়িকার (বা গল্পের প্রধান চরিত্রের) কথা থাকে, hero, heroine-এর সৃষ্টি থাকে না; দেশী উপন্যাসে নায়ক নায়িকার স্থলে প্রধানত hero, heroine-এর সৃষ্টি করা হয়। বিলাতী উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে এত মোহকর করিয়া চিত্রিত করা হয়—পাপীকে অবস্থার দাস বলিয়া তাহার পক্ষে এত ওকালতি করা হয় যে, তাহাতে আমাদের আকৃষ্ট করে। দেশী উপন্যাসে পাপকে ও পাপীকে তাহাদের স্বরূপ অবস্থায় দেখান হয়, তাহাতে পাপের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও পাপীর প্রতি দয়া জানাইয়া দেয়। পূর্বে বলিয়াছি, নভেল বা উপন্যাস সাধারণ পাঠককে বড় আকৃষ্ট করে। চুম্বক ও লোহকে আকৃষ্ট করে। চুম্বকের উত্তর-মুখী শক্তি, লৌহের দক্ষিণমুখী শক্তিকে সংযত করিয়া, তাহার উত্তরমুখী শক্তিকে সংযত করিয়া, তাহার উত্তরমুখী শক্তির স্ফুরণ করে। উপন্যাসেও সেইরূপ আদর্শচিত্র থাকিলে তাহা পাঠকের অধর্মবৃত্তি সংযত করিয়া ধর্মবৃত্তির স্ফূর্তি ও উন্নতি করিতে পারে। দেশী উপন্যাসে এই ধর্মবৃত্তি যত স্ফূর্তি করে, বিদেশী নভেল তত পারে না।

এস্থলে আর একটি কথার অবতারণা করা আবশ্যক হইতেছে। অনেকে উৎকৃষ্ট বিদেশী নভেলে শিল্প-চাতুর্য বা Art দেখিয়া মোহিত হন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে অগ্নি যেমন লৌহকেও দীপ্তিমান করে, Art-ও তেমনি কাব্য ও উপন্যাসের অনেক দোষ ঢাকিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের যেমন রূপ, কাব্যের তেমনি আর্ট বা শিল্পচাতুর্য। অনেকের কাছে রূপ অনেক দোষ ঢাকিয়া রাখে। কথায় বলে গোরা সর্ব-দোষহরা, কিন্তু যিনি আপনার সৌন্দর্য-জাল পাতিয়া অন্যকে কুপথে লইয়া যান, তাঁহার রূপ যেমন নিন্দনীয় ও সর্বথা পরিহারযোগ্য, আর যিনি সেই সৌন্দর্য-বলে Spiritual beauty-র আকর্ষণে অন্যের মনে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাকে উন্নত করেন—পবিত্র

করেন, তাহার মনে প্রেম ও আনন্দ উৎপাদন করেন, তাঁহার সৌন্দর্য যেরূপ প্রশংসার বা আরাধনার উপযুক্ত সেইরূপ, যে শিল্পী আশ্চর্য কৌশলে আদর্শ সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা আমাদের উন্নত করেন, তিনিই কেবল প্রশংসনীয়; কিন্তু যিনি সেই Art-এর অপব্যবহার করেন, তাহার মোহিনীজাল বিস্তার করিয়া আমাদের বৃথা আমোদ জন্মাইয়া অপথে লইয়া যান—তিনি নিন্দার পাত্র। Nineteenth Centuryতে কোন লেখক লিখিয়াছেন,—

"My faith is small in leaders or prophets, who varnish over with a little enthusiasm the ugliness of brute appetite."

একটা চলতি শ্লোকে আছে,—

"বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥"

যিনি সাধু, তিনি বিদ্যা, ধন বা শক্তির সদ্ব্যবহার করেন, কেবল খলেই তাহাদের অসদ্ব্যবহার করে; আর যে কবি-শিল্পী সাধু ও পূজনীয়, তিনি তাঁহার কবিত্ব-শক্তির সদ্ব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা উচ্চ ideal বা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া আমাদের নানারূপ বৃত্তির স্ফূর্তি ও উন্নতির চেষ্টা করেন। কিন্তু যে কবি-শিল্পী অসাধু, তিনি তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা আমাদের মোহিত করিয়া পদস্খলিত করাইতে চেষ্টা করেন। বাইরণ এত বড় কবি-শিল্পী হইলেও ধার্মিক লোকে তাহার মোহিনী শক্তির আকর্ষণের বাহিরে থাকিতে চাহেন। আমাদের মাইকেল এত বড় কবি হইলেও কালে, এই কারণেই, তাঁহার সিংহাসন অনেক নিম্নে স্থাপিত হইবে। সে যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। শুধু Art দেখিয়াই বিলাতী উপন্যাসের উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য নহে—ইহাই আমাদের বুঝিয়া রাখা কর্তব্য।

দেশী ও বিলাতী উপন্যাসের মধ্যে আরও এক পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য বাহ্য জগতের সহিত মানুষের সম্বন্ধ চিত্র লইয়া। হিন্দু-জগৎকে একবার দেখেন—জীবে আত্মদর্শন করেন, জড় প্রাণ উপলব্ধি করেন; কাজেই বাহ্য-জগতের সহিত হিন্দুর বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাহ্য প্রকৃতি, হিন্দুর জননীস্বরূপা। জীবের সহিত হিন্দুর ভাই-ভাই সম্বন্ধ—জড় তাহার প্রীতি। হিন্দু সূর্য-চন্দ্রের সহিত কমলিনী-কুমুদিনীর দাম্পত্য সম্বন্ধ পাতায়, ভ্রমরকে ফুলের প্রেমে মাতায়, প্রকৃতিকে লইয়া বালকের মত খেলা করে। সমুদ্র বা পর্বত দেখিয়াও তাহার এ ক্রীড়া, এ রংগ ঘুচে না। প্রকৃতি যখন তাহাকে বড় ভীষণ মূর্তি দেখায়, তখনও তাহার মধ্যে শক্তির কালীরূপে বিকাশ দেখিয়া তাহার ক্রোড়ে হাসিয়া লুকাইতে যায়। তাই বাহ্য জগৎ তাহাকে বড় অভিভূত করিতে পারে না। কিন্তু ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিকে বাহ্য জগতকে এভাবে দেখিতে পারে না। তাহাদের কাছে প্রকৃতি জড়রূপা সৌন্দর্যময়ী, মহিমাময়ী-বিশাল—sublime, grand beautiful। ইউরোপীয় কবি প্রকৃতিতে এই সৌন্দর্য উপভোগ করেন; আর যখন প্রকৃতি ভয়ংকর মূর্তিতে তাহার নিকট আসে—তখন সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই কারণে হিন্দু কবির প্রকৃতি-চিত্র ও বিলাতী কবির প্রকৃতি-চিত্র মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। সে প্রকৃতিতে কেবল সৌন্দর্য দেখিতে যায়, সে তাহাকে বিশ্লেষণ করে, উলংগ করে, তন্ন তন্ন করিয়া দেখে, তাহাকে প্রণয়িনী সাজাইতে চাহে। আর যে প্রকৃতি মধ্যে ঐশী শক্তি দেখিয়া মাতৃভাবে তাহার নিকট অগ্রসর হয়, সে কখনও প্রকৃতিকে এত বিশ্লেষণ করিয়া এত তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে দেখিতে পারে না, সে তাহার কেবল সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে না—সে তাহার কোলে বালকের মত মুখ লুকাইয়া জুড়াইতে চায়। তাহাকে **Fetish** বলিতে হয় বল, বালক বলিতে হয় বল, অশিক্ষিত বলিতে হয় বল, তথাপি সে তোমার কথা শুনিবে না। আশ্চর্য যে, যে পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রকৃতির দ্বারা, বাহ্য অবস্থার দ্বারা অভিভূত, প্রকৃতি যাহাকে ক্রীড়ার পুত্তলি করিয়াছে,

সেই প্রকৃতিকে লইয়া খেলা করে, তাহাকে মানে না। আর যে প্রকৃতির আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে পারে, দূরে থাকিতে চায়, প্রকৃতিকে যে মায়া বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, এই হিন্দুই প্রকৃতির শক্তি নিদর্শনে মোহিত হইয়া, চক্ষু অর্ধ নিমীলিত করিয়া, বালকের মত তাহার সহিত ক্রীড়া করে।

যে কারণেই হউক, দেশী ও বিদেশী কবি প্রকৃতিকে ভিন্ন রূপে দেখিয়া থাকেন ও বুঝাইয়া থাকেন ও সেই জন্যই দেশী ও বিদেশী উপন্যাসে এই স্বভাব—বর্ণনায় ও প্রকৃতি ও প্রকৃতি-চিত্রণে কিছু পার্থক্য প্রবেশ করিয়াছে, রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধেও তাহার বিশেষত্ব আছে। এই সমস্ত বিশেষত্বের জন্য পূর্বকার দেশী ও ইউ-রোপীয় কাব্যে অনেক পার্থক্য হইয়াছিল। ইউরোপের উপন্যাসে ও ইউরোপীয় কবি, এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছেন। আর যদি তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবি বাংলার উপন্যাস রচনা প্রবর্তিত না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত হিন্দুর কবির যে বিশেষত্ব, তাহা বাংলা উপন্যাসে দেখা যাইত না। তাহা হইলে হয়ত বাংলা উপন্যাস বাংলাভাষায় লেখা বিলাতী উপন্যাসের সমান হইত।

(নব্য ভারত, ১৩০১)

ছোট গল্প

আমাদের সাহিত্যে ছোট গল্প বড় অনেক দিন প্রচলিত হয় নাই। বংকিমচন্দ্র যে কয়টি ছোট গল্প লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার দুইটিকে বর্ধিত করিয়া উপন্যাসে পরিণত করিতে গিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্প দুইটি তাঁহার উপন্যাসের পার্শ্বে নিতান্ত ম্লান। মাসিক পত্রে মাঝে মাঝে ছোট গল্প দিবার চেষ্টা প্রথম 'সাহিত্য' হইতে আরম্ভ। সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য আমরা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে "বুল্‌স্ আই"—লণ্ঠনের আলোক যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্প রচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া, তাহাকেই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারে সেই একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাই সে লণ্ঠনের আলোকের কার্য। যেমনই বিচিত্র সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, উত্থান-পতন, সংঘাতময় জীবনে একটা ছোট ঘটনা, অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্যদানই গল্প রচনাকৌশলের কার্য। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে, প্রকৃত ছোট গল্পের আদর্শ ফরাসী সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—ইংরাজী সাহিত্যে নহে। ফরাসী গল্প প্রকৃত শিল্প; ইংরাজী গল্প শিল্পচাতুরীবিহীন বাক্যস্তূপ মাত্র। ইংরাজী গল্প লেখকদিগের মধ্যে কেবল টমাস্ হার্ডি প্রভৃতি দুই চারি জন ছোট গল্পের রচনায় কৃতকার্য হইয়াছেন। বহু দোষ সত্ত্বেও কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পগুলি প্রকৃতই শিল্প কার্য।

সম্প্রতি "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে মিষ্টার ওয়েডমোর ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রারম্ভেই লেখক বলিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক বলিয়াছেন,—জীবনের রংগমঞ্চে যাহারা বিফলমনোরথ, তাহারাই নাট্যশালার রংগমঞ্চে বিশেষ প্রশংসিত হয়। একজন সংবাদপত্রসেবক বলিয়াছেন,—পাঠকগণ বিদ্যা চাহে না; লিখিত বিষয়ে লেখকের বিদ্যা যত অল্প, তাঁহার রচনা পাঠকসমাজে তত অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। থ্যাকারেও একস্থানে বলিয়াছেন, পঞ্চাশোর্ধে আর কাহারও প্রণয়ঘটিত উপন্যাস রচনা করা কর্তব্য নহে; কারণ ততদিনে প্রণয় ব্যাপারে তাঁহার কিছু অধিক অভিজ্ঞতা জন্মে। এ হিসাব দেখিতে গেলে, যাহারা উপন্যাস রচনায় অকৃতকার্য হইয়াছেন; তাহারাই ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধ হস্ত হইবেন। কথাটা কি ঠিক? কখনই নহে। সাহিত্য-শিল্প-হিসাবে ছোট গল্প উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র জিনিস। ছোট গল্প নানা প্রকারের হইতে পারে। একটা কোনও বৃত্তান্ত, একটা পরীর গল্প, একটা চরিত্র বিবৃতি, একটা অদ্ভুত বৃত্তান্ত, একটা বর্ণনা, একটা কোন নীচ ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। কিন্তু ছোট গল্প আর যাহাই হউক উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নহে 'সনেট' ও মহাকাব্য, এতদুভয়ে যত প্রভেদ, ছোট গল্প ও উপন্যাস, এতদুভয়েও তত প্রভেদ। এই কথাটা না বুঝাতেই অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ছোট গল্পের রচনা নিতান্ত সহজ মনে করিয়া উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করিয়া মনে করিয়াছেন—ছোট গল্প রচনা করা হইল। দুই প্রকার রচনার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা "শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়া" বসেন। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদিগেরই যখন এমন ভ্রম হয়, তখন সাধারণ লোকের এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য নহে। যাহারা সাহিত্য-শিল্প-বিচারে অক্ষম—যাঁহাদিগের বিশ্বাস—উপন্যাস কেবল শ্রান্তি দূর করিবার জন্যই রচিত, তাঁহারা যে সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য বুঝিতে পারিবেন না; ইহা একরূপ নিশ্চিত। যাহারা উপন্যাস পাঠকালে

চিত্রিত চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল উপন্যাসের আখ্যান বস্তু (plot) পাঠ করেন, তাঁহারা কিছুতেই ছোট গল্পের প্রশংসা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মাধুরী বুঝিতে পারিবেন না।

উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পে অধিক বৈচিত্র্য-বিকাশ সম্ভব। উপন্যাসের রচনাপ্রণালী ত ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতেই পারে—তদ্ভিন্ন আবার আরও কতকগুলি রচনাপ্রণালী আছে, যাহা উপন্যাসের উপযোগী না হইলেও, ছোট গল্পে প্রযোজ্য। প্রথমে আমরা উপন্যাসে ও ছোট গল্পে সাধারণত ব্যবহৃত রচনা-প্রণালীর উল্লেখ করিব। সাধারণত অনুসৃত এই প্রণালীতে লেখক বর্ণিত বিষয়াভিজ্ঞ তৃতীয় ব্যক্তির মত রচনা করেন। অস্মদ্দেশে দৃষ্টান্তস্বরূপ বংকিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর এক প্রকার রচনা প্রণালীও অনেক সময় উপন্যাসে ও ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সে প্রাণালীতে লেখক বর্ণিত চরিত্র সকলের মধ্যে একজন হইয়া বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বংকিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিষয় বিশেষে নিপুণ লেখকের হস্তে এই রচনা প্রণালী অধিকতর সহজে প্রয়োগ করা যায়। ডিকেন্সের মত পাকা লেখকও কেবল David Copperfield গ্রন্থে এই রচনাপ্রণালীর প্রয়োগে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত অল্প-ক্ষমতাবিশিষ্ট লেখকগণ এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিতে গিয়া কেবল গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার প্রশংসায় গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া থাকেন। উপন্যাসে ও ছোট গল্পে আর একপ্রকার রচনাপ্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহাতে গল্পের বিষয়ীভূত চরিত্র সকলের পত্রে গল্পাংশ বিবৃত হয়। সুদীর্ঘ উপন্যাসে এ প্রণালী অনেক সময় বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়;—এই প্রণালী ছোট গল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে লেখকদিগের পত্রে প্রত্যেকের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যে বোধ করি ১২৯৯ বংগাব্দে "সাহিত্যে" প্রকাশিত "প্রাইভেট—টিউটার" নামক গল্পই এইরূপ প্রণালীর সর্বপ্রথম * ও * * *

রচনা। অনেক সময় এই তিন প্রকার রচনাপ্রণালী মিশ্রিত করা হইয়া থাকে; তবে সেই মিশ্রনোৎপন্ন রচনাপ্রণালী উপন্যাসেরই বিশেষ উপযোগী। কেবল কথাবার্তাতেও ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করিলে, নাটকের নিয়মাধীন হইতে হয়; অথচ নাটকের বিশেষ সুবিধা আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল কথাবার্তায় গল্প শেষ করিলে যেন কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডায়েরী হইতে উদ্ধৃতাংশের আকারেও ছোট গল্প লেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে লেখকের যেমন ক্ষমতার আবশ্যক, পাঠকেরও তেমনি ক্ষমতা আবশ্যক। যে পাঠক একবারমাত্র চক্ষু বুলাইয়া পাঠ শেষ হইল মনে করেন,—তাঁহার পক্ষে ডায়েরী আকারে ছোট গল্প প্রীতিপ্রদ হইবে না।

ছোট গল্পে যেখানে কথাবার্তা প্রচলিত করিলেও চলে, সেখানেও অনেক সিদ্ধহস্ত লেখক কথাবার্তা পরিহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল্‌জাকের ছোটগল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রণালী ছোটগল্পে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দয সংবর্দ্ধক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অন্য সকল প্রকার রচনার ন্যায় ছোটগল্পও লেখকের প্রতিভার উপর নির্ভর করে। ডোডের সর্বোৎকৃষ্ট ছোটগল্পটীর কথাই ধরা যাউক। সেটির আখ্যান-বস্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পথের দুই পার্শ্বে দুইটি পান্থ-নিবাস—একটী কোলাহলহীন, বিষাদময়; অপরটী শব্দমুখরিত, উন্নতিশীল। প্রাচীন পান্থনিবাসের অধিকারী নূতন পান্থনিবাসে তাহারই পুরাতন অতিথিদিগের সহিত আমোদে মত্ত—ব্যবসা হারাইয়া নূতন পান্থনিবাসে একজন পরিত্যক্তা রমণী শূন্য-হৃদয়ে, শূন্য-আলয়ে দিন কাটাইতেছে। তাহার অন্ধকারময় জীবনে আর বিন্দুমাত্র আলোকবিকাশ নাই। এই সামান্য গল্পটাকে ডোডের রচনাকৌশল কি মধুর, কি করুণ, কি হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে।

উপন্যাসে বা ছোটগল্পে স্বভাববর্ণনা অতি বিস্তৃত হওয়া অনুচিত; ঔপন্যাসিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্ নহেন। তাঁহার পক্ষে খুঁটিনাটি দেখা অনাবশ্যক।

সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষে সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ বিশেষ আবশ্যক। ভার্জিল হইতে ব্রাউনিং অবধি প্রধান সাহিত্য-শিল্পিগণ এ কথা ভুলেন নাই। ছোটগল্পে ইহা আরও আবশ্যক। ছোটগল্পে যেখানে কথোপকথন ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রত্যেকের কথার বিশেষ উপযোগিতা থাকা চাই। উপন্যাসে দুইটা বাজে কথা ব্যবহার করা চলে—ছোটগল্পে তাহা নিষিদ্ধ। সাধারণ পাঠক হয়ত সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সমালোচকের, শিল্পীর চক্ষে তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। সেইজন্য ছোটগল্প ধীরে ধীরে রচনা করা ও বহুবার সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। সাধারণত উপন্যাসেই হউক, আর ছোটগল্পেই হউক, কথোপকথন ব্যবহার করা বড় সহজ নহে। হাস্যরসের অবতারণায় দুই একটা বাজে বকুনিও অসংগত নহে, কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের অবতারণায় অনেক সময় কথোপকথন ব্যবহারে রচনার সৌন্দর্যহানি হইয়া থাকে।

পাঠক ও ছোট গল্প

নাটকের মত ছোট গল্পেও প্রতি ছত্র দর্শকের বা পাঠকের মনে বিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তবে নাটকে যে প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইলে হয়, ছোট গল্পে সে ভাবও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবার এক হিসাবে নাট্যকারের অসুবিধা অধিক; কারণ দর্শকদিগের মধ্যে সকল প্রকারের লোক থাকে; তাহাকে সকল দর্শকের মনস্তুষ্টিবিধান করিতে হয়। ছোট গল্পের লেখককে তাহা করিতে হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলে কেবল সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য রচনা করিতে পারেন।

আজকাল অনেক লেখক রচনাকৌশলের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া থাকেন; তাহা ভাল ভিন্ন মন্দ নহে, কারণ সাহিত্যে কোনও রচনা স্থায়ী করিতে হইলে, তাহা সুলিখিত হওয়া আবশ্যক। রচনা-কৌশলও সাহিত্য-শিল্পের একটা প্রধান অংগ। তবে যাঁহারা কথার বাহার খুঁজিতে গিয়া ভাবদৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভাষার

সৌন্দর্য বাড়াইতে গিয়া রচনা ফেনাইয়া অতিশয় বিস্তৃত করিয়া ফেলেন, তাহারা প্রকৃত শিল্পীর রচনা-কৌশলে অনভিজ্ঞ।

ছোট গল্পে মৌলিকতা ও আন্তরিকতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার আধিক্য হেতু পাপের প্রত্যেক পৈশাচিক খুঁটিনাটির বর্ণনা করেন, যাহাদের বর্ণিত চরিত্র পাপের পূতিগন্ধময়, তাহাদের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি? সে সকল 'Dyspoptic pessimist'-এর বাস্তবাদর্শপ্রিয়তা রোগ-বিশেষ। এই বিষয়ের বিচারকালে জর্জ গিসিংএর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফ্রান্সে এখন বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার বিকৃতাংশ অনাবৃত। গীদে মোপাসাঁ আপনি এই স্বতন্ত্র পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোপাসার জীবনে বিষাদপ্রবণতার অভিসম্পাত ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে আপনার রচিত পথ আপনার পক্ষে সুগম ও অপরের পক্ষে আলোকোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাই যাহারা ছোট গল্প রচনায় তাহার অনুসরণ করিতেছেন, তাহারা সফল হইতে পারিতেছেন না।

বাংলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক

লিটিরেরি গেজেট নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাংলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাংকিত করিয়াছেন পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্য-রচনায় এতদ্দেশীয় লোকদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাংলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসনারি সাহেবরা ইহার পূর্বে গদ্যরূপে ধর্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংলণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকদের বোধগম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার রাজাবলী নামক গ্রন্থ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন। অতএব তদ্বিষয়ক আমাদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাংলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

পরে পুরুষ পরীক্ষা নামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায় নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্বক কহেন যে রাজাবলী হইতে ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশ হওনের পর যে প্রথম বাংলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয়

তাহা রামমোহন রায় কর্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্র গ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর ফেলিক্স কেরি সাহেব ইংল্যাণ্ড দেশের বিবরণ তর্জমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি তাহাতে ইংলণ্ডীয় নাম ও ইংলণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাস-যুক্ত দরুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাংলা ভাষার মর্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাংলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাংলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ী ভাষায় ইংলণ্ড-দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ সর্বপ্রকারে সকলের উপকার্য হইতে পারে।

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরের বাংলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাংলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাংলা ভাষার রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়া প্রযুক্ত তাহার টাইটেল পেজ অর্থাৎ ভূমিকা ব্যতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।

অপর তিনি বাংলা পদ্যগ্রন্থের বিষয়ে প্রস্তাব করেন যে তিনশত বৎসর হইল কৃত্তিবাস নামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাংলা পদ্য রচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন ও এতদ্দেশীয় পদরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই

প্রসিদ্ধ। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে তাঁহার রামায়ণ অপভাষায় পরিপূর্ণ কিন্তু ঐ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহা হইতে উত্তমরূপ পদরচনা করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। বাংলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষত মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহাদের দিবসের কার্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বংগদেশ মধ্যে এমন কোন দোকানদার নাই যে তাহাদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে নানা অপভাষা আছে তাহার দোষ বরং লিপিকরের। কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। সেই গ্রন্থ গত তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত না হইয়া বারংবার নকল হইয়াছে। অতএব মূর্খেরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে নানাপ্রকার তাহাতে ভাষার অন্যথা করিয়াছে এমত বোধ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ তরজমা অতিরসাল এবং তাহার যদি অপভাষা সকল বহিষ্কৃত হয় তবে ঐ পুস্তক অতি গ্রাহ্য হয়। অতিশয় খ্যাতাপন্ন এক সুপণ্ডিত কর্তৃক সংশোধন পূর্বক শ্রীরামপুরের যন্ত্রালযে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীযবার প্রকাশি হইয়াছে। * * * অপর কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাসুন্দর নামক এক পুস্তকের কথা 'উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগলের এক অংশ। তিনি যথার্থরূপে তাহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার কয়েক পয়ারে তিনি ইংরেজী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক কাব্যরস দৃষ্ট হইতেছে। বাংলা ভাষার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অনুযায়ী ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট অন্য তুল্য এমত পুস্তক নাই কেবল মধ্যে মধ্যে অনেক আদিরসঘটিত কথার দ্বারা তাহাতে কলংক আছে।

অপর তিনি কহেন যে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর রাধামোহন সেন বাংলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ। (সমাচার দর্পণ, ১২৩৬)

পদ্মিনী উপাখ্যান

(১)

রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ কবি বটেন, সন্দেহ নাই। তিনি আধুনিক কাব্যাভিমানীদিগের ন্যায় কয়েকটি শব্দালংকারকেই কবিত্ব স্বীকার করেন না। ভাব ও অর্থ ই তাঁহার পূজ্য, এবং ঐ দেবসেবায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সদ্ভাবের আকর, এবং ঐ ভাবসকল মনোহর ভংগীতে অলংকৃত হইয়াছে। এই শুভ-ঘটনার পক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাখ্যানের সৌন্দর্যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন মানিতে হইবে। ভীমসিংহ-গেহিনী সুবিখ্যাতা পদ্মিনীর ন্যায় শৌর্য-গুণসম্পন্না, পতিপ্রাণা, রূপলাবণ্যবতী রমণী পতিব্রতাদিগের ইতিহাসমধ্যেও সমধিক-প্রাপ্যা নহে। শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী পতিভক্তির অনুরাগে রামায়ণকে প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, পদ্মিনীর সতীত্ব মাহাত্ম্য তাহা হইতে খর্ব নহে। সাধ্বী স্ত্রীদিগের অনুকীর্তন-সময়ে তিনি অবশ্যই শ্রেষ্ঠা মধ্যে গণ্যা হইবেন। তদ্‌গুণ-কথনে যে গ্রন্থের সাফল্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি? পরন্তু এ কথা কহিয়া আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণ-গরিমা খর্ব করিতে মানস করি না। তিনি টড্‌ সাহেব কৃত ইংরাজী গন্থের কয়েক পৃষ্ঠা হইতে সুদীর্ঘ কাব্য বিরচিত করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রচনা-শক্তির প্রশংসা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অপর ঐ রচনা যেরূপ প্রাঞ্জলভাবে ও সুললিত-ভাষায় বিকশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না।

স্যার ওয়াল্‌টর্‌ স্কট্‌ নামা সুবিখ্যাত ইংরাজী কবি তাঁহার কাব্য সকলের আরম্ভে একজন বন্দীকে কোন গৃহস্থের বাটীতে আনাইয়া তাহার মুখ হইতে আপন কাব্য সুব্যক্ত করেন। এই প্রকারে পুরাবৃত্ত-কথনে অনায়াসে পাঠকের মনোহরণ হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ

দৃষ্টান্তের অনুসারে কোন সরোবর-তীরে এক নবীন ভাবুকের নিকট জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখ হইতে পদ্মিনীর উপাখ্যান নিঃসৃত করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ অনুকরণের কিঞ্চিৎ ত্রুটী হইয়াছে। ওয়াল্‌টর্‌ স্কট্‌ সাহেবের গায়ক গৃহস্থের বাটীতে আহ্নিক সমাপন করিরা সন্তৃপ্তমনে হার্পযন্ত্র সাহায্যে আখ্যায়িকা করিতে আরম্ভ করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণ তৈলাক্তদেহে ও নক্তকস্কন্ধে "স্নানাশয়ে জলাশয়ে" আসিয়া অকৃতাহ্নিকাবস্থায় শতাধিক পৃষ্ঠা আখ্যান অনুকীতন করেন; ইহাতে কদাপি মনঃপ্রীতি জন্মে না। জঠরাগ্নির বিরুদ্ধে কালিদাসের কবিতাও রুচি-প্রদায়িনী নহে। ভগবান বেদব্যাস বর্ণন করিয়াছেন যে রণক্ষেত্রস্থ যুদ্ধোন্মুখ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভগবৎগীতা শ্রবণ করাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে দৃষ্টান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে কাব্যের অনুরোধে অকৃতাহ্নিক থাকা প্রিয়কল্প বোধ হয় না। পরন্তু কল্পিত ব্রাহ্মণের ক্লেশে পাঠক মহাশয়দিগের অপরাহ্ণে উক্ত গ্রন্থালোচনায় কোন মতে রসের হানি হইবেক না।

কবিদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে সদ্‌ভাবকে উজ্জ্বল ভংগীতে ব্যক্ত করেন। ঐ ভংগী সিদ্ধ করিতে কদাপি অর্থের কৌশল এবং কদাপি শব্দের কৌশল অবলম্বিত হয়। সাহিত্যিকরা এই কৌশল-দ্বয়কে অলংকার শব্দে অবিধান করেন; সুতরাং অলংকার দুই প্রকার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কবিরা অর্থালংকারকেই শ্রেষ্ঠ মানিতেন এবং তাহার প্রয়োগেও তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ ছিলেন। আধুনিক কবিরা তাহার বিনিময়ে শব্দালংকারের অনুরাগী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাব্যে অনুপ্রাস-যমকের সাহায্যে মনের পরিবর্তে কর্ণের বিনোদ অধিক হয়। সহৃদয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে এ প্রথা কোন মতে আদরণীয় নহে; এই প্রযুক্ত তাহারা প্রাচীন কাব্যেরই অনুশীলন করিয়া থাকেন। ইহা উল্লিখিত করা বাহুল্য যে, শব্দালংকার সাবধানে স্থানবিশেষে প্রযুক্ত হইলে অতীব রমণীয় বোধ হয়; পরন্তু মনুষ্যদেহের স্থানে স্থানে সদ্ভংগীতে অলংকার না দিয়া সর্বাংগ আভরণে আচ্ছাদিত করিলে যেরূপ সৌন্দর্যের হানি হয়, সেইরূপ অবিবেচনায় কবিতার

সর্বত্র যমকের আবরণ হইলে রসের একান্ত ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কবিদিগের যথার্থ প্রথা সাবধানে গ্রহণ করিয়া অর্থালংকারের বাহুল্য প্রচার করিয়াছেন; তত্রাপি তাঁহার গ্রন্থে শব্দালংকারের অভাব নাই। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত সংগৃহীত করিতে হইলে আমাদিগের পত্রে স্থানাভাব হইয়া উঠে, এই প্রযুক্ত পাঠকবৃন্দকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিতে হইল; তাঁহারা পদ্মিনী উপাখ্যান পাঠ করত অনায়াসে তাহার সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

সুরস নূতন ভাব বর্ণনা করা আধুনিক কবিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর; তথাপি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বকীয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন। এক স্থলে তিনি শেখরাগ্রে সূর্যকিরণের নির্মল জ্যোতির বর্ণের পরম চাতুর্যের সাহিত্য লিখিয়াছেন, "প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।" বোধ হয় পাঠকবৃন্দ আমাদিগের সহিত একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে এ উপমা অপূর্ব বটে। অপর একস্থানে পদ্মিনীর লজ্জার প্রশংসায় তিনি লিখিয়াছেন—

"কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পরপরশনে।"

ইহাও অসাধারণ সুন্দর বলিয়া মানিতে হইবেক। প্রভাতকালে চন্দ্রের মলিন হইবার কারণ বর্ণিত করিবার ছলে বন্দ্যোপাধ্যায় কবিত্ব করিয়াছেন—

"সারা নিশি গেল তাঁর নক্ষত্র সভায়।
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ শরমের দায়॥"

এবংবিধ অপরাপর অনেকগুলি পদ্য আমরা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি হইয়াছি; পরন্তু এতদপেক্ষায় প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থের ভাব সুরসভাষায় বিন্যস্ত করিতে প্রস্তাবিত গ্রন্থকার বিশেষ দক্ষ; এবং তাহার পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিরা অবশ্যই আনন্দলাভ করিবেন। গ্রন্থারম্ভে রাজপুতনার মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসংগে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"বসুধা বেষ্টিত যার কীর্তিমেখলায়।"

এই চরণ পাঠ করিবামাত্র কালিদাসের রচনা স্মৃতিপথে উদিত হয়। অপর একস্থানে ভীম সিংহের কারারুদ্ধাবস্থার বর্ণনে কবিবর লেখেন,—

"হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর॥
মোহভংগে পুনর্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ অগ্নিকণা॥
একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘদলে॥
মোহ মেঘে ক্রোধ সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জলে অনলের রেখা॥"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুললিত-ভাষা সম্পন্ন নহেন, কবিকংকণের ওজোগুণও ইনি প্রাপ্ত হয়েন নাই। অপর স্থানে স্থানে বিকট ও কঠিন শব্দ ব্যবহৃত করিয়া রসেরও হানি করিয়াছেন; তথাপি রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার কাব্য সমাদৃত করিবেন; বিশেষত এতদ্দেশীয়া ললনারা যে ইহার পাঠে পরিতৃপ্তা ও সদুপদিষ্টা হইবেন, সন্দেহ নাই।

(২)

ভারতচন্দ্রের কাব্য লালিত্য প্রযুক্তই বিশেষ বিখ্যাত, তদর্থে তাঁহাকে জয়দেবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তারপর তিনি বাঙালীভাষায় সবশ্রেষ্ঠ কবি বিরচিত করিয়াছেন মানিতে হইবে। কিন্তু কোন এক ব্যক্তির স্বাভাবসিদ্ধ অবিকল চরিত্র বর্ণন করিতে তিনি বিশেষ সক্ষম হয়েন নাই। সুচিত্রকরেরা যে প্রকার বর্ণাদিদ্বারা কোন এক ব্যক্তির চিত্র প্রস্তুত করিলে তাহা সে ব্যক্তি অন্য কাহার অবিকল বোধ হয় না। হোমর যে সকল যোদ্ধাদিগের বর্ণন করিয়াছেন তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বোধ হয়; একের বিবরণ অন্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান ব্যাসদেব অর্জুন ও কর্ণ এবং ভীম ও দুর্যোধনকে বীর-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন, তথাপি একের বিশেষণ অন্যে কদাপি সংলগ্ন হয় না। এই ক্ষমতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়; ইহাদ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট

মানবমণ্ডলীর প্রত্যেকের কায়িক পার্থক্য লক্ষণ অনুকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতচন্দ্র এ ক্ষমতায় সম্পন্ন ছিলেন না। বোধ হয় কেবল মালিনী এবং সাধ্বী মাধ্বী ভিন্ন তাঁহার নায়ক নায়িকার কেহই এমত কোন লক্ষণ বিশিষ্ট নহে যাহাদ্বারা তাহাদিগকে অন্য নায়ক নায়িকা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার বিদ্যাকে বিদ্যাবতী বর্ণিত করিবার ইচ্ছা করেন, অথচ সমস্ত কাব্যের এক স্থানেও তাহার বিদ্যাবতীত্ব প্রকাশিত হয় নাই। সুন্দরের বর্ণনায় সামান্য লম্পট ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উপলব্ধি হয় না।

এতদপেক্ষায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নায়ক নায়িকারা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহার পদ্মিনীর চিত্র দেখিয়া কেহই অন্য স্ত্রীর সহিত তাহার সাম্য করিতে পারিবেন না। আক্ষেপের বিষয় এই যে কবিবর পদ্মিনীকে এক কদর্য পত্র লেখাইয়া সহৃদয়দিগের মনে বেদনা দিয়াছেন; নতুবা আমরা তাঁহাকে অনুপমা কহিতে শংকিত হইতাম না। সে যাহা হউক পদ্মিনী উপাখ্যান অন্নদামংগল হইতে লঘু হইলেও যে বংগ কাব্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণ্য হইবেক ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

প্রচলিত রীত্যনুসারে গ্রন্থকার মহাশয় আপন প্রবন্ধকল্পনায় ছন্দসকল অক্ষরগণনায় নির্দিষ্ট করিয়াছেন, অন্যথায় সংস্কৃতবৃত্তি ছন্দসকল বৃত্তিগণদ্বারা নিদিষ্ট করিলে সংস্কৃতজ্ঞদিগকে বিরত হইতে হইত না।

পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুযোগ করিতে পারি না। বৃত্তের অবহেলায় তিনি ভারতাদি সমস্ত বাঙালী কবির অনুগামী মাত্র হইয়াছেন; তবে আমাদিগের এস্থলে এ প্রসংগ করায় এইমাত্র অভিপ্রায় যে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হউন। সামান্য কথায় বলে "লঘুগুরু জান না", অথচ আমাদিগের কবিমাত্রেই অংগুলির অগ্রভাগদ্বারা কবিতা নিবন্ধন করেন; কেহই লঘুগুরুর অনুসন্ধান করেন না। এই অবধির প্রতিকার করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সক্ষম। তাঁহার ছন্দসকল যে প্রকার সাধু, এবং কাব্যরচনায় তিনি যে প্রকার সুপটু, ইহাতে আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে তিনি

চেষ্টা করিলে বাঙালী ছন্দের অনেক উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আর অধিক লিখিবার স্থানাভাব; অতএব আমরা রাজা ভীমসিংহের উৎসাহ-বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় !" ইত্যাদি

(বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০ শক)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১। শর্মিষ্ঠা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি শর্মিষ্ঠা নামক এক-খানি নূতন পুস্তক প্রকটিত করিয়াছেন ; তাহার আলোচনা পাঠকদিগের অবশ্য কর্তব্য বোধ হইতেছে। গ্রন্থকার ইংরাজী, বাংলা, গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় পারদর্শী এবং কবিতামৃতের বিশেষ অনুরাগী। তিনি হোমর, কালিদাস, ভবভূতি, মিলটন্, সেক্‌সপীয়র প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত কবিদিগের রচনা মাধুর্যপানে কেবল আপন মনকে পুলকিত করিয়াছেন এমত নহে, তাহা দ্বারা আপন কল্পনাবৃত্তিকে প্রদীপ্ত করিয়া স্বয়ং বীণাধারণ করিয়াছেন ; কিন্তু বহুকাল বংগদেশীয় সাধারণ জনগণে তাহার কোন ফল সংদর্শন করিতে পারেন নাই। সংগীতরূপ উপাসনার ফলস্বরূপে গ্রন্থকার কিয়ৎকাল হইল যে একখানি সুচারু ইংরাজি কাব্য পাঠকগণের হস্তে সমর্পিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলের সুপ্রাপ্য হয় নাই। সম্প্রতি দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠাকে কাব্যরূপ মহৌষধি হইতে মন্থিত করিয়া সবিশেষ বিবেচনায় পরম দেশহিতৈষী ও বিদ্যানুরাগী ভ্রাতৃদ্বয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়দিগকে সমর্পিত করাতে সে আক্ষেপ নিবৃত্ত হইয়াছে। সরলা রাজবালা যেরূপ সুচারু নাটিকারূপ ধারণ করিয়াছেন, উক্ত মহোদয়েরাও সেইরূপ নাটিকানুরাগী বটেন। আমরা নিতান্ত ভরসা করি এই সংসহবাসে সদভিনয়ে সাধারণ জনগণের বিহিত মনস্তুপ্তি জন্মিবেক।

বংগদেশীয় কাব্যের বর্তমানাবস্থা কোন মতে ভদ্র নহে। প্রকৃত কবি আর কুত্রাপি দৃশ্য হয় না। কবিকংকণ, কালিদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি যে সকল কবির রচনা সম্প্রতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা তাদৃশ দেখা যায় না। বাংগালি কবির মধ্যে কবি-কংকণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে : যেহেতু কবির যে প্রধান

ক্ষমতা কল্পনা-শক্তি তাঁহাতে যে প্রকার তাহার প্রাচুর্য ছিল সে প্রকার অন্যত্র লক্ষ্য হয় না; অথচ তাঁহার সমাদর তাদৃশ প্রগাঢ় দেখা যায় না। কোন সুচারু নবীন কবি লিখিয়াছেন যে, অধুনা কালিদাস সজীব হইয়া বংগদেশে আগমন করত তাঁহার প্রাচীন আশ্রম অবন্তীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে কেহই সদুত্তর দিতে পারিবেক না। এমত সময়ে প্রকৃত দেশ-হিতৈষী কবিতানুরাগীর মনে আক্ষেপ ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদয় হইতে পারে না। এই হেতু দত্তজ গ্রন্থ প্রস্তাবনায় সকরুণ-স্বরে বিলাপ করিয়াছেন—

"কোথায় বাল্মীকি ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রংগে,
মজে লোক রাঢ়ে বংগে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

এই প্রস্তাবনার পর গ্রন্থারম্ভে দত্তজ প্রাচীন প্রথার অনুসারে মণি গোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত নান্দীর আহ্বান না করিয়া এক কালেই প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন; ইহাতে দর্শকদিগের পক্ষে আর নান্দী ও সূত্রধারের বাক্য জ্বালা সম্ভোগ করিতে হয় না। অপর আরম্ভও সুচারু হইয়াছে। রংগভূমির পট উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্র সম্মুখে এককালের চির নীহার-মণ্ডিত হিমালয়ের ভীষণ প্রকৃতি ও তাহার উপযুক্ত প্রহরী একজন ভীমকায় দৈত্য বিদিত হয়। ঐ ভয়াবহ প্রতিমার অনুধ্যান সমাপন হইতে না হইতে রংগভূমিতে বকাসুর অধিষ্ঠিত হন। কেবল পাঠকদিগের পক্ষে এই দৈত্য-প্রধানের গাম্ভীর্য আশু উপলব্ধি হয় না, পরন্তু রংগভূমিতে বিহিতরূপে অভিনীত হইলে দর্শকের পক্ষে ইহা বিশেষ রম্য বোধ হইবে সন্দেহ নাই। আমরা স্বয়ং বেলগাছিয়ার রংগভূমিতে বকাসুরের অনুকারক কুশীলবের অসি চর্ম কবচাদি প্রাচীন হিন্দু-যোদ্ধাদিগের বিচিত্র বেশভূষা ও অপূর্ব কায়িক সৌষ্ঠব দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি অন্যত্র শর্মিষ্ঠার অভিনয়ে তদ্রূপ হইলে দর্শকদিগের

কাহার পক্ষে আক্ষেপ করিতে হইবে না। এই উভয় দৈত্যে নাটকের প্রথম গর্ভাংকে দৈত্যরাজবালা শর্মিষ্ঠা কি প্রকারে শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর দাসীত্ব প্রাপ্ত হন তাহার ব্যাখ্যা করেন, এবং তদ্ব্যাখ্যায় উভয়েই আপন আপন পদ রক্ষা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সেকস্পীয়র যে প্রকারে "রোমিও এণ্ড জুলিএট" নামক নাটকে মকু´টিওকে নাট্যমধ্যে আনিয়া তাহাকে লইয়া কি করিবেন তাহা না স্থির করিতে পারিয়া তৃতীয় অংকে তাহাকে বধ করেন, দত্তজ সেই প্রকার বকাসুরকে সমুত্থান করাইয়া কএকবার ক্রন্দনের পরই অপসৃত করাইয়াছেন; প্রকৃত প্রস্তাবে বকাসুরের ন্যায় প্রধান বীরের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এক ব্যক্তি বীরকে বৃথা ক্রন্দন না করাইয়া অন্যদ্বারা সে কর্ম সমাধা করিলে কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হইত না।

নাটকের দ্বিতীয় গর্ভাংকে শর্মিষ্ঠা ও তাহার সহচরী দেবীকা তথা দেবযানী ও তাহার দাসী পূর্ণিকা এবং পিতা শুক্রাচার্যের পরস্পর কথোপকথনে নাট্যবিষয়ের অনেক ব্যক্ত হইয়াছে। শর্মিষ্ঠাই গ্রন্থের নায়িকা; সুতরাং গ্রন্থকার তাঁহার চরিত্র বর্ণনে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন; এবং সে প্রযত্নও ব্যর্থ হয় নাই। দেবিকার সহিত আলাপনে শর্মিষ্ঠা অতীব রমণীয়া বীর্যবতীর ধর্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সামান্য নায়িকার পক্ষে দুঃখের সময়ে হতাশ হওয়া স্বভাবসিদ্ধ লক্ষণ বটে; পরন্তু দৈত্য-কন্যার পক্ষে সেরূপ সম্ভবে না; তাহা হইলে তাঁহার গৌরবের লাঘব হয়। গ্রন্থকার এই বিবেচনায় তাঁহার প্রকৃতিতে মহামনস্বিনীর সমস্ত লক্ষণ রক্ষা করিয়াছেন। সামান্য দাসী তাঁহার দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করে, তিনি তৎসমুদয় তুচ্ছ করিয়া প্রকৃতি-প্রতিমার সৌন্দর্যে মন স্নিগ্ধ করত পরম শৌর্য গুণ প্রকাশ করেন, পরে বকাসুরের সহিত কথোপ-কথনে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহা যথার্থ মহত্বের চিহ্ন মানিতে হইবেক। দৈত্য রাজবালার শৌর্যগুণসম্পন্নহৃদয় কি প্রকার গর্বশালি হয় তাহার প্রকৃত অনুভব না হইলে অংকিত বর্ণনা কদাপি অবিকল হইতে পারে না। আমাদিগের মনে এই অংশ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়াংকে গ্রন্থকর্তা যযাতির সহিত দেবযানীর উদ্বাহ সম্পন্ন করেন; তাহাতে মধ্যে মধ্যে আপন কবিত্বশক্তি অতি মনোহর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এক স্থানে রাজা ও মাধব্যের কথোপকথনে রাজার মুখ হইতে কয়েকটি অতীব কোমল বাক্য নিঃসৃত করাইয়াছেন, তাহার শ্রবণে অবশ্যই আর্দ্রচিত্ত হইতে হয়। রাজা কহেন, "সখে মাধব্য, মরুভূমে (ভূমিতে ?) তৃষ্ণাতুর মৃগবর মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে বারিলোভে ধাবমান হইলে জীবন উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা করলে আমারও সেই দশা।" আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রন্থকার ঐ হৃদয়গ্রাসী বাণীর অনতিবিলম্বে এক গর্ভাংকের মধ্যেই মাধব্যের সহযোগে একটা বারবিলাসিনী আনাইয়া যৎসামান্য কিংচিৎ রহস্য করিয়াছেন; তাহা না থাকিলে সহৃদয়দিগের বিশেষ প্রীতিকর হইত। পরন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সামান্য দর্শকদিগের বিনোদনার্থে ইহা নিতান্ত দূষ্য নহে।

তৃতীয়াংকের প্রথম গর্ভাংকে প্রথমত রাজমন্ত্রী রাজার প্রত্যাগমন-বার্তা বিজ্ঞাপন করেন; তন্নিমিত্ত তাঁহার এক পৃষ্ঠা পরিমিত বাক্য কাহার বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ হইবেক না; পরন্তু তৎপরক্ষণেই বিদূষক ঐ আক্ষেপের পরিশোধ করিয়াছেন। যাঁহারা বেলগাছিয়ার রংগভূমিতে বিদূষকের মুখনিঃসৃত মিষ্টান্ন-চৌর্য-বিষয়ক বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন ঐ প্রকরণ একান্ত প্রমোদজনক হইয়াছে বটে। অতঃপর দুই গর্ভাংকে দেবযানী এবং শর্মিষ্ঠার সহিত যযাতির প্রেমসম্ভোগ প্রদর্শিত হইয়াছে; তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য নাই। প্রণয়ের অভিনয় প্রদর্শন তাহার একমাত্র অভিপ্রায়, তাহাতে গ্রন্থকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। সামান্য লেখকের হস্তে এতদবস্থার বর্ণনা প্রায় অশ্লীল বা ইতর হইয়া থাকে; কিন্তু দত্তজ-সদৃশ সুচতুর ব্যক্তির লেখনী হইতে বিশুদ্ধ কাব্যে তাদৃশ দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধানতা প্রকাশ করিয়াছেন।

রাজা যযাতি গান্ধর্ব প্রথায় শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন তদ্বার্তা বহুকাল দেবযানীর গোচর হয় নাই; দৈবে এক দিবস উদ্যানে স্বামীর সহিত ভ্রমণ সময়ে তিনি শর্মিষ্ঠার পুত্রত্রয়কে দেখিয়া তৎসমুদায় জ্ঞাত হন; এবং তাহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাজপুর পরিত্যাগপূর্বক পিতৃ নিকট গমন করত অভিশাপদ্বারা স্বামীকে জরাগ্রস্ত করান। এই ব্যাপারের বর্ণনার্থে প্রস্তাবিত নাটকের চতুর্থ অংক নিযুক্ত হইয়াছে এবং তদ্বর্ণনের ভংগী অতীব মনোহর ও শ্রবণপ্রিয়। দেবযানী শর্মিষ্ঠার পুত্রদিগকে দেখিয়া কহেন, "হে বৎসগণ! তোমরা কিছুমাত্র শংকা করিও না।" এই কথার প্রত্যুত্তরে "সর্বকনিষ্ঠ পুরু সক্রোধে স্বীয় কোমল বাহু আস্ফালন করিয়া বলিলেন আমরা কাকেও শংকা করি না। তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও।" একথা শিশুর মুখে হঠাৎ অনুপযুক্ত বোধ হইতে পারে, পরন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে পুরু ক্ষত্রিয়কুলপ্রধান যযাতির পুত্র; ঐ কুলের সাহস ও বীর্যই চিরপ্রশংসনীয়, অতএব পুরুর মুখে "আমরা কাকেও শংকা করি না" এই বাক্য সমীচীনই হইয়াছে; বিশেষত যে বালক তাহার কিংচিৎ পরে পিতার মংগলার্থে অনায়াসে চিরকালের নিমিত্ত জরা রোগ স্বীকার করিবেক, তাহার বদনে এতাদৃশী সগর্ববাণী ভিন্ন অন্য কিছুই উপযুক্ত বোধ হয় না। বীর্যানুরাগী ব্যক্তিরা তাহা পাঠ করিবামাত্র পুরুকে ক্রোড়ে লইতে মানস করেন সন্দেহ নাই। অপর দেবযানীর সহিত শুক্রাচার্যের কথোপকথনও অপূর্ব হইয়াছে। তাহার পাঠে সকলেই স্বীকার করিবেন যে শুক্রাচার্যের গাম্ভীর্য ধর্মজ্ঞান ও বাৎসল্য-স্নেহে নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্তি তথা দেবযানীর আবদার অবিকল স্বভাবানুরূপ হইয়াছে, কিংচিৎমাত্র অন্যথা হয় নাই।

গ্রন্থের শেষাংক সর্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র। তাহাতে রাজার জরারোগ হইতে মুক্তি ও তৎসূচক উৎসব শর্মিষ্ঠার দাসীত্ব-মুক্তি-বিষয়ক ব্যাপার পরিকীর্তিত হইয়াছে; তাহার পাঠাপেক্ষায় অভিনয় বিশেষ মনোজ্ঞ বোধ হয়। পরন্তু তাহা যে রচনার সৌন্দর্যে গ্রন্থের অপরাংশের তুল্য ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। ফলত এ বিষয়ে বাঙালী নাট্যকারে

ও দত্তজায়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্বোক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন ; দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন ; কি উপায়ে অভিনেয় বস্তু সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইবে ; এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহার বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শর্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। নাট্যরচনার এক প্রধান নিয়ম এই যে তাহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হয় তৎসমুদয়কে এক উদ্দেশ্যের অনুকূল হওয়া কর্তব্য, এবং সেই উদ্দেশ্য বর্ণনীয় বিষয়ের মুখ্য ঘটনা। প্রত্যেক গর্ভাংকে সেই মুখ্য ঘটনার উপায় ক্রমশ প্রস্তুত হইতে থাকে. তাহা হইলেই অসংলগ্নত্ব দোষের সম্ভাবনা হয় না। উত্তম নাটকে ভয়ানক রস বর্ণিতব্য হইলেও মধ্যে মধ্যে রহস্যজনক ব্যাপারেরও বর্ণন থাকে ; কিন্তু সদগ্রন্থকারেরা এতাদৃশ কৌশলে তাহার বিনিয়োগ করেন যে তাহাতে রসের অপলাপ হয় না। দত্তজ এ বিষয়ে পরম পণ্ডিত। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্যক কৌতুক, বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে তাহা কোনমতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।

নাটক মধ্যে প্রথমত যে কয়েকটী গীত অভিনিবেশিত হইয়াছিল তাহার রচনা সমীচীনই বটে ; কিন্তু মনোজ্ঞ স্বরের সহিত তাহার অনৈক্য বিধায় কোন সহৃদয় ব্যক্তি অপর কয়েকটী গীত প্রস্তুত করত ঐ সকলের স্থানীভূত করিয়াছেন। দেববিড়ম্বনায় আমাদিগের মনে প্রেমরসের উৎস এক কালে শুষ্ক হইয়াছে, এই প্রযুক্ত আমরা অনুরাগোদ্দীপক গীতরসের আস্বাদনে বিমুখ ; তথাপি যাঁহার রসান্ত-ভাবকতার সাহায্যে শেষোক্ত গীত কয়েকটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে সতৃষ্ণ হইলাম। ফলত আমরা শর্মিষ্ঠার পাঠ ও অভিনয় উভয় প্রকারে তাহার সৌন্দর্য সম্ভোগ করিয়াছি, সুতরাং কেবল দর্শক বা পাঠক আমাদিগের তুল্য আনন্দিত হইতে পারেন না. তত্রাপি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সকল বাংলা নাটক এ

পর্যন্ত প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণজনগণে শর্মিষ্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠা বলিবেন, সন্দেহ নাই।

শর্মিষ্ঠা নাটকের সমালোচনে আমরা দত্ত বাবুর ক্ষমতাবিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম, তাহা উপস্থিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে সর্বতোভাবে সপ্রমাণিত হইয়াছে। অধুনা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে নাটক-রচনায় দত্তজ বাঙালির মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছেন। মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতির অবিকল অনুভব করিয়া উজ্জ্বল বাক্যে তাহার উদ্ভাষণ যে কবির প্রকৃতধর্ম ও বীণাপাণির মুখ্য-প্রসাদ তাহা দত্তজর উপলব্ধি হইয়াছে; এক্ষণে তিনি ত্বরায় বংগীয় একজন প্রধান কবি বলিয়া গণ্য হইবেন এমত সম্ভাবনা হইয়াছে।

"ইয়ং বেংগল" অভিধেয় নববাবুদিগের দোষোদ্ঘোষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে ইহার প্রমাণার্থে, আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নববাবুদ্বারা আচরিত হইয়াছে।

প্রহসনের নায়ক নবীনবাবু; তিনি সমবয়স্ক ও সমস্বভাবাপন্ন কতকগুলি নব্যের সহযোগে একটি জ্ঞানতরংগিনী নাম্নী সভা সংস্থাপিত করিয়াছি বলিয়া পরিবারের নয়নে ধূলি নিক্ষেপ করত এক গোপন স্থানে গিয়া সুরাদি সেবন করিতেন। নাটকের প্রথমাংকে একদা তিনি কি প্রকারে পিতাকে বংচনা করিয়া সেই স্থানে গমন করেন, ও তাঁহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে একজন বৈরাগীকে পাঠান, তাহার কি বিড়ম্বনা হয়, তাহার বর্ণনা করিয়া দ্বিতীয়াংকের প্রথম গর্ভাংকে উক্ত সভার বৈভব কীর্তিত হইয়াছে।

২। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বলিয়া নির্দিষ্ট করেন; সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবদ্ধিত করিয়া থাকেন এবং

ছন্দের লক্ষণ এই যে, রচনাকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশভাষা ও পাঠকদিগের রুচিভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণমাত্রা ও যতির পরিবর্তন করা হয়; সুতরাং বর্ণ যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দ হয় না। ছন্দের অলংকার স্বরূপে কোন কোন ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অংগ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি। ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুল পিতামহ বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলংকার মাত্র, তাহা কোনমতে অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহা স্বীকর্তব্য বটে যে বংগভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট; কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার সাব্যস্ত হইতে পারে না, তাহার সম্পূরণার্থে সর্বদা নূতন ছন্দ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দ সকল গ্রহণ করা হইতেছে; অতএব দত্তবাবু বাঙালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে অন্ত্যানুপ্রাস অলংকার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে; পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে সত্বরে অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসত্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, যাহারা গদ্যরচনা অত্যল্পমাত্র বুঝিতে পারে তাহাদিগের পক্ষেও অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদিছন্দোগত ভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নসকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে

পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর অনেক সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘকাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণ-সুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বর-সমানতা-প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন কোন বাঙালী কবি ঐ স্বরসাম্যত্বের নিরাকরণার্থে এক কাব্যে নানাবৃন্দ ব্যবহৃত করেন; তদন্যথায় সংস্কৃত ইংরাজী লাটীন ও গ্রীক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু পয়ার ছন্দে প্রতি চতুর্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সংকোচ হইয়া ওঠে, কল্পনাশক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বলভাব খর্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিতা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারে; ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয়, তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলত দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে মিতাক্ষর কবিতার নিগড়। তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবচর হইতে পারেন।

অপর ঐ নিগড় সত্ত্বেও কবিতার ওজোগুণের সংবৃদ্ধি হইতে পারে না। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে বাঙালি কবির মধ্যে ভারতচন্দ্র যেমত কবিতার লালিত্য অনুভূত করিতে পারিতেন এমত আর কোন কবি পারেন নাই। তিনি শব্দের গৌরব অতি চমৎকৃতরূপে সমাহিত করিয়া রাগ দ্বেষাদি-প্রকাশ-করণ-সময়ে তদুপযুক্ত গম্ভীর কর্কশ ভয়ানক শব্দ, ও কোমল ভাবের জ্ঞাপনার্থে সুমধুর কোমল মৃদু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতি অল্প বাঙালী কবি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত তুলনীয় হইতে পারেন। শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা সময়ের বিবরণের মধ্যে শব্দার্থের সমন্বয়-বিষয়ক একটি অপরূপ উদাহরণ আছে তাহার পাঠে আমাদিগের অভিপ্রেত অনায়াসে পাঠক-

দিগের বোধগম্য হইবে। ঐ বর্ণনায় সতীর দেহত্যাগ-সংবাদে মহাদেব ভয়ঙ্কর কোপে ভূত-প্রেত-পরিচারক সমভিব্যাহারে দক্ষালয়ে আগমন করিয়া কি কহিতেছেন তদ্বিষয়ে লিখিত আছে,—

"অদূরে মহারুদ্র ডাকে গম্ভীরে।
অরেরে অরে দক্ষ দেরে সতীরে।"

এই ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে ভয়ানক কোপ জ্ঞাপক অর্থের সহিত শব্দের সাম্যত্ব সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু পয়ার কি অন্য কোন বাঙালী ছন্দে তাহার সমাধা হয় না; ভারত সদৃশ কবি ও তাহার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়াছেন। দেখুন বিদ্যা কোপান্বিতা হইয়া তিরস্কার করণ সময়ে ছন্দের অনুরোধে—

"শুনলো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিত হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি।"

ইত্যাদি বাক্যে কি প্রকার শব্দ ও ভাবের বিরোধ করিয়াছেন, বিদ্যা মায়ের আগে ক্রন্দন করিয়া মালিনীর নামে অভিযোগকরণ সময়ে এরূপ বাক্য কহিলে হানি ছিল না; তিরস্কারের নিমিত্ত নিতান্ত অপ্রযোগ্য—মধুরভাষিণী কামিনীর উক্তি বলিলেও ইহার দোষ খণ্ডিত হয় না। পরন্তু ইহা যে কেবল ছন্দ ও অনুপ্রাসের অনুরোধে ঘটিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র যদ্যপি অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিয়া এই কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে এদোষ কদাপি হইত না। এই অনুরোধ ও অমিত্রাক্ষর কবিতার উপযোগিতা উপলব্ধ হইতেছে, এবং মত্তজ বাঙালীতে তাহার প্রচার করাতে এতদ্দেশীয় সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন মানিতে হইবে।

ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে অন্ত্যযমক থাকিলে কবিতা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয় অন্ত্যযমক বিরহে সেরূপ সুখবোধ্য হইতে পারে না; সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট কবিতা যেরূপ অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট সমাদৃত হয় অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন কাব্য তাদৃশ হইবেক না। পরন্তু ইহা

স্মর্তব্য যে সকল কবিতাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না ; এবং ধীমান্ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না ; এবং ধীমান্ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তদ্যোগ্য কবিতা প্রস্তুত করা কর্তব্য। বালকের দুগ্ধ কেন ভীমের উপযুক্ত খাদ্য নহে। বোধ হয় এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙালী কবিতার নাম শুনিলেই "ভাষা" বলিয়া পরিত্যাগ করেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহারা কালিদাস শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কবিতা পাঠকরণান্তর অর্থের গৌরবহীন পয়ার নিতান্ত ইতরবৃত্তি মনে করেন।

কথিত হইয়াছে যে অন্ত্যানুপ্রাস ত্যাগ করিলে কবি যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাক্যের সমাপ্তি করিতে পারেন, ইহাতে আশু বোধ হইতে পারে, এবং কোন কোন সম্পাদকের বোধ হইয়াছে, যে অমিত্রাক্ষর কবিতার যতির ভেদ নাই ; কিন্তু তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কাব্যের প্রধান অংগ অক্ষর বা মাত্রা বৃত্তি ও যতি ; আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি ; এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজ ও তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন। পরন্তু যতির অনুরোধে যে অন্যত্র বাক্যশেষে যতিভংগ হয় ইহা আমরা বোধ করি না। নিয়মিত স্থানে যতি রাখিয়া পরে তথায় বা অন্যত্র পদের শেষ হইবার পূর্বেই বাক্যশেষ করিলে যতিভংগ হয় না, ইহাই আমাদিগের বক্তব্য। তাহার উদাহরণার্থে আমরা এক চরণান্তর্গত প্রশ্নোত্তরবিশিষ্ট কবিতায় উদ্দেশ করিতে পারি ; তাহাতে আমাদিগের কাব্য সপ্রমাণ হইবে। তদ্ভিন্ন সামান্য কবিতায় ও তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দেখুন কুমার-সম্ভবের ৫ম সর্গের ৪র্থ শ্লোক যথা—

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া
তদিদং গতমীদৃশাং দশাং
নবিদীর্যে—কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥

এস্থলে চতুর্থপাদের "নবিদীর্যে" পদের পরই অর্থের শেষ হইয়াছে।

"কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ" বাক্যের সহিত পূর্ব বাক্যের বৈয়াকরণীয় কোন আসত্তি নাই, অথচ ঐ স্থান ছন্দের যতি স্থান নহে।

রঘুবংশে যথা,

সোঽমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাং
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাং
যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাং
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাং
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাং
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাং
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাং
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে,

১ম সর্গ ৫—১০ শ্লোক

এই বাক্যেও ইহার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। ইহাতে বক্ষ্যে পদেই অর্থের শেষ হইয়াছে; শ্লোক পাদের শেষ কথায় অন্য প্রসংগ; তাহার সহিত পূর্ব কথায় সমন্বয় নাই। রঘুবংশের অন্যত্র—

সমমেব সমাক্রান্তং দ্বয়ং দ্বিরদগামিনা
তেন সিংহাসনং পিত্র্যমখিলং চারিমণ্ডলং।

৪র্থ সর্গ ৪র্থ শ্লোক।

এই শ্লোকেও "তেন" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে, অথচ সেই স্থান যতির নহে।

কিরাতার্জুনীয়ে যথা—

কৃতপ্রণামস্য মহীং মহীভুজে
জিতাং সপত্নেন নিবেদয়িষ্যতঃ
নবিব্যথে তস্য মনঃ—ন হি প্রিয়ং
প্রবক্তুমিচ্ছন্তি মৃষা হিতৈষিণঃ

এই শ্লোকে তৃতীয় পাদের "মনঃ" পদে অর্থের শেষ হইয়াছে। তৎপরের "ন হি প্রিয়ং" ইত্যাদি বাক্যের সহিত তাহার কোন সমন্বয়

নাই। এতাদৃশ অপর দৃষ্টান্ত অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে; পরন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। প্রদত্ত উদাহরণেই পাঠকবৃন্দ নিশ্চিত হইবেন যে পদমধ্যে অর্থের শেষ করায় হানি হয় না এবং তিলোত্তমায় যে পদের প্রারম্ভে বা মধ্যে যে সকল বিরাম আছে তাহা কোন মতে প্রকৃত যতির হানিকর নহে। দত্তজ লেখেন—

"এ হেন নির্জন স্থানে দেব পুরন্দর,
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা,
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে,
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি।"

এই পাদচতুষ্টয়ের তৃতীয় পাদের "বীণাপাণি" পদে অর্থ শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে যতির ভংগ হয় নাই; যেহেতু তিলোত্তমার ছন্দ অমিত্রাক্ষর পয়ার, তাহার লক্ষণ চতুর্দশাক্ষর বৃত্তি অষ্টমাক্ষরে যতি এবং এই লক্ষণ রক্ষা পাইলেই ছন্দের রক্ষা মানিতে হইবে। সেই লক্ষণানুসারে "স্থানে" "আজি" ও "তোমা" পদের পর যতি আছে, সেই যতিতেই ছন্দের অনুরোধ রক্ষা পায়; বীণাপাণি শব্দের পর পৃথক্ যতি থাকায় তাহার হানি হয় না। যদ্যপি এই নিয়মের অন্যথায় অষ্টমাক্ষরের পর যতি না থাকে তাহা হইলে কাব্যকর্তাকে যতি-ভংগী দোষ স্বীকার করিতে হইবে। এক পদে চতুর্দশাক্ষরের অধিক বা অল্প থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে ছন্দোভংগ অংগীকার করিতে হয়।

প্রস্তাবিত ছন্দের পাঠ করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র সামান্য পয়ারের ন্যায় ইহা পাঠ করিলে, অর্থেরও অনুভব হইবেক না এবং কাব্যও পদ্য বলিয়া বোধ হইবেক না। যাহারা ইংরাজী ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা যে প্রকারে মিলটন কবি কৃত "পারাডাইস্‌লষ্ট" নামক কাব্য পাঠ করেন তদ্রূপে ইহার পাঠ করিলে সিদ্ধকাম হইবেন। অন্যের প্রতি বক্তব্য যে তাঁহারা পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা পাঠে সুখী হইতে পারিবেন। ফলত যে প্রকারে বিরাম-চিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায় সেই প্রকার অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়, কেবল

ইহার বিরাম-চিহ্ন ব্যতীত ছন্দের দুই যতি আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

তিলোত্তমার ছন্দ ও যতি বিষয়ে এতাবন্মাত্র লিখিয়া তাহার রচনা-কৌশল ও কবিত্ব সম্বন্ধে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কর্তব্য, কিন্তু বিবিধার্থের শেষ প্রস্তাবে সমালোচন আরম্ভ করিলে প্রায় স্থান সংকীর্ণ হইয়া থাকে; বর্তমান প্রস্তাবে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, সুতরাং আমাদিগের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে। ইহাতে আমাদিগের বিশেষ আক্ষেপ নাই, যেহেতু এতৎ পত্রের পূর্ব-পূর্ব খণ্ডে দত্তজর কবিত্ব-বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে, এস্থলে এইমাত্র বলিলে হয় যে দত্তজর কবিত্ব-শক্তি-সম্বন্ধে আমরা পূর্বে যে প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম তাহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়া তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায় তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়, সর্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ ভাব সকল দত্তজ ভুবনবিখ্যাত কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, মিল্টন প্রভৃতি কবিকুলকেশরদিগের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু বংগভাষায় তাহার বিভাষণে দত্তজ কেবল অনুবাদ করিয়া নিরস্ত হয়েন নাই; তাঁহার মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না; প্রত্যুত সকলই হৃদ্য, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হয়। লালিত্য বিষয়ে বোধ হয় তিলোত্তমা অতি প্রসিদ্ধ হইবেক না। তথাপি পৌলোমীর খেদ উক্তির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বাঙালি কাব্য-পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে। দত্তজ পৌরাণিক ভূগোল ও খগোল পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বকর্মাকে ভূমণ্ডলের প্রান্তভাগে প্রেরণ করায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, এবং পৌলোমীর সহচরীর মধ্যে ষষ্ঠী, মনসা, সুভচনীর উল্লেখ সহৃদয়ের কার্য হয় নাই। অপর, অনেক স্থানে তুলনা ও বিশেষণ তথা স্বর্বেশ্যা তিলোত্তমাকে "সতী" বলিয়া বর্ণনা দূষিত মানিতে হয়; পরন্তু ঐ সকল আপত্তিসত্ত্বেও

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বর্তমান কাব্য বংগভাষার প্রধান-কাব্য-মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই, এবং সহৃদয় কাব্যানুরাগীরা ইহার পাঠে অবশ্যই বিশেষ সংতৃপ্ত হইবেন, তাহা না হইলে ইহার মংগলাচরণে আমরা কদাপি জনৈক সহৃদয়াগ্রগণ্যের নাম দেখিতে পাইতাম না।

৩। পদ্মাবতী

দত্তজর পদ্মাবতী নূতন নাটক। গ্রন্থকার তাহার আদ্যোপান্ত বিভিন্ন স্থান হইতে সমাহৃত করিয়া এক চমৎকার সমষ্টি প্রস্তুত করিয়াছেন, তত্রাপি কয়েকটী প্রাচীন রথচক্রমার্গ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারেন নাই। তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে নাটকমাত্রেই "নান্দ্যন্তে সূত্রধার" "এক রাজার দুই স্ত্রী" ও "পেটুক ব্রাহ্মণের পেটে হাত," কোনমতে চিত্তাকর্ষক নহে; তাহা হইলে এক নাটকেই সকল অভিপ্রেত সিদ্ধ হইত। সেক্‌সপীয়ারদ্বারা বর্ণিত ফালষ্টাফে ভীরু, উদরম্ভরী পিণ্ডীশূরের চরম হইয়াছে, প্রতি নাটকে তাহার দুই একটি কথার চালনায় কোনমতে প্রিয়কল্প হয় না। কল্পনা-শক্তির প্রধান লক্ষণ এই যে বিশ্বব্যাপার দর্শনানন্তর বিভিন্ন আধারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘটনা একাধারে সমাহার-করণ, দত্তজ তাঁহার "একেই কি বলে সভ্যতা"য় তাহা সিদ্ধ করিয়াছেন।

পদ্মাবতীতে তাহা তাদৃশ উজ্জ্বলরূপে ব্যক্ত হয় নাই; পদ্মাবতী শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠা ভগিনী মনে হয়। পরন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এতদ্দেশীয় কবিরা যে প্রকার একের ভাব লইয়া অন্যে কাব্য রচনা করিয়া থাকেন, পদ্মাবতী ও শর্মিষ্ঠার তাদৃশ সৌসাদৃশ্য নাই। তাঁহার আখ্যায়িকা কোন এক এতদ্দেশীয় গ্রন্থকারের অপহৃত-ভাবাত্মিকা নহে; তদ্রচনায় তিনি স্বকীয় চাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে সূত্রধারের বাগাড়ংবরের পরে বর্ণনীয় কথা পূর্বেই ব্যক্ত হইয়া রসের ব্যাঘাত করে নাই। গল্পের পূর্বাপর অতি সাবধানে রম্যকৌশলের সহিত বিন্যস্ত হইয়াছে। সর্বাংশই আমোদজনক ও তৎপরে কি হইবে তাহার অনুসন্ধানাকাংক্ষার উত্তেজক; তত্রাপি ইহা স্বীকার করিতে

হইবে যে যযাতি ও ইন্দ্রনীল, শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী এবং বিদূষক ও মাণবক প্রভৃতি নায়ক-নায়িকার অনেক অংশে সমভাব আছে। পরন্তু নাটক যে পারিপাট্যবিশিষ্ট মনোগ্রাহী হইয়াছে তাহা আমরা আহ্লাদ-পূর্বক স্বীকার করিতেছি। যে কেহ তাহা পাঠ করিবেন অবশ্যই তেহঁ আমাদিগের এ উক্তির পোষকতা করিবেন।

৪। মেঘনাদ বধ ও ব্রজাংগনা কাব্য

কপিরাক্ষসকুলের লংকা সমর বৃত্তান্ত, রাজা রামচন্দ্রের দিগন্ত-ব্যাপিনী কীর্তিকথা হিন্দু জাতীয় আবালবৃদ্ধবণিতামধ্যে কাহারো অবিদিত নাই। দত্ত কবিবর রামচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র অবলম্বন করিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহার নায়কগণ এমনি যথাযোগ্য গুণে বিভূষিত যে, তাহাতে রামায়ণ প্রচারয়িতা বাল্মীকিকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছে। যদি প্রস্তাব সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইত তাহা হইলে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ কোন গুণেই ইহার নিকট লক্ষিত হইত না।

দৈবশক্তির এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা, যে দত্তজ পতিপরায়ণা প্রমীলার অনন্য আশ্রয় বীর চূড়ামণি মেঘনাদকে যে সকল বীর লক্ষণে ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে বাল্মীকির মতো তাহারে পরস্বাপহারী দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধম বলিয়া তাহার অকাল মৃত্যুতে আহ্লাদিত হওয়া নৃশংসেরও কর্ম নহে। মেঘনাদ যে সকল সদ্গুণে ভূষিত, দুর্বৃত্ত রাবণের পুত্রত্ব স্বীকার করাও তাহার অনুচিত। তিনি সাগরাম্বরা ধরণীমণ্ডলের অধীশ্বর হইলেই শোভা পাইতেন। হায়! পতিপরায়ণা প্রমীলা তাঁহার বিরহভার কিরূপে বহন করিবে!

> শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি
> রবিতেজে সমুজ্জ্বলা, দাসী ও তেমতি,
> হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে
> আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে।
> মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
> উজ্জ্বলতর মুকুতা! শত-দলদলে
> কি ছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে?

উত্তরিলা বীরোত্তম—"এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লংকা-সুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লংকেশ্বরী।
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে
পায়োবহ? অনুমতি দেহ রূপবতি!
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা পলাইছে, দেখ সত্বর-গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"

যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিতে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে,
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে,
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে।
প্রাক্তনের গতি, হায় কার সাধ্য রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।

কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ;
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে;—
"জানি আমি, কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্, রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাজা তোর রে কে বলে
রাক্ষস-কুল-হর্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরী, তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী

ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য-কুল-নিত্য-অরি দেব-কুল-পতি"।
এতেক কহিয়া সতী কৃতাংজলি পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
"প্রমীলা তোমার দাসী নগেন্দ্রনন্দিনি !
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লংকা পানে,
কৃপাময়ি ! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে।
দেখ, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে।
আর কি কহিবে দাসী ? অন্তর্যামী তুমি,
তোমা বিনা জগদম্বে ! কে আর রাখিবে ?"

মেঘনাদ বধ কাব্যে প্রতি পদেই যেন প্রকৃতি মূর্তিমতী হইয়া পাঠকবর্গের আনন্দবিধান করিতেছেন। নায়ক দম্পতীর অকৃত্রিম প্রেমে আমরা যতদূর মোহিত হই, নানা গুণে মেঘনাদ আমাদিগের যত প্রসন্নতা লাভ করেন, আবার চিরদুঃখিনী সীতা সতীর অবিরল বিগলিত নয়নজল আমাদিগকে তত উত্তেজিত করে। তখন আর পতিপরায়ণা প্রমীলার দুঃখভার স্মরণ হয় না। বহু গুণাকর মেঘনাদকেও ক্ষণকালের নিমিত্ত জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করি না।

—কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !
"চালাইল রথরথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা ! স্বর্গ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কাননরাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্তনাদ। প্রভঞ্জন-বলে

ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড় মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী ?
ফাঁফর হইয়া আমি খুলিনু সত্বরে
কংকণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী ছড়াইনু পথে ;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাই, রক্ষোবধূ !
আভরণ। দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা ;—
"এখনও তৃষ্ণাতুরা, এ দাসী, মৈথিলি,
দেহ সুধা দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার।" সুস্বরে
পুন আরম্ভিলা তবে ইন্দুনিভাননা ;—
"শুনিতে লালসা যদি, শুন, লো ললনে !
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে ?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লংকাপতি,
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাংগিতে শৃংখল তার, কাঁদিনু সুন্দরি !
"হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে এ দাসীর দশা)
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী।
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি ; দূতপদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু ! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর-নিনাদে।
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,

সীতার বারতা তুমি, গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধুসখা।
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!—"

বাংগালী সাহিত্যে এবংপ্রকার কাব্য উদিত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও স্বপ্নেও জানিতেন না।

"শুনিয়াছি বীণা ধ্বনি দাসী,
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধু মাখা কথা কভু এ জগতে।"

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারে নাই। সংসারের নিয়মই এই প্রিয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্‌গুণরাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জরিত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধিজল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্বক বহুমানে অলংকারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই, কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব।

মাইকেল মহাশয়ের ব্রজাংগনা কাব্যও অতি চমৎকার হইয়াছে। কবিত্ব শক্তির এমনি অনির্বচনীয় ক্ষমতা যে, ব্রজাংগনা কাব্য যে একজন খ্রীশ্চন প্রণীত, ইহা কে বিশ্বাস করিবে।

(বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৭৮০-৮৩ শক)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ;—ভয়, ক্রোধ, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই সকল কিংবা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাকে কাব্য কহে, এবং তাহাতে কবিতারূপ পীযূষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়। বর্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার প্রাচুর্য থাকাতে এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকর্তা যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়। সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে বংগভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস সংকলিত রামায়ণ এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্র এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাংলা পুস্তকেই নাই। ইত্যগ্রে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে, তৎসমুদয়ই করুণ কিংবা আদি রসে পরিপূর্ণ, বীর অথবা রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন ; কিন্তু নিবিষ্ট চিত্তে যিনি মেঘনাদ বধের শংখধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার কতদূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন কবি।

ইন্দ্রজিৎ এবং লক্ষ্মণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারংবার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি, বংগবাসী হিন্দু সন্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই ; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে, অভিনবকায় সেই উপাখ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন, এ দেশে এমন হিন্দুসন্তানও কেহ নাই।

সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নানা-দেশীয়

মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়নপূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বংগবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন।

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমনীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব-দানব-মানবমণ্ডলীর বীর্যশালী প্রতাপশালী সৌন্দর্যশালী জীবগণের রোমাংচিত হইতে হয়—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণরসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুল-লোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা সে বংগবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি?

অত্যুক্তি জ্ঞানে এ কথায় যদি কাহারও অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা হয়, তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করিবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন, মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী শক্তি!—তাঁহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরংগ। কখনও তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্পাহরণ করিতেছেন এবং কখনও বা নবীনকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিৎ-জায়া প্রমীলার লংকা-প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী-দর্শন, পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ কিরূপ আশ্চয, কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এতদিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পূজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু বোধ হয়, এতদিন পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়-কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল! এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে, আমি ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে, কেহ

বা লেখার চমৎকারিত্বে লোকের চিত্তহরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্ত প্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য, তৎসম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কাহারও সাধ্য নাই। পরিপাটী সর্ব্বাংগসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন, বংগকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এতদিন সজীব রহিয়াছে। কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত-গুণকে কবিকৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ গণনা করেন, ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য; কিন্তু যাহাতে অন্তর্জাত হয়, হৃদয়কম্প হয়, শরীর রোমাংচিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কৈ? কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বাসিত তরংগাবেগ কৈ? বিদ্যুচ্ছটাকৃত বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা কৈ? তাঁহার কবিতাস্রোত কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়, বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরংগতর্জন নাই,—মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন-শ্রবণ-তৃপ্তিকর।

মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্ছনা-উক্তি, বকুল-বিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরী মানিনীগণের রসালাপ, বিদ্যাসুন্দরের প্রথমমিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎর্সনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদ বধে নাই; কিন্তু উহার শব্দ প্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটাগর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাঁহাদিগের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, পূর্বে আমাদের ও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে, মেঘনাদবধের শব্দবিন্যাস অতিশয় কুটিল ও কদর্য এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পূর্বে আমি কান্ত হই নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারংবার আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, বিদ্যাসুন্দরের শব্দাবলীতে মেঘনাদ বধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদংগ এবং তলবার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু তরংগবিলাসী প্রমত্ত যোধগণের উৎসাহবর্ধন

জন্য তূরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক, ধনুষ্টংকারের সঙ্গে শংখনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় না। পাঠক-মহাশয়েরা ইহাতে মনে করিবেন না যে, মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাঁহার রচনার কতকগুলি দোষ আছে, কিন্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতাজনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই তাঁহার রচনার প্রধান দোষ অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়, বিশেষ্য, বিশেষণ, সংজ্ঞা, সর্ব্বনাম এবং কর্তা ক্রিয়া-সম্বন্ধে—তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেকস্থলে অস্পষ্টার্থদোষ জন্মিয়াছে—অনেক পরিশ্রম না করিলে, ভাবার্থ উপলব্ধি হয় না।

দ্বিতীয়ত—তিনি উপর্যুপরি রাশি রাশি উপমা একত্র করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং সর্বত্র উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না।

তৃতীয় দোষ—প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা। যথা—"স্তুতিলা," "শাস্তিলা", "ধ্বনিলা", "মর্মরিছে", "দ্বন্দ্বিয়া", "সুবর্ণি" ইত্যাদি।

চতুর্থত—বিরাম যাতি-সংস্থাপনের দোষ স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে; যথা—

"কাঁদেন রাঘব-বাংছা আঁধার কুটীরে
নীরবে—
"নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক ;—
"হেন কালে হনূসহ উতরিলা দূতী
শিবিরে।—
"রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র !—
"দেবদত্ত অস্ত্র-পুংজ শোভে পিঠোপরি,
রংজিত রংজনরাগে কুসুম-অংজলি—
আবৃত ;—

এই সকল স্থলে "গায়ক" "শিবিরে" "বীরেন্দ্র" "আবৃত" শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ার পদাবলী স্রোতোভংগ হেতু শ্রবণ কঠোর হইয়াছে।

এ সমাপ্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদ বধ গ্রন্থখানি সর্বাংগসুন্দর হইত, কিন্তু এরূপে দোষাশ্রিত হইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বংগভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফলত—

"গাঁথিব নূতন মালা,—
রচিব মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বলিয়া গ্রন্থকার যে সদর্প উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার সংপূর্ণ সফলতা হইয়াছে এবং এই "নূতন মালা" চিরকালের জন্য নয় তাঁহার কণ্ঠদেশে শোভাসম্পাদন করিবে, ইহার আর সন্দেহ নাই।

অতঃপর ছন্দ প্রণালী সম্বন্ধে গুটীকতক কথা বলা আবশ্যক।

ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্ণ এবং ইংরাজী ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রকৃতি সেরূপ নয়। ইহাতে যদিও হ্রস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষার প্রথানুসারে বংগভাষায় পদ্যরচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র; অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়া তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, দ্বাদশ ও চতুর্দশ অক্ষরের পর বিরাম-যতি থাকে; আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে শব্দের মিল থাকে; আবৃত্তির সময় সেই সেই স্থানে ছন্দ অনুসারে শ্বাসপতন করিতে হয়; এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে, আপাতত বোধ হয়, যেন শব্দের মিলই এ প্রণালীর প্রধান অংগ, কিন্তু কিংচিৎ অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, শব্দের মিল ইহার আনুসংগিক এবং শ্বাসনিক্ষেপের নিয়মই প্রধান কৌশল। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত অমিলিত-শব্দপূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, যথা,—

"দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী"—১
"আর কি কাঁদে, লো নদি! তোর তীরে বসি
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?"—২
"কি কাজ বাজায়ে বীণা, কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?"—৩
"শুনি গুন্ গুন্ ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর! এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!"—৪
"এসো, সখি! তুমি আমি বসি এ বিরলে
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে,—৫

ইত্যাদি।

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ-রচনায়ও এই প্রণালী। অতএব অমিত্র-চ্ছন্দ বলিয়া কাহারও কাহারও তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়া এতই বা বাগ্বিতণ্ডার আড়ম্বর কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন। কারণ, বিরাম, যতি অনুসারে পদবিন্যাস করা তাঁহারও রচনার নিয়ম কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদিচ্ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি যখন যে ছন্দে আরম্ভ হয়, তাহার শেষ পর্যন্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সর্বত্রই একরূপ বিরাম-যতি থাকে; মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রূপ না হইয়া সকল ছন্দ ভাংগিয়া সকলের বিরাম-যতির নিয়ম একত্র নিহিত ও গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোনও পংক্তিতে পয়ার-ছন্দের নিয়মে আট ও চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে ত্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় ও আট এবং কখনও বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতি বিভাগ-নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে, যথা—

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,—১
যজ্ঞের তুরংগ সংগে আসি, উতরিলা—২
নারী-দেশে ; দেবদত্ত শংখনাদে রুষি,—৩
রণরংগে বীরাংগনা সাজিল কৌতুকে ;—৪
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি ;—৫
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি ;—৬
উলংগিয়া অসিরাশি, কার্মুক টংকারি,—৭
আস্ফালি ফলক-পুঞ্জে ! ঝক্ ঝক্ ঝকি—৮
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী !—৯
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, উর্ধ্ব কর্ণে শুনি—১০
নূপুরের ঝন্‌ঝনি, কিংকিণীর বোলী,—১১
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল-ফণী—১২
বারি-মাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদরি,—১৩
গম্ভীর-নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি—১৪
দূরে ! রংগে গিরি-শৃংগে, কাননে, কন্দরে,—১৫
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি,—১৬
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে ।—১৭

উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে, ১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুর্দশ মাত্রার পর, ২য় ও ৩য় পংক্তিতে "আসি" "উতরিলা" "নারীদেশে" এবং "রুষি" শব্দের পর দশ অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, আর, ১৫শ পংক্তিতে "দূরে" "শৃংগে" ও "কন্দরে" শব্দের পর বিশ্রাম-যতি স্থাপিত হইয়াছে ।

পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল-প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ-রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং ঐ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাস পতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি করার কৌশল ।

প্রকারান্তরে অমিত্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না, সে একটি স্বতন্ত্র কথা ;—কিন্তু বংগভাষার যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে

যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারে ও বংগভাষায় ছন্দ রচনা হইতে পারে এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত 'ছন্দ কুসুম' গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় যে, যতদিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ অনুসারে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা প্রচলিত না হয়, ততদিন সে প্রণালীতে পদ্য রচনা পণ্ডশ্রম মাত্র—ইহা 'ছন্দ কুসুম' গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই পাঠক-মহাশয়দিগের হৃদয়ংগম হইবে। পরন্তু যদি কখনও বংগভাষার প্রকৃতির ততদূর বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্তী হন, তবে সে প্রণালী উৎকৃষ্টতর ও তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই।

বংগসুন্দরী কাব্য

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য

বিহারীলাল চক্রবর্তী বিরচিত বংগসুন্দরী কাব্য আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই কাব্যখানি মনোযোগপূর্বক প্রায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ১০।১১ বৎসর হইল মেঘনাদ বধ ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রূপে ভারতী দেবী বংগভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইরূপ জনগণের নিকট বিশিষ্ট পূজ্য হইয়াছে বলিয়া মহারব উঠিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সেই মূর্তির যে প্রকার বিকৃত অনুকরণ দেখিতেছিলাম, তাহাতে বংগ সমাজে ভারতী দেবীর আন্তরিক পূজা লাভ বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। এই হেতু আমরা নব নব গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে সচকিতনেত্র ছিলাম, ও সেই হেতু বংগসুন্দরী কাব্য পাইয়া আমরা বিশেষ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়াছি।

ভারতী দেবীর মূর্তি দ্বিবিধ ও তাঁহার অর্চনা ও দ্বিবিধ। তিনি কখন স্থূলদেহ ধারণ করিয়া স্থূল উপকরণের পূজা গ্রহণ করেন, কখন ছায়ারহিত পলকশূন্য দৈব শরীর ধারণপূর্বক ভক্তবৃন্দের মানস পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন। শারদীয়া ভগবতীর ন্যায় তিনি কখন স্থূল বাহনে অবতীর্ণ হয়েন ; কখন—

"সৌর খরতর করজাল সংকলিত"

সিংহাসনেও অবতীর্ণ হয়েন। কাব্যরচনার এই দ্বিবিধ প্রণালীর মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা বংগসুন্দরী কাব্য বিশেষ যত্ন সহকারে পড়িয়াছি।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্বে দুই একজন এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহার মত কৃতকার্য হয়েন নাই। তাঁহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া কেবল ইংরাজী কাব্য বিশেষের অনুকরণে

আকাংক্ষামাত্র বোধ হইয়াছিল ; কাব্য রচনা যে অনুকরণাকাংক্ষা ভিন্ন মানসিক শক্তির সাপেক্ষ, তাঁহাদিগের এ জ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ। বিহারীলাল চক্রবর্তী তাদৃশ কাব্য প্রণেতাদিগের অপেক্ষা কৃতকার্য হইয়াছেন। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, বিবেচনা করিতে হইবে।

কোন নূতন বা পুরাতন সাহিত্য গ্রন্থের গুণাগুণ বিবেচনা করিতে হইলে কোন কোন লোকে আপতত তাহার ভাষার রচনার পরীক্ষা করেন। পূর্বে এই প্রথাটী অতি বলবৎ ছিল ; এক্ষণে লজ্জা বা অন্য কোন কারণবশতই হউক এই প্রথাটী ক্রমশ পরিত্যক্ত হইতেছে। এক্ষণে অধিকাংশ লোকে বিচার্য গ্রন্থের ভাবকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিচার-পদ্ধতির এই পরিবর্তনটী শুভকর ও উন্নতিশীল বটে ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। একদা কোন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ লোককে নূতন নূতন প্রণীত কাব্য বিশেষের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন, কাব্যখানি মণিমুক্তা প্রবালাদি রত্নের ভাণ্ডের সদৃশ, কিন্তু কৌশলরচিত রত্নমালার সদৃশ নহে। আমরা এক্ষণে অল্পে অল্পে রত্ন প্রকৃত কি কৃত্রিম চিনিতে পারিতেছি বটে, কিন্তু বিচার্য গ্রন্থটী রত্নের ভাণ্ড কি মালা সে বিষয়ে দৃষ্টি করিতে শিখি নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি, কিন্তু দুই একজন ভিন্ন কে কোথায় তাহার অংগ প্রত্যংগ সমেত সর্বায়বঘটিত বিচার করিয়া থাকেন ?

মনুষ্যের কীর্তি এই উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে বিচারিত হওয়া উচিত। যেমন হর্ম্য বিশেষের সৌন্দয বিচার করিতে গিয়া আমাদিগের তদবয়ব সম্বন্ধে অংগ প্রত্যংগের প্রতিযোগিতার বিচার করা উচিত ; যেমন পরিধেয় অলংকারের শিল্পকবিতা বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া আমাদিগের তদুপকরণ সমুদয়ের পরস্পর ও সর্বসাকল্য সম্বন্ধে যথা যোগ্যতার বিচার করা উচিত, তেমনি গ্রন্থ বিশেষের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে কেবল তদন্তর্গত ভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সমুদয় অবয়ব পর্যন্ত দৃষ্টি চালনা করা কর্তব্য। এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে গ্রন্থের স্থূল অবয়ব, উপকরণ সন্নিবেশ, ভাবগ্রন্থি ও

ভাষাব্যবহার এই সকলের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে, ও এই পদ্ধতি অনুসারে আমরা ও বংগসুন্দরীর বিচার করিব।

আমাদের চক্ষে বংগসুন্দরী উৎকৃষ্ট কাব্য নহে; তথাপি উপরি উক্ত রূপ বিচারে যে পরিশ্রম আবশ্যক, বংগসুন্দরী কাব্য সম্বন্ধে আমরা তাহা স্বীকার করা কর্তব্য পেষ করিয়াছি। তাহার কারণ, ইহার প্রচার দ্বারা পূর্বোক্ত উৎকৃষ্টতর প্রণালীর দ্বার এই প্রথম উন্মুক্ত হইল। গ্রন্থ প্রণেতা ইংরেজী-বিদ্যা-বিশারদ; ইংরেজী-বিদ্যা-বিশারদ মণ্ডলীতে তাঁহার কাব্য বিশেষ আদৃত হইবার সম্ভাবনা; তিনি নব্য, সৎপরামর্শে তাঁহার অধিকার আছে; তাঁহার গ্রন্থে অনেক ভাল সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা ভবিষ্যতে আরও ভাল সামগ্রী পাইবার প্রত্যাশাপন্ন।

মূল প্রণালী সম্বন্ধে এ প্রশ্নের প্রশংসা করা হইয়াছে। সর্বাবয়ব সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। গ্রন্থ প্রতিপাদকের অভিপ্রায়—

"বংগ বালা চিরপরাধিনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিনী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই সপ্ত বংগসীমন্তিনী।
চিত্রেতে এদের দেহ মন"

কাব্যকর্তা কিজন্য এই সাতজন স্ত্রীকে বর্ণনার নিমিত্ত মনোনীত করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোক জীবনের অবস্থাভেদে কি প্রকার ভাব সম্পন্ন হয়, যদি তাঁহার তাহা দেখাইবার অভিপ্রায় থাকিত, তবে এই তালিকার মধ্যে প্রসূতি গৃহ-স্বামিনী আদি কয়েক জন স্ত্রীর সন্নিবেশিত হইবার অধিকার ছিল। ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থে যে সমস্ত নারী মূর্তি পৃথক্ পৃথক্ গঠিত হইয়া থাকে, যদি গ্রন্থকার সেই সমস্ত সংকলন পূর্বক একটী প্রতিমাপঞ্জরে সাজাইবার অভিপ্রায় করিতেন, তাহা হইলে তপস্বিনী ও বীরংগনাদি কতিপয় স্ত্রীর ঐ তালিকায় প্রবেশের অধিকার ছিল। ফলত, এই কয়েক

জন অংগনা পরস্পর কোন সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত নহে, গ্রন্থকার কেবল মাত্র একে একে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত গুটিকতক নারী কল্পনা করিয়াছেন। তিনি রত্নমালা রচনা না করিয়া সাতখানি রত্ন কৌটা প্রস্তুত করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন।

এইরূপ সংকল্প করাতে আমরা তাঁহাকে দোষ দিই না। গ্রন্থকারেরা যদৃচ্ছা সংকল্পে রচনা করিতে পারেন, সংকল্প বৃহৎ হইলে তন্নিবন্ধন প্রশংসা পান; সংকল্প ক্ষুদ্র হইলে তন্নিবন্ধন প্রশংসার অধিকারী হয়েন না এই মাত্র নতুবা কোন দোষ হয় না। কেহ দান সাগর করে, কেহ তিল কাঞ্চন করে, তাহাতে কোন দোষ নাই; দান সাগর সংকল্পে তিলকাঞ্চনের ব্যাপার হইলেই দূষনীয়।

কিন্তু গ্রন্থকার যে তিলকাঞ্চনের সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাতেই বা কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন? তাঁহার প্রণালী এইরূপ, নাটক রচনার পদ্ধতির মর্ম অবলম্বনপূর্বক কোন একটী বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার বর্ণনা করিয়া সেই বর্ণনার সংগে সংগে মনোনীত অংগনাগণকে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। যথা করুণা সুন্দরীকে বর্ণনার পূর্বে একটা গৃহদাহের ব্যাপার কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ করুণা সুন্দরীকে কোন নিকটস্থিত বারান্দায় দণ্ডায়মান করাইয়া তাঁহার তাৎকালিক মূর্তি চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণালী অতি সুন্দর ও তন্নিমিত্ত গ্রন্থকর্তাকে আমরা শত সাধুবাদ দিই কিন্তু এই নাটকোচিত অবস্থার সম্যক্ আবির্ভাবে তিনি কুত্রাপি কৃতকার্য হয়েন নাই। তাঁহার কল্পনা শক্তি আছে কিন্তু ভাল পরিস্ফুট নহে।

ভাবুকতাবিষয় গ্রন্থকারের প্রশংসা করিতে হয়। তিনি রাশীকৃত ভগ্ন কাচের মধ্যে দিব্য রত্ন নিহিত রাখিয়াছেন। এই রত্নগুলি অতি কোমল ও মধুরজ্যোতি। বহু কবিগণ মধ্যে এমন কেহ নাই যে ইহাদিগকে শ্লাঘাপূর্বক গলে পরিধান করিতে না পারেন। পাঠকবর্গ অনায়াসে চিনিতে পারিবেন।

ছন্দটী বড় কোমল, বড় মিষ্ট, কিন্তু চুটকী; বৃহৎ পুস্তকের উপযোগী নহে।

গ্রন্থকারের রচনা সকল স্থানে প্রাঞ্জল নহে। প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে তাহার আকাংক্ষারও কিছু অসদ্ভাব দেখায়। আর তাঁহার রচনাতে যেমন মধ্যে মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য লক্ষিত হয়, আবার মধ্যে মধ্যে তেমনি তাহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। কাব্য কর্তাদিগের কল্পনাশক্তি কিছু আদ্যোপান্ত সমান বলবতী থাকে না। তাঁহারা কখন কখন উড্ডীন হইয়া চন্দ্রালোকে পর্যন্ত উর্ধ্বে উঠেন, আবার বিশ্রামের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে পৃথ্বীতলে অবরোহণ করেন; কিন্তু বংগসুন্দরী কর্তা সাবধানতাপূর্বক অবরোহন করিবার কৌশল জানেন না। তাঁহাকে আমরা এই অনুরোধ করি, কোন গ্রন্থ রচনা করিবার পূর্বে সুকবি বিশেষের আচরণ ও কৌশল সম্যক্ রূপে হৃদয়ংগম করেন; তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন। যে সময়ে কল্পনা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে, সে সময়ে সদ্বিবেচনা ও সাধুরুচির সাহায্য লওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য।

(এডুকেশন গেজেট)

মানস বিকাশ

বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

বাংলা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতি কাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাংলায় এই জাতির কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাংলার সর্বোৎকৃষ্ট কবি জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলি এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য প্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি কবি। তৎপরে কতকগুলি "কবিওয়ালার" আবির্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবি-ওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেমবাবুর গীতি কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে তাহা বাংলা ভাষায় তুলনা রহিত। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতি কাব্য প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য-নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতি কাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি 'মানস বিকাশ' নামে যে কাব্য গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি

হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টি-বিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও বা কুজ্ঝটিকা রূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যেও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুজ্ঞের্য়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত যে রূপ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশ ভেদে, রাজ বিপ্লবের প্রকার ভেদ, ধর্ম বিপ্লবের প্রকার ভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকার-ভেদ, সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সংগে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বক্‌ল ভিন্ন কেহ বিশেষরূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্লের সংগে কাব্য সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি অল্প। মনুষ্য চরিত্র হইতে ধর্ম এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজ-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সংগে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটা কত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্যগণ অনার্য আদিম অধিবাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত, তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য-কুল প্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তারপর ভারতবর্ষের অনার্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগতা অনন্তরত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে,

তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহুকালের রক্ত-বৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নত-প্রকৃতি আর্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধন বৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালা-শোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, কালিদাসাদির নাটক ও মহাকাব্য সকল। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম শৃংখলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল, যে সাহিত্যরস-গ্রাহিনী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্য ও ধর্মানুকারিণী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার-শক্তি ধর্ম মোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্মই তৃষ্ণা, ধর্মই আলোচনা, ধর্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম-মোহের ফল পুরাণ।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশে অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল—বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্বরা এবং তাহার উপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য তেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে আমরা বাংলার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতা-পূর্ণ অতি সুমধুর, দম্পতী প্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি—চরিত্রানুকারী গীতি-কাব্য

সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বংগদেশের জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতি-কাব্যের এত বাহুল্য।

(২)

বংগীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দল প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য প্রকৃতিকে দীপ করিয়া, তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য চরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী মলয়সমীর, ললিতলতা কুবলয়দল-শ্রেণী স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকর-বৃন্দ, কোকিলকুজিতকুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসংগে কামিনীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাহুলতা, বিম্বোষ্ঠ সরসীরুহলোচন, অলস-নিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতংরগবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সংগে মানব হৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ; কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়; তৎপরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়-তলচারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল এই বাহ্য প্রকৃতির শক্তি।

স্থূল প্রকৃতির সংগে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিনী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতি মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রব-শূন্য, বিলাস-শূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাস পূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাংক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্ল কমল জাল শোভিত, বিহংগমাকুল, স্বচ্ছ-বারিবিশিষ্ট-সুন্দরসরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী, বেগবতী তরংগ-সংকুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষ-মালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসংগিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্ন শ্রেণীর গীতকবির আদর্শ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্তে।

আধুনিক বাংগালীগীতকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাংগালী কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব-কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্তী যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ, তাহার পুংখানুপুংখ সন্ধান্ জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এখনকার কবিগণ জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক-তত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল নানা বস্তু তাহাদিগের চিত্ত-মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া, তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের

কবিতাও দূর-সম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সংকীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সংগে সংগে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

"মানস বিকাশ" এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা "মানস বিকাশ" পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—"মিলন" ও "কাল" নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। "কাল" হইতে আমরা কিংচিৎ, উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময়,
নর নারী কীট পতংগ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত
হলো উদয়।
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময় ॥
দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারও নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখ নীরে তারে কর নিমগন,

পদযুগে পরে কররে দলন,
আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কতশত নরে যাও ভাসাইয়া,
নয়ন জলে।

এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি গন্ধ কয়। প্রাচীন বাংগালী গীতিকাব্য লেখকেরা এ পথে যাইতেন না; কালের কথা গাহিতে গেলে, সৃষ্টির আদি, রাজেন্দ্রের মুকুট, সমগ্র মনুষ্য জাতির নয়ন জল তাঁহাদিগের মনে পড়িত না; এ সকল জ্ঞান ও বুদ্ধি বিস্তৃতির ফল। প্রাচীন কবি, কালের গতি ভাবিতে গেলে, আপনার হৃদয়ই ভাবিতেন; নিজ হৃদয়ে কালের "দুরন্ত দংশন" কি প্রকার, তাহার বিষ কেমন, তাহাই দেখিতেন। কাল সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কবিতা তুলনার জন্য আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

এখন তখন করি, দিবস গোয়াঙনু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোয়াঙনু
খোয়ানু এ তনুয়াক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোয়াঙনু
খোয়ানু এ তনু আসে॥
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবি মাসে॥
অংকুর তপন তাপে তনু যদি জারব
কি করবি বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, ইত্যাদি।

(৩)

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃ-প্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃ-প্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃ-প্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃ-প্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এস্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জনসন।

ভারতচন্দ্রাদি বাংগালী কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন, যে ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে মাত্র। আধুনিক ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাংগালী কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতা দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু "অবকাশ রংজিনী"র লেখক এবং "মানস বিকাশ" লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল। যাহারা নিত্য পয়ার রচনা করিয়া বংগদেশ প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন না মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপিত করিতেছি; অন্তঃপ্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতি কোন প্রকৃতির সংগে তাহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন দোষই নাই।

"মানস বিকাশ" কবিতার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা, "মিলন", কিন্তু

তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না। তাহা কর্তব্য নহে এবং তদুপযুক্ত স্থানও আমাদিগের নাই। এজন্য "প্রেম প্রতিমা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আইল বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায়
তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,
বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায়।
তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনী,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরণীতলে।
আঁধার আকাশে হিমাংশু-কিরণ
হাসি হাসি করে কর বিতরণ
ভাসে যেন, মরি অখিল ভুবন
সুখ সলিলে॥
কে বলে কেবল নন্দন কাননে,
ফোটে পারিজাত? ফোটে না এখানে
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে
ফুটেছে কত!
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে
কতশত ফুল প্রফুল্ল বদনে
ফোটে নিয়ত!"

ইংরেজ শিষ্য এইরূপে প্রেম বর্ণন করিলেন, ইহার সংগে কণ্ঠিধারী

বৈরাগিগণ কৃত প্রেম বর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্বে আর একজন হাফ ইংরেজ হাফ জয়দেব-চেলার কৃত কবিতা শুনুন ; এ কবিতারও উদ্দেশ্য প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনা।

"মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে
কমল কাননে।
কমলিনী কোন ছলে, ডুবিয়া থাকিবে জলে,
বংচিয়া রমণে।
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তারপাশে
মদন রাজার বিধি, লংঘিব কেমনে।
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে, এ তিন ভুবনে॥
ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মন রে
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যাম দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসী ?
সৌদামিনী ঘন সনে, নাচে সদানন্দ মনে
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা বিলাসী

× × ×

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশেরে
অবিরাম গতি !
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি
নিশি রূপবতী॥
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু-নিধি, আমারে দিয়াছে বিধি,
বিরহ আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি।"

এক্ষণে বৈষ্ণবের দলের দুই একটা গীত—

সই, কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায়, লাগিবে বলিয়ে
চন্দন না মাখে অংগে।
গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোসর
সদাই ফিরয়ে সংগে॥
তিলে কত বেরি, মুখ নিহারয়ে
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কতদূর মানয়ে
তেঁই সদাই লয় নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমতি পীরিতি,
আর কি জগতে আছে॥

পরিশেষে আমাদের গীতকাব্যের আদি পুরুষ, এ শ্রেণীর সকল কবির আদর্শ, জয়দেব গোস্বামীর একটি গীত উদ্ধৃত করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জয়দেব যেমন সুকবি, তেমনি রসিক—তাঁহার কবিতার রস বড় গাঢ়। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাংগালী—তত গাঢ় রস বংগ-দর্শনের পাঠকদিগের সহিবে না। তবে যাত্রাকরদিগের কৃপায়, অনেকেই তাঁহার দুই একটি গীত, বুঝুন না বুঝুন, শুনিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, বা গীত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবের একটি গীত স্মরণ করুন—"বদসি যদি কিংচিদপি" ইত্যাদি গীত স্মরণ করিলেও চলিবে। এই কয়টি কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন,

প্রথমে, জয়দেবে বহিঃ-প্রকৃতি-ভক্তি ইন্দ্রিয়পরতায় দাঁড়াইয়াছে। দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায়শেখরে বহিঃ-প্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্বর্তিনী এবং সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সংকীর্ণ পথে—নিকট

সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সংকীর্ণপথে—গতি অত্যন্ত বেগবতী। তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতায়, সেই গতি পরিসর পথবর্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই, নদীর স্রোতের ন্যায় বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে। চতুর্থ, মানসবিকাশে, আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটিয়াছে।

"মানস বিকাশ" অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্ট নহে। অনেক স্থানেই নবীনত্বের অভাব—অনেকস্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাক্‌শক্তি, এবং পদ্য-বিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। "মিলন" নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর, যে তাহা হেমবাবুর যোগ্য বলা যায়; কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। ফলে এই কবি আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই। (বংগদর্শন, ১২৮০)

পলাসির যুদ্ধ

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মনুষ্যজগতে নিখুঁতরূপ নাই এবং নিখুঁত কাব্য নাই। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্যখানিও সর্বাংশে নিখুঁত নহে। তবে, একথা তথাপি অক্ষুব্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, 'পলাসির যুদ্ধ' কাব্যে সর্বত্রই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণস্বরূপ গ্রথিত হইবে, এবং যতদিন এই ভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বংগবাসীর হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।

এই কাব্যের বিষয় পলাসির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অথবা নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন এবং বংগে ইংরেজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়। এদেশীয়েরা সাধারণত যে সকল বিষয়ে আদর করিয়া থাকেন, এই কাব্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতে দেবতা নাই, গন্ধর্ব নাই, দেবাসুরের যুদ্ধ নাই, তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা নাই, জটাচীরধারী তাপসদিগের কঠোর তপস্যার কথা অথবা শৈবালসমাবৃতা পদ্মিনীর ন্যায় বল্কলাবৃতা তপস্বিকন্যাদিগের প্রেম, বিরহ ও অশ্রুবর্ষণ প্রভৃতি ভারতপ্রিয় হৃদয়হারি বৃত্তান্ত নিচয়েরও উল্লেখ নাই। কিন্তু তথাচ ইহাতে যাহা আছে, তাহা পাঠ করিবার সময় হৃদয় অনিবচনীয় আনন্দে উছলিয়া উঠে, এবং কল্পনা অনন্ত সমুদ্রে ভাসমান হয়।

আমরা শুদ্ধ কল্পিত বিষয়ের উচ্চতা, প্রসার ও অতুল গৌরব স্মরণ করিয়াই কবির প্রশংসা করিতেছি না। এই কল্পনায় নবীন বাবুর আর একটি বিশেষ প্রসংসা আছে। তিনি যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্বে পাদক্রম করেন নাই। তিনি যে 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস সহকারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে কেহই তাঁহার জন্য আলোকবর্তিকা স্থাপন করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময় হইতে এ দেশে যিনিই যে কোন কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন,

তিনিই একটি পুরাতন অবলম্বন পাইয়াছেন। কেহ পুরাণ ফুলে নূতন মালা গাঁথিয়াছেন, কেহ নূতন ফুলে পুরাণ সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন। নবীব বাবুর তাহা হয় নাই। তাঁহার অবলম্বন স্বহৃদয় ও স্বকীয় কল্পনা মাত্র। তাঁহার জন্য বাল্মীকি ও মনি বেধ করিয়া যান নাই, এবং কবিকল্পপাদপ ব্যসদেব ও অনন্ত-রত্নরাশি সাজাইয়া রাখেন নাই। তাঁহার প্রায় সমস্তই স্বহস্তে সংচয়ন ও স্বহস্থে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা সামান্য অভিমানের কথা নহে। গ্রন্থখানিতে যদিও আধুনিক রীতি অনুসারে একটি বিজ্ঞাপন সংযোজন করিয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কবি আশার সম্বোধনচ্ছলে দ্বিতীয় সর্গের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোকে মনের বিনয়াচ্ছন্ন অভিমান ও অভিমনাচ্ছন্ন ভয় অতি সুকৌশলে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিমানকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি, এবং তাঁহার আশা যে দুরাশা নহে, ইহাও সরল হৃদয়ে বিশ্বাস করি। যাঁহার কৃপায় আজি বংগে মধুসূদন প্রভৃতির নাম লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিচরণ করিতেছে, তিনি নবীন বাবুর প্রতি অপ্রসন্ন নহেন।

পলাসির যুদ্ধ কাব্য অনতিবৃহৎ পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম সর্গে নবাব বিদ্রোহিদিগের ষড়যন্ত্র ও কূটমন্ত্রণা, দ্বিতীয় সর্গে ব্রিটিশ সেনার শিবির সন্নিবেশ তৃতীয় সর্গে পলাসিক্ষেত্রের বর্ণনা প্রসংগে সিরাজদ্দৌলার তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন ইত্যাদি, চতুর্থ সর্গে যুদ্ধ এবং পঞ্চম সর্গে শেষ আশা অথবা সিরাজদ্দৌলার উপাংশুহত্যা।

প্রথম সর্গের আরম্ভ যেমন গম্ভীর, তেমনই মনোহর। বোধহয়, মেঘনাদ বধের আরম্ভ বিনা বাংলার কোন কাব্যের প্রারম্ভ বর্ণনাতেই এইরূপ ভয়ংকর গাম্ভীর্য এবং এইরূপ পরিম্লান মনোহারিত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। অভ্রভেদী পর্বত কি অনন্তবিস্তারিত সমুদ্রাদির বর্ণনাতে মনে এক গাম্ভীর্যের আবেশ হয়। ইহা সেইরূপ গাম্ভীর্য নহে। কোন অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী অংগনা, কি মৃদুবাহিনী স্রোতস্বিনী, কিংবা সরোবিলাসিনী ফুল্ল কমলিনী প্রভৃতির বর্ণনাতেও উৎকৃষ্ট কবিরা মনো-হারিত্ব সৃজন করিতে পারেন। এই মনোহারিত্বও সেই প্রকারের নহে।

যদি কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর বিষাদের প্রতিমূর্তি আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেন এবং সেই মূর্তিতে আতংক ও আশা এই উভয়ের বিরোধ এবং শোকের মলিনতা ভালরূপে ফলাইতে পারিতেন, তবে তাহাকেই ইহার উপমাস্থল বলিয়া নির্দেশ করিতাম। পড়িবার সময় প্রতীতি হয়, যেন প্রকৃতি আপনি আসিয়া আজন্মদুঃখিনী বংগভূমির দুঃখে করুণকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, আর সমস্ত সংসার ভয়ে, বিস্ময়ে এবং শোকভরে স্তম্ভিত হইয়া অনন্যমনে ও অনন্যকর্ণে সেই বিলাপ শ্রবণ করিতেছে।

দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের বর্ণনায় এই অংশে একটি আশ্চর্য পংক্তি কবির লেখনী হইতে হঠাৎ স্খলিত হইয়াছে:—

'তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল'

সংস্কৃতে অনুবাদ করিলে এই পংক্তিটিকে মহাকবি ভারবির নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকার্ধের সংগে অকুতোভয় গাঁথিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

"ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা
তিমিরসংবলিতেব বিবস্বতঃ"

এই সর্গের মধ্যে কিছু দূরে প্রবিষ্ট হইলে যবননিপাতের নিদানভূত ভারতবিখ্যাত জগৎ শেঠের নিভৃতমন্ত্রভবন। এই মন্ত্রণাচিত্রে অনুকৃতির কিংচিৎ ছায়া আছে। যাঁহারা মিল্টনের স্বর্গভ্রংশকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পাণ্ডিমোনিয়মের সেই লোমহর্ষণ বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহা বিস্ময়কর কি বিচিত্র বোধ না হইতে পারে। কিন্তু অনুকৃতির ছায়া আছে বলিয়াই যে ইহা কোন প্রকারে অবশেষ কারণ হইয়াছে, এমন নহে। আদৌ, পলাসির যুদ্ধে এই অংশ অপরিহার্য। এটুকু ছাড়িয়া দিলে ইতিহাসকে লংঘন করা হয়। দ্বিতীয়ত এই মন্ত্রণায় যাঁহারা অধিনায়ক তাঁহাদিগের সহিত পাণ্ডিমোনিয়মের মন্ত্রণাধিনায়কদিগের অনেক বৈলক্ষণ্য। ইহারা রক্তমাংসের মনুষ্য, তাহারা কবিকল্পিত অপদেবতা। ইহাদিগের শোক, দুঃখ, মর্মব্যাথা এবং আশা ও ভয় আমরা বুঝিতে পাই;

তাহাদিগের সমস্তই মানবীয় সহানুভূতির বহির্ভূত। আমরা এই অংশ হইতে বিশেষ বাছনি না করিয়া কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বর্ণনায় কিরূপ প্রশংসনীয় চিত্র—নৈপুণ্য দেখান হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

"রাখিয়া দক্ষিণকরে দক্ষিণ কপোল;
বসি অবনতমুখে বীর পঞ্চজন,
বহে কি না বহে শ্বাস, চিন্তায় বিহ্বল
কুটীল ভাবনা বেসে কুঞ্চিত নয়ন।
অনিমেষ নেত্রে কষ্টে যেন একমনে
পড়িছে বংগের ভাগ্য অংকিত পাষাণে
বিধির অস্পষ্টাক্ষরে, কিংবা চিতসনে
প্রাণ যেন আরোহিয়া কল্পনা-বিমানে,
সময়ের যবনিকা করি উদ্ঘাটন,
বংগ ভবিষ্যৎ সিন্ধু করে সন্তরণ"
"একটি রমনী মূর্তি বসিয়া নীরবে,
গৌরাংগিনী, লম্বগ্রীবা, আকর্ণ-নয়ন,
(সুখ-তারা শোভে যেন আকাশের পটে)
শোভিছে উজ্জ্বলি জ্ঞান-গর্বিত বদন।
আবার পলকে সেই নয়নযুগল,
স্নেহের সলিলে হয় কোমলতাময়,
এই বর্ষিতেছে ক্রোধ—গরিমা-গরল
অমনি দয়াতে পুন দ্রবীভূত হয়।
বিশ্বব্যাপী সেই দয়া জাহ্নবী যেমন
সমস্ত বংগেতে করে সুধা বরিষণ।"
"সুস্নিগ্ধ নয়নে ঐ গম্ভীর বদনে,
করতলে বামগণ্ড করিয়া স্থাপন,
ভাবিছে জানকী যেন অশোক কাননে,
আপন উদ্ধার চিন্তা, বিষাদিত মন।

আবার এদিগে দেখ, স্বতন্ত্র আসনে
নীরবে বসিয়া এক তেজস্বী যবন,
দুরূহ ভাবনা যেন ভাবিতেছে মনে,
শ্বেত শ্মশ্রু-রাশি তার চুম্বিছে চরণ।
ক্ষণে চাহে শূন্যপানে, ক্ষণে ধরাতল
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে শ্মশ্রু করে দলমল।"

*　　　*　　　*

কোন ব্রতে ব্রতী আজি কে বলিবে হায় ?
কি বর মাগিছে সবে শ্যামার চরণে,
সামান্য লোকের মন বলা নাহি যায়,
রাজাদের কি কামনা বলিব কেমনে ?
ঐ দেখ—
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি তুলিয়া বদন,
কষ্টের স্বপন যেন, হলো অপসৃত,
সংগীদের মুখপানে করি নিরীক্ষণ
কহিতে লাগিলা মন্ত্রী নিজ মনোনীত।
পর্বত নির্ঝর হতে অবরুদ্ধ নীর,
বহিতে লাগিল যেন, গরজি গম্ভীর।"

কূটচক্রবদ্ধ মন্ত্রণাকারীদিগের প্রত্যেকেই সিরাজদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী ও মর্মান্তিক শত্রু ছিলেন। সিরাজের সর্বনাশ হউক এবং তদীয় সিংহাসন এই মুহূর্তেই বিচূর্ণিত হইয়া যাউক ইহা প্রত্যেকেরই প্রাণগত কামনা ছিল। কিন্তু কবি অতি সাবধানে, অতি সুকৌশলে, ইঁহাদিগের এক একজনের ভাব এক এক রূপ ভাষায় প্রকাশিত করিয়া চরিত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়াছেন এবং সেই সংগে স্বকীয় লোকপ্রতিজ্ঞা এবং শাব্দিক ক্ষমতারও পরিচয় দিয়াছেন। মন্ত্রিবর রায় দুর্লভ কপট ধার্মিক। তাঁহার মন কূর্মশুণ্ডবৎ। উহা একবার বাহিরে আইসে, আর বার সংকচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তিনি কিছুই পরিষ্কার দেখিতে পান না। যেখানে পদনিক্ষেপ করিতে যান, সেখানেই তাঁহার

কণ্টক ভয়। যাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তিনি সম্যক্ বিশ্বাস করেন না। শেষে, প্রাণভয়কে পাপভয় বলেন, এবং এইরূপ লোকের যেমন হইয়া থাকে, মনের কথা মনেই রাখিয়া ইহাঁর এবং উহাঁর মুখ পানে চাহিয়া থাকেন। তাহার পর জগৎ শেঠ যেমন পাণ্ডব সভায় ভীম, তেমনি এই সভায় জগৎ-শেঠ;—অকপট, অসন্দিগ্ধ চিত্ত, অটলসাহসপূর্ণ এবং অভিমানবিষে জর্জরিত। শেঠ বরের হৃদয়ের ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মত, উহা হইতে যাহা কিছু উদ্গীর্ণ হয়, তাহাই শ্রোতার অংগে 'তপ্তলোষ্ট্রসম' নিপতিত হয়, কথায় ধমনীতে অগ্নিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। জগতশেঠের প্রতিজ্ঞাও ভীমের ন্যায়, শুনিলেই হৃদয় চমকিয়া উঠে এবং যেন এতক্ষণ পরে পুরুষ সম্মুখে আসিয়াছি এইরূপ প্রতীতি জন্মে;—

"সম্ভব, হইবে লুপ্ত শারদচন্দ্রমা,
অসম্ভব, হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।"

* * *

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন,
উপাড়িব একা নভো-নক্ষত্র-মণ্ডল,
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল।
যদি পাপিষ্ঠের থাকে সহস্র পরাণ,
সহস্র হলেও তবু নাহি পরিত্রাণ।"

রাজনগরেশ্বর মহারাজ রাজ বল্লভের কথায় বিষের মিশ্রণ আছে, তাড়িতবেগ নাই, কথা যেন ফুটে ফুটে হইয়াও দুঃখভরে কণ্ঠলগ্ন হইয়া থাকে। কি এই যে অস্ফুটকথা তাহাতেও

"* * * উঠিল কাঁপিয়া
দুরু দুরু করি মিরজাফরের হিয়া।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত ধার্মিক, পাপদ্বেষী, পবিত্র ও পরদুঃখকাতর। তিনি যখন আলিবর্দির অকলংক চিত্রপটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিরাজের কলংকপংকিল, কুৎসিত প্রতিমূর্তি নিরীক্ষণ করেন, তখন ঘৃণায়

তাঁহার আত্মা জর্জরিত হয়। কিন্তু তিনি জগৎশেঠের মত সাহসী নহেন, রাজবল্লভের মত কূটভাষীও নহেন। তাঁহার পরামর্শ স্পষ্ট কথা। চক্রীদিগের মধ্যে তাঁহারই চক্রান্ত নাই, কারণ তিনি মীমাংসাকারী।

যদি কোন ব্যক্তি সুগভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা কোন অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুতশব্দ শ্রবণ করিয়া জাগিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত সেরূপ নানাবিধ অচিন্তনীয়ভাবে তৎকালে আলোড়িত হয়, এই কাব্যের প্রথম সর্গ হইতে দ্বিতীয় সর্গে অবতীর্ণ হওয়া মাত্র পাঠকের অসাবধান চিত্ত ও সহসা সেইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠে। প্রথম সর্গের সমস্ত কথাই পূর্বে এক একবার নিশার দুঃস্বপ্নের মত অলীক বোধ হয়, অথবা ঘোরান্ধ-রজনীতে অকস্মাৎ মেঘগর্জন শ্রবণ করিলে কিংবা অকস্মাৎ দামিনীর ক্ষণস্থায়ি চমক দেখিলে, তাহা যেমন শ্রুতি কি দৃষ্টির বিভ্রম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, সেইরূপ যাহা কিছু শুনিয়াছি এবং যাহা কিছু দেখিয়াছি সমস্তই যেন মনের ভ্রান্তি, এইরূপ বিশ্বাস করিলেই সেই প্রীতিকর ভ্রম ও প্রিয় বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া যায়; এবং যাহা দেখি নাই তাহা দেখিয়া এবং যাহা শুনি নাই তাহা শুনিয়া মন বিস্ময়ের পর ভয়ে এবং ভয়ের পর বিস্ময়ে বিস্ফারিত ও সংকুচিত হয়। কোথায় ইংলণ্ড, আর কোথায় বংগভূমি। কিন্তু এখন কি শুনি, আর কি দেখি? না—

> "ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজে ঝম্ ঝম্,
> হইতেছে পদাতিক-পদ সংচলন
> তালে তালে, বাজে অস্ত্র ঝণন্ ঝণন্,
> হ্রেষিছে তুরংগ রংগে, গর্জিছে বারণ।
> থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে,
> ঘুরিছে ফিরিছে সৈন্য, ভুজংগ যেমতি
> সাপুড়িয়া মন্ত্র বলে; কভু অস্ত্র করে
> কভু স্কন্ধে; ধীরপদ; কভু দ্রুত গতি।

'ভ্রমের' ঝর্ঝর রব বিপুল ঝংকার,
বিজ্ঞাপিছে ব্রিটিশের বীর অহংকার।"

এই সর্গে সমরোন্মুখ সৈনিকদিগের মনের ভাব আঁকিতে যাইয়া কবি মধ্যস্থলে আশার যে একটি বন্দনা করিয়াছেন, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকিবে। এই বন্দনাটিকে স্কটলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ কবি, ক্যাম্বেলের 'আশা' নামক কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পাঠকবর্গ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিবেন। ক্যাম্বেলের আশা• পৃথ্বীলোক পরিত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বতম গগনে বিচরণ করে; নবীনবাবুর আশা স্নেহগদগদ প্রিয়-কণ্ঠের ন্যায় হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংচরণ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লয়। দুইটিই সুন্দর ও সুখদর্শন; কিন্তু একটি মধ্যাহ্ন সূর্যের খরজ্যোতি, আর একটি লঘুমেঘাবৃত চন্দ্রমার শীতলকান্তি; একটি সুদূরবর্তিনী আর একটি মর্মস্পর্শিনী।

যিনি ব্রিটিশ-সেনার প্রাণ, পলাসিযুদ্ধের প্রধান নায়ক এবং ভারতে ইংরেজ রাজমহিমার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সেই চিরবিশ্রুতনামা দুর্ধর্ষপ্রকৃতি ক্লাইভের সহিত এতক্ষণ কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কোথায় ছিলেন, কেন বংগে আসিলেন, এবং বংগে আসিয়াই বা আজ কি কারণে কাটোয়া শিবিরে তরুতলে একাকী গভীর চিন্তার নিমগ্ন, কবি আখ্যায়িকার প্রচলিত রীত্যনুসারে ইতঃপূর্বে তাহার কিছুই বলেন নাই। কিন্তু আশার নিকট জিজ্ঞাসাচ্ছলে যে ভাবে বীরবরকে সহসা অভিনয়ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন, তাহা অতি সুচারু হইয়াছে। এইরূপ পটপরিবর্তনে মনে কৌতূহলের উদ্দীপনা হয়, এবং উত্তরোত্তর চিত্রগুলি দেখিবার জন্য চিত্ত স্বভাবতই উৎসুক হইয়া উঠে।

ক্লাইভের তৎকালীন মুখচ্ছবি এবং মনোগত ভাবের যেরূপ বর্ণনা হইয়াছে, তাহাও আমাদের নিকট প্রশংসনীয় বোধ হইল।—

* * * "প্রশস্ত ললাট
বীরত্বের রংগভূমি, জ্ঞানের আধার;
বক্ষঃস্থল যেন যমপুরীর কপাট,—
প্রশস্ত, সুদৃঢ়; বহে তাহার ভিতর

দুরাকাংক্ষা, দুঃসাহস, স্রোত ভয়ংকর।”
“যুগল নয়ন জিনি উজ্জ্বল হীরক
আভাময়; অন্তর্ভেদি তীব্রদৃষ্টি তার,
স্থির অপলক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক।
যে অসম সাহসাগ্নি হৃদয়ে তাঁহার
জ্বলে, যথা অগ্নিগিরি অন্তঃস্থ অনল;
প্রদীপ্ত নয়নে সদা প্রতিভা তাহার—
ভুবনবিজয়ী জ্যোতি; বরষি গরল
শত্রুর হৃদয়ে; কিন্তু কখনও আবার
সে নেত্র-নীলিমা নীল নরকাগ্নি মত,
দেখায় চিত্তের সুপ্ত দুষ্প্রবৃত্তি যত।”
“নীরবে, নির্জনে, বীর বসি তরুতলে;
অর্থহীন ঊর্ধ্বদৃষ্টি; বোধ হয় মনে
ভেদিয়া গগন দৃষ্টি কল্পনার বলে,
ভবিতব্যতার ঘোর তিমির-ভবনে
প্রবেশিয়া, চেষ্টিতেছে দূর ভবিষ্যত
নিরখিতে;—

নবীনবাবু বর্ণনীয় বীরপুরুষের চক্ষু এবং দৃষ্টির প্রতিই সমধিক মনোযোগ দিয়াছেন। বোধ হয়, যদি তিনি তাঁহার অধর, ওষ্ঠ, নাসা, ভ্রূযুগ এবং উপবেশন—ভংগিমাকেও ঐ সঙ্গে আঁকিয়া তুলিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানেরও সম্মান রক্ষা পাইত এবং বর্ণনাও অধিকতর চমৎকারিণী হইত।

ক্লাইভের বর্ণনায় কিংচিৎ ন্যূনতা থাকিলেও, যিনি ধ্যানযোগে তদীয় মানসচক্ষুর সম্মুখবর্তিনী হইয়া এই ক্ষুদ্রতাময় নরলোকে ক্ষণকাল বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিলেই সকল কথা ভুলিয়া যাই। যখন বীরকেশরী ক্লাইভ, সংশয় দোলায় দোলায়িত হইয়া আশার হিল্লোলে একবার উপরে উঠিতেছেন এবং পরিণাম চিন্তায় আবার জড়সড় হইয়া ভূতলে পড়িতেছেন; যখন সম্পদ ও বিপদ, বিজয় ও

পরাজয় এবং কীর্তি ও অকীর্তির বিভিন্ন মূর্তি তাঁহার কল্পনানেত্রে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহাকে ভয়ানকরূপে বিলোড়ন করিতেছে; এবং যখন অপমানের বৃশ্চিক-দংশন, লোভের অংকুশ-তাড়না এবং অভিমানের প্রদীপ্তবহ্নি তাঁহার চিত্তকে এক অনির্বচনীয় উৎসাহে স্ফীত করিয়া তুলিতেছে, এমন সময়ে রাজরাজেশ্বরী-রূপিণী এক দিব্য-রমণী আরাধ্য দেবতার ন্যায় অথবা মূর্তিমতী সিদ্ধি কি জয়শ্রীর ন্যায়, অন্ধকার গৃহে দীপালোকবৎ, অকস্মাৎ তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। তখন,—

"সহস্র ভাস্কর তেজে গগন প্রাংগণ
ভাতিল উপরে; নিম্নে হাসিল ভূতল;
নামিল আলোকরাশি ছাড়িয়া গগন,
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব রমণী"

এই রমণী চিত্র অপ্রতিম। এই অলৌকিক রূপরাশি দর্শনে অতি নিকৃষ্টস্বভাব মনুষ্যেরও কিছুকালের জন্য আত্মবিস্মৃতি হয়, এবং যে পবিত্রতা তাহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই, তাহা আসিয়া তাহাতে আবিষ্ট হয়।

"কোটি কোহিনুর কান্তি করিয়া প্রকাশ,
শোভিছে ললাটরত্ন, সেই বরাননে;
গৌরবের রংগভূমি, দয়ার নিবাস,
প্রভুত্ব ও প্রগল্‌ভতা বসে একাসনে।
শোভে বিমণ্ডিত যেন বালার্ক কিরণে
কনক অলকাবলী বিমুক্ত কুংচিত,
অপূর্ব খচিত চারু কুসুম রতনে,—
চির বিকসিত পুষ্প, চির সুবাসিত"

* * *

"ঝলসিছে শীর্ষোপরি কিরীট উজ্জ্বল,
নির্মিত জ্যোতিতে, জ্যোতির্মালায় খচিত,

জ্যোতি-রত্নে অলংকৃত জ্যোতিই সকল ;
জ্বলিছে হাসিছে জ্যোতি চির প্রজ্বলিত।
উজ্জ্বল সে জ্যোতি জিনি মধ্যাহ্ন তপন,
অথচ শীতল যেন শারদ-চন্দ্রমা,
যেমন প্রখর তেজে ঝলসে নয়ন,
তেমতি অমৃতমাখা পূর্ণ মধুরিমা।
ক্লাইব মুদ্রিত নেত্রে জাগ্রত স্বপনে
ভুবন-ঈশ্বরী মূর্তি দেখিলা নয়নে"

অভয়া মাভৈ রবে ক্লাইবের আকুলপ্রাণকে আশ্বস্ত করিয়া,—তাঁহার নির্বাণোন্মুখ সাহসকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া, আকাশ-বাণীর মত সে কয়টি কথা বলিলেন, তাহা শুনিবার জন্য হৃদয় যার-পর নাই অধীর হয়, অথচ শুনিয়া দুঃখের মুর্মুর-দাহনে দগ্ধ হইয়া যায়।—

"তোমার চিন্তায় আজি টলিল আসন ;
আসিনু পৃথিবীতলে, তোমারে বাছনি !
শুনাইতে ভবিষ্যত বিধির লিখন,—
শুনিলে উল্লাসে তুমি নাচিবে এখনি।"

* * *

"সোনার ভারতবর্ষে, বহুদিন আর,
মহারাষ্ট্রী মোগল বা ফরাসী দুর্জয়
করিবে না রক্তপাত ; দ্বিতীয় 'বাবর'
ভারতের রংগভূমে হইয়া উদয়
অভিনব রাজ্য নাহি করিবে স্থাপন ;
কিংবা অতিক্রমি দূর হিমাদ্রি কান্তার,
দিল্লীর ভাণ্ডার রাশি করিতে লুণ্ঠন
ভীমবেগে দস্যুস্রোত আসিবে না আর,
ভারতের ইতিহাসে উপস্থিত প্রায়
অচিন্ত্য, অশ্রুত, এক অপূর্ব অধ্যায়।"

আমরা এই সর্গ হইতে আর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। বোধ হয়, রসগ্রাহী সহৃদয় ব্যক্তিরা উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইবেন। যদি কল্পনার উচ্চতায়, এবং চিত্রগত কারুকার্যের চমৎকারিতায় আত্মাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারিলে কাব্যের প্রশংসা হয়, তবে এ অংশটি কতদূর প্রশংসনীয় তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। প্রাচীনতার প্রতি অন্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, পক্ষপাত-শূন্য হৃদয়ে বিচার করিলে, এই কবিতা কয়টির তুলনাস্থল অল্প আছে। যখন সেই জ্যোতির্ময়ী বরবর্ণিনী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সাধক সিদ্ধকাম হইয়াছেন; তখন তিনি তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়া যেন অংগুলিনির্দেশ সহকারে, বিধাতার অংকিত 'ভারতবর্ষের ভাবি মানচিত্রখানি' দেখাইতে লাগিলেন। ভারতবাসি! জীবিত হও আর মৃত হও, তুমিও আজ সেই চিত্রখানি একবার দর্শন কর,—

"অনন্ত তুষারাবৃত হিমাদ্রি উত্তরে
ওই দেখ উর্ধ্বে শিরে পরশে গগন;
অদ্রির উপরে অদ্রি অদ্রি তদুপরে,
কটিতে জীমূতবৃন্দ করিছে ভ্রমণ;
দক্ষিণে অনন্ত নীল ফেনিল সাগর,
—উর্মির উপরে উর্মি, উর্মি তদুপরে—
হিমাদ্রির অভিমানে উন্মত্ত অন্তর
তুলিছে মস্তকদেশ ভেদি নীলাম্বরে;
অচল পর্বতশ্রেণী শোভিছে উত্তরে,
চংচল অচল রাশি ভাসে সিন্ধুপরে।"
"বেগবতী ঐরাবতী পূর্ব সীমানায়;
পঞ্চভুজ সিন্ধুনদ বিরাজে পশ্চিমে;
মধ্যদেশে, ওই দেখ, প্রসারিয়া কায়
শোভে যে বিস্তৃত রাজ্য রঞ্জিত রক্তিমে,
বিংশতি ব্রিটন নাহি হবে সমতুল;
তথাপি হইবে—আর নাহি বহুদিন;

অভাগিনী প্রতি বিধি চির প্রতিকূল—
বিপুল ভারত, ক্ষুদ্র ব্রিটন অধীন।
বিধির নির্বন্ধ বাছা খণ্ডন না যায়,
কিবা ছিল রোম রাজ্য এখন কোথায়?”

“ওই শোভে শতমুখী ভাগীরথী তীরে
কলিকাতা, ভারতের ভাবি রাজধানী;
আবৃত এখন যাহা দরিদ্র-কুটীরে,
শোভিবে অমরাবতী রূপে করি গ্লানি
রাজ-হর্ম্যে, দৃঢ় দুর্গে, গ্যাসের মালায়।
ওই যে উড়িছে উচ্চ অট্টালিকা শিরে
ব্রিটিশ পতাকা; যেন গৌরবে হেলায়
খেলিছে পবন সনে অতি ধীরে ধীরে
তুমিই তুলিয়া সেই জাতীয় কেতন,
ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য করিবে স্থাপন।”

“নব রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তোমায়,
আমি বসাইব ওই রত্ন-সিংহাসনে;
আমি পরাইব রাজমুকুট মাথায়,
সমস্ত ভারতবর্ষ আনত বদনে
পালিবে তোমার আজ্ঞা, অদৃষ্টের মত,
তোমার নিঃশ্বাসে এই ভারত ভিতরে
কত রাজ্য, রাজা, হবে আনত, উন্নত;
ভাসিবে যবনলক্ষ্মী শোণিতে, সমরে;
প্রণমিবে হিমাচল সহিত সাগর,—
ইংলণ্ডের প্রতিনিধি—ভারত-ঈশ্বর।”

চিত্র প্রদর্শনের পরক্ষণেই,—

“অদৃশ্য হইল বামা; পড়িল অর্গল

ত্রিদিব কবাটে যেন, অন্তর-নয়নে
ক্লাইবের ; গেল স্বর্গ এল ধরাতল।”

সর্গাবসানে একটি সংগীত। বীরকণ্ঠ ব্রিটিশ-সৈনিকগণ, রণমদ-মত্ততায় গর্জিয়া গর্জিয়া, একতান কণ্ঠে, ঐ সংগীত গাইতে গাইতে, গংগা পার হইতেছে ; আর তালে তালে, আঘাতে আঘাতে, গংগার অমল জলরাশি লহরী-লীলায় নাচিয়া উঠিতেছে। ভাগিরথী বহুদিনের পরে বীররসে নৃত্য করিলেন!!! গীতি কবিতা রচনায় গ্রন্থকারের কিরূপ ক্ষমতা আছে, বংগীয় সাহিত্য সমাজে তাহা অনেক কাল পরীক্ষিত হইয়াছে। আমরা কয়েক ছত্র উধৃত করিলাম।

“সমুদ্রের বুকে পদাঘাত করি,
অভয়ে আমরা ব্রিটন নন্দন ;
আজ্ঞাবহ করি তরংগ লহরী,
দেশ দেশান্তরে করি বিচরণ।
নব আফ্রিকার মৃগতৃষ্ণিকায়,
ঐশ্বর্যশালিনী পূরব প্রদেশে
ইংলণ্ডের কীর্তি না আছে কোথায় ?
পূরব পশ্চিম গায় সমুদয়,
জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়।”

ইহা একটি অবধারিত কথা যে, কাব্যের প্রধান পরীক্ষাস্থল পাঠকের হৃদয়। তার্কিকের ভাষা, সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া, বুদ্ধিকে সম্বোধন করে ; কবির কণ্ঠলহরী, তর্কের কুটিল পথে পরিভ্রমণ না করিয়া, একবারে গিয়া হৃদয়ের মর্মস্থানে স্পৃষ্ট হয়। সুতরাং, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে,—শ্রোতা কি পাঠকের হৃদয়নিহিত নিদ্রিতভাবসমূহকে উদ্বোধিত করিয়া দেয়, সেই কাব্য সেই পরিমাণে কৃতার্থতা লাভ করে। আর, যে কাব্য যে পরিমাণে হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অথবা হৃদয়ের নিকটস্থ হইতে অসমর্থ থাকে, সেই কাব্য সেই পরিমাণে অকাব্য মধ্যে পরিগণিত হয়। পোপ এবং বায়রণে ইহার উদাহরণ দেখ। পোপের

লেখা পড়িবার সময় তোমার প্রথমেই প্রতীতি হয় যে, তুমি কোন সাবধান লোকের নিকট বসিয়াছ। উত্তরোত্তর কথার গাঁথুনিতে সাবধানতা, ভাবের সমাবেশে সাবধানতা, এবং পদবিন্যাসেও সেই সাবধানতা। যেন প্রত্যেক শব্দ শতপরীক্ষার পর গৃহীত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ভাব শতবার শোধিত হইয়া কবির হৃদয় হইতে বাহিরে আসিয়াছে। বায়রণের লেখায় এই সাবধানতার চিহ্নমাত্রও বিলোকিত হয় না। উহা নিশীথে বংশীধ্বনির মত, অথবা বাতবিক্ষোভিত স্রোতস্বিনীর বিলাপধ্বনির মত। শ্রবণমাত্রই চিত্ত পাগলের ন্যায় নাচিয়া উঠে। কি শুনিলাম, কে শুনাইল, ইহা বিচার করিবার অবসর থাকে না, প্রাণ আকুল হইয়া পড়িতেছে, কেবল এইমাত্র ধারণা থাকে। কখনও বিরক্তি বোধ হয়, কখনও বা মনে প্রীতির সঞ্চার হয়,—কখনও আত্মা অশান্তিতে ছট্‌ফট্‌ করে, কখনও বা শান্তির সুখস্পর্শে, ক্ষণকালের জন্যে সুখের আস্বাদ পায়। কিন্তু সেই অনির্বচনীয় আকুলিত ভাব কিছুতেই প্রশমিত হয় না; উহা ক্রমশই পরিবর্ধিত হইয়া শেষে সমস্ত হৃদয়কে তরংগায়িত করিয়া তুলে।

উল্লিখিত কবিদ্বয়ে শক্তিবিষয়ে এত তারতম্য কিসে? এই প্রশ্নে সকলেই এই উত্তর দিবে যে, একজন বুদ্ধির কবি, আর একজন হৃদয়ের কবি; পিংজররুদ্ধ গৃহশুক এবং প্রমত্ত বনবিহংগ। যিনি বুদ্ধির কবি, তিনি 'যেহেতু' এবং 'অতএব' দিয়া বুদ্ধিমানদিগকে প্রবোধ দেন; কিন্তু তাঁহার সেই সুমাজিত ও সুসংগত কথা শ্রুত হইয়াও অশ্রুতবং থাকে। যিনি হৃদয়ের কবি, তিনি তানমানে দৃক্‌পাত না করিয়া, মনের সুখে কি মনের দুঃখে হৃদয়ের গীত গাইয়া ফেলেন; কিন্তু সেই বন্য সংগীত বিশৃঙ্খল হইলেও হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় এবং এক তানে শত তান সৃজন করে।

'পলাসির যুদ্ধ' এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্য। এই হৃদয়-রূপ জীবন্ত প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, এবং ইহার প্রত্যেক কবিতা, ও প্রতি পংক্তিতেই সজীবতার পরিচয় রহিয়াছে। আমরা ইহাকে বায়রণের কোন কাব্যের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সে

তুলনায় ইহা অবশ্যই হীনপ্রভ প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু বায়রণের কবিতায় যে দৃক্‌পাতশূন্য বন্যভাব এবং যে অদ্ভুত মাদকতা আছে, ইহাতেও অনেক স্থলেই তাহার অনুরূপ পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। কোন কৃত্রিম কবি কদাপি 'পলাসির যুদ্ধ' প্রণয়ণে সমর্থ হইত না। ইহার লেখকের হৃদয়ে চির-বসন্ত, চির-যৌবন। তাঁহাতে বার্ধক্যের জড়তা নাই, চিন্তামাত্র-পরায়ণের সাবধানতা নাই। কিন্তু লেখা তথাপি হৃদয়স্পর্শিনী। আমরা নিম্নে তৃতীয় সর্গের আরম্ভ হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। নবীনচন্দ্রকে কেন অসাবধান বলি এবং অসাবধান বলিয়াও কেন অকৃত্রিম কবি বলি; ইহা হইতেই তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতে পারিব।

"এই কি সেই পলাসির ক্ষেত্র? এই সে প্রাগংণ?
যেইখানে কি বলিব?—বলিব কেমনে?
স্মরিলে সে সব কথা বাঙালীর মন
ডুবে শোকজলে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে,
সেইখানে মোগলের মুকুট রতন
খসিয়া পড়িল আহা! পলাসির রণে;
সেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা-ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে;
দুর্বল বাঙালী আজি সজল নয়নে
গাবে সে দুঃখের কথা; তবে হে কল্পনে!"
"অতিক্রমি সান্ত্রীদল,—যন্ত্রীদল মাঝে
গাইছে যথায় যত কোকিল-গঞ্জিনী
বিদ্যুতবরণী বামা: মনোহর সাজে
নাচিছে নর্তকীবৃন্দ মানসমোহিনী,
ডুবিয়া ডুবিয়া যেন সংগীত সাগরে;
পশি সশংকিতে, কম্পিত অন্তরে,
না বহে নিঃশ্বাস যেন অতি ধীরে ধীরে,

কহ সখি ! কহ দুঃখ-বিকম্পিত-স্বরে,
শত বৎসরের কথা বিষন্ন অন্তরে ।"

উল্লেখিত প্রথম কবিতাটির প্রথমার্ধ পড়িবার সময় মনে সর্বাগ্রে ইহাই ধারণা হয় যে, কবি একজন অতীব সহৃদয় এবং অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি কল্পনা-যোগে সেই ভারত বিশ্রুত পলাসি-প্রাগংণে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উপস্থিত হইয়াই চিন্তাবেগে আসন্ন, হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মন আর তাঁহাতে নাই। হৃদয়ে গভীর শোকবিন্দু উথলিয়া উঠিয়াছে এবং শোক বশে নয়নযুগল হইতে দর দর ধারে নিঃশব্দ অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে। ইহার পরই জিজ্ঞাসা, এ শোক কি ?—না মোগলের দুঃখে দুঃখ, শত্রুর জন্য সহানুভূতি, উৎপীড়কের জন্য উৎপীড়িতের সকরুণ খেদ অথবা কারণ বিনা কার্য। ভাল শোকের স্রোতই প্রবাহিত হউক। অকস্মাৎ আবার ক্রোধের স্ফূর্তি কোথা হইতে ? যদি মোগলের দুঃখেই দ্রবীভূত হইয়া থাক, তবে আবার তাহাকে 'পাপাত্মা' ও 'যবন' বলিয়া তিরস্কার কর কেন ? আর বাঙালীরই বা সেই পাপাত্মা যবনের নিপাত-গীত গাইতে বিশেষ দুঃখ কি ?

পাঠকের চিত্ত এইরূপ বিবিধ প্রশ্নে বিলোড়িত হইতেছে এবং কবি কল্পনার অন্তরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া মীমাংসার অনুসন্ধান করিতেছে, ইহার মধ্যেই সহসা এক নূতন কথা। কোথায় কোটিকল্প লোকের অদৃষ্টের ফলাফল-গণনা, আর কোথায় রূপসীবৃন্দের রূপের তরংগ। কিন্তু কবি যেই ভারতের ভাগ্যসূত্র করে ধারণ করিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার শিবিরস্থ বিলাস গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সকল কথা পাসরিয়া একেবারে সেই বিলাস-সরসীতে ভাসিয়া গেলেন। তখন :

'যার মুখপানে চাহি হেন মনে লয়,
এই রূপবতী নারী রমণীর মণি,
ফিরে কি নয়ন আহা ! ফিরে কি হৃদয় !
বারেক নিরখি এই হীরকের খনি ?'

'মিলাইয়া সপ্তস্বর সুমধুর বীণা
বাজিতেছে বিমোহিত করিয়া শ্রবণ ;
মিলাইয়া সেই স্বরে প্রত্যেক নবীনা,
গাইতেছে সপ্তসর, ব্যাপিছে গগন ;'

'সুর কলকণ্ঠ নহে দেখ একবার
মরি কি প্রতিমাখানি !—অনংগরূপিণী
নবাবের সম্মুখেতে করিছে বিহার,
অবতীর্ণা মূর্তিমতী বসন্তরাগিনী ;
বাণী-বীণা-বিনিন্দিত স্বর মধুময়
বহিছে কাঁপায়ে রক্ত অধরযুগল ;
বহিতেছে সুশীতল বসন্তমলয়
চুম্বি পারিজাত যেন, মাখি পরিমল ;
বিলাসবিলোল যুগ্মনেত্র নীলোৎপল
বাসনা সলিলে, মরি, ভাসিছে কেবল !'

আমরা পূর্বে যে অসাবধানতার কথা বলিয়াছি, ইহাই সেই অসাবধানতা ;—এক গীতের মধ্যে আর এক গীত, এক রাগিনীর মধ্যে আর এক রাগিনী। কিন্তু এই অসাবধানতার মধ্যেও স্বভাবের কি চমৎকার শোভা রহিয়াছে! কি আশ্চর্য সহৃদয়তাই প্রকাশিত হইয়াছে! তরংগের পৃষ্ঠে তরংগের ন্যায় উদ্বেলহৃদয়সমুদ্রে মুহুর্মুহু ভাব-পরিবর্তন হইতেছে, আর আত্মবিস্মৃত কবি সেই সমস্ত চঞ্চল-ভাবকে বর্ণতুলিকা লইয়া অবিরাম চিত্রিত করিতেছেন। মনের এই অবস্থায় কি কখনও সাবধান হওয়া সম্ভবপর হয়? অথবা তর্কশাস্ত্রকে প্রবোধ দিবার জন্য অত সাবধান হইয়া চলিলে, কবিতা কি কখনও চল-সৌদামিনীর মত এইরূপ স্ফূর্তিমতী ও হৃদয়গ্রাহিণী হইয়া থাকে?

কবি এই সর্গে আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন।

রমণীর রূপবর্ণনায়, নৃত্যগীতের বর্ণনায় এবং হাব, ভাব, লীলা, রংগ এবং বিলাস বিভ্রমের বর্ণনায় প্রায়ই মনুষ্যের চিত্ত তরলিত হয়। কিন্তু এই সর্গে তাদৃশ বর্ণনা সকল পাঠ করিবার সময়েও চিত্ত তরলিত না হইয়া, যেন কি দুঃখে, বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে;—অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে রৌদ্রের বিষাদমাখা হাস্যের ন্যায়, অথবা প্রভাতের নিভু নিভু দীপশিখার ন্যায় পাঠকের চক্ষে সমস্তই নিরানন্দ আনন্দের মূর্তি ধারণ করে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের অন্ধ ভক্তেরা আদিরসকে করুণ রসের নিত্যবিরোধী বলেন। যিনি আদিরসের উদ্দীপক বর্ণনাতেও এইরূপ কারুণ্যের উদ্বোধন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহাকে মহাকবি বলিব কি না, এই প্রশ্ন দুইবার উত্থাপন করা অনাবশ্যক।

পলাসি যুদ্ধের চতুর্থ সর্গ বংগবাসিমাত্রেরই অভিমানের বিষয়। বাংলায় এমন সামগ্রী অল্প আছে। ইহার যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মোহিত ও পুলকিত হইবে; এবং যতবার পড়িবে ততবারই নূতন আনন্দ অনুভব করিবে। কি রস, কি রচনা, সর্বাংশেই ইহা যার পর নাই মাদক ও মনোহর। যদি স্থান থাকিত, তবে আমরা ইহার আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতাম। কিন্তু যদিও তাহা সম্ভব নয়, আমরা তথাপি এখান ওখান হইতে কয়েকটি কবিতা কোন ক্রমেই না তুলিয়া পারিলাম না।

যুদ্ধের আরম্ভে—

'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গংগাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি।'
'নাচিল সৈনিক রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে'

'নিনাদে সমর-রংগে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগংগণে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে,
উঠিল অম্বর পথে করি ঘোর রোল।'
'ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ
কৃষক লাংগল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধরে,
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।'
'অর্ধ নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।'

'ইংরেজের বজ্রনাদী কামান সকল
গম্ভীর গর্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি।
মুহূর্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।'
'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশংকিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-বক্ষ-কলসী অমনি।'

'সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইভের সেনা
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।'

'খেলিছে বিদ্যুৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন !
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।'

যখন ভয়াকুলিত নবাব-সৈন্যগণ রণে ভংগ দিয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল, তখন—

'দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে, দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভংগ দেও রণ,
গর্জিল মোহনলাল 'নিকট শমন !'
'আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।'

* * *

'সেনাপতি ! ছি ছি একি ! হা ধিক্ তোমারে !
কেমনে বল না হায় !
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে !'
'ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?'
'দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বংগ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর ?'

'সেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃংখলে সবে হবে শৃংখলিত।'
'অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অংগার'
সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত,
করে অনিবার, প্রীত,
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর !'

*　　*　　*

'একদিন—একদিন-জন্মজন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন ;
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে !'
'কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান ;
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ !'

ইহার পর পুনরায় যুদ্ধ, যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা এবং বংগেশ্বরের পরাজয় ও পলায়ন। কবি তৎকালে কল্পনা-নেত্রে অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করের প্রতি চাহিয়া যে কয়েকটি কবিতা সম্বোধন করিয়াছেন, ভারতবাসীর অশ্রুজল ভিন্ন তাহার আর প্রতিদান সম্ভবে না। প্রিয়-বিয়োগ-বিধুর কামিনী-কণ্ঠের বিলাপ শুনিয়াছি এবং ত্রিতন্ত্রীর কাঁদো কাঁদো মৃদুনিনাদ শুনিয়াছি ; কিন্তু কিছুতেই প্রাণ এমন আলোড়িত হয় নাই। যদি এই বাক্য কয়টি

কবির মুখ হইতে নিঃসৃত না হইয়া স্বদেশ বৎসল মোহনলালের মুখ হইতে নিঃসারিত হইত, তবে আর কথাই ছিল না।

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী !
অধীনতা-অন্ধকারে চিরদিন তরে,
ডুবায়ে ভারতভূমি যেও না তপন ;
উঠিলে কি ভাবে বংগে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়ে, আহা, ডুবিছ এখন ?
পূর্ণ না হইতে তব অর্ধ আবর্তন ;
অর্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বংগ আজি শোকসিন্ধুজলে ?
যাও তবে, যাও দেব, কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বংগ-উদয়- অচলে ;
কি জন্য বল না তাহা ফিরিবে আবার ?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন ;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ ;
যদবধি হইবে না দাসত্বমোচন,
এস না ভারতে পুনঃ, এস না তপন।"

মুর্শিদাবাদের বুদ্ধিমান লোকেরা মিরজাফরকে কর্ণেল ক্লাইভের গর্দভ বলিত। পঞ্চম সর্গে সেই গর্দভশ্রেষ্ঠের সিংহাসনে অভিষেক এবং সিরাজদ্দৌলার নিধন। কবি এই সর্গটিকে 'শেষ আশা' নাম দিয়াছেন। যদি আমাদিগের ইচ্ছা অনুসৃত হইত, তবে আমরা ইহার এক

নাম রাখিতাম—আশার নির্বাণ। এখানেই সকলের আশা ফুরাইল। প্রদীপ চিরদিনের তরে নিভিয়া গেল। এই সর্গের সমুদয় অংশ সমান হৃদ্য হয় নাই, কিন্তু এক একটি স্থান আশ্চর্য। পাঠক কখনও দুঃখে গলিয়া পড়িবেন, কখনও ভয়ে স্তম্ভিতবৎ হইবেন। যখন মনুষ্য-কুলের চিরকলংক কুমার মিরণের জনৈক পাপসহচর কারাগারের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সিরাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেই দুঃখ-জর্জরিত, অর্ধমৃত, হতভাগ্য যুবার শিরশ্ছেদের জন্য খড়্গ তুলিয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত কবি উপদেশ করিতেছেন—

"রে নির্দয় অনুচর! কৃতঘ্ন হৃদয়!
কি কাজে উদ্যত আজি নাহি ক'র জ্ঞান?
কেমনে রে দুরাচার! কেমনে নির্ভয়ে,
নাশিতে উদ্যত আজি নবাবের প্রাণ?"

"ডুবিবে, ডুবিছে পাপী, আপনি আপন;
শৃংগচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
পড়ে যবে ধরাতলে, কি কাজ তখন
আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর।"

(পলাসির যুদ্ধ) কাব্যের ভাষা কিরূপ হৃদয়হারিনী হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত এরূপ সরল, সরস ও সুখপাঠ্য কবিতা এ দেশীয়েরা অধিক দেখেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় ইংরেজী ভাষার সহিত ওয়াল্টার স্কটের 'লেডী অব্ দি লেক' নামক কাব্যের যে সম্বন্ধ, বাংলা ভাষার সহিত ও 'পলাসির যুদ্ধ' কাব্যের সেই সম্বন্ধ থাকিবে। তবে, কবিবর নবীনচন্দ্র ইংরেজী ভাষার প্রাণগত রসকে বাংলা ভাষায় ঢালিতে গিয়া স্বজাতির যেমন কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, মধ্যে মধ্যে তেমনি দুই একটি অসহ্য অপরাধও করিয়াছেন। যথা,—'পাড়াপ্রতিবাসী-ত্রাস',—'চিত হয়ে পড়ে দাও দাঁড়ে টান'—ইত্যাদি। গ্রাম্যতা দোষে দূষিত এইরূপ এক একটি পংক্তি, দুগ্ধ-কুণ্ডে গোময়

প্রক্ষেপের ন্যায়, এক একটি মনোহর কবিতাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কবি কিছু কিছু পরেই আবার এমন এক একটি সুধানিঃস্যন্দিনী কবিতা বংগভারতীর কণ্ঠে তুলিয়া দিয়াছেন যে, দেখিয়া তাঁহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গিয়াছি। নিম্নে ইহার উদাহরণ দেখ।

"শোভিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে,
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।"

"প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার!
যেই প্রেম অশ্রুরাশি আজি অভাগার
ঝরিতেছে নিরবধি
তরল না হত যদি
গাথিতাম সেই হার তব উপহার;
কি ছার ইহার কাছে গোলকন্দ হার!"

পলাসির যুদ্ধে এরূপ কবিতা এবং এইরূপ ললিত পদাবলীর অভাব নাই। যেন লেখনী অবিরত মুক্তা-ফল প্রসব করিয়াছে।

যখন বাল্মীকি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে পরকীয় পদানুসরণ করিতে হয় নাই; যখন হোমর বীররসে মত্ত হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে সেই এক গীত গাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আর কাহারও কণ্ঠানুকরণ করিতে হয় নাই। কিন্তু নূতন কবিদিগের সে সৌভাগ্য সম্ভবে না। তাঁহারা প্রকৃতির নিকট যত না শিখিয়া থাকেন, পূর্বতন কবিসম্প্রদায়ের নিকট তাহা অপেক্ষা অধিক শেখেন। সুতরাং তাঁহারা অনুকারী। নবীনবাবু ও অনুকরণের অপবাদ হইতে নির্মুক্ত নহেন। সিরাজদ্দৌলার বিকট স্বপ্ন দর্শনে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ড নামক নাটকের স্বপ্নদর্শন স্পষ্ট প্রতিভাত রহিয়াছে; চাইল্‌ড হেরোল্‌ডের তৃতীয় কাণ্ডস্থ কতিপয় কবিতায় নৃত্য-গীতের যাদৃক বর্ণনা আছে, পলাসির যুদ্ধে কোন কোন কবিতায়

তাহার ছায়া পড়িয়াছে এবং বায়রণ ও স্কটকে আরও অনেক স্থলে অনুকরণ করা হইয়াছে। ইহাকে আমরা দোষ বলি না। কারণ, এ দোষে সকলেই সমান দোষী। দোষ অথবা অপূর্ণতার কথা বলিতে হইলে পলাসির যুদ্ধের বিশেষ দোষ কিংবা বিশেষ অপূর্ণতা এই যে, ইহাতে পাঠাবসানে মনে কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট ভাব এবং অত্যুৎকৃষ্ট বর্ণনা দৃঢ় নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট কোন এক চরিত্র তেমন চিত্রিত থাকে না।

বান্ধব, ১২৮২

বৃত্রসংহার

প্রথম খণ্ড *

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই মহাকাব্যের বিষয়, ইন্দ্রকৃত বৃত্রের বধ। হেমবাবু পৌরাণিক বৃত্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই—অনেক স্থানেই নিজ কল্পনাকে স্ফুরিত করিয়াছেন। পাতালে বৃত্রজিত, নির্বাসিত দেবগণ মন্ত্রণায় নিযুক্ত। এই স্থানে গ্রন্থারম্ভ। প্রথম সর্গ পড়িয়া অনেকেরই পাণ্ডিমো-নিয়মে মন্ত্রণানিযুক্ত দেবদূতগণের কথা মনে পড়িবে। হেমবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, "বাল্যাবধি আমি ইংরাজিভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃতভাষা অবগত নাই, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরাজি গ্রন্থকারদিগের ভাবসংকলন এবং সংস্কৃতভাষার অনভিজ্ঞতা দোষ লক্ষিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।" হেমবাবু মিল্টনের অনুসরণ করিয়া থাকুন বা না থাকুন, তিনি এ অংশেও যে স্বকীয় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠমাত্রেই সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। "নিবিড়ধূম্রল ঘোর" সেই পাতালপুরীর মধ্যে, সেই দীপ্তিশূন্য অমরগণের দীপ্তিশূন্য সভা—অল্পশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক বিশেষ ভয়ংকর—

> "চারিদিকে সমুত্থিত অস্ফুট আরাব
> ক্রমে দেব-বৃন্দমুখে ফুটে ঘন ঘন,
> ঝটিকার পূর্বে যেন ঘন ঘনোচ্ছাস
> বহে যুড়ি চারিদিকে আলোড়ি সাগর।"

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন, ভীমশব্দপূর্ণ সভাতলে বসিয়া, পুনর্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দেবমুখে সন্নি-

---

* বৃত্রসংহার কাব্য। প্রথমখণ্ড। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা।

বেশিত বাক্যগুলিতে একটা অর্থ আছে, বোধ করি, সকলেই বিনা টিপ্পনীতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। অধিক উদ্ধৃত করিবার আমাদিগের স্থান নাই ; উদাহরণস্বরূপ তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধিক দেব ! ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ-হৃদয়,
এতদিন আছ এই অন্ধতমপুরে ;
দেবত্ব, বিভব, বীর্য, সর্ব তেয়াগিয়া
দাসত্বের কলংকেতে ললাট উজ্জ্বলি।
"ধিক্ সে অমরনামে, দৈত্যভয়ে যদি
অমরা পশিতে ভয় কর দেবগণ,
অমরতা পরিণাম পরিশেষে যদি
দৈত্য-পদরজঃ পৃষ্ঠে করহ ভ্রমণ।
"বল হে অমরগণ—বল প্রকাশিয়া
দৈত্যভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা ?
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে,
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়া ?"

এই সর্গে অনেক স্থানে আশ্চর্য কবিত্ব প্রকাশ আছে, তাহা দেখাইবার আমাদিগের অবকাশ নাই। অন্যান্য সর্গ সম্বন্ধে অধিকতর বক্তব্য আছে।

এই দেবসমাজে ইন্দ্র ছিলেন না। তিনি কুমেরু শিখরে নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। অমরগণ বিনা ইন্দ্রেই পুনর্যুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ ইন্দ্রালয়ে। প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরংগ তুলিয়া কুশলময় কবি সহসা সে ক্ষুব্ধ সাগর শান্ত করিলেন। সহসা এক অপূর্ব মাধুর্যময়ী সৃষ্টি সম্প্রসারিত করিলেন। নন্দনবনে বৃত্রমহিষী ঐন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্ত স্বর্গসুখে সুখময়ী—

রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে ভুলি,
বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

এই চিত্রমধ্যে বসন্ত-পবনের মাধুর্যের ন্যায় একটি মাধুর্য আছে—কিসের সে মাধুর্য, পবন-মাধুর্যের ন্যায় তাহা অনির্বচনীয়—স্বপ্নবৎ—

করিছে শয়ন কভু পারিজাতে
মৃদুল মৃদুল সুশীতল বাতে
মুদিয়া নয়ন কুসুমে হেলি।

এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া, ঐন্দ্রিলা স্বামীর কাছে সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধিশ্বরী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার সাধ পূরে না—শচীকে আনিয়া দাসী করিয়া দিতে হইবে। বৃত্রাসুর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এই কথোপকথন আমাদিগের তত ভাল লাগে নাই। ইন্দ্রজয়ী মহাসুরের সংগে মহাসুরের মহিষী নন্দনে বসিয়া এই কথোপকথন করিতেছেন, গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ইহা মনে থাকে না, মর্ত্যভূমে সামান্যা বংগগৃহিণীর স্বামীসম্ভাষণ বলিয়া কখন কখন ভ্রম হয়।

তৃতীয় সর্গে, বৃত্রাসুর সভাতলে প্রবেশ করিলেন,

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস,
পর্বতের চূড়া যেন, সহসা প্রকাশ—

"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ" ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি—মিল্‌টনের যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্য মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক আছে।

অন্যান্য দেবতা পাতালবাসী, কিন্তু কাম ও রতি, স্বর্গ ছাড়িতে পারে নাই—তাহারা বৃত্র এবং মহিষীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। নাহ'লে অসুরলব্ধ স্বর্গের প্রকৃতি ভ্রংশ হয়! দূরদর্শী কবি এটুকু ভুলেন নাই। বৃত্রের আজ্ঞানুসারে, কাম শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। শচী এক দেবী মাত্র সংগে লইয়া পৃথিবীতলে নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতেছেন। বৃত্র সভারূঢ় হইয়া আদেশ করিলেন যে, ভীষণ নামে পরাক্রান্ত অসুর তাহাকে আনয়ন জন্য প্রেরিত হউক। প্রথম কৌশল, কৌশলে না পারে বলে আনিবে। এদিকে সূর্যাদি দেবগণ মন্ত্রানুসারে স্বর্গ নিরোধ করিতে আসিতেছিলেন। বৃত্র সেই সংবাদ পাইলেন। বৃত্রাসুর সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না,—তখন প্রধান রক্ষক, যেরূপ লক্ষণ দেখিয়া

দেবাগমন অনুমান করিয়াছিল, তাহা নিবেদন করিল। সে কয় পংক্তি অমূল্য রত্ন—

কহিলা ঋক্ষভ দৈত্য "শুন, দৈত্যনাথ,
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ
জ্যোতির্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ ;
নক্ষত্র উল্কার জ্যোতি নহে সে আকার ;
জানি ভাল দেব-অংগে জ্যোতি সে প্রকার ;
ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়,
চিনিলাম দেব-অংগ-জ্যোতি সে শোভায়,
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে,
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না মিশে ;
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার,
উঠিছে,আকাশ প্রান্তে ঘেরি চারিধার ;
বহু দূরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়—
দেবতা তাহারা কিন্তু কহিনু নিশ্চয়।"

বৃত্রের সন্দেহ ভংজন হইল, তখন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

পরে চতুর্থ সর্গে, নৈমিষারণ্যে সুরেশ্বরী শচী, সখীর সংগে কথোপকথন করিতেছেন। স্বর্গমতি দুঃখ সখীর কাছে বলিতেছেন। সে সখী, অন্য কেহ নহে—বিদ্যুৎ। বৃত্রসংহারের জন্য বজ্র সৃষ্টি হয়—বজ্রের অগ্রে বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া কবি, পাঠকদিগের নিকট কৈফিয়ত দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তাঁহার মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে যে যাহারা তাঁহার কাব্য পড়িবে, তাহারা অধিকাংশই আধুনিক অর্ধশিক্ষিত বাঙালী এবং তদপেক্ষা ঘোরতর মূর্খ সমালোচকেরা ইহা সমালোচনা করিবে। সুতরাং মূর্খ সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া কথাটি বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এ বিনয়ের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এ সময়ে

ভবভূতির গর্বোক্তি মনে পড়িল। যে এই মনোমোহিনী বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রশংসা না করিবে, সে তাঁহার এই মহাকাব্য পড়িবার যোগ্য নহে; তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

হেমবাবুর বিদ্যুৎ অত্যন্ত মনোমোহিনী, সুসংগতা, এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিতা। আমরা বলিতে পারি না, কবির কি অভিপ্রায়, কিন্তু আমাদিগের এমন একটু ভরসা আছে যে বজ্র সৃষ্ট হইলে, কাব্যমধ্যে সুন্দরী চঞ্চলা এবং মহাবীর বজ্রের পরিণয় দেখিতে পাইব—চির-প্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ বাহ্য প্রকৃতির চরমোৎকর্ষ, বাংলার কবির গানে গীত হইবে। আমাদিগের এ সাধ কি পূরিবে?

চঞ্চলার নিকটে শচীর বিলাপ, অতি মধুর অতি সকরুণ। ঐন্দ্রিলার বাক্যে যে মানুষিকতা দোষ লক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে সে দোষ নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে দেবীর যোগ্য। বোধ হয় এই প্রভেদ, কবির অভিপ্রেত। দেবদৈত্য প্রভেদ অবশ্য রক্ষণীয়। তথাপি দৈত্যের দৈত্যত্ব থাকা আবশ্যক। অন্যত্র তাহা আছে। এই শচী বিলাপ হইতে, উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বপনে যদ্যপি ছাই, সে কথা ভুলিতে চাই,
দেবেরে স্বপন নাহি আসে!

জাগ্রতে সে দেখি যাহা চিত্ত দগ্ধ করে তাহা,
প্রাণে যেন মরীচিকা ভাসে!

নয়নের কাছে কাছে সতত বেড়ায় আঁচে
স্বরগের মনোহর কায়া।

সকলি তেমতি ভাব, দৃষ্টি পথে আবির্ভাব,
কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া!

ভ্রান্তি যদি হৈত কভু, কিছুক্ষণ সুখে তবু
থাকিতাম যাতনা ভুলিয়া।

হায় এ মাটীর ক্ষিতি, পায়ে বাজে নিতি নিতি
শিলা যেন কঠোর কর্কশ!

শুনিতে না পাই ভাল, শব্দ যেন সর্বকাল,
কর্ণ মূলে ঝটিকা পরশ !
এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি
সখিরে সকলি হেথা স্থূল !
নিত্য এ খর্বতাজ্ঞান, আকুল করে পরাণ
কেমনে সে বাঁচে নরকুল !
অমর মরণ নাই, কত কাল ভাবি তাই,
এত কষ্টে এখানে থাকিব।
যখনি ভাবি লো সই, তখনই তাপিত হই,
চিরদিন কেমনে সইব ॥
অনন্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বণিতা হৈয়ে,
ভোগ করি স্বর্গবাস সুখ।
কিরূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্তচেতা,
নরলোক সহিয়া এ দুখ ॥

এই কাব্যে হেমবাবু একটি অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন—অতি অল্প কথায়, অতিশয় সম্পূর্ণ এবং উজ্জ্বল চিত্র সমাপন করিতে পারেন; শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচী-বিলাপ হইতে আমরা একটি উদাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি—

কেমনে ভুলিব বল্, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্মুক ধরি করে ;
তুই সে মেঘের অংগে খেলাতিস্ কত রংগে,
ঘটা করি লহরে লহরে !
কি শোভা হইত তবে, বসিতাম কি গৌরবে,
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে !
হইত কি ঘন ঘন, মৃদু মন্দ গরজন
মেঘে যবে দুলাত পবনে !

কামদেব, প্রভুর আজ্ঞায় শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কামদেব শচীর নিকট নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক নহেন। শচী ধরিবার

ব্যবস্থা শুনিয়া ভীত হইয়া, নৈমিষারণ্যে সংবাদ দিতে আসিলেন। তখন কবি, অকস্মাৎ প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারের ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন। দলত্যাগী অসুরদাস কামদেবকে দেখিয়া দেবীদ্বয় ব্যংগ করিতে লাগিলেন। চপলার ব্যংগ তৎস্বভাবানুযায়ী, স্পষ্ট স্পষ্ট, উগ্র, তপ্ত এবং চাপল্যব্যংজক; যথা—

"শুনি নাকি মাল্যকার, হৈয়ে এবে আছ, মার!
ঐন্দ্রিলার উদ্যান সাজাও?
নিজ করে গাঁথ মালা, সাজাতে দানববালা,
মালা গাঁথি অসুরে পরাও?
এত গুণপনা তব, জানিলে হে মনোভব,
নিত্য গাঁথিতাম পুষ্পহার।
থাকিতে সে অন্য মনে, ত্যজি পুষ্পশরাসনে,
ত্রিভুবনে পাইত নিস্তার॥
বড় আগে হেলি হেলি, পুষ্পধনু পৃষ্ঠে ফেলি
বেড়াইতে মনোহর বেশে।
ত্যক্ত করি বারে বারে, সর্বলোকে সবাকারে
শুন কাম এই তার শেষে॥"

শচীর ব্যংগও শচীর যোগ্য, গম্ভীর এবং গূঢ়ার্থ। যথা—

শচী কহে চপলারে, "গংজনা দিও না মোরে;
সুখে আছে সুখে থাক কাম,
এ পীড়া হৃদয় ধরি, স্বর্গপুরী পরিহরি,
পুরাইত কিবা মনস্কাম?
ভাবনা যাতনা নাই, সদা সুখী সর্ব ঠাঁই
চিরজীবী হ(উ)ক সেইজন॥
রতির কপাল ভাল, সুখে আছে চিরকাল,
সহে না সে এ পোড়া যাতন।
প্রদ্যুম্ন, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়;

কিরূপে ভুলিব সব, তুমি যথা মনোভব,
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময় ?”

কন্দর্পের উত্তর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—

কন্দর্প অপাংগ ঠারে শাসাইয়া চপলারে,
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়।
“সুখদুখ ইন্দ্রপ্রিয়া সকলি বাসনা নিয়া,
মুকুতির আয়ত্ত সে নয়।
ছাড়িয়া নন্দন-বনে কোথায় সে ত্রিভুবনে
যুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাংছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা
না পাইব গিয়া অন্যস্থান॥
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর,
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা তার সেথা চির আশা
সুখ দুখ মনের খনিতে।”

কন্দর্প বৃত্রকৃত শচী-হরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন। শুনিয়া শচী প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া, পরে রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে নিরুপায় হইয়া তপঃস্থিত ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়ন্তকে স্মরণ করিলেন।

পরে পঞ্চম সর্গে জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া চপলা ইন্দ্রাণীকে বৈকুণ্ঠে বা কৈলাসে বা ব্রহ্মালয়ে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যিনি ইন্দ্রপত্নী সুরেশ্বরী তিনি বৈকুণ্ঠেও পরাশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। তখন চপলা ছদ্মবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। শচীর উত্তর পাঠে সকলেরই আনন্দ জন্মিবে।—

“শুনলো চপলা!
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছলা॥
চিরদিন যেইরূপ জানে সর্বজন,
সহচরি, সেইরূপ শচীর(ও) এখন।
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন—

নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যজিব কখন ।"
বলিতে বলিতে আস্তে হইল প্রকাশ
অপূর্ব গরিমা-ছটা কিরণ আভাস ।
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্ময়—
সৃষ্টির সৃজনে যেন নব সূর্যোদয় !
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মাদ যেই জন,
হেরে স্তব্ধ হয় সেই, সে নেত্র বদন ।

দেখিয়া চপলার বড় আনন্দ হইল। চপলা তখন সেই মূর্তির শোভনোপযোগী মায়াবন সৃষ্টি করিলেন—

মোহিনী-মোহকর মহীরুহ-রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি ।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি ;
চুম্বলে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি !
কাঁপিল ঝরঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে ।
হাসিল ফুলকুল মংজুল মংজুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল ।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুংজ ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনীপুংজ ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরংগ ;
গুংজরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃংগ ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা—
সুরস অরধ, অরধ শশি শোভা,—
শোভিল সুতরুণ স্থলজল অংগে ;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রংগে ।

পরে জয়ন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; মাতাপুত্রে অনেক সস্নেহ এবং সকরুণ কথোপকথন হইল এবং জয়ন্ত সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিলেন। এদিকে চপলা নন্দনতুল্য বন বিকাশ করিয়া আনন্দে ভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, এমত সময়ে দূতসহ ভীষণ সেই স্থলে উপস্থিত। তাহারা মর্ত্যে নন্দন শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইল। চপলাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। পরে যাহা ঘটিল তাহা গ্রন্থকারের মুখে শুনিতে হইবে—

চপলা কহিলা "কেন কিসের কারণ
নৈমিষ অরণ্য দোহে কর অন্বেষণ?
এই তো নৈমিষ, আমি নিবসি এখানে।
প্রকাশিয়া বল শুনি কি বাসনা প্রাণে?
দিব ইচ্ছা যাহা তব, এ বন আমার—
দেখ অরণ্যেরে কৈনু নন্দন আকার।
বল আগে, কার দূত পুরুষ কি নারী?
পার কি চিনিতে বুঝি আমি যেন পারি।
হাতে দেখি পারিজাত, না হবে মানুষ—
হায় রে সে স্বর্গ, যথা অমর বিভব!"
ভাবিল ভীষণ, তবে হবে এই শচী
নিবারিত ক্লেশ মর্তে আছে স্বর্গ রচি।
প্রফুল্ল পরাণে কহে "ধর এই ফুল—
পাছে নাহি মান, চিহ্ন আনিয়াছি স্থূল;
দেব-দূত আমি, দেবি, ইন্দ্রের প্রেরিত,
তুমি সুরেশ্বরী শচী ভুবনে বিদিত।
যুদ্ধে জয়, অমরের স্বর্গ অধিকার;
তিরস্কৃত দৈত্যকুল তাড়িত আবার;
স্বর্গ এবে শান্ত পুন, তাই সুরপতি
পাঠাইলা, লৈতে তোমা আপন বসতি।"
ঈষৎ হাসিয়া তাহে চপলা কহিলা,
"আমায়, সন্দেশবহ চিনিতে নারিলা।

পেয়েছ দূতের পদ, শিখ নাহি ভাল—
ইন্দ্রের দূতত্ব পদ বড়ই জঞ্জাল!
শিখাব উত্তমরূপে পাই সে সময়,
তুমি দূত, আমি দূতী জানিহ নিশ্চয়।
পুরাতনে প্রয়োজন নহিলে কি এত?
নূতনে নূতনে জ্বালা, বুঝে না সংকেত।"
শিব! বলি, দূতবেশী কহে দৈত্যেরে
"চিনেছি, চিনেছি—ভ্রান্তি নাহি অতঃপর—
শচী-সহচরী তুমি বিষ্ণুর মহিলা"—
"আবার ভুলিলা দূত" চপলা কহিলা;
"থাক মেনে, আর কেন দেও পরিচয়—
মূর্খের অশেষ দোষ, কহিনু নিশ্চয়;
ওহে দূত, বোঝা গেছে তব গুণপনা—
নারী চেনা, মণি চেনা দুর্ঘট ঘটনা!
নহি হরিপ্রিয়া আমি বৈষ্ণবী কমলা;
শুন দূত, শচীদূতী আমি সে চপলা।
আশা করি আসিয়াছ ইন্দ্রের আদেশে;
না হবে নৈরাশ, ভাগ্যে ঘটে যাহা শেষে।"

চপলা অকুতোভয়ে দৈত্যদ্বয়কে শচী সমীপে লইয়া গেলেন। দৈত্যদ্বয় সেই প্রশান্ত গম্ভীর তেজোময় আকার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময় জয়ন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আসিয়া ভীষণের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গে দেবগণ স্বর্গ নিরোধ করিয়াছে। দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধ বর্ণনা বাংলাভাষায় অতুল্য; মেঘনাদ বধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা কোথাও আছে আমাদিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের যোগ্য। উদ্ধৃত করিতেছি।—

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী;
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,

যোজন যোজন ব্যাপ্ত ; প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক আচ্ছাদিয়া
দূরস্থিত, সন্নিহিত, যত শৈলরাজি,
অস্তোদয় গিরিশৃংগ প্রভায় উজ্জ্বল,
অখণ্ডের সমুদায় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দিকে ।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণ দর্শন—
পাষাণ-সদৃশ-বপু, দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম,
ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জিয়া গর্জিয়া ।
জাগ্রত সুসজ্জ সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বত্মে´ বত্মে´ স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অংগ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদে, অম্বর বিদারি ।
অস্ত্রবৃষ্টি শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহ
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে
রাত্রিদিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ
বিদ্যুত-মিশ্রিত শিলা দিগে দিগে ব্যাপি ।
ত্রিদশ আলয়ে হেন অমর দানবে
জ্বলিছে সমর বহ্নি নিত্য অহরহ ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে,
সুদৃঢ় সংকল্প উভ দেবতা দনুজে ।
অর্ণবের উর্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশি অনুক্ষণ, বিরত বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া সদা সিন্ধু-অভিমুখে ;
অথবা সে শূন্যে যথা আহ্নিক গতিতে
ভ্রমে নিত্য ভূমণ্ডল পল অনুপল ;

কিংবা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি
অশব্দ তরংগ চলে কালের প্রবাহে ;
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহ স্বর্গ-বহির্দেশে ;
জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

বিরক্ত হইয়া দৈত্যপতি যোদ্ধবর্গকে তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন বলিয়া শিবদত্ত ত্রিশূল আনিতে আজ্ঞা দিলেন। দেখিয়া বৃত্রপুত্র যুবা বীর রুদ্রপীড় তাঁহাকে ক্ষান্ত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে যাইতে অনুমতি প্রর্থনা করিলেন—

বীরের স্বর্গই যশ যশ(ই) সে জীবন।
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।

বৃত্রের উত্তরে যে বীরবাক্য আছে তাহাও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।
"অনন্ত তরংগময় সাগর গর্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখময় ;
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে সে সুখ ;—
কিংবা সে গংগোত্রী পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত !
"তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিজড়িত ;

সমর-তরংগে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখে চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
"সেই সুখ, সে উৎসাহ, হয় কত কাল।
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পুরাইতে সাধ।
"নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা;
দেখ এ ত্রিশূল অগ্রে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি চিহ্ন, কলংক গভীর!

এমন সময়ে দূত আসিয়া ভীষণের বধবার্তা জ্ঞাপন করিল। তখন রুষ্ট দৈত্যপতি পুত্রকে শচী আনয়নে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী নিষেধ করিল। স্বর্গদ্বারে দেবগণ যুদ্ধ করিতেছে; কুমার কি প্রকারে আবার পুরী প্রবেশ করিবেন? বৃত্র পুত্রের সংগে শত যোদ্ধা ও তাঁহার হস্তে শিবত্রিশূল দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী বলিল, শূল না থাকিলে পুরী রক্ষা সংকট হইবে; তখন—

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট প্রদেশে
স্থাপিয়া অংগুলিদ্বয়, গর্ব প্রকাশিয়া,
কহিলা দানবপতি—'সুমিত্র, হে এই—
এই ভাগ্য যতদিন থাকিবে বৃত্রের,
"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তায়—
ধররে ত্রিশূল পুত্র, বীর রুদ্রপীড়।"

রুদ্রপীড় ত্রিশূল লইল না। শত যোদ্ধা লইয়া শচী হরণে চলিল। এবং প্রতারণা দ্বারা দেবসৈন্য হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া মর্ত্যে গমন করিল।

কাব্যনায়ক ইন্দ্র, এই প্রথম, সপ্তম সর্গে দৃশ্যমান হইতেছেন। কোন কোন মহাকাব্য আছোপান্ত নায়ক প্রায় আমাদিগের দৃষ্টির অতীত হয়েন না,—সে শ্রেণীর মহাকাব্যের প্রথম উদাহরণ রামায়ণ। আবার কোন কোন মহাকাব্যে নায়ক, তাদৃশ সর্বদা দর্শনীয় নহেন; কার্যকালেই দেখা দেন। সংসারের এক একটী কার্য বহুজনের বহুতর উদ্যোগের ফল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকে বহুতর উদ্যোগ করে, শক্তিধর মনুষ্য তাহা একত্রিত করিয়া তাহাতে ইচ্ছামত ফল ফলান। কাব্যকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়োজন প্রথম দেখাইয়া, শক্তিধরের শক্তিতে তৎসমুদায়ের পরিণাম দেখান। এইজন্য শ্রেণী বিশেষের মহাকাব্যে নায়ক কেবল ফলোৎপত্তি কালেই পরিদৃশ্যমান হয়েন। ইলিয়দের প্রথম সর্গের পর, অষ্ট সর্গে আর আকিলিসের দেখা নাই; এবং বৃত্রসংহারে সপ্তম সর্গ পর্যন্ত ইন্দ্রের দেখা নাই। ফলে যে একাদশ সর্গ এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাতে ইন্দ্রকে আমরা অধিকক্ষণ দেখি না।

কুমেরু শিখরে ইন্দ্র তপস্যায় নিযুক্ত। কিন্তু সে তপস্যা ব্রহ্মাদি পৌরাণিক দেবতার আরাধনা নহে। তিনি নিয়তির আরাধনা করিতেছিলেন। নিয়তি হেমবাবুর সৃষ্টি। সত্য বটে, গ্রীসীয় দেবতাদিগের মধ্যে ঈদৃশ দেবী আছেন, কিন্তু হেমবাবুর নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্ন প্রকৃতি। হেমবাবুর এই সৃষ্টি অত্যন্ত সুসংগত বলিয়া বোধ হয়। নিয়তি অস্মদ্দেশীয় পুরাণে ইতিহাস নাম প্রাপ্ত নহেন বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই ঐশীশক্তির অতীত আর একটী শক্তির অধীন দেখা যায়। যাঁহারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, তাঁহারাও সর্বশক্তিমান্ বা ইচ্ছাময় নহেন। তাঁহাদিগকেও উদ্যোগ করিয়া কার্যসিদ্ধ করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে বিফলযত্ন হইতে হয়। দশবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে পৃথিবীর ভার মোচন বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাদেব সমুদ্রমন্থন করাইয়াও বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্য দেবতাদিগের ত কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার বিফলতা

থাকিলেই সুখ দুঃখ আছে। অতএব ব্রহ্মা বিষয়াদির এই সুখ দুঃখ কোন্ শক্তিতে? পুরাণাদিতে সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু ত তাহার নিয়তি নাম দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সে দেহও অতি ভয়ংকর—

পাষাণের মূর্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়।
মাধুর্য কি স্নেহ কিংবা অনুকম্পা-লেশ
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে,
ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র; নিয়ত দর্শন
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য পটে।
অনন্যমানস, দৃষ্টি আলেখ্যের প্রতি,
কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়া বাসবে—
"কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত?
নিয়তি নহেক তুষ্ট কিংবা রুষ্ট কভু।"

যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভংগ হইলে নিয়তির এই মূর্তি তাঁহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া আমরা পাঠককে আর একটী কৌতূহল ব্যাপার দেখাইব—বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের ধ্যান ভংগ হইল। তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির সাহায্যে নিম্নলিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্তন দেখিতেছেন,—

"পূর্বে সে নিরখি যথা ক্ষৌণী সমতল,
পর্বত এখন সেথা শৃংগ বিভূষিত,
লতা গুল্ম সমাকীর্ণ শ্যামল সুন্দর,
বিরাজে গগনমার্গে অংগ প্রসারিয়া!
"গভীর সাগর পূর্বে ছিল যেই স্থানে,
বিস্তীর্ণ মরুমণ্ডল সেথায় এখন,
সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে,
তরুবারি-বিরহিত তাপদগ্ধ দেহ!
"নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত,
নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ;

সূর্যের মণ্ডল যেন স্বস্থান বিচ্যুত,
অপসৃত বহুদূর অন্তরীক্ষ পথে !”

আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে যে, অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লারের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিন খানি অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য বিশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখন কখন প্রতীয়মান হয় এবং লিয়রে বা হামলেটে কখন কখন আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। প্রকৃত বিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেমবাবু তাহা উপরি ধৃত কয় চরণে দেখাইয়াছেন। ইহাতে আর একটি উদাহরণ আমরা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিব।

নিয়তির দর্শন পাইলে, ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিনে, কি উপায়ে বৃত্র নিধন হইবে। নিয়তি তাঁহাকে শিবপুরে যাইতে পরামর্শ দিলেন। ইন্দ্র দেবদূত স্বপ্নের দ্বারা এ সংবাদ, স্বর্গদ্বারে সমবেত দেবগণ-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাসধামে যাত্রা করিলেন।

অষ্টম সর্গে, আদ্যোপান্ত একটী সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র। এই মোহমন্ত্রের মোহিনী রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম সর্গের ন্যায় কবিতা, বাংলা ভাষায় অতি বিরল। আমরা সর্গটী সমুদায় উদ্ধৃত করিতে পারি না, কিন্তু সমুদায় উদ্ধৃত না করিলেও, ইহার রাশি রাশি সৌন্দর্য, ইহার চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দেওয়া যায় না—নিদাঘকালীন পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় ইহা আদ্যোপান্ত সুপ্রফুল্ল কবিতা-পুষ্পে মণ্ডিত।

ইন্দুবালার প্রকৃতি অতি মনোমোহিনী।

মাধুরী লহরী অংগেতে যেমন,
উছলি উছলি চলে।

রতি নিকটে বসিয়া ফুল গাঁথিতেছিলেন। ইন্দুবালাকে সম্বোধন করিয়া রতি বলিলেন—তুমি বীরপত্নী, তোমার এত ভয় কেন? তখন—

কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস
নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
“বীরপত্নী হায় সবার পূজিতা
সকলে আমায় বলে !

পতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে
কত যে সতত ভয়,
জানে সে কজন, ভাবে সে কজন
বীরপত্নী কিসে হয়।
কতবার কত করেছি নিষেধ
না জানি কি যুদ্ধপণ!
যশ তৃষা হায় মিটে নাকি তাঁর
যশ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল মম চিত্তে ভয়
সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর না হয় হৃদয়ে—
সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্যমনে;
অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা যত
নেহালে যতনে অতি॥
"এই জাতি ফুল তাঁর প্রিয় অতি"
বলি কোন পুষ্প তুলে;
"এই পালংকেতে বসিবারে সাধ,"
বলি তাহে বৈসে ভুলে;
"এই অস্ত্রগুলি খুলি কতবার
তুলি এই শরাসন;
কহিলা সাজাব রণ বেশে তোমা
শিখাব করিতে রণ॥"
এ কবচ অংগে দিলা কতদিন,
শিরে এই শিরস্ত্রাণ!
কটি বন্ধে কসি দিলা এই অসি
হাতে দিলা এই বাণ।

অতি প্রিয় তাঁর অস্ত্রে এই সব
আমার সাধের অতি !
তাঁরে সাধে অংগে ধরি·কত দিন,
হেরে প্রিয় ফুল্লমতি।
আহা এই ধনু চারু পুষ্পময়
মনমথ দিলা তাঁয় !
যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্পশর
ফেলিল আমার গায় !
এবে শুকায়েছে হয়েছে নিগন্ধ
প্রিয়কর কতদিন
না পরশে ইহা, সময় রংগেতে
রহ তিনি অন্তদিন ॥
সকলি কোমল প্রিয়ের আমার,
সমরে শুধু নিদয় ;
হেন সুকোমল হৃদয় তাঁহার
কেমনে কঠোর হয় !
আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায় ?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই,
মহাবীর পতি মম !
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন
বিপদে শচীর সম !”

এই সকল কবিতার সমুচিত প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। “আমিও রমণী, রমণীও শচী” ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ শত পৃষ্ঠা লিখিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না।

শচীকে ধরিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, শাশুড়ীর উপর ইন্দুবালার রাগও বড় মধুর।—

ঐন্দ্রিল-দুহিতা সেবিতে কিংকরী
স্বর্গে কি ছিল না কেহ ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী দানব মহিষী
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ !

আমারে না কেন কহিলা মহিষী,
আমি সেবিতাম তাঁয়।
পূরে নাকি তাঁয় সাধের ভাণ্ডার
শচী না সেবিলে পায় ?

রতির মুখে ইন্দ্রাণীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা বলিতেছে,—:

আমারে লইয়া কন্দর্পকামিনি,
চল সে পৃথিবী পর,
হইতে দিব না নিদয় এমন,
ধরিব পতির কর ;

এত সাধ তাঁর করিবারে রণ,
সে সাধ মিটাব আমি ;
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে
ফিরায়ে আনিব স্বামী ॥

ইন্দুবালা মর্ত্যলোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, দেবব্যূহ ভেদ করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। তখন ইন্দুবালার স্মরণ পড়িল যে, তাঁহার স্বামীকেও যুদ্ধ করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। ইন্দুবালা যুদ্ধের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। আমরা সে ভাগ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলতা তাহাতে অতি সুন্দর স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সরলতাই, ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী শক্তির মূল। কবির চিত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাও বক্তব্য যে, সে সরলতা তিনি ইন্দুবালার চরিত্রে স্পর্শ করিতে দেন নাই। শচীতে, চপলায় বা

ঐন্দ্রিলায় সে সরলতা নাই। এইরূপে তিনি চরিত্রে সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

ইন্দুবালাকে রতি শান্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়েকটি কথা বলিলেন, তাহাতে অপূর্ব কবিত্ব। সেই সরলতার সংগে কবি অতি গুরুতর গাম্ভীর্যের সূত্র জড়াইয়া দিতেছেন ;—ইন্দুবালার চরিত্রে সৌন্দর্য্য-তরংগ উছলিয়া উঠিতেছে,—

"পারি না সহিতে প্রদ্যুম্ন-কামিনি,
নিতি নিতি এই জ্বালা !
দৈত্য সেনা কত মরে অহর্নিশি,
পড়ে কত মহাবীর ;
দেখি দৈত্যকুল এইরূপে ক্ষয়
হৈবে বুঝি শেষ স্থির !
কত দৈত্যসুতা হয় অনাথিনী।
কত পিতা পুত্রহীন !
কত দেবতনু পড়িয়া মূর্ছাতে
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ !
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা
বিচারিয়া যদি দেখে,
তবে কি সে কেহ যশের আকর
বলিয়া উল্লেখে একে ?
দানবের কুলে জন্ম হয় মম,
বুঝি অদৃষ্টের ছলে !
কাম-সহচরি সত্য তোমা বলি,
সতত অন্তরে জ্বলে !"

কুলশত্রু দেবতার জন্য এই কাতরতা—"কত দেবতনু পড়িয়া মূর্ছাতে !" এই চারিটি শব্দে হেমবাবু রমণী-চরিত্রের সরলতা, মাধুর্য ও মহত্ত্বের সীমা দেখাইয়াছেন।

তখন রতি বলিতেছে,—

"হায় ইন্দুবালা তুমি সুকোমল
পারিজাত পুষ্প যেন!
পতি যে তোমার তাঁহার হৃদয়
নির্দয় এতই কেন?"

তখন পতি-নিন্দায় ইন্দুবালা গর্জিয়া উঠিয়া রতিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল,—

"শচীর লাগিয়া না নিন্দিহ তাঁরে
বীর তিনি রণপ্রিয়!
শচীর বেদনা ঘুচাব আপনি,
ফিরিয়া আসিলে প্রিয়॥
যাব শচীপাশে, শুশ্রূষা করিব,
যাতে সাধ দিব আনি।
মহিষী-কিংকরী হইতে দিব না,
কহিনু নিশ্চিত বাণী॥
মন্মথ-রমণি নাহি কর খেদ,
যাহ ফিরে নিজে বাস;
পতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী
পাইব সদা প্রয়াস॥
ভেবেছিনু আর গাঁথিব না ফুল,
থাকিবে অমনি ঢালা,
এবে গুটাইয়া আরও সুযতনে
গাঁথিয়া রাখিব মালা;
যবে শচী লয়ে ফিরিবেন পতি
পরাব তাঁহার গলে,
পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে
মুছায়ে চক্ষুর জলে॥
পতির মালিন্য, নারী না ঢাকিলে,
কে ঢাকিবে তবে আর,"

তখন রতি যে কয়টি কথা বলিতেছে, তাহা মর্ম-বিদারক,—

"এ দুঃখ তাহার করিবে মোচন,
দিয়া তারে পুষ্পহার ?
ফুলের রজ্জুতে করিলে বন্ধন
বেদনা নাহি কি তার ?

আর কেন চাও ফুটাতে অংকুর
চরণে দলিয়া আগে !
দানব-নন্দিনি, জান না সে তুমি,
দুঃখীরে পূজিলে লাগে !

মৃগেন্দ্রী আসিছে আপন আলয়ে
শৃংখল বাঁধিয়া পায় !
রতির কপালে এও সে ঘটিল,
দেখিতে হইল হায় !"

এই বলিয়া রতি কাঁদিতে কাঁদিতে গেল। ইন্দুবালাও কাঁদিতে লাগিল,—

পড়ে বিন্দু বিন্দু কুসুমের স্রজে,
ইন্দুবালা গাঁথে ফুল ;
ভাবিয়া পতিরে, ভাবি যুদ্ধ ভয়,
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল ॥

কুরংগী যেমন শুনিয়া গহনে
মৃগয়ীর দূররব,
চকিত চঞ্চল, প্রতি পলে পলে
মৃত্যু করে অনুভব ;
সেইরূপ ভয়ে চমকি চমকি
গাঁথিতে গাঁথিতে চায়,
ফুলমালা হাতে ইন্দুবালা বামা
রুদ্রপীড় ভাবনায় ॥

নবম সর্গ বীররসপ্রধান। বাত্যামথিত সাগরবৎ এই সর্গ, অবিশ্রান্ত ভীম গর্জন করিতেছে। নৈমিষে জয়ন্ত সংগে শচী কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে রুদ্রপীড় আসিল,—

হেনকালে রণশংখ,
মৃগেন্দ্র-শ্রুতি-আতংক ;
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন ;
বন আলোড়িত হয়,
কাঁপিয়া আলয়
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন।

কিংচিৎকাল প্রাচীন প্রথানুসারে বাক্‌যুদ্ধের পর, রুদ্রপীড় জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন্ যোদ্ধার সংগে জয়ন্ত যুদ্ধে ইচ্ছুক। তখন জয়ন্ত শত অসুরকে এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষা, কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি। জয়ন্তের সংগে শত যোদ্ধার যুদ্ধবর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি—

অন্য শব্দ সব স্তব্ধ,
দেব দৈত্যে যুদ্ধারব্ধ,
কেবল হুংকারধ্বনি বাণের গর্জন।

আন্দোলিত হয় সৃষ্টি,
সুরাসুরে সরবৃষ্টি,
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ॥

দ্রুঘণ, মুষল, শল্য,
প্রক্ষেড়ন, চক্র, ভল্ল,
দৈত্যের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করকা।

জয়ন্তের শররাশি,
চমকে তমসা নাশি,
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা॥

কেশরী-শার্দূল-দল,
শুনিয়া সে কোলাহল,
ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্বত গহ্বর।
বিহংগ জড়ায় পাখা,
ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা,
খসিয়া খসিয়া পড়ে ধরণী উপর ॥

ধূলিতে ধূলিতে ছন্ন,
অভেদ নিশি মধ্যাহ্ন,
উদ্গীরিল বিশ্বম্ভরা গর্ভস্থ অনল।
অসুর-জয়ন্ত-ক্ষিপ্ত
শেল, শূল, শর দীপ্ত,
ঘাত প্রতিঘাতে ছিন্ন কৈল নভঃস্থল ॥

ধরাতল টল টল,
নদীকূল কল কল
ডাকিয়া, ভাংগিয়া রোধ করিল প্লাবন।
ঘুরিতে লাগিল শূন্য,
শৈলকুল হৈল ক্ষুণ্ণ,
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগদিগন্তে পতন ॥

হেন যুদ্ধ দেবাসুরে,
হয় অর্ধদিন পূরে,
তখন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত-অসি,
ছুটে যেন নভস্বৎ
কিংবা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ,
পড়িল বেগেতে দৈত্য-মণ্ডলী ঝলসি ॥

যথা সে অতলবাসী,
তিমি তুলি জলরাশি,
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার,

যবে যাদঃপতি জলে,
ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে,
উত্তুংগ পর্বতপ্রায় দেহের প্রসার ;
ক্রোশ যুড়ি শুষি বারি,
আবার ফেলে উগারি
দূর অন্তরীক্ষে, বেগে ছাড়িয়া নিশ্বাস ;
নাসিকায় উৎক্ষেপণ,
অম্বুরাশি অনুক্ষণ,
অস্থির অম্বুধিপতি ভাবিয়া সন্ত্রাস ॥
কিংবা গিরিশৃংগ রাজি
মধ্য যথা তেজে সাজি,
ক্ষণপ্রভা খেলে রংগে করি ঘোর ঘটা,
খেলে রংগে ভীমভংগি,
শিখর শিখর লংঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা,
নিমেষে নিমেষে ভংগ,
দগ্ধ গিরি-চূড়া অংগ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ে ঘোর রাব ;
বেগে দীপ্ত গিরিকায়,
বিদ্যুৎ আবার ধায়,
ছড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাব ॥
জয়ন্ত তেমতি বলে
দানব যোদ্ধায় দলে,
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীম দাপে।

তখন সূর্যাস্ত দেখিয়া এবং নবতি যোদ্ধা হত দেখিয়া রুদ্রপীড়, বিশ্রামের আকাংক্ষা প্রকাশ করিলেন। উভয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রে শচী ও চপলা বিশ্রামশীল জয়ন্তকে দেখিয়া যে কথোপকথন করিলেন, তাহা অতি সুমধুর। প্রভাতে জয়ন্ত

মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ কামনা করিলেন। শচী অন্তরে অমংগল সূচনা দেখিয়া, জয়ন্তকে অন্য দেবের স্মরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বীরধর্মাশ্রিত জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে গেলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আশ্চর্য কৌশলের সহিত কথিত হইয়াছে।

অর্ধ দিবা যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচজন দানব বধ করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে রুদ্রপীড় তাঁহাকে ঘোরতর আঘাত করিল।

না সহি দুর্বহ ভার,
অচল বিজুলি হার
বিচ্ছিন্ন হইলে যেন, পড়িল তেমন।
কিংবা যেন রাশীকৃত
চন্দ্র-রশ্মি আভা-হৃত,
খসিয়া পৃথিবী-অংগে হইল পতন!
শিরীষ-কুসুমস্তর,
যেন বা অবনী 'পর,
পড়িয়া রহিল মহী করিয়া শোভন।
দেখিতে দেখিতে দ্যুতি,
নিমেষে মিশে তেমতি,
ভস্মেতে অংগার দীপ্ত মিশায় যেমন!

শচী আসিয়া পুত্রদেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন—

না পড়ে চক্ষের পাতা,
যেন ধরাতলে গাঁথা,
মলিন প্রস্তরমূর্তি অর্ধ অচেতন।

দেখিয়া, রুদ্রপীড় শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। কিন্তু নিকম্ভর নামে এক পামর অনুচর সংগে ছিল; শচীহরণ জন্য তাহাকে অনুমতি করিলেন। নিকম্ভর শচীর কেশ ধরিয়া তুলিল—

হায় মতংগজ যথা,
ছিঁড়িয়া মৃণাল-লতা,
শুণ্ডেতে ঝুলায়ে তুলে শতদল থর ;
দানব-করেতে তথা,
নিবদ্ধ কুন্তললতা,
তুলিতে লাগিল শূন্যে শচীকলেবর !

দৈত্যগণ, স্তম্ভিতা শচীকে কেশ ধরিয়া শূন্যপথে লইয়া চলিল স্বর্গদ্বারে শংখধ্বনি শুনিয়া শচীর মূর্ছা ভংগ হইল। তখন শচী উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ; সেই রোদন মর্মভেদী তূর্যধ্বনিবৎ। শুনিয়া ত্রিলোকের জীব কাঁদিল। এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়া দেখিলেন, দেবগণ সমরে পরাভূত হইয়াছেন,—

রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে,
আছে শৈলরাজি ছেয়ে,
চারিদিকে দেব-তনু কিরণ প্রকাশি ;
দিনান্তে নদীর জল,
ঈষৎ-বায়ু-চঞ্চল,
তাহা যেন ভাসিতেছে ভানু-রশ্মিরাশি।

সর্বশেষে একটী চমৎকার ছত্র আছে। শচী-দেহ, অসুর, বৃত্র-সভাতলে আনিল। দেখিয়া দৈত্যপতি,—

চমকি সম্ভ্রমে উঠি যেন দাঁড়াইল।

দশম সর্গারম্ভে ইন্দ্র কৈলাসপুরে যাইতেছেন. আমরা কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে দীর্ঘ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিব—পাঠকেরা, তজ্জন্য আমাদিগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, এমন বিশ্বাস আছে।

ক্রমে ব্যোমগর্ভে যত প্রবেশে বাসব,
স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
নিরখিলা সুসজ্জিত অন্তরীক্ষ মাঝে
জ্যোতি বিমণ্ডিত কোটি গ্রহের উদয়।
দেখিলা ভ্রমিছে শূন্যে শশাংকমণ্ডল

ধরাসংগে, ধরা অংগ করি প্রদক্ষিণ,
প্রকাশিয়া চারুদীপ্তি সূর্যচারিধারে,
শীতল কিরণে পূর্ণ করিয়া গগন।
ভ্রমিছে সে সুধাকর পৃথিবী ছাড়িয়া
আরো উধ্ব´শূন্যদেশে অতি দ্রুতবেগে,
চন্দ্রমা-বেষ্টিত চারি, চারু-শোভাময়,
দীপ্ত বৃহস্পতিতনু বেষ্টিয়া ভাস্করে।
সে সকলে রাখি দূরে কান্তি মনোহর
ভাতি উপবীত অংগে, চলেছে ছুটিয়া
ভয়ংকর বেগে শূন্যে ঘেরিয়া অরুণে,
সপ্ত কলানিধি সংগে গ্রহ শনৈশ্চর!
দেখিলা সে কত শশী, কত গ্রহ হেন,
ব্যোমমার্গে ভ্রমে সদা ফুটিয়া ফুটিয়া,
উজ্জ্বল কিরণমালা জড়ায়ে অংগেতে,
অপূর্ব ধ্বনিতে শূন্য করি আনন্দিত।
দেখিতে দেখিতে বেগে চলিলা বাসব
উধ্ব´উধ্ব´বায়ুস্তর করি অতিক্রম—
ধরাতল ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর অতি
সুদূর নক্ষত্রতুল্য লাগিল ভাতিতে
ক্রমে ক্ষীণ-লীনাপ্রায়-মসীবিন্দুবৎ
হইল ধরণী-অংগ, বাসব ক্রমশ
উঠিতে লাগিলা যত অনন্ত অয়নে,
নিম্নদেশে ছাড়ি চন্দ্র শুক্র শনৈশ্চর।
অদৃষ্ট হইল শেষে—বাসব যখন
ছাড়িয়া সুদূর নিম্নে এ সৌর জগৎ,
বায়ুবিরহিত ঘোর অনন্তের মাঝে
উতরিলা আসি ভীম কৈলাসপুরীতে।
শব্দশূন্য, বর্ণ-শূন্য প্রশস্ত, গভীর,

ব্যাপৃত সে অন্তরীক্ষ, ব্যাস অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে, পূরি চতুর্দিক,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মূর্তি ছায়ার আকারে।
বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি
বিদ্যমান সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে অনন্ত শরীরে,
মুহূর্তে মুহূর্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।
বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য-ভূষিত অষ্ট, প্রশান্ত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা ;
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি !

তথা শংকর এবং উমা, অতি গূঢ় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসংগের জল্পনায় আনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এমত সময়ে ইন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া, পার্বতী তাঁহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। ইন্দ্রও সকল কথা বলিলেন। এমত সময়ে সহসা শিবের জটা কম্পিত হইল ; ইন্দ্রের হস্ত হইতে কার্মুক স্খলিত হইল ; গৌরীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িল। শচীর ক্রন্দন কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শুনিয়া ইন্দ্র দ্রুতবেগে স্বর্গাভিমুখে ছুটিতেছিলেন। শিব তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন ইন্দ্র গর্জিয়া উঠিয়া, শংকরকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। সেই মহাতেজোময় দৃপ্ত বাক্য উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। মহাদেবও তখন বৃত্রের অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া, সহসা সংহার-মূর্তি ধারণ করিলেন। পার্বতী ঈশানকে শান্ত করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে দধীচির আলয়ে যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে বজ্রসৃষ্টি হইবে।

একাদশ সর্গের আরম্ভে স্বর্গপুরে দৈত্যজয়োৎসব। শচীকে দেখিতে দৈত্যপুরবধূ ছুটিতেছে—তদ্বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকের কালিদাস কৃত, বর দেখিতে নাগরীদিগের গমন বর্ণনা স্মরণ হইবে।

এদিকে বৃত্র, বৃত্রপুত্র একত্র মিলিত হইলে উভয়ে আপনাপন যুদ্ধ

সংবাদ কহিতে লাগিলেন—বৃত্র সগর্বে, রুদ্রপীড় বিনীতভাবে। তৎপরে ঐন্দ্রিলা শচীর আনয়ন সংবাদে প্রীত হইয়া পুত্রকে তাহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর রূপের অনেক প্রশংসা করিলেন। পুত্রমুখে শচীর রূপের কীর্তন শুনিয়া ঐন্দ্রিলার আর সহ্য হইল না। তিনি স্বামীকে আদেশ করিলেন যে তখনই শচীকে আনাইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হউক—

"অলক্তে রঞ্জিবে শচী আজি এ চরণে।"

কৈলাসে পার্বতী এই কথা শুনিয়া মহাদেবকে জানাইলেন। তখন মহাকালের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তৎফলে—

সংহার ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে
ভ্রমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে।
চমকিল ব্যোমমার্গে ভাস্করের রথ;
অতল ছাড়িয়া কূর্ম উঠে অদ্রিবৎ;
বাসুকী গুটায় ফণা, মেদিনী কম্পিত;
উত্তাল উল্লোলময় সিন্ধু বিধূনিত;
ভয়েতে ভুজংগকুল পাতালে গর্জয়;
সদ্যোজাত শিশু মাতৃস্তন ছাড়ি রয়,
বিদীর্ণ বিমানমার্গ, গিরিশৃংগ পড়ে;
চেতনে জড়ের গতি, গতিপ্রাপ্ত জড়ে;
টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌ ত্রিদশ আলয়;
মূর্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা উদয়,
দোদুল্য সঘনে শূন্যে সুমেরু শিখর
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাঁপে থর থর!
ঐন্দ্রিলার হস্ত হৈতে খসিলা কংকণ;
রুদ্রপীড় অংগে হৈল লোম-হরষণ;
নিঃশংক বৃত্রের নেত্রে পলক পড়িল,
"রুদ্রের ক্রোধাগ্নি-চিহ্ন" জ্বলিয়া উঠিল॥

এইখানে অদৃষ্টের বিষময় বীজ রোপিত করিয়া কবি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের ছন্দ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটী ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রের শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যো-পান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের কিংচিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরাজী রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগ পূর্বক, দেশী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাংলার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, "কেবল সচরাচর, সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।" কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে, পদ্যের তাদৃশ উৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙালী কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদি রসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য হওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার কাব্য যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাঁহার যোগ্য নহে। কিন্তু "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতেনিমজ্জতীত্যাদি।"

(বংগদর্শন, ১২৮১)

বৃত্রসংহার

দ্বিতীয় খণ্ড *

(১)

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথম খণ্ডের শেষে, দানবপত্নী ঐন্দ্রিলাকৃত শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। প্রথমখণ্ডের আরম্ভে দ্বাদশসর্গে সেই ক্রোধাগ্নিশিখা দেখিয়া, বৃত্রাসুর স্তম্ভিত, ভীত।

শূল হস্তে দৈত্যপতি একাকী দাঁড়ায়ে,
ভূধর অংগেতে স্বীয় অংগ হেলাইয়া,
একদৃষ্টি শূন্য দেশে কটাক্ষ হানিছে—
যেখানে শিবের ক্রোধ-চিহ্ন দেখা দিল।

বৃত্র, শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখিয়া আপনার অমংগল আশংকা করিতে করিতে, মহিষীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় শচীকে মুক্ত করিয়া শিবকে প্রসন্ন করেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সখ, শচী তাঁহার সেবা করিবে। প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টি মিটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আব্দার মিটে না। ঐন্দ্রিলা, লেডি মাকবেথের মত স্বামীর আশংকা মুখঝামটায় উড়াইয়া দিলেন। বৃত্র দেখাইয়া দিলেন,

চেয়ে দেখ অন্তরীক্ষে সে বহ্নির রেখা
এখনো ভাতিছে মৃদু সুমেরু উপরে দীপ্ত
অন্ধকার যথা!

ঐন্দ্রিলা কথা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষণ হইয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। অথবা দেবতার মায়া!"

আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে
হতেম, দেখিতে তবে আমার কি পণ!—

* বৃত্রসংহার কাব্য। দ্বিতীয় খণ্ড। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন। ১২৮৪ সাল।

ভয়, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে !

বৃত্রের প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেব সেনাপতির বন্ধন ঐন্দ্রিলা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বৃত্র বলিলেন, "তুমি স্ত্রীলোক!" ঐন্দ্রিলা বড় কোপ করিয়া বৃত্রকে গর্বিতলোচনে গর্বিত বচনে ইন্দ্রজেতাকে ভৎ‍র্সনা করিল। বৃত্র, ঐন্দ্রিলার ক্রোধ বড় গ্রাহ্য না করিয়া, রতিকে আদেশ করিলেন, যে শচীকে ডাকিয়া আন। আমি তাহার কারাক্লেশ ঘুচাইব। বৃত্র, স্বয়ং প্রাচীরশিরে উঠিয়া দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন। হেমবাবুর একটী মণিময় বর্ণনা—

জ্বলিছে দেবের তনু গভীর নিশীথে !
স্থানে স্থানে রাশিরাশি—কোথাও বিরল—
কোথা অবিরল শ্রেণী—দু'একটী কোথা !
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা ! দেখিতে তেমতি
হে কাশি, তোমার তটে—জাহ্নবীর জলে
ভাসে যথা দীপমালা তরংগে নাচিয়া
কার্তিকের অমাবস্যা উৎসব নিশিতে,
মত্ত যবে কাশীবাসী দেয়ালি-উল্লাসে।
অথবা দেখিতে, আহা, নক্ষত্র যেমন—
নক্ষত্র নিশীথ পুষ্প—নীলাম্বর মাঝে
শোভে যবে অন্ধকারে রজনীরে ঘেরি।
দীপ্ত সে আলোকে নানা বর্ম, প্রহরণ,
খড়্গ, অসি, শূল, ভল্ল, নারাচ পরশু,
কোদণ্ড বিশাল মূর্তি, গদা ভয়ংকর,
জ্যোতির্ময় দীপ্ত তনু তূণীর, ফলক,
তোমর, মার্গণ, ভীম টাংগী খরশান।
কোনখানে স্তূপাকার জ্বলিছে তিমিরে
বিবিধ অস্ত্রের রাশি ; কোথাও উঠিছে
রথের ঘরঘর শব্দ—নেমি দীপ্তিময় ;
কোথা শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে।

ত্রয়োদশ সর্গারম্ভে, ইন্দ্র, পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দধীচির আশ্রমে যাইবেন। অরণ্যমধ্যে দৈত্যভয়ে স্বর্গচ্যুতা দেবকন্যাগণ পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া দিনযাপন করিতেন। এখন, রজনীর আশ্রয় পাইয়া স্ব স্ব দেহ দেহ ধারণ করিয়া দিব্যাংগনাগণ সেই অটবী মধ্যে কেলিরংগ করিতেছিলেন। অল্প কথায় এই চিত্রটী বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভুলিবে না। দেবকন্যাগণ ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথ বলিয়া দিলেন। লোকহিতৈষী পরহিতব্রত, শান্তিরসনিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর। বাসব, ঋষির আশ্রমে দেখা দিলেন। ঋষি, ইন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র, ঋষির প্রাণভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন—কি প্রকারে তাহা বলিবেন? মুখে বলিতে পারিলেন না—নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তৎসদৃশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহর্ষণ মহাচিত্র বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এই সরল, সুধাময়, কথাগুলি বিস্তৃত হইলেও উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত?—কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম!
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা, দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের (ও) অতীত!
এতেক কহিয়া মহা তপোধন ধীরে,
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অংগন-মাঝে; কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা,

সাশ্রুনেত্র-শিষ্যবৃন্দ, আকুল-হৃদয়,
যোগাসন গাংগেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্গুল্,
সর্জরস; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুণীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি জ্যোতি সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে!
সুললাটে আভা নিরুপম! বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে!
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি শিষ্যকুল-মুখ মধুর সম্ভাষে
কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভব মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে, পায় কত জন!"

* * * *

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিয়া এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধন শিরঃ স্পর্শি সুকর-কমলে,
কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু—শিরোরত্ন ঋষি তুমিই সাত্ত্বিক!

তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন !
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর !”

* * *

বলিয়া রোমাঞ্চ-তনু হইলা বাসব
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভা নিরমল !
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদ গান,
উচ্চে হরিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনি-শোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভমণ্ডল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন লতা-তরুকুল শোকে অবনত !
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাস শূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি—
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ-ক্ষণে-শূন্যে উঠি
মিলাইল শূন্যদেশে ! বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য-হরিসংখ ; শূন্যদেশ যুড়ি
পুষ্পসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি !—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মংগলে।

সুশীতল সাগরবৎ, এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে—ইহার অতল রসপ্রবাহে মন ডুবিয়া যায়।

চতুর্দশসর্গে “চিত্তময়ী” সর্গে ইন্দ্রানীর বন্দিনী—

——শোভিছে তেমতি।
চির পরিচিত যত অমর বিভব।
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে
অমরা হাসিছে আজি।

কিন্তু স্বর্গ আজি অসুর পীড়িত, পরাধিকৃত দেশ—
চিত্তময়ী ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর হৃদয়ে
সে পোড়া দহন আজি।

পঞ্চদশ সর্গে স্বর্গদ্বারে সুরাসুরেব যুদ্ধ এবং অসুরের পরাভব। অসুরের পরাভব দেখিয়া বৃত্র স্বয়ং দেববিজয়োদ্দেশে শিবদত্ত ত্রিশূল পরিত্যাগ করিলেন। অব্যর্থ ত্রিশূলের ত্রাসে সকল দেবগণ লুক্কায়িত হইলেন—ত্রিশূল লক্ষ্য না পাইয়া বৃত্রের করেই ফিরিয়া আসিল।

যেমন পঞ্চদশ সর্গে বৃত্রের রণজয়, ষোড়শ সর্গে তেমনি ঐন্দ্রিলার রণজয়। বৃত্রের রণজয় শিবের ত্রিশূল—ঐন্দ্রিলার রণজয় মন্মথের ফুলধনু লইয়া। রসিক কবি, বৃত্রের রণজয়ের অপেক্ষা ঐন্দ্রিলার রণজয় গাঁথিয়াছেন ভাল।

ঐন্দ্রিলার মনে মনে বড় সাধ, শচী তাঁহার সেবাকারিণী পরিচারিকা হইবে। কিন্তু তাঁহার কৃত শচীপীড়নে রুদ্রদেব-রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। তাহাতে বৃত্র ভীত হইয়া, শচীকে ছাড়িয়া দিতেছিলেন। শুনিয়া ঐন্দ্রিলা সে ভয় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ব্যংগ শুনিয়া বৃত্র, বীরসুলভ ঘৃণার সহিত মহিষীকে বলিয়াছিলেন, "বামা তুমি ?" ঐন্দ্রিলার সে কোপ মনে ছিল—

"বামা আমি, অহে দৈত্যকুলেশ্বর"
কহে দৈত্যরামা অর্ধ মৃদু-স্বর,
"শচী ছাড়ি নাথ, আমায় কাতর
করিবে ভেবেছ—ইচ্ছায় আমার এতই হেলা॥

আমি, দৈত্যনাথ, রমনী তোমার,
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার
তোমার (ও) যেমন তেমতি আমার ;
হে দনুজপতি, দেখিবে এবার বামা কেমন !"

ঐন্দ্রিলার আদেশে মদন তখন স্বর্গে এক অতুল্য শোভাসমন্বিত নিকুঞ্জ নির্মাণ করিলেন, ঐন্দ্রিলা সেইখানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত

সময়ে রতি আসিয়া শচীর কঠিন, দর্পিত উত্তর শুনাইল। ঐন্দ্রিলা বলিলেন, "তবে আমি স্বয়ং তাহাকে আনিতে যাইব। রতি, তুমি আমাকে ভাল করিয়া সাজাইয়া দাও দেখি—রতি তাহাকে অপূর্ব সাজে সাজাইল। এমন কালে বৃত্রাসুর রণজয় করিয়া আসিল। কুঞ্জের শোভা, ও ঐন্দ্রিলার সাজ দেখিয়া, অসুরেশ্বর মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু দেখিলেন যে ঐন্দ্রিলার বৈভব সকল কুঞ্জমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঐন্দ্রিলা বলিল—

কোথা তবে আর রাখিব এ সব,
কহ শুনি ওহে হৃদয়বল্লভ !
কার গৃহ, হায়, ভবন ও সব
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব !
শচী-ভবন !

শুনিয়া অসুর বড় ক্রুদ্ধ হইল।

অমরার রাণী !—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি,
এ ভুবন তার !—কহিলা কি জানি
তস্কর আমরা ?—চাহে না সে ধনি
কারা মোচন।
"আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রানি ?
বিফল করিলি দৈত্যরাজ বাণী ?"
বলি ছিঁড়ি কেশ দুই হস্তে টানি
ছুটিল হুংকারি ;—হেরি দৈত্যরাণী
বামা চতুর।
নিল ফুলধনু আপনার হাতে ;
বাঁকাইল চাপ (ফুলবাণ তা'তে)
আকর্ণ পূরিয়া ; বসি হাঁটু গাড়ি
(সাবাস সুন্দরি !) বাণ দিল ছাড়ি
ঈষৎ হাসি।

অব্যর্থ সন্ধান! মদনের বাণ
আকুল করিল দনুজ পরাণ;
ফিরিয়া দেখিল স্থির সৌদামিনী
হাসিছে ঐন্দ্রিলা—দানব কামিনী
লাবণ্য-রাশি!

* * *

কহে দৈত্যপতি "তোমায়, সুন্দরি,
দিলাম সঁপিয়া ইন্দ্র সহচরী;
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি,
পূরাও মহিষি;—ফণা চূর্ণ করি
আনো ফণিনী।"

সপ্তদশ সর্গে, রুদ্রপীড়ের যুদ্ধে যাত্রা। রুদ্রপীড় অগ্নি এবং জয়ন্তের কাছে পরাভূত হইয়াছিলেন, সেই দুঃখে তাঁহার শরীর দহিতেছিল। পিতার নিকট, পুনর্বার যুদ্ধগমনের আজ্ঞা লইলেন। মাতার কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং পত্নী ইন্দুবালার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। পরদুঃখকাতরতা ইন্দুবালার প্রাণে সহে না যে, কেহ যুদ্ধ করে—স্বামী যুদ্ধ করে একান্ত অসহ্য। ইন্দুবালা কিছুতেই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। রুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দুবালা পতির মংগলের জন্য শিবপূজা করিতে গেলেন। পূজার ঘট মহাদেবের মাথার উপর ভাংগিয়া গেল।

অষ্টাদশ সর্গ প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য। বিষয় ও গীতিবাব্যের—কাব্য ও গীতি। এরূপ ওজস্বিনী, তূর্যধ্বনিসদৃশা গীতি, হেমবাবু ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না।

এই সর্গে শচীর নিকট রতি ইন্দুবালাকে লইয়া গিয়াছে। যেখানে শচী তাহাকে নানা কথায় ভুলাইতেছেন এমত সময়ে ঐন্দ্রিলা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রবধূকে শক্রপত্নীপদতলস্থা দেখিয়া ঐন্দ্রিলার গুরুতর ক্রোধ উপস্থিত হইল এবং ইন্দুবালাও তাঁহার আগমনে সশংকিত হইল। এদিকে ঐন্দ্রিলা ইন্দ্রানীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য

করিয়া পদাঘাতের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময় শিবদূত আসিলে, সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। বীরভদ্র শচীকে সুমেরু-শিখরে লইয়া গেলেন এবং বৃত্রনিধন যে নিকট তাহা বৃত্রমহিষীকে শুনাইয়া গেলেন।

উনবিংশ সর্গে বজ্রের নির্মাণ। বিশ্বকর্মার শিল্পশালায়, ইন্দ্র দধীচির অস্থি লইয়া উপস্থিত।—হেমবাবুর কবিতা, সর্বত্র সমান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্বকর্মার শিল্পশালায় তাঁহার সংগে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়—কর্ণ বধির হইয়া যায়। অগ্নির গর্জনে, মুদ্গরের আঘাতে, ধূমের তরংগে, ধাতুনিঃস্রবে, রবে মহাকোলাহল—আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সত্য সত্যই দেব-শিল্পীর কারখানায় আসিয়া পৌছিয়াছি। এই সর্গ—কবির কল্পনাশক্তির এবং মৌলিকতার বিশেষ পরিচয়স্থল। এই সর্গে বজ্র নির্মিত হইল এবং তাহাতে ত্রিদেবের তিনশক্তি প্রবেশ করিল।

(২)

বিংশ অধ্যায়ে রুদ্রপীড়ের রণ। রণে রুদ্রপীড় দেবগণকে পরাভূত করিলেন। দেবগণ স্বর্গদ্বার হইতে তাড়িত হইয়া ভগ্নোৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন—বৃত্র এবং বৃত্রপুত্র ইন্দ্রেতর দেবের অজেয়—অতএব ইন্দ্র যতদিন না আসেন, ততদিন রণক্লেশ বৃথা সহা।

একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী এবং ত্রিদেব ইহার অভিনেতৃগণ। রুদ্রাণী, ইন্দ্রাণীর অপমানে মর্মপীড়িতা হইয়া বৃত্রবধের পরামর্শের জন্য ব্রহ্মার সদনে গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ। লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ভূত করিলেন; হর্বট স্পেন্সর তাহার বিচিত্র ব্যখ্যা করিলেন। ঘৃণিত বংগদেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধা সঞ্চিত করিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গেলেন এবং বিষ্ণু ও উমার সহিত কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। কৈলাসের ফুলবেঞ্চে হুকুম হইল যে অকালে বৃত্রের নিধন হউক।

দ্বাবিংশ স্বর্গের আরম্ভে ;—

বসিয়া অসুর—পার্শ্বে অসুর ভামিনী ;—
নবীন নীরদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি,
বুকে ইন্দ্রধনু-রেখা, ঢাকিয়া মিহির,
পরাশি ভূধর-অংগ রহে যেন স্থির !
যেন ঢল ঢল জলে নীলোৎপল দল,
প্রসারিত নেত্রদ্বয়, দৈত্যমুখে চাহি রয়,
নিস্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন,—
না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন !

ঐন্দ্রিলা একটু সোহাগ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রানী জিতিয়া গিয়াছে, সেই ঝালে গা জ্বলিতেছিল। বৃত্রাসুর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভাব কেন ? মহিষী তখন দুঃখের কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। "শচী আমায় নাতি মারিয়া, বৌ কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।" অসুর বড় রাগিয়া উঠিল। তখন ঐন্দ্রিলা যথায় সুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া শচী নির্ব্বিঘ্নে অবিষ্ঠান করিতেছে, তাহা দেখাইতে লইয়া গেল। বৃত্র দেখিতে অমরার প্রাচীরে উঠিলেন।

তখন দেব দৈত্যে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়াছে। রুদ্রপীড় অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়া, দেবসেনা বিমুখ করিতেছে। এমত সময়ে বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন।

দেখিল অসুর সুর প্রাচীর শিখরে
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রাসুর মহাকায়
দাঁড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে প্রসারিয়া
আশীর্বাদ করে যেন পুত্রে সংকেতিয়া।
চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে,
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর-কুন্দল
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রস্থত উরস,
তিন নেত্রে তরুণের রক্তিমা-পরশ।

বৃত্র পুত্রকে সাধুবাদ করিয়া উৎসাহিত করিলেন ;

"মা ভৈ মা ভৈ" শব্দে ভীষণ নিনাদি
কহিলা দনুজেশ্বর "হের পুত্র ধনুর্ধর
ক্ষণকাল নিবার এ স্থর রথিগণে,
এখনি বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রণে।"

বৃত্রাসুর চলিয়া গেলে, রুদ্রপীড় সকল দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রের সংগে রণে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং দেবরাজের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ, ত্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণরসে। রুদ্রপীড়ের নিধনবার্তা শুনিয়া বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং দ্বেষ-হিংসাপূর্ণা ঐন্দ্রিলার তেজোগর্ব অমর্ষসূচিত রোদন উভয়েই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল। আমরা এই কাব্যের প্রথমভাগ হইতে অনেক উদ্ধৃত করিয়াছি এজন্য, আমরা আরও উদ্ধৃত করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু ঐন্দ্রিলাবিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত না করিলে ঐন্দ্রিলার চরিত্রে সুসংগতি সমষ্টীকৃত হয় না :—

"কি কব, হে দৈত্যনাথ, না শিখিলা কভু
সংগ্রামের প্রকরণ ঐন্দ্রিলা কামিনী!
নহিলে সে দেখা'তাম কার সাধ্য হেন
ঐন্দ্রিলার পুত্রে বধে তিষ্ঠে ত্রিভুবনে?
জ্বালা'তাম ঘোর শিখা, চিত্তে দহে যাহে,
সেই তস্করের চিত্তে—জায়া-চিত্তে তার
জ্বালা'তাম পুত্রশোক চিতা ভয়ংকর!
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা!"
সহসা পড়িল দৃষ্টি দনুজ-বামার
রুদ্রপীড়-রণ-সাজে, হেরি পুত্র-সাজ
হৃদয়ে শোকের সিন্ধু বহিল আবার!
বহিল শোকাশ্রুধারা গণ্ড ভিজাইয়া!

পরদিন সূর্যোদয়ে রণ হইবে—দানবপুরীতে সেই কালরজনীতে

ভীষণ রণসজ্জা হইতে লাগিল। পরদিন দানবকুল ধ্বংস হইবে। আমরা সেই ভয়ংকরী রণসজ্জার কথা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—দুঃখ রহিল। কৃতান্তের কালছায়া আসিয়া সেই পুরীর উপর পরিয়াছে—গভীর মানসিক অন্ধকারে অসুরপুরী গাহমান হইয়াছে—কালসমুদ্র উদ্বেলনোন্মুখ দেখিয়া কূলস্থ জন্তু সমূহের ন্যায় অসুরমহিলাগণ বিত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগামী বৃত্রসংহারের করাল ছায়া অসুরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে।

চতুর্বিংশ সর্গে বজ্রাঘাতে বৃত্রবধ এবং কাব্যসমাপ্তি। দেবদানবের আশ্চর্য রণ।

লহরে লহরে
দুলিয়া, ভাংগিয়া, পুন মিলিয়া আবার,
সাগর তরংগ তুল্য বিপুল বিশাল
চলিল দনুজদল সেনানী চালনে।
দৈত্যধ্বজা উড়িছে গগনে মেঘাকার!
ঝক্ ঝক্ কিরণ চমক্ অস্ত্র' পরে;
রথধ্বজ কলসে, তনুত্রে ধনুহুলে,—
ঝকিছে কিরণোচ্ছ্বাস দিগন্ত ব্যাপিয়া!

তুমুল সংগ্রাম বাধিল। বাসব ও জয়ন্তের পরাভবার্থ বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ করিলেন।

শূল ব্যর্থ দেখিয়া বৃত্র,
ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁদিল জগৎ!
উজার স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ তারাদল,

খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে !
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায়।
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া
ছুটিতে লাগিল ভয়ে রোধিয়া শ্রবণ
কৈলাস বৈকুণ্ঠ ব্রহ্ম-লোক। সে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন! মহাকাল
শিবদূত কৈলাসে দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে !
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্বলোপ হয়!"

তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন।

ছুটিল গর্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্য-পথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সংগে দিল যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অংগে মাখি,
আবর্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সংগে ; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল ;
দিঙ্মণ্ডল যেন
ঘোর রংগে সংগে সংগে ঘুরিয়া চলিল !

বজ্রঘাতে বৃত্র প্রাণত্যাগ করিল।

(৩)

বৃত্রসংহারে প্রবেশ করিয়াই আমরা কাব্যের দ্বারে শক্তির বিশাল মূর্তি দেখিতে পাই। চারিদিকে শক্তির বিকাশ। সম্মুখে, মনুষ্যের

বুদ্ধির অতীত দৈবশক্তি সূর্য, বহ্নি, মরুৎ, পাশী, স্বয়ং দণ্ডধর কৃতান্ত। তদুপরি দৈবশক্তিবিজয়ী, আসুরিক বল। অগাধ সলিলে বনক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শকরীর ন্যায়—আমরা এই শক্তিসাগরে ডুবিয়া, অস্থির, দিশাহারা হই; কাব্যের মর্মার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারি না। যেমন সমুদ্রতলস্থ ক্ষুদ্র মৎস্য সাগর বেলার কোন সন্ধান পায় না।—আমরা এই কাব্য মধ্যে প্রথমে শক্তির সীমা দেখিতে পাই না। শক্তিই শক্তির সীমা স্বরূপ দেখিতে পাই—অন্য সীমা দেখিতে পাই না। দেখি দৈবশক্তির শেষ আসুরিক শক্তিতে, আসুরিক শক্তির রোধ দৈবশক্তিতে। তবে বাহুবল কি এই জগতে অপ্রতিহত? কি মর্ত্যে কি স্বর্গে বাহুবলই কি বাহুবলের শেষ দমন কর্তা? এরূপ সিদ্ধান্তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়— জগৎ কেবল দুঃখের আগার বলিয়া বোধ হয়—এবং স্রষ্টার সৃষ্টি কেবল নিষ্ঠুরের পীড়নকৌশল বলিয়া বোধ হয়।

এই প্রশ্নের উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞান সহজে দিতে পারে না। মনুষ্যজীবনের সামান্য ভাগ দর্শন ও বিজ্ঞানের আয়ত্ত। তাহাদিগের ক্ষমতা ক্ষুদ্র পরিধিমধ্যে সংকীর্ণীভূতা—তাহারা প্রমাণের অধীন। যতদূর প্রমাণ আছে—ততদূর দর্শন বা বিজ্ঞান যাইতে পারে; প্রমাণ রজ্জু ফুরাইলে তাহাদিগের গতি বন্ধ হয়। তাহারা বলে ঈশ্বর নাই; ধর্ম নাই; উভয়েরই প্রমাণাভাব; বাহুবলই বাহুবলের সীমা!

এইখানে কাব্য আসিয়া আপনার উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যাহা বিজ্ঞান ও দর্শনের অতীত তাহা কাব্যের আয়ত্ত। যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান ও দর্শন দিতে অক্ষম, কাব্য তাহাতে সক্ষম। যাহা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, কবি নিজ প্রতিভাবলে, দূরপ্রসারিণী মানসী দৃষ্টির তেজে, তাহা পরিষ্কার দেখিতে পান। সে দৃষ্টি ভ্রান্তিশূন্যা, কেন না তাহা নৈসর্গিক ঈশ্বর প্রেরিত। কবিরাই প্রধান শিক্ষক জগৎগুরুশ্রেণীর মধ্যে গেলেলিও বা বেকন্ অপেক্ষা সেক্সপীয়রের উচ্চ স্থান, লাপ্লাস বা কোমৎ অপেক্ষা ওয়াল্‌টার স্কটের অধিক মহিমা।*

* কাব্যের উদ্দেশ্য যে শিক্ষা ইহা সচরাচর বোধ হয় স্বীকৃত নহে। বিলাতি সমালোচক-দিগের প্রচলিত মত এই যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য

এই দেব এবং অস্থরিক শক্তির ভীষণ অবতারণা নূতন নহে। এবং বৃত্রবধও নূতন নহে। বাল্যকাল হইতে আমরা এ সকল জানি। পুরাণ উপপুরাণ দেবাস্থরের শক্তি মাহাত্ম্য পরিপূর্ণ—বৃত্রসংহার কাব্য সেই মহাবৃক্ষের একটী পল্লব মাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে। কেন রচিত হইল? বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্য কি, অনেকের বিবেচনার এরূপ কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্য, কয়েকটি উজ্জ্বল চিত্রের একত্র সমবেশ—কতকগুলি স্থপদ্যের একত্রে সংকলন মাত্র। আমরা বিগত দুই সংখ্যায় যে কবিতা পুষ্পহার গাঁথিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছি, অনেকের বিবেচনায় তাহাই কাব্যের উদ্দেশ্য এবং সফলতা। এরূপ অনেক কাব্য আছে। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ ভিন্ন অপরে সচরাচর এইরূপ কাব্য প্রণয়নে ব্যস্ত। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যও আছে। "পলাসির যুদ্ধ" একটী উদাহরণ। একটী উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, কিন্তু কতকগুলি স্থমধুর, ওজস্বী গীতি-কাব্যের সংকলন মাত্র। বৃত্রসংহারের লক্ষ্য মহত্তর—স্থতরাং উচ্চতর স্থান ইহার প্রাপ্য।

প্রথমে কাব্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অপরিমেয় দৈব ও আস্থরিক শক্তির "ঘাত প্রতিঘাতে" কিছু ব্যতিব্যস্ত হই—কোন পথে কাব্যস্রোত চলিতেছে, শীঘ্র বুঝিতে পারি না। প্রথম যখন নৈমিষারণ্যে অসহায়া শচীকে অস্থরগণ ধরিতে যায়, তখন একটু আলো দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, শক্তির অত্যাচার। প্রথম খণ্ডের শেষে গিয়া, যখন শচীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্নি-শিখা স্বর্গীয় বায়ুস্তরে দেখি; তখনই বুঝিতে পারি কাব্যের মর্ম কি—শক্তির অত্যাচারেই শক্তির অধঃপতন।

বাহুবলই কি বাহুবলের সীমা? এ প্রশ্নের এখন উত্তর পাইলাম। বাহুবল বাহুবলের সীমা নহে। বাহুবলের অসদ্ব্যবহার বা অত্যাচারই

ছাড়িয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কাব্য অপকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য বটে এবং অসত্যও বটে। কি প্রকারে সত্য এবং কি প্রকারে অসত্য, শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ, উভয়ের সঙ্গে কাব্যের কি সম্বন্ধ, সবিস্তারে তাহা বুঝাইবার স্থান এ নহে। তাহা বুঝাইতে আর একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে তত্ত্বের যৎ কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা গিয়াছে।

বাহুবলের সীমা। বাহুবল ধর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে অত্যাচার অধর্ম্মের সহিত মিলিত হইলে বিনষ্ট হয়। মনুষ্য জীবন ইহার নিত্য উদাহরণস্থল। সমাজের গতি ইহার উদাহরণে পরিপূর্ণ। ইতিহাস কেবল এই কথাই কীর্তন করে—হস্তিনার কুরুগণ হইতে পুণার মহারাষ্ট্রগণ পর্যন্ত—টার্কুইনের রোম হইতে অত্যকার টকি পর্যন্ত, এই মহাতত্ত্বের ঘোষণা করে। কথা পুরাতন, কিন্তু আজিও মনুষ্য ইহা বুঝিল না, মনে করে শক্তিই অজেয়, কেন না শক্তি শক্তি। কিন্তু কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে পান শক্তি অকিঞ্চিৎকর, অনিত্য, শক্তিও অশক্ত। ধর্মই নিত্য, ধর্মই বল—শক্তি তাহার সহায় মাত্র।

এই নৈতিকতত্ত্বের উপর আরোহণ করিয়া, মনুষ্য জীবনের এই সমস্যার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, কবি বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ না ভাবেন, যে এই নৈতিক তত্ত্বের একটী উদাহরণ অলংকার বিশিষ্ট করিয়া ছন্দোবন্ধে উপাখ্যাত করা তাহার উদ্দেশ্য। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য স্মৃষ্টি। বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্যও সৌন্দর্য স্মৃষ্টি। কিন্তু কিসের সৌন্দর্য ? কোন আকার ধরিয়া সৌন্দর্য কাব্য মধ্যে অবতরণ করিবে ? যদি কাব্য না হইয়া ভাস্কর্ষ বা চিত্র বিদ্যা হইত, তাহা হইলে সহজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা হইত। রতির রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল প্রস্তরে খোদিত হইত—নন্দনকাননের শোভা, বা সুমেরুর মাহাত্ম্য পটে বিকসিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নহে—মনের সৌন্দর্য ইহার উদ্দেশ্য। কেবল পর্বতের শোভা, রমণীর রূপ, বা আকাশের বর্ণ, ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য গঠিত হইতে পারে না। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্যই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশ্য। মানসিক বা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য কাব্য ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অতএব কার্যের বিবৃতি লইয়া এ সকল কাব্য গঠিত করিতে হয়। যে কার্য সুন্দর, তাহাই কাব্যের বিষয়। কিন্তু কোন কার্য সুন্দর ? ইহার মীমাংসা করিতে গেলে “সৌন্দর্য কি ?” তাহার মীমাংসা করিতে হয়। তাহার স্থান নাই—তাহার সময় এ নহে। তবে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কোন মহদ্ধর্মের সংগে যে কার্য কোন সম্বন্ধ

বিশিষ্ট তাহাই সুন্দর। কার্যটি নীতিসংগত না হইলেও হইতে পারে, তথাপি কোন সুপ্রবৃত্তি বা সুনীতির সংগে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। সুন্দর কার্যই সুনীতিসংগত। অতি ভীষণ কার্যও এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা যায় যে কেবলং ধর্মানুরোধেই পরশুরাম মাতৃহত্যা রূপ মহাপাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই মহাপাপও সুন্দর হইয়া উঠে।

কাব্য অনেক সময়েই স্বতঃ সুন্দর হয় না। অন্য কার্যের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর হয়। রাম কর্তৃক সীতা ত্যাগ স্বতঃ সুন্দর নহে, অনেক ইতর ব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া থাকে। কিন্তু রাম সীতার পূর্ব প্রণয়, রামের জন্য সীতা যে দুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যে কারণে রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সংগে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াই সীতাত্যাগ সুন্দর কার্য।—"সুন্দর" অর্থে "ভাল" নহে। অতি মন্দ কার্যও সুন্দর হইতে পারে। এই রামকৃত সীতাবর্জন ও পরশুরামকৃত মাতৃবধ ইহার উদাহরণ। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্যের সৌন্দর্য, তখন সে সৌন্দর্য ঐ সম্বন্ধের। আরও বিবেচনা করিতে হইবে যে কার্য পরম্পরার যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য। যেগুলি নিত্য সম্বন্ধ সেগুলি নিয়ম বলিয়া পরিচিত। ঐ নিয়মগুলিই নৈতিকতত্ত্ব। যদি কার্যের পরস্পর সম্বন্ধটি সৌন্দর্যের আধার হয়, তবে ঐ নৈতিকতত্ত্বগুলিও সৌন্দর্য বিশিষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক অনেকগুলি জটিল ও দুরূহ নৈতিকতত্ত্ব অনির্বচনীয় সৌন্দর্য পরিপূর্ণ—অপরিমিত মহিমাময়। প্রতিভাশালী কবির হৃদয়ে পরিস্ফুট হইলে তাহা কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিকতত্ত্বের ব্যাখ্যা তাহার উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য সৌন্দর্য; কিন্তু সৌন্দর্য নৈতিকতত্ত্বে নিহিত বলিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। মনুষ্যজীবন* সৌন্দর্যের উৎস—অতএব মনুষ্য জীবনই কাব্যের বিষয়। কোটিরূপধারী মনুষ্য-জীবন কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না—এই জন্য কাব্য

* কাব্যের নায়ক মনুষ্যকল্প দেবতা হইলেও এ কথার কোন ব্যত্যয় নাই।

মাত্রে মনুষ্য জীবনের এক একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয়। রামায়ণে রাজধর্ম, মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে ক্রোধ, এবং মিলটনে অপরাধ, রোমিও জুলিয়েটে যৌবন, মাকবেথে লোভ, শকুন্তলায় সরলতা, উত্তরচরিতে স্মৃতি—সকলগুলিই নৈতিক বা মানসিক তত্ত্ব। তদ-বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই।

হেমবাবু মনুষ্য জীবনের যে মূর্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহা পরম সুন্দর। বাহুবলের শাস্তা ধর্ম; ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অসহ্য; পুণ্যের সংগে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ। এ তত্ত্ব সৌন্দর্যে পরিপ্লুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে দেখ, আলোকসম্মুখী রত্নের ন্যায় ইহা জ্বলিতে থাকে। হেমবাবু এই তত্ত্বকে এতদূর প্রোজ্জ্বল করিয়াছেন, যে ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল; ত্রিভুবনজয়ী বৃত্রের আলয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া, ত্রিদেব—তিনমূর্তিতে পরমেশ্বর অদৃষ্ট খণ্ডিত করিলেন—অকালে বৃত্রের নিধন হইল।

বাহ্য বা মানসিক জগতে এমন কোন নিয়মই নাই, যে তাহা অবস্থা বিশেষ একাই কার্য করে। কি বাহ্যিক কি মানসিক নিয়ম অনুক্ষণ অন্য কোটি নিয়ম কর্তৃক বর্ধিত, সংযত, বিঘ্নিত, বিফলীকৃত, বিকৃত হইতেছে। অতএব একমাত্র নিয়মের অধীন যে কাব্যের কার্য তাহা মনুষ্যজীবনের অনুরূপ চিত্র নহে—অনুরূপ না হইলেই অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক হইলেই অসুন্দর। এ-কথা বৃত্রসংহারেও প্রমাণীকৃত। ধর্মের সংগে বাহুবলের যে সম্বন্ধ তাহা কাব্যের স্থূলচর্ম—মেরুদণ্ড। কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর কতকগুলি বিষয় আছে। প্রথম, দেশ-বাৎসল্য, দেবগণের স্বর্গোদ্ধারের ইচ্ছায় পরিণত, চিত্রিত এবং বিশুদ্ধিপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় তত্ত্বটি, আমরা লেডি মাক্‌বেথে দেখিয়াছিলাম —বৃত্রসংহারেও দেখিলাম লোকে যাহাকে সচরাচর বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী"—সেক্সপীয়রে তাহা লেডি মাক্‌বেথ—বৃত্রসংহারে তাহা ঐন্দ্রিলা। উভয়েই একটি অপরিবর্তনীয় সামাজিক শক্তির প্রতিমা। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী বটে, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য সচরাচর গৃহীত হয়

কি না সন্দেহ। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থূল নহে—পুরুষের বুদ্ধি দূরগামিনী কিন্তু স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অধিকতর সুতীক্ষ্ণা। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অমার্জিতা বা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রলয়ংকরী নহে; যে দেশে স্ত্রী পুরুষে উভয়ে তুল্য শিক্ষিত, উভয়ের বুদ্ধি যে সকল দেশে তুল্যরূপে মার্জিত, যে সকল দেশে মিসেস্ মিল, মাদাম রোলন্দ বা মাদাম দেস্তাল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সকল দেশেও স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী। লক্ষ্মী চঞ্চলা; সরস্বতী মুখরা; সতী আত্মঘাতিনী; রুদ্রাণী রণোন্মত্তা, বিবসনা। বাল্মীকির অপূর্ব সৌন্দর্য জগতে দোষমাত্র পরিশূন্যা সীতা, সুবর্ণমৃগের জন্য অধীরা। যিনি পরে রাবণের ঐশ্বর্য লোভ সম্বরণ করিলেন, অশোকবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন, তিনি একটি মৃগের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রলয়ংকরী বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। ঐন্দ্রিলা স্বর্গের সর্বেশ্বরী হইয়াও শচীকে অপমান করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের দয়া অল্প নহে, কিন্তু প্রতিযোগিনীর উপর স্ত্রীলোক যেরূপ নিষ্ঠুর, বন্য পশুও তাদৃশ নহে। এই সকল কথা হেমবাবু ঐন্দ্রিলাতে মূর্তিমতী করিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক। এই কাব্যে প্রথমত শক্তি, অচিন্ত্যনীয়, অপরিমেয় কিন্তু অনন্ত শক্তি নহে। দেবগণ ভুবনসংহারে সক্ষম, তথাপি বৃত্র ও বৃত্রপুত্রের বীর্যের অধীন। বৃত্র দেবগণকেও পীড়িত করিতে সক্ষম, তথাপি মরণাধীন। বৃত্রের শক্তি পুণ্যজাত, ঈশ্বর প্রেরিত—ঈশ্বরেরই শক্তি। ত্রিশূল তাহার রূপ, স্বর্গের আধিপত্য তাহার ফল। এই শক্তির তিন শত্রু। প্রথম শত্রু সর্বসংহর্তা কাল; ব্রহ্মার দিবস বৃত্রশক্তির জীবন; কালসহকারে সে শক্তি অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু কাল এখনও সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া বৃত্রশক্তির নিকট উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় শত্রু দেবতার স্বর্গ-বাৎসল্য; কিন্তু দেবতা ঈশ্বরপালিত, ঐশীশক্তির নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। তৃতীয় শত্রু অধর্ম; ধর্মরূপী ঈশ্বর; অধর্মের সহিত ঐশীশক্তি—শিবের ত্রিশূল—একত্রে থাকিতে পারে না। ঐন্দ্রিলার বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অধর্ম

প্রবেশ করিল, অমনি শিবশূল গগনপথে শ্বেতবাহু কর্তৃক অপহৃত হইল; ত্রিদেবশক্তি ইন্দ্রায়ুধে প্রবেশ করিল। অধর্মে অকালে বৃত্রশক্তি বিনষ্ট হইল।

বৃত্রসংহারের নায়কনায়িকা সকল অমানুষিক হওয়াতে ইহার ফল-সিদ্ধি আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার রংগভূমে বলই অধিনায়ক—ক্ষুদ্র মনুষ্যের বলের অপেক্ষা দেবাসুরের বল সে কল্পনা স্পষ্টতর করিয়াছে। কিন্তু কেবল অমানুষিক শক্তিই তাঁহার প্রয়োজনীয়। যে সকল তত্ত্ব কাব্যের বিষয় তাহা মানবচরিত্রে নিহিত; অতিমানুষ চরিত্রের বিষয় আমরা কিছু জানি না। এই জন্য যেখানে মনুষ্যপ্রণীত কাব্যে দেবগণের অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দেবগণ মনুষ্যকল্প; মানুষের ছাঁচে ঢালা। মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, প্যারাডাইজ লষ্টে, সর্বত্রই দেবগণ হৃদয়ে মনুষ্যোপম, মানুষিক রাগ দ্বেষ দয়া ধর্মে পরিপূর্ণ হেমবাবুর সুরী অসুরীগণ ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য। বাহ্যচিত্র মনুষ্য লোকাতীত, আভ্যন্তরিক চিত্র মানবানুকারী। তাঁহার সুরাসুরগণ অতিপ্রাকৃত শারীরিক শক্তিবিশিষ্ট মনুষ্য মাত্র।

সমুদায় নায়ক-নায়িকাগণের মধ্যে শচীর চরিত্রই মনুষ্য চরিত্র হইতে কিছু দূরতাপ্রাপ্ত—এইখানেই দৈব চরিত্রের অনির্বচনীয় জ্যোতি লক্ষিত হয়। আমরা পূর্বেই শচী চরিত্রের অনবনত এবং অনবনমনীয় মহিমা সমালোচিত করিয়াছি। শচী মানুষীর ন্যায় পুত্রবৎসলা—মানুষীর ন্যায় দুঃখবিদগ্ধা, স্মৃতিপীড়িতা—অবনীর কঠিন মাটী তাঁহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমিষারণ্যে তাঁহার মর্মদাহ করে—তথাপি শচী বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসংকুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে দৃঢ়-সংস্থাপিতা, ধৈর্যে এবং গাম্ভীর্যে মহামহিমাময়ী। সকল নায়ক নায়িকা-দিগের মধ্যে শচীর চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্রণীত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এরূপ উন্নত স্ত্রীচরিত্র কোথাও নাই—মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার সহিত ক্ষণমাত্র তুলনীয়া নহে। শচীর পার্শ্বে ইন্দুবালা দেবদারুতলায় নব মল্লিকার ন্যায়, সিংহীরই অংকলালিত হরিণশিশুর ন্যায় অনির্বচনীয় সুকুমার। শচীর পর, ইন্দুবালার চরিত্রই মনোহর।

বস্তুতঃ কাব্যমধ্যে নায়িকাদিগের চরিত্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় স্থল। শচী, ইন্দুবালা, ঐন্দ্রিলা এবং চপলা সকলেই সুচিত্রিত এবং সুরক্ষিত। নায়কদিগের মধ্যে কেবল রুদ্রপীড়ের চরিত্রই পরিস্ফুট; তাহাও অভিমন্যু ও হেক্টারের ছাঁচে ঢালা। বাঙালী কবিরা প্রায়ই স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুপটু; প্রমীলাই মেঘনাদবধের প্রধান গৌরব। বস্তুত বাঙালী লেখক যে স্ত্রীচরিত্রে অধিক নিপুণ, পুরুষ-চরিত্র প্রণয়নে তাদৃশ নিপুণ নহে, তাহার কারণ সহজে বুঝা যায়। বাঙলার স্ত্রীগণ রমণীকুলের গৌরব; বাঙলার পুরুষগণ পুরুষনামের কলংক। অন্য কোন দেশেই বাঙালী মহিলার চরিত্রের ন্যায় উন্নত স্ত্রীচরিত্র নাই—অন্য কোন দেশেই বাঙালি পুরুষের মত ঘৃণাস্পদ কাপুরুষ নাই। কবিগণ জন্মাবধি উন্নত স্ত্রীচরিত্র আদর্শ প্রত্যহ দেখিতে পান; জন্মাবধি প্রত্যহ কাপুরুষমণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন। যে সকল সংস্কার মাতৃদুগ্ধের সহিত পীত হয়, তাহা চেষ্টা করিলেও জয় করা যায় না। বাঙালী স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুনিপুণ, পুরুষচরিত্রে অনিপুণ কাজে কাজেই হইয়া পড়েন। তবে যখন বাঙালি পুরুষের দোষমালা গীত করিতে হইবে, তখন বাঙালী কবির পুরুষচিত্রে নৈপুণ্যের অভাব থাকে না; পুরুষ বানরের চিত্র প্রণয়নে বাঙালীর তুলি অভ্রান্ত, কেননা আদর্শের অভাব নাই। দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা টেকচাঁদঠাকুর প্রণীত পুরুষচরিত্র সকল অসাধারণ উজ্জ্বলতাপূর্ণ। বাবুরামবাবু, রামদাস, বা জলধরের চরিত্র আকাংক্ষার অতীত। বানরের সম্মুখে রাখিয়া সুনিপুণ ভাস্কর উত্তম বানরমূর্তি গড়িতে পারে, কিন্তু কখন দেবতা গড়িতে পারে না। দেব গড়িতে বানর হয়, তাহাতে তাঁহার দোষ নাই। জীবন্ত আদর্শের অভাবে, বিদেশী পুরাবৃত্তে তাঁহাকে খুঁজিতে হইয়াছে। রুদ্রপীড়ের সংগে ইন্দ্রের যুদ্ধ পড়িতে ইন্দ্রের চরিত্রে বেয়ার্ড বা অন্য ইউরোপীয় মাধ্যকালিক অশ্বারোহী বীরকে মনে পড়ে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে যে সকল দেশে

পুরুষচরিত্র বলবত্তর সে দেশের সাহিত্যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ-চরিত্র প্রবলতর হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় সাহিত্য এ কথায় সমর্থন করে। হোমর হইতে সদ্যঃপ্রসূত নবেল-খানি ইহার প্রমাণ। আমরা কেবল ইংরেজি সাহিত্যেরই বিশেষ উল্লেখ করিব, কেন না অন্য দেশের সাহিত্যের বিষয়ে কথা কহিবার বিশেষ অধিকারী নহি। ইংরেজি সাহিত্যের কথা পড়িলে আগে সেক্ষপীয়রের নাটক ও স্কটের উপন্যাসগুলি মনে পড়ে। এই দুই কাব্যশ্রেণীই প্রকৃত চিত্রাগার—আর সকলই ইহার কাছে সামান্য। স্কটের উপন্যাসে পুরুষচরিত্র প্রবল—স্কট যে স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়নে সুদক্ষ তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রণীত চরিত্রগুলি স্ত্রী পুরুষে বিভাগ করিলে দেখা যাইবে কোন দিক ভারী। এক রেবেকা পঁচিশখানা কাব্য আলো করিতে পারে না। সেক্ষপীয়রের কথা স্বতন্ত্র; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম। তাঁহার তুল্য সর্বজ্ঞতা মনুষ্য দেহে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার লেখনীর কাছে স্ত্রী পুরুষ তুল্য হওয়াই সম্ভব। বাস্তবিক তাদৃশ তুল্যতা আর কোথাও নাই। তথাপি তাঁহারই স্বদেশী কবি কর্তৃক কথিত হইয়াছে—"Stronger Shakespeare felt for man alone."

(বংগদর্শন, ১২৮৪)

রংগমতী কাব্য

বংগভাষায় উৎসর্গ পত্র কেহ সমালোচনা করেন না,—কেননা সচরাচর তাহা সমালোচনার যোগ্য নহে। সমালোচ্য "রংগমতী কাব্যে"র উৎসর্গ পত্র বাস্তবিক সমালোচনার যোগ্য। বাঙালীর কাব্যরসজ্ঞতার উপর অনেকের এমনই অটল ভক্তি যে, তাঁহারা অনায়াসে স্থির করিতে যান যে, "বাঙালী কবি কেন ?" মনে হইতেছে, সেদিন একজন লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "বাঙালী কবি নয় কেন ?" কোন কথা ঠিক একেবারে বলিয়া উঠা বড় সহজ নহে; অথচ, বাঙালীকে অরসিক বলিতে প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে! সে হউক, যে বৈচিত্র্য কবিপ্রতিভা বিকাশের প্রধান উপকরণ, বংগসমাজে তাহা বড় নাই। এই চিরস্থিতিশীল সমাজে বৈচিত্র্য হাসির কথা, স্বানুবর্তিতা পাগলামী। সুতরাং চিন্তাশীল স্বীকার করিবেন যে, বংগসমাজ কাব্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে। বংগের সমতল ক্ষেত্রে মলয়ানিল যেমন অব্যাহতগতিতে বহিতে পায়, সমাজক্ষেত্রে কাব্য-সমীরণ তেমন সৌভাগ্যশালী নহে।

তবে বংগভূমিতে মহাকাব্য সকল জন্মিল কিরূপে ? ইহার উত্তর সহজ। যখনই এই চিরস্থিতিশীল সমাজের অটুট বন্ধনীগুলি কাল-প্রভাবে এক একবার শিথিল হইয়াছে, অমনি বংগে কাব্য জন্মিয়াছে। বৈদেশিক ভাবপ্রভাব যখন বহিয়াছে, তখনই কাব্য দেখা দিয়াছে—কেননা তখন সমাজ বৈচিত্র্যের মহিমা বুঝিয়াছে। স্বীকার করি, সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই সকল দেশে কাব্য জন্মে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, স্থিতিশীলতায় বংগসমাজের তুলনা নাই। নদী-মুখনীত কর্দমরাশিতে কতিপয় সহস্র বর্ষ মধ্যে বংগভূমি গঠিত না হউক, কিন্তু স্থিতিশীল আর্যজাতির শেষ লীলাস্থলী এই বংগভূমি। তাই সমাজবন্ধন এত কঠোর। কেন না, নিভিবার আগে প্রদীপ উজ্জ্বলতর হয়! সমাজবন্ধন এত কঠোর বলিয়াই, শিথিলাবস্থায়

ইহার কার্যক্ষেত্র এত প্রশস্ত হইয়া উঠে। যেখানে ঘাতের বেগ প্রবল, প্রতিঘাতের বেগ সেখানে অসহ্য।

বাঙলায় "রংগমতী"র কবি, উৎসর্গ পত্রে স্বীয় জীবনের বৈচিত্র্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অন্য দেশে সে কাব্য সমালোচকের। ইহাতেই প্রভেদ বুঝা যায়। কবির প্রতি আমাদের ভক্তি কেমন, তাহা জানিতে তত কষ্ট পাইতে হয় না। সাধারণত বাঙালী সমালোচক যদি বংগকবিজীবনের বৈচিত্র্য বুঝিতেন, তবে আর বাঙালী কবিকে নিজের কথা বলিতে হইত না।

ছয়সর্গে "রংগমতী" কাব্য শেষ হইয়াছে। প্রথম সর্গে, কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্রের নৌকাযাত্রা এবং দারুণ ঝটিকায় তাঁহার নিমজ্জন বর্ণিত হইয়াছে। সর্গারম্ভে নিদাঘের ছবিটী কমনীয় বটে। আর বাংলাভাষায় "চন্দ্রকলার গীত" এক নূতন জিনিস। তাহা ছাড়া এ সর্গে সুখ্যাতির যোগ্য আর কিছু নাই।

দ্বিতীয় সর্গে—"কানন কালীর শ্বেতপ্রস্তর মন্দিরে"· সুষুপ্ত যুবা বীরেন্দ্র। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তপস্বিনী। সুষুপ্ত বীরেন্দ্রের নিদ্রায় শান্তি নাই—

নিদ্রার সাগরে
* * * বহিতেছে কুস্বপ্নঝটিকা।

তপস্বিনীর "বৎস বীরেন্দ্র !" সম্বোধন শুনিয়া যুবার নিদ্রাভংগ হইল। তখন তিনি আপন স্বপ্নবৃত্তান্তছলে জীবনের পূর্বকাহিনী বিবৃত করিলেন।

এই দীর্ঘ বিবৃতি বড় অস্বাভাবিক হইয়াছে। কবির মনোহর কবিত্বগুণে ইহা পড়িতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু ইহা সুরুচিকর নহে। এই সর্গে মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবাজীর একটী বড় সুন্দর ছবি আছে। এই ছবি পূর্ণ এবং ভাস্বর। ইতিহাসে শিবাজীর সেই সকল অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী পড়িয়া পাঠকের মনে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি জন্মে, কবি নবীনচন্দ্রের এই স্বল্পাক্ষরগ্রথিত, ক্ষুদ্র চিত্রে তাহার শতগুণ ফল হয়। এই দেখুন,—

"সগর্বে ফিরায়ে পুনঃ প্রদীপ্ত বদন,
ললাটে ধমনীত্রয় স্ফীত, আরক্তিম,—
বালার্ক কিরণ রেখা, হায় রে যেমনি
উদয় গগনে ঝলে মিদাঘ প্রভাতে।
কুঞ্চিত অধরে পুনঃ বলিতে লাগিলা!
'দস্যু আমি! আমি দস্যু মহারাষ্ট্রকুলে!'
ঘোর অট্টহাসি বীর উঠিল হাসিয়া।
হাসিয়া? হাসি ত নহে! ভৈরব গর্জনে
আগ্নেয় ভূধর রুদ্ধ হুতাশন-রাশি
হইল নির্গত যেন!—ভয়ংকর হাসি!"

এই চিত্র বড় সুন্দর, বড় উদ্দীপক বটে, কিন্তু ইহা যথাস্থানে নিবেশিত হয় নাই। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শেষ করিয়া জীবন বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলে নির্জ্জনবাসিনী তপস্বিনীর একদিন ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অসহ্য। সেই উপন্যাস প্রবাহে শিবজীর এই দৃপ্ত চিত্র ভাসিয়া গিয়াছে;—কবির উদ্দীপনাগুণে ও ইহার ফল স্থায়ী হয় নাই। শিবজীর উপর বড় অবিচার করা হইয়াছে। এই মহাচিত্রের গৌরবানুরোধে কবি পুনা দুর্গের চিত্র, কাব্যের প্রথম সর্গে যথাযথ দিলে ভাল করিতেন। সেইখানে আমরা নয়ন ভরিয়া মহারাষ্ট্র দুর্গে শেষ হিন্দুকুলতিলক শিবজীর অনন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতাম। তাহা হইলে আর পিতামহীর গল্পমধ্যে, নিমজ্জনশ্রান্ত ক্ষীণকণ্ঠ বীরেন্দ্রের মুখে শুনিতে হইত না—

"প্রীতি দৃষ্টি মম পানে করি কিছুক্ষণ,
ত্যজিয়া পর্যঙ্কাসন, বীরেন্দ্র কেশরী
ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে, অবনত মুখে
অন্য মনে, সন্ধ্যালোকে, শিবির বাহিরে।"

অথচ কাব্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। এই কাব্যের যাহা কেন্দ্র, তাহা বুঝি, তাহা হইলে আরও স্পষ্টীকৃত হইত।

তৃতীয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়, চন্দ্রশেখরের অদ্ভুত নৈসর্গিক

শোভা! এই কাব্যের প্রধান আকর্ষণ নিসর্গ বর্ণনা। কাব্যের যে কোন সর্গে ইহার প্রাচুর্য আছে। চিরসমতলবাসী বংগ কবিকুলের সৃষ্টি সাহিত্যসংসারে 'রংগমতি কাব্য' নূতন জিনিস। নিসর্গের অনন্ত ভাব এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে আর কোন বাংগালি কবি চিত্রিত করিতে পারেন নাই। এবং নবীন বাবু ভিন্ন আর কোন বাংগালি কবি সে দৃশ্যের প্রতি বিচার করিতে পারেন কিনা, জানি না।

এই সর্গে একটী বানরের চিত্র আছে। সে চিত্র পূর্ণ এবং আকাংক্ষার অতীত। সাধারণত বাংগালী কবি শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসেন। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া বানর গড়িতে বসিলে কুশলী বাংগালী কবির চিত্র যে অভ্রান্ত হইবে, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। জলধর এধং বিদ্যাদিগ্‌গজ বাংগালীর মৌলিক চিত্র। আর সেদিন রামদাস কল্পতরু মূলে দেখা দিয়াছেন। আজ আবার "ঢেঁকি পঞ্চানন" আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন।

'দোহাই তোমার বাবা! যাহা আছে সব
দিতেছি বলিয়া—এক গুণ দুগ্ধ তাহে
দধি দুই গুণ—তিন গুণ লুচি আর
মণ্ডা চতুর্গুণ। ক্ষুদ্র উদর-সাগরে
দধি, দুগ্ধ অম্বুরাশি, লুচি মণ্ডাচয়।
ভীষণ ঝটিকা তাহে,—অর্থের পিপাসা!"

চতুর্থ সর্গে "রংগমতী বনে"র ছবি। সে বড় সুন্দর! উচ্চতম শৃংগে বসিয়া প্রভাতে বীরেন্দ্র চিন্তামগ্ন! সেইখানে বসিয়া তিনি শৈশবের কথা ভাবিতেছিলেন। শৈশবের, কৈশোরের সরল মুখ, সরল প্রীতির সহিত যৌবনের কুটিল ভাবের তুলনা করিতেছিলেন। শৈশবের যে চিরসংগিনী,—শূন্যহৃদয়া বালিকা,—যৌবনের যে সুখস্বপ্ন তাহার কথা—সেই কুসুমের কথা—তিনি একমনে ভাবিতেছিলেন। এই বলে বালিকা কুসুমের সংগে কেমন খেলা করিতেন, কেমন স্নেহের বিবাদ করিতেন, সে সব কথা মনে পড়িয়া তাঁহার স্মৃতিসাগর মথিত হইতেছিল! যে সকল কবিতায় এই দৃশ্য বাংগালা কাব্যে আর একবার দেখিয়াছিলাম।

বীরেন্দ্র কুসুমকে দেখিয়া, প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যকালের প্রণয়টা মনে পড়িয়া যায়।

বীরেন্দ্রের সুখের চিন্তা থামিয়া গেল—কেন না তিনি দূরে শিকারীর বীরগান শুনিতে পাইলেন। এই শিকারীর গানের প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। সাহিত্য সংসারে প্রধানত গীতি কবিতার জন্যই নবীন বাবুর প্রতিষ্ঠা। তাঁহার "অবকাশ রঞ্জিনী"র পীযূষময়ী গীতি কবিতানিচয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে"র গীতি কবিতায় মুগ্ধ হইয়া বাংগালার সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে, গীতি কবিতায় তিনি মন্ত্রসিদ্ধ। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে 'রংগমতী কাব্যে' তিনি সে যশ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। বরং গাম্ভীর্য ও নৈপুণ্যে এ সম্বন্ধে তিনি সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

সর্গ শেষে দস্যু বেঞ্জামিনের সঙ্গে বীরেন্দ্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের "Lady of the Lake" মনে পড়িয়া গেল। রডরিকের (Roderick) সংগে ফিজ্জেম্‌সের (Fitz-James) ঠিক এইরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। "রংগমতী"র ধরণ অনেকটা "Lady of the Lake"-এর মত। যে সময় গীতি শুনিতে শুনিতে Roderick প্রাণত্যাগ করিয়াছিল "রংগমতী কাব্যে" তপস্বিনীর কাছে কাছে পুরোহিতের বিজয় গীতি তাহারই স্থলাভিষিক্ত। তবে বোধ হয় যে, উদ্দীপনায় নবীন বাবুর কবিতার সার্থকতা অধিকতর।

পঞ্চম সর্গের প্রভাতে "রংগমতী দেবী মন্দিরে" জীবন্ত বিষাদের গীতি!—শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। নবীন বাবুর গীতিকাব্য কুশলতার আমরা বিস্তর প্রশংসা করিয়াছি—পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চম সর্গের আকর্ষণ বলিতে গেলে দুইটী গীতিই কুসুমিকার বিষাদ-গীতি আর তপস্বিনীর কাছে কাননকালীর পুরোহিতের সমরগীতি। সে কথা পূর্বেও একবার বলিয়াছি।

ষষ্ঠ সর্গের কবিতার অধিকাংশ বড় ভাবোদ্দীপক বিশেষ অশোকমূলে একাকিনী বসিয়া, জুমিয়া রমণী বিচিত্র বাস বুনিতে বুনিতে, বিষাদে,

যে বিরহ গীতি গাহিতেছে, তাহা শুনিয়া তৃপ্তি মিটে না।—সে গীতির আমূল উদ্ধৃত করিতে সাধ করে!—একটু শুনুন,

"যে দেশে রয়েছ তুমি, নাহি কি আকাশ ভূমি
সে দেশে সলিল নাহি, নাহি রবি শশী?
আকাশে নীলিমা নাই ভূমে বৃক্ষলতা নাই,
সলিলে তরল শোভা, নিশি কণ্ঠে শশী?
"দিনে দিবাকর নাই? প্রদোষ, প্রভাত নাই?
নরের হৃদয় নাই, হৃদয়েতে স্মৃতি?
থাকিলে, এ দুঃখিনীরে ভাসায়ে বিস্মৃতি-নীরে
কেমনে রয়েছ ছাড়ি আশ্রিতা ব্রততী?
"যখন যেদিকে চাই, কেবল দেখিতে পাই
অংকিত তোমার মুখ,—শূন্য, ধরাতল!
ঝর ঝর নিরঝরে নিত্য প্রেম গীত ঝরে,
অনন্ত প্রেমের কাব্য গগন, ভূতল!"

নবীন বাবুর বিশ্লেষণ শক্তি "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। "রংগমতী কাব্যে" তাঁহার আশ্লেষণ শক্তি স্ফুটতালাভ না করুক, দেখা দিয়াছে। "রংগমতীর" অধিকাংশ চিত্র ফোট ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তবে ফুটাইবার উদ্যম আছে বটে। বীরেন্দ্র চরিত্রে তিনি কয়টি রেখাপাত করিয়াছেন;—তাহারা তাঁহার বিকাশোন্মুখ আশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার বীরেন্দ্র আশার যেন অবতার! তিনি রংগমতীর সুন্দর কানন দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন—

"একটি রাজ্যের উপকরণ সুন্দর রয়েছে পড়িয়া!"

"পলাশীর যুদ্ধে" নবীন বাবুর যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন; তাঁহার কবিতা গৈরিকনিস্রববৎ তীব্র উদ্দীপনা উদ্গীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্মভেদী রোদন "রংগমতী"র অস্থি পঞ্জর! প্রভেদ এই "পলাশীর যুদ্ধ" কেবলমাত্র সুপদ্যের সমষ্টি! তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। "রংগমতী কাব্যে"র কেন্দ্র আছে, বীজ আছে, সুতরাং কবি, কাব্যসোপানে আর একপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (বংগদর্শন, ১২৮৮)

মেঘনাদ বধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা

(শ্রীশচন্দ্র মজুমদার)

হিন্দুসন্তানমাত্রই .রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ত্ব তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প, জগতে অতুলনীয়া, দোষমাত্রাপরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীরপুরুষের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব ;—সংক্ষেপত রামায়ণের সেই স্বর্গীয়ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দু সন্তান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সংগে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধকিরীটিনী" লংকা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লংকার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে চেড়ীদলবেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ! অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদ বধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, মেঘনাদে তাহা পড়িতেছি। মেঘনাদে"র রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না ;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলংকার" লংকার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in "মেঘনাদ" is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ এ দেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে "মেঘনাদ বধ" কাব্যে কবির মনের টান.রাক্ষসদের প্রতি। বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দু. সন্তানের

চিরাচরিত সংস্কার-স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাতত ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই "মেঘনাদ বধ" কাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুত গ্রহ, মিল্টনের সেই সয়তানতুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ্য অনন্ত গাম্ভীর্যময় বটে, কিন্তু যেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদ-বধের" রাবণ? কতকটা ভক্তি প্রীতির আধার! তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতু নিগড়বদ্ধ চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যংগের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলংঘ্য, অজেয়
তুমি? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর?"

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাংগদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"হায় নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!"

তখন "মহামন্ত্র বলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন!—যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই নিদান মাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদ বধে"র রাবণ কতকটা ভক্তি ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসংবাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষ চর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

"দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল ছায়া"

তখন মর্মপীড়িত লংকেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তি গদগদস্বরে বলিয়াছিলেন,—শুনিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না,—বলিয়াছিলেন,

"এত দিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার ? এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব হে সর্বজ্ঞ ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে !"

ফলত "মেঘনাদ বধ কাব্যে"র রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না। "মেঘনাদে"র রাবণ,—যেমন মানুষ অনেক শোক পাইয়া স্থৈর্যলাভ করিয়াছে ;—দুর্বৃত্ত যুবক যেন কত ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানব চরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য! আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান, পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, একথা মনে করিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কোমল "কোমল সে ফুলসম" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না।

আমরা যাহা বুঝাইতে চাই, তাহাতে রাবণ চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্য মধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া একবার তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গের ধাত্রীর মুখে লংকার বিপদবার্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন ;—ক্রোধে সে কুসুমদাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন—

"ধিক মোরে।
হা ধিক মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলংকা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ আপদ, বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর। তাঁহার বীরভাব যেমন সংগত, তেমনি সরল! এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত মনে, প্রমোদ—উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদ-নিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদ-বার্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণ জ্ঞান করেন! সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

"হে রক্ষঃকুল পতি
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব! এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম-বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎতরংগের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই দেখুন—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলংক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি; দুইবার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে! পুত্রবৎসলা মন্দোদরী

কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন। বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জন করিলেন। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকন্দরসাকে কখন মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে।—বলিলেন,

"কি সুখ ভুঞ্জিব
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রাম!
আক্রমিলে হুতাসন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেব দৈত্য নরত্রাস
ত্রিভুবনে দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে
যাইব সমরে মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন কূজনিছে বিহংগম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্ধর্ষ রাক্ষস দলে পশিব সমরে
আপন মন্দিরে দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদরাজীবযুগল, সমরবিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃআজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি!
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে।"

এ বীরত্ব, এই পিতৃ-মাতৃভক্তি পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নীবাৎসল্য প্রেমের আদর্শস্থল। তাহার মাধুর্য ও গাম্ভীর্যে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। উষাসমাগম কুঞ্জবনগীতে, কুমারের নিদ্রাভংগ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।—

প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, কমললোচন !
উঠ চিরানন্দ মোর ! সূর্যকান্তমণি
সম এ পরাণকান্তে ; তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার ! নয়নতারা ! মহার্হ রতন।
উঠ দেখ শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম !"

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভংগ হইয়াছে—

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির শর্বরী ;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি কমলিনী,
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয় !"

প্রমীলাকে রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সংগে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন ! তবু প্রমীলা আর একবার স্বামীকে নির্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেঘনাদ "ধীরে ধীরে" "কুসুম বিস্তৃত পথে যজ্ঞশালামুখে" যাইতেছিলেন ! "ধীরে ধীরে", কেন না তখন প্রমীলার চারুমূর্তি হৃদয়ে তাঁহার জাগিতেছিল। এমন সময়ে,

"সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিয়া পশ্চাতে
চির-পরিচিতময়ী, প্রণয়ীর কানে
প্রণয়িনী-পদশব্দ ! হাসিলা বীরেন্দ্র,

স্থখে বাহুপাশে বাঁধি ইন্দিবরাননা
প্রমীলারে।”

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন। দেব বৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময় লক্ষ্মণ মায়াবলে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের!—কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

“সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলা।”

আবার যখন মূর্তিমান্ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিমশয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহবিচ্যুত হইতে বড় দেরি নাই, তখন তাঁহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল! নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল ইহাই তাহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়শাসনে সন্দেহ জন্মিল না।

“দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?”

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অপূর্বদৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদ চরিত্রের পূর্ণতা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙালীর হৃদয়ে অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু স্থন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র স্বষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য লইয়াই কাব্য,—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্যময়! সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানব হৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমানমাত্র সহায় করিয়া অসহায় নির্ভীক ইন্দ্রজিৎ আত্মচরিত্রের সর্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না;—তাঁহাদের কার্য কাপুরুষের ন্যায়

বলিয়া বোধ হয়! সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়;—মেঘনাদের বীরদর্প; সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য!

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়।—মনে হয় জন্মদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তরে আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে? অন্যায় মৃত্যু? সে আবার কি! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা ত মনেই হয় না! সে অন্যায় বোধ, সে দুঃখে সহানুভূতি কেবল 'মেঘনাদবধ' পাঠকালেই হয়! ইহার অর্থ কি?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিষবৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্বগুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন?

"প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা মাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লংকাপুরে
স্বর্ণলংকা-অলংকার!"

তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা; কিন্তু ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কার-স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সংকীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণত সংকীর্ণ হইয়া পড়ে কাব্যের ন্যায়পরতা বা Poetical Justice এইরূপ সংকীর্ণতার ফল। উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে

যে, যে সকল নিয়মে জড় জগৎ শাসিত, নিয়মিত, সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহাদেরই অনুবর্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি আজি জানি না, ঠিক করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চির-প্রচলিত কিংবদন্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথা মাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহার-কণা, যে শস্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন; অনন্ত শূন্যে অনন্ত পরিমিত অনন্ত সৌরজগৎমণ্ডলী তেমনই নিয়মের অধীন।—সর্বত্র নিয়ম! তুমি কবি;—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রু বিসর্জন কর; তোমার মনে হয় এ খড় অবিচার। অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। জড় জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহার শক্তিবিশেষ যখন আপন প্রভাব বিস্তার করে, তখন ইহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না। দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তি-চক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে; ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতত্ত্ব কীর্তন করে, "মেঘনাদ বধ" কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব! সৌন্দর্যসার মেঘনাদ দেবদুর্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য! সর্বজ্ঞ কবির অপূর্ব, অতুল্য, মোহময় সৃষ্টি! সত্য বটে।—কিন্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এ জগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য! এ সত্যের ব্যভিচার নাই।

বলিয়াছি ত যে জড় জগৎ বল, অন্তর্জগৎ বল; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মূর্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড় শক্তি; আর যে

অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি রুশিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তঃশক্তি!—শক্তি এক, তবে মূর্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন!—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সান্ত্বনার কথা এই যে অন্তর্জগতের শক্তি বিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড় শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কি না, আজও মনুষ্যজ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত! সাধ্য পক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তি প্রয়োগের কারণ হইও না! তোমার কার্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুঝিয়া দেখ কথা এক। সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ 'মেঘনাদ কাব্য' অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র জ্ঞানময় কবি প্রমীলাচরিত্রে কয়েকটি গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃ সুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রী পুরুষের সাম্য কখন ছিল কিনা ঠিক্ বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্য ধর্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রী জাতি লইয়া! কাব্য দেখ স্ত্রী জাতির প্রধান ধর্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য! পবিত্রতা ইহসংসারে সকল সুখের আকর;—কিন্তু বিধিটা একতরফা করায় ইহার শুভকারিতা অনেক কমিয়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই; তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরংগ

খেলে, বিষাদ,—কেন না তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্মের পরিণতিতে সামাজিক মংগল নাই, তাহা ঠিক ধর্ম নহে। ফলনিরপেক্ষ ধর্মাধর্ম সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রী পুরুষ সমবায়ে নির্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরববিধ্বংসকর!

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণীচরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্যসমাজে দুই তিনবার সে চেষ্টা হইয়াছে;—তবে ফল বড় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্যকারিতা সমাজ গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদীচরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখরবুদ্ধিশালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী, জ্যোর্তিময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্মিনী! সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর একবার সে যত্ন হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। তন্ত্রপ্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্বেসর্বা, স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অসভ্য বা অর্ধসভ্য যে সে আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে চায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণকুলের চিরোর্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিনকতক স্ত্রীচরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিনী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদি-বিলাসিনী কালিকার মূর্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতংক উপস্থিত হয়। যাহা অনন্তশক্তি দেবে পারিল না বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়

পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখনও বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখনও নহে। ওডিনের (Odin) উপবর্গ অসভ্য ইউরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বংগভূমে তন্ত্রশাস্ত্র, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

'মেঘনাদবধ কাব্য' যখন লিখিত হয় তখন বংগসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাংগালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ক্রীড়াসংকুচিতা বংগনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন।

"অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে আমরা;
নাই কি বল এ ভুজ মৃণালে ?"

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্য সংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে! প্রথমে বুঝি আরো মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—আর আমাদের মধুসূদন "প্রমীলা" চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলাচরিত্রের আর একটী ভংগী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;—প্রমীলাচরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষসদম্পতীর অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহেন, একথাটী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

(বংগদর্শন, ১২৮৮)

রামবসুর বিরহ

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

রামবসুর বিরহসংগীত বংগদেশের সর্বত্র খ্যাত। জানা শুনা লোকের মধ্যে বিরহ সংগীতেও কথা উঠিলেই রামবসুর নাম হয়। রামবসুর নাম এ প্রকার প্রসিদ্ধ হইবার উপযুক্ত ও বটে। রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার (কেষ্টা মুচি), লালু নন্দলাল, নীলমনি পুটুনি, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, সাতু রায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবিওয়ালাদিগের যত সংগীত আমরা অবগত আছি, তন্মধ্যে রাম বসুর গানই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ইহাঁর গানের ভাব যেমন স্বাভাবিক, সময়োপযোগী এবং সুন্দর, শব্দবিন্যাসও তেমন প্রাঞ্জল, সুকৌশলসম্পন্ন, সুতরাং পরিপাটী ও মনোহর। কিন্তু দুঃখের বিষয়—লজ্জার বিষয় ও বটে—দুঃখের বিষয় এই যে, রাম বসুর নাম যত লোকে জানে, তাহার পনর আনা লোকই বোধহয়, রামবসুর একটী গানও কখন কর্ণে শুনে নাই বা চক্ষে দেখে নাই। দুই চারিজন বোধহয় দুই একটা গানের দুই চারি ছত্র অবগত আছেন। এই সকল লোকের মুখে রামবসুর যে প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীনদিগের প্রশংসার প্রতিধ্বনি মাত্র।

রামবসু যে কেবল বিরহসংগীতই রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার রচিত আগমনী এবং সখীসংবাদ ও অনেক আছে। কিন্তু বিরহের জন্যই ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক ও ইহাঁর বিরহসংগীত-গুলি যেমন মনোহর, অন্যবিধ গান তেমন নহে। এই স্থলে ইহাও বলিতে হয় যে, বিরহসংগীতেরও সকলগুলি সমান নহে। দুই একটা এমনও আছে যে, তাহা রামবসুর রচিত বলিতে দুঃখ বোধ হয়, লজ্জা করে। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, আকাশের সকল নক্ষত্রই কিছু শুকতারা নহে, কাননের সকল কুসুমই কিছু কানন আলো করে না,

সারভান্টিসের সকল গ্রন্থই কিছু 'ডন কুইক্সোট' নহে, সেক্সপীয়রের ও সকল নাটক কিছু হ্যামলেট্, ওথেলো নহে।

রামবসুর গানের ভাব ও শব্দবিন্যাস-কৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করিয়াছি। মোটামুটি এরূপ প্রশংসা করা যায়। কিন্তু আঁটা আঁটি করিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইহাঁর ভাব পারিপাট্য অপেক্ষা রচনাচাতুর্য অধিকতর জাজ্জ্বল্যমান,—ভাবুকতা অপেক্ষা মুন্সীগিরি অধিক—কথার বাঁধুনি, কথার গাঁথনি যেমন, ভাবের মনোহারিতা, ভাবের চমৎকারিতা তদ্রূপ নহে। সুতরাং ইহাঁর বিরহিনীদিগের বিরহসংগীত শুনিয়া 'বাহবা' দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু 'আহা' কথাটা মুখে আসে না।

রামবসুর বিরহসংগীতে যেরূপ বিরহের বর্ণনা, তাহাকে আমরা বিরহ না বলিলেও বলিতে পারি। এ বিরহ, না প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের বিরহ, না অধুনাতন নাটকোপন্যাস লেখকদিগের বিরহ। ইহাতে ব্যাকুলতা নাই, আত্মবিস্মৃতি নাই, স্মৃতিদংশন নাই, মর্মদাহ নাই, তন্ময়ও নাই। ইহাতে হাহাকার নাই, চক্ষের জল নাই, ভূপতন নাই, মূর্ছা নাই, মৃত্যু নাই। আছে কেবল প্রগল্‌ভার বাক্‌চাতুরী। তীব্র ব্যংগ অগ্নিময় শ্লেষ ইহার প্রাণ। ইহার নায়িকারা—নায়কের উক্তি বিরহ বড় বিরল—বিরহপীড়িতা হইয়া উষ্ণনিশ্বাসে এবং উষ্ণতল অশ্রুপাতে প্রেমতর্পণ করেন না; নায়কের দেখা পাইলে বাক্যবিষে তাঁহাকে দগ্ধ করেন। যখন বিরস মলিন মুখে আপনার হৃদ্‌গত দুঃখের কথা ব্যক্ত করেন, তখনও যেন নয়নপ্রান্তে শ্লেষপরায়ণার ঈষৎ তীব্র হাসি, আকাশপ্রান্তে ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় খেলিতে থাকে,—বিদ্যুতের ন্যায়, সে ক্ষীণ হাসির ও দাহিকা শক্তি আছে। যখন বহুদিনের অদর্শনের পর দৈবযোগে বাঞ্ছিতের দেখা পাইয়া প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য মিনতি করিয়া থাকেন;—

"দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ,
হলো এ পথে আগমন।

কও কথা, একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন ॥”

তখনও সংগে সংগে শ্লেষ—

“পিরীত ভেংগেছে তার লজ্জা কি,
এমন তো প্রেমভাংগাভাংগি অনেকের দেখি।”

আমরা বলি ইহার অপেক্ষা দু ঘা মারা বরং ভাল।

এই সকল বিরহসংগীতে যে প্রকার প্রেম পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা প্রেমের আদর্শ নহে, কেন না তাহা পবিত্র নহে। ইহার অধিকাংশ নায়িকাই পরকীয়া নায়িকা, সুতরাং ইহাদিগের প্রেম আত্মবিসর্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসকলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র। যে দুই একটি গানের নায়িকা পরকীয়া নহেন, তাঁহাদেরও তাই। ইহাদের যত জ্বালা, কেবল যৌবনজনিত, বসন্তজনিত, স্মরশরজনিত। ইঁহাদের দুঃখ—

“যৌবন রসের ভার অতি ভার,
নারী নারি আর বহিতে।”

ইঁহাদের দুঃখ—

“যৌবন জনমের মত যায়;
সে তো আশাপথ নাহি চায়।”

ইঁহাদের অনুযোগ—

“একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল ॥”

তাই বলিতেছিলাম, যে ইহা প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে। সে প্রেম আত্মনিগ্রহরত, আত্মবিস্মৃত, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেমে মনুষ্য আত্মসুখদুঃখ ভুলিয়া যায়, জগৎ সংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম প্রলোভনে পরীক্ষিত, দুঃখে দৃঢ়ীকৃত, অদর্শনে অবিচলিত, অনাদরে অক্ষুণ্ণ এবং কালস্রোতে অপরিশ্রান্ত, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেম আত্মায়

আত্মায়, হৃদয়ে হৃদয়ে, যে প্রেমের সৌরভ বৈকুণ্ঠধাম পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যে প্রেমে মানুষকে দেবতা করে, ইহা সে প্রেম নহে। যে প্রেমে "গুরুজনা গঞ্জনা" দেয়, প্রতিবাসী প্রতিবাদী হয়, লোকে ছি ছি করে, ইহা সেই প্রেম। যাহাতে কলংক আছে, লুকোচুরি আছে, অনুতাপ আছে, অধর্ম আছে, ইহা সেই প্রেম। ইন্দ্রিয় লালসাতেই যাহার উৎপত্তি, এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতেই যাহার পরিসমাপ্তি, ইহা সেই প্রেম—কেবল রক্তমাংসের প্রেম।

কাজেই প্রেম অতি সামান্য। ইহার দায়ে নায়িকা কখন আত্ম-বিস্মৃত হয়েন না। যখন বড় দুঃখে কাতর, তখনও আপন ক্ষতিলাভ গণনায় রত, ক্ষতিলাভ গণনায় অভ্রান্ত। যখন প্রণয় পাত্র প্রবাসে যাইতেছেন, তখনও লোকের কথার ভয়ে তাঁহাকে মর্মকথা বলা হইতেছে না—

"যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।"

ভোগলালসা কলুষিত বলিয়া এ প্রণয় বড় স্বার্থপর। আপন সুখসম্ভোগের জন্য প্রণয়পাত্রের প্রাণে কষ্ট দিতেও কুণ্ঠিত নহে। তাহার মনোবেদনাতেই যদি বাসনাসিদ্ধির উপায় হয়, তবে তাহাতেও রাজি। নায়িকা বিরহ-সন্তপ্তা হইয়া বিচ্ছেদকে উদ্দেশ করিয়া গাইতেছে—

"যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার।
যাতে বদ্ধ আছে বঁধুর প্রাণ,
হান গে তায় বিচ্ছেদ বাণ;
যদি জ্বালায় জ্বলে আমায় ব'লে মনে পড়ে তার।"

আবার—

"বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা কিছু তায় দিও বিশেষে।
নারীর প্রাণে কত ব্যথা জানে যেন সে।"

ইহা প্রকৃত ভালবাসার ভাষা নহে। যথার্থ প্রেমানুরাগ যাহার মনে আছে, সে প্রাণান্তেও এমন কামনা করিতে পারে না। প্রকৃত

প্রেম, প্রণয়পাত্রের অতি সামান্য ক্লেশ নিবারণের জন্যও আপনার বুক চিরিয়া বুকের রক্ত দিতে অগ্রসর হইবে, বাঞ্ছিতকে সুখী করিবার জন্য আপন হাতে আপনার হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া দিতে প্রস্তুত থাকিবে. তাহা কখন আপনার কষ্ট নিবারণের জন্য প্রীতিপাত্রের মনে 'বিশেষ ব্যথা' দিতে চাহিবে না। এই বিরহিনী প্রকৃত প্রেমশালিনী হইলে গাইতেন—

আমার মনোবেদনা কভু শুনা'ওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ, সে পাছে বেদনা পায়।
না বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল,
শুনিয়া তার মংগল তবু ত প্রাণ জুড়ায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রকার উচ্চ প্রেমের ভাব রাম-বসুর বিরহ-সংগীতে নাই। যাহা বলিয়াছি তাই—আধ্যাত্মিকতার অভাবই এই সকল প্রেম-সংগীতের প্রধান দোষ। ইন্দ্রিয় লালসার আধিক্যই ইহাদের প্রধান কলংক।

কিন্তু একটা কথা আছে। প্রত্যেক মানুষের প্রবৃত্তি ও রুচি, অনেকটা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থানুসারে গঠিত হয়। কার্লাইল এক স্থলে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য সেই ব্যক্তি যতটা দায়ী, সমাজ তদপেক্ষা অধিকতর দায়ী। ইহা সত্য। এ জগতে কেহ একা নহে, কেহই অন্যনিরপেক্ষ নহে। পরস্পর নির্ভর পরস্পরাবলম্বন মনুষ্যের জীবন। এ পৃথিবীতে আসিতে হয় পরের উপর নির্ভর করিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হয় পরের হাত ধরিয়া, থাকিতে হয় পরকে অবলম্বন করিয়া। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, মনুষ্যের রুচি, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি অনেকটা তৎকাল বর্তমান সামাজিক সংস্থানের প্রতিকৃতি মাত্র। কালের অনভিভবনীয় মাহাত্ম্য প্রতিভার দুর্দম স্বানুবর্তিতাকে পর্যন্ত আপন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লয়—মনুষ্য কালের ক্রীড়নক, কালের ছায়া। এক্ষণে, আমরা যদি এই তত্ত্বের আলোকে সমালোচ্য সংগীতনিচয়ের প্রকৃতি পর্যালোচনা করি,

তাহা হইলে, রচয়িতাকে বোধ হয় আরোপিত কলংকভার হইতে অনেকটা মুক্তি দেওয়া যায়।

রাম বসুর প্রেম-সংগীতের যাহা কিছু কলংক আছে, তাহার নিন্দার ভাগী একা তিনি নহেন—সে সময়ের সমাজকেও খানিকটা দিতে হইবে। যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে বর্তমান থাকিয়াও রাম বসু যে সকল প্রেমসংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও যে আমরা দুই একস্থলে উচ্চ প্রেমের আত্মবিসর্জন ও আত্মবিস্মৃতির ভাব দেখিতে পাই, তজ্জন্য আমরা সহস্র মুখে তাঁহার প্রশংসা করি। ধর্মনীতি ছাড়িয়া দিয়া, কেবল সাহিত্য বলিয়া বিচার করিলে, এই সকল সংগীতকে অতি সুন্দর বলিতে হয়। এমন সুন্দর রচনা কৌশল এমন পরিপাটী কথা ও ভাবের গাঁথনি, প্রতারিত অনুরাগের অভিমান অনুযোগ-প্রকাশের এমন সুন্দর ভংগী বাঙালা সংগীতে বিরল। রাম বসুর নায়িকাদিগের আর যত দোষ থাক্, তাঁহারা সুরসিকা বটেন।

এক্ষণে আমরা রামবসুর দুই চারিটা গান পাঠকবর্গকে উপহার দিয়া এ প্রবন্ধের শেষ করিব ;—

মহড়া

যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আশা পথ নাহি চায়॥
কি দিয়ে গো প্রাণ সখি, রাখিব উহায়।
জীবন যৌবন গেলে আর ;
ফিরে নাহি আসে পুনর্বার ;
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়॥

চিতেন

গেল গেল এ বসন্তকাল, অসিবে তৎকাল ;
কালে হলো কাল এ যৌবন কাল,
কাল পূর্ণ হলে রবে না,
প্রবোধে প্রবোধ মানে না।
আমি যেমন রহিলাম তার আশায় আশায়॥

অন্তরা।

হায় ষোল কলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার,
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে বিফলেতে যায়।

কৃষ্ণ পক্ষ প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়।
শুক্ল পক্ষে হয়, পুনঃ পূর্ণোদয়।
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়,
কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়,
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায়।

মহড়া

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেও না
তোমায় ভালবাসি তাই চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বোলে ধরে রাখব না
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
সদা রাগে কর ভর, আমি ত ভাবিনি পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

চিতেন

দৈবযোগে প্রাণনাথ হলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি,
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ ;
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না।

(অসম্পূর্ণ)

মহড়া

বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ ;

কি প্রেমের বশে, প্রেমরসে তুষতে প্রাণ ;—
রাখিতে হে অধিনীর সম্মান।
অভিমানী হতেম হে তোমায়,
প্রাণনাথ কার সোহাগে, অনুরাগে,
ধরতে আমার পায়।
তুমি আমি যে সেই আছি ;
তবে কিসে গেল সে সম্মান।

চিতেন।

আবাহন করে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক, হয়েছে,
আমার কপালে ছিল হে যেমন।
রঙ্গ রসে ছিলাম এত দিন,
প্রাণনাথ প্রেমের পথে, দুজনাতে কে কার অধীন।
শেষে যদি করবে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান।

অন্তরা

ওরে প্রাণ, কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিয়া।
পূজ্য ছিলাম, ত্যজ্য হ'লাম যৌবন গিয়া।

চিতেন

দৈব দেখা প্রাণনাথ হতো এ পথে ;
আপনা আপনি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে।
এখন ত সেই পথের দেখা হয় ;
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক যেন ঠেকেছে কি দায়।
প্রেম গেছে, যৌবন গেছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান।

(বান্ধব—১২৮৮)

মেঘনাদবধ-কাব্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে এই জন্য অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে, যে, যখনি তাহার ফুল-বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল বাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কি করে? সে প্যাটার্ন্ কিনিয়া চোখে চশমা দিয়া পশমের ফুল তৈরী করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে কখন বা হ্যাম্‌লেটরূপে কখন বা ম্যাক্‌বেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন! আর যিনি গড়েন, তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই;—ইহাঁদের কেবল কেরাণীগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ, আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থ ই তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাঁহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণীনির্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—(কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়।) এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায়, যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এতদিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগমান্ অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে

একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কংকাল তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনীত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ-বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল চোক বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি! অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান, তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে সুরু করেন।

এপিক্ (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণত বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারী কাটাকাটীর ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সব গুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না! এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন “এস, একটা এপিক্ লেখা যাক্” বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য-চরিত্রের উদার-মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দেশে নিবিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনা-কালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধ বর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্রপ্রবৃত্তি; আব রামায়ণে দেখ, একদিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম

আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশিরাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধ-বর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেম বাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষার-ললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধকাব্যে কোথায়! কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন, ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় হইয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে বধ করা, অথবা পুত্র-শোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয়-গৌরব কীর্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্‌খানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি, মেঘনাদবধকাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি, ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্যের প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদ-বধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি, তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায় জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম; তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব-জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সংগে সংগে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই সকল অমর সহচর-সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দিকব্যাপী সেই কবিত্ব-জগতে মাইকেল কয়জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদি বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন—তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্টি মহৎচরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন "I despise Ram and his rabble" সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে কিরণদান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার

বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কাবর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্যচরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাঁহার কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান-সংগীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন, অমনি, সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ-নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সংকীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনার অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে সুপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া সহজ ভাষায় ভাব

প্রকাশ না করিয়া পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহলবশত পড়িতে পারে, বাংলা ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অংগ প্রত্যংগ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম, তাহা মহাকাব্যই নয়।

হে বংগ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙালীদের মানুষ হইতে শিখাও।

(ভারতী, ১২৮৯)

দশমহাবিদ্যা

সর্বাগ্রে দশমহাবিদ্যার আখ্যায়িকার বর্ণনা করা যাউক। একদা মহাদেব সতীশোকে বিলাপ ও রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি নারদ বীণাবাদন করিতে করিতে শিব-সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। মহাদেব সতী-বিরহে আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রাকৃতজনের ন্যায় বিলাপ করিতেছিলেন, নারদের সুধাসিক্ত সংগীতে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন, "বৎস নারদ! আমার বুদ্ধি-বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপা জগন্ময়ী সতীকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তোমার সংগীত শ্রবণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি এবং পুনরায় সতীকে আমার সম্মুখে বিরাজমানা দেখিতেছি।" নারদ এই সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিল, "প্রভো! আমিও মাতৃরূপা স্নেহময়ী সতীকে দর্শন করিব।" নারদ সতী-দর্শনাশায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,—

"কহ ত্রিপুরারি কোথা গেলে তাঁরি
দরশন পুনঃ লভিব।
সে রাঙা চরণ মনের মতন
সাধনে আবার পূজিব॥"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব সতী-প্রদর্শন-দ্বারা নারদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিলেন।

অমনি—

"মহাদেব মহাবেশ ক্ষণকালে ধরিল।
ভীমরূপ ব্যোমকেশ পরকাশ করিল॥
বিদারিত রসাতল পদযুগে ঠেকিল।
ঘোর ঘটা ভীমজটা আকাশেতে উঠিল॥"

দেখিতে দেখিতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে মহাদেবের শরীরে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে গিরি, নদী, বৃক্ষলতা, সমস্তই একে একে অদৃশ্য হইল। গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্তই তিরোহিত হইল। বিশ্বস্থ সমস্ত বস্তু এইরূপে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইলে, মহাদেব মায়াবলে সম্মুখে এক মহাকাশ সৃজন করিলেন। এই নীলবর্ণ মহাকাশের উপর দেখিতে দেখিতে এক রাশিচক্র স্থাপিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঐ রাশিচক্র দশ কক্ষে বিভক্ত হইল। এবং তখন দেখা গেল যে, ঐ রাশিচক্রের কক্ষে কক্ষে সতী ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

নারদ দূর হইতে দেবীর দশমূর্তি দেখিতে লাগিলেন। কিছু দূর হইতে দেখিতে তাঁহার তৃপ্তিবোধ হইল না। তিনি বলিলেন,—"দেব! যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, নিকটে গিয়া এই দশমূর্তি নিরীক্ষণ করি।"

নারদ বলিলেন,—

"কুতূহলে বিকলিত পরাণ উতলা।
দেখিব নিকটে গিয়া অনাদ্যা মঙ্গলা॥"

তখন ভক্তবৎসল মহাদেব কৈলাস পর্বত সহিত নারদকে পূর্বোক্ত রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত করাইলেন। বালকস্বভাব নারদ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন,—"আমি আরও নিকটে যাইয়া দেখিব।" মহাদেব এবার নারদের কুতূহল চরিতার্থ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আমি তোমাকে দিব্য-চক্ষু দিতেছি, তুমি এখান হইতে সমস্ত দেখিতে পাইবে।" তখন নারদ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, দশ কক্ষে দশ মহাবিদ্যার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, ভৈরবী, কমলা প্রভৃতি দশ প্রকার দশ মহাবিদ্যার দশ লীলা দেখিয়া নারদ আনন্দে বিভোর হইয়া পুনরায় বীণাবাদন আরম্ভ করিলেন। মহাদেবও সে গীত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিমোহিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর পুনরপি বৃহদাকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু

পুনরায় বিশ্বে প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিতে দেখিতে বিশ্বচক্রস্থ দেবীর দশটী মূর্তি একত্র হইয়া গৌরী-রূপ ধারণ করিল। তখন হরগৌরী একাংগ হইয়া, কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ৫৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে এতগুলি বর্ণনা-বহুল ঘটনার সমাবেশ হেমবাবুর অসাধারণ লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু পূর্বোক্ত আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আমরা কি শিক্ষা লাভ করিব? এই উপাখ্যান দ্বারা আমাদের জ্ঞান, নীতি, বা সুখ কিছুমাত্র উন্নত হইবে কি না? কেহ হয়ত বলিবেন কবিতা হইতে এরূপ লাভের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা। কবিতা কবি-হৃদয়ের ভাবোদ্গার; ইহাতে লাভবান বিবেচনা করা অবিধেয়। বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, আকাশে চন্দ্র উদিত হয়, দেখিয়া সুখী হই, এই পর্যন্ত; ইহাতে আবার লাভালাভ বিবেচনা করিব কি? কিন্তু লাভলাভ বিবেচনা করি বা না করি, লাভালাভ সর্বদাই সর্ব কার্যে সংঘটিত হইতেছে। যিনি বিবেচক, তিনি কতটুকু লাভ, কতটুকু অলাভ, পরিমাণ করিয়া নির্ধারিত করেন। আর যিনি স্থূলদর্শী, তিনি লাভালাভের পরিমাণ-নির্ধারণে অক্ষম। ফলত অন্য অন্য বিষয়ে লাভালাভের প্রশ্ন উত্থাপন করা যেমন যুক্তিসংগত, কবিতাতেও সেইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করা, তেমনই বিজ্ঞান-সম্মত। লাভালাভ বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা—অধম, মধ্যম ও উত্তম। সে কবিতায় মনুষ্য-সমাজের জ্ঞান, নীতি বা সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ, এ তিনের একটিরও কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি না হয়, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে। আর যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জিত বা পরিবর্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হেমবাবুর কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

হেমবাবু একস্থলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"সুখ কি জীবিত মানে? কিবা অর্থ নির্বাণে?
কা হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমিল বিধাতার
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?"

এই প্রশ্নই অন্য এক স্থলে স্বতন্ত্র ভাষায় জিজ্ঞাসিত হইতেছে,—

"উৎকট ইহ লীলা, তাঁহারে কি সম্ভবে?
সতী কি অশিব, শিব! আছিলেন এ ভবে?
জীব-দুঃখ তবে কি গো অনাদ্যারি রচনা?
অদম্য তবে কি, দেব, পরাণীর যাতনা?
জগৎ-সৃজন-লীলা দুঃখ দিতে প্রাণীরে?
না জানি কি ধর্ম তবে ধর দেবশরীরে!"

"অশুভ সৃজন কার?"—তুমি আমি সকলেই, কেহ বা ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, কেহ বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, আপনাকে আপনি মুহূর্তে মুহূর্তে এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। উদ্যমশীল সাহসী যুবক সংসারের কুটিলস্রোতে এক একটি সৎপ্রবৃত্তি, এক একটি সদাশা বিসর্জন দেয়, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" সদনুষ্ঠায়ী সদনুষ্ঠানের চারিদিকে সহস্র সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া হতাশ্বাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" ধার্মিক সহস্র সহস্র চেষ্টাতেও ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া উর্ধ্বে হস্তোত্তোলন করত কাঁদিয়া কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে,— "অশুভ সৃজন কার?" বিধবা মাতা প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করে,—"অশুভ সৃজন কার?" আর যিনি জ্ঞানী, তিনিও পর-দুঃখে বিগলিত-চিত্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করেন,—"অশুভ সৃজন কার?"

আমরা সকলে যে শুদ্ধ আপনাকে আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা নহে। আমরা সকলেই এই প্রশ্নের একরূপ না একরূপ উত্তরও দিতেছি। কেহ বলিতেছি,—"অশুভ সংসার-নিয়ম।"

কেহ বলিতেছি,—"অশুভ ঈশ্বর-লীলা।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ শয়তানের বা আহ্রিমানের দুষ্টতার ফল।" কেহ বলিতেছি,—"অশুভ গ্রহবৈগুণ্য হইতে উৎপন্ন হয়।" দেখা যাউক, "দশমহাবিদ্যা" এ প্রশ্নের কি উত্তর দেয়।

কবি বলিতেছেন,—

"না হও নিরাশ, অরে ভক্তিমান,
ভূতেশ কহেন নারদে।
দুঃখেরি কারণ, নহে জীবলীলা
মোচন আছে রে আপদে॥

পূর্ণ সুখ ইহ জগত ভাণ্ডারে
দেখিতে পারিবে পশ্চাতে॥
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা দশপুরী,
ক্রমে জীব পূর্ণ কামনা।
শোক দুঃখ তাপ, সকলি দমন,
এমনি বিধানে যোজনা॥
পর পর পর এ দশ জগতে
জীবের উন্নতি কেবলি।
অনন্ত অসীম কাল আছে আগে,
অনন্ত জীবিতমণ্ডলী॥"

অর্থাৎ—"এই দুঃখরাশি অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে, দেখিতেছ; এ অশুভ চিরদিন থাকিবে না। এক একটি করিয়া বিবর্তের (Evolution) স্বাভাবিক নিয়মে এই অশুভ-মালার নিরাকরণ হইতে থাকিবে। শোক, দুঃখ, তাপ প্রভৃতি নানাবিধ মনঃপীড়া এক একটি করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইবে। এবং সর্বশেষে এই দুঃখময় জগতেই মনুষ্য 'পূর্ণ সুখ' দেখিতে পারিবে।" যে কবি আশার এই মোহনস্বরে পাঠকদিগকে বিমোহিত করেন, তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আর আমাদের মধ্যে

যাঁহারা শোক-পীড়িত, দুঃখাহত বা তাপ দিগ্ধ, তাঁহারাও এই সান্ত্বনাময় কাব্যের গ্রন্থকারকে একান্তচিত্তে আদর করিবেন, সন্দেহ নাই।

কবি যে শুদ্ধ আমাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি আমাদের গন্তব্য পথেরও নির্ধারণ করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন,— "লক্ষ্য করি তারি

(চরম শুভের) পথ চালা নিজ মনোরথ,

জীব-জন্মে ভয় কিরে ? জগদম্বা জননী।"

অর্থাৎ "মা ভৈঃ ! মা ভৈঃ ! আকাশে বিদ্যুৎ ক্রূর হাস্য করিতেছে; করুক, ভীত হইও না। শরীরে অগণিত বৃষ্টিধারা নিপতিত হইতেছে: হউক, তাহাতেও বিচলিত হইও না। যাহাদিগকে লইয়া তোমার সংসার-বিপণি সাজাইয়াছিলে—তাহারা কোথায় গেল, আর ফিরিল না; হউক, তাহাতেও বিষণ্ণ হইও না। সেই চরম শুভের পথ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও ! জগদম্বা এক্ষণে তোমাকে বিবিধ তাড়না দিতেছেন; দিউন, তাহার জন্য বিলাপ করিও না। কারণ, ইহা নিশ্চিত জানিও—জগন্ময়ী জগন্মাতা অনতিবিলম্বে তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তোমার সর্ব দুঃখ হরণ করিবেন।" যে ব্যক্তি সর্ব-প্রকার দুঃখে শোকে এই জপমালা স্মরণ করিতে পারিবে, দুঃখ-শোকে তাহার কিছুই কষ্ট হইবে না। কবিও একস্থলে ইহার আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"হেন দশ রূপ (দশরূপা দশমহাবিদ্যা)

ভবার্ণবে পাবে কূল।"

আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কবি আরও একস্থলে বলিয়াছেন,—

"ধরম ধরম পুর, আপন ক্রিয়া কর,

সংযত করি মন তাঁহাদেরি নিয়মে।"

অর্থাৎ "যে যে-কর্মে প্রবৃত্ত আছে, সে সেই কর্ম-অনুসারে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ কর। তুমি তোমার কার্য কর। জগতের দুঃখরাশি দেখিয়া হতাশ বা নিরাশ্বাস হইও না। সদা 'সত্য পথে রাখি মন' নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর।"

পূর্বোক্ত সকল কথা একত্রিত করিলে, হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'য় কি শিক্ষা করা যায়? হেমবাবু বলেন,—"মনুষ্য! দুঃখে শোকে অভিভূত হইও না। বর্তমান অশুভ চিরস্থায়ী নহে। ঈশ্বর-কৃপায় এ অশুভ নিরাকৃত হইয়া, ইহারই স্থলে শুভ আসিবে। যাহাতে চরম শুভ জগতে আসিতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। বর্তমান সময়ে, সত্য-পথে থাকিয়া আপন আপন কর্তব্য-অনুসারে আপন আপন জীবে নিয়মিত কর।" ভগবদ্‌গীতা হইতেও এই শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্সসি॥"

অর্থাৎ "সুখ, দুঃখ, লাভ, অলাভ, জয়, পরাজয় প্রভৃতির বিচার এক্ষণে করিও না। যুদ্ধ এক্ষণে তোমার কর্তব্য কর্ম। অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ করিলে তোমায় প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না।" হেমবাবুর শিক্ষা বর্তমান বংগবাসী ও ভারতবাসীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পরাধীন দেশে মনুষ্যের মন স্বভাবতই নৈরাশ্যের অন্ধ-কূপে ধীরে ধীরে ডুবিতে থাকে। রুদ্ধবেগা নদীর ন্যায় পরাধীন ব্যক্তির হৃদ্‌গত যাবতীয় আশা, হৃদয়েই পর্যবসিত হয়। নৈরাশ্যপ্রবণ পরাধীন দেশে যিনি হেমবাবুর ন্যায় আশার সঞ্জীবন সংগীত শ্রবণ করান, তিনি নীতি ও সুখ উভয়েরই পথ পরিষ্কৃত করেন। এ স্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, যে কবি ভারত-বিলাপ ও ভারত-সংগীত লিখিয়া আমাদের নিরাশ-হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা করিয়াছিলেন, সেই কবিই 'দশমহাবিদ্যা' লিখিয়া আমাদের নৈরাশ্যের দমন করিতেছেন। সংক্ষেপত লাভালাভ-বিবেচনায় আমরা হেমবাবুর 'দশমহাবিদ্যা'কে উত্তম শ্রেণীভুক্ত করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত নহি। আমাদের বিশ্বাস যে, 'দশমহাবিদ্যা'-পাঠে ভারতবাসীর নীতি ও সুখ উভয়ই পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইবে।

কবি বলিতেছেন,—অশুভ ক্রমে ক্রমে নিরাকৃত হইয়া অশুভস্থলে শুভ আসিবে। কিন্তু এ কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ ইতিহাস।

পৃথিবীতে কিরূপে অল্পে অল্পে সভ্যতার বিকাশ হইতেছে, তাহা কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। কবির বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে অল্পে অল্পে অশুভ-স্থলে শুভ আনীত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে, সংসার-পটের প্রথম অংকে দেখিতে পাইবে, মনুষ্য মনুষ্যকে আত্মরক্ষার্থ বিনাশ করিতেছে। সে অংকের মূলমন্ত্র—'সংহার'। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী নরমুণ্ডমালে বিভূষিত হইয়া অহরহ নরবিনাশ করিতেছেন। সেখানে যাহা কিছু শিব, যাহা কিছু শান্ত, তাহাই পদদলিত হইতেছে। সেখানে প্রকৃতিরূপা দেবী বিভীষণা, রক্তাক্তবদনা, উলংগা, লোহিতনয়না, কৃষ্ণবরণা।

• আবার সংসার-পটের দ্বিতীয় অংকে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে, তথায় অশুভ কিঞ্চিৎ নিরাকৃত হইয়াছে। দেখিবে, তথায় সভ্যতার এই প্রথম উন্মেষ হইতেছে। প্রকৃতিরূপা দেবী সেখানেও ভীমা, নৃমুণ্ডমালিনী, লোলরসনা, অট্টহাসিনী। কিন্তু এ অংকে দেবী উলংগিনী নহেন। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়াছেন। পূর্বের ন্যায় সংসারের চতুর্দিকে এখনও চিতা জ্বলিতেছে। কিন্তু ঐ চিতার মধ্যেই প্রস্ফুটিত পথও দেখা যাইতেছে। দেবী অসভ্য মনুষ্যের মনে এই প্রথম জ্ঞানের অংকুর প্ররোপিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্য পূর্বে পর্বত-গহ্বরে, বৃক্ষ-কোটরে বা ভূগর্ভে বাস করিত। এক্ষণে তাহারা জ্ঞানবলে খড়্গ, কর্তরী লইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসভূমি প্রস্তুত করিতেছে।

সংসার-পটের তৃতীয় অংকে দেবী মনুষ্যকে সভ্যতার পথে আরও অগ্রসর করাইয়াছেন। সেখানে দেবী নর-নারীর মধ্যে দাম্পত্য প্রেম সঞ্চারিত করিতেছেন। অসভ্য মনুষ্যের মধ্যে পরিণয়-প্রথা প্রবর্তিত হইতেছে।

কবি দেখাইতেছেন, সংসার-পটের চতুর্থ অংকে দেবীর আর সে ভয়ংকরী মূর্তি নাই। তিনি সেখানে মনুষ্যের মনে অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত করিতেছেন। যতদিন পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল না,

ততদিন অপত্যস্নেহের প্রাবল্য অনুভূত হইত না। কিন্তু এখন নর-নারী সন্তান-সন্ততির প্রতি প্রচুর স্নেহ প্রকাশ করিতেছে।

সংসার-পটের পঞ্চম অংকে মনুষ্যের মনে প্রথম ভক্তি, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি উদিত হইতেছে। সংসার-পটের ষষ্ঠ অংকে মনুষ্য মনুষ্যকে প্রীতি করিতে শিখিতেছে। অর্থাৎ পূর্ব অংকে মনুষ্য প্রত্যুপকার-স্বরূপ পিতামাতাকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে মনুষ্য মনুষ্যমাত্রকেই প্রীতি করিতে শিখিতেছে। সংসার-পটের সপ্তম অংকে মনুষ্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পর পরস্পরের শ্রম লাঘব করিতেছে। সংসার-পটের অষ্টম অংকে মনুষ্য দারিদ্র্য-অসুরকে নিহত করিতেছে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যতই সভ্যতার বিকাশ হয়, ততই মনুষ্য দারিদ্র্যকে পরাভূত করিতে শিক্ষা করে। সকলেই জানেন যে, সভ্য দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না।

সংসার-পটের নবম অংকে মনুষ্য পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে এবং পাপের জন্য অনুতাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সর্বশেষে কবি দেখাইতেছেন যে সংসার-পটের দশম অংকে মনুষ্য দুঃখ সুখ তাপ প্রভৃতি সমস্ত পরাভব করিয়া সর্বমংগলার মধুর শাসনে পরস্পর দয়ার অমৃত সিঞ্চনে সর্বপ্রকার সুখভোগ করিতেছে।

কবি যে সভ্যতার এই দশমূর্তির বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা কি কেবল কবি-কল্পনা? সভ্যতার এই চিত্র যে কল্পনাবহুল, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, কল্পনা-বাহুল্য সত্ত্বেও এই বর্ণনার মূল ভিত্তি ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনা। যিনি বিজ্ঞানের চক্ষে ইতিহাস আলোচনা করেন, তিনি জানেন যে, সভ্যতার পূর্বোক্ত অধিকাংশ মূর্তিই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আজিও বিরাজ করিতেছে। ফিজি দ্বীপের নর-খাদক অধিবাসী যে সভ্যতার সংহারময়ী মূর্তির অধীনে বাস করেন ইহা কে অস্বীকার করিবে? আর ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন, কনগ্রীভ প্রভৃতি রাজনৈতিকগণ যে সভ্যতার কমলাত্মিকা মূর্তির অধীনে বাস করেন,

ইহাই বা কে না স্বীকার করিবে? হেমবাবু দেবীর দেবমূর্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা করিয়া কল্পনার সহিত বৈজ্ঞানিক সত্যের সুন্দর বিমিশ্রণ সম্পাদন করিয়াছেন।

কিন্তু হেমবাবু দেবীর দশ মূর্তির সহিত সভ্যতার দশ অবস্থার সংযোজনা বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারও আলোচনা করা কর্তব্য বোধ হইতেছে। মহামেঘবরণা, দন্তুরা, নৃমুণ্ডমালিনী কালীর সহিত সভ্যতার সংহারময়ী মূর্তির সংযোজন আমাদের বিবেচনায় বড়ই পরিপাটী হইয়াছে। দেবীর তারামূর্তির সহিত সভ্যতার জ্ঞানময়ী অবস্থার সংযোজনা মন্দ হয় নাই; কারণ, জ্ঞানই মনুষ্যের প্রধান ত্রাণোপায়। দেবীর যোড়শী মূর্তির সহিত সভ্যতার প্রেমময়ী মূর্তির অবস্থার সংযোজনা বড়ই মধুর হইয়াছে। কারণ, বয়সের প্রথম উন্মেষেই প্রীতির প্রথম উচ্ছ্বাস। ভুবনেশ্বরীর সহিত স্নেহের সংযোগ মন্দ হয় নাই; কারণ, ভুবনেশ্বরী জগন্মাতা-রূপিণী। কিন্তু ভৈরবীকে কেন ভক্তিবিধায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইল? ধূমাবতী কেন শ্রমহারিণী? মাতংগী কেন প্রেম-প্রীতিদায়িনী? বগলা কেন দারিদ্র্যদলনী? ছিন্নমস্তাতে পাপহারিণী মূর্তির কল্পনা সুন্দর হইয়াছে; পাপী পাপাঙ্কুশ-তাড়নায় আপনার মস্তক আপনি বলি দিতে পারে। দয়াময়ীর সহিত মহালক্ষ্মীর সংযোজনা সুন্দর হইয়াছে; কারণ, ধন সূর্য হইতে উত্তাপ না প্রাপ্ত হইলে দয়া-লতা অংকুরিত হয় না। ইহা দ্বারা দেখা গেল, দুই তিনটি মূর্তি ভিন্ন প্রায় সকলগুলিতেই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির সহিত সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংযোজন সুন্দর হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যার রূপ-বর্ণনা-সম্বন্ধে হেমবাবুর সহিত আমাদের একটু বিবাদ আছে। তিনি কয়েকটি মূর্তি পুরাণোক্ত প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আর কয়েকটি মূর্তি নিজ কল্পনা হইতে আঁকিয়া লইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আর কয়েকটি মূর্তিতে পুরাণ ও স্বকপোল-কল্পনা উভয়ই বিমিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। 'ছিন্নমস্তা'র রূপ পুরাণানুমোদিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে পুরাণের পরিত্যজ্য

অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই। কিন্তু 'বগলা' ও 'ষোড়শী' কবি নিজ কল্পনানুসারে সজ্জিত করিয়াছেন। 'মাতংগী' ও 'ভৈরবী' মূর্তিতে কল্পনা ও পুরাণ উভয়ই সম্মিলিত আছে। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন কবি এইরূপ স্বাধীনতা প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন মূর্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত ছিল। কয়েক স্থলে মূর্তিগুলির রূপের সহিত তাহাদের চরিত্রগত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। 'ধূমাবতী'কে শ্রমাতুরা, ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বৃদ্ধা বিধবার রূপে বর্ণনা করা বড় সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ 'ছিন্নমস্তা'তে মদোন্মাদের বর্ণনা করা বড় উপযোগী হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানময়ী 'তারা'কে লম্বোদরা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জ্ঞানের সহিত লম্বোদরতার কি সম্পর্ক? কিংবা জ্ঞানের সহিত পিংগল বর্ণের কি সম্বন্ধ? যিনি স্নেহময়ী, তাঁহার হস্ত অংকুশ কেন? অভয় বর প্রভৃতি কেন? ভক্তি বিধায়িনী 'ভৈরবী'র মস্তকে মাল্য বড় সুন্দর দেখাইতে পারে; কিন্তু তাহার স্তন রক্তলেপিত কেন? যদি হেমবাবু পৌরাণিকী বর্ণনা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত বিবাদ করিতাম না। কিন্তু যখন তিনি মধ্যে মধ্যে কবিসুলভ-স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছেন; তখন সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া মূর্তিগুলির রূপে ও চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে ভাল হইত।

আমরা 'দশমহাবিদ্যা'র প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। এক্ষণে ইহার কল্পনা, ভাষা, চরিত্র-বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা হেমবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

১ম—কল্পনা

পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে দশমহাবিদ্যার রূপ প্রথমে কল্পিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ রূপের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঐ দশরূপের "দশমহাবিদ্যা" অভিধান তখনও দেওয়া হয় নাই। তদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীর দশ মূর্তির নামগুলির সহিত দশমহাবিদ্যার নামগুলির ঐক্য হয় না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর দশ নাম এই—দুর্গা, দশভুজা,

সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, জগদ্ধাত্রী, কালী, মুক্তকেশী, তারা, ছিন্নমস্তকা, জগদ্‌গৌরী। শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-কালে দেবী পূর্বোক্ত দশমূর্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অসুর বধ করিয়াছিলেন। ইহার পর কালী-কৈবল্যদায়িনী নামক পুস্তকে দেবীর এই দশ মূর্তিকে দশমহাবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। কালীকৈবল্যদায়িনী, বোধ হয় তন্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনী দেবীর দশমূর্তির ভিন্ন আখ্যা দিয়াছেন; যথা—"কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভৈরবী, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতংগী, কমলা।" কালীকৈবল্যদায়িনী—অনুসারেও দেবী অসুর-বধার্থ এই মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও আবার কালীকৈবল্যদায়িনীতে যে সমস্ত অসুরের নাম বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা হয় নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ছিন্নমস্তা নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন। কালীকৈবল্যদায়িনীতে ছিন্নমস্তা অঘোর নামক অসুর বধ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে তারা শুম্ভ বধ করিয়াছেন, কালীকৈবল্যদায়িনীতে তারা ঊর্ধ্বশিখ অসুর বধ করিতেছেন। কিন্তু কালীকৈবল্যদায়িনী দশমহাবিদ্যার পূজার যে ক্রম লিখিয়াছেন, আজিও বংগদেশে সেই ক্রম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কালীকৈবল্যদায়িনী বলেন,—

"কার্তিকেয় অমাবস্যা স্বাতিঋক্ষ তায়।
মহানিশা মধ্যেতে পূজিবে কালিকায়॥
* * *
তারাপূজা ফাল্‌গুণ মাসেতে নিরূপিত।
* * *
আশ্বিনীতে কোজাগর পৌর্ণমাসী তিথি।
মহালক্ষ্মী আরাধেয় নক্ষত্র রেবতী॥"

ইহা দেখিয়া এইরূপ বোধ হয় যে, যদিও কালীকৈবল্যদায়িনী পৌরাণিক মতের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই মত-অনুসারে বংগদেশ পরিচালিত হইত *। কালীকৈবল্যদায়িনীর গ্রন্থকর্তা ভিন্ন

* অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বংগদেশের পূজার ক্রম দেখিয়া কালীকৈবল্য-দায়িনী তাহা নিজ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন।

অন্য কবিরাও এই দশমহাবিদ্যার উল্লেখ, আরাধনা, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মধ্যে মধ্যে দুই এক মূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের লেখকেরাও দশমহাবিদ্যার কল্পনায় মোহিত হইয়া উহাদের রূপ-বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আমাদের জাতি-মধ্যে দশমহাবিদ্যার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বহুকাল হইতেই বিদ্যমান আছে।

ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসী কেল্টদিগের ন্যায় ও নরওয়ে-সুইডেন-বাসী স্কাণ্ডিনাবিয়ানদিগের ন্যায় ভারতীয় হিন্দুরাও অদ্ভুতরসের পক্ষপাতী। এজন্য হিন্দু কবিরাও অনেক সময়ে অদ্ভুতরসের অবতারণা করিয়া থাকেন। শকুন্তলার জন্ম, শকুন্তলার শকুন্ত-সাহায্যে প্রাণ-রক্ষা, শকুন্তলার অপ্সরা কর্তৃক অপহরণ, মহাদেবের কপাল-নিসৃত জ্যোতি দ্বারা কামদেবের বিনাশ, মন্দার কুসুমাঘাতে ইন্দুমতীর প্রাণ-ত্যাগ, সমুদ্র-মন্থনে ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতির সমুত্থান, কিশোরবয়স্ক রামচন্দ্র কর্তৃক তাড়কা-রাক্ষসী-বধ ও হরধনুভংগ, কৃষ্ণের পুতনা-বধ; কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ প্রভৃতি অদ্ভুতরস-বহুল নামা চিত্র আমাদের কাব্য ও ও পুরাণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দশমহাবিদ্যার আদ্যোপান্ত অদ্ভুত ভাব-বহুল। এবং বোধ হয় এই জন্যই দশমহাবিদ্যা আমাদের দেশে প্রাচীন ও নবীন উভয় দল দ্বারাই এত সমাদৃত হইয়া থাকে। হেমবাবু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দশমহাবিদ্যাগণের অদ্ভুতত্ব প্রায়শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারিবে।

কালীকৈবল্যদায়িনীতে ধুমাবতীর বর্ণনা এইরূপ,—

"ধূমারূপে কাত্যায়নী হইল প্রকাশ।
অতি বৃদ্ধা বিধবার পক্ক কেশপাশ॥
বৃদ্ধ কলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর।
ধূমাবর্ণা, বাতাসে দুলিছে পয়োধর॥
কাকধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ।

ভগ্নকটি, বিস্তারিত মলিন বদন ॥
বাম হাতে কুলা, ডান হাত কম্পমান।
কাত্যায়নী নিকটে হৈল বিদ্যমান ॥”

ভারতচন্দ্র ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

“দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ-রথারূঢ়া ধূমের বরণ ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান, আর হস্তে কুলা ॥”

হেমবাবু ধূমাবতীর বর্ণনা করিতেছেন,—

“কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্মল যিনি অন্য ভুবনে।
দীর্ঘা বিরল রদ, শুধু বরণচ্ছদ,
কুটিল নয়না বামা ধূমাবতী ধরণে ॥
লম্বিত পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীবদুঃখ বিনাশে।
শ্রমক্লান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্য সতী হোথা বিকাশে ॥
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা, হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে।”

কোন কোন স্থলে হেমবাবু পুরাণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পূর্ববর্তী কবিগণকে বর্ণনা-মাধুর্যে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্র মাতংগীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

“রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গচর্ম পাশাংকুশ ধরি ॥
ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্র কপাল ফলকে।
চমকিয়া বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে ॥”

কালীকৈবল্যদায়িনী মাতংগীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবসনা মাতংগী ॥
চতুর্ভুজ খড়্গচর্ম পাশাংকুশ ধরা।
ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাংক শেখরা ॥

হেমবাবু মাতংগীর এই রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"সুমেরু মনোহর, হের নিকটে তার,
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে।
বীণা বাজিছে করে, বাদলে থরে থরে,
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে ॥
কলহংস শোভা সম, শ্বেতমাল্য নিরুপম,
শ্যামাংগী শঙ্খের মালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে, সর্বজীব দুঃখ দলে,
মাতংগীর রূপে সতী পদ্মদলে বসেছে ॥"

সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, কোন কোন স্থলে হেমবাবুও পূর্ববর্তী কবি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

হেমবাবু ছিন্নমস্তার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"হের আর উর্ধ্বদেশে, মদনোন্মত্তার বেশে,
ছিন্নমস্তা ভয়ংকরী স্নাত নিজ রুধিরে ॥
বিকট উৎকট স্ফূর্তি—
জগতের সর্বপাপ নিজ অংগে ধরিয়া।"

কালীকৈবল্যদায়িনী ছিন্নমস্তার রূপ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"স্তবে তুষ্টা হয়ে দেবী করিলা অভয়।
চিন্তা নাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি* ভয় ॥
এত বলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন।
আপনার বাম করে করিলা ধারণ ॥
কণ্ঠ হইতে তিন ধারা তিন দিকে ধায়।

* দেবী ছিন্নমস্তারূপে ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

এক ধারা ছিন্নমস্তা অতি সুখে খায় ॥
দুই ধারা দুই সখী সুখে করে পান।
নিজ রক্তে ক্ষুধানল করিল নির্বাণ ॥"

এইরূপে হেমবাবু কখনও বা পূর্ববর্তী কবিগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাদের কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি শুদ্ধ পুরাণের মধ্যে নিজ-কল্পনা কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। তিনি নিজে কয়েকটি অদ্ভুত রসবহুল চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা নিম্নে এইরূপ দুই-তিনটি চিত্রের উল্লেখ করিতেছি।

(ক) যেখানে মহাদেব সৃষ্টির আচ্ছাদন অপসারিত করিতেছেন এবং বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু একে একে শিব-দেহে প্রবিষ্ট হইতেছে, সেখানে কবির কল্পনা এক সুন্দর ও অদ্ভুত চিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে,—

"শ্বাসরোধ করি ভীম শুধিলেন অচিরে।
বিশ্ব-অংগ লুকাইল মহাকাল-শরীরে ॥
একে একে জগতের আভরণ খসিল।
চন্দ্রতারা রশ্মি মেঘ অভ্র সনে ডুবিল ॥

* * *

স্বর্গপুরী রসাতল হিমালয় ছুটিল।
ধারাহারা বসুন্ধরা শিব-অংগে মিশিল ॥
ঘুরে ঘুরে শূন্য পথে বিশ্বকায়া ধায় রে।
ঝরে যেন অরণ্যের পল্লবেতে ছায় রে ॥"

(খ) কবি আর এক স্থলে সৃষ্টির ও সভ্যতার আদিম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাই ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তার তুলনা ॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপরি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী ॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি-কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে ॥

বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে ॥
অংগ হ'তে বেগে পুনঃ বেগধারা বিহারে।
করালবদনা কালী নৃত্য করে হুংকারে ॥"

(গ) কবি আর এক স্থলে সভ্যতার প্রথম অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

"কেহ নিজ মুণ্ড কাটে, জীয়ে পুনঃ রক্ত চাটে,
শাঁকিনীরূপিণী ঘোরা কালিকারে ঘেরিয়া।

কালীর সংগিনী রংগে, ছুটিছে তাদের সংগে
খিলি খিলি হাসি মুখে, কি বিকট ভংগিমা।
মুখে মুণ্ড চিবাইয়া, করে করতালি দিয়া
ডাকিনী ধাইছে কত—সৃক্কণী রক্তিমা!

জড় প্রকৃতির ছলে, শিবদেহ পদতলে—
নৃমুণ্ডমালিনী কালী হুহুংকারি নাচিছে।
সংহার নিরূপণ বদনেতে বিদারণ
শিশু-কর কড়মড়ি চর্বণে গিলি'ছে।"

(ঘ) বিশ্বস্থ যাবতীয় বস্তু বিশ্বে প্রত্যাবর্তন করিতেছে,-

"ধীরে মলয় বায়ু প্রবাহিল স্বননে।
ধরণী ধরিল শোভা সহাস্য বদনে ॥
কুঞ্জে ফুটিল লতা তরুকুল হরষে।
ছুটিতে লাগিল পুনঃ স্রোতধারা তরসে ॥
পতংগ, কীট পশু, পুনঃ পেয়ে চেতনে।
গুঞ্জিল চিতসুখে প্রকটিত জীবনে ॥
মিলাইল দশ রূপ উমা-রূপ ধরিল।
হরগৌরী-রূপে সতী হিমালয়ে উদিল ॥"

আমরা এক্ষণে হেমবাবুর ভাষার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। যে ভাষাতে ভাবের ছায়া স্পষ্টত লক্ষিত হয়, তাহাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাষাকে ইংরাজীতে ভাবের প্রতিধ্বনি কহে। নর্তকীর নৃত্য কখন দ্রুত, কখন বা ধীর হইয়া থাকে। গ্রের নৃত্য-বর্ণনা পাঠ করিলে ঐ বর্ণনার মধ্যেও যেন দ্রুতত্ব ও ধীরত্ব অনুভূত হয়। দ্রুত নৃত্য গ্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"Now Pursuing, now retreating
Now in circling troops they meet."

আবার ধীর নৃত্য বর্ণনা-কালে কবি বর্ণনা করিতেছেন,—

"Slow melting strains their queens approach declare."

এইরূপ ভাষা বাস্তবিকই ভাবের প্রতিধ্বনি। হেমবাবুর ভাষা অনেকস্থলে ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া অনুভূত হয়। নারদ বীণা বাদন করিতেছেন, বীণা কখনও বা পঞ্চমে নামিতেছে, কখনও বা সপ্তমে উঠিতেছে। যখন নারদ বীণা পঞ্চমে নামাইতেছেন, তখন কবির ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমে নামিতেছে। যথা,—

"মৃদু মৃদু গুঞ্জন অংগুলি স্ফুরণে।
সরিৎ প্রবাহিল সুন্দর বাদনে॥
রুণু রুণু নিক্কণ কোমলে মিলিয়া।"

আবার নারদের বীণা যখন সপ্তমে উঠিতেছে, তখন কবির ভাষাও সেই সপ্তম তানের অনুকরণ করিতেছে,—

"আনন্দে তরুকুল মঞ্জরি হাসিল।
আনন্দে তরু-ডাল বিহংগে সাজিল॥"

যখন কোথাও ধীর গতির বর্ণনা করা হইতেছে,—

"মৃদু হাসি রঞ্জিল মহাদেব বদনে।
বিচলিত কৈলাস মৃদু মৃদু চলনে॥
ধীর মৃদুল গতি কৈলাস চলিল।
মধ্য গগন ভাগে শিবপুরী বসিল॥"

এই কয় পঙ্‌ক্তি পড়িলে মনে হয়, যেন কৈলাস পর্বত ধীরে ধীরে তোমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

আবার যখন ভয়ানক বা বীভৎস রসের অবতারণা করা হইয়াছে, তখন হেমবাবুর ভাষার মধ্যেও সেই ভয়ানক ও বীভৎসত্বের ছায়া পড়িয়াছে,—

"শক্তি শম্বুক শাঁখ, মুখব্যাদান ফাঁক
রক্ত জলধিদেহ লোই লোই চলিছে।
পন্নগ সুভাষণ ফণা-প্রসারণ
উৎকট গর্জন তরংগে দুলিছে ॥
কূর্মকমঠি কূট ঊর্মিতে লটপট
লোহিত তৃষাতুর সংপুট খুলিছে ॥"

এইরূপে আরও বহুতর স্থলে ভাষার উৎকর্ষ দেখা যাইতে পারিবে। এক্ষণে চরিত্র-বিন্যাস-সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিয়া আমরা সমালোচনার উপসংহার করিব। আমাদের বিবেচনায় দশমহাবিদ্যার প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে শিবের শিবত্ব সংরক্ষিত হয় নাই। যিনি দেবাদিদেব জগদ্‌গুরু, তিনি স্ত্রী শোকে অধীর হইয়া—

"ছুড়ে ফেলি হাড়মালা, করে দলি ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া।"

এখানে মহাদেবকে নিতান্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাব্যাংশে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি দশমহাবিদ্যার সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। বংগভাষার এরূপ হৃদয়বিদারক সুমধুর বিলাপ আর কোথাও আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।—

"হরষ সুধাসম, হৃদয় উচাটিত,
দম্পতী পরিণয় বাসে।
কত সুখে যাপন, অহরহ বৎসর,
দক্ষ-দুহিতা ছিল পাশে ॥

কতবিধ খেলন, মূরতি প্রকটন,
ভুলাইতে শংকর ভোলা।
থাকিবে চিরদিন, হৃদিপটে অংকন,
সে সব বিলসিত লীলা॥

* * *

সেই যোগ সাধন, কি হেতু ঘুচাইলি,
ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি,
সে সাধ এতদিন পরে॥"

এই সমস্ত কবিতার এক একটি পদ বংগসাহিত্যরূপ নূতন কাননে এক একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প, কিন্তু আমাদের মনে হয়, যেন দেবাদিদেব জগৎস্রষ্টা মহাদেবের মুখে এ কথাগুলি তাদৃশ শোভা পাইতেছে না। আমরা স্বীকার করি, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র শিবের যে অবমানন করিয়াছেন, হেমবাবু তাহা হইতে শিবকে অনেক উচ্চে রাখিয়াছেন, কিন্তু শিবকে আরও উচ্চে রাখিলে শিবের সম্মান রক্ষা হইত। দেখুন. এইরূপ অবস্থায় কালিদাস শিবকে কিরূপ বিচিত্র করিয়াছেন। কালিদাসের শিব সতী-শোকে ক্রন্দন করিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের শোক হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া তপোমগ্ন আছেন। দেবদারু-তলে, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া মহাদেব তপস্থায় নিমগ্ন হইয়া আছেন। তিনি আজ বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দেহে, বদনমণ্ডলে শোকের বিষাদের বা বিলাপের চিহ্নমাত্র নাই। তিনি ধীর, স্থির ও নিশ্চল।

"অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরংগম্।
অন্তশ্চরানাং মরুতং নিরোধান্
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥"

মহাদেব অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘের ন্যায়, তরংগবিহীন সমুদ্রের ন্যায়, নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায়। কালিদাস এখানে শোকের বর্ণন করিয়াও শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। যদি হেমবাবু পুরাণোক্ত

শিব-বিলাপ বর্ণনা না করিয়া কালিদাসের শিব-চিত্র আমাদের সম্মুখে তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিতেন, তাহা হইলে 'দশমহাবিদ্যা' আরও মহামূল্য ও নিরবদ্য হইত।

আমরা নিরপেক্ষভাবে যথাশক্তি হেমবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করিলাম। যদি কেহ আমাদের সমালোচনা এতদূর পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাদের সহিত স্বীকার করিবেন যে, 'দশমহাবিদ্যা' বংগভাষায় এক অতি উজ্জ্বল রত্ন।

(বান্ধব, ১২৮৯)

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

(১)

। বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সংকোচও হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার শেষ কবি। মধুসূদন বাংলার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র—বায়রন, রবীন্দ্রনাথ—শেলি,—বেশ কথা, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাংলার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙালীর নিজস্ব। সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।

তবে কি হেমবাবুর কবিতা আমাদের নিজস্ব নহে? আমাদের আদরের সামগ্রী নহে? নিজস্বও বটে, আদরের সামগ্রীও বটে, কিন্তু একটু কথা আছে।

আপনার সহধর্ম্মিণী বিরলে বসিয়া একান্ত মনে মখ্‌মলের উপর ফুল তুলিয়া একটী সুন্দর টুপি আপনার জন্য তৈয়ার করিলেন। আপনাকে দিলেন, আপনি হাসিতে হাসিতে মাথায় দিলেন,—হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া দশজন বন্ধুবান্ধবকে দেখাইলেন। সেই টুপিটী আপনার প্রিয়া-স্ব, আপনার নিজস্ব, আপনার কত আদরের সামগ্রী! কিন্তু উহার উলগুলি সমস্তই বিলাতি উল, ফুলগুলি বিলাতি ফুল, চিত্রের বিলাতি লতাটী বিলাতী পেঁচে জড়াইয়া আছে। সেই নিজস্বের ভিতর হইতে একরূপ পরস্ব পরতে পরতে উঁকি মারিতেছে। তাহার পর সেই দশজন বন্ধুবান্ধবকে লইয়া যখন ভোজনে বসিলেন, তখন আপনার গৃহিণী নিজে রাঁধিয়া বাড়িয়া স্বহস্তে পলান্ন পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলে নয়ন জুড়ায়, গন্ধে গৃহ ভুর্ ভুর্ করিতেছে; তাহাতেও পেস্তা কিস্‌মিস্ প্রভৃতি বিদেশী দ্রব্যের

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম

(সিদ্ধেশ্বর রায়)

অদ্য আমরা বংগসাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু কাব্য কি সম্যক্ প্রকারে সমালোচিত হইবার সামগ্রী? কবি হৃদয়ের অনন্তভাবের অনন্ত-উচ্ছ্বাস কেহ কি আপন হৃদয়ে অনুভব করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম? কবি স্বয়ংই কি আপন হৃদয়ভাব সকল সময়ে অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে সমর্থ? কবির হৃদয়ে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা প্রকাশ করিবার হয়ত উপযুক্ত শব্দও নাই। যে সকল প্রচলিত শব্দে তাহা প্রকাশিত হয় তাহার দ্বারা দর্পণের প্রতিবিম্বের ন্যায় অন্য হৃদযে সেই সকল ভাবের সমভাব উৎপন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব। কেন না কবি স্বভাবতই কবি;—শিক্ষাদ্বারা কবি নহেন। চিত্রকরের হৃদয়ে যে চিত্র জাগরিত আছে, বর্ণের দোষে বা চিত্র প্রতিফলিত করিবার দোষে তাহা যেমন অন্যের চিত্তগত করা দুরূহ, কবি-হৃদয়ের অনন্ত ক্রীড়াময় ভাবসকলও তেমনই প্রকাশোপযোগী ভাষার দোষে বা প্রকাশ করিবার দোষে অন্যকে সম্যক্ অবগত করা দুরূহ। সুতরাং কবি-হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া যে ভাবের অনন্তপ্রবাহ বহিতে থাকে তাহা সমালোচকের অকবি-হৃদয়ের অননুভবনীয়। সমালোচক স্বয়ং কবি হইলে কতকাংশে অননুভবনীয়, কেন না, এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের সম্যক্ বোধ্য নহে। এই চিন্তাস্রোত বাক্যদ্বারা কথঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয়, সুতরাং কবির, বাক্যের দ্বারা অসমান হৃদয়ে কখনই কবির হৃদয়ভাব সম্পূর্ণ অনুভব করা যাইতে পারে না। যাহা যৎসামান্য অনুভবনীয়, তাহা আবার অন্যের চিন্তাকে প্রবাহিত করিয়া অন্যের বাক্যে প্রকাশিত হইলে কবি-হৃদয় হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়ে। এইজন্য বলিতেছিলাম

* চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট্, ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ১২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ এক টাকা।

যে, অনন্ত প্রসারিত অনন্ত-গগন-বিহারী কবি-হৃদয় হইতে যে ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া চিন্তাস্রোতকে আলোড়িত বিলোড়িত করিয়া সামান্য মনুষ্যকৃত ভাষার শব্দে বিকলাংগ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে তাঁহার হৃদয়কে প্রকৃতরূপে অনুভব করা কদাচিৎ সম্ভব।

অনেকে এমন মনে করেন যে, নানাবিধ ছন্দোবন্ধে এবং সুললিত শব্দে প্রকাশিত বাক্যই কাব্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ প্রকার সহস্র কাব্যে একবিন্দুও কবিত্ব না থাকিতে পারে। পক্ষান্তরে ছন্দোবন্ধ বিরহিত একটি মাত্র পংক্তিতে আবার এত কবিত্ব থাকিতে পারে যে, সংসারে তাহার স্থান হওয়া কঠিন। এতদ্ভিন্ন সেক্সপীয়রে বা কালিদাসে যে কবিত্ব নাই, হয়ত কোন বাক্যশূন্যহৃদয়ে তাহা আছে। ছন্দ, বাক্য এবং চিন্তা কবিত্বকে পরিচালিত করিতে পারে না এবং তাহাদিগের দ্বারা কবিত্ব পরিপুষ্ট হয় না, বরং তাহারাই কবিত্বের দ্বারা পরিচালিত, অংগ-প্রাপ্ত ও অলংকৃত হইয়া থাকে। কবিত্ব,—চিন্তা, বাক্য বা ছন্দের দাস নহে এবং কখনই তাহাদিগের অনুজ্ঞা পালন করে না। যেখানে ছন্দ নাই, বাক্য নাই এবং চিন্তা নাই, কবিত্ব সেখানেও অনন্তভাবের ও প্রকৃতির সহিত আনন্দক্রীড়ায় রত থাকিতে পারে। তবে যদি কবি হৃদয়ের সহিত চিন্তা, বাক্য এবং ছন্দের সংযোগ ঘটে, তাহা হইলে সে সংযোগ যে সুখের সংযোগ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অতুল লাবণ্যময়ী কামিনীর কান্তি অলংকারে শোভিত না হইয়াও যে লাবণ্যছটা ছড়াইতে পারে তাহা গোলকুণ্ডার হীরকখচিত কুৎসিত রমণীতে সম্ভবে না।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কাব্য কি? কবির ভাষায় প্রকাশিত কবির হৃদয়-ভাবেরই নাম কাব্য। কবির ভাষায় কবির হৃদয়ভাব যে সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশিত হইবে বা হইতে পারে তাহা নহে, তবে এমত ভাবে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক যে, সেই ভাষা অন্যের হৃদয়ের নিদ্রিত ভাবসকলকে জাগ্রত করিয়া কবির হৃদয়কে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করাইতে সমর্থ

হয়। ছন্দ, অলংকার, সুললিতশব্দ ইত্যাদির দ্বারাই অন্যের নিদ্রিত ভাব সকল সহজে জাগ্রত হওয়া সম্ভব। ছন্দ-অলংকার নহিলে যে অন্যের হৃদয়ে সুপ্তবীণা একেবারে বাজে না, বা বাজিয়া উঠিতে পারে না, আমরা তাহা বলি না। যেখানে ভাব সকল তীব্র এবং তীরগতিতে অন্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, সেখানে ছন্দ-অলংকার নহিলেও চলিতে পারে। যেমন, শব্দ করিয়া যাহার নিদ্রাভংগ করা যায় না, তাহার অংগ স্পর্শ করিতে হয়, তেমনি, ভাব তীব্র ও তড়িৎ গতি হইলে ছন্দালঙ্কার ব্যতিরেকে ও কবিহৃদয় অন্যের অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু এই তীব্র ও তড়িৎগতি ভাবসকল আবার ছন্দালংকারাদিতে শোভিত ও অলংকৃত হইলে যে সহজে অন্য হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের ভাবসকল যেরূপ তীব্র, উজ্জ্বল এবং সহজে অন্য হৃদয়ে প্রবেশক্ষম, তাহাতে ইহা ছন্দালংকার বর্জিত হইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সহজেই যে রূপবতী, অলংকার তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা না হউক, নিষ্প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম লাবণ্যময়ী রমণীমূর্তি, সুতরাং তাহার বস্ত্র-ভূষণ নহিলে ক্ষতি নাই। এই জন্যই কাব্যখানি গদ্যকাব্য। যাহার লাবণ্য আছে, তাহাকে অলংকার দিয়া সাজাইয়া কবি যে, কোন অংগই আচ্ছাদিত রাখেন নাই,—ইহা ভালই করিয়াছেন। চন্দ্রবাবু যে অতি সামান্য চেষ্টা করিলেই কাব্যখানিকে নানাবিধ ছন্দোবন্ধে ও অলংকারে সাজাইতে পারিতেন না, আমাদিগের তাহা বিশ্বাস হয় না। তাঁহার সহজ ও সরলভাবের জন্য বাস্তবিকই বন্ধন নিষ্প্রয়োজন। বন্ধনমুক্ত হইয়া তিনি যেমন অল্প কথায় এবং অল্পায়াসে ভাবসকলকে প্রকাশিত করিতে পারিয়াছেন, বন্ধনযুক্ত হইলে তেমন পারিতেন না। তিনি যে কেবল ছন্দাদি বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে ও নিম্নে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার কবিতা অনেকস্থলে বাক্যের বন্ধনকেও ছিন্ন করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে কল্পনাসহচরী চিন্তা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া

আসিয়াছে। যিনি একবার তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, কবির হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে তখনই সেই ভাবের স্রোত চলিয়াছে, কোন প্রকার বিঘ্ন মানে নাই; হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নানাদিকে এককালে ধাবিত হইয়া বিদ্যুৎগতিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইয়াছে। কি ছন্দ, কি ভাষা, কি চিন্তা—কেহই সেই উচ্ছ্বাসের নিকট দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় নাই। যদি কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে কেহ প্রতিহত করে, তাহা হইলে প্রবাহ অবাধে ছুটিতে পারে না; সুতরাং কবির কবিত্ব প্রকৃত এবং সহজ না হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কোনদিকে দৃক্‌পাত বা ভ্রুক্ষেপ না করিয়া উচ্ছ্বাসের স্রোত ও ভাবের তরংগে যাঁহারা স্বর্গ মর্ত্য প্লাবিত করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন তাঁহারাই প্রকৃত কবি। কেননা প্রকৃতি স্বয়ং স্বাধীন ও অনন্তশক্তিসম্পন্ন। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে প্রকৃত কবির্‌লক্ষণ অনেক বিদ্যমান আছে, একে একে আমরা তাহার বিশ্লেষ করিতে চেষ্টা করিব।

সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃতি ও পুরুষ যে সম্বন্ধ একটি সম্পূর্ণ মনুষ্য সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষেরও সেই সম্বন্ধ; একের অভাবে অন্যের মনুষ্যত্ব অক্ষুন্ন থাকে না, সমাজ সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য উভয়েই "নারিকেলের মালার" ন্যায় অর্ধাংগ মাত্র—স্ত্রী পুরুষ দুই না হইলে এক অংগ সম্পূর্ণ হয় না। উভয়ে মিলিয়া সংসার ধর্ম পালন করে বলিয়া, স্ত্রী পুরুষের সহধর্মিণী। সংসার ধর্ম পালন করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি। প্রেম ও ভক্তি নহিলে যেমন মুক্তিলাভ হয় না, তেমনই স্ত্রীর প্রগাঢ় ভক্তি এবং স্বামীর অগাধ প্রেম নহিলে সংসার-সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না। মনুষ্যত্বকে বিশ্লেষ করিলে আমরা প্রেম ও ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। আবার তাহাদের মিলনে যে সামগ্রী উৎপন্ন হয়, এক একটি পৃথক করিয়া পরীক্ষা করিলে সে সামগ্রীর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—উভয়ের মিলন ব্যতিরেকে সে সামগ্রী জন্মে না। যেখানে উভয়ের মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছে, সেইখানেই পবিত্রতা বিরাজিত আছে, সেইখানেই মনুষ্য সৃষ্টির

সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে; অন্যথা স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের বিচ্ছিন্ন জীবন বিড়ম্বনামাত্র, সমাজ ভিত্তিশূন্য, ভক্তি প্রেমশূন্য, মনুষ্য মনুষ্যত্ব-শূন্য। উভয়ের সম্পূর্ণ সংযোগ ব্যতিরেকে পবিত্রতা প্রায় দুর্লভ হইয়া দাঁড়ায়, মনুষ্য মনুষ্যনামের কলংক হইয়া পড়ে, সমাজ বন্ধনশূন্য হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কেবল ভক্তিতে কার্যসিদ্ধি হয় না, কেবল ঈশ্বর নিকটবর্তী হন না—ভক্তির সহিত প্রেম চাই। সংসারে স্ত্রীর সহিত পুরুষের মিলন চাই। দেবাদিদেব মহাদেব কেবল ভক্তিতে ঈশ্বর প্রাপ্ত হন নাই, যতদিন না প্রেমরূপিণী পার্বতীর সহিত উদ্বাহ হইয়াছিল ততদিন তাঁহার তপঃসিদ্ধি হয় নাই। তাই বলি, প্রেমরূপিণী ভার্যা এবং ভক্তিরূপী স্বামী নহিলে মনুষ্যত্ব জন্মে না—ভক্তি একা কেবল কঠোরতা-মাত্র। স্ত্রী সমাজের ভিত্তি; পুরুষ সেই ভিত্তিকে আশ্রয় করে বলিয়া মহৎ, নতুবা স্ত্রীবিহীন পুরুষ কিছুই নহে। যে সময়ে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়, সেই সময় হইতে স্ত্রীর ভক্তি ও পুরুষের প্রেম শিক্ষা আরম্ভ হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও ভক্তির সেইই প্রথম সোপান,—সেইখানেই বিশ্বব্যাপী প্রেমের বীজ অংকুরিত হইতে আরম্ভ হয়। এইজন্য হিন্দুর সমস্ত ধর্মকর্ম স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া করিতে হয়। এই সংযোগ ছিন্ন হওয়াতেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কাব্যের সৃষ্টি।

কাব্যের বিষয়টি প্রেম। প্রকৃত কবির ইহা একটি উপযুক্ত বিষয় বটে। প্রেম ব্যতিরেকে স্বর্গীয়ভাব পৃথিবীতে আর কে আনিতে পারে? চন্দ্রবাবুর হৃদয় যেমন গভীর, তাঁহার প্রেম ও তেমনি গভীর। প্রেমের দিকেই সকল হৃদয় ধাবিত এবং প্রেমই সকল হৃদয়ের লক্ষ্য, কেননা, জীবনের লক্ষ্য যে ঈশ্বর, তিনিই প্রেমে বাঁধা। যে যত অধিক প্রেমময়, সে তত ঈশ্বরের নিকটবর্তী। খ্রীষ্ট সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তার করিয়া ঈশ্বরের পুত্র। মনুষ্যের দুঃখ-নিবারণই চৈতন্যের উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি ভগবানের অংশ। জগতের দুঃখে দুঃখী বলিয়া শাক্যসিংহ—বুদ্ধদেব। শত্রুর দুঃখে দুঃখী বলিয়া রামচন্দ্র —বিষ্ণুর অবতার। তাঁহাদের প্রেমের অনন্ত রাজ্য বলিয়া তাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণে নহে। প্রেমের সীমা

যতই গভীর ও বিস্তৃত হইবে, মনুষ্যের ততই দেবত্বলাভ হইবে। কেন না যেখানে প্রেম, সেইখানেই ঈশ্বর। প্রেম বিস্তৃত হইলে যে গভীরতা থাকে না, তাহা আমরা বুঝি না। যাহা অল্প এবং সীমাবদ্ধ তাহারই গভীরতা লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সমুদ্র অনন্তবিস্তৃত হইলেও তাহার গভীরতার হ্রাস নাই। যাহা বিস্তৃত হইল বলিয়া গভীর হইল না, তাহা অতি সামান্য। খ্রীষ্ট, চৈতন্য, শাক্যসিংহ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের হৃদয়ে সে অল্পপরিসর প্রেম ছিল না। তাঁহারা এক এক জন অনন্ত প্রেমের উৎস। তাঁহাদিগের গভীর প্রেমস্রোত অনন্তবিস্তৃত হইয়া প্রত্যেক লোকেরই দ্বারে গিয়া লাগিয়াছিল। প্রেমের গভীরতার সহিত বিস্তৃত নহিলে তাহার আদর বৃদ্ধি হয় না। গভীর অথচ বিস্তৃত প্রেমই পূজ্য ও নমস্য। এ প্রকার প্রেমে স্বার্থের নাম গন্ধ নাই, তাহার সকলই নিঃস্বার্থতা পরহিতান্বেষী। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের প্রেমে গভীরতা আছে বটে, কিন্তু নিঃস্বার্থতা নাই, বিস্তৃতি নাই। চন্দ্রবাবুর হৃদয় প্রেমময় সত্য, কিন্তু তিনি প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত। যাহা প্রকৃত প্রেম তাহাতে উন্মত্ততা থাকিলেও উদ্‌ভ্রান্তি নাই, চিত্ত-বিকৃতি নাই, শোকতাপ নাই, জ্বালাযন্ত্রণা নাই, হা-হুতাশ নাই, দীর্ঘনিশ্বাস নাই। তাহা কেবল অনন্ত প্রেমের অপ্রতিহত অনন্ত প্রবাহ। যতদিন জীব ততদিন সে প্রেম জীবন্ত। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের শীতবসন্ত নাই, চিরদিনই একটানা স্রোত। সে হৃদয় একের জন্য পাগল নহে, সমস্ত জগতের জন্যই তাহার প্রাণ, সমস্ত মনুষ্যই তাহার প্রণয়পাত্র। এইজন্য সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক পণ্ডিৎ কোমৎ মনুষ্যসমাজের অধিক ঈশ্বর মানেন না।

কিন্তু আমাদিগের কবির হৃদয় কেবল এক হৃদয়ের জন্যই পাগল। তাই প্রণয় পাত্রের অনুপস্থিতিতেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের সৃষ্টি। সমস্ত দুঃখসন্তাপ কেবল তাহারই জন্য। এ প্রকার প্রেমকে আমরা স্বার্থশূন্য বলি না। যাহা পাইলে সুখী হই, তাহা হস্তবহির্ভূত হইল বলিয়া যে অসুখ, তাহাতে স্বার্থত্যাগ কোথায়? তাঁহার প্রণয় গভীর এবং পবিত্র বটে, কিন্তু যেখানে অধিক স্বার্থ সেখানে গভীরতার সীমাও

বিস্তৃত। আর যে প্রেম পবিত্র নহে তাহার কথা আমরা মুখে আনিতে চাহি না। যদি এ প্রেম সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য কাতর হইত, যদি জগতের দুঃখে দুঃখ করিতে জানিত,—তাহা হইলে আমরা ইহার পূজা করিতে পারিতাম, কিন্তু ইহা বিস্তৃত হয় নাই বলিয়া ইহার গভীরতারও আশানুরূপ হয় নাই। যদি ইহাতে স্বার্থের কথা না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থখানি প্রতি প্রেমিকের হৃদয়ের ধন হইত। কিন্তু ইহাতে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতের কথা নাই। বংকিমবাবুর চন্দ্রশেখরে যে প্রেমের কথা আছে, যে মূলসত্য আছে, যে দেবভাবের উপদেশ আছে, ইহাতে তাহা নাই। তথাপি যে সমাজে স্ত্রী স্বামীর দাসীর অধিক নহে, ইহা যে সে সমাজের একটী অমূল্য সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিলের 'স্ত্রী জাতির বশ্যতা' (Subjection of Women) নামক গ্রন্থে যে উপদেশ আছে, ইহাতে তাহার অধিক আছে। স্ত্রীজাতি যে বাস্তবিক অশ্রদ্ধার সামগ্রী নহে এবং তাহারা যে পুরুষের প্রকৃত বন্ধু ও প্রাণের প্রাণ, ইহাতে এ প্রকার বিস্তর নীতিপূর্ণ শিক্ষা আছে। স্ত্রী-পুরুষ সমানভাবে না মিলিলে যে সমাজ ভাল চলে না, তাহাও ইহাতে চক্ষে অংগুলি দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

চন্দ্রবাবুর পরলোকগতা ভার্যার প্রতি যে গাঢ় প্রেম, এই গ্রন্থ তাহার উজ্জ্বল চিত্র। স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়ে বিলক্ষণ স্বার্থ আছে বলিয়া উভয়ের প্রেম বাস্তবিকই অতি গাঢ়। এই গাঢ় প্রেম, কবি অতি পরিষ্কার ও উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষের যাহা প্রকৃত সম্বন্ধ, ইহাতে তাহা সর্বাংগসুন্দর করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্বার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসা যায়, তাহার সুখের জন্য যাহা কর্তব্য, ইহাতে তাহারও বিস্তর উপদেশ আছে। ফলত কাব্যখানি যে সাহিত্য সংসারের একটী রত্নবিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ রত্ন পরিষ্কৃত নহে। শৈবলিনী-বিচ্ছেদে চন্দ্রশেখর যেমন শৈবলিনীর স্থানে সমগ্র মানবজাতিকে বসাইলেন, চন্দ্রবাবু যদি পরলোকগতা ভার্যার স্থানে সেইরূপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহার জ্যোতিতে অনেকদূর

আলোকিত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি কি না প্রাণের ব্যবসায় করিতে গিয়া "আর একজনকে" প্রাণ দিবার কথা পাড়িলেন।

ঘূর্ণ্যমান দ্রব্যে যে বল নিহিত থাকে তাহাকে কেন্দ্রীভূতবল বলা যায়। যতক্ষণ বল এক কেন্দ্রে অবস্থিতি করে ততক্ষণ তাহার সীমা প্রসারিত হয় না, কিন্তু বল কেন্দ্র হইতে অপসারিত হইলে ঘূর্ণ্যমান সামগ্রী দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রেম সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। এক ব্যক্তির প্রতি প্রেম ঘনীভূত থাকিলে সেই ব্যক্তির অবর্তমানে অবশ্যই প্রেম বিস্তৃত হইয়া সমগ্র মনুষ্য জাতির উপর, অন্তত স্বজাতিদের উপর, বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। শৈবলিনী যতদিন চন্দ্রশেখরের গৃহে, চন্দ্রশেখরের প্রণয়ের গাঢ় অনুরাগ ততদিন এক কেন্দ্রে ঘনীভূত। কিন্তু শৈবলিনী জাতিভ্রষ্টা হইলেই তাঁহার প্রণয় বিস্তৃত হইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিতে পড়িল। যদিও ইহা কল্পনাজগতের চিত্র, তথাপি কেমন স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। প্রণয় বিস্তৃত হইয়া পড়িল বলিয়া, চন্দ্রশেখর একখানি উচ্চ অংগের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। বাস্তবিক কর্মজগতে যদি চন্দ্রবাবুর প্রণয় তেমনি বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাহার প্রণয়-পাত্রে যে প্রণয় কেন্দ্রীভূত ছিল তাহা যদি মনুষ্য জাতিতে, অন্তত স্বজাতিতে, অথবা তাঁহার পল্লীস্থ প্রতিবেশীমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে এত গভীর প্রেমের সার্থকতা হইত। কিন্তু কবি নিজেই বলিয়াছেন "যে পরের জন্য আপনাকে ভুলিতে পারে না, সেই দুর্বল, সেই সামান্য, সেই ক্ষুদ্র। যে পারে, সেই মহৎ, সেই ধন্য, প্রাতঃস্মরণীয়। আমি এই দৌর্বল্য নিরাকৃত করিতে চাই—পারি না যে মা! মনে করি আর আপনার জন্য কাঁদিব না—পোড়া মন মানে না যে মা! মনে করি মনুষ্য জাতিকে হৃদয়ে স্থান দিব, মনুষ্যজাতির জন্য, পশু-পক্ষী-কীট-পতংগের জন্য, আপনাকে ভুলিয়া যাইব—ততদূর প্রশস্ত চিত্ততা নাই যে মা!" যাহা হউক, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে, হৃদয়ে স্থান দিতে তিনি যে বাসনা করিলেন সে বাসনা পূর্ণ করিতে না পারিলেও তাঁহার কিঞ্চিৎ মহত্ত্ব আছে।

প্রেমকে প্রধান লক্ষ্য করিয়া এ গ্রন্থে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা মৌলিকতার সহিত লিখিত হইয়াছে এবং প্রায় সমস্ত বিষয়গুলিতে

চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত এ গ্রন্থখানি কাব্য ও দর্শনের মিশ্রফল এবং কাব্যকেও কি প্রকারে দর্শনের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে ইহা তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। কেবল কল্পনা লইয়া যে কাব্য কল্পনা ও দর্শন মিশ্রিত কাব্য তাহার অপেক্ষা আদরণীয়, কেন না তাহা অধিক স্বাভাবিক। ভারতের আদি কবিগণ প্রায় সকলেই দার্শনিক কবি, এই জন্য কোথাও তাঁহাদিগের তুল্য কবি নাই। ইংলণ্ডে টেনীসন্ দার্শনিক কবি বলিয়া তাঁহার এত যশ।

এই গ্রন্থের ভাষা সুললিত, রসাক্ত, সহজ এবং পরিষ্কার। যে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য যে শব্দগুলি বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, সে ভাবটি সেই শব্দে যতদূর সম্ভব ততদূর পরিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; এই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থল প্রত্যহ যে ভাষায় কথা কথা যায় সেই ভাষায় লিখিত হইয়া বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতি সহজেই মর্ম্মকথাগুলি হৃদয়ে লাগিয়া যায়। কিন্তু ইহার কোন কোন স্থলের ভাষা লিখিবার ভাষা নহে বলিয়া যাঁহারা ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে চাহেন তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, যতদিন লিখিবার ও বলিবার ভাষা এক না হইবে ততদিন সে ভাষার প্রকৃত উন্নতি হইবে না এবং তাহা অধিককালস্থায়ী হইবার পক্ষেও অনেক সন্দেহ। সংস্কৃত ভাষার প্রকারভেদ ছিল বলিয়া তাহা মৃতপ্রায়। বাংলাভাষার প্রকারভেদ থাকিলে কালে তাহারও দুরবস্থা হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিজাতীয় ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলায় তাহার অবিকল প্রতিশব্দের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য ব্যবহৃত হইয়া তাহা দূষণীয় হইবে কেন; ভাষাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য অন্য ভাষা হইতে কথা লইয়া অভাব মোচন করা কি দোষের কথা? অন্য ভাষা হইতে কোন কথাই লওয়া উচিত নহে, এ প্রকার মত অতি অপ্রশস্ত। তবে চন্দ্রবাবু সংস্কৃত শব্দসাগর হইতে যাহা লইতে পারিতেন, তাহা অন্যত্র হইতে লইয়া হৃদয়ভাব সহজে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু সে স্থলে শব্দ মনোনীত করিবার কিছু ত্রুটি হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

(পাক্ষিক সমালোচক)

মানসী

প্রিয়নাথ সেন

সৌন্দর্য উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি, তাহা একদিকে যেমন বিশুদ্ধ, অপরদিকে তেমনি প্রখর। প্রখরতানিবন্ধন সে আনন্দ আমরা নিজের ভিতর বদ্ধ রাখিতে না পারিয়া জগৎ সংসারকে তাহার ভাগ লইতে আহ্বান করি; এবং বিশুদ্ধ বলিয়া পরের সহিত উপভোগে সে আনন্দ কমিয়া না গিয়া বরং বাড়িতেই থাকে। ইংরেজ কবি শেলি লিখিয়াছেন, প্রেমের বিভাগ অর্থে এমন বুঝায় না যে, কাহারও প্রাপ্ত অংশ হইতে তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্র বঞ্চিত করা। এ কথায় অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে—কিন্তু সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া আনন্দ ভাগ করিয়া লইলে, আনন্দ যে বাড়ে বই কমে না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। সৌন্দর্য-উপভোগ-প্রবৃত্তির মূলে যে পরার্থপরতা আছে, ইহা তাহার একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তাহা হইলেই আমরা বলিতে পারি যে, এই বৃত্তি মংগলময়ী এবং ইহার পরিচালনা শুভোদ্দিষ্টা।

আমাদের সৌন্দর্যস্পৃহা নানা উপায়ে চরিতার্থ হয়। কিন্তু বোধ হয়, সুন্দর কাব্য হইতে আমরা যে আনন্দ পাই, তাহা সর্বতোভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। চিত্র-বিদ্যা, সংগীতবিদ্যা প্রভৃতি অপরাপর কলা বিদ্যারও উদ্দেশ্য সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি; কিন্তু কাব্যে যেমন বাহ্য এবং অন্তর-জগতের সৌন্দর্য স্থায়ী, এবং সর্বাংগীণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কাব্যামোদী পাঠক, তাই কোনও সুন্দর কাব্যের সন্ধান পাইলে সুখে অধীর হইয়া অপরকে তাহার রসাস্বাদনের সুখী করিতে উৎসুক হন। সম্ভবত, সমালোচনার জন্ম ইহা হইতেই।

আমরা "মানসী" পাঠে যে তীব্র এবং নিরবচ্ছিন্ন আমোদ পাইয়াছি, সচরাচর কোন কবিতা পুস্তকপাঠে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

আমাদের বিবেচনায় মানসী একখানি অতি উৎকৃষ্ট, অতি অপূর্ব গ্রন্থ। এত চরম সৌন্দর্য্যের, এত বিচিত্র কবিতার একত্র সমাবেশ বাঙালা ভাষাতে আজ এই প্রথম দেখিলাম। অপর কোনও ভাষাতেও এরূপ একখানি গ্রন্থের ভিতর এত উচ্চ দরের অথচ বিভিন্ন প্রকৃতির এতগুলি কবিতা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। স্যুইন্‌বার্ণ এবং ভিক্টর হুগোর দুই একখানি গ্রন্থ স্মরণ হইতেছে—কিন্তু মানসী পড়িয়া বিষয় এবং ভাবের বৈচিত্র্যগুণে এবং কাব্য সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষনিবন্ধন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা পুস্তকই বার বার আমার মনে আসিয়াছে। সে পুস্তক আর কাহারও নয়, ভিক্টর হুগোর—এবং সেখানি তাঁহার অপর কোন পুস্তক নয়, তাঁহার লে কোঁতাঁপ্লাসিও (Les Contemplations)। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, সমালোচক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন। আমরা কিন্তু আমাদের মনের কথাই বলিতেছি। আমাদের স্থির বিশ্বাস, মানসীর রসাস্বাদনে অধিকারী পাঠক যদি ভিক্টর হুগোর কোঁতাঁপ্লাসিও পড়িয়া থাকেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, এই দুই পুস্তকের একত্র নামকরণ অনিবার্য না হইলেও, নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে।

মানসীর ভাষা এবং ভাব—যেন একই ছাঁচে একেবারে প্রকৃতির হাত হইতে বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক ইহার কোথাও কৃত্রিমতার নাম গন্ধ নাই। এই সকল কবিতার অসাধারণ উৎকর্ষের মূলীভূত কারণ,—তাহাদের মর্ম্মগত সত্য। মানসী বড়ই সুন্দর, কেন না মানসী বড়ই সত্য। তাহাতে একটীও মিথ্যা কথা নাই। কবি মানব-হৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবসমূহের অতলস্পর্শ গভীরতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই, সেই চির সত্যের ভিতর কবিত্বের অমর সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেইজন্য তাহার অন্বেষণে তাঁহাকে মিথ্যার দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হয় নাই। প্রকৃতির চিরসৌন্দর্য্যের প্রাণ পর্যন্ত দেখিবার চক্ষু তাঁহার আছে বলিয়াই, তাঁহাকে বসিয়া বসিয়া চিরদিন রং ঘুঁটিতে হয় নাই। তিনি বাহ্য এবং অন্তর্জগতের এতদূর পর্যন্ত দেখিতে জানেন বলিয়াই, এত সৌন্দর্য দেখিতে

পাইয়াছেন, এবং এমন সুন্দর করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। এই গেল মানসীর ভাব বা প্রাণের কথা। ইহার বাহ্য বিকাশ অর্থাৎ ভাষা এবং ছন্দ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই খাটে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই কবির ভাব ও ভাষা একাধারে একেবারে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ সৃষ্টির হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে সৌন্দর্যের বার্তা আসিয়াছে তাহা একেবারে কবিত্বের আকার ধরিয়াই আসিয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শব্দ আহরণ করিতে হয় নাই—ভাবপ্রকাশের জন্য ইতস্তত করিতে হয় নাই। এদিকে আবার জোর করিয়া একটা মস্ত কথা বলিবার কোথাও প্রয়াস বা চেষ্টা দেখিলাম না। পূর্ণ প্রাণ হইতে সুন্দর এবং পরিণত ভাষা ও ছন্দে, উচ্ছ্বাসোন্মুখ কবিতার মুক্তস্রোত হিল্লোলময়ী ধারার নিঃসৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই কবির বলিবার কথা আছে—কথা বলিবার আড়ম্বর নাই। তাই তাঁহার ভাষা সারগর্ভ, সুন্দর, পরিষ্কার, পরিস্ফুট এবং ভাবের পর্দার সংগে সুমিলিত। শুধু তাহাই নহে। এ প্রশংসায় ভাষার এ গুণপনায়, উৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য উভয়েরই দাবী আছে, এবং উভয়েরই থাকা চাই। কিন্তু পদ্যের হিসাবে এই সকল কবিতার অপূর্ব সুন্দর ভাষাকে আরও সুন্দর এবং মুগ্ধকর করিয়া তুলিয়াছে শব্দবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ বিস্ময়কর ক্ষমতা। আমি কেবল শব্দের লালিত্য বা মাধুর্যের কথা বলিতেছি না—কাব্যাংশে তাহাদের সার্থকতার কথা বলিতেছি। এ ক্ষমতা যে কেবল রবীন্দ্রবাবুর মানসীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার শৈশব কবিতার ভিতরও ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহার নির্বাচিত শব্দগুলির ভিতর যেন স্বভাবের চিরসৌন্দর্য জাগিয়া রহিয়াছে—প্রকৃতির পূর্ণ-মোহ তাহাদের ভিতর বিদ্যমান। নিকৃষ্ট কবিদিগের বর্ণনার ন্যায় তাহারা নিসর্গের কেবলমাত্র প্রাণহীন ফোটোগ্রাফ বা অন্ধ ছবি নহে। স্বভাবের সমস্ত জীবন তাহাদের অভ্যন্তরে প্রদীপ্ত। পাঠকালে এই শব্দমন্ত্রে আহূত হইয়া পাঠকের হৃদয়ে

আবির্ভূত হয়, কখন বা স্বভাবের উদার, কখনও বা রুক্ষ, কখনও বা বিস্ময়কর দিব্যমূর্তি; এবং কেবল তাহাই নহে। প্রকৃতির সৌন্দর্যরাশি দেখিলে হৃদয় যে অব্যক্ত অধীরভাবে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহাদের ভিতর সেই অব্যক্ত অধীরতাটুকুও ব্যক্ত হইয়াছে। তাহারা কেবল বাহ্যজগতে সৌন্দর্যরাশি আনিয়া পাঠককে উপহার দিয়া ক্ষান্ত হয় না—কবির অন্তর্জগতের আরও মুগ্ধকর বার্তা আনিয়া দেয়—আনন্দ উন্মুখ পাঠকের প্রাণে কবির উপভোগগলিত তপ্তপ্রাণ ঢালিয়া দেয়। এক কথায়, তাহাদের ভিতর যেমন নিসর্গের চির-প্রফুল্ল সৌন্দর্যরাশি বর্তমান, তেমনই তাহারই সংগে সংগে কবি—হৃদয়ের মুগ্ধ উপভোগও বর্তমান।

এই পরিষ্কার ভাষা ও এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাসের উপর আবার আসিয়া পড়িয়াছে, উদ্বেলিত প্রাণের সমুচ্ছ্বাসপূর্ণ, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় মুগ্ধকর, এক অতি আশ্চর্য—অতি অপূর্ব ছন্দের আকুল তরঙ্গ। বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্রবাবুকে ছাড়িয়া দিলে, শব্দ বিন্যাস এবং ছন্দরচনায় রবিবাবু বংগ কবিদিগের শীর্ষস্থানীয়, এবং ভবিষ্যতের চির আদর্শ। এক ছন্দ লইয়াই কবিপ্রতিভার পূর্ণ পরিমাণ লওয়া যাইতে পারে। নিকৃষ্ট সমালোচকেরা ছন্দকে কবিতার বাহ্য-গঠন বা পরিচ্ছদজ্ঞানে তাহাকে নিতান্ত গৌণ বা অপ্রধান স্থান দিয়া থাকে। নিকৃষ্ট কবিদের নিকট ছন্দ ভাবপ্রকাশের নিগড় বা ব্যাঘাত হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। কিন্তু প্রকৃতি কবির হাতে ছন্দ ভাষা অপেক্ষা রসবিকাশের শ্রেষ্ঠতর—যোগ্যতর অবলম্বন। ভাষা যাহা করিতে পারে না, ছন্দ তাহা অনায়াসে করিতে পারে। ভাষা যেখানে যাইতে পারে না, ছন্দের স্বর্গীয় রাগিণী সেখানে ভাবপ্রকাশের পথ অতি সুগম করিয়া দেয়। পদ্য যদি ছন্দোময়ী রচনা হয়, এবং গীতিকাব্য যদি প্রাণের উচ্ছ্বাস হয়, তবে সে উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই তেমন প্রকাশ পায় না, যেমন ছন্দের আকুল হিল্লোলে। প্রথম শ্রেণীর কবিমাত্রেরই ছন্দের উপর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। ছন্দের উপর ক্ষমতা অর্থে আমি বুঝিতেছি না—মাত্রা মিল বা যতি সংস্থাপন সম্বন্ধে শাস্ত্রের

শাসন মানিয়া চলা। এমন অনেক পদ্য আছে, যেখানে সকল নিয়মই সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে—পড়িতে শুনিতেও যাহা বেশ সুমধুর, অথচ ছন্দের যে সৌন্দর্যের কথা আমি বলিতেছি, তাহাতে তাহার কিছুই নাই। সে সৌন্দর্য নিয়মের অধীন নয়, শিক্ষারও আয়ত্ত নয়। গায়কের কণ্ঠের ন্যায় তাহা নিতান্ত স্বভাবের সামগ্রী। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসকে লইয়া যে পুরাতন বিবাদ আছে, এখানে তাহার মীমাংসা হইতে পারে। বিদ্যাপতির ছন্দের উপর এই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে—বিদ্যাপতির গলা আছে। চণ্ডীদাসের নাই। চণ্ডীদাসের ছন্দ বেশ সুন্দর এবং মধুর, বেশ তাললয়বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে বিদ্যাপতির অপূর্ব মোহ নাই। মলয় সমীরণের ন্যায় তাহা হঠাৎ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না, প্রাণকে ভাসাইয়া দেয় না। বিদ্যাপতির বংশীর রবে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, চিত্ত চমকিত হয়, বর্তমান ভুলিয়া গিয়া কোথায় কোন্ দিকে ভাসিয়া যাই।

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

চণ্ডীদাসের এই কয়টি কথায় বিদ্যাপতির সুন্দর কণ্ঠধ্বনি অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বিদ্যাপতির ছন্দের ঘোরও একটু আছে, কিন্তু দেখ, সে আকুলতা এই কয়েক কাতর পদের দীর্ণ বিদীর্ণ মর্মোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া ধুইয়া মগ্ন হইয়া গেল।

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

বিদ্যাপতি সুরে মুগ্ধ করেন, চণ্ডীদাস কথায় মুগ্ধ করেন। কিন্তু সুর লইয়াই ছন্দ এবং ছন্দ লইয়াই কবির কার্য। তাই বলিয়া এমন বুঝিও না, চণ্ডীদাসের সুর নাই বা বিদ্যাপতির কথা নাই।

ছন্দের উপর রবিবাবুর ক্ষমতা বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিদিগের ন্যায়। তাঁহারও ছন্দের সুরে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সুদূর নিকট হয়, নিকট সুদূর হয়। দুই চারিটি পদ্যে চক্ষে জল আসিয়া পড়ে এবং ছন্দের উচ্ছ্বাসের সংগে মর্ম কাঁপিতে থাকে। এই মানসীতে

তাঁহার ছন্দরচনাক্ষমতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি নূতন মিল, নূতন মাত্রা, নূতন পদবিভাগ, যতিসংস্থাপন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নূতন ছন্দ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাংলা ভাষার সুপ্ত অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, এবং আরও বিস্ময়কর ব্যাপার—পুরাতনকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। যুক্তাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার অভিনব ব্যবস্থা সকল স্থানে না খাটিলেও, আমাদের পুরাতন 'আটপৌরে' পয়ার ছন্দের জরাজীর্ণতার ভিতর অনেকটা জীবনী সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাহার সেই অলস নিদ্রাতুর "একঘেয়ে" ভাব বিদূরিত করিয়া, তাহার স্থানে জাগ্রৎ জীবনের সচল ভাব আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই অভিনব বিধানের ভিতর উৎকট কিছুই নাই—ইহা বাংলা ভাষা ও ছন্দের আভ্যন্তরিক ধাতুগত স্বাভাবিক গতির সংগে বেশ খাপ খাইয়া মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত এই কয়টি চরণের যতিবিভাগে এবং বিভিন্ন স্বরের উত্থান পতনে—অথবা জানি না কোন্ নিগূঢ় কারণে,—হৃদয়ের কি ঘোর ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে, যেন আবেগভরা প্রাণের গভীর 'দুরু দুরু' এই ছন্দের তালে তালে স্পন্দিত হইতেছে।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছি গীতহার,
কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,

অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
তোমার মূরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

হাজার কথা দিয়া কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিত না, কোন কালে কেহ যাহা বলিতে পারিবে না, তাহা এই কতিপয় অলংকারশূন্য সাদাসিধা, অতি সরল, অতি সহজ অতি সামান্য পদে কি চমৎকার, কি প্রাণভরা উক্তি পাইয়াছে। জানি না, শেষ চরণ পাঠে চক্ষের উপর কত জন্ম কত যুগ ঘুরিয়া যায়। কত সুদূর বৎসরের বিশাল মেঘরাশি ঠেলিয়া প্রাণ কোথায় ভাসিতে থাকে। অতীতের অনন্ত বিস্তৃতি চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া যায়। কত অন্ধকার কত আলো আসিয়া প্রাণে পড়ে। ইহা অপেক্ষাও মুগ্ধ সুন্দর সুরবিশিষ্ট পদ ও চরণ 'মানসী'তে অনেক আছে। এ স্থলে তাহাদের উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধের শেষ হইবে না। সে যাহা হউক, আমি বলিতে চাহি যে, কবির এই মোহমন্ত্রময় শব্দবিন্যাস এবং অপূর্ব ছন্দ-সৌন্দর্য রসবিকাশে এবং ভাবপ্রকাশে তাঁহাকে অতুল ক্ষমতা দিয়াছে। ইহার দ্বারা সকল ভাব, সকল রসই বেশ পূর্ণ পরিণত অভিব্যক্তি পাইয়াছে। বিশাল সমুচ্চ বা সুগভীর ভাব—মনের ভাষা যেখানে পৌছিতে পারে না—অতি সূক্ষ্ম কোমল মৃদুভাব—কথায় যাহাকে ধরিতে পারা যায় না, হৃদয়ান্তঃপুরচারিণী কল্পনার সেই লাজময়ী কুসুমসুকুমার মূর্তি—ভাষার রূঢ় স্পর্শে যাহা মলিন হইয়া ভাংগিয়া পড়ে, এই সকলই কি চমৎকার, কি অনির্বচনীয় সুন্দররূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। কখন কখন তাঁহার একটি সমগ্র কবিতা এইরূপ একটি ভাবেই পরিপূর্ণ। অথচ তিনি উচ্চ প্রতিভাবলে তাহাদিগকে এমনি কবিত্বময় অথচ পরিচিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, একদিকে যেমন ভাবের নৈসর্গিক গৌরব এবং সুষমা রক্ষিত হইয়াছে, অপরদিকে পাঠকের হৃদয়ে তাহারা শৈশব-সুহৃদের ন্যায় অতি সহজে প্রবেশ লাভ

করে। তাহাতে অপ্রাঞ্জল কিছুই নাই—জটিলতার নাম গন্ধ নাই। মানসীতে এমন অনেক কবিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম এবং শেষ কবিতা দুইটির উল্লেখ করিলাম। "উপহারে" যদিও ছন্দের মোহ বা অপূর্বতা কিছুই নাই, তবু কি সুন্দর সরল ভাব ও ভাষায় কবির সমস্ত জীবন-কাহিনী ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। সে চিত্র যেমন সুন্দর, তেমনি সত্য। কবির প্রাণের সেই দুর্দমনীয় সৌন্দর্য-পিপাসা, সৌন্দর্যকে ধরিবার নিমিত্ত সেই জন্মান্তরীণ আকুলতা, কি অনির্বচনীয় মধুরভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্যকে কে কবে আয়ত্ত করিয়াছে, আয়ত্ত করিয়াই বা কে তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। মনে করি এই বুঝি পাইলাম, পলক না ফেলিতে কই কোথায় আবার উড়িয়া গেল—'আঁখি পালটিতে নাহি পরতীতে যেন দরিদ্রের হেম'—এক যায় আবার শত শত আসিয়া জীবনকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে—প্রাণের ভিতর চিরচঞ্চলতা, সুচির অশান্তি আনিয়া দেয়। দুইটি কথায় ইহার কি সুন্দর ছবিই অংকিত হইয়াছে—"রচি শুধু অসীমের সীমা" এই কয়টি কথায় কবি-জীবনের সমস্ত উন্মত্ত আশা, প্রাণ-ভরা স্বপ্ন, হৃদয়-ভরা আবেগ এবং পৃথিবী-ভরা ব্যথা কি উক্ত হয় নাই ?

গ্রন্থের শেষ কবিতাটিতে প্রেমিকের জীবনরহস্য তেমনি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমের সর্বস্ব ধর্ম ইহার ভিতর উক্ত হইয়াছে। প্রেমিকের সকল কার্য এবং সকল চিন্তার, সকল আশা এবং সকল কল্পনার ভিতর যে প্রিয়জনের মধুর মূর্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার অনন্ত বিশাল হৃদয়াকাশ যে প্রিয়জনের সেই ক্ষুদ্র সুন্দর মুখ-চন্দ্রমার অসীম জ্যোৎস্নায় চির আলোকিত, তিনি তাহার কি সুন্দর বর্ণনাই করিয়াছেন,—

নাহি সীমা আগে পাছে যত চাও তত আছে
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্ব ভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে'।

নিম্নলিখিত কয়টি ছত্রে পুরুষের কল্পনায় idealising প্রেমের অনির্বচনীয় মধুর চিত্র অংকিত হইয়াছে ,—

আমি যা পেয়েছি, তাই   সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন শুধু স্মৃতি   তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।

এই সকলের উপর আবার কি মধুর সুমিষ্ট ছন্দ। সাদাসিধা সহজ কথা, সরল অথচ মধুময় গাঢ় প্রাণ-ভাসান সুর। কোনও কল কৌশল নাই, ভাষা বা ছন্দের কোন কৃত্রিমতা বা জটিলতা নাই, আমাদের ঘরের বাংলা, অথচ কি স্বর্গীয় রাগিণী। যেন শারদ জ্যোৎস্নার শুভ্র সরল আকুল হৃদয়ে শেফালিকা তাহার শুভ্র সরল আকুল প্রাণখানি নীরবে খুলিয়া দিয়াছে।

কিন্তু বিষয় ও ভাবের অভিনব ও প্রগাঢ় মাধুর্যে, এবং ছন্দেরও অভিনব অপার্থিব সুষমায়, 'বর্ষার দিনে' নামক কবিতাটি রবিবাবুর অসাধারণ শক্তির অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তাঁহার অপর সকল কবিতা হইতে এবং তাহা হইলেই বংগ সাহিত্যের অপর সকল্ কবিতা হইতে ইহা পৃথক, এবং বিশেষ আসন পাইবার উপযুক্ত। ইহার মত দ্বিতীয় কবিতা তিনি বা অপর কোন্ বংগ কবি লিখিয়াছেন? বাংলা ভাষায় বা ছন্দে যে এমন মোহিনী আছে বা থাকিতে পারে, তাহা আমি কখনও স্বপ্নে ভাবি নাই. তিনি কেবল তাঁহার সুন্দর প্রতিভা-বলে আমাদের এক 'এই ঘেয়ে' ভাষার অভিনব শক্তি দিয়াছেন, বা তাহার প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য উদ্ভাবন করিয়াছেন। বর্ষার মেঘরুদ্ধ হৃদয় যেন এই কবিতার কাতর ছন্দে বিদীর্ণ হইয়াও হইতেছে না। ইহার প্রত্যেক কথার অন্তরালে প্রাবৃটের চির সন্ধ্যা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, এবং মানব-জীবনের অনিবার্য বিষাদ, সেই বিষাদ, সেই সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে জড়িত রহিয়াছে। এদিকে কি সুন্দর অথচ সহজ ভাব ইহার প্রাণের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। যে সকল কবি বা কল্পনাব্যবসায়ী মানব জীবনের উন্মুক্ত সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন প্রান্তভাগ

বা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রদেশের অপরূপ শোভাবর্ণনে পটু Poe, Baudelair বা Hawthorne—তাঁহাদেরও কবিতা বা রচনার ভিতর এমন কোন অপার রহস্যময় গোধূলির ছায়া দেখি নাই, এমন পবিত্র অপার্থিব বিষাদ দেখি নাই। ইহার সুন্দর ছন্দের কাতর মন্থর গতিতে সন্ধ্যার হৃদয়-ধ্বনি অনুভূত হয়, এবং তাহার আলুলায়িত কেশের শিথিল অন্ধকার উহার প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া আছে।

মানসীর উত্তরার্ধে মিত্রাক্ষর পয়ারে যে সকল কবিতা আছে (মেঘদূত, অহল্যা-বিদায়) তাহাদেরও ঠিক এইরূপই প্রশংসা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক এই সকল কবিতায় রবীন্দ্রবাবু বাংলা পয়ারকে নূতন করিয়া গড়িয়াছেন, তিনি তাহাকে অভিনব জীবন প্রদান করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত তাঁহার নিজের সামগ্রী। তাঁহার পূর্বে কোন বংগীয় কবি এইরূপে পয়ার রচনা করেন নাই। তাঁহার হস্তে ইহা এক অপূর্ব জীবন্ত দর্পিত গতি লাভ করিয়াছে। কবিতার তীব্র স্রোতে একটী চরণ কেমন আর একটীর উপর তরংগায়িত হইয়া উছলিয়া পড়িয়াছে! চরণের উপর চরণের এইরূপ উচ্ছ্বাসকে ফরাসী ভাষায় আঁজাঁবমাঁ (enjambement) বলে। বাংলায় যেমন এই চতুর্দশমাত্রাত্মক পয়ার, ইংরাজীতে সেইরূপ আয়াম্বিক পেণ্টামিটার (Iambic Pentameter) এবং ফরাসী ভাষায় আলেকজাঁড্রিন্ (Alexandrine)। এই তিন ভাষাতে এই তিন অতি প্রাচীন এবং সাধারণ ছন্দ; এবং তিন ভাষাতেই এই তিন ছন্দের প্রতি চরণের অন্তে-যতি স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম। আধুনিক কালে ভিক্টর হুগো আলেকজাঁড্রিন্-এর এই নিয়মের নিগড় খুলিয়া সাহিত্য সমাজে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল দাঁড়াইয়াছে যে, ফরাসী ভাষায় অমিত্রাক্ষর না থাকিলেও এই শৃংখল মুক্ত আলেকজাঁড্রিন্ সর্বতোভাবে ইংরাজী অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাধীনতা, সৌন্দর্য এবং বাক্‌পটুতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ভিক্টর হুগোর বহু পূর্বে এই আঁজাঁবমাঁ কখন কখন ব্যবহৃত হইত।

রবীন্দ্রবাবুই কিন্তু এই প্রথমে বাংলা মিত্র পয়ারের পায়ের বেড়ী খুলিয়া দিলেন, এবং তাহাতে যে বাংলা সাহিত্যের বল এবং সৌন্দর্য কতদূর বর্ধিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রতিভার বিক্রম। ইহার এই মিত্রাক্ষর পয়ার পড়িয়া ইংরেজী পেণ্টামিটার-এর শীর্ষস্থানীয় শেলির এপিসাইকিডিয়ন (Episychidion) মনে পড়ে। ইংরেজী সাহিত্যেও উচ্চ শ্রেণীর কবি ভিন্ন মধ্য বা নিকৃষ্ট কবিদিগের লেখায় এরূপ পয়ার দেখিতে পাইবে না। পোপ বা ড্রাইডেন-এ ইহা নাই, কিন্তু শেলি এবং কীট্‌স্‌-এ ইহা বহুল পরিমাণে দেখিবে।

উপরি উক্ত 'অহল্যা' নামক কবিতা এমন বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ—ইহার ভিতর জড়জগতের সহিত এমন একটী অসীম ধাতুগত সহানুভূতি রহিয়াছে যে, বোধ হয় যেন, Walt Whitman-এর সৃষ্টি বিশাল প্রাণ Shelleyর অমর বীণা লইয়া ঝংকার করিতেছে। যে সকল অন্ধ এবং বধির পাঠক রবিবাবুকে তাঁহার সেই অপোগণ্ড কালের কবিতাসমূহের মধ্যেই চিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই অহল্যার প্রকাণ্ড কল্পনার পরিচয় লইতে বলি। তাঁহাদের সংকীর্ণ হৃদয়ে অহল্যার সেই "নেত্রহীন মূঢ় রূঢ় অর্ধ জাগরণের" বিশাল চিত্র কি স্থান পাইবে? তাঁহার কি উদার মহত্ত্ব এবং মাধুর্যপূর্ণ ভাষা! কি স্নেহপ্রীতিময়ী কল্পনা—উষার ন্যায় সরল শুভ্র আলোকময়ী দৃষ্টি। তাঁহার কবি-হৃদয়ে বিশ্বব্যাপিনী করুণা—এ সকলের আদর না দেখিলে মর্মে মরিয়া যাইতে হয়।

মানসীর 'বিদায়' নামক কবিতার পূর্বার্ধে বিদায়মান দিবসের বিষণ্ণ আলোক জড়িত রহিয়াছে, অপরার্ধে সন্ধ্যার শিথিল হৃদয়ের আকুলতা এলাইয়া পড়িয়াছে। শেষ কয়েকটি চরণে আকাশ, সাগর এবং সাগরতীরের উল্লেখে বোধ হয়, যেন কোন সুদূর অপরিচিত দেশে কোন সীমাহীন শূন্য প্রান্তরের ভিতর সন্ধ্যার বিশাল বিজনতার মধ্যে আত্মহারা হইয়া ভাসিতেছি,—মাথার উপর সন্ধ্যাতারা কেবল তাহার শুভ্র বিমল দীপ্তি বর্ষণ করিতেছে। জীবনের একটি ক্ষণিক বিদায়ের বিরহ-বিষাদে থাকিয়া, কবি প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে মহাবিদায়ের

সম্ভাষণ করিতেছেন। এ বিরহ-প্রেমিকের বিরহ এবং কবির বিরহ। ইহারই অধীনে প্রেমিক কবি দেখিয়াছিলেন, "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে"। তাই সুদূরে প্রবাসে থাকিয়া কবি বলিতেছেন,

অকূল সাগর মাঝে চলেছে ভাসিয়া
জীবন-তরণী। ধীরে লাগিছে আসিয়া
তোমার বাতাস, বহি' আনি' কোন্
দূর পরিচিত তীর হ'তে কত সুমধুর
পুষ্পগন্ধ, কত সুখস্মৃতি, কত ব্যথা,
আশাহীন কত সাধ, ভাষাহীন কথা।
সম্মুখেতে তোমার নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুবতারাসম ; সেই অনিমেষ
আকর্ষণে চলেছি কোথায়, কোন্ দেশ
কোন্ নিরুদ্দেশ মাঝে !

এবং বিশ্বচরাচরের সুন্দর উদার বিষণ্ণ পদার্থের সহিত আপনার স্মৃতি বিজড়িত রাখিয়া প্রেমাস্পদের নিকট ভবিষ্যৎ চিরবিদায় গ্রহণের কথা উত্থাপন করিতেছেন। প্রকৃতির হৃদয়ের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত এমন কবিতা খুবই বিরল। ইহাতে যেন জড়-জগতের অব্যক্ত মায়া পড়িয়া রহিয়াছে। পড়িলে বোধ হয়, যেন প্রকৃতির কোন মহান্ বিশাল রাজ্যের ভিতর দিয়া চলিতেছি, যেন উদার বিস্তৃত সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের অবসাদ বিদূরিত করিতেছি,—যেন সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান ক্লান্ত ম্লান হৃদয় প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন বিজনতার মধ্যে কি এক পবিত্র অথচ বিষাদপূর্ণ শান্তি উপভোগ করিতেছে, যেন হৃদয়ের সম্মুখে অনন্তের মহারাজ্য খুলিয়া গিয়া, কোথা হইতে এক মহান্ অথচ নিরুদ্দেশ উদ্দেশ্য আসিয়া প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

সকল দেশেরই সাহিত্যে প্রেম-কবিতার দৌরাত্ম্য একটু বাড়াবাড়ি। আমাদের দেশে ত কথাই নাই। এখানে বাগ্দেবীর বন্দনা শেষ না হইতেই, পঞ্চবাণের ষোড়শোপচারে পূজা। কিন্তু সুস্থ সুন্দর সরল

কৃত্রিমতাহীন অথচ প্রেমের মধুর উন্মাদনায় পরিপূর্ণ, এমন কয়টি কবিতা আছে? বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে প্রকৃত প্রেমের আকুলতা ও গভীরতা পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও, তাঁহাদের ভিতর অসীম বিস্তৃতির ভাব নাই। তাঁহাদের গান প্রায় একই কথায় পরিপূর্ণ, কিন্তু এক কথা হইলেও তাহা হৃদয়ের কথা এবং প্রগাঢ় অনুভবশক্তির পরিচায়ক। তাহা ছাড়া তাঁহাদের ভিতর অপ্রাকৃত কিছুই নাই, সেইজন্য একঘেয়ে হইলেও তাহারা চিরজীবনে জীবিত। কিন্তু মানসীর প্রেম-কবিতাগুলি কতই বিচিত্রভাবে পরিপূর্ণ, কত দিক্ হইতে কত বিভিন্ন অবস্থায় কবি প্রেমকে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা না কেবলমাত্র শরীরের মরুময় নিকৃষ্ট লালসায় জর্জরিত বা পীড়িত, না অপ্রেমিকের মিথ্যা আধ্যাত্মিকতার আড়ম্বরময় অহংভাবে স্ফীত বা বর্ধিত দেহ। তাহার ভিতর 'ছিব্‌লেমি' চটুলতা কিছুই নাই, কিন্তু অতল মানব-হৃদয়ের মর্মোচ্ছ্বাস আছে। মানবজীবনের পূর্ণ প্রদীপ্ত আকাংক্ষায় তাহারা জীবিত উন্মত্ত আকুল। বাস্তবিক মানুষের সমুদয় হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেমের যেমন শ্রেষ্ঠতা, তেমনই সকল কবিতা বা গানের মধ্যে প্রেমকবিতার শ্রেষ্ঠতা। সর্বতোভাবে সুন্দর প্রেম-গীতি বড়ই বিরল। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিরাই ইহার চরম সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের পরিসর ক্ষুদ্র হইলেও, তাঁহারা তাহারই মধ্যে কবিত্বের যথেষ্ট উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় সকল প্রেম-কবিতাগুলি সর্বতোভাবে সুন্দর, সেই ছেলেবেলার "বলি ও আমার গোলাপবালা" হইতে আজিকার এই মানসীর "আমার সুখ" পর্যন্ত, তাহাদের কোথাও ভাব, ভাষা বা ছন্দে একটুও খুঁত নাই।

মানসীর গোড়ার দিকের প্রেম কবিতাগুলির ভিতর নবীন প্রেমের প্রথম বিরাগ ও বিরহের সুন্দর মোহ এবং জ্বালা—উপভোগ এবং অধীরতা—হর্ষ এবং বিষাদ, কি সুন্দর ছন্দেই বর্ণিত হইয়াছে। "বিরহানন্দ," "ক্ষণিক মিলন" প্রভৃতির ছন্দ, কবি দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিকট ধার করিয়াছেন বটে—কিন্তু প্রথম দুইটি কবিতার অমৃত-মধুর ছন্দ তাঁহার নিজের রচিত।

গ্রন্থের শেষের দিকে কবিতাসমূহে যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ণ, উন্নত এবং গভীর। সে প্রেম পরিণত মানব জীবনের প্রেম। ইহাতে মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক্ স্ফূর্তি এবং বিকাশ আনিয়া দেয়। ইহাতে সংকীর্ণ হৃদয় বিস্তীর্ণ হয়, ক্ষুদ্র হৃদয় উন্নত হয়, অলস হৃদয় উদ্যমে জাগ্রত হয়। এক কথায় ইহা প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ উভয়েরই মুক্তি সাধন করে।

গ্রন্থের দুই দিকের প্রেম-কবিতাগুলির ভিতর যেমন ভাবগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, তেমনই আবার তাহাদের ছন্দ ও গঠনের বিভিন্নতা আছে। পূর্বদিকের কবিতাগুলির ছন্দের বেশ চটক আছে। তাঁহাদের মাধুর্য মদিরতামিশ্রিত, পাঠককে ক্রমশ ক্লান্ত করিয়া আনে। অপরার্ধের কবিতাগুলির মধুরতার ভিতর নিসর্গের মহৎ বস্তুর উদারতা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহাদের সৌন্দর্য-উপভোগে প্রাণ উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। প্রথমার্ধ বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ব্যস্ত, অপরার্ধ সাগরোর্মির মধুর, উদার নির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে।

"ধ্যান" নামক কবিতাটির সুন্দরভাব কেবলমাত্র আমাদেরই দেশের ভিতর বদ্ধ না থাকিলেও, অনুভবের গভীরতায় **Hugo** বা **Shelley**র শ্রেষ্ঠতম রচনার সমান।

"তোমায় পাইনে কুল
আপনা মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাইনে তুল।
উদয় শিখরে সূর্যের মত
সমস্ত প্রাণে মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত
একটী নয়ন সম;
অগাধ অপার উদাস সৃষ্টি
নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার;
আমি যেন এই অসীম পাথার,

আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দ পূর্ণিমা !
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিগদিগন্তে
তুমি আমি একাকার !"

কৈ Hugo বা Shellyর ভিতর এমন সুন্দর পরিপূর্ণ কবিত্বের আকুল উচ্ছ্বাস দেখি নাই।

মানসীতে এখনও নানাবিষয়ক কত কবিতা আছে যাহাদের এ পর্যন্ত নাম উল্লেখ করিতে পারি নাই। তাহাদের ভিতর অনেকগুলিই উপরে সমালোচিত কবিতা সমূহের ন্যায় সুন্দর। যে কবিতার ভিতর এমন অতুলনীয় শ্লোক আছে, তাহার সম্যক্ প্রশংসা করিতে গেলে "ভাষা" মৌন হইয়া পড়ে।

"আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক তাই তাই, তার বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেংগে যায় পাছে !
এত মৃদু এত আধো, অশ্রুজলে বাধো বাধো
সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বলো না তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে !"

যে সকল পাঠক মানসীর অপর কোন অংশ বুঝিতে বা তাহার সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও "নব বংগদম্পতির প্রেমালাপে"র রহস্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। "নিস্ফল উপহারে"র বাঁধাবাঁধি ছন্দ, নিয়ন্ত্রিত রচনা, এবং ভাবের শাসন, বংগসাহিত্যে অদ্বিতীয়। "দুরন্ত আশা"র তীব্র দুরন্ত কষাঘাতে বাংগালী ভিন্ন অপর সকল জাতির মনে লজ্জা বা ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। তাহাতে যে বেদুইনের বর্ণনা আছে, তাহা কোন্ শ্রেষ্ঠ কবির না উপযুক্ত ? "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম করিতে পান"—ওমর খায়্যামের যোগ্য—

সহসা শুনিলে তাঁহারই কথা বলিয়া ভ্রম হয়। "সুরদাসের প্রার্থনা"য় সৌন্দর্য-বিধুর প্রেমবিহ্বল কবিহৃদয়ের কি সুন্দর কাতর চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। দুই বন্ধুকে লিখিত দু'খানি পত্রের ভিতর বন্ধুহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা কবিতার স্রোতের সংগে কেমন সুন্দর মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে, ইহাদেরও ভিতর স্বভাব বর্ণনে কবির স্বাভাবিক মোহমন্ত্র পরিস্ফুট ;—

"যেন রে সময় টুটে, কুমুদ আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল !"

এই কয়টি কথায় যেন ভরা শ্রাবণের মেঘ-স্নিগ্ধ হৃদয়ের আলোক ও ছায়া, সৌরভ এবং শ্যামকান্তি প্রাণে আসিয়া পড়ে।

"নারীর উক্তি" এবং পুরুষের উক্তি" ভাল হইলেও আদর্শের উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমটির আরম্ভ অবিকল Browning এর মত হইলেও, পরে তাঁহার অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তির কিছুই দেখিলাম না। Browning এর কথার ধারই ইহাতে নাই, এবং ইহার ভিতর মানবজীবনের কোন রহস্য উদ্ভাবিত হয় নাই। "পুরুষের উক্তি"তে কিন্তু একটি বেশ গভীর সত্য প্রকটিত হইয়াছে।

"কেন তুমি মূর্তি হয়ে' এলে,
রহিলে না ধ্যান-ধারণার !
সেই মায়া-উপবন, কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার !"

তাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অসীম সুন্দর গদ্য কাব্যের নায়িকা 'নায়কের সহিত কেবল মাত্র এক রাত্রি প্রেম সম্ভোগের পর চিরকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া বলিয়াছেন ;—"তোমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার নিকট আসিবার জন্য নিয়তই তাহার পক্ষ সঞ্চালন করিবে। আমি তোমার চিরবাঞ্ছিত হইয়া রহিব। তোমার লুব্ধ কল্পনা আমাকে পাইবার জন্য অনুদিন উৎসুক থাকিবে।"—(Mademoiselle or Maupin)। "শূন্য গৃহে" এবং "জীবন মধ্যাহ্ন" দুইটিই আমাকে বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহাদের ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য এবং ভাবের

গাম্ভীর্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী। নিম্নলিখিত শ্লোকের করুণ রস কি সরল সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইয়াছে ("কাল ছিল প্রাণ যুড়ে···হেন বজ্রপাত") "তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়ে লাগে"—সৌন্দর্যে ইহা Tennyson এর "Star to star vibrates light"এর অপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন নহে। "জীবন মধ্যাহ্নে"র ন্যায় দ্বিতীয় কবিতা বাংলা ভাষায় দেখি নাই। ইহা সুন্দর ধর্মভাবে পরিপূর্ণ, এবং পূর্ণ প্রাণের উক্তি। ইহাতে কোনরূপ ভান বা আড়ম্বর, কোনরূপ ভংগি বা ভেংগান নাই। হৃদয়ের যথার্থ ভাবই যথাযথ চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক একটি উপমা অতি মনোহর :—

"লজ্জা বস্ত্র জীর্ণ শত ঠাঁই।"

—"শস্যশীর্ষরাশি

ধরার অঞ্চলতল ভরি,'—"

আর দুইটি কবিতার উল্লেখ করিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ করিব। "নিষ্ফল কামনা" একটী নিতান্ত অভিনব পদার্থ। আমাদের ধারণা ছিল যে, বাংগলা ভাষায় অমিত্র ছন্দে এমন কবিতা রচিত হইতে পারে না। মিলের অভাবে তাহা নিতান্ত শোভাহীন ও শুনিতে নিতান্ত শ্রুতিকঠোর বোধ হইবে। কিন্তু রবিবাবু দেখাইলেন যে, এইরূপ মাত্রাবিভাগে বেশ সুন্দর অমিত্র ছন্দ রচিত হইতে পারে। "উচ্ছৃঙ্খল" নামক কবিতাটির ভিতর কি চমৎকার, কি সুন্দর, কি কারুণ্যপূর্ণ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

উপসংহারে কি বলিতে হইবে যে, মানসীর কবিতাগুলি ভাব-প্রধান না বস্তুপ্রধান? তাহারা কোন্ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, এবং তাহাদের ভিতর কবি কি গুপ্ততত্ত্ব নিহিত করিয়াছেন? অতি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, আমরা এ সকল বিষয়ে কিছুই জানি না, এবং জানিতেও চাহি না। কেবল এই মাত্র জানি যে, সৌন্দর্য-অনুভবে তাহাদের জন্ম, এবং সুন্দর অভিব্যক্তিতে তাহাদের বিকাশ। যেখানে এই দুইটি আছে, সেখানে অপর সকলেই আছে বা আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। আমার যতটুকু রসাস্বাদনশক্তি আছে, তাহাতে

আমি নিঃসংশয়ে নির্দেশ করিতে পারি যে, মানসীতে সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হইয়াছে। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাব্য। প্রথম শ্রেণীর কাব্যের এই এক অসাধারণ গুণ যে, তাহার সহিত কাহার কোন বিবাদ বিসম্বাদ থাকিতে পারে না, সকল শ্রেণীর লোক তথায় স্থান পাইতে পারে। তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই বলিয়া, সকল সম্প্রদায় তাহার উদার সৌন্দর্যের অসীমতার ভিতর মিলিত হইতে পারে। সে কবিতা বিষয় অনুসারে বস্তুগত বা ভাবগত। তাহার সৌন্দর্য যেমন অনুভবে, তেমনি অভিব্যক্তিতে,—যেমন কল্পনায়, তেমনি রচনায়—যেমন অন্তর্দৃষ্টিতে, তেমনি বহির্দৃষ্টিতে। মানসীর ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা পাঠে হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বচরাচরে ছড়াইয়া পড়ে—সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়—ব্যাকুল প্রাণ জগতের মাঝখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিয়া জগৎসংসারের মাঝে সংসার রচনা করে, এবং সমস্ত মানব হৃদয়ের সহিত মিলিত হয়। আবার এমনও কথা আছে যে, হৃদয় নিজের প্রচ্ছন্নতর অন্তঃপুরমধ্যে সেই একই কথার ধ্যানে নিমগ্ন হয়। বিশ্ব তখন বিলুপ্ত—জগৎ-শূন্য। প্রাণ-প্রাণেরই ভিতর প্রবিষ্ট ও আপনাতে আপনি বিভোর। এইরূপে মানসীতে পূর্ণতম সৌন্দর্য, উচ্চতম কবিত্ব, এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। সত্যই ইহা "শ্রেষ্ঠতম প্রাণের বিকাশ", বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন, এবং কাব্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই আদরের বস্তু।

(সাহিত্য, ১৩০০)

বীরাংগনা

বীরেশ্বর গোস্বামী

(১)

রোমীয় সাহিত্যে ওভিডের অতুল প্রতিপত্তি। ইহার কারণ, তাঁহার অনুপম কাব্য "মেটামর-ফোসিস্", বস্তুত বর্ণনার সজীবতায় ও ওজস্বিতায়, মাধুর্যে, রচনা কৌশলে ও কল্পনার দূরগামিতায়, শুধু রোমীয় সাহিত্যে কেন, ইহা সমগ্র কাব্যজগতে দুর্লভ। সকল দেশের পুরাণ ও ধর্মেতিহাস যেরূপ মনোহর কবিকল্পনা ও দুর্বোধ্য রহস্যে জটিল, বলা বাহুল্য, রোমীয় পুরাণও তদ্রূপ। এই পুরাণ কাহিনীর উপন্যাসভাগের উপরই এই কাব্যের ভিত্তি; ঐ কাহিনীগুলির মূল ঘটনা লইয়া পত্রাকারে এই কাব্য রচিত। পত্রগুলি কাব্যের বিভিন্ন নায়িকা কর্তৃক লিখিত, এরূপ কল্পিত হইয়াছে। কোন পত্রে প্রেতপতি প্লুটোর রাজ্য 'হেডিস' হইতে, বিখ্যাত ট্রয়যুদ্ধের মূল কারণ লোক-ললামভূতা হেলেন নিজ দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন, কোন পত্রে সুধী রাজা ইউলিসিস্ "শ্রান্তিহীন কর্মসুখ তরে" লালায়িত হইয়া তাঁহার তৎকালিক অলস জীবনের জন্য আক্ষেপ করিতেছেন, কোন পত্রে বা প্যারিস-পরিত্যক্তা বিয়োগ-বিধুরা দেবকন্যা ইনোনি নিজ শোকগাথায় আইডার শৈলমালা বিগলিত করিতেছেন ও পরে তাঁহার সপত্নী ভাগ্যবতী হেলেনকে অভিশাপ দিয়া প্যারিসের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন; এইরূপ পত্রের পর পত্রে এই কাব্য গ্রথিত হইয়াছে। ইউরোপে অনেক পরবর্তী কবিও এই কাব্যের ছায়া লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে রাজকবি টেনিসনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ও এই কাব্যের অনুকরণে এক কাব্যরত্ন বংগীয়-সাহিত্য-ভাণ্ডারে প্রদান

করিয়াছেন। সেই কাব্যই বর্তমান প্রবন্ধের সমালোচ্য বিষয়। অনুকরণ বলিয়া যে এ কাব্যের মর্যাদা কমিয়াছে, তাহা আমরা বলিতেছি না। এই কথার সমর্থনে বলা যাইতে পারে, জগতের সাহিত্যে দুইখানি অতুলনীয় কাব্য, একখানি অন্যখানির অনুকরণ! (১) অনুকরণ, প্রতিভাশালী লেখকের হস্তে অপূর্ব আকার ধারণ করে। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, কোনও বহুকাল-বিস্মৃত প্রবাদ বা কোনও তৃতীয় শ্রেণীর কবির অপাঠ্য কবিতার উপাখ্যান ভাগ লইয়া, বিশেষত ঐতিহাসিক নাটকগুলি প্লুটার্কের "জীবনী" অবলম্বনে মহাকবি সেক্সপীয়র স্বীয় অমর নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌতূহলী প্রত্নতত্ত্বান্বেষী বা নীরস ঐতিহাসিক ছাড়া প্লুটার্কের চর্চা আর বড় কেহ করেন না। এই অর্থে সেক্সপীয়র অমর, এবং প্লুটার্ক বহুদিন মৃত। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্কট, লিটন, ডিকেন্স প্রভৃতি, ও জগতের সাহিত্যে যাঁহারা লীলাময়ী প্রতিভাবলে ঐতিহাসিক ও সমালোচকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের সম্বন্ধেও একথা বেশ খাটে। তবে অনুকরণের দোষও আছে। সে দোষ বীরাংগনা কাব্যে নাই, একথা বলি না। হয়ত এমন হয়, যে কাব্যের অনুচিকীর্ষু কবি স্বীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন, সেই "সময়"টা অনুকৃত কাব্যে ঢুকাইলে অসংলগ্ন হয়। হয়ত এরূপ ঘটে, মূল কবি ও লেখক স্বীয় গ্রন্থে নায়ক নায়িকার যে উক্তি, বা তাঁহাদের কথোপকথনের ভাব, বা তাঁহাদের যেরূপ পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, অনুকারী কবিও অনুকরণ করিতে গিয়া, আপনার নায়ক-নায়িকাকে সেই পরিচ্ছদ ও সেই ভাষা দিয়া এরূপ দোষে পতিত হইয়াছেন। যাঁহার কাব্য এই প্রবন্ধের সমালোচ্য, তাঁহার "মেঘনাদ বধ"—কাব্য পাঠ করিয়া আমাদের এইরূপ ধারণা হয়। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদিও কবি হিন্দুকুলসূর্য রামচন্দ্রকে

---

(১) মহাভারত যে রামায়ণের অনুকরণ, তাহা ইউরোপে অধ্যাপক মোক্ষমুলার, ল্যাসেন, উইলিয়ম আর্জিও এদেশে বঙ্কিমবাবু, পূর্ণবাবু প্রভৃতি বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, একথা পাঠকের অবিদিত নহে। লেখক।

হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন, কিন্তু সেই পরিচ্ছদ হইতে কোট-প্যাণ্টালুন যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। (২) এরূপ হইতে পারে, কারণ তখন হয়ত কবি মিণ্টনের "সয়তান পক্ষপাতিত্ব" স্মরণ করিতেছিলেন। এই দোষ বীরাংগনা-কাব্যের ও উপাখ্যান-ভাগ ও রচনা-কৌশলে পাওয়া যায়। ডেভিড যখন রোমীয় সাহিত্যে অভ্যুদিত হয়েন, তখন রোম সাম্রাজ্যের বড় সুখ-সমৃদ্ধির সময়। তখন সাম্রাজ্যের পুন প্রতিষ্ঠাতা বীরকেশরী অগষ্টাস্ সীজর্ সিংহাসনে সমাসীন। সাহিত্য, বাণিজ্য, ধনাগম, সকল দিকেই রোমসাম্রাজ্য তখন চরম-সীমায় উপস্থিত। তখন লিভি-প্রমুখ ঐতিহাসিকবৃন্দ, বর্জ্জিল-হোরেস্—ডেভিড প্রমুখ কবিগণ রোমীয় সাহিত্য সমলংকৃত করিয়া-ছিলেন; এগ্রিপা-প্রমুখ সুযোগ্য সৈন্যাধ্যক্ষ সমূহে রাজ্যের সৈন্যবল পরিবর্ধিত হইয়াছিল। সাহিত্য যদি সাময়িক সমাজের উন্নতি বা অবনতির নিদর্শন হয়, তবে ওভিডের নায়ক-নায়িকাদের পত্র লিখিবার ক্ষমতা কল্পনা করা অন্যায় বোধ হয় না, কারণ কাব্যের বর্ণনীয় সময়ে ও তাহার বহুপূর্বে, স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপিও অতিদূরদর্শী সমালোচক Dr. Bayne, Steadman প্রভৃতিও ইহাতে কবিকে দোষ দিয়া থাকেন। বীরাংগনা কাব্যের নায়িকারা যে এরূপ কল্পিত হইয়াছে, ইহা উপাখ্যান ভাগের দোষ বলিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল ও মালতীমাধব ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্যে—যে সাহিত্য হইতেও যে সব চরিত্রের অনুকরণে কবি বীরাংগনা কাব্য লিখিয়াছেন, সে সাহিত্যে কোন নায়িকা পত্র লেখে, এরূপ বোধ হয় না। কাব্যের শীর্ষদেশে সাহিত্যদর্পণ হইতে কবি যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থিত হয় না, কারণ যে "সময়" কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়, সে সময়ের তুলনায় সাহিত্যদর্পণ সম্পূর্ণ আধুনিক বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হয় না। এই জন্য উপাখ্যান ভাগের রচনাকৌশলে আমরা দোষারোপ করিতেছি।

(২) তাঁহার "বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

(২)

কিন্তু কাব্যের উপাখ্যান-ভাগ ছাড়িয়া যখন চরিত্র-চিত্রণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন কবির প্রতিভার অলৌকিকী ক্ষমতা আমাদের চক্ষে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। যদিও কাব্যের সকল নায়িকা-চরিত্র কবির মূল সৃষ্টি নহে, তথাপি যেমন বিশাল প্রকৃতি-রাজ্যের অপূর্ব কুহকী বহুরূপী যে স্থান দিয়া গমন করে সেইরূপ বর্ণ ধারণ করে, এক মূলচরিত্রও বিভিন্ন কবির হস্তে পড়িয়া বিভিন্নাকার ধারণ করে, কারণ কাব্যগত নায়ক-নায়িকাচরিত্র এক হইলেও, সকল কবির প্রতিভার মূল তত্ত্ব এক নহে। জগতের সাহিত্যালোচনায় সমালোচকেরা এই তত্ত্বেই উপনীত হন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কাব্যের শকুন্তলা-চিত্রের আলোচনা করিব। এই চরিত্রের মূল সৃষ্টিকর্তা ব্যাস—কিন্তু আর দুইজন প্রতিভাশালী কবি এই চরিত্র নিজ কাব্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; একজন সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাস; অপর বংগের কবিবর মধুসূদন। দুইজনের চিত্রই মূল সৃষ্টিকারের চিত্র হইতে উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু কবিত্রয়-বর্ণিত তিনটি চিত্রই এক হইয়াও, প্রতিভাবৈচিত্র্যে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যাসের চিত্র মধুসূদনের চিত্র হইতে যত বিভিন্ন, কালিদাসের চিত্র হইতে কিন্তু তত নহে। ব্যাসের শকুন্তলা মুখরা, গর্বিতা; প্রেমিকা হইলেও, সেই প্রেমে মহত্ত্ব বা ঔদার্য কিছুই নাই। এই শকুন্তলা সরলা ঋষিকুমারী হইলেও, সংসারাভিজ্ঞা। রাজসভায় তাহার ব্যবহার অভদ্রোচিত ও সামান্যা নারীর ন্যায়। ব্যাস-বর্ণিত শকুন্তলা বায়রণের নায়িকাগুলির ন্যায় ও রবীন্দ্রনাথের বিক্রম-চরিত্রের ন্যায়। যখন ভালবাসে, তখন পৃথিবীর সর্বস্ব ভুলিয়া ভালবাসে, কিন্তু প্রেমের পাত্র যদি দুর্ভাগ্যবশত কোনও অনুচিত কার্য করিয়া তাহার বিষ নয়নে পতিত হয়, তবে সে ভালবাসা ঘোরা দানবীর ঘৃণায় পরিণত হয়। ইহা তেজস্বিনী-নারী-প্রকৃতি হইতে পারে, কিন্তু মহীয়সী, সরলা, প্রেম-সর্বস্বা, সংসারানভিজ্ঞা ঋষিকুমারী-চিত্র

নহে। কালিদাস-বর্ণিত শকুন্তলা-চরিত্র আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিয়াছি, এখানে এইমাত্র বলা প্রয়োজন যে, কালিদাসের শকুন্তলা-চিত্র আদর্শ করিয়া সম্ভবত আমাদের বংগীয় কবি নিজ নায়িকাচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। উভয় কবির চিত্র দুইটি প্রায় এক হইয়াছে—সম্পূর্ণরূপে নহে। কালিদাসের শকুন্তলা সরলা, পতিপ্রাণা অথচ মহীয়সী, শম-প্রধানা, মনে হয় যেন তপোবনে কণ্ব-কর্তৃক লালিত পালিত হইলেও অগ্নিগর্ভ শমী-বৃক্ষের ন্যায় ক্ষত্রিয় রমণীর তেজ তাঁহাতে অন্তর্নিহিত। তাঁহার প্রতি বাক্যে, প্রত্যেক ব্যবহারে, বিশেষত রাজসভায় এই মহত্ত্ব ও তেজ সম্যক্ প্রকাশিত। রাজা যখন তাঁহাকে সর্বসমক্ষে প্রত্যাখ্যান করিলেন তখন শকুন্তলার, রাজার জন্য যত দুঃখ, নিজের জন্য তত নহে,—কারণ তাঁহার বিশ্বাস, পরিণীতা পূর্ণগর্ভা পত্নীকে সভামধ্যে কুবাক্য বলিয়া রাজা ক্ষত্রিয়-বীরোচিত ও রাজোচিত ব্যবহার করেন নাই। দুষ্মন্ত যে বিনা দোষে, প্রকাশ্য রাজসভা মাঝে, পারিষদগণের সম্মুখে শকুন্তলার সতীত্বে সন্দেহ করিলেন, এইজন্য রাজার উপর তাঁহার বড় ক্রোধ হইল—নির্দোষী সাধুর যেমন চৌর্যাপবাদে ক্রোধোৎপত্তি হয়। কবি মধুসূদনও এইরূপ চিত্র অংকিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের অতুলনীয় চিত্রের সমক্ষে সে চিত্র তত ভাস্বর নহে। কবি মাইকেলও তাঁহার শকুন্তলাকে প্রেম-প্রাণা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে প্রেমে ধৈর্যবল নাই—যাহাতে প্রেমের অর্ধেক মহত্ত্ব। এইজন্য বিয়োগবিধুর বালা "দূর বনে পবন-স্বননে" "মদকলকরী"-বোধ, প্রতি বৃক্ষপত্র-মর্মরে প্রিয়ের আগমনবার্তা, "আকাশে ধূলিরাশি" সমুত্থিত দেখিলে দুষ্মন্তের সেনাগমের আশায় বুক বাঁধিয়া, শেষে হতাশ হইয়া ক্রন্দন করেন। এইরূপ মিলন-ব্যাকুলতা কবি মেঘনাদবধ কাব্যে প্রমীলা-চরিত্রে দেখাইয়াছেন, কিন্তু সে চরিত্র যে মহত্ত্ব ও তেজে বিজড়িত, শকুন্তলায় তাহার অভাব। পাছে প্রিয় কর্তৃক উপেক্ষিত হন এই ভয়েই, আহা, কোমলহৃদয়া বালিকা মৃতপ্রায়। তবে একথা আমরা

বলিব যে, আলংকারিক-নির্ধারিত* "মুগ্ধা নায়িকার" লক্ষণ মাইকেলের শকুন্তলা যতটা সার্থক করিয়াছেন—কালিদাসের সেরূপ নহে।

দ্বিতীয়, তারা-চরিত্র। পুরাণের একটি অশ্লীল উপাখ্যান লইয়া এ পত্র লিখিত। অন্যে যেরূপ মনে করুন, আমরা এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সমর্থন করিতে পারিব না। আমরা ইহাকে কোন দুশ্চরিত্রা রমণীর কুপ্রণয়পত্র বলিব। জানি না, এই পৌরাণিক উপাখ্যানে কোন্ আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত আছে। সে বিচার করিবার ক্ষমতা আ[illegible]দের নাই—"আর্যামি"-রোগগ্রস্ত মহাশয়েরা তাহা করিবেন। [illegible]দো সৎসাহিত্যে কুরুচির সমর্থক নহি। এ পত্রে স্থানে স্থানে [illegible]ৎ উদ্বেগ প্রাংজলতার অভাব। ছেকানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস, ইত্যাদির ব্যব[illegible] কালিদাস, জয়দেব ও শ্রীহর্ষাদির গ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু [illegible]রাজ কবি Tennyson যেমন বাক্যানুপ্রাসের সুন্দর ব্যবহার করিয়া[illegible]য়, (বিশেষত তাঁহার Maud এ), সেরূপ আর কুত্রাপি দেখি[illegible]ই। আমাদের বংগকবি এই ব্যাক্যানুপ্রাসের অস্থানে ব্যবহার, দ্ব্যর্থ শব্দের প্রয়োগ এবং অলস বাক্‌ছলের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, এই পত্রের স্থানে স্থানে (এবং অন্যত্রও) তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষার প্রাংজলতা নষ্ট করিয়াছেন। অপ্রাসংগিক হইলেও এ স্থানে [illegible]লা অন্যায় হইবে না, বোধ হয়, ভারতচন্দ্র ও শ্রীহর্ষাদির কবিতারও ইহাই প্রধান দোষ। এই পত্রের আর একটি দোষ উল্লেখযোগ্য। তারার উপাখ্যান পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু কবি যথাযথ পুরাণের অনুসরণ না করিয়া "কালানৌচিত্য-দোষে" [illegible]ত হইয়াছেন। তারার সহিত ব্যভিচার-পাপে লিপ্ত হওয়াতে দেবগুরু বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র কলংকী হইয়াছিলেন, ইহাই পুরাণ-প্রসিদ্ধ। কিন্তু সমালোচ্য পত্রে তারা এই ঘটনার পূর্বেই চন্দ্রকে "কলংকী" ও "তারানাথ" সম্বোধন করিয়া উক্ত দোষ করিয়াছেন।

* প্রথম যৌবনাবতীর্ণা রতৌ বামা
কথিতা মৃদুশ্চ মা নে সা নারী মুগ্ধেতি।"
ইতি কাব্যপ্রকাশে।

স্থানে স্থানে ভাষার মাধুর্য ও কল্পনার দূরগামিতা এই পত্রের প্রশংসনীয় বিষয়, কিন্তু ইহাতে কবির অন্তর্দৃষ্টির অভাব।

রুক্মিণীর পত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই, কারণ সকল চরিত্র বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা করিবার স্থান ও অবসর আমাদের হইবে না। তবে তারা ও রুক্মিণীর চরিত্র তুলনা করিলে আমাদের পূর্বের কথা আরও স্পষ্ট হইবে। উভয়ের বস্তুগত প্রার্থনা স্থূলত এক, কিন্তু চরিত্রগত বিভিন্নতায় সে প্রার্থনা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে। রুক্মিণী পতিব্রতা—স্বপ্নে একবার যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, পাছে তাঁহাকে ছাড়িয়া, গুরুজনবর্গ কর্তৃক [illegible]রাজ শিশুপালের সংগে বিবাহিত হইয়া, মানসিক ব্যভিচারে [illegible] হন, সেই ভয়ে এই পত্রে তাঁহার করুণ মর্মোক্তি। সতী তজ্জন্য [illegible]দিক-জ্ঞানশূন্যা—সমস্ত পত্রখানিতে কবি তাঁহার নায়িকার পত্নী[illegible] ভা[illegible] জাগাইতে বেশ কৃতকার্য হইয়াছেন। রুক্মিণী অসামান্যা রূপসী—ইহা আমাদের পুরাণের ধারণা ছাড়া পত্র-পাঠেও বেশ [illegible]ধ হয়, তথাপি রুক্মিণীর আকুলতায় স্বীয় অলৌকিক রূপের প্রতি কটাক্ষ সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। এইস্থানে তারার সহিত রুক্মিণীর প্রধান প্রভেদ এই প্রভেদ সতী ও অসতীর চরিত্রমাত্রেই অন্তর্নিহিত। তার[illegible] রূপসী, তাহার "এ বর-বরণ মম কালি অভিমানে" ইত্যাদি উক্তিতে স্পষ্ট ব্যক্ত। সে সেই "রূপহার' চন্দ্রকে উপহার দিবে, কারণ তিনিই অতুলনীয় রূপে তাহার যোগ্য নায়ক। ইহা ব্যভিচারিণীর রূপ[illegible] মোহ। ইহাতে পবিত্রতা, গভীরতা বা অন্তর্দৃষ্টি কিছুই নাই কুরুচির ভয়ে আমরা বিশেষ করিয়া বলিতে পারিব না। এই কা[illegible] শকুন্তলা-চরিত্রের সহিত রুক্মিণী-চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, ত[illegible] পূর্বোক্ত চরিত্র শেষোক্তের ন্যায় তত মহত্ত্বপূর্ণ নহে।

(৩)

চতুর্থ পত্রে কৈকেয়ী-চিত্র বেশ উজ্জ্বল হইয়াছে, কবির অন্য[illegible] অনুকৃত চরিত্রের মত ইহা স্বতন্ত্র নহে, ইহাই বিশেষত্ব। বাল্মীকি[illegible] কৈকেয়ীতে আর মধুসূদনের কৈকেয়ীতে বড় একটা প্রভেদ নাই

কবির অন্যান্য কাব্যের অন্যান্য চরিত্রের কথা বলিলে একথা আরও স্পষ্ট হইবে বোধ হয়। "মেঘনাদ-বধে" রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, প্রমীলা, হনুমান প্রভৃতির চিত্র, একটিও ঠিক বাল্মীকির চিত্রের মত নহে। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবুর মত পূর্বেই উদ্‌ধৃত করিয়াছি। বাল্মীকি-চিত্রিত চরিত্রের ন্যায় কবি মধুসূদনের কৈকেয়ী-চরিত্রেও সেই কু-উচ্চাভিলাষ, সেই নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতা, সেই রাক্ষসী প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। এই পত্রের ভাষায় কবি বিলক্ষণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। ইহা খুব বিষয়োচিত ও সময়োচিত হইয়াছে। আমাদের কাব্যামোদী পাঠকগণের সম্ভবত কণ্ঠস্থ থাকিলেও এইখানে কিংচিৎ উদ্‌ধৃত করিতেছি :—

চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী। দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
'পরম-অধর্মাচারী রঘুকুলপতি।'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্বজনে—
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে, তাপসে,
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,
'পরম-অধর্মাচারী রঘুকুলপতি।'
পুষি সারি শুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ ঘোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে
'পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি'।—ইত্যাদি

আবার কৈকেয়ীর শ্লেষোক্তিতে তাহার চরিত্র কেমন ব্যক্ত হইয়াছে ;—

পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা,
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।

দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে।
চিরি বক্ষ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন; না থাকে যদি পাপ এ শরীরে,—
পতি-পদ-গতা সদা পতিব্রতা দাসী,—
বিচার করুন ধর্ম, ধর্ম-রীতি-মতে।

ইংরাজ কবি Gray, Dryden এর কবিত্বের কথায় বলিয়াছিলেন, —"Words that breathe and thoughts that burn"। এই পত্র সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। পত্রখানা শেষ করিয়া মনে হয়, যেন একটা রূপবতী, ক্রুদ্ধা, প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া গর্ব ও ঘৃণামিশ্রিত তীব্রস্বরে ঐ কথাগুলি বলিয়া গেল—যতক্ষণ বলিতেছিল, ততক্ষণ যেন তার বিস্ফারিত নয়নযুগল অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল। এই পত্রের স্থানে স্থানে রুচিদুষ্ট। দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, ইহ সাধারণ দোষ।

শূর্পণখা পত্রের বিশেষ সমালোচনা করিব না, কারণ ইহাও রুচিদুষ্ট। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, কবি ওভিডের অনুকরণে পুরাণের এরূপ অশ্লীল কাহিনী না লইলেও পারিতেন। ওভিডের রুচি দুষ্ট হইলেও মার্জনীয়, কারণ সে সময় এই সভ্যতালোক-দীপ্ত উনবিংশ শতাব্দী হইতে নিশ্চয় স্বতন্ত্রতর। সুরুচিসম্পন্ন ইংরাজ কবি টেনিসনও ওভিডের অনুকরণ করিয়া অশ্লীলতা-দোষে পতিত হইয়াছেন। কবিগুরু বাল্মীকি, যাহার উপাখ্যান আমাদের কবি অনুসরণ করিয়াছেন ও যাহাতে ব্যাসের ন্যায় অশ্লীলতা-দোষ প্রায় দেখা যায় না, তাঁহাকেও শূর্পণখা-চরিত্র অবতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ কুরুচির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এরূপ স্থলেও, মাইকেল কবির এরূপ অশ্লীল কাহিনী অবলম্বন করায় কাব্যের উপাখ্যান-ভাগে অবশ্য দোষ আসিয়াছে; এবং সত্যানুরোধে ইহাও বলিব, ভট্টিকার শূর্পণখা-চিত্রে যে অশ্লীলতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় এ অশ্লীলতা কিছুই নহে। আর একটা কথা এক্ষেত্রে বলা উচিত।

কবি তাঁহার স্বাভাবিক রাক্ষস-পক্ষপাতিতায় বংগীয় পাঠকবর্গকে শূর্পণখা-চরিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নতাকারে প্রদান করিয়াছেন। তিনি এই পত্রিকার সূচনায় এ কথা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা শূর্পণখা স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।" এই অন্যায় পক্ষপাত তাঁহার কাব্যের দোষ। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণবাবুর মত আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। বাল্মীকি যে রাবণের পরিবারবর্গকে বীভৎস-রসে বর্ণনা ও অন্তিমে তাহাদের সবংশে উচ্ছেদ-কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে স্ব-কাব্যে ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ দেখাইয়াছেন মাত্র। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, রামায়ণ কেবল বহির্জগতের চিত্র নহে, অন্তর্জগতেরও চিত্র। যুদ্ধে অশিক্ষিত, অস্ত্রশস্ত্রহীন, রাক্ষসসেনার তুলনায় মুষ্টিমেয় বানরসৈন্য ও সহোদরমাত্র-সহায় রামচন্দ্রের অনধিগম্য রাক্ষসকুল ধ্বংস করা কেবল অন্তর্জগতেই সম্ভব। পুণ্যের অভ্যুদয়ে পাপ কিরূপ সমূলে বিনষ্ট হয়, মনুষ্য-হৃদয়ের এই আধ্যাত্মিক রহস্য মহাকবি বাল্মীকির কাব্যে নিহিত, এরূপ পূর্বোক্ত সমালোচকদের বিশ্বাস।* এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের পূর্বের যুক্তি আরও সমর্থিত হইল। যদিও সময়ে সময়ে পৃথিবীতে ন্যায় অন্যায়ের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হয়, সত্য অসত্যের নিকট মস্তকাবনত করে, ধর্ম অধর্মের দ্বারা শতরূপে পীড়িত হয়, তথাপি অধর্মের গৌরবে কোন লাভ নাই, সম্যক্ হানি আছে, এবং ইহাতে কাব্যের সদুদ্দেশ্য বিফল হয়। পাশ্চাত্য আলংকারিকেরা যাহাকে Poetical Justice বলেন, এই কাব্যে সেই Poetical Justice অর্থাৎ কবির ন্যায়-বিচার হয় নাই। বিখ্যাত আলংকারিক "কাব্যং যশসে" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় ন্যায়-বুদ্ধি-সাধনের প্রয়োজনীয়তা লিখিয়াছেন "রামাদিবৎ বর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ।"

* ১২৯৪ সালের "বিভায়" পূর্ণচন্দ্র বসুর "মহাকাব্যের পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

সে যাহা হউক, বাল্মীকি-চিত্রিত শূর্পণখার চিত্রে মনে বীভৎস রসেরই উদ্রেক হয়, কারণ পাপিষ্ঠা মায়াবিনী নিশাচরীর কুৎসিৎ ব্যবহারে পাঠকের মনে ঘৃণোৎপত্তি করাই কবির অভিপ্রেত। কবি যদিও তাহাকে রূপসী-শ্রেষ্ঠার আকার-ধারণে সমর্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি তাহার পূর্বের বর্ণনাবশত আমরা তাহার কদাকার বিস্মৃত হই না। ভট্টিকারের শূর্পণখার ন্যায় বংগকবির শূর্পণখার একটু উন্নতি থাকিলেও অশ্লীলতার স্পর্শে সে টুকু নষ্ট হইয়াছে।

বর্ণনীয় কাব্যে শূর্পণখার সহিত দুইটি চরিত্রের মিল আছে—সে দুইটি তারা ও উর্বশী। এ তিনটি চরিত্রের অবতারণায় কাব্যের গঠনোপাদানে দোষ হইয়াছে, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তবে এ তিনটি চরিত্রের মধ্যে উর্বশী-চরিত্রে আমরা একটু অন্তর্দৃষ্টি পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে মানসিক সৌন্দর্যের তুলনায় উর্বশী প্রথমা, তারা দ্বিতীয়া এবং শূর্পণখা তৃতীয়া। প্রার্থনা তাহাদের তিনেরই দূষ্য, ধর্ম ও নীতি-বিরুদ্ধ, তবে ইতর-বিশেষ এই যে, বর্ণনার ভংগি ও উক্তির বৈচিত্র্যে উর্বশী-চরিত্রে কিছু আপেক্ষিক মহত্ত্ব আছে। এ সব চরিত্রের অবতারণায় রুচিদোষ আসিবেই; এ কথার সমর্থনে আমরা "বিক্রমোর্বশী"র উল্লেখ করিতে পারি। মনোহারিণী কল্পনায়, মনুষ্য-হৃদয় ও মনুষ্য-চরিত্রে দূরদৃষ্টিতে কালিদাসের উর্বশী-চিত্র "বীরাংগনা" কাব্যকর্তার চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে উজ্জ্বল হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি উক্ত নাটক-পাঠে উর্বশী-চরিত্র আদ্যন্ত পর্যবেক্ষণ করিলে উর্বশী যে স্বর্বেশ্যা, তাহার প্রেম যে ক্ষণিক রূপজ মোহ মাত্র, তাহার কথায় বা ভাব-ভংগিতে এ কুৎসিত সত্য আবৃত হয় না। তাহাকে শত কল্পনা, শত সৌন্দর্য ঘিরিয়া থাকিলেও তাহার উর্বশীত্ব উহার মধ্যে বিলুপ্ত হয় না—সুতরাং পুরুরবা-বিরহে উর্বশীর খেদে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা হয় না! কিন্তু শকুন্তলার বিরহবেদনা কিরূপ মর্মস্পর্শী! সেক্সপীয়রের ক্রেসিড, ক্লিওপেট্রার বিরহোক্তিতে চোখে জল ধরে না কেন? বোধ হয়, মনুষ্য-হৃদয়ের নৈসর্গিক পুণ্যপ্রবণতা এ সমবেদনার মূলীভূত কারণ।

(৪)

অতঃপর দ্রৌপদী-চরিত্র। মহাভারতকারের এ উজ্জ্বল চিত্র দেশীয় বিদেশীয় অনেক সমালোচকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের বংগকবির হস্তে এ চিত্র কিরূপ ফুটিয়াছে, তাহা এই কাব্যের সমালোচকমাত্রেরই অভিনিবেশের বিষয়। বস্তুত ব্যাসের দ্রৌপদী হইতে মাইকেলের দ্রৌপদী কিছু বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয় না—উভয়েই সেই হিন্দুরমণীর "সনাতন পাতিব্রত্য", সেই ধর্মপরায়ণতা, সেই রাজপদাভিলাষ, সেই মহত্ত্ব। বরংচ বীরাংগনা কাব্যে দ্রৌপদী-চরিত্রের শ্রেষ্ঠাংশ ততদূর চিত্রিত হয় নাই, মধুর ও কোমল অংশ যতটা হইয়াছে। ইহা বংগরমণীর কোমলতা, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সহধর্মিণীর কোমলতা ও কঠিনতা মিশ্রিত সৌন্দর্য নহে। কবি এরূপ অবস্থানে কোমলতা আনিয়া চরিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট করেন। মেঘনাদবধে সীতা ও প্রমীলা চরিত্র তুলনা করুন; বোধ হইবে, একার বীর-পত্নী-যোগ্য কঠোরত্ব অন্যার চরিত্রে অতিরঞ্জিত হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রৌপদী-চরিত্রেও এই দোষ আসিয়াছে। মনে হয়, দ্রৌপদীর সে প্রেম-প্রবণতা থাকিলেও, হৃদয়ে সে বল কই? সে কর্তব্যবুদ্ধি কই? গভীর প্রেমের লক্ষণ সে বিশ্বাসের উদারতা কই? দ্রৌপদী যেন পতিচরিত্রে অর্ধসন্দিগ্ধ। অপ্সর-কন্যারা অলৌকিক রূপলাবণ্যে পাছে স্বামীটিকে বেদখল করিয়া ফেলে, দ্রৌপদী এই ভয়েই সারা। ব্যাসের দ্রৌপদী এরূপ নহেন। বৈর-নির্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্র-শিক্ষার্থে স্বামী ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন, সে পর্যন্ত দ্রৌপদী বিরহে কাতরা হইলেও কর্তব্যজ্ঞান তাঁহার এত প্রবল যে, পতিচরিত্রে অন্যায় সন্দেহে বা বিরহানল নিবাইবার জন্য স্বামীকে স্বর্গ হইতে ফিরাইয়া আনিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। কৌরবেরা তাঁহাদের কি দুর্গতি না করিয়াছিল? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূতবেশে পঞ্চগ্রাম ভিক্ষা করিতে গিয়া মদদর্পিত দুর্যোধন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। সুতরাং এ যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষার উদ্দেশ্য আধুনিক ইয়ুরোপের অদম্য রাজ্য-সম্পদ-লালসার

পরিতৃপ্তি নহে! ইহা ধর্ম—ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য।* সে কার্যে ব্যাঘাত দেওয়া সহধর্মিণীর উচিত কার্য নহে।

এই পত্রে একস্থানে কবি কালানৌচিত্য দোষে পতিত হইয়াছেন। বীরাংগনা কাব্যের অন্য কোন সমালোচক এ দোষ দেখাইয়াছেন কিনা, জানি না। মহাভারত-পাঠে আমরা অবগত হই, যখন বৃহদশ্ব ঋষি আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে নলোপাখ্যান বিবৃত করেন, তাহার বহু পূর্বে অর্জুন ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় দ্রৌপদীর "শুনি বৈদর্ভীর কথা ধরিতাম ফাঁদে রাজহংস" ইত্যাদি উক্তিতে কালানৌচিত্য দোষ আসিয়াছে—কারণ সে সময়ে দ্রৌপদী নলোপাখ্যান অবগত ছিলেন না।

ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে বিশেষ কিছু বলিবার নাই, কারণ স্থানে স্থানে কাব্যমাধুর্য ছাড়া আর কিছু প্রশংসনীয় নাই। কবির অবস্থার লোকের হিন্দুপুরাণে জ্ঞান দেখিয়া (এ গ্রন্থ মধ্যে বিশেষ এই দুই পত্রে) আমরা বিস্মিত হই, যদিও স্থানে স্থানে এই পুরাণোপমা-বাহুল্যই দোষাবহ হইয়াছে। ইহা ছাড়া, এই দুই পত্রে কবির চরিত্র-সৃষ্টি-কৌশল তেমন নাই। দুঃশলা ও ভানুমতী-চরিত্র প্রায় এক, কেবল প্রভেদ নায়ক-নায়িকার অবস্থানভেদ।

পূর্বে বলিয়াছি, অবস্থাগত সাদৃশ্যে জনা কৈকেয়ী-তুল্যা। যতটুকু উগ্রতা জনাচরিত্রে বাহ্যত পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল অবস্থাগত। কৈকেয়ী জনার অবস্থায় পড়িলে বোধ হয় আরও উগ্রা হইতেন। জনা একে পুত্রবিয়োগবিধুরা তাহাতে আবার হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্বামী দ্বারা পুত্রহন্তা শত্রুকে ষোড়শোপচারে পূজিত হইতে দেখিয়া সে ক্ষত্রিয় রমণী হৃতশাবকা বাঘিনীর ন্যায় ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পতিকে ভর্ৎসনা করিতেছে। সে ভর্ৎসনা তীব্র ঘৃণাপূর্ণ ও বিদ্রূপময়। ব্যাস জনা-চরিত্র উজ্জ্বল করিতে প্রয়াস পান নাই। কারণ সকল পারিপার্শ্বিক চিত্রে মনোযোগ দিতে তাঁহার অবসর বা উদ্দেশ্য ছিল না। কবি মধুসূদনের এ চিত্র সুতরাং বেশ

* গীতার "মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়" ইত্যাদি শ্লোকের বংকিমবাবুর ব্যাখ্যা দেখ।

উজ্জ্বল হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দ্বৈত-চরিত্রে কাব্যের গঠনে বৈচিত্র্যহীনতা দোষ আসিয়াছে। রুক্মিণী ও শকুন্তলায়, তারা, উর্বশী ও শূর্পণখায়, কৈকেয়ী ও জনায়, দুঃশলায় ও ভানুমতীতে উক্তরূপ সাদৃশ্য আসিয়া কাব্যগত নায়িকাচরিত্রের বৈচিত্র্য নষ্ট করিয়াছে। একেবারে স্বাতন্ত্র্য নাই, এরূপ নহে, তবে খুব স্পষ্ট নহে। একটি চরিত্রে কেবল উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বর্তমান, সেটি গংগাচরিত্র। এই কাব্যের অন্য কোন চরিত্রের সহিত ইহার তুলনা দেওয়া যায় না। গংগা অনেকদিন শান্তনু-পত্নী ছিলেন, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, যদিও এই পুরাণ-কাহিনীর প্রথমাংশ (অর্থাৎ শান্তনু-পিতার রূপে দেবীর অনংগবাণ বিদ্ধ হওয়া) দেবী-চরিত্রের বড় মাহাত্ম্যসূচক নহে। প্রতিজ্ঞা, দেবতনয় শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর উদ্ধার। এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইলে গংগা অন্তর্হিতা হইয়াছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পত্নী-বিয়োগ-বিধুরা শান্তনু জ্ঞানশূন্য হইয়া, নিদ্রাহার ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতটে ভ্রমণ করিতেছেন। ব্যাস ও মাইকেলের শান্তনু-চরিত্র এরূপ রূপলালসাময়। তাঁহার প্রেম অনেকটা রূপজাত মোহ। প্রমাণ, কিছুদিন পরে আবার তিনি সত্যবতীকে দেখিয়া এইরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণটা যেন কর্ণধারবিহীন তরী; রূপসীর রূপের প্রতি তরংগে উলটিয়া যায়। ইন্দ্রিয়-সংযম নামক যে একটা কর্ণধার থাকে, তাহার অস্তিত্ব সে তরীতে অনুভূত হয় না। সে যাহা হউক, গংগা শান্তনুকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন, "পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে"। গংগা আত্ম-পরিচয় দিতেছেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি স্বয়ং "হরশিরোনিবাসিনী হরপ্রিয়া জাহ্নবী।" যে কারণে এত দিন রাজার আলয়ে মানবী আকারে পত্নীভাবে ছিলেন, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। শেষে সর্বগুণধর পুত্রের মুখ দেখিয়া স্ত্রীবিয়োগ-ব্যথা ভুলিতে পারেন, এইরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন :—

কি কাজ অধিক ক'য়ে ? পূর্বকথা ভুলি
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মন,

প্রণম সাষ্টাংগে, রাজা ; শৈলেন্দ্র-নন্দিনী
রাজেন্দ্র-গৃহিণী গংগা আশীষে তোমারে,—
যতদিনে ভবধামে বহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশঃ, গুণ, ভবধামে ,
কহিবে ভারতজন, "ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেবব্রত রথী !"

(৫)

উপসংহার

য়ুরোপীয় সমালোচকেরা কবিশ্রেষ্ঠ মিল্টনের রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, অনেক শ্রেষ্ঠ কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু মিল্টনের মত ওজোগুণসম্পন্ন, মধুর ও সুদূরগত-ভাবময়, ঝংকারবিশিষ্ট ছন্দ ও ভাষা কাহারও নহে। সেইরূপ আমাদের মাইকেল কবি স্বপ্রবর্তিত ছন্দে যেরূপ কুশলী, সেরূপ অন্য কেহ নহেন —সমগ্র বংগভাষায় তাঁহার সমকক্ষ নাই। শব্দবিন্যাসের অপূর্ব কৌশল, ছন্দের ঝংকার, ভূরিতা, লালিত্য ও মাধুর্য, উপমার সুন্দর ও অলংকার-বিশুদ্ধ প্রয়োগ, ভাষায় ভাবের অনুগামিতা, এই সকল মাইকেলের রচনার সাধারণ গুণ , এবং এই সকলের অনুকরণ অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য। মিল্টনের ভাষায় দুর্বোধ ও দীর্ঘ উপমাপ্রয়োগ একটা প্রধান দোষ। মাইকেলের ভাষায় অন্যান্য দোষ সত্বেও এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। কতকগুলি উপমার দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। এগুলি আমরা বাছিয়া উদ্ধৃত করি নাই ; চক্ষের সমক্ষে যাহা সুন্দর ও মৌলিক বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহাই লইয়াছি।

১। ভ্রাতা মোর কুরুরাজ, ভ্রাতা পাণ্ডুপতি,
একজন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব ? আর কি কহিব,
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে ?

২। অপ্সরা-বল্লভ তুমি, নর-নারী দাসী,
তা'বলে করো না ঘৃণা * * *

স্বর্ণ অলংকার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে, পরে না কি রজত চরণে ?

৩। —কর্মনাশা, পাপ-প্রবাহিনী,
কেমনে পড়িলে বহি' জাহ্নবীর জলে ?

৪। যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদী তীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্তি বিমল সলিলে,
হেরে আসি সুবদনা সুবদন যথা—দর্পণে।

৫। এ বরাঙ্গ বররুচি রুচ্যমান এবে
মোহান্তে। ভাঙ্গিলে পাড়, মলিনা-সলিলা
হয়ে ক্ষীণ এইরূপে বহেন জাহ্নবী
আবার প্রসাদে, শুভে।

৬। দেহ আজ্ঞা নরেশ্বর ; সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব পদে, পড়ে বারি ধারা
যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে।

ভাষায় ভাবের অনুগামিতা ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তে লক্ষিত হইবে। সিন্ধুনদী-তীরে সুন্দরী পুরী অবস্থিত, এই কথা বলিলেই চলিত, কিন্তু তাহাতে পাঠকের মনে পুরীর অবস্থানের ওরূপ সুন্দর ছবি প্রতিবিম্বিত হইত না—তাই দর্পণে সুন্দরীর চন্দ্রবদন-দর্শনের উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। সুদূর হইতে পতনের ধারণা পাঠকের মনে দিবার নিমিত্ত মেঘক্রোড় হইতে বৃষ্টির সমুদ্রে পতন কল্পিত ও চিত্রিত হইয়াছে। কি সুন্দর! এইরূপ শত শত দেখাইতে পারি। কালিদাসের স্বদেশীয় বলিয়াই কি মধুসূদন এই অধিকারটুকু লাভ করিয়াছেন? পাঠক মহাশয় এই উপমাগুলির সহিত "স্বর্গবিচ্যুতি"র (বিশেষত দ্বিতীয় সর্গের) দুর্বোধ উপমাগুলি মিলাইয়া দেখিবেন।

রচনার অনেক দোষও আছে, সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ করিব। মাননীয় কবি হেমবাবু "মেঘনাদ-বধ" কাব্যের সমালোচনায় ইহার কতকগুলি নির্দেশ করিয়াছেন। মাইকেল রাশি রাশি উপমা

স্তূপাকার করেন এবং অনেক সময়ে উপমা উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না। কিন্তু এ দোষ সাধারণত মিণ্টনের যত, মাইকেলের তত নহে, এবং মেঘনাদবধে যত, তত বীরাংগনায় নহে। কখনও কখনও অন্বয়ের দোষে—অর্থাৎ কর্তা-ক্রিয়াদির পরস্পর দূর ব্যবধানতায় ভাষা ও ভাবের অস্পষ্টতা এবং অর্থের জটিলতা জন্মে। দ্রৌপদীর পত্র হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

পূজিতাম শিবধনু, কহিতাম সাধে
ঋষিবেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে ;
(জানি কামরূপ তুমি) দিতে এ দাসীরে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
হে কোদণ্ড ! ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে ;
তাহলে পাইব নাথে, বলিশ্রেষ্ঠ তিনি।'

ইহার অর্থ একেবারে দুর্বোধ না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে। প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন করা একটা দোষ। হেমবাবু ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মর্মরিছে' 'স্বনিয়া' প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু এগুলি, আমাদের ক্ষুদ্রবোধে, শ্রুতিকটু (সুতরাং কাব্যে অনুপযুক্ত) নহে। তবে 'প্রতিবিধিৎসিতে', 'নীরসি' 'রণি' প্রভৃতি বাঙ্গালায় নিতান্ত "গুরুপাক" বোধ হয়। অনেকগুলি বিশেষণও, শুধু প্রথাবহির্ভূত নিয়মে নিষ্পাদিত, এরূপ নহে, শ্রুতিকটু ও ব্যবহারদুষ্ট। যেমন স্থানে অস্থানে 'পোড়া' শব্দের এত অধিক প্রয়োগ ভাল শুনায় না। "পূর্ব পুণ্যফলে স্বেচ্ছাচার পুত্র তাঁর", এস্থলে কবি যে অর্থে 'স্বেচ্ছাচার' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতই সাধারণত বুঝাইয়া থাকে। বিশেষত 'পূর্ব পুণ্যফলে' পাঠ করিয়া মনে সহসা বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয়। তাহা ছাড়া সন্ধিদোষ, বিভক্তিদোষ প্রভৃতিও আছে, কিন্তু এই সমস্ত ছোট ছোট বিষয় লইয়া গোলযোগ করা ভাল মানুষের উচিত কর্ম নহে বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

তাহার পর, ছন্দ। কবি হেমচন্দ্র যখন সাহসের সহিত এ ছন্দ-প্রয়োগ সমর্থন করিয়াছিলেন, সেদিন আর নাই। অধুনাতন

বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহুল ব্যবহারে মধুসূদনের প্রবর্তিত এ ছন্দ তাহার পরবর্তী কবিগণের কাব্যে বিকশিত হইয়া প্রবর্তয়িতার মৌলিক প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। এরূপ স্থলে এ বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র লেখনী চালনা করা নিষ্প্রয়োজন। মাইকেলের রচনা-কৌশলে বিরাম-যতি-স্থাপনের দোষ সম্বন্ধে হেমবাবু অনেক কথা বলিয়াছেন। "তিলোত্তমা" কবির প্রথম উদ্যম বলিয়া ইহাতে এই দোষ "বীরাংগনা" বা "মেঘনাদ বধ" হইতে সমধিক দেখা যায়।

কবি বর্ণনায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত, নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি দৃষ্টান্তে তাহা প্রতীয়মান হইবে। তবে এখানে একথা বলা উচিত যে বর্ণনাশক্তি "বীরাংগনা" অপেক্ষা "মেঘনাদ-বধে" অধিকতর ফুটিয়াছে। শূর্পণখা স্বীয় সুখৈশ্বর্য বর্ণনা করিয়া লক্ষ্মণকে লুব্ধ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছেন :—

—"অপ্‌সরা, কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে শত দাস দাসী!
সুবর্ণ-নির্মিত গৃহে আমার বসতি,—
মুক্তাময় মাঝে তার ; সোপান খচিত
মরকতে ; স্তম্ভে হীরা, পদ্মরাগমণি ;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ, রতন কপাটে,
সুকল স্বর-লহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি ; গায় পাখী সুমধুর-স্বরে ;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাপাণি
বামাকুল। শত শত কুসুম-কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে ;
খেলে উৎস, চলে জল কলকল কলে।"

শূর্পণখা লংকার শোভাই বর্ণনা করিতেছেন ; "মেঘনাদবধে"ও লংকার শোভা বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ, "প্রাসাদশিখরে, কনক-

উদয়াচলে ভগবান দিনমণি অংশুমালীর" ন্যায় উদিত হইয়া "সৌর-কিরিটিনী লংকা"র শোভা দেখিতেছেন :—

"———মনোহরা পুরী!
হেমহর্ম্য সারি সারি পুষ্প-বনমাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজছটা ;
তরুরাজি, ফুলকুল চক্ষু-বিনোদন,
যুবতী-যৌবন যথা ; হীরাচূড়াশির
দেবগৃহ ; নানারাগে রংজিত বিপণি
বিবিধ রতনে পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে
রেখেছে, রে চারু লংকে, তোর পদতলে,
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।"

ভাষা ও ভাবের জমাট বাঁধুনিতে ও মাধুর্যে দ্বিতীয়টি প্রথম বর্ণনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুনশ্চ ভানুমতী স্বপ্নদৃষ্ট রণক্ষেত্র বর্ণনা করিতেছেন :—

"——দেখিনু তরাসে,
যতদূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি।
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে ;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈল শৃংগ যেন
চূর্ণ বজ্রে ; হতগতি অশ্ব ; রথাবলী
ভগ্ন, শত শত শব! কেমনে বর্ণিব,
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে।"

ইহার সহিত "মেঘনাদবধে"র রণক্ষেত্র-বর্ণনা তুলনা করুন।

"——শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে, কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে ;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে

সমলোভী জীবে ; কেহ গরজি উল্লাসে
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে রক্তস্রোতে।
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে !
চূর্ণ রথ অগণ্য ; নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক.পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে ! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনু,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে”—ইত্যাদি

শেষোক্ত বর্ণনার কাছে বীরাংগনার বর্ণনা দাঁড়াইতে পারে না।

বর্ণনার দোষও আছে—তাহা ভাবের অনুকরণ। “মেঘনাদ-বধ” অপেক্ষা “বীরাংগনা”র ক্ষুদ্রাকারে এ অনুকরণ-বাহুল্য সহজেই নেত্রগোচর হয়। অবশ্য তিনি সামান্য তস্করের ন্যায় অন্যের ভাবরত্ন অপহরণ করেন নাই, তবে ভাবে এতদূর সাদৃশ্য যে রচনাকালে কবি উহা স্মরণ করিতেছিলেন বলিয়াই মনে হয়। গংগা শান্তনুর সহিত ভীষ্মের তুলনা করিতেছেন :—

“পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি, প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী।”

এ উপমা সুন্দর, কিন্তু মৌলিক নহে। কালিদাসও রঘুর তুলনায় অজের বীর্য বর্ণনা করিয়াছেন :—

“ন কারণাৎ স্বাদ্বিভেদে কুমারঃ
প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।”

জনা পত্রের শেষভাগে বলিতেছে :—

“নরেশ্বর, ‘কোথা জনা’ বলি যদি ডাক,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি, ‘কোথা জনা’ বলি।”

বাংলায় এইরূপ উক্তিতে নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু আমাদের

বায়রণের অনুকরণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল—পাঠক মহাশয়ের বিবেচনা করিবেন।

"Hush! To the hurried questions of despair,
'Where is my child'—the echo answers where?"

কেহ বলিতে পারেন, একজন যাহা ভাবিয়াছেন অন্যে তাহা ভাবিতে পাইবেন না, ভাবরাজ্যে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নাই, এ কথা সত্য কিন্তু মাইকেল সম্বন্ধে এ কথা খাটে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। মিল্টনের প্রকৃতি-বর্ণনা সম্বন্ধে কোন বিখ্যাত সমালোচক বলিয়াছেন—"Milton sees Nature through the spectacles of books" অর্থাৎ তদধীত পুস্তকের নেত্রপুটের ভিতর দিয়া প্রকৃতিকে দর্শন করিতেন। ইডেন-উদ্যান-বর্ণনায় কবির তাই এনার (Enna) উপত্যকায় প্রসার্পাইনের (Prosperine) পুষ্পচয়ন মনে পড়ে, সয়তানের পৃথিবী অভিমুখে বেগোত্থানে সাইয়েনিনান (Cyanean) শৈলমালায় আর্গোর (Argo) দশা বা সিলা (Scylla ও চারিব্ডিসের মধ্যগত রাজা ইউলিসের কথা স্মরণ হয়। সুতরাং সেখানেও বর্ণনাও অনুকৃত কবির সহিত (Virgil ইত্যাদি) প্রায় মিলিয়া যায়। উক্ত সমালোচকেরা দোষের সমর্থনে বলেন যে, মিল্টন যখন এই মহাকাব্য রচনা করেন, তখন প্রাচীন ও তদানীন্তন য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ কবিবর্গের কাব্য তাঁহার সম্যক্ অধীত ছিল। এই কথা আমাদের কবি-সম্বন্ধেও বক্তব্য। "মেঘনাদ-বধ" ও "বীরাংগনা"র রচয়িতার মত, দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যজ্ঞ বংগকবি এ পর্যন্ত কেহ হয় নাই। সুতরাং এ দোষ স্বভাবত তাঁহারও কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ সাদরে প্রমীলার নিদ্রাভংগ করিতেছেন—"উঠ প্রিয়ে, কমললোচন মেল, চিরানন্দ মোর" ইত্যাদি উক্তির সহিত, অ্যাডামের ইভকে জাগরণকালীন উক্তি—"Awake my fairest, my espoused" ইত্যাদি তুলনা করিলে আমাদের পূর্বের কথা আরও প্রমাণিত হইবে।

অস্থানে, অপাত্রে, আদিরসের অবতারণা সাধারণত মাইকেলের

প্রধান দোষ আমরা শুনিতে পাই। মিল্টন, সেক্সপীয়রেও অশ্লীলতা আছে, এজন্য ভারতচন্দ্রাদির অশ্লীলতাও মার্জনীয়। এ ও কি একটা যুক্তি নাকি? প্রথমত, যাহা অশ্লীল—যাহাতে পাপের দিকে মন আকৃষ্ট হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে থাকিলেও সমর্থনীয় নহে। তবে পাপের বীভৎস চিত্রে আন্তরিক ঘৃণা ও ভয়ের উৎপত্তি করিয়া পাঠকের মনকে শিক্ষা দেওয়া নাকি কবির উদ্দেশ্য, তাই একটা ফল্‌ষ্টাফ্ বা একটা ইয়াগো বা একটা মেফিস্‌টোফেলিসের চরিত্র-চিত্রণ শুধু ক্ষমার্হ নহে, আবশ্যকীয়ও বটে। কিন্তু সে চরিত্র যদি এরূপ ভাবে চিত্রিত হয় যে, তাহাতে পাপে ঘৃণা হওয়া দূরের কথা, পাপের দিকেই মন আকৃষ্ট হয়, সেস্থলে কবির সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও সে অশ্লীলতা মার্জনীয় নহে। এইজন্য ভারতচন্দ্রাদি, উইকার্লি (Wycherly), জয়দেব প্রভৃতির ও ন্যায় আমাদের মধুসূদন কবির অশ্লীলতা অমার্জনীয়।

বিভিন্ন রসোদ্রেকে কবির নিপুণতার দৃষ্টান্ত "বীরাংগনা"য় অনেক আছে, বাহুল্য-ভয়ে আমরা সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। যদিও কাব্যখানি প্রধানত আদিরসঘটিত, তথাপি শকুন্তলা, রুক্মিণী ও দ্রৌপদীর পত্রে আদিরসের, গংগার পত্রে শান্তরসের, ভানুমতী ও দুঃশলার পত্রে আদিমিশ্রিত রৌদ্ররসের, কৈকেয়ী ও জনার পত্রে ব্যংগমিশ্রিত করুণরসের বেশ স্ফূর্তি পাইয়াছে। জনার পত্রে এই তীব্র ব্যংগরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন; "কি লজ্জা, দুঃখের কথা" ইত্যাদি উক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন :—

"কেমনে তুমি, মিত্রভাবে
পরশ সে কর যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত?"

সে উক্তি প্রথম শ্রেণীর কবির যোগ্য—উহা মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, তাহা ভয়াবহ। পুনশ্চ, অর্জুনের সম্বন্ধে জনা উপহাস করিয়া

যাহা বলিতেছেন, বংগভাষায় ব্যংগরসের সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

"নর-নারায়ণ-জ্ঞানে শুনিনু পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে ;—এ কি ভ্রান্তি তব ?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে
স্বৈরিণী ? তনয় তার জারজ, অর্জুনে
(কি লজ্জা) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,
নর-নারায়ণ-জ্ঞানে ? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলা-খেলা তোর বুঝিব কেমনে ?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুন তারে
অকালে ;—আছিল মান, তাও.কি নাশিলি ?
নর-নারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা, গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে,
কি পুরাণে এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে ;
ধীবর জননী, পিতা ব্রাহ্মণ !

× × ×

× × কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা ? কুলাচার্য তিনি
কু-কুলের। তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আ মরি কি সতী !
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ ! পৌরব সরসে
নলিনী ! অলির সখী, রবির অধিনী,
সমীরণ-প্রিয়া, ধিক্ ! হাসি আসে মুখে,

(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা।
লোকমাতা রমা কি হে ভ্রষ্টা এ রমণী ?"

কাব্যের নায়ক-নায়িকাকে যে যে অবস্থায় ফেলিলে যে যে রসের স্ফূর্তি পায়, সেই সেই অবস্থাকে সেই সেই রসের সংস্থান বলে। বংকিমবাবু যথার্থ ই বলিয়াছেন,—"সংস্থান রসের আকর।" বীরাংগনায় সংস্থানের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে—বস্তুত সংস্থানের জন্যই কেবল উর্বশী, শূর্পণখা প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা কতক অংশে মার্জনীয়।

(নব্যভারত, ১৩০০)

কুরুক্ষেত্র

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(১)

সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের মতে কাব্যের লক্ষণ এইরূপ—কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং, রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রস শব্দটা পারিভাষিক, বোধ হয় বাংলায় ভাব শব্দ দ্বারা উহার অর্থ অনেকটা প্রকাশ করা যায়। বাক্যের অপর নাম ভাষা। অতএব কাব্যের লক্ষণ এইরূপ হইল—ভাবাত্মক ভাষাই কাব্য। ভাব বা ভাষা স্বতন্ত্রভাবে কাব্য নহে; কিন্তু উভয়ের অপূর্ব দৈব-রাসায়নিক সংযোগই কাব্য। যেমন আত্মা বা দেহ স্বতন্ত্রভাবে মানবপদবাচ্য নহে, কিন্তু দেহনিবদ্ধ আত্মাই মানুষ।

ভাষার প্রধান উপাদান শব্দবিন্যাস ও ছন্দের ঝংকার। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে শব্দবিন্যাস এমন সুন্দর, কথায় কথায় সংযোগ, শব্দে শব্দের অনুবর্তন, বাক্যে বাক্যের সাপেক্ষতা এমন নিপুণ কৌশলময়, যে তাহার আলোচনায় কাব্যামোদীর উৎকৃষ্ট চিত্তপ্রসাদ অনুভূত হয়। আর শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে ছন্দের এমন একটা মধুর ঝংকার আছে, এমন একটা গম্ভীর আরাব, উচ্ছল প্রবাহ, উলসিত গতি আছে যে, সে কাব্য আবৃত্তিমাত্রেই প্রাণের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় সুখাবেশে আচ্ছন্ন করে। এ ঝংকার অনুকরণের সামগ্রী নহে। ইহা উৎকৃষ্ট কবির অসাধারণ সম্পত্তি। অতএব কবির ভাষায় (শব্দবিন্যাসে ও ছন্দের ঝংকারে) যে পরিমাণে সৌন্দর্যের সমাবেশ থাকে, তাঁহার কাব্য তত উৎকৃষ্ট।

কুরুক্ষেত্রের ভাষা কিরূপ?

প্রথম শব্দবিন্যাসের কথা বলি। শব্দবিন্যাসের সৌন্দর্য বিশ্লেষণে বুঝান যায় না। বিশ্লেষ কর দেখিবে, এই চলিত কথা—যাহা কবি অকবি সকলেই সর্বদা প্রয়োগ করে। শব্দবিন্যাসে সংশ্লিষ্টের সৌন্দর্য, বিশ্লিষ্ট তাহা কোথা পাইবে? অতএব কুরুক্ষেত্রের শব্দবিন্যাসের সৌন্দর্য—দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া বুঝাই।

"ঘুমন্ত প্রতিভা-অংকে ফুটন্ত সৌন্দর্য স্বপ্ন।"
"সংসার মরুতে ঢালিয়া অমৃত
করুণার মন্দাকিনী।
দয়ার দর্পণে যেন চিত্র পরদুঃখ।"
"রবি শশি বালুকণা, পারাবার কূপ,
বল্মীকের স্তূপ যেন গিরি হিমবান্!"
"আগে মরু পিছে মরু মরু চারিদিকে
হু হু করিতেছে মরু প্রাণের ভিতরে।"
"কি অনন্ত প্রেমতৃষা নীরব-মুখরা
কি অনন্ত সুখ দুঃখ, কি অনন্ত ভাষা,
কি অনন্ত নিরাশায় কি অনন্ত আশা"
"বনবালা কিশোরীর প্রেম
গিরিসুতা ক্ষুদ্রা নির্ঝরিণী।
হইয়াছে আজি প্রাণনাথ
মহানদী ধারা-বিপ্লাবিনী।
হায় হায় যেই জলধর
ঢালে বিশ্বে অমৃত-আসার,
একটি তাপিতা লতাবুকে
সে কি বজ্র করিল প্রহার?"
"জগতের অদ্বিতীয় বীরত্বের রবি
হইল পূর্বাহ্নে অস্ত,? কবিতা-জ্যোৎসনা
অদ্বিতীয়া নিবিল কি শুক্লা দ্বিতীয়ায়?
নরলোকে নিরুপমা সংগীতের বীণা
নীরবিল আলাপের প্রথম উচ্ছ্বাসে?
প্রকৃতির অতুলিতা তুলি বিনোদিনী
পড়িল কি খসি চিত্র-প্রথম-আভাসে?"

কাব্যমোদী পাঠক বোধ হয় অনুভব করিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের কথায় কথায় সংযোগ, শব্দে শব্দের অনুবর্তন, বাক্যে বাক্যের সাপেক্ষতা

কেমন নিপুণ, সুন্দর, কৌশলময়! আর একটা উদ্ধৃত করি—তাহার শব্দবিন্যাস বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতুলনীয়।

রবি অস্ত গেলে হায়! দিবা কি থাকিতে পারে
অস্ত গেলে শশধর, লয়ে যায় জ্যোৎস্নারে!
পাদপ হইলে ভস্ম, ছায়া কি থাকে কখন
নির্ঝর হইলে শুষ্ক, ধারা হয় অদর্শন!
প্রদীপ হইলে ভগ্ন, শিখা কি কখন রয়
বাঁচে কি নলিনী, যদি শুষ্ক হয় জলাশয়!

অতঃপর ছন্দের ঝংকারের কথা বলি। মধুসূদন তাঁহার কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন যে, যদিও অমিত্রাক্ষরেই নাটকের ভাষা ছন্দোবদ্ধ হওয়া উচিত, তথাপি তাঁহাকে গদ্যেই নাটক লিখিতে হইল। কারণ বাঙ্গালা নাটক অমিত্রাক্ষরে লিখিত হইবার সময় তখনও আইসে নাই। কুরুক্ষেত্র পড়িবার পর একজন প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী কবি বলিয়াছিলেন যে বোধ হয় এতদিনে অমিত্রাক্ষরে বাঙ্গালা নাটক লিখিবার ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে। যে ছন্দের ঝংকার, গম্ভীর আরাব, উচ্ছল প্রবাহ ও উলসিত গতির কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, তাহার কুরুক্ষেত্রের পত্রে পত্রে সাক্ষাৎ পাই। কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে এই মধুর ঝংকার, যাহা বস্তুত শ্রেষ্ঠ কাব্যের অসাধারণ লক্ষণ, সেই ঝংকার কাব্যগত ভাষার সহজ বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে, তাহাতে কবির কোন কৃতিত্ব নাই। তাঁহাদের মতে চসর, জয়দেব বা বার্ণসের ছন্দোগত মাধুর্য তদানীন্তন ইংরাজি, সংস্কৃত ও স্কচ ভাষা সাপেক্ষ। এইরূপ মাইকেলের গম্ভীর আরাব সংস্কৃতবহুল বঙ্গভাষার ইরম্মদ, কলম্ব, মলম্বা, দম্ভোলি শব্দজন্য, কবির প্রতিভার অসাধারণ সম্পত্তি নহে। এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। সেক্সপীয়র, কালিদাস, কিট্‌স প্রভৃতি রচিত কাব্যই ইহার প্রমাণ—তাঁহাদের ভাষা ত অন্য কবির ভাষা হইতে বিভিন্ন নহে, তবে অন্য কবির শত সাধনার অপ্রাপ্য ছন্দ-সম্পত্তি তাঁহারা কোথা পাইলেন? এইরূপ মাইকেল সম্বন্ধে কাহারও কাহারও যে ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে, আশা করি কুরুক্ষেত্র-পাঠে সে বিশ্বাস সংশোধিত হইবে।

শুধু অমিত্রাক্ষর কেন? কুরুক্ষেত্রের সর্বত্রই সেই ঝংকার আবার কর্ণে ধ্বনিত হয়, সেই গতি-প্রবাহে হৃদয় উচ্ছ্বসিত করে। দৃষ্টান্ত শুনুন।

"দিবসের শেষ অস্ত্র উঠিল, পড়িল
দিবসের শেষ মৃত চুম্বিল ভূতল।"
"ঘন-কৃষ্ণ বিষাদের ঘোর অন্ধকারে।
কহিত তপতী আমি শৈলজা নর্মদা।"
"সে নহে এ জগতের কর্কশ বন্ধুর
সুখদাতা পরিত্রাতা নর নারায়ণ।"
"হেলায় সমর-সিন্ধু করি অতিক্রম
আনন্দে চলিয়া যাবি বিজয়ের পার।"
"স্নেহের বেষ্টনে বাঁধা লতিকার মূল
পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি।"
"শোকে সমহৃদয়তা বড় শান্তিকর।"
"কভু নামি ধরাতলে
হিরণ্বতী নীল জলে।"
"গ্রহ তারাগণ
মনে হয় মানবের ভবিষ্য আশ্রম।"

কিন্তু ছন্দের ঝংকার অনুভব করিতে হইলে এরূপ বিপর্যস্ত শ্লোকাংশ আবৃত্তি করা যথেষ্ট নহে। পাঠককে নবম বা সপ্তম বা পঞ্চদশ বা সপ্তদশ অধ্যায় আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে পাঠক কুরুক্ষেত্রের ছন্দের ঝংকার কেমন মধুর হৃদয়ংগম করিবেন।

কাব্য ভাবাত্মক ভাষা। কুরুক্ষেত্রের ভাষার আলোচনা করিলাম; ভাবের কিছু আলোচনা করি।

সুধীবর অ্যারিষ্টটলের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের সহিত কোন এক মহান্ গাম্ভীর্য, এক ব্যাপক সত্যসমাবেশের চিরন্তন সম্বন্ধ আছে। সত্যশূন্য, গাম্ভীর্যবিহীন কবিতা উচ্চ কাব্য নামের অধিকারী নহে। ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর, দান্তে, সেক্সপীয়র, গেটে—ইহারা মহাকবি, কারণ

ইহাদের কাব্যে ঐ ব্যাপক সত্য, ঐ মহান্ গাম্ভীর্য পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। আমার বিশ্বাস কুরুক্ষেত্রে ঐ ব্যাপক সত্য, ঐ মহান্ গাম্ভীর্যের যে পরিমাণে সমাবেশ আছে, বাংলার আর কোনও কাব্যে (মেঘনাদ-বধেও) সে পরিমাণে আছে কিনা সন্দেহ।

এই ভাব-অভিব্যক্তির সহায়ক—চরিত্রসৃষ্টি, রসের অবতারণা, বর্ণনার চাতুর্য, আখ্যানের মনোজ্ঞতা এবং অলংকারের কৌশল। মধুর অলংকার, মনোজ্ঞ আখ্যান, নিপুণ বর্ণনা, অভিব্যক্ত রস ও বিচিত্র চরিত্র দ্বারা কবি ভাবের সৌন্দর্য রক্ষিত ও পরিবর্ধিত করেন। ভাবের রক্ষণ ও পরিবর্ধনকারী এই সকল উপাদান কুরুক্ষেত্রে কি পরিমাণে ও কি প্রণালীতে সংগৃহীত হইয়াছে, অতঃপর সেই কথার আলোচনা করা যাক।

কুরুক্ষেত্রের উপমাসৌষ্ঠব বড় মনোহারী, ইহাতে ভাবের সৌন্দর্য সুন্দরতর হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কবির উপমানগুলি শুধুই উপমেয়ের সদৃশ নহে, তাহাদের নিজের একটা উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য আছে। এ গুণটি কালিদাসী গুণ; কালিদাসের কাব্যেই এই প্রণালীর পূর্ণোৎকর্ষ। দৃষ্টান্ত দেখুন।

উত্তরার রূপ—

"ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরা"।

রণান্তে যোদ্ধাগণ শিবিরে ফিরিল যেন—

"দুই প্রতিকূলানিলে চলিল ছুটিয়া
ফেনিল তরংগমালা মহা পারাবারে।"

সুভদ্রার মুখ—

"শোভিতেছে অন্ধকারে
ফুল্ল অরবিন্দ যথা নীল সরোবরে।"

নদীতীরে রথীদের অসংখ্য চিতা জ্বলিতেছে
নদীনীরে তাহার প্রতিবিম্ব—

"কি যে কি ভীষণ ছবি
নদীগর্ভে অস্ত যেন হতেছে অনন্ত রবি।"

ধীরে ধীরে অতি ধীরে কহিলা সুভদ্রা, যথা
কহে নৈশ সমীরণ:কুসুমের কানে।"
শৈলজার পুণ্যবতী গাভী—
"শ্বেত কাদম্বিনী যেন শোভিল দুয়ারে।"
অশ্রুসিক্ত বিষাদিনীর—
"পড়িছে গৈরিক-কালি ধূসরিত কেশভার
হেমন্তে বিষাদমাখা শিশিরাক্ত অন্ধকার।"

কুরুক্ষেত্রের আখ্যানাংশ অতি পুরাতন—পুরাতন হইতেও পুরাতন। কবি অপূর্ব কৌশলে নূতন চরিত্র-সৃষ্টি ও নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়া সে আখ্যানে এমন নবীনত্ব সঞ্চার করিয়াছেন, যে প্রতি অধ্যায়ে কৌতূহল নবীকৃত হয়, আর কাব্যগত পাত্র-পাত্রীর অদৃষ্টবিবর্তনের সহিত এরূপ প্রগাঢ় সহানুভূতি জন্মে যে, কাব্য সাংগ না করিয়া সুস্থির হওয়া যায় না। কবির এই ত কৌশল! এ অংশে কুরুক্ষেত্র উৎকৃষ্ট উপন্যাসের গল্পাংশের সহিত তুলনীয়।

কুরুক্ষেত্রের বর্ণনানৈপুণ্যও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কবি যুদ্ধের কোলাহলে, বীরের সিংহনাদে, মুমূর্ষুর আর্তস্বরে, অশ্বের হ্রেষারবে, মাতংগের বৃংহতিশব্দে, অস্ত্রের ঝনৎকারে প্রাকৃতিক বর্ণনার বড় একটা সুযোগ পান নাই। তবে বিশেষ কৌশল করিয়া একাদশ সর্গে একটা অবসর সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। আর সেই সর্গ মৃদুল মধুর, শান্ত কাননগীতিতে মুখরিত করিয়া দিয়াছেন। কাব্যরসলোলুপ পাঠক এ সর্গ বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িবেন।

আমি নির্দেশনের জন্য দুই-দশ ছত্র উদ্ধৃত করি।

কি অপূর্ব পুণ্যাশ্রম, কিবা শান্তি নিকেতন
মরুভূমে চারু মৃগতৃষ্ণিকা সৃজন।
কি সুন্দর সরোবর, কিবা বন মনোহর
চারি ধারে বনে কিবা কুটীর সুন্দর

লতা পুষ্পে সুসজ্জিত চিত্র মুগ্ধকর।
কি সুখে কাটিল দিন, সন্ধ্যা-আগমনে
কাকলি-কল্লোল কিবা উঠিল কাননে!
সেই কাকলির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া
বন পুত্র-পুত্রীগণ গাইয়া গাইয়া।

আর সেই সর্গে অভিমন্যু কল্পনায় যে সুন্দর আশ্রম সৃজন করিয়াছেন,—

দেখিয়াছি সিন্ধুতীরে শৈল মনোহর।
নির্মাইব সেই শৈলে আবাস সুন্দর ॥

সেই সুন্দর কল্পনা-আবাস, যদি কখন নিপুণ শিল্পীর চারু শিল্পে বাস্তবে পরিণত হয়, তবে সে সত্য সত্যই ভূতলে স্বর্গ হইবে, কালিদাসের ভাষায়,—

'শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতিমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং' হইবে।

কবি পঞ্চদশ সর্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বীররসের প্রস্রবণ, শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারী, হৃদয়বিস্ফারক ষোড়শ-বর্ষীয় শিশুর বীরগাথা—যাহা কালের প্রস্তরবক্ষে চিরদিন অমর অক্ষরে খোদিত রহিবে, কবি কেমন নিপুণতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। কাব্য-জগতের হিমাদ্রিতুল্য মহাভারতের অমৃতনিস্যন্দিনী, ওজোময়ী বর্ণনা হইতে কবি চিত্তস্পর্শী কথাগুলি বাছিয়া কেমন গুছাইয়া বলিতেছেন!

কতরূপ মৃত্যুজিহ্ব অস্ত্র ভয়ঙ্কর
উঠিতেছে পড়িতেছে ছাইয়া গগন
অসংখ্য বিদ্যুৎগতি তীব্র বিষধর
খেলিতেছে শমনের কি ক্রীড়া ভীষণ!

প্রথম সর্গে রণকোলাহলের বর্ণনা কেমন শ্রবণ কর।

অস্ত্রের নিঃস্বন, ঊর্ধ্বে ঘাতপ্রতিঘাত
কালানল উদ্গীরণ, নিম্নে হাহাকার
মিশি সিংহনাদ সহ অশনি-সম্পাত
কোদণ্ড-টংকার ঘোর শ্রবণে আমার

লাগিতেছে যেন দূর সমুদ্র-হুংকার,
বাত ক্ষুব্ধ সহ ঘন অশনি-ঝংকার।

আর রণান্তে মহাশ্মশান-সমরক্ষেত্রের কেমন সুন্দর মর্মস্পর্শী বর্ণনা।

কুরুক্ষেত্র মহাক্ষেত্র সমাকীর্ণ এবে
বিকৃত মানব শবে—দৃশ্য করুণার।
কেহ বা নিদ্রিত যেন প্রশান্ত বদন
কেহ দন্তে ওষ্ঠ কাটি ঘূর্ণিত নয়নে
চাহি আকাশের পানে মুষ্টিবদ্ধ কর।
কেহ দন্তে তৃণ কাটি আলিঙ্গি বসুধা—
পড়ে আছে স্থানে স্থানে শোণিত-কর্দমে।
কারো অস্ত্রক্ষতে হায় ঝলকে ঝলকে
এখনো শোণিতধারা বহিতেছে বেগে
অঙ্গে অঙ্গে নানা অস্ত্র রয়েছে বিঁধিয়া।

কবি রসের অবতারণায় সিদ্ধহস্ত। প্রাচীন আলংকারিকদিগের মতে রসের উপচয়েই কাব্যের কাব্যত্ব। শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি চিত্তের যে অন্তর্নিহিত স্বভাবসিদ্ধ স্থায়ী ভাবগুলি আছে, তাহার যথোচিত উদ্রেকেই (তাঁহাদের মতে) কবির কৃতিত্ব। তাঁহারা কুরুক্ষেত্র পড়িলে রসের শত ধারায় অভিষিক্ত হইয়া বোধ হয় দিব্য কাব্যামোদ অনুভব করিতেন। শান্তরসাস্পদ আশ্রম, বীররসাত্মক সমরস্থল এবং বীভৎসরসবহুল যুদ্ধক্ষেত্র বর্ণনার আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এখানে অন্যান্য রসের প্রসঙ্গ করিব।

দুর্বাসার নীচ হৃদয়ের হীন অসূয়া বর্ণনা বেশ স্বাভাবিক।

শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম ওই দেখ ওই
মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে।

*   *   *

ভীষ্ম ও ভীরুর শেষে এক পরিণাম।
ওই ভণ্ড, রাজসূয় যজ্ঞে মহাদর্পে
বাড়াইয়া গোপসুতে করিল প্রহার

ব্রাহ্মণের শিরে অসি * * *

ওই ভীষ্মদেব, পড়ি মণ্ডুকের মত !

দশম সর্গে দুর্বাসার ক্রূর জিঘাংসা ও কর্ণের স্নেহোচ্ছ্বাসিত বীর-হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত বড় চিত্তাকর্ষক।

দুর্বাসা— নাহি পারে একরথী, সপ্তরথী মেলি
বধিবে তাহারে রণে ; বধে যেই মতে
মৃগেন্দ্র ফেলিয়া জালে বলে ব্যাধগণ।

কর্ণ— এই ব্যাধধর্ম প্রভু বীরধর্ম নয়
পারিবে না কর্ণ
দেব পিতা, দেবী মাতা, দেবতা মাতুল
জগতের এ দেবত্ব করিব নির্মূল ?
দাতাকর্ণ নাম যার, বিশ্বাসঘাতক,
নরহন্তা, আততায়ী সেই দুরাচার ?

কুরুক্ষেত্রে সোদর-স্নেহের অবতারণা কেমন মধুর, কেমন হৃদয়গ্রাহী। জরৎকারুর বাসুকীস্নেহ এবং সুভদ্রার কৃষ্ণপ্রেম একজাতীয় পদার্থ বটে কিন্তু মানবীর ও দেবীর চিত্তবৃত্তি কবি বিভিন্ন ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

জরৎকারুর উক্তি—

একস্রোতে হায়. আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এ জীবন, এ হৃদয়, সহোদর-স্নেহ
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ !
প্রভু আমাদের নাগরাজ, পিতা মাতা ভ্রাতা সহোদর।
একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
উদাসিনী পত্নী তব ; স্নেহ-পারাবার
ভ্রাতা সে বন্ধন তার।

সুভদ্রার উক্তি—

দয়াময় নাহি শোক, সাধিল তোমার কর্ম
পুত্র যার, তার শোক নাই ধরাতলে।
ক্ষুদ্রলতা দুরবল, প্রসবি বৃহৎ ফল
তাপিত মানব প্রাণ করে সুশীতল

তব পদাশ্রিতা লতা, পুণ্যবতী ভদ্রা তথা
প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল,
সাধিয়াছে যদি দেব! মানবমঙ্গল—
মাতার ত এই সুখ
বড় ভাগ্যবান্ পুত্র, তাহার নিয়তি পূর্ণ,
অপূর্ণ নিয়তি আছে এখনও ভদ্রার,—
ধরাতলে কৃষ্ণ নাম হয়নি প্রচার।

বাৎসল্য মানব-হৃদয়ের অতি সুকুমার বৃত্তি; সুকুমার শিল্পকাব্যে সেই জন্য সেই বৃত্তির ভূয়সী বর্ণনা থাকে। কুরুক্ষেত্রেও আছে। এক অভিমন্যুর প্রতি সুভদ্রা, সুলোচনা ও শৈলজার বাৎসল্য-বর্ণনা, বর্ণপাতের তারতম্য করিয়া কবি কেমন বিচিত্র করিয়াছেন!

সুভদ্রা ও সুলোচনা দেবী ও মানবী।
সুভদ্রা মায়ের স্নেহ স্বর্গ নিরমল
সুলোচনা মার স্নেহ ধরণী শীতল।

আর শৈলজার স্নেহ স্বর্গ ও ধরণীর অন্তরালে যে প্রশান্ত অন্তরীক্ষ—দেবী ও মানবীর সমন্বয় শৈলজার স্নেহ সেই অন্তরীক্ষ।

প্রেম বোধ হয় চিত্তের মধুরতম বৃত্তি। তাই মাধুর্যের স্রষ্টা কবির প্রেম অবশ্যম্ভাবী অবলম্বন। অনাদি কাল হইতে প্রেম কাব্যের উপাদান। কুরুক্ষেত্রে কবি চার প্রকৃতির প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুভদ্রার পতি-প্রেম—সে প্রেম অবাতবিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় প্রশান্ত, গভীর, প্রগাঢ়, ব্যাপক ও সীমাহীন। শৈলজার, অর্জুনপ্রেম—যে প্রেমে সূর্যমুখীর সূর্য-উপাসনার মত কামনার ছায়া, আসক্তির করালতা নাই, কিন্তু নৈরাশ্যের নিরাকাংক্ষা, কল্পনার উন্মাদতা আছে—

কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা,
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পুত্র পার্থ, আমি বাৎসল্যে পূরিতা,

কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার,
অভিন্ন উভয় কভু, নদী-পারাবার।

জরৎকারুর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—যে প্রেম বরিষার বন্যার ন্যায় দুকূলপ্লাবী, গ্রীষ্মান্তবাত্যার ন্যায় প্রচণ্ড প্রখর, উত্তপ্ত মরুভূমির ন্যায় জীবনশোষক।

"গিয়াছে ত প্রেম আশা ; হা হত বিধাত
কিন্তু গিয়াছে কি প্রেম ? যায় কি তা কভু।"

"তুমি মম আরাধ্য ঈশ্বর
পতিত চরণে আজি তব
পিপাসায় পুড়িছে অন্তর।"

"সেই নামে সেই পদে, সর্বস্ব অর্পণ করি
লভিল কি দাসী নাথ ! এ মহা শ্মশান।"
"হায় সূর্যমুখী মত চাহি সেই রবি পানে
এরূপে জীবনবৃন্তে যাব শুকাইয়া
আর,—নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া।"

আর অভিমন্যু-উত্তরার সেই বালকবালিকার প্রেম—যে প্রেম বীচিবিহ্বল তটিনী-প্রবাহের ন্যায় ভঙ্গীময়, রহস্যময়, প্রীতিময়, উৎসবময় ; যাহাতে সহস্র লীলা, সহস্র লহরী, সহস্র চুম্বন, সহস্র কলহ, সহস্র সম্ভাষণ ; যাহা মুখে মুখে, বুকে বুকে, শিরায় শিরায়, জীবনে জীবনে ; যে প্রেমে বিরাম নাই, অবসাদ নাই, অনুচ্ছ্বাস নাই, সংকীর্ণতা নাই। সে প্রেমের উপলব্ধির জন্য পাঠককে সমগ্র কুরুক্ষেত্র পড়িতে হইবে ; তবে কতকটা আভাস—তাহাও ঐকদেশিক—এইখানে পাইতে পারেন।

"এতরূপ এতগুণ পারিজাত-হার
মিলিয়াছে মম ভাগ্যে প্রত্যয় আমার
নাহি হয় পোড়া মনে। জাগ্রত শয়নে
হারালেম, হারালেম, ভয় হয় মনে।
ইচ্ছা করে রাখি সদা নয়নে নয়নে
মিলাইয়া বুকে বুকে জীবনে জীবনে।

কেন এত ভালবাসি, কেন তার তরে
প্রাণ মম নিরন্তর এইরূপ করে!
ইচ্ছা করে চিরি বুক বুকের ভিতর—
রাখি মুখখানি, দেখি জন্ম-জন্মান্তরে।”

কুরুক্ষেত্র শোক-কাব্য। ইহার শেষ তিন সর্গে কবি যে শোকের পাথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিষাদের শেষ সীমা স্পর্শ করিয়াছে। এই শোকের পরাকাষ্ঠা মানবের সুখের সোপান। ‘মানব পবিত্রকারী-এই মহাশোক।’ শোকসৃষ্টিই গ্রীক নাটকের চরম লক্ষ্য ছিল। যেমন অগ্নিসংস্কৃত সুবর্ণের বিশুদ্ধি সাধিত হয়, সেইরূপ এই মহাশোক-বিলোড়িত মানব-হৃদয় উন্নতির উচ্চতর স্তরে সমারূঢ় হয়। এ শোক-সৃষ্টি বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল—প্রবীলার চিতারোহণেও এত শোক উচ্ছ্বসিত হয় কিনা সন্দেহ। অর্জুনের সে শোকক্ষুব্ধ বীর-হৃদয়ের তরল শোকাগ্নিনিঃস্রাব বীর ও করুণ রসের অপূর্ব মিশ্রণ।

সুদর্শন—সংরক্ষিত অমৃত-ভাণ্ডার
হরিলা কি মৃত্যু আজি? হা পুত্র আমার
তোমার অভাবে আজি ধরা মৃত্যু-পুরী,
মৃত্যু-পুরী স্বর্গ আজি প্রভাবে তোমার!

* * *

উঠ বৎস! উঠ! এই পাপ ধরাতলে
এখনও ত ধর্ম্মরাজ্য হয়নি স্থাপিত,
মানব-উদ্ধার বৎস হয়নি সাধিত।

আর উত্তরার সেই শোক-ছবি—রহস্যের উৎস, সংগীতের ঝংকার, ক্রীড়ার প্রস্রবণ, ‘ফুটন্ত হাসির ডালা’ সরলা, আনন্দময়ী বালিকা যখন উন্মাদিনী—চিত্রিতা আকারে, আলুলায়িত-কেশে স্বামীর শবের পাশে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,—

“কহ একবার,
ভাংগিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল-খেলা নাহি ফুরাইতে হায়

ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার ?
ভাংগিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?

* * *

তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল,
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার
ভাংগিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার ?"

যখন স্বামীর চিতাগ্নির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অশ্রুহীননয়নে আকুল প্রাণে কৃষ্ণের উদ্দেশে কাঁদিয়া বলে—

কোথায় রহিলে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি
এই শোক-পারাবারে দেও নাথ, পদ-তরি !

* * *

বিধাতার পূর্ণ সৃষ্টি স্বপ্ন-স্বর্গ উত্তরার
এরূপে কি হল ভস্ম ? চিহ্ন রহিল না তার ?

তখন পাষাণ ফাটিয়া শোকনির্ঝরিণী শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বক্ষে, চক্ষে প্রবাহিত হয়। তুলনায় প্রভেদ স্ফুটতর করা যায়, তাই শোকের সাগর সপ্তদশ সর্গের পাশে কবি হাসির রাশি দ্বিতীয় সর্গে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সপ্তদশ সর্গ যত বারই পাঠ করা যায়, প্রতি বারেই অশ্রুপ্রবাহ সমান বেগে উথলিয়া উঠে।

(২)

কুরুক্ষেত্রের চরিত্র—সম্পত্তি অতি মনোহারিণী। কি বৈচিত্র্য, কি বিশেষত্ব, কি সৌন্দর্য, কি সংগতি, কি স্বাভাবিকতা, সকল গুণেই সেই সকল চরিত্র উৎকৃষ্ট। নাট্যকারের স্পৃহনীয় চরিত্র—চিত্রণের ক্ষমতা কবিতে বিশেষ লক্ষ্য হয়।

কুরুক্ষেত্রের শীর্ষ-অভিনেতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই কেন্দ্রস্থলে। আর তাঁহার জীবনব্রতের স্বপক্ষ—বিপক্ষরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত অন্যান্য চরিত্র। দুর্বাসা, বাসুকি, জরৎকারু এক দিকে, অন্য দিকে ব্যাস, অর্জুন, সুভদ্রা, অভিমন্যু। মরুভূমে ত্রিধারার ন্যায় কবি কুরুক্ষেত্রের

শোণিতকর্দমে আর তিনটি স্ত্রীচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন—তাহারা সুলোচনা, শৈলজা ও উত্তরা। তাহারা কৃষ্ণের জীবনব্রতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সহায়িনী নহে, কিন্তু তাহাদের কাব্যের পাত্র-পাত্রীগণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এই সকল চরিত্র কুরুক্ষেত্র-চিত্রপটে সন্নিবিষ্ট হইয়া সে পটের বিচিত্র সৌন্দর্য সম্পাদন করিয়াছে। কবি আদর্শ-পুরুষ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও সূক্ষ্মতম ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনব্রত—

"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের করিব সাধন,
স্থাপন করিব ধর্ম, এক মহা ধর্মরাজ্য করিয়া সৃজন।"

তাঁহার ধর্মমত—

"নহে বেদ পূর্ণ ধর্ম যজ্ঞ নহে পূর্ণ কর্ম
ধর্ম কৃষ্ণ! সর্বভূতহিত;
তাহার সাধন কর্ম, নারায়ণে কর্মফল
ভক্তিভরে করি সমর্পিত।"

তাঁহার প্রীতি সর্বভূতময়—

"দেখিলে কণ্টক এক চরণে কাহার,
কি বিষম ব্যথা পাই মরমে মরমে!"

তাঁহার চক্ষে—

"শত্রু যুদ্ধকালে
কৌরবেরা; যুদ্ধ-অন্তে ভাই পাণ্ডবের।"

কিন্তু অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী অনন্ত কোটী মানবের মংগলের পথে অন্তরায় হইয়াছে, সেইজন্য—

"নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জুনের রথে
সাধিছেন স্থিরচিত্ত ক্ষত্রিয়বিনাশ।"

কিন্তু—

"সর্বত্র নির্লিপ্ত কৃষ্ণ, সর্বত্র নিষ্কাম,
সর্বত্রই দয়া ধর্ম আদর্শ মহান্!"

সেইজন্য—

"ক্ষুদ্র কীট ছার
যশোলোভে মত্ত যথা; বীর অদ্বিতীয়
ভারতের সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত্র আপনি,
সারথীর ব্রতে ব্রতী।

তিনি যেমন প্রজাপতিরূপে আত্মবলিদান দিয়া এই জগৎসৃষ্টি সম্ভাবিত করিয়াছিলেন, জগৎরক্ষার জন্য আবার সেইরূপ আত্মবলিদান দিতে প্রস্তুত।—

"একই নির্ঘাতে হায়, একই নিমেষে হায়
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়!
একই শ্মশান মাত্র করি যেন প্রজ্বলিত
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত!"

ধর্মবীর ভীষ্মের কথা বড় যথার্থ—

"যাঁর আবির্ভাবে, এই জগতের হায়
তৃতীয় যুগের সৃষ্টি হইল পূর্ণিত
যাঁর পদতরী ভর করি যুগে যুগে
সংসার-অর্ণব যাত্রী যাবে মোক্ষধাম।"

এই আদর্শ চরিত্র এত দিন কথায় পর্যবসিত ছিল; কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহার জীবন্ত চিত্র চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্রের জড় কঙ্কালে এত দিনে রক্ত মাংস, অধিকন্তু জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিলাম, কেন ভারত একদিন কৃষ্ণরসে মাতিয়াছিল, কেন গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্তি, কেন মুখে মুখে কৃষ্ণনাম, কেন আসিন্ধুহিমাচল কৃষ্ণ-পূজা। কেন ভীষ্মের মত রাজর্ষি, ব্যাসের মত ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াছিলেন। কেন শুকমুখগলিত তাঁহার কথামৃত আস্বাদন করিবার জন্য হিন্দু জনসাধারণ লালায়িত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্রে দুর্বাসাচিত্র বেশ ফুটিয়াছে। সেই রৈবতকের দুর্বাসা—

ঋষিকুল—ধূমকেতু, জীবন্ত নরক,
মহাপাপ, মূর্তিমন্ত ক্রোধ অবতার।

কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ—কৃষ্ণ বেদদ্বেষী, কাপুরুষ, চক্রী, গোপ, পামর। এই বিদ্বেষের কারণ রৈবতকে বিবৃত আছে। দুর্বাসার দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণপ্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম অংকুরে উন্মূলিত না হইলে,—

ভস্মিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম যেই পাপানল
প্লাবিবে ভারতরাজ্য দাবানল মত

কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্মরাজ্য—সংস্থাপন বিফল করিবার জন্য তিনি অনার্যের নেতা বাসুকির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

"আইস, ব্রাহ্মণ আর অনার্য শিলায়
মধ্যস্থ ক্ষত্রিয় জাতি পিষিয়া তেমন
নূতন ভারত রাজ্য করিব সৃজন।"

সেই সন্ধিবন্ধন দৃঢ়তর করিবার জন্য দুর্বাসা বাসুকির যুবতী রূপবতী ভগ্নী জরৎকারুর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই বিবাহের সময় হইতে ষোল বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু সাধ্বী রমণীর মত দুর্বাসার প্রকৃতি তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। এখনও কথায় কথায়

"ক্রোধেতে ঋষির অঙ্গ কাঁপে থর থর"

তাঁহার মতে—

"তরুর আবার কেবা পিতা মাতা ভ্রাতা?
হলে বৃক্ষান্তর
"ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক কুঠারে
পূর্ব তরু, আছে তাহে কি দুঃখ লতার?"

জরৎকারু তাঁহার ধর্মপত্নী, কিন্তু সে অনার্যা।—

"অঙ্গ-বাতাসেও তার
হয় দেহ কলুষিত আমি দুর্বাসার;
ঘৃণায় শিহরে অঙ্গ। কিন্তু কি করিব?"

কিন্তু যাবৎ না ব্রত উদ্‌যাপন হয়, তাবৎ

"হইবে সহিতে
অনার্যসংসর্গ—পাপ এই বিড়ম্বনা।"

আর সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের পথে কোন ধর্মবাধা স্থান পাইতে পারে না। শিশু অভিমন্যু যদি সে পথের কণ্টক হয়, তাহাকে অন্যায়-যুদ্ধে উন্মূলিত করিতে হইবে।

"নাহি পারে এক রথী, সপ্তরথী মিলি
বধিবে তাহারে রণে।"

কবি দশম সর্গে কর্ণ-দুর্বাসা-সংবাদে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের এক অভিনব ইতিহাস দিয়াছেন। তাঁহার মতে, কর্ণ দুর্বাসার করচালিত যন্ত্র; তাহারই উপদেশে কর্ণ কৃষ্ণের পঞ্চগ্রামভিক্ষা নিষ্ফল করিয়া কুরুক্ষেত্র-মহানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। দুর্বাসার উদ্দেশ্য, কৌরব-পাণ্ডব ধ্বংস করিয়া কর্ণকে ভারত-সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। আর বাসুকির সহিত যে ধর্মসাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা, তাহার ফলে অনার্য জাতিকে অতল জলে ডুবাইয়া দেয়। এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের আমরা যথাস্থানে বিচার করিব। এখানে এইটুকু লক্ষ্য করা উচিত যে, কবি দুর্বাসায় যে সকল ছলকৌশল আরোপিত করিয়াছেন, তাহা দুর্বাসা-চরিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। কুরুক্ষেত্রের দশম সর্গ অপূর্ব কৌশলে লিখিত—ইহাতে অতি-সংক্ষেপে অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ভাবন এবং ক্রূর, কুটিল, কৌশলী দুর্বাসা-চরিত্রের বিকাশ ও সঙ্গতিরক্ষা দৃষ্ট হয়।

কুরুক্ষেত্রে বাসুকি-চরিত্র বড় ফুটে নাই—বোধ হয় কবি ফুটাইবার অবকাশ পান নাই। দীর্ঘকাল কোথা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অসংখ্য অনার্য জাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার প্রয়াসে ভগ্নমনোরথ হইয়া বাসুকি ভগিনীর কাছে ফিরিয়া আসে। সেই একবারমাত্র তাহার সাক্ষাৎ পাই। তাহার মুখে শুনি,

"ছিলাম ব্যাপৃত
নানা কার্যে, অসম্পূর্ণ এসেছি রাখিয়া।"

কি এই নানাকার্য, কবি তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, করিলে ভাল হইত। কবি এই সুযোগে তদানীন্তন অনার্য্য সমাজের, অনার্য্য-সম্মিলনের, অনার্য অনৈক্যের একটা সজীব চিত্র আঁকিতে পারিতেন। এ চিত্রের আভাস তিনি রৈবতকে দিয়াছেন; সেই চিত্র

উদ্ভাসিত করিতে পারিতেন। তাহা করেন নাই। তাহার ফলে রৈবতকের সেই অনার্য ঈশ্বর, অনার্য শক্তির নব অভ্যুত্থানের নায়ক, সেই দৃঢ়তা, সাহস, শক্তি, সর্বত্যাগী পণের আধার বাসুকির তুলনায়, কুরুক্ষেত্রের বাসুকি যেন নিস্তেজ, নির্জীব, নিরুদ্যম, অলীক চিত্র বলিয়া মনে হয়।

জরৎকারুর নিরাশ প্রেমের প্রসংগ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রেমের ইতিহাস রৈবতক—পাঠকের অবিদিত নাই। কারুর যখন ফুটোন্মুখ যৌবন, হৃদয়ের শত ধারা প্রণয়ের পাত্রে সংক্রামিত হইবার কাল, সেই কালে, কৃষ্ণের সহিত নিত্য দেখা হইত।

"ক্রমে দেখা, ক্রমে কথা, অঙ্কুরিত আশা লতা,
ক্রমে ক্রমে হ'ল পল্লবিত।
ক্রমে নিত্য দরশন নাহি সহে অদর্শন—
ক্রমে ক্রমে পল-পরিমিত।"

শেষে একদিন প্রণয়ের বাসন্তী উষায় কৃষ্ণ কারুর সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিলেন।

"আমি ক্ষুদ্র মানব কি ছার?
এস সহোদরা সম হও ব্রতে সহায় আমার।"

অভিমানিনী কারু এ প্রত্যাখ্যানে পদস্পৃষ্টা ভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিল।—

"নিব ব্রত? লইলাম, দিব ঘোর প্রতিদান
পাইলাম যেই অপমান,
জ্বালাইলে যে শ্মশান করিবে অনার্য প্রাণ
তব তপ্ত রক্তে নির্বাণ।

সেই অবধি হৃদয়ের অবরুদ্ধ শত সুখপ্রবাহ—কারুর সকল আশা ভালবাসা—ভ্রাতা বাসুকির প্রতি প্রধাবিত হইল। তাহার প্রস্ফুট পরিচয় এই কুরুক্ষেত্রে পাই।—

"এক স্রোতে হায় আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এ জীবন, এ হৃদয়; সহোদর স্নেহ
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ * * *

প্রভু আমাদের
নাগরাজ পিতা মাতা ভ্রাতা সহোদর
একই বন্ধনে বাঁধা সংসারের সহ
উদাসিনী পত্নী তব। স্নেহপারাবার
ভ্রাতা সে বন্ধন তার।”

সেই নিরাশ জীবনের ঘনান্ধকারে একটি ক্ষীণালোক দেখা দিল—ভ্রাতার সাম্রাজ্য-আশা। সেই সংগে আর্যের অত্যাচার হইতে নাগভূমির উদ্ধার। সে অত্যাচার কারুর মর্মে মর্মে বাজিতেছিল।

“অনার্য আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্যের,
পশু পক্ষী যেই দয়া পায় আর্যদের কাছে,
আমরা অনার্য নাহি পাই বিন্দু তার,
হায় নাথ, তুমি পিতা নহ কি অনার্যদের
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা?”

সেই সাম্রাজ্য-আশা চরিতার্থ হইবার আশায়, সেই প্রতিহিংসা-ব্রত সফল করিবার কামনায়, বিলাসিনী কৃষ্ণপ্রেমাধিনী কারু, বিকলাংগ কৃষ্ণশত্রু দুর্বাসার সহিত বিবাহবন্ধন অংগীকার করিল। বিবাহ বলিতে আমরা যে পতিপত্নীসম্বন্ধ বুঝি, এ সে বিবাহ নয়। ইহা পণ-উদ্ধারের চুক্তিমাত্র।

“দুর্বাসা আমার নহে পতি
আমি ভার্যা নহি দুর্বাসার
উভয়ে উভয়ে মাত্র দেখি
উভয়ের সেতু কামনার।”

কৃষ্ণই তাঁহার চিরদিন হৃদয়ের স্বামী—জীবনের আরাধ্য ঈশ্বর। কত দিন দেখা নাই, কিন্তু আজিও—

“অংগের বাতাস তার অংগের সুবাস
সেই ফুল্ল কম্বুকণ্ঠে বহুদিন শ্রুত—”

বারেক অনুভব করিবার জন্য কারু বিহ্বলা, বিবশা, দীনা হইয়া

"চেয়ে আছে অভাগিনী, নিদাঘবিদগ্ধ ধরা
কাতরা পিপাসাতুরা চাহি নব ঘনে।
না না নাথ তুমি মম স্বামী
আমি আমরণ তব দাসী।
আগুন ঋষির মুখে, পতি মম সেইজন
জীবনে মরণে মম জনমে জনমে।"

দুর্বাসার কারুর প্রতি ভাব, অনার্যসংসর্গরূপ বিড়ম্বনায় বিরাগ ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অতএব সেই কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতায় যদি না এই দুর্বাসার চুক্তি-পতিত্ব নিমগ্ন হইয়া হারাইয়া যাইত, তবে আমরা কবিকে অসংগতি-দোষে অপরাধী বলিতে পারিতাম।

আর সেই গভীর প্রেমে নৈরাশ্যের তীব্রতাই বা কত?

"হয় ত উদয়
অস্ত রবি, অস্ত প্রেম ফিরে না কি আর?
নাই যদি পাইলাম কেন নাহি মরিলাম
হায় নাথ চরণে তোমার?"

জ্বলিয়া জ্বলিয়া অভাগিনীর হৃদয় মরুভূমি হইয়াছে।

"হায় মাত বসুন্ধরে দয়াময়ী তুমি!
বহিতেছ বক্ষে তব কত মরুভূমি।
এ হৃদয়-মরুভূমি কর মা গ্রহণ!"
কারুর হৃদয়ের নিকুঞ্জ বনে
"আজি জ্বলিতেছে কিবা দাবাগ্নি ভীষণ!"

উন্মাদিনী প্রতিহিংসাব্রত আজিও ভুলে নাই—প্রভাসে উদ্‌যাপিত করিবে।

"আর নাগবালা আমি দংশিয়া তাহার বুকে
মারিব, মরিব তাকে এ বুকে লইয়া।"

প্রেমনিরাশা, প্রতিহিংসা, রাজ্যলিপ্সা, স্নেহ, কোমলতা, অভিমান,

সহিষ্ণুতা,—এই সকল বিচিত্র বৃত্তির সামঞ্জস্যে ও সংঘর্ষে কারু-চরিত্র। জগতের কাব্যে এরূপ চরিত্রের সংখ্যা অধিক নহে।

(৩)

ধর্মরাজ্যস্থাপনে কৃষ্ণের প্রধান সহায় ব্যাস, অর্জুন, সুভদ্রা, অভিমন্যু। ব্যাস ও অর্জুন-চরিত্রের বিস্তৃত সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। কবি রৈবতক ও কুরুক্ষেত্রে তাঁহাদের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে ধারণা হয় যে, কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত

নব ধর্মমন্দিরে
ধনংজয় বাহুবলে
করিতেছে কুরুক্ষেত্রে পরিখা খনন ;
বিশ্বকর্মা দ্বৈপায়ন
করিবেন জ্ঞানবলে
এই পরিখায় নব মন্দির সৃজন।
তাঁহার গাণ্ডীব জ্ঞান, অস্ত্র তত্ত্বরাশি
তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র গীতা, নিত্য, অবিনাশী।

সুভদ্রা আদর্শ রমণী—'রমণীর পূর্ণ সৃষ্টি, রৈবতকের সেই বালিকা, এখন যুবতী হইয়াছে। অর্জুনের প্রণয়িনী আজ অভিমন্যুর মাতা। তরল জল ও ঘন তুষারে যে প্রভেদ, রৈবতকের সুভদ্রা ও কুরুক্ষেত্রের সুভদ্রায় সেই প্রভেদ; যেমন অষ্টমীর চন্দ্র পরিণত হইয়া পূর্ণিমায় ষোলকলায় পূর্ণিত হয়, যেমন ক্ষুদ্রা গিরি-নির্ঝরিণী শ্যামল ক্ষেত্রে পূর্ণতোয়া হইয়া জীবনরূপিণী হয়, বালিকা সুভদ্রা যুবতীতে বিকশিত হইয়া সেইরূপ হইয়াছে।

সুভদ্রা 'ভূতলে রূপের স্বপ্ন', গুণের সমষ্টি। গীতার অপার্থিব ধর্ম তাহাতে মূর্তিমান্। রৈবতকে আমরা শুনিয়াছি।

যেইখানে রোগী শোকী ভদ্রা সেইখানে
মূর্তিমতী শান্তিরূপে। অশ্রু যেইখানে
সেখানে ভদ্রার কর।

কুরুক্ষেত্রে দেখি—সুভদ্রার

নাহি রাত্রি নাহি দিন থাক প্রলেপের মত
লাগি অংগে আহত সবার।

শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার !

রণান্তে প্রতি সন্ধ্যায় সেবক-সেবিকা সৈন্য-চিকিৎসক সহ রণস্থল ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার জীবনের ব্রত পরহিত।

তোমার অশ্রুতে অশ্রু করিব বর্ষণ
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পারি যদি মুছাইতে
এক বিন্দু, হবে মম সার্থক জীবন।

তাহার রমণী-জীবন-আদর্শ অতি মহান্।

জগতের পত্নী জগতের মাতা
জগতের দাসী রমণীচয়।

(রৈবতক)

রোগে শান্তি দুঃখে দয়া শোকেতে সান্ত্বনা-ছায়া
দিদি এই ধরাতলে রমণীর বুক।

(কুরুক্ষেত্র)

তাহার কাছে শত্রু-মিত্র, আর্য-অনার্যে ভেদ নাই।

"তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার।"
"শত্রু এক ভগবান্ সর্বদেহে অধিষ্ঠান !
সর্বময় এক অদ্বিতীয়।"
"না বোন, অনার্য আর্য কহিতে লাগিলা ভদ্রা
একই পিতার পুত্র কন্যা সমুদয়
এক রক্ত এক মাংস এক প্রাণ সকলের
এক আত্মা, এক জল, ভিন্ন জলাধার।"

তাহার ব্যাপক হৃদয়ে পাপীর জন্যও স্থানের অসদ্ভাব নাই।

যেই জন পুণ্যবান্ কে না তারে বাসে ভাল
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ;
পাপীরে যে ভালবাসে আমি ভালবাসি তারে
সেই জন প্রেম-অবতার।

আর জগতের মংগল-আকাংক্ষা, জাগতিক প্রীতির পরিমাণই বা কত!

স্নভদ্রার পতি পুত্র আত্ম-সমর্পণ
করি এই হুতাশনে পৃথিবী-পাবক
করি ধরাতলে ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন
মানবের সুখপথ করে উন্মোচন ;—
তবে শৈল! ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী আর
কে আছে এ ধরাতলে মত সুভদ্রার ?

এই জগতের হিতে আত্মবিসর্জনে আমরা স্নভদ্রার কঠোর কর্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাই। সেই জন্য ধর্মপালনে তাঁহার এত অনুরাগ। তিনি পুত্রকে আশীর্বাদ করেন,—

লও আশীর্বাদ করি স্বধর্মপালন
গীতার সাম্রাজ্য কর জগতে স্থাপন।

কৌরবেরা অন্যায় যুদ্ধে পুত্রের ঘোর অমংগল ঘটাইবে জানিয়াও, সুভদ্রা সেই জন্য পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে মানা করিলেন না।

ধর্মযুদ্ধে করিয়া বারণ
কুমারে, কেমনে ধর্মে হইব পতিতা।

সেই জন্য পুত্রের বিদায়ের কালে হৃদয়ে অমংগল বিষাদ-ছায়া জাগিলেও

তথাপি একটি রেখা মুখে রূপান্তর
হইল না সুভদ্রার।

ভ্রাতার ধর্মরাজ্যস্থাপনব্রতের উদ্‌যাপন জন্য ভগিনীর কতই প্রয়াস, কতই একাগ্রতা!

"পিতাপুত্র শ্লথ করে করিতেছে রণ
কৃষ্ণ-সুভদ্রার যত্ন যাইছে ভাসিয়া।"

* * * *

"দয়াময়! নাহি শোক সাধিল তোমার কর্ম
পুত্র যার, তার শোক নাহি ধরাতলে।
তব পদাশ্রিতা, পুণ্যবতী ভদ্রা তথা

প্রসবিয়া অভিমন্যু এই মহাফল
সাধিয়াছে যদি দেব মানবমংগল"

এইরূপে দুইজনে প্রেম আলিংগনে
বাঁধিব অনার্য-আর্য। গাইবে জগৎ
কৃষ্ণনাম ; কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিবে ধরণী।

কবি সুভদ্রাকে পুত্রশোকে পোড়াইয়া তাহার অগ্নিপরীক্ষা দেখাইয়াছেন। সে অগ্নিও সুভদ্রার স্পর্শে চন্দনশীতল হইয়াছে। শোকের সাগর কুরুক্ষেত্র শবচক্রমহাবেলার মধ্যে, স্তম্ভিত প্রাংগণে যথায় বিরাটপতি মূর্চ্ছিত, 'পাণ্ডব সকল বাণবিদ্ধ মীন-মত',

কেন্দ্রস্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়
নিদ্রা যাইতেছে সুখে ; বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিত, মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা

সেই মহা শোকক্ষেত্রে

কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক বিস্ফারিত,
কেবল অচল সেথা একটি হৃদয়
সেই নেত্র, সেই বুক মাতা সুভদ্রার।

জননী যোগস্থা হইয়া পৃথিবী ভুলিয়া অচেতনা, আকাশের পানে চাহিয়া আছেন।

এ ভাব কাহারও কাহারও চক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রথমত সুভদ্রা সমাধিস্থা ছিলেন, অর্থাৎ শোকের বস্তু হইতে চিত্ত প্রত্যাহার করিয়া ভগবানে নিবিষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমাধির ফলে প্রহ্লাদ অস্ত্রের ছেদ ও অগ্নির দাহন-জ্বালার ক্লেশও অনুভব করেন নাই। দ্বিতীয়ত তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অভিমন্যুর মরণে মানবমংগল সাধিত হইবে।

আমরা সকলে মেলি সাধিতেছি যেই ব্রত
একা অভিমন্যু আজি করিল সাধন।

সফল জীবন ব্রত, অধর্ম হয়েছে হত
স্থলোচনা-মাতৃপ্রেম, অভিমন্যু-আত্মদান,
নব ধর্ম-রাজ্য-ভিত্তি, চূড়া তার কৃষ্ণনাম।
এই নব ধর্মামৃতে দুঃখ রহিবে না আর
জগতের, হবে ধরা সুখ-শান্তি পারাবার।

শেষ কথা, সুভদ্রার স্নেহ এক পুত্রে সীমাবদ্ধ না হইয়া সমগ্র মানবজাতিতে সংক্রামিত হইয়াছিল!

সমগ্র মানবজাতি আজি অভিমন্যু মম,
আজি অভিমন্যু মম বিশ্ব-চরাচর,
এক মর পুত্র মম হারাইয়া লভিয়াছি
আমি কি মহান্ পুত্র অনন্ত অমর।

এই সুভদ্রা চরিত্র। এরূপ শোভাময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়, মহিমাময় চরিত্র জগতের সাহিত্যে বিরল।

কৃষ্ণ, অর্জুন, সুভদ্রা ও অভিমন্যু সম্বন্ধে কবির এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

জ্ঞান দেব নারায়ণ, বল দেব ধনংজয়,
মধ্যে ভক্তি দেবী ভদ্রা, সম্মুখে মহিমাময়
চিতা আত্মবিসর্জন, জ্ঞান বল আত্মদান
ভক্তির নিষ্কামসূত্রে সম্মিলিত সম প্রাণ!

কি মহান্ উদ্দেশ্য, কি বিশাল উত্থম, কি যুগসংচারী মত! এই উদ্দেশ্য; উত্থম, মত যে পরিমাণে মহান্, বিশাল, যুগসংচারী, তাহার সাধনের জন্য বলিদানের বস্তুর তেমনি গৌরব, মহিমা, মহত্ত্ব হওয়া উচিত। এইরূপে সৃষ্টির সামঞ্জস্যবিধি রক্ষিত হয়। কবি অভিমন্যু-চরিত্র যে তুলিতে অংকিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা হয় যে ধর্মরাজ্য স্থাপন, এবং মানব-উদ্ধার সাধনার্থে অভিমন্যু যোগ্য বলিদান।

অভিমন্যু 'কৌরবখনির শিশুমণি সর্বোত্তম'। ত্রিদিবপ্রসূত বারিবিন্দু পৃথিবীর শুক্তিতে মুক্তায় ঘনীভূত হইয়াছে।

দেব প্রতিভায়,
বিক্রমে মাহাত্ম্যে জ্ঞানে অভিমন্যু মম
কেশবের সমকক্ষ, রথি-গণনায়
আমার (অর্জুন) অপেক্ষা পুত্র শ্রেষ্ঠ অর্ধগুণে।

তাহার প্রীতি সীমাহীন ;
শত্রু মিত্র তার কাছে উভয় সমান,
উভয়ে সমান প্রীতি, ভক্তি সমতুল ;
শিশুরা সকলে ভাই, পিতৃব্য আমরা
সকলেই ; পত্নীগণ সকলি-জননী,—
সমস্ত জগৎ তার প্রেমের নির্ঝর।

ইহার ফল আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিতে পাই,—
যথায় ক্ষত্রিয়গণ হইয়াছে সমবেত
সেই যুদ্ধে কেন হই আমি বা কাতর এত।
কেন সিংহশিশু আমি শুনি বীর সিংহনাদ
না নাচে হৃদয় মম।

মাতা-পিতা-মাতুলের প্রতি তাহার ভক্তি-শ্রদ্ধা অগাধ, অপরিমেয় ;
মাতা দেবী, পিতা দেব, মামা নারায়ণ,
আমি তোমাদের মাগো পুত্র নরাধম।

তাহার পত্নী-প্রেম অতলস্পর্শ—
ইচ্ছা, থাকি প্রেম-অনন্ত-স্বপনে
ঐ বুকে মরি, জাগি না আর।

কুরুক্ষেত্রের মৃত্যুশয্যায়—
কহিল কুমার, 'সূত! ললাটে আমার
লেখ হৃদয়ের রক্তে শরের জিহ্বায়
কৃষ্ণার্জুন নাম, মধ্যে মাতা সুভদ্রার—
লেখ বুকে অনাথিনী নাম উত্তরার।'
* * গাহিতে গাহিতে
পুণ্য-নাম-চতুষ্টয় মুদিল নয়ন।

অভিমন্যুর কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপালন সুভদ্রাসুতের অনুরূপ।

স্বধর্মপালনে মাগো করি প্রাণদান
জন্মে জন্মে তোমাদের পদে পাই স্থান।

* * *

ধর্মযুদ্ধ প্রিয়তমে স্বধর্ম আমার
এই কুরুক্ষেত্র মম ত্রিদিবের দ্বার।

* * *

সাধুদের পরিত্রাণ দুষ্কৃত দমন
সাধিব, করিব ধর্মসাম্রাজ্য—স্থাপন।

আর উত্তরা—

ক্ষুদ্র একখণ্ড ফুল্ল নিরমল
বৈশাখী জ্যোৎস্না অমৃতে ভরা

উত্তরা বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি; এত হাসি ও অশ্রুর সম্মিলন, এত প্রমোদ ও বিষাদের সমাবেশ, এত মেঘ ও রৌদ্রের মিশামিশি, আর কোথায় আছে, মনে পড়ে না।

উত্তরা যে বীরপত্নী, বীরোত্তম অভিমন্যুর অর্ধাংগী, তাহা একটি ঘটনায় বেশ বুঝা যায়।

"পতিশোকে বিষাদিনী
উঠি ধীরে ধীরে শেষে কহিল, 'মা চল যাই'
কোথায়? মা উত্তরার এক ভিন্ন গতি নাই
পতির জলন্ত চিতা।"

কিন্তু যখন অনাথিনী উত্তরা শুনিল যে,

"তুমি কৌরবের লক্ষ্মী, আছে মা গর্ভে তোমার
একই অংকুরমাত্র কৌরবের ভরসার।"

তখন সে মৃত্যুর অধিক জীবনব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হয়।

ছয় মাস পরে যেন ছয় যুগ-উত্তরার
উত্তরা আসিবে অন্তে স্বর্গে তার তপস্যার।
পতির চিতায় এই মৃত প্রাণ সমর্পণ
নহে মৃত্যু, অনাথার দীর্ঘমৃত্যু এ জীবন।

কুরুক্ষেত্রের আলোচ্য চরিত্রসৃষ্টির শেষ দৃষ্টান্ত শৈলজা। রৈবতকের পাঠকের কাছে, শৈলজা অপরিচিতা নহে। রৈবতকের সমালোচনায় দেখিয়াছিলাম যে, অতুল রূপ, অমৃতভরা হৃদয়, অদ্ভুত সাহস, অকৃত্রিম প্রেম, অযাচিত আত্মত্যাগ, নিরাশায় অতুল শান্তি, সকল মিলিয়া শৈলজা এক অপূর্ব সৃষ্টি হইয়াছে। দেখিয়াছিলাম, নাগবালা শৈলজা পিতৃহন্তা অর্জুনকে কাল-ভুজংগিনী মত দংশন করিবার জন্য ছদ্মনামে ছদ্মবেশে অর্জুনের দাসত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অর্জুনের প্রীতিপূর্ণ মুখ, শোকপূর্ণ অনুতাপ দেখিয়া শুনিয়া তাহার হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটে। শেষে অভাগিনী প্রতিহিংসা ভুলিয়া অর্জুনের পদে অনাথ জীবন সমর্পণ করে। অবশেষে অর্জুনকে সুভদ্রার প্রেমাকাংক্ষী দেখিয়া নিরাশহৃদয়ে তাঁহার সুখাকাংক্ষায় আত্ম-সুখ বলিদান দিয়া অর্জুনের সুভদ্রালাভের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেয়। তাহার পর আরক্তবসন-ধারিণী যোগিনী সাজিয়া বাষ্পোচ্ছ্বাস-অবরুদ্ধ কণ্ঠে অর্জুনের নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়া শৈলজা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়।

কুরুক্ষেত্রে যখন তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখন শৈলজা নব-জীবন লাভ করিয়াছে। এই নূতন জীবনলাভের কাহিনী কবি অপূর্ব কৌশলে বিবৃত করিয়াছেন। অর্জুনের কাছে বিদায় হইয়া একাকিনী অনাথিনী শৈলজা নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। পৃথিবীর শত সৌন্দর্য তাহার নিরাশ চক্ষে মরুময় বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে অর্জুনের প্রতি পতিভাব ঘুচিয়া পিতৃভাব ফুটিতে লাগিল। করাল কামনা সুখময়ী কল্পনায় পরিণত হইল। শৈলজা হৃদয়ে শান্তি অনুভব করিল।

"ঈর্ষ্যা নরক নিভিল হৃদয়ে
ভাসিল শান্তি শীতল
মেলিনু নয়ন— বেলা অবসান
শান্তিপূর্ণ ধরাতল।"

সেই অবধি শৈলজার নব-জীবন আরম্ভ হইল। শৈল বিন্ধ্যাচলে

পার্থের মৃন্ময়মূর্তি গড়িয়া ভক্তিভরে তাহার পূজা করিতে লাগিল; চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া পূজিতে পূজিতে

সেই পতিভাব দেখি হইল বিলীন
সিন্ধুমুখী গংগা মত। এই চরাচর
হইল অর্জুনময়, হইনু তন্ময়।

একদিন ব্যাসদেব শৈলজার কুটীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিলেন,

সিদ্ধ তব পার্থপূজা, পূজ তুমি এবে
পার্থরূপে ভগবান্ অনন্ত সুন্দর।
× × × পূজ ভক্তিভরে তবে
আদর্শ মানব কৃষ্ণ যুগ-অবতার
পার্থ কৃষ্ণে, কৃষ্ণে কর নারায়ণে লয়।

শৈলজা পিতার মুখে শুনিয়াছিল, ধর্মেই সুখ, 'ধর্ম বিনা আর, হইবে না কোনমতে অনার্য উদ্ধার।' সে ব্যাসের বাক্য শিরোধার্য করিল।

গাও তবে কৃষ্ণনাম, গাও বনে বনে
পতিতপাবন নাম, অনার্য-উদ্ধার
হবে এই নামে; মন্ত্র নাহি জানি আর।

তদবধি শৈলজা পরহিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। বনে বনে কৃষ্ণনাম গাহিয়া অনার্য উদ্ধারের, ধর্মরাজ্যস্থাপনের সহায়তা করিতে লাগিল।

বিন্ধ্যাচলে শৈলজার পুণ্যাশ্রমে একদিন অভিমন্যু মৃগয়ায় পথ হারাইয়া উপনীত হন। তাঁহাকে দেখিয়া শৈলজার—

"কি মধুর স্নেহ-হাসি ফুটিল সে মুখে
কি মধুর স্নেহ-স্রোত উথলিল বুকে।"

সেই অবধি একটি নূতন স্নেহনির্ঝর শৈলজার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার হিল্লোলে আকুল হইয়া শৈলজা গভীর নিশাকালে অর্জুনের শিবিরে সুভদ্রার সহিত সাক্ষাৎ করে। এই সুভদ্রা-শৈলজা মিলনে কবি উভয় চরিত্রের বৈচিত্র্য বড় সুন্দরভাবে প্রস্ফুট করিয়াছেন। উভয়ই পার্থানুরাগিনী, উভয়ই অভিমন্যুর প্রতি স্নেহময়ী; কিন্তু উভয়ের স্নেহ ও প্রেম কত ভিন্ন প্রকৃতির!

যোগের একটা অবস্থা আছে, তাহাকে কষায় বলে ; সে অবস্থায় বৃত্তি থাকে না, কিন্তু বৃত্তির বীজ অতি নিস্তেজভাবে চিত্তের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে। বিক্ষেপের প্রবল হেতু উপস্থিত হইলে, সেই বীজ দগ্ধ হইয়া চিত্তবৃত্তিরূপে প্রকটিত হয়। কষায় অবস্থার এই বীজ দগ্ধ করিতে পারিলেই যোগীর সাধনা সম্পূর্ণ হয়, যোগী সমাধিলাভ করেন।

শৈলজার পার্থপ্রেম অনেক সাধনায় এই কষায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিল না, কিন্তু নিস্তেজ বীজ মর্মের অন্তস্থলে নিহিত ছিল। সেই বীজ দগ্ধ করিল অভিমন্যুর শোক। যোগিনীর যোগসাধনা সম্পূর্ণ হইল। হৃদয় নির্বাত, নিষ্কম্প সাগরের ন্যায় গভীর শান্তিতে ভরিয়া উঠিল। চতুর্দশ বৎসরের তপস্যার পরে

> ছিল যেই শুভ্র ছায়া প্রাণে কামনার
> পুত্র আজি প্রাণ দিয়া, মুছাইল সেই ছায়া
> পতি পিতা পুত্র তুমি আজি শৈলজার
> পুণ্যবতী—আজি পূর্ণ তপস্যা আমার।

অতএব

> শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্র সমর্পিয়া সুখে,
> করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
> গাই কৃষ্ণ—নাম, মা'গো, জুড়াই জীবন।
> বনবিহংগিনী মত উধাও উড়িয়া
> গাব কৃষ্ণনাম মাগো বিশ্ব জুড়াইয়া।

শোকে এই অপূর্ব শান্তি বিধান করিয়া পিতৃস্নেহ-শৈলে অবরুদ্ধ গৃহমুখী পতিপ্রেম-মন্দাকিনী-ধারা পতিত অনার্য জাতি উদ্ধার জন্য বনভূমে বহাইয়া, কবি শৈলজা-চরিত্র সাংগ করিয়াছেন।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে সুভদ্রা ও শৈলজা কেবল আর্য ও অনার্য রমণীমাত্র নহে, কিন্তু আর্য ও অনার্য শক্তির প্রতিরূপ। যমুনা ও জাহ্নবী যেমন প্রয়াগে মিলিত হইয়া পুণ্যতম তীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ আর্য ও অনার্য শক্তি কৃষ্ণের পদতলে সম্মিলিত হইয়া পতিত উদ্ধার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। (সাহিত্য, ১৩০২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত

বীরেশ্বর পাঁড়ে

সুপ্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই তিনখানি পৃথক-নামীয় গ্রন্থ হইলেও একই গ্রন্থের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন পর্ব। কেন না রৈবতকের নায়ক, নায়িকাগণই কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের নায়ক-নায়িকা—এবং তিনখানিরই মূল বর্ণনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণচরিত্র। কবি নিজেই বলিতেছেন, "রৈবতক-কাব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র-কাব্য মধ্যলীলা, এবং প্রভাস-কাব্য অন্তিম লীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।" কবি ইহাকে কাব্য নামে অভিহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা সামান্য কাব্য নহে। অলীক গল্পের কাব্য নহে, ঐতিহাসিক কাব্য। প্রচলিত ইতিহাস অবলম্বনে পূর্ব পূর্ব কবিগণ যেরূপ ঐতিহাসিক কাব্য লিখিয়া আসিয়াছেন এ সেরূপ ঐতিহাসিক কাব্য নহে। আমাদের সাহিত্যানুরাগী সুপণ্ডিত বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কবি প্রতিভাবলে অন্ধকারাবৃত প্রাচীনকালের প্রকৃত ইতিহাস এই কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু ইহার সমালোচনা উপলক্ষে সাহিত্য নামক মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন—

"কবি আদর্শ পুরুষ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও সূক্ষ্মতম ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।...এই আদর্শ চরিত্র এতদিন কথায় পর্যবসিত ছিল, কবি অপূর্ব প্রতিভাবলে তাহার জীবন্ত চিত্র চিত্রিত করিয়া বাংগালী পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। বংকিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্রের জড় কংকালে এতদিনে রক্ত মাংস, অধিকন্তু জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছে।"

বংকিমবাবু নাকি ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া বলিয়াছেন, অনেকে ইহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত বলিবে। আমরাও হীরেন্দ্রবাবুর

ও সেই মহাত্মার বাক্যের অনুসরণ করিয়া এই কাব্যত্রয়কে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত বলিয়া স্বীকার করিলাম।

কাব্যত্রয়ের স্থূল মর্ম এই—

পূর্বকালে এই ভারতবর্ষ নাগ নামক জাতি-বিশেষের বাস-ভূমি ছিল; সেই নাগেরাই ভারতের অধিপতি ছিল। মধ্য-আসিয়া হইতে আর্যজাতি ভারতে উৎপতিত হইয়া, নাগ জাতিকে আক্রমণ ও পশু-বলে ভারতকে শোণিতে প্লাবিত করিয়া, তাহাদের সেই বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিলেন। সেই প্রাচীন জাতি রাজ্য হারাইয়া, আর্যদের ভয়ে হিংস্র জন্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, বন ও পর্বতে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। কতকগুলি অনার্য নাগ আর্যদের শরণাপন্ন হইল, তাহাদিগকে আর্যেরা দাসত্বজীবী অস্পৃশ্য শূদ্র নামে অভিহিত করিলেন। আর্যেরা ভারত অধিকার করিয়া ক্রমেই আপনাদের উন্নতি করিতে লাগিলেন; সমগ্র ভারতে তাঁহাদের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল; 'রক্তার্ণবে' শত শত নগর নির্মিত হইল, নানা বিদ্যা ও উৎকৃষ্ট ধর্ম প্রচারিত হইল। কালে ব্রাহ্মণেরা নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িলেন; তাঁহারা স্বার্থসাধন অভিপ্রায়ে বর্ণভেদ-প্রথার সৃষ্টি করিলেন, প্রীতির মূর্তি সমাজ-দেহকে কাটিয়া চারি খণ্ডে বিভক্ত করিলেন, এবং বেদের প্রাকৃতিক উপাসনার স্থলে যাগ-যজ্ঞ প্রবর্তিত করিলেন। ভারত 'যজ্ঞধূমে মেঘাচ্ছন্ন' হইল, মানবগণ 'বেদভারে প্রপীড়িত' হইল। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, এইরূপে আর্যজাতি অধঃপাতের পথে প্রস্থিত হইলে, পরমেশ্বর আর্যজাতির এই অধঃপতন নিবারণের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। নারায়ণাবতার কৃষ্ণ দেখিলেন, সমগ্র ভারতবাসীকে একজাতীয়, একধর্ম-বিশিষ্ট ও এক রাজার অধীন না করিতে পারিলে ভারতবাসীকে ধর্মপরায়ণ করিতে পারা যাইবে না; কিন্তু সে কার্য সাধন করিতে প্রভূত বলের আবশ্যক। তাই কৃষ্ণ স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে অর্জুনকরে সমর্পণ করিয়া পাণ্ডবকুলের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিলেন। ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রভুত্ব নষ্ট করিবার অভিলাষী

হইয়াছেন, কৃষ্ণ কৃতকার্য হইলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়ের অধীন হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা অনার্য জাতির সহায়তায় ক্ষত্রিয়-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন; ক্ষত্রিয়ের অপরাধ এই যে ভীষ্ম কৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এক জনের অপরাধে সমগ্র ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসেই ব্রাহ্মণেরা কৃতসংকল্প হইলেন। দুর্বাসাই ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি স্বরূপ। কৃষ্ণের ও সমগ্র আর্যজাতির পরম শত্রু নাগরাজ বাসুকীকে কৃষ্ণের ও ক্ষত্রিয়ের বিদ্বেষী করিবার অভিপ্রায়ে দুর্বাসা যোগবলের ভাণ করিয়া নানাপ্রকার বুজরুকি দেখাইলেন, এবং তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা হইবে ভাবিয়া জগৎকারুরূপ ধারণ করিয়া বাসুকীর ভগ্নী জগৎকারুকে বিবাহ করিলেন। এ বিবাহ কিন্তু দুর্বাসার যেমন মনোগত নহে, বাসুকী ও জগৎকারুরও সেইরূপ মনোগত নহে। দুর্বাসা দেখিলেন অর্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইলে দুইটী প্রবল কুল মিলিত হইয়া ক্ষত্রিয়বল দৃঢ় হইবে। এই নিমিত্ত যাহাতে এই বিবাহ না হয়, প্রত্যুত এই বিবাহ উপলক্ষেই ক্ষত্রিয়-জাতির মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়, তাহার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলরামকে পাণ্ডবগণের প্রতি কোপান্বিত করিয়া দিয়া দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে দুর্বাসার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিলেন। কবি এইরূপে ধর্মরাজ্যের বীজ রোপিত করিয়া রৈবতকের শেষ করিয়াছেন।

দুর্বাসা চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া, সমগ্র অনার্য-জাতিকে একতা-সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য বাসুকীকে অনার্যগণের সমীপে প্রেরণ করিলেন, এবং মন্ত্রপুত্র ও শিষ্য কর্ণকে ভারতের অধিপতি করিবেন আশা দিয়া ক্ষত্রিয়মধ্যে গৃহবিবাদের সূচনা করিয়া দিলেন। কর্ণের পরামর্শে দুর্যোধন পাঁচখানি গ্রাম দিয়াও পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিলেন না; কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বাসুকী অন্যূন ১৭ বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু একজন অনার্যকেও স্বমতে আনিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। দুর্বাসা তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ

না হইয়া কহিলেন, "ক্ষতি নাই এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইহারা আপনা আপনিই বিনষ্ট হইবে; আসল বদমায়েস ভীষ্মটা গিয়াছে, অচিরে সমস্তই যাইবে।" অনন্তর দুর্বাসা রাত্রে কর্ণকে স্বীয় আশ্রমে আনাইলেন ও সপ্তরথী মিলিত হইয়া অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহত করিবার উপদেশ দিলেন। পরদিন সেই পরামর্শমতে অভিমন্যুর বধ সাধন হইল। কিন্তু তাহা হইলেও যুদ্ধশেষে কৃষ্ণপক্ষেরই জয় হইল। পাণ্ডবেরা সমগ্র ভারতের একচ্ছত্রাধিপতি হইলেন। কৃষ্ণের ঈপ্সিত ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইল। এইখানে কুরুক্ষেত্র সমাপ্ত।

কৃষ্ণ, সুভদ্রা ও শৈলজানাম্নী নিষ্কামধর্মপরায়ণা নাগ-কন্যার সহায়তায় সমগ্র ভারতে গীতা ও কৃষ্ণনাম প্রচারিত করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভারতবাসী ভক্তিভাবে কৃষ্ণনামামৃত পান করিতে লাগিল; দ্বেষ-হিংসা এককালে লোকের হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইল; আর্য, অনার্য, ধনী, জ্ঞানী সকলেই প্রেমভরে মিলিত হইয়া এক হইল। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইল; এক রাজার অধীন থাকিয়া সমগ্র ভারতবাসী শান্তিলাভ করিল; অনার্যগণ অংগে কৃষ্ণনাম লিখিয়া প্রেমভরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নৃত্য করিতে ও গড়াগড়ি দিতে লাগিল; কেহ রাখাল সাজিয়া, কেহ গোপী সাজিয়া ব্রজলীলা করিতে লাগিল। সমগ্র ভারত কৃষ্ণনামে মত্ত হইল। বাসুকীও কৃষ্ণের ভক্ত হইয়া পড়িলেন। দুর্বাসা কিন্তু এখনও ছাড়েন নাই। তিনি এখন যদুবংশ-ধ্বংসের চেষ্টাতেই আছেন। তিনি নাম মাত্র পত্নী কৃষ্ণরূপমুগ্ধা, কৃষ্ণপ্রেমবঞ্চিতা জরৎকারুর দ্বারা যদুবংশীয়গণকে মদ্যপায়ী করিয়া তুলিলেন। জরৎকারু কৃষ্ণকে দেখিবার উদ্দেশ্যে, দুর্বাসার আজ্ঞাপালন উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি রজনীতে কৃষ্ণের আলয়ে যাইতেন। সাত্যকি সেই সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন ও তাহার প্রেমের আশায় তাহার প্ররোচনায় যদুবংশীয়গণকে সুরাপান শিখাইলেন; যদুবংশীয়গণ ভয়ানক মাতাল হইয়া পড়িল। এই সকল আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে বাসুকী দুর্বাসার নিকট আসিয়া কহিল, "ভারতের সমস্ত আর্য ও অনার্যগণ কৃষ্ণের উপাসক হইয়াছে,

কেহই কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না। কি আর্য কি অনার্য সকলেই প্রভাসে কৃষ্ণ-দর্শনে আসিতেছে, কেবল আমার সৈন্যগণ সজ্জিত আছে, তাহারা গোপনভাবে প্রভাসে আসিবে।” তখন দুর্বাসা আবার যোগানল বলিয়া পার্বতীয় অগ্নি দেখাইয়া বাসুকীকে ভুলাইলেন। বলিলেন “অদ্য নিশ্চয়ই যদুবংশ ধ্বংস হইবে, আমি তাহার সমস্ত আয়োজন করিয়াছি। তুমি সৈন্যগণসহ অদ্য রজনীযোগে প্রভাসক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অন্তরাল হইতে যাদবগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে।” তাহাই স্থির হইল। ঐ দিন কৃষ্ণদর্শনাভিলাষী লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রভাসের উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া নানারূপ ব্রজভাবে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিল। রজনীযোগে জরৎকারু পত্রদ্বারা সাত্যকিকে ডাকিয়া আনিয়া প্রভাসকূলে বসিয়া মদ্যপানাদি করিল ও পাপ কৌশল অবলম্বন করিয়া কৃতবর্মার প্রতি সাত্যকির ঘোরতর বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিল। সাত্যকি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ শিবিরে গমন করিয়া কৃতবর্মার প্রাণসংহার করিলেন। সেই উপলক্ষ্যে যাদবগণের পরস্পরের মধ্যে আত্মদ্রোহ উপস্থিত হইল। ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এদিকে বাসুকীসেনাগণ অন্তরালে থাকিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। সেই সময়ে রৈবতক পর্বতে অগ্ন্যুৎপাত হইল। যদুকুল এককালে ভস্মীভূত হইয়া গেল। পরদিন কৃষ্ণ বলরামকে হরিকুল স্থাপন করিবার জন্য ইয়ুরোপে পাঠাইলেন। বলরাম বাসুকীর অনার্য সৈন্যগণসহ সৌরাষ্ট্রের উপকূলে জাহাজে উঠিয়া য়ুরোপে যাত্রা করিলেন; কৃষ্ণ যদুকুলধ্বংসকারিণী প্রেমোন্মাদিনী জরৎকারুকে ক্রোড়ে লইয়া দিব্য রথে উঠিয়া অমরধামে যাত্রা করিলেন। বাসুকী এতদিনে দুর্বাসার ষড়যন্ত্র ও ছলনা বুঝিতে পারিয়া, ক্রোধে তাঁহার বক্ষে বৃহৎ শিলাখণ্ড চাপাইয়া দিল। তাহাতেই দুর্বাসার প্রাণ-বিয়োগ হইল। দুর্বাসার প্রায়শ্চিত্ত হইল, পাপমুক্ত হইয়া দুর্বাসা শান্তিধামে গেলেন। বাসুকী কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া চিরপ্রেমের আধার সুভদ্রার অংকে মস্তক রাখিয়া বৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হইলেন। দারুক-মুখে সংবাদ পাইয়া অর্জুন আগমন করিয়া সকলের সৎকার করিলেন ও যাদবগণের রমণী,

শিশু ও বৃদ্ধদিগকে সংগে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক-পরিচালিত নাগগণ যাদব-রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল ও তদ্দ্বারা আর্য-অনার্য-মিশ্রণরূপ ভারত-হিতকর মহৎ কার্য সংসাধন করিয়া ধর্মরাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিল। অনন্তর ব্যাসের পরামর্শে পাণ্ডবগণ অবশিষ্ট যাদবগণসহ লোহিতসাগরতীরে মহাপ্রস্থান করিলেন। প্রভাস সমাপ্ত হইল।

অর্জুন

মহাভারতে আছে, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির যে গৃহে অবস্থিত ছিলেন, অর্জুন দস্যু-দমন জন্য সেই গৃহ হইতে অস্ত্র আনয়ন করিয়া নিয়ম ভংগ করায়, পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা-পালন জন্য তীর্থভ্রমণ করেন। কবি তাহার স্থানে বলেন, গোহরণকারী আদিম নিবাসী হত চন্দ্রচূড়ের মুখে তাহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার কথা শুনিয়া, সেই কন্যার অনুসন্ধানজন্য অর্জুন তীর্থযাত্রার ভাণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। অর্জুন ব্রাহ্মণের গোহরণকারী চন্দ্রচূড়কে যুদ্ধে নিহত করিলে চন্দ্রচূড় অর্জুনকে খুব তীব্র রকম গালি দেন; কেবল অর্জুনকে নহে, তাঁহার পিতৃপুরুষগণকেও প্রচুর গালি দেন, সেই গালি খাইয়া অর্জুন বুঝিলেন, তিনি বড় পাপাচরণ করিয়াছেন। যথা—

বিশাল ত্রিশূল
আমার হৃদয়ে যেন করিল প্রবেশ;
কাঁপিয়া উঠিল অংগ থর থর থর।
নাগরাজ-মৃতদেহ করিয়া দাহন
নিজ হস্তে, আসিলাম গৃহে ফিরি; কিন্তু
অষ্টমবর্ষীয়া সেই অনাথা বালিকা
ভাসিতে লাগিল, দেব, নয়নে আমার।
বহু অন্বেষণে তার না পাই সন্ধান,
কি যে তীব্র মনস্তাপ, হৃদয়ে আমার
বসাইল বিষ—দন্ত; সুখশান্তি মম

হইল বিষাক্ত সব। তীর্থ পর্যটনে
আসিলাম জুড়াইতে সেই মনস্তাপ।
অষ্টম বৎসর আজি দেশ দেশান্তরে
বেড়াইনু ; কিন্তু নাহি পাইনু সন্ধান,
অষ্টমবর্ষীয়া সেই শিশু অনাথার।

(রৈবতক ৩৮, পৃঃ)

ধর্মযুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়জাতির একান্ত কর্তব্য, সেই ক্ষত্রিয় অর্জুন প্রজা-রক্ষার্থে দস্যু হনন করিয়া আপনাকে এত অন্যায়কারী মনে করিলেন! যদি প্রজার সম্পত্তিহারী যুদ্ধপরায়ণ দস্যুকে নিহত করিলে রাজার পাপ হয়, জানি না তবে রাজার কর্তব্য কি? অসহায়া কন্যার কথা স্মরণ করিয়া অর্জুনের কষ্ট হইয়াছিল? কিন্তু ওরূপ বা উহা অপেক্ষাও দুঃখজনক ব্যাপার কি অন্যান্য যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের মৃত্যুতে ঘটে না? এরূপ হইলে ত যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের চলে না? বিশেষত কবির মতে অর্জুন বনের পশু তুল্য, ভুজবলগর্বে তিনি ধরাকে সরা ভাবিতেন ; কবির অর্জুন নিজেই বলিতেছেন—

ঘটিয়াছে জীবনের কিবা রূপান্তর!
কি ছিলাম? বন্য পশু, গর্ব ভুজবল ;
ধরা ভাবিতাম সরা আত্ম-গরিমায়।

(রৈবতক, ২৮৮ পৃঃ)

অপিচ, কবির সুভদ্রা বলিতেছেন—

কিবা রূপান্তর
ঘটিয়াছে প্রাণেশের এই কয়দিনে!
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন-রবি বীরত্বে কেবল
নহে সেই মুখ আর।

(রৈবতক, ২৮৯)

অপিচ, কবির জগৎকারু বলিতেছেন—

কিন্তু জগৎকারু যদি কৈশোর যৌবনাবধি,
বীরত্বে বিকাত মনপ্রাণ,

অনার্য-বীরত্ব খনি,　　　ধরে তবে কত মণি
　　পরাক্রমে পার্থের সমান।
বিভিন্নতা এইমাত্র—　　　তারা অমার্জিতগাত্র,
　　অবস্থার আঁধারে নিহিত।
পার্থের মার্জিত প্রভা,　　　স্ফটিকে যেমতি জবা,
　　সৌভাগ্য-কিরণে ঝলসিত।
সখীরে! অবস্থা যারে　　　গড়িয়াছে, গড়িবারে
　　পারে সেইরূপে অন্য জন;
গাধা পিটে হয় ঘোড়া　　　যষ্টিভরে চলে খোঁড়া,
　　ভেলা করে সমুদ্র লঙ্ঘন।

(রৈবতক, ১৫৯ পৃঃ)

এই বন্যপশু অর্জুনের এত দয়া যে, রাজকার্য ও সুখসম্ভোগ সমস্ত ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিলেন। কিন্তু অর্জুন যখন সেই কন্যাকে পাইলেন ও পাইয়াই বুঝিতে পারিলেন, সেই চন্দ্রচূড়া-কন্যা শৈল কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে এবং দস্যু-হস্ত হইতে সুভদ্রাকে ও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, তখন অর্জুন কি করিলেন? শৈল যখন একমাত্র "আশ্রয়দাতা বাসুকি এক্ষণে তাহারই জন্য শত্রু হইয়াছে, এক্ষণে হয়ত তাহাকে তাহার অস্ত্রে শুকাইতে হইবে বলিয়া" হতাশ হইয়া চলিয়া গেল, তখন অর্জুন কি করিলেন? দেখিতে পাই তখন কবির অর্জুন

"শৈলজে শৈলজে"—
ডাকিতে ডাকিতে পার্থ গেলা গৃহদ্বারে,
ছুটিয়া নক্ষত্রবেগে। দেখিলা সম্মুখে
সরথ দারুক; রথী, যেন স্বপ্নবৎ
এক লম্ফে ধনঞ্জয় আরোহিলা রথ

(রৈবতক, ৩৬৯ পৃঃ)

কৈ, অর্জুন একটুও ত শৈলের অনুসন্ধান করিলেন না, একবার হা হুতাশও করিলেন না। এক লম্ফে রথে উঠিয়া স্বকার্য-সাধনে

গেলেন। এই জন্যই অর্জুন গৃহধর্ম, রাজধর্ম ত্যাগ করিয়া বনচারী হইয়াছিলেন! কৃষ্ণের নিকট শিক্ষা পাইয়া কি অর্জুনের এই ফল লাভ হইল! ইহা অপেক্ষা কি তাঁহার পূর্বের মনের পশুভাব ভাল ছিল না! কবির অর্জুনের বুদ্ধিও নিতান্ত মোটা। কেন না, যে শৈলের অনুসন্ধান জন্য তিনি দ্বাদশ বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেই শৈল ভৃত্যবেশে প্রায় দুই বৎসর তাঁহার নিকট ছিল, নিয়ত তাঁহার পদসেবা করিত, অর্জুন নিয়ত তাঁহার স্বর শ্রবণ করিতেন, তাহার মুখ হাতের উপর রাখিয়া মাথার চুল সরাইতেন, তথাপি তাহাকে স্ত্রীজাতি বলিয়া একবারও সন্দেহ জন্মিল না! শৈল যখন আপনাকে 'দাসী' শব্দে পরিচিত করিল, তখনও একটু সন্দেহ হইল না, ভাবিলেন ভ্রমক্রমে শৈল আপনাকে 'দাসী' বলিয়াছে! অর্জুন নিরেট বোকা! কবির অর্জুনের বুদ্ধির অল্পতার আরও প্রমাণ এই যে, কৃষ্ণের নিকট শিক্ষা পাইয়াও তাঁহার কোনও ফল হয় নাই; পত্নী সুভদ্রা তাঁহাকে নিয়ত শিক্ষা দিতেন, তথাপি জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। গীতা-শিক্ষা তাঁহার কিছুমাত্র ফলোপধায়িনী হয় নাই। শেষে অতিবৃদ্ধ বয়সে কৃষ্ণের ইহলোক-ত্যাগের পর, নিজের মহাপ্রস্থানের কিছুদিন পূর্বে সুভদ্রার উপদেশ শুনিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিন অর্জুনের হৃদয়মরুতে একটী শীতল ধারা বহিয়াছিল, সেই দিন তাঁহার অন্ধকারময় হৃদয়মরুভূমে একটী ক্ষীণ আলোক জ্বলিয়াছিল। যথা, কবি নিজেই বলিতেছেন—

> একটী শীতল ধারা হৃদয়-মরুতে
> বহিল পার্থের ধীরে, এক ক্ষীণ আলো
> উঠিল জ্বলিয়া দূরে ঘোর অন্ধকারে
> সেই মহামরুভূমে। সেই ক্ষীণ আলোকে
> দেখিলেন ধনঞ্জয় ভাবী আবর্তন
> নিয়তি-চক্রের ক্ষুদ্র অস্ফুট রেখায়।

(প্রভাস, ১৭৭ পৃঃ)

এই কি মহাভারতের অর্জুন? যে অর্জুন নররূপে নারায়ণ, যে অর্জুনের আকর্ষণে গীতার উৎপত্তি, যে অর্জুন সর্বগুণের আধার, কবির মতে যে অর্জুন কৃষ্ণের ভুজস্বরূপ, এ কি সেই অর্জুনের চিত্র? কবি কোন্ ইতিহাসে অর্জুনের এরূপ চরিত্রের পরিচয় পাইলেন?

দুর্বাসা

কবি দুর্বাসার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে ইতিহাস-বিরুদ্ধ। দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দেওয়ার জন্য দুর্বাসার ষড়যন্ত্রের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন না, মহাভারতের মতে অর্জুন সুভদ্রাকে দর্শন করিয়া চঞ্চল হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা বুঝিতে পারিয়া অর্জুনের অভিলষিত পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, কারণ, স্বয়ম্বরে সে কাহার প্রতি অনুরক্তা হইবে, কে বলিতে পারে? তদনুসারে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রে ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক বংশীয় নৃপতিগণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রণ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বলরাম কহিলেন, কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমরা এ কি করিতেছ? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য কর। এই বলিয়া বলরাম সকলকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন। কৃষ্ণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, অর্জুন অবৈধ কার্য করেন নাই, প্রত্যুত অর্জুন আমাদের কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সুভদ্রাও ইহাদ্বারা যশস্বিনী হইবেন, অতএব তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া শান্ত বাক্য দ্বারা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত কর। যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশানুসারে অর্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে, তিনি যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাভারতের মতে সুভদ্রা অর্জুনের প্রতি অনুরাগিনী হয়েন নাই, বলরাম দুর্যোধনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন নাই, এবং এই উপলক্ষে যাদবগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধও হয় নাই—এ সমস্ত

দুর্বাসার ষড়যন্ত্রের কথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুর সহিত দুর্বাসার বিবাহ হওয়া যে মিথ্যা তাহা পূর্বে সপ্রমাণ হইয়াছে। আস্তিক জরৎকারু ঋষির ঔরসে ও নাগকন্যা জরৎকারুর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, একথা যখন সপ্রমাণ হইয়াছে, তখন কবি যে বলিতেছেন 'দুর্বাসা যে কোন রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন, ও তাহারই গর্ভে আস্তিক জন্মগ্রহণ করেন' একথা যে মিথ্যা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দুর্বাসা যে কুব্জ, কৃষ্ণবর্ণ ও কাশরোগগ্রস্ত ছিলেন, দুর্বাসা যে কর্ণের পিতা বা গুরু ছিলেন, দুর্বাসা যে কর্ণকে পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্র-পরীক্ষা-সময়ে দুর্বাসা যে কর্ণকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছিলেন, দুর্বাসার মন্ত্রণাতে যে কর্ণ দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে দেন নাই, এবং পিতা ও গুরু দুর্বাসার আজ্ঞা অলংঘনীয় মনে করিয়াই যে কর্ণ সপ্তরথীসহ মিলিয়া অভিমন্যুকে নিহত করেন, ইত্যাদি বিবরণের আভাসমাত্রও কোন পুরাণে পাওয়া যায় না। দুর্বাসার কৃষ্ণ ও ক্ষত্রিয়-দ্বেষের কথা, বাসুকীর সহিত সন্ধির কথা এবং যদুবংশ-ধ্বংস ও কৃষ্ণের নিধনব্যাপারে দুর্বাসার ষড়যন্ত্রের কথা ও বুকে শিলাখণ্ড পড়িয়া দুর্বাসার মৃত্যুর কথার আভাসও কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। দুর্বাসা যে প্রবঞ্চনা-পরায়ণ ধূর্ত ও মহাপাপী ছিলেন, তাঁহার যে ব্যাসাদির ন্যায় যোগবল ছিল না, কেবল বুজরুকী দেখাইয়া তিনি যোগবলের ভাণ করিতেন, এ কথার প্রমাণও কোথাও নাই। প্রত্যুত, দুর্বাসা যে অতিশয় প্রভাবশালী এই কথারই প্রমাণ সর্বত্র পাওয়া যায়। মহাভারতের যেখানে যেখানে দুর্বাসার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইখানেই তিনি অতিশয় প্রভাবশালী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দুই এক স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। যথা—"একদা ধার্মিকাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন।" —(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ১১০ অধ্যায়।) অপিচ "মহাদেব কহিলেন এই ভূমণ্ডলে দুর্বাসা নামে এক মহর্ষি আছেন, তিনি অতিশয় সুবিখ্যাত ও আমারই অংশ সম্ভূত।" (ঐ মহাভারত

আদিপর্ব, ১২৩ অধ্যায়।) ভাগবত দুর্বাসাকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়াছেন। যথা—

তস্যত্র্যতিথিঃ সাক্ষাদ্ দুর্বাসা ভগবানভূৎ ॥

৩৫।৪ অঃ।৯ স্কন্ধ

দুর্বাসা যে অতিশয় কোপনস্বভাব ছিলেন ও তাঁহাকে দেখিলে লোকে যে শাপ—ভয়ে ভীত হইত, একথার প্রমাণ আছে বটে, কিন্তু উহা সে তাঁহার সমধিক প্রভাবের পরিচয় জন্যই লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল স্থল দেখিলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুত দুর্বাসা ন্যায়ের পূর্ণ মূর্তি; অন্যান্য ঋষিগণ যেমন দয়ার পরবশ হইয়া কখন কখন ন্যায়পথের অন্যথাচরণ করিতেন, দুর্বাসা সেরূপ করিতেন না। তিনি পাপের বিন্দুমাত্রেরও প্রশ্রয় দিতেন না। তাই তিনি কোপনস্বভাব বলিয়া পরিচিত। সামান্য দোষে দুর্বাসা ক্রোধ প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু বিনা দোষে কখনও দুর্বাসাকে ক্রোধ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না।

বাসুকি

কবির বাসুকি পৌরাণিক নাম মাত্র, ইহার চরিত্র সম্পূর্ণ কবির কল্পিত। কবির মতে আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বে নাগজাতি ভারতের অধিবাসী ছিল। বাসুকি সেই নাগজাতির অধিপতির পুত্র। কংস নরপতি ইহার পিতৃরাজ্য অপহরণ করিলে, নাগগণসহ ইহার পিতা পাতালপুরী আশ্রয় করেন। পরে বসুদেব তাঁহার সহায়তায় কৃষ্ণকে কংস-কারাগার হইতে নন্দালয়ে রাখিয়া আইসেন। বাসুকি বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণের সহিত আলাপ করিয়া ও তাহার পিতাই যে কৃষ্ণের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এই পরিচয় প্রদান করিয়া শত্রু কংস-বধে কৃষ্ণকে উৎসাহিত করেন। কৃষ্ণ মথুরা-উদ্ধারব্রতে দীক্ষিত হইয়া বাসুকির আলয়ে গমন করিয়া, সৈন্যগণকে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। পরে দধি-দুগ্ধ-ভারবাহী দশসহস্র নাগ ও গোপসৈন্যসহ গভীর নিশীথে নিদ্রিত মথুরা আক্রমণ করিয়া কংস বধ করিলেন।

বাসুকি মথুরা রাজ্য ও কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে প্রার্থনা করিলে, কৃষ্ণ তাহা দিলেন না;—তদবধি কৃষ্ণ বাসুকির শত্রু হইলেন। অবশেষে, দুর্বাসার পরামর্শে বাসুকি প্রভাসক্ষেত্রে গুপ্ত-শর-প্রহার দ্বারা যদুকুল ধ্বংস করেন। এ সমস্তই ইতিহাসের বিরুদ্ধ। আর্যগণ যে ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া ভারতের আদিমবাসিগণকে পরাজিত করেন নাই, তাহা পূর্বেই সপ্রমাণ হইয়াছে। পুরাণসকলের মতে কংস অক্রূরকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া কৃষ্ণ-বলরামকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনেই কংসকে নিহত করেন, দধি-দুগ্ধ-ভারবাহী দশ সহস্র নাগসৈন্যসহ কৃষ্ণ রজনীযোগে দস্যুর ন্যায় মথুরা আক্রমণ করেন নাই। যদুবংশ-ধ্বংসও মহাভারতের মতে নাগগণের গুপ্ত শরাঘাতে হয় নাই, আত্মদ্রোহই যদুবংশ-ধ্বংসের একমাত্র হেতু। যদি সে ধ্বংস ব্যাপারে অন্য কাহারও কিছু সহায়তা থাকে ত সে কৃষ্ণের নিজের। মহাভারতের মতে কৃষ্ণ নিজে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট যদুগণকে নিহত করেন। যথা—"মহাবাহু মধুসূদন কালকৃত বিপর্যয়ের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সময়ে যে মুষল দর্শন করিলেন, তাহাই গ্রহণ করত তদ্দ্বারা সকলকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।"

(মহাভারত মৌষল পর্বে, ৩য় অধ্যায়)

কৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব যখন কংসকারাগার হইতে, তাঁহাকে নন্দালয়ে লইয়া যান, তখন অনন্ত স্বীয় ফণা বিস্তার দ্বারা বৃষ্টিপাত নিবারণ করিয়াছিলেন, এইরূপ বিবরণ পুরাণে আছে। এই বিবরণ হইতেই কি কবি বাসুকির সহায়তায় কংস-কারাগার হইতে কৃষ্ণের উদ্ধার কল্পনা করিয়াছেন? আচ্ছা! নাগ যদি ভারতের আদিমবাসী হইল, তবে সিদ্ধ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, অপ্সর, বিদ্যাধর, দৈত্য, দানব, অমর প্রভৃতি কি? মহাভারতাদিতে দেব, দৈত্য, দানব, অপ্সর, গন্ধর্বাদির ন্যায় নাগগণ ও কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষকন্যার গর্ভে জাত বলিয়া বর্ণিত; কবি কেবল নাগগণকেই আদিমবাসী বলেন কেন?

জরৎকারু

জরৎকারু যে কৃষ্ণের সমকালবর্তিনী নহেন, জন্মেজয়ের সমকালবর্তিনী, সে কথা পূর্বেই সপ্রমাণ হইয়াছে। জরৎকারু মনসাদেবী নামে পরিচিতা ও পূজিতা।

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা-ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোহস্তুতে॥

বোধ হয় এই সর্পভয়বারক মন্ত্রটি সকলেই জানেন। কবি হিন্দুর এই দেবীকে কামোন্মাদিনী রাক্ষসীরূপে চিত্রিত করিয়াছেন; তাহাকে দুর্বাসার পত্নী করিয়াও পুরুষান্তরপরায়ণা করিয়াছেন। রূপজ মোহবশতই জরৎকারু কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। শতবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলেও জরৎকারু স্বীয় রূপপ্রভায় ভুলাইয়া সাত্যকিকে ও পরে সাত্যকির সহায়তায় সমগ্র যাদবগণকে মদ্যপায়ী করিয়াছিলেন। অবশেষে নিতান্ত অসতী-রমণীসুলভ উপায় অবলম্বন করিয়া যাদবগণের মধ্যে আত্মদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহাতেই যদুবংশধ্বংস হইল। অবশেষে জরৎকারু কৃষ্ণেরও প্রাণবধ করিয়াছিলেন। এ সমস্তই অনৈতিহাসিক। মহাভারতের জরা স্থানে জরৎকারু নাকি? এই শব্দসাদৃশ্যই কি নবীন কবির উদ্ভাবিত ঐতিহাসিক তত্ত্বের মূল?

ব্যাস

বেদব্যাস যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ও হিতবাদদর্শনে পণ্ডিত ছিলেন, মহাভারতে কি তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়? না, তাহার কৃত মহাভারতে কবিকৃত কৃষ্ণ-চরিত্রের কোন আভাস পাওয়া যায়? যদি না পাওয়া যায়, তবে ব্যাস-কবি কৃষ্ণের প্রচারিত নবধর্মের প্রচারক হইলেন কি প্রকারে? মহাভারতের সমস্তই কি প্রক্ষিপ্ত? প্রক্ষিপ্ত বলিলে কি পরিবর্তিতও বুঝায় নাকি? নচেৎ মহাভারতের কোন্ অংশে কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্র পাওয়া যায়? কোন্ অংশ দেখিয়া কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদ্বেষী, বেদদ্বেষী, দেবদ্বেষী ছিলেন, বুঝিতে পারা যায় যে, কবি তাহা দেখিয়া ব্যাসকে এবংবিধ-চরিত্র-সম্পন্ন করিয়াছেন?

ব্যাসের আশ্রম যে রৈবতক পর্বতে ছিল, ইহার প্রমাণ কবি কোথায় পাইলেন? ব্রহ্মাবর্ত, ব্রহ্মর্ষি প্রদেশই না আর্যগণের পবিত্র বাসস্থান? নৈমিষারণ্যই না ঋষিগণের আশ্রম স্থান? কবি কোন্ প্রমাণের বলে ব্যাস, দুর্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের আশ্রম রৈবতক পর্বতে ছিল বলেন?

কবি বলেন কৃষ্ণের লীলা-দর্শন অভিপ্রায়ে ব্যাস রৈবতকে দ্বিতীয় আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রের লীলা-দর্শন করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। যথা—

শুনিলাম যেই দিন অপূর্ব স্বর্গীয় শিশু
বৃন্দাবনে ইন্দ্র-যজ্ঞ করেছে বারণ,

* * *

বুঝিলাম সেই দিন দ্বাপর হতেছে শেষ,
জগতের নবযুগ হতেছে সঞ্চার,
আবির্ভূত বৃন্দাবনে যুগ অবতার।
সেই দিন হ'তে ব্যাস তোমার মহিমা ধ্যান
করিতেছে নিরন্তর, আত্মসমর্পণ
করিয়াছে তব পদে, নর-নারায়ণ!
কেবল তোমার লীলা করিবারে দরশন,
করেছে প্রভাস তীরে দ্বিতীয় আশ্রম।
অদূরে কুটীর ক্ষুদ্র করিয়াছে নিরমাণ
কুরুক্ষেত্রে তব লীলা করিতে দর্শন।

(কুরুক্ষেত্র, ২১০ পৃঃ)

কাজেই বলিতে হইতেছে কৃষ্ণের দ্বারকাপুরী নির্মাণ করার পর ব্যাস তথায় আশ্রম নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবির কৃষ্ণ যে বলিতেছেন—

হইতেছি লক্ষ্যভ্রষ্ট, পড়িনু সরিয়া
বিমুখি মগধপতি সপ্তদশ বার।

পশ্চিম ভারতে শান্তি করিয়া স্থাপন,
লইলাম মহর্ষির চরণে শরণ ;

(কুরুক্ষেত্র, ১৩৬ পৃঃ)

অর্থাৎ জরাসন্ধের আক্রমণ-নিবারণ জন্য কৃষ্ণ যে দ্বারকায় পুরী নির্ম্মাণ করেন, ব্যাসের আশ্রম তথায় ছিল, সেইজন্য। ব্যাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের নিকট থাকিবেন বলিয়া তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণ বলিতেছেন ব্যাসের নিকট থাকিবেন বলিয়া তথায় পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার কোনটা সত্য পাঠকগণ স্থির করিবেন।

যাহাই হউক, কবির মত কৃষ্ণের দ্বারকা আগমনের পর এই দ্বিতীয় আশ্রমে বসিয়া ব্যাস বেদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেন ব্যাস বেদ সঙ্কলন করিলেন ? কৃষ্ণ ইন্দ্রপূজা, বৈদিক দেবপূজা উঠাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই যখন ব্যাস কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার মনে করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, তখন আবার বেদের সঙ্কলন করিয়া কৃষ্ণের মতের বিপরীত ইন্দ্রাদিপূজার ও যজ্ঞের প্রচার করিলেন কেন ? কেন ধরাকে বেদভারে প্রপীড়িত ও যজ্ঞ-ধূমে সমাচ্ছন্ন করিলেন ? আচ্ছা, কৃষ্ণ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ব্যাসের নিকট বলিতেছেন তিনি বৃন্দাবনে গোচারণ করিতে করিতে ভাবিতেন, বেদ-ভারে প্রপীড়িত, যজ্ঞ-ধূমে সমাচ্ছন্ন, উষ্ণজীবশোণিত-প্লাবিত ভারত হইতে কি প্রকারে সেই হিমাচলসদৃশ বেদ উৎপাটন করিবেন, কিন্তু তখন ত বেদ সঙ্কলিত হয় নাই। কৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া বাস করিলে, তাহার পর ব্যাস রৈবতক পর্বতে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, সেই আশ্রমে বসিয়া বেদ সংকলন করিয়াছেন। যদি শ্রুতি-পরম্পরাগত ঋচাদি উপলক্ষ করিয়া কৃষ্ণ এরূপ বলিয়া থাকেন, তবে আবার

বলিতেছেন কেন ? বেদ যে এত অনিষ্টকর তাহার সঙ্কলন জন্য ব্যাসের এত আগ্রহ কেন ? আরও আশ্চর্য এই যে, কৃষ্ণ বেদের অনিষ্ট-কারিতা প্রভৃতির কথা, বেদসঙ্কলনকারী ব্যাসের নিকটেই বলিতেছেন। ব্যাস আবার তাহাতেই সায় দিতেছেন। এ সকলের সামঞ্জস্য

কোথায়? এই সকল কি ইতিহাস-তত্ত্ব? সরস্বতী নদী কি রৈবতক পর্বত হইতে উৎপন্ন? ব্রহ্মাবর্ত কি তবে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণস্থিত ও গুজরাটের নিকটবর্তী? একি ভূগোলের নূতন তত্ত্ব?

অন্যান্য চরিত্র।

কবি কর্ণের মহচ্চরিত্রে ভয়ানক কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন। কর্ণকে দুর্বাসার করধৃত জড় পুত্তলিকা করিয়াছেন। দুর্বাসা বিনা অপরাধে কর্ণের মস্তকে পদাঘাত করেন। কবি বলেন দুর্যোধনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ভারতের সম্রাট হইবার অভিপ্রায়েই কর্ণ দুর্বাসার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া দুর্যোধনকে পাণ্ডব বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মতে কর্ণ পাপবুদ্ধি-পরায়ণ হইয়া দুর্যোধনকে উৎসাহিত করেন নাই, কর্তব্যজ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াই করিয়াছিলেন। ফলত কর্ণের তুল্য মহানুভব অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গুণময় কর্ণকে কবি মহাপাপপরায়ণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ-নিন্দাই কবির এ ভয়ানক চিত্র অংকনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কর্ণ যে কেবল গুরু দুর্বাসার অনুরোধেই এই সকল অকার্য করিয়াছিলেন, গুরুপ্রথা থাকাতে ভারতে যে এবংবিধ অনিষ্ট সংঘটিত হয়, ইহাই দেখাইবার জন্য, কবি কর্ণকে এবংবিধ পাপ-পরায়ণ করিয়াছেন।

কবি জরৎকারুর উক্তিতে যুধিষ্ঠিরকে কি বলিতেছেন দেখুন:—

বিড়াল-তপস্বী সুবচন!
দিব্য কথা ধর্মরাজ! সে ধর্মে পড়ুক বাজ,
যে ধর্ম স্বার্থের আবরণ।

(রৈবতক, ১৫৮ পৃঃ)

মহাভারতের মতে যে যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াও রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ, ব্যাস, ভীষ্ম প্রভৃতির এত উপদেশেও যাঁহার মনে শান্তি জন্মে নাই, সেই যুধিষ্ঠির স্বার্থপর বিড়াল তপস্বী? এ কথা কি ইতিহাস-সম্মত?

কবি মহাদেবকে অনার্যের ঈশ্বর ও কালীকে অনার্যের ঈশ্বরী বলিয়াছেন ; যথা—"ভগবান ভূতনাথ অনার্য ঈশ্বর" ; (রৈবতক, ৬৩ পৃঃ) অপিচ "সম্মুখে দেখ অনার্য ঈশ্বর মহাদেব" (রৈঃ ৭৯ পৃঃ)

গালি দিস বিধুমুখি টানি জিহ্বা তোর
সাজাইব অনার্যের কালী। (রৈঃ ২৮২ পৃঃ)

এ তত্ত্ব কবি কোন্ ইতিহাসে পাইলেন ? নারায়ণ-পূজায় শূদ্রের অধিকার নাই, শিব ও দুর্গার পূজা অর্থাৎ নিতা শিবাদির পূজায় শূদ্রের অধিকার আছে, তাই দেখিয়া কি কবি এরূপ বলেন ? না সম্প্রদায়-বিদ্বেষে পুনরায় ভারতকে ভস্মীভূত করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ বলেন ! কবি যখন আর্য-অনার্যের ধর্ম-মিলনের ইচ্ছা করেন, তখন শিবদুর্গাকেই ত প্রকৃত ঈশ্বর বলা উচিত। কেন না নারায়ণের দ্বারা সে কার্য সাধিত হইতেছে না, শূদ্রের নারায়ণ-পূজায় অধিকার নাই।

অভিমন্যু Sir Philip Sidney-র অনুবাদ। Sidney-র ন্যায় অভিমন্যু পিপাসা-নিবারণের জন্য আনীত জল আপনি পান না করিয়া মৃত্যু-শয্যাশায়ী জনৈক সৈনিককে দিয়াছিলেন। উত্তরা পাশ্চাত্য রমণীর ন্যায় রূপগুণসম্পন্না। ইহার গমন হরিণীর ন্যায়, মরাল বা গজেন্দ্রের ন্যায় নহে, চলিবার সময়ে উত্তরার পা মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, নিয়তই উত্তরা হাসেন, এবং চিত্রবিদ্যা, বীণাবাদন, রণপারদর্শিতা প্রভৃতি পাশ্চাত্য রমণীর ন্যায় সকলপ্রকার গুণেই উত্তরা অলংকৃতা। উত্তরা ও অভিমন্যুর প্রেম ও পাশ্চাত্য প্রেমের অনুবাদ। এ সমস্ত অনৈতিহাসিক।

শৈল ও সুলোচনা পৌরাণিক নহে, এই দুইটি কবির কল্পনা-সৃষ্ট নূতন চরিত্র। সুতরাং ইহাদের কথা ইতিহাস-প্রকরণের আলোচ্য নহে। শৈলজার চরিত্র কবি উচ্চাদর্শে অংকিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাও পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা। উহার উদ্দেশ্যও আর্যনিন্দা। কবি দেখাইতে চাহেন, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শৈলজার ন্যায় দেবচরিত্র মনুষ্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু আর্যেরা জাতিভেদের নিষ্পেষণে তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করেন বলিয়া, তাহাদের উন্নতি

হইতে পারে না, তাই শৈলজার চরিত্র এত উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা কিন্তু ইতিহাসের বিরুদ্ধ। কেননা কোন অনার্য বা শূদ্রারমণী যে কৃষ্ণের সময় কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিল, এরূপ প্রমাণ মহাভারতাদিতে নাই। সুভদ্রাও পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা। সুভদ্রার চরিত্রোন্নতির কারণও আর্যনিন্দা। কবি বলিতে চাহেন যে রমণীজাতির মধ্যে ঈদৃশী দেবী জন্মগ্রহণ করে, সেই রমণী জাতিকে আর্যেরা বেদে অধিকার দেন নাই, স্বাতন্ত্র্য দেন নাই, ও তদ্বারা দেশের মহৎ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।

যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে বুঝা গেল কাব্যত্রয়ের আদ্যোপান্তই ইতিহাসবিরুদ্ধ। সত্য বটে, কবিগণ ঐতিহাসিক কাব্যের স্থানে স্থানে ইতিহাসবিরুদ্ধ বর্ণন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কাব্যোক্ত নায়ক-নায়িকাগণের উৎকর্ষ সাধন জন্য কবিগণ স্থানে স্থানে ইতিহাসের ব্যতিক্রম করেন; কিন্তু আমাদের কবির সে উদ্দেশ্য কোথায়? ইতিহাসের বিরোধাচরণ দ্বারা কবি কোন্ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন? কোনও চরিত্রেরই ত উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখিতে পাই, কবি সমস্ত নায়কনায়িকাগুলিরই চরিত্রের অপকর্ষ সাধন করিয়াছেন। দেবতুল্য আর্যজাতিকে দস্যুর শিরোমণি, স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারপরায়ণ, ভীষণ পাপের প্রথম পথ-প্রদর্শক সয়তানের অবতার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণকে—ঋষিগণকে ঘোর স্বার্থপর প্রবঞ্চক ও সমগ্র মানবজাতির অনিষ্টকারী করিয়াছেন। যে যুধিষ্ঠির ধর্মের অবতার, সেই যুধিষ্ঠিরকে বিড়ালতপস্বী, স্বার্থের অবতার, যে অর্জুনের তুল্য সত্যপরায়ণ যোগী মিলা ভার, সেই অর্জুনকে বনের পশু, গর্বের মূর্তি ও পত্নীর শিষ্য করিয়াছেন। যে কর্ণ দাতার শিরোমণি, অসামান্য তেজস্বী, সেই কর্ণকে দুর্বাসার করধৃত পুতুল করিয়াছেন, যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিয়া বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন; সেই ব্যাসকে বেদদ্বেষী, পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিৎ, ভোগসুখরত পণ্ডিতমাত্রে পরিণত করিয়াছেন। যে জরৎকারু মনসাদেবী নামে অভিহিত, যাঁহাকে আমরা পূজা করিয়া থাকি, সেই

জরৎকারুকে কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি রিপুবর্গের মূর্তি করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, এবং জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়মূর্তি, রুদ্র-অবতার দুর্বাসাকে সয়তানের অধম করিয়াছেন।

সুভদ্রাকে কবি সমধিক-গুণ-সম্পন্না করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু কবির সুভদ্রা হিন্দু রমণী নহে। যে গুণে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, সুভদ্রার সে গুণের বিন্দুবিসর্গও নাই; সুভদ্রা পাশ্চাত্য আদর্শ রমণী নাইটিংগেলের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে আহতগণের সেবা করেন, মিশনারী রমণীর ন্যায় কৃষ্ণধর্ম প্রচার করেন, কিন্তু সুভদ্রার পতিভক্তির কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তিনি অর্জুনের সেবা করেন না, তাঁহাকে শিক্ষাই দিয়া থাকেন। এই সহস্র-পৃষ্ঠা-পরিমিত পুস্তকের কোন স্থানেই সুভদ্রাকে অর্জুনের সেবা বা ভক্তি করিতে দেখিতে পাই না। আহতের সেবা করিতে দেখিতে পাই, হতগণের সংকার করিতে দেখিতে পাই, পশুপক্ষীকে যত্ন করিতে দেখিতে পাই, কৃষ্ণের শরক্ষত দেহে ঔষধ লেপন করিতে দেখিতে পাই, যাত্রী লইয়া বৃন্দাবনে যাইতে দেখিতে পাই, অর্জুনকে ধর্মোপদেশ দিতে দেখিতে পাই, অর্জুনের বুকে মাথা দিয়া নিদ্রা যাইতে দেখিতে পাই, কিন্তু একবারও অর্জুনের সেবা করিতে দেখিতে পাই না। অর্জুন সুভদ্রার পতির যোগ্য নহেন, দাসেরই যোগ্য। অর্জুন মানব, সুভদ্রা দেবী। যথা—অর্জুন-প্রেমোন্মত্তা শৈল বলিতেছে—

অর্জুনের মানবত্ব, দেবীত্ব ভদ্রার।

(কুরুক্ষেত্র, ১৭৫ পৃঃ)

অর্জুন নিজেই বলিতেছেন,—

পশু বলে বলী আমি দুরাচার,
নাহি সাধ্য হব যোগ্য পতি সুভদ্রার।
হৃদয়ে তাহারে মাত্র করিয়া স্থাপন,
পূজিব

(রৈবতক, ৩০৩ পৃঃ)

হিন্দু এরূপ রমণী চাহেন না। স্বামী নিকৃষ্ট, স্ত্রী উৎকৃষ্ট, এরূপ আদর্শ চরিত্র ভারতে শোভা পায় না। পতি-সেবা, গুরুজনের শুশ্রূষা, অতিথির পরিচর্যা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শবদাহ করা আমাদের আর্যরমণীর কার্য নহে। ঐ কার্য আবার গরু কেটে জুতা দানের ন্যায়। তাঁহার স্বামী, তাঁহার ভ্রাতা, তাঁহার পুত্র, প্রাণীহত্যা করিবেন, তাহাতে বাধা দিবেন না, সেই হতাহতের সৎকার-সেবা করিয়া বিশ্বপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন। কবি যে Miss Nightingale-এর ছাঁচে ভারতের জন্য এই চিত্র ঢালাই করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য কি? ভারতীয় রমণীগণকে এই আদর্শে গঠিত করাই কি তাঁহার অভিপ্রেত? ভারতীয় পুরুষগণ কি এমনই বীর হইয়াছেন, যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেবার জন্য রমণীর প্রয়োজন হইয়াছে? কবি সুভদ্রাকে আরও অনেক উচ্চ গুণে অলংকৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সুভদ্রা কেবল পরেরই কার্য করেন, নিজের সুখের দিকে তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই, সুখে বা দুঃখে সুভদ্রার কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হয় না, বদনের একটী রেখারও ব্যতিক্রম হয় না। সুভদ্রা অর্জুনে প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছিলেন, স্বয়ং মন্মথ সে প্রেমের সহায় হইয়াছিলেন, তথাপি দুর্যোধনকে বিবাহ করিতে হইবে শুনিয়া সুভদ্রার মৌখিকভাবের কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্তন হয় নাই। যথা—

দেখিলেন ধনঞ্জয় ভদ্রার বদন
শান্তির চিত্রিত ছবি, রেখাটিও তার
হয় নাই রূপান্তর।

(রৈবতক, ২৯০ পৃ:)

প্রেম-পিপাসা পূর্ণ হইল না বলিয়া সুভদ্রা ব্যথিত না হউন, কিন্তু পাতিব্রত্য নষ্ট হইবে ভাবিয়াও কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তিত হইলেন না! একজনে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কি হিন্দু সতী অন্যকে পাণিদান করিতে পারে?

রামনারায়ণ তর্করত্ন

(১) কুলীন-কুল-সর্বস্ব-নাটক

(১)

স্বভাবত মনুষ্যমাত্রেই অনুকরণে রত। অন্যের অবস্থা, অন্যের ভাব, বা অন্যের রাগদ্বেষাদি ধর্ম উজ্জ্বলরূপে মনে বিকসিত হইলেই সেই ব্যক্তির অংগভংগি ও স্বরের অনুকরণ করিতে প্রায় সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। কদাপি ইচ্ছা না থাকিলেও ঐ প্রবৃত্তি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই অনুকরণ-ক্রিয়া মনুষ্যমাত্রেরই আনন্দজনক। বালকেরা ইহাতে সর্বদা তৎপর; পিতৃমাতৃ-বয়স্য-পরিজন-প্রভৃতিরা জীবনযাত্রায় যে সকল ক্রিয়ার সম্পাদন করে বালকেরা তাহার অনুকরণ করিতে নিয়ত অনুরত থাকে; তাহাদিগের অত্যন্ত প্রমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে ঐ অনুকরণ কার্যই সর্বপ্রধান। ক্ষুদ্র-গৃহের স্থাপন করা, তাহাতে মৃত্তিকাদি পদার্থদ্বারা কাল্পনিক অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, পরিবেশন করা, কাষ্ঠপুত্তলিকাকে পুত্রকন্যার ন্যায় লালন-পালন করা, তাহার বেশভূষা ও কল্পিত বিবাহাদি সংস্কার সমাধা করা, অপেক্ষায় বালিকার পক্ষে প্রিয়তর ক্রীড়া কিছুই দেখা যায় না; ও বালকের পক্ষে গুরুমহাশয় হওয়া, রাজা হওয়া, চোর হওয়া, কল্পিত অশ্বারোহণ করা প্রভৃতি কার্যই অত্যন্ত প্রমোদজনক। বাল্যকালাবধি এইরূপ অনুকরণ-স্পৃহা বর্ধমানা হইতে হইতে অধিকবয়স্ককে অভিনয় সৃষ্টি করায়; ফলত ইহলোকে যে সকল ঘটনা সর্বদা ঘটিয়া থাকে প্রমোদ-জননার্থে তাহার অনুকরণের নাম "অভিনয়"*।

এই প্রকারে অনুকরণকে অভিনয়ের মূল বলিয়া স্বীকার করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতে পারে, যে, যে ঘটনাদি যে যে ব্যক্তি দ্বারা সমাহিত হয়, অভিনয়েও তত্তাবৎ ব্যক্তির উপস্থিতি থাকা আবশ্যক।

---

* ভবেদভিনয়োঽবস্থানুকারঃ অর্থাৎ অবস্থার অনুকরণই অভিনয়। সাহিত্যদর্পণে ৬ পরিচ্ছেদে ২৭৪ কারিকা।

ঐ সকল ব্যক্তির প্রকৃতি, অবয়ব, গঠন, দীর্ঘতা, খর্বতা, বয়ঃক্রম, সৌন্দর্য প্রভৃতি যে প্রকার হয়, অভিনয়েতে সেই সকলের অবিকল অনুকরণ না হইলে সাতিশয় রসের হানি হয়। অপর প্রকরণবশত অভিনেতব্য ব্যক্তিদিগের হাবভাব-কটাক্ষ এবং বাক্‌স্ফূর্তির ও অনুকরণ করা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের পরিচ্ছদ, পদচিহ্ন, বয়ঃক্রম এবং দেশাচারও অবিকল অনুকরণীয়; তাহা নইলে কে রাজা, কে মন্ত্রী, কে সভ্য, কে প্রতীহারী, তাহার নির্ণাস হওয়া কঠিন হয়; সুতরাং অভিনয়েরও বৈকল্য। এবম্প্রকারে অভিনয়-নিষ্পাদনার্থে রূপের আরোপ করিতে হয় বলিয়া সাহিত্যগ্রন্থে নাটককে "রূপক" * শব্দে বিধান করে। অনেক কবিতা আছে, যাহাতে ভাব ও ছন্দোলংকারের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; অথচ তাহা রঙ্গভূমিতে পাঠ করিলে কাহার মনোরঞ্জন হয় না; অপর কতকগুলি কবিতায় ছন্দোলংকারের অনেক ব্যত্যয় আছে, তথাপি রংগভূমিতে মনোরঞ্জন-কারিতা গুণ অতি স্পষ্ট দেখা যায়। † এই প্রযুক্ত সাহিত্য-কারেরা কাব্যকে 'দৃশ্য' ও 'শ্রব্য' এই দুই অংশে বিভাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দৃশ্য কাব্য "রূপক" বা "অভিনয়" নামে বিখ্যাত। ঐ অভিনয়রূপ-কবিতার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে তাহার কবিত্ব ও অভিনয়ত্ব উভয় গুণের আলোচনা করিতে হয়।

অনেকে মনে করিতে পারেন, যে নাটকের অধিকাংশ গদ্যে রচিত, তাহাতে কি কবিত্ব থাকিতে পারে? অতএব বক্তব্য যে কবিত্ব শব্দে ছন্দ ও অলংকার আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কালিদাস ও বররুচি যে ছন্দে কাব্যরচনা করিয়াছেন, ও যে অলংকার ব্যবহার করিতেন, এইক্ষণকার অনেক কবি তদ্রূপ করিয়া থাকেন, অথচ তাহাতে কেহই কালিদাস হইতে পারেন নাই। মেঘদূতের ছন্দ

* রূপারোপাৎ তু রূপকম্। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৭৩ কারিকা।

† দৃশ্য-শ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতং। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৭২ কারিকা।

প্রবন্ধাদি সকল লক্ষণের অনুকরণে কোন নব্য কবি "পদাংকদূত" রচিত করিয়াছেন, তথাপি উভয়ে স্বর্গ-মর্ত্যবৎ ভেদ রহিয়াছে; মেঘদূতের রমণীয় সুন্দর রস পদাংকদূতের কুত্রাপি প্রাপ্তব্য নহে; অতএব কহিতে হইবে রসই † কবিতার প্রাণ; তদ্ভিন্ন কদাপি উত্তম কবিতা হইতে পারে না। কেবল ছন্দোলংকারে কবিতা ও মৃত্তিকা-নির্মিত মনুষ্যমূর্তি, উভয়ই সমান, প্রকৃতির অনুরূপ বটে, কিন্তু প্রকৃত পদার্থ নহে। রূপকে এই ভাব রক্ষার নিমিত্ত আদৌ যে আখ্যায়িকা-ঘটিত নাটক রচনা করিতে মানস হয়, তাহাতে কেবল ঐ সকল প্রসংগ একত্রিত করা আবশ্যক, যাহাতে হাস্য, করুণা, বীর, রৌদ্র, ভয়ানকাদি রসের উদ্দীপন হইতে পারে—সামান্য কথায় মুখ্য কল্পের ব্যাঘাত না হয়; ফলত কবিদিগের প্রধান চাতুর্য এই যে সামান্য কথার পরিহারপূর্বক কেবল মুখ্য কথাসকল এ প্রকারে একত্র করেন, যাহাতে আখ্যায়িকার কোন্ অংশ অসংগত ও অসম্ভব বোধ না হয়। আখ্যায়িকা মিথ্যা হউক, বা সত্য হউক তাহাতে কোন হানি হয় না; কিন্তু মনুষ্যের যে অবস্থায় যে ভাব উদয় হয়; বাক্যদ্বারা তাহার আবিষ্কার ও অবিকলরূপে তত্তদাকারের উৎপাদন করাই কবিদিগের মুখ্য কল্প; তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যত্যয় হইলেই রসের হানি হয়।

অসাধারণ ক্ষমতা-ভিন্ন সর্বত্র এই সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া নাটক রচিত হইতে পারে না; সুতরাং শুদ্ধভাবান্বিত রূপক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসরাবধি এতদ্দেশে অনেক কবি অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়াও শকুন্তলার সদৃশ রূপক উৎপাদন করিতে পারেন নাই। স্পেনদেশে লোপ্ ডি বেগা নামে একজন কবি ১২৭০ খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার একখানিও সহৃদয় মহাশয়েরা পাঠ করিতে উৎসুক নহেন। সমস্ত-আমোদজনক পদার্থ মধ্যে এবম্প্রকার রূপকের-দর্শন সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট; ইহাতে মন ও বুদ্ধির সহিত সমস্ত ইন্দ্রিয় সন্তৃপ্ত হইয়া থাকে, গীতনৃত্যাদি অন্য কোন আমোদে

† বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সাহিত্যদর্পণে ৩য় কারিকা।

তাদৃশ সুখের সম্ভাবনা নাই। এই প্রযুক্তই প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে গ্রীকজাতি, রোমীয়, চীন-জাতি এবং হিন্দুজাতীয়েরা রূপক-দর্শনে অত্যন্ত সমুৎসুক ছিলেন, এবং স্ব স্ব দেশে যে কোন উৎসব হইলেই ঐ রূপকের প্রচার করিতেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহারা ইহাকে যৎপরোনাস্তি সমাদর করিতেন, এবং কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি অগ্রগণ্য মহাকবিরা উৎকৃষ্ট রূপক রচনায় যত্নশীল ছিলেন। তাহাতে ঐ মহানুভাবদিগের যত্নও ব্যর্থ হয় নাই; ও তৎকর্তৃক শকুন্তলা, বীরচরিতাদি নাটক রূপক-রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ঐ সকল আশ্চর্য রচনায় কবিদিগের অদ্ভুতকৌশলে বাক্যদ্বারা লৌকিক ঘটনাসকল এমনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; যে তৎস্মরণে বুদ্ধির ব্যত্যয় হইয়া তাহাতে সত্যের ভাণ হইয়া থাকে, ভূতকালের ব্যাপার বর্তমান হইয়া উঠে, মিথ্যা সত্য হয়, এবং চিত্রিত পদার্থের অনুকূলে মন কাম-ক্রোধাদি রসে আর্দ্র হয়। কবিদিগের কি আশ্চর্য ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা। তৎদ্বারা তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অলীক কল্পিত গল্পদ্বারা দর্শকমাত্রের বুদ্ধিকে জড়ীভূত করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে অনায়াসে তাহাদিগের মনকে কখন হাস্য, কখন মধুর, কখন বা করুণারসে মুগ্ধ করিতেছেন, ও অনেককে ক্রন্দন করাইয়া আনন্দ প্রদান করিতেছেন!

২

এই মনোহর, বিনোদ রচনা দুর্দ্দান্ত যবনদিগের রাজ্যকালে এতদ্দেশে একেবারে বিলুপ্ত হয়। কবি ও পণ্ডিতেরা দুই একখানি উৎকৃষ্ট রূপক রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণ জনগণের মনে তাহার নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিল। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে এইক্ষণে ঐ দুরবস্থার লোপ হইতেছে, এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণ রংগভূমিতে কবিতা-সুধাকরের উদয়করণার্থে যত্নবান হইয়াছেন। যে গ্রন্থের প্রসংগে এই প্রস্তাব আরব্ধ হইয়াছে তাহা এই নির্মল চন্দ্রোদয়ের আদি কিরণ বলিলে বলা যায়।

পূর্বে বংগভাষায় কয়েকখানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, তাহার সর্বাংগ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে "দৃশ্য কাব্য" বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহার অত্যল্প-মাত্র তাহাতে বর্তমান দেখা যায়।

প্রস্তাবিত নাটকখানিতে রূপকের অনেক ধর্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাবও পরিশুদ্ধ। (গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালংকার—শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্য রচনায় তৎপর।) তিনি সমীচীন—যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছেন;) এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই। আমরা স্বয়ং উপঢৌকন-স্বরূপে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তৎপাঠে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর গ্রন্থকারের নিকট প্রকাশ্যরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। উক্ত গ্রন্থের পাঠাবধি তাহার গুণ-বর্ণনেও আমাদিগের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু মহোদয় ব্যক্তিরা উপকৃত ব্যক্তিকৃত উপকারের প্রতি প্রশংসাবাদ অপেক্ষায়, পক্ষপাতবিহীন ব্যক্তির মনোগত অভিপ্রায় শ্রবণে অধিক পরিতৃপ্ত হন, এই কারণ এবং সহৃদয় আত্মীয়গণের বিশেষ অনুরোধবশত, কেবল স্বাভিমত তদ্‌গুণ বর্ণন না করিয়া "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" পাঠসময়ে তদ্‌গুণ বিষয়েও আমাদিগের মনে যে স্থানে যে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহাতে আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা নাই বটে, পরন্তু বোধ করি, আত্মীয়বর্গ, গ্রন্থকার ও পাঠকবর্গ সুতৃপ্ত হইবেন। "বল্লালসেনীয় কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে" অভিনয়দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্যকল্প। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উৎসেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকারে রূপক-রচনা সর্বদাই করিতেন।

"ধূর্তনর্ত্তক", "কৌতুকসর্বস্ব" প্রভৃতি রূপকসকল এই অভিপ্রায়েই প্রস্তুত হইয়াছিল। জগদীশ নামা একজন কবি, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও দৈবজ্ঞদিগের অধর্মোৎসেদার্থে "হাস্যার্ণব" নামে একটি রূপক প্রস্তুত করেন। যদিচ তাহাতে অনেক অশ্লীল কথা আছে, তথাপি তাহা কুলীনসর্ব্বস্বের আদর্শস্বরূপ বলিলে বলা যায়। তাহাত অন্যায়-সিন্ধুরাজা আপন নগর ভ্রমণ করিতে করিতে সাধ্বী স্ত্রী, গেহিন্যনুরক্তস্বামি, ধর্মের সমাদর, অধর্মের অবহেলা দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণমনে যাহাতে ব্রাহ্মণে পাদুকা প্রস্তুত করে, ও অন্যান্য সৎপ্রথা স্থাপিত হয়, তদর্থে এক বারাঙ্গনার গৃহে উপস্থিত হন। পরে তথায় বিশ্বভাণ্ড নামা এক শৈব যোগী ও তাহার শিষ্য কলহাঙ্কুর আসিয়া এক বেশ্যার নিমিত্ত কলহ উত্থাপন করে। অপর রাজার প্রিয়চিকিৎসক ব্যাধিসিন্ধু, যিনি জিহ্বায় তপ্তশলাকা বিদ্ধ করিয়া শূলরোগের প্রতিকার করেন, ও তাঁহার সাধুহিংসক কোতোয়াল, যিনি সমস্ত নগর চোরদিগকে সমর্পিত করিয়া পরম হর্ষান্বিত হন, ও তাহার রণজম্বুক সেনাপতি প্রভৃতি পরিষদগণ উপস্থিত হইয়া নাট্যের কার্য্য সমাধা করে।

সাহিত্যকারদিগের মতানুসারে এবম্প্রকার রচনার নাম "প্রহসন"; এবং তাহাতে দুই অংকমাত্র থাকা উপযুক্ত।*

বিজ্ঞবর তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় তদন্যথায় প্রহসনকে কি কারণে ষড়ঙ্ক সম্পন্ন নাটকরূপে প্রচারিত করিলেন, তাহার তাৎপর্য অনুভূত হইতেছে না; বোধহয়, বঙ্গভাষায় রূপকের ভেদ রক্ষা করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তদ্রূপ করিয়া থাকিবেন; পরন্তু সে সন্দেহ পাঠকদিগের মনে বহুকাল স্থান পাইবার নহে; নটীর সুললিত গানে মোহিত হইয়া অবিলম্বেই তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। এতদ্দেশীয় কবিরা প্রায় বৃত্তচ্ছন্দেই কবিতা-রচনা করিয়া থাকেন, এবং মধ্যে মধ্যে নাগবিলাস, চম্পকলতা প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে বিবিধ ছন্দের সৃষ্টিও করিয়া থাকেন; কিন্তু অত্যল্প লোকে পূর্ব্ব-প্রসিদ্ধ মাত্রাছন্দে কবিতা রচনা করিয়া

---

* ভাণবৎ সন্ধি-সন্ধ্যঙ্গ-লাস্যাঙ্গাটঙ্কর্বিনির্মিতং। ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবি-কল্পিতং। সাহিত্যদর্পণে ষষ্ঠাঙ্কে ৫৩৩ কারিকা।

কৃতকার্য হইয়াছেন। তর্কসিদ্ধান্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার "সুকণ্ঠ—নির্গলিত সুসঙ্গীতটি" পাঠমাত্রই জয়দেবের ভুবনবিখ্যাত গীতগোবিন্দের স্মরণ হয়। আমাদিগের এ অভিপ্রায়ের সাক্ষিস্বরূপে উক্ত গীতটি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"চূতমুকুলকুল, সঞ্চলদলিকুল,
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল কোকিল, কলরব-সংকুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতি-নর্তন, বিরসবিকর্তন
শুভ-ঋতুরাজ—সমাজে।
নব নব কুসুমিত, বিপিন সুবাসিত
ধীর সমীর বিরাজে॥"

প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকার কোন বিশেষ সৌন্দর্য নাই; কৌলীন্য—মর্যাদাভিমানী কোন ব্রাহ্মণকর্তৃক পূর্বদিন বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া পরদিন এক অতি বৃদ্ধ কুলীন পাত্রে আপন কন্যাচতুষ্টয়কে সম্প্রদান করাই ইহার স্থূল তাৎপর্য; পরন্তু সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় পরমচাতুর্যের সহিত সামান্য বিবাহের উদ্যোগে অনেকগুলি প্রসঙ্গ একত্রিত করিয়া অনেক ব্যক্তির চরিত অতি পরিপাটিরূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে কন্যাকর্তা কুলপালকই প্রসঙ্গ—বিধায়ে সর্বপ্রধান; তাঁহার বর্ণনা-পাঠে কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত, অথচ কুলাভিমান—রক্ষার্থে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কন্যাভারগ্রস্ত কুলীনের মূর্তি মনোমধ্যে অবিকল উদিত হয়; কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটী বোধ হয় না। পরন্তু নাটকের ক্রিয়াকলাপ—সম্বন্ধে প্রধান নায়ক তিনি নহেন, তদ্বিষয়ে অনৃতাচার্য চূড়ামণিই সর্বাগ্রগণ্য বলিতে হইবে। ঘটকের জাতীয় ধর্ম-রক্ষার্থে তিনি সকল ঘটেই বর্তমান; বোধ হয়, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় অনেক প্রযত্নে উহার চরিত্রের বিন্যাস করিয়া থাকিবেন; পরন্তু তৎপাঠানন্তর আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে স্বভাবত ধূর্ত ঘটকের অবিকল প্রতিমূর্তি অনুভূত হইল না; কোন পরিচিত

পদার্থের চিত্রপটের স্থানে স্থানে অসংলগ্ন বর্ণ বিন্যস্ত থাকিলে যদ্রূপ নয়নের অতৃপ্তি জন্মে, ঘটকরাজের চরিত্রে তদ্রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। নাট্যকার তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ঘটক-চূড়ামণির চরিত্র কি প্রকারে বর্ণিবেন, তাহার সঙ্কল্প এই বাক্যে করিয়াছেন,

তদ্যথা,

"আসিল পরের জাতি কুলনাশ:হেতু।
বিবাহ-নির্বাহ-বিধি-জলধির সেতু॥
অনর্থ অর্থের লাগি ত্যক্তধর্মকর্মা।
চূড়ামণি মিথ্যাবাদী অনৃতার্য শর্মা॥

এই প্রতিজ্ঞানুসারে সর্বত্রই তাহাকে অত্যন্ত ধূর্তরূপে বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু যে ব্যক্তি অর্থের লালসায় নিরন্তর শঠতায় অনুরত, তাহার মুখে আপন পিতৃ-নামের অজ্ঞতাসূচক নিম্নোদ্ধৃত সংলাপ মাদৃশ অকিঞ্চনদিগের অল্প বিবেচনায় কোনমতে সংলগ্ন বোধ হয় না। আমাদিগের বোধ আছে যে সৎ কি অসৎ, বিজ্ঞ কি অজ্ঞ, বংগদেশীয় কোন ঘটক এ প্রকার বাক্য কখন মুখে আনয়ন করে না। শুভাচার্যের প্রতি ব্যংগোক্তি মনে করিলেও এ বাক্য উপযুক্ত বোধ হয় না।

"শুভাচার্য। আপনকার পিতৃঠাকুরের নাম শুনিতে ইচ্ছা করি।

"অনৃতাচার্য। আঁা কি বল্যে হে; কালি রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, বড় গ্রীষ্ম।

"শুভ। মহাশয়ের পিতার নাম কি?

"অনৃ। বড় মশা।

"শুভ। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি আপনি কার পুত্র?

"অনৃ। অধিক দিন হইল আমার পিতৃ-ঠাকুরের পরলোক হইয়াছে।

"শুভ। (সহাস্য মুখে) আমি পরলোক ও ইহলোকের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ইহাতে পরলোক-ইহলোকের কথা কেন?

অনৃ। বিলম্ব কর, অধিক দিন তাঁহার কাল হইয়াছে, নাম প্রায় এক প্রকার বিস্মৃত হওয়া গিয়াছে, স্মরণ করি তবে তো বলিব, তাড়াতাড়ি করিলে কি হইবে ?

শুভ। কে আছ হে—শুনিলে ? ইনি এমনি ঘটক নিজ পিতৃনামও বিস্মৃত হন ! কিন্তু অন্যের পিতৃ-পিতামহের নাম ইঁহার মুখাগ্রবর্তি, সে সময়ে একটাও ঠেকে না।

অনৃ। পরের পিতার নাম কহিতে বিবেচনা কি ? যাহা আইসে একটা বলিলেই হয়। ভাল সে কথা থাকুক—তুমি কোন্ ব্যবসায়ী ?

এই কথোপকথনের কিঞ্চিৎ পরে শুভাচার্য ঘটকের লক্ষণ জিজ্ঞাসিলে অনৃতাচার্য কহেন।

অনৃ। হাঁ বাপু হে পথে আইস, আমার নিকট শুনিবে ?

শুভ।

প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, মুখে প্রিয় আলাপন
ধর্মাধর্মে নাই বিচারণ।
না পাইলে বলে কটু, স্বোদর-পূরণে পটু
দৃষ্টিমাত্র করে সম্ভাষণ ॥
বাচাল আচার-ভ্রষ্ট, জাতি কুল করে নষ্ট
দুষ্টমতি মূর্খের প্রবর।
বিবাদে নারদসম, মূর্তিমান যেন তম,
হয় নয় বল সুধীবর ॥

বেল্লিক-পুরাণে—মাতলামি খণ্ডে ঘটকের এই লক্ষণ লিখিত আছে, তা বাপু হে, এ সকল জানতে হয়, এ সকল শিক্তে হয়, পেট থেকে পড়িয়াই—ঘটক হইলে হয় না। আমি এ সকল শিখিয়া ও এ সকল গুণে ভূষিত হইয়াই—"ঘটক-চূড়ামণি" নামে খ্যাত আছি। আমার গুণের কথা কতো কহিব—আমি সাবর্ণ-গৃহে কত শত কৈবর্ত্ত কন্যা চালাএছি ; শুদ্ধগোত্রীয় বরে ক্ষত্রিয় কন্যা, বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে বৈষ্ণব কন্যা, শিব চক্রবর্তীর সন্তানে পদ্মরাজ-দুহিতা ঘটাএছি ; আর কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর, এ সমস্ত তো আমার

শরীরের আভরণ। এই ১৪ই মাঘে খাড়ীবাটীর রুচিরাম চক্রবর্তির কন্যাকে এক উন্মাদ দিগম্বর বর প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্তের কিঞ্চিদ্দক্ষিণা পাইয়া মাসাবধি শয্যাগত ছিলাম, কিন্তু আমার এরূপ চাতুর্য যে এতাদৃশ ব্যবহারেও আমি কখন কোথায় অপমানিত হই নাই, তুমি আমাকে কি ঘটকালি দেখাও। ভাল আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিও মন্দ নও, বল দেখি কুলীন কাহাকে বলে ?

এ উক্তির প্রথমভাগ অনৃতের মুখে স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, সুধীরের মুখে অতি পরিপাটী হইত। কেহ কেহ মনে করেন, শেষ ভাগও অন্য কোনও নটের মুখে থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু আমার বোধে, সাক্ষাৎ দম্ভাবতার ঘটকের পক্ষে একথা নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান হয় না।

শুভাচার্য অনৃতের পরোক্ষে কহেন।

শুভ। (জনান্তিকে) ওহে ভাই সুধীর, একি ? উঃ বেটা কি দাম্ভিক! বোধ হয় দম্ভই শরীরী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার উদরে ক অক্ষর মহামাংস, শুদ্ধ অশুদ্ধ কথাই অনর্গল কহিতেছে।

কিন্তু একথা রক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থকার চূড়ামণির মুখে কিঞ্চিৎ অশুদ্ধ কথা দিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহা থাকিলে উত্তম হইত। অনৃতাচার্য সত্যের বিপর্যয়ে তৎপর বটেন, কিন্তু ব্যাকরণের সহিত তাঁহার বিশেষ বিবাদ বোধ হয় না। অপর কুলপালকের সম্মুখে তিনি যে কৌশলে গৃহাচার্যকে দূরীকৃত করেন, প্রকৃত লোকযাত্রায় কোন বিজ্ঞ কন্যা-কর্তার প্রত্যক্ষে কেহ তাহা অবলম্বন করিতে পারে না।

কুলপালকের গেহিনী "ব্রাহ্মণীর" বাক্যালাপে বোধ হয়, তিনি পূর্ণবয়স্কা প্রৌঢ়া, "জামাইবেটা কত কথা জানে" তাহা শুনিতে ছিটে ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্রে" তাহাকে ভেড়া করিয়া রাখিতে ও যাহাতে "সুখের কামাই" না হয়, ইত্যাদি নানাভিলাষে বিলক্ষণ অনুরক্তা, কোন মতে আতুরা বৃদ্ধার ন্যায় নহেন; পরন্তু কুল-পালকের বাক্যানুসারে, তাঁহার চারি কন্যা, তন্মধ্যে "বড় কন্যার অদ্যাবধি সকল দন্ত পতিত হয় নাই; মধ্যমটীর সকল কেশও পক্ক হয় নাই; তৃতীয়

কন্যাও প্রায় মধ্যমটীর মত; আর আমার যে কনিষ্ঠা কন্যা সে অতি শিশু, বোধ হয় গাত্রে সূতিকা-গন্ধও থাকিলে থাকিতে পারে, বাছা এই গত পৌষ মাসে সবে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে।"

এই কন্যা চতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া জাহ্নবী ও শাম্ভবী আপন আপন বয়ঃক্রমানুসারে সশ্লেষে মাতৃসহিত বিবাহের আলাপ করে; কিন্তু কামিনীটী তাদৃশ শান্ত নহে। তাহার বয়স প্রায় মধ্যমটীর মতন, "সকল চুল পাকে নাই" অথচ আবদারে পরিপূর্ণ; এই মায়ের কথায় বিশ্বাস হয় না, আবার বরের বয়েস শুন্তে চায়, অথচ "যা হোক বিবাহ হইলেই হয়" (৩২ পৃষ্ঠা) আবার বলে, "ওমা, সত্যি বর কি এসেছে? বাসা দিছিস কোথা মা? চুপি চুপি দেক্‌তে গেলে হয় না, ক্ষেতি কি মা?" এদিকে গোপনে গিয়া বর দেখিয়া (১০৮ পৃষ্ঠা) "বড়দিদির কপাল ভাল, যেমন দেবা তেমনি দেবী" দেখে, তথাপি সে বরং পদে আছে, তাহার কনিষ্ঠা কিশোরী তাহার হইতেও এক কাঠি অধিক। "বাছা পৌষ মাসে পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছে," এবং কবিতায় বসন্ত ও বিরহ বর্ণনেও অপটু নহে; তথাপি মার বিবাহ দেখিতে উদ্যত। তাহার ভাবে বোধ হয়, কুলপালক আপন দুহিতাদিগের বয়ঃক্রম বলিতে ভুলিয়াছেন; প্রথমা ৩৫ বৎসর, দ্বিতীয়া ২৫, তৃতীয়া ১৪ এবং কামিনী ৮ বৎসর হইলে সকলের কথা সংলগ্ন হইত। এ বিষয়ে পাঠকদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থে তাহার মাতৃসহিত কথোপকথন এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, শ্লেষোক্তি বলিয়া ইহার অভব্যত্ব কাটান যাইতে পারে কি না।

কিশোরী। (সোৎসুকা)

প্রফুল্ল বকুল ফুল, গন্ধে অন্ধ অলিকুল
অনুকূল মলয় পবন।
প্রবোধ না মানে মন, সদা করে আকিঞ্চন,
বল্লালির দিতে বিসর্জ্জন॥

কুলে কালি দিয়ে কালী, বলে চলে যাব কালি
ঘটকালী কি করিবে আর।
যৌবন অমূল্য ধন, করিব গো বিতরণ
নাহি ভয় থাকিবে কাহার॥

কে রে আমায় ডাক্‌লে ?

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লি ?

ব্রাহ্মণী। তুই কালি অবধি কোথায় ? দেক্‌তে পাইনে কেন ?

কিশোরী। ওমা, ওমা, আমি ওপাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর অমন্ যেয়োনা, ডাগোর ডাগোর মেয়ে, যেতে আছে ? লোকে যে নিন্দে কর্বে, ছি !

কিশোরী। ওমা, কেন নিন্দে কর্বে মা ? কর্বে না, হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা, আর যেয়ো না, আজি এক কর্ম আছে।

কিশোরী। কি কম্ম মা ?

ব্রাহ্মণী। বাছা, আজি আমাদের বাড়িতে এক শুভকর্ম হবে।

কিশোরী। ওমা, কি শুভ কম্ম, বল্‌না মা ? হে মা বল, কি শুভ কম্ম। বলবিনে, বলবিনে ?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্‌বো না কেন ? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) ওমা, 'বে' কাকে বলে মা।

ব্রাহ্মণী। 'বে' কাকে বলে তাও জানিস নে বাছা ? 'প্রধান সংস্কার'।

কিশোরী। ওমা, তাকি আমি খাব ?

ব্রাহ্মণী। বাছা 'বে' কি খেতে হয় ? রাঙাবর আস্‌বে, তোদের 'বে' কর্বে, কতো ঘটাঘটি হবে, সে কি বাছা কিছুই জানিস্‌নে।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, সেই 'বে'? তা আমি জানি, তা কার হবে মা।

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে, তোমার আর তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ওমা, তবে তোর হবে মা?

ব্রাহ্মণী। (হাস্যে করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নাই, তাকি বল্‌তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝিচি, তোর হয়ে গেছে, ওমা কার সংগে হয়েছে বল্‌না মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমায় ব্যস্ত করিস্‌নে, মচ্চিচি নানান জ্বালা, তোরা সকলে এখন বাড়িতে যা।

তৃতীয়াঙ্কের প্রধান প্রক্রিয়া কামিনীগণের জল সওয়া; তাহার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই; মোহিনীর প্রবেশ অবধি সকল কর্ম সুপরিপাটীরূপে নির্বাহ হইয়াছে। মহিলাগণের আপন আপন স্বামি-সম্বন্ধে বিলাপ-পাঠে অনেকের মনে ভারতচন্দ্র-কৃত বিদ্যাসুন্দর-গ্রন্থস্থ সুন্দর-দর্শনে কামিনীগণের উক্তি মনে পড়িতে পারে, কেহ বা এই অংকের কবিতার বাহুল্য বিষয়ে সাহিত্যকারদিগের নিষেধ স্মরণ করিতে পারেন, পরন্তু নিম্নোদ্ধৃত গর্ভাংকের পরমসৌন্দর্যের ও অবিকল স্বভাব—সাদৃশ্যের প্রশংসা অবশ্যই করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মোহিনী। এই তো বে বাড়ি, কৈ কে কোথা গো? কাকেও যে দেক্‌তে পাইনে। ওমা সেএ কি গো? এই যে কথায় বলে "যার বে তার মনে নাই, কাটনা কামাই পাড়াপড়সীর"।

ভামিনী। মরণ, ও কি হলো? মিল্লো কৈ লো?

মোহিনী। আর ভাই, মেলে কৈ?

ভামিনী। গুণ থাগলেই মেলে, "যার বে তার মনে নাই, পাড়া পড়সীর ঘুম নাই।" দেক্‌দেকি মিল্লো কিনা?

মেদিনী। ভাল ভাই, তাই যেন মিল্লো, এখন বে বাড়ির কাকেও যে মেলে না, তার কি বল্‌না?

যমুনা। বলে মন্দ নয়, বে বাড়ি অথচ কিছুই দেকৃতে পাইনে। বাদ্দি নেই, বাজনা নেই, কিছুই নেই, সে কি, আঁা, ওমা আমি কোথা যাব, ওমা আমি কোথায় যাব।

হেমলতা। এই যে ভাই একটা কলাগাচ রয়েচে।

যমুনা। অমন কত গাচ কত দিকে আচে, আসলে কৈ লো? বাড়িল্লোক কৈ?

ব্রাহ্মণী। (প্রফুল্লমুখে) এই যে মা সকল, দিদি সকল, বাছা সকল, এসেচো এস এস, আসবে বৈ কি, তোমাদের কম্ম, কর্বে কর্মাবে খাবে খাওয়াবে, নেবে থোবে, তোমরা না কল্যে কে কর্ব্যে? জাতি বল গোত্র বল, সকলি আমার তোমরা।

হেমলতা। ওলো ঠান্‌দিদি বলি এাক লো? মেয়েদের বে দিতে বসেছিস্, তা সব ফাঁকিজুকি কি, ঘটাঘটি কৈ, কিছুই যে দেখিনে?

ব্রাহ্মণী। আর ভাই 'ঘটা', কুলীনের মেয়ের 'বে' ঘটাই ভার, আবার 'ঘটা' পাবো কোথায় বোন? তবে তোরা এসেছিস্ এই ঘটাই 'ঘটা'।

কামিনী। ওলো হেমলতা, জানিস্‌নে বড়গিন্নির সব ফাঁকি নিখরচায় জামাই পাবে, ছাড়বে কেন?

ব্রাহ্মণী। দূর ছুঁড়ি, ওকথা বল্‌তে আছে? জামাই আর ছেলে ভিন্ন কি? যা, তোরা সকলে মিলেজুলে জল সৈতে যা দেখি?

চপলা। যে তোর মেয়েদের বর এসেচে,

(বাটীমধ্যে ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।)

তার জন্য জলসৈতে হবে না, তাকে 'জল সৈ' কল্লিই
ভাল হয়—শুনে গেলিনে মাগি?

এই অভিনয়ের পর (৫২ পৃষ্ঠে) যশোদা ও ফুলকুমারীর কথোপকথনে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এমত পাষাণকেহই নাই, যে একেবারে মহাপাপীয়সী কৌলিন্য-প্রথার উৎসেদার্থে একাগ্রচিত্ত না হয়; তদুক্ত জামাতার ন্যায় নরাধম কি ভূমণ্ডলে আর আছে?

পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই মনে করিতে পারেন, যে সুকবি তর্কসিদ্ধান্ত-কর্তৃক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বর্ণন অবশ্যই উত্তম হইবে, কিন্তু যদবধি তাঁহারা প্রস্তাবিত গ্রন্থস্থ ধর্মশীল ও তর্কবাগীশের বর্ণনা না পড়েন, তদবধি বর্ণনাদ্বারা কি পর্যন্ত প্রকৃতের প্রতিমা মনে উদিত হয়, তাহার অনুভব করিতে পারিবেন না। ধর্মশীলকে লৌকিক-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রে একাগ্রচিত্ত, অথচ অর্থাভিলাষী অধ্যাপকবর্গের আদর্শস্বরূপ বলিলে বলা যায়।

কুলীন-কামিনীদিগের দুঃখবর্ণন-করণান্তর তাহাদের দুঃখদাতা কুলীন-কলিপুত্রদিগের মূর্তি চিত্রিত করিতে অনায়াসেই স্পৃহা হইতে পারে, তর্কসিদ্ধান্ত বিবাহ-বণিক, অধর্মরুচি, ও উত্তম মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রেই অতি পরিপাটীরূপে সে স্পৃহা নিবৃত্ত করিয়াছেন। কুলীনকুল-সর্বস্ব-দ্বেষী কুলীন "কলির চেলা এমত কেহই নাই, যে সে চরিত্রের কোন অংশে তিলার্ধ দোষারোপ করিতে পারে।" বিবাহবণিক (৭২ পৃষ্ঠে) "১২৫২ সালের ৩রা মাঘ বিমলাপুরের কমল ন্যায়ালংকারের কন্যাকে" বিবাহ করিয়া কি প্রকারে ১২৬১ সালে "এক কালে কুড়ি বৎসরের ছেলে" প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সন্দেহজনক মনে হইতে পারে; পরন্তু বণিকজীর "ফর্দের" বিশ্বাস কি? তাঁহার "লেখাপড়া" কুলধনের কন্যার ঠিকুজির ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া থাকিবে, বা বণিগবর ১২৪২ কে ১২৫২ পড়িয়া থাকিবেন।

অতঃপর কন্যাপ্রসূ গর্ভবতীর দুঃখ, কন্যাবিক্রয়ের দোষোদ্‌ঘোষণ, ফলারের লক্ষণ, বিরহী পঞ্চাননের যাতনা, ও অভব্যচন্দ্রের পরিচয় প্রভৃতি নানা প্রসংগে তর্কসিদ্ধান্ত এতদ্দেশীয় অনেক ব্যাপারের সুবর্ণন করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের উপসংহার করিবার পূর্বে ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য, যে বংগভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কুলীন-কুলসর্বস্বই রংগভূমিতে অভিনীত হওয়ার উপযুক্ত; তাহার অভিনয় যাদৃশ মনোহর-বিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদৃশ সদ্‌বিনোদ অধুনা বংগভাষায় আছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে না।

(২) বেণীসংহার নাটক

কবি না হইলে কাব্যের অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন-কুল-সর্বস্ব নাট্যকারের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটীরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন। যদিও অনুবাদের স্থানে স্থানে মূলের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হইয়াছে; পরন্তু তাহাতে দোষারোপণ করা যায় না; কেন তিনি তাহা আপন বিজ্ঞাপনে স্বীকার করিয়াছেন; বস্তুত নাটক অবিকল অনুবাদিত হইলে তাহার অভিনয়ে অনুবাদকের মানস সিদ্ধ হইত না। ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলে লিখিতেছি।

সংস্কৃত বেণীসংহারের প্রথমাংক ভীমোক্ত একটী কবিতাদ্বারা শেষ হইয়াছে; ঐ শ্লোক যথা,

> "অন্যোন্যাস্ফালভিন্নদ্বিপরুধিরবসামাংসমস্তিষ্কপঙ্কে
> মগ্নানাং স্যন্দনানামুপরি কৃতপদন্যাসবিক্রান্তপত্তৌ।
> স্ফীতাসৃক্পানগোষ্ঠীরসদশিবশিবাতূর্যনৃত্যৎকবন্ধে
> সংগ্রামৈকার্ণবান্তঃপয়সি বিচরিতুং পণ্ডিতাঃ পাণ্ডুপুত্রাঃ॥"

অর্থ "যুদ্ধস্বরূপ দুস্তর সাগর অতীব ভয়ানক; অস্ত্রক্ষত হস্তিদিগের রুধির মেদ মাংস মজ্জা প্রভৃতি তাহার পংক; তাহাতে রথসকল নিমগ্ন রহিয়াছে; তদুপরি পদাতিক সৈন্যেরা ভীমনাদে আত্মপরাক্রম প্রকাশ করিতেছে; এবং তচ্চতুর্দিগে শোণিত পানে মত্ত শৃগালদিগের অমংগল ধ্বনিতে কবন্ধ সকল নৃত্য করিতেছে; পরন্তু এ প্রকার সমুদ্র পার হইতে পাণ্ডবেরাই সুপণ্ডিত; অতএব ভয় কি? আমরা এখনই চলিলাম।"

অনুবাদক মহাশয় এই শ্লোকের অধিকাংশ ত্যাগ করত "যুদ্ধ-স্বরূপ সমুদ্র দুস্তর, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহা উত্তীর্ণ হইতে অত্যন্ত পণ্ডিত, তা ভয় নাই আমরা চলিলেম" এই কথায় উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কি পর্যন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত নাটকের আখ্যায়িকা কোনমতে রম্য নহে। বীর রসই ইহার উদ্দেশ্য। পরন্তু যুদ্ধবর্ণনে সহসা অনেক দর্শকের মন এক কালে সন্তৃপ্ত করা কুশলসাধ্য বোধ হয় না। অতএব এই নাটক উত্তমাভিনয়োপযুক্ত নহে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। রাজা দুর্যোধনের সভায় দুঃশাসন বলপূর্বক দ্রুপদকন্যার কেশ ধৃত করিয়াছিল। সেই অবমানে দুঃখিত হইয়া ভীম কুরুকুল ধ্বংস করত দ্রৌপদীর বেণী সম্বরণ করিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞোপলক্ষে প্রস্তাবিত নাটকে পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ ও ভীমের প্রতিজ্ঞা-পালন বর্ণিত হইয়াছে। এই বিষয়ের স্থূল বিবরণ অনুবাদক মহাশয় গ্রন্থ-প্রারম্ভে সুচারুরূপে বর্ণিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা শান্তনুর রাজ্যকালাবধি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত কুরু-পাণ্ডবদের সংক্ষেপ-বিবরণ অনায়াসে ব্যক্ত হয়; তৎপাঠে তাঁহার পাঠকবর্গেরা পূর্বোক্ত ইতিহাস জ্ঞাত হইয়া অনায়াসে নাটক বুঝিতে পারিবেন। বেণীসংহারের প্রথম প্রশংসা এই যে তাহাতে মনুষ্য-চরিত্র অবিকল বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পাঠমাত্র ভীমের তেজ, কর্ণের অহংকার, অশ্বত্থামার ক্রোধ ও দয়াপূর্ণ স্বভাব এবং দুর্যোধনের আত্মশ্লাঘায় মত্ততা, তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয়, কুত্রাপি কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি বোধ হয় না। এ প্রকার স্বভাব-বর্ণনের ক্ষমতা সামান্য প্রশংসনীয় নহে; অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কবি ভিন্ন অন্যে ইহাতে কৃতসংকল্প হইতে পারে না। পরন্তু সুশৃংখলায় নাটকের বিন্যাস করিতে গ্রন্থকার তাদৃশ লব্ধকাম হয়েন নাই; কেন না তিনি অনেক প্রক্রিয়া নেপথ্যের প্রতি অবলম্বন করিয়া বাক্যে বর্ণন করিতে বিরত হইয়াছেন।

কেহ কেহ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে প্রস্তাবিত গ্রন্থের অনুবাদক মহাশয় শকুন্তলানুবাদক নন্দকুমার কবিরত্ন মহোদয়ের ন্যায় স্থানে স্থানে কবিতার অনুবাদে পয়ারাদি পদাবলির অবলম্বন করেন নাই। যদিচ তাদৃশ—কবিতা-পাঠে মনোরম্য হইত বটে, কিন্তু অভিনয়ে যে তাহা গ্রন্থের সাফল্যকর হইত ইহা নিতান্ত সন্দেহাস্পদ। জীবন-যাত্রায় সম্ভাবনীয় ঘটনার অনুকরণের

নাম নাটক; তাহাতে যে পর্যন্ত প্রকৃতির সহিত সাদৃশ্য রক্ষা পায় তদনুসারে নাটকের সাফল্য হয়; সাদৃশ্যের অভাব হইলেই রসের হানি হয়; সুতরাং জীবন-যাত্রায় যে অবস্থায় যে ব্যক্তি যে ভাষা কহিতে পারে নাটকে তাহারই প্রয়োগ করা কর্তব্য; তদন্যথায় রংগভূমিতে পয়ারে রোদন, ত্রিপদীতে রাগ, বা চৌপদীতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কৌতুক-ব্যংগ বা অদ্ভুতের বর্ণন স্থলে পদ্য রচনায় হানি নাই; তত্তদ্‌স্থানে কাব্য সম্ভবপর বটে। ফলতঃ নাট্যশালায় পয়ারাদিতে বীর-রসাশ্রিত নাটক অভিনয় করিলে মাদৃশ অকিঞ্চিৎকরদিগের বিবেচনায় সমুদায়ই পাঁচালির অনুকরণ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে অন্যান্য দেশীয় ও সংস্কৃত ভাষায় কবিগণ এতাদৃশ নাটকে পদ্য ব্যবহার করিয়াছেন; পরন্তু তাঁহাদের স্মরণ করা কর্তব্য যে সংস্কৃত কবিতা আমাদের পয়ারের তুল্য নহে, সুতরাং উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। ইংরাজী লাটিন ও গ্রিক কবিতাসকল মাত্রাছন্দে রচিত হয়। তাহাতে প্রতি পদের শেষ অক্ষরে অনুপ্রাসের প্রয়োজন রাখে না। এই প্রযুক্ত তৎপাঠে গাম্ভীর্যরসের প্রকাশ পায়। সংস্কৃত ও অনুপ্রাসের দাস নহে; অতএব তৎপাঠেও পয়ারের ন্যায় প্রতিকথায় ঠনন ঠনন ঘণ্টা ধ্বনি হয় না, সুতরাং তাহাও অসুশ্রাব্য নহে। এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় মাত্রাছন্দে পদ্য প্রায় প্রচলিত নাই; অপর তদ্রূপ পদ্য রচনা করিলেও গদ্যের ন্যায় বোধ হয়; অতএব এসকল স্থলে বিশেষত বেনীসংহারে গদ্য রচনা করাই বিধেয়।

কয়েক মাস হইল শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের সদনে শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয় প্রযত্নে প্রস্তাবিত অনুবাদ-গ্রন্থের অভিনয় হইয়াছিল; তদ্দর্শনে সহৃদয় মহাশয়েরা যে প্রকার পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল যে পণ্ডিতবরের অনুবাদ ও নটদিগের নাট্য ক্রিয়া কোন মতে দূষণীয় হয় নাই; সকলেই আপন আপন প্রযত্ন পূর্ণরূপে সফলকরত দর্শক ও নাটক উভয়েরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

(৩) রত্নাবলী নাটক

রত্নাবলী নাটক শ্রীহর্ষদেব নামা কাশ্মীরাধিপতি বিরচিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থকর্তা শ্রীমম্মট ভট্ট লেখেন যে শ্রীহর্ষ স্বয়ং বিশেষ সুকবি ছিলেন না; তাঁহার সভাস্থ ধাবক প্রভৃতি কএক জন সুপণ্ডিত গ্রন্থ রচনাকরত তাঁহার নামে বিখ্যাত করিত। একথা নিতান্ত অপ্রমাণ বোধ হয় না; সুতরাং রত্নাবলীর আদিকর্তা কে তাহা স্থিরীকৃত হইবার উপায় নাই। সে যাহা হউক। সংস্কৃত রত্নাবলী যে শ্রীহর্ষের রাজ্য-কালে প্রকটিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে। উক্ত রাজা ইংরাজী ১১১৩ অবধি ১১২৫ অব্দ পর্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং রত্নাবলী ও সেই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গ্রন্থের মুখ্যোদ্দেশ্য উদয়ন রাজার চরিত্র; কিন্তু সোম দেবকৃত 'বৃহৎ-কথা'য় * যে প্রকারে উক্ত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত গ্রন্থে তদনুরূপ বর্ণিত হয় নাই; গ্রন্থকার আপন কল্পনা-বলে বিবিধ নূতন ঘটনার আরোপকরত গল্পের সৌন্দর্য সুপ্রসিদ্ধ করিয়াছেন। নাটক-রচনায় এ প্রথা সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; অতএব তদ্ধেতুক গ্রন্থকারের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে না। তাঁহা-কর্তৃক প্রাচীন আখ্যায়িকার অন্যথা হওয়াতে নাটিকার অনেক সৌন্দর্য বর্ধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; বিশেষত ভবভূতি-বিরচিত মালতী-মাধবের অনুরূপে ইহার রচনা নিষ্পন্ন হওয়াতে ইহা বিশেষ মনোহর হইয়াছে; অধিকন্তু ইহাতে সহস্রবৎসর-পূর্বে কি প্রকারে এতদ্দেশীয়েরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত তাহার কথঞ্চিৎ আদর্শ থাকাতে ইহা অনেকেরই সমাদরণীয় বলিয়া গণ্য হয়।

রত্নাবলীকর্তা কবিত্বগুণে কালিদাস বা ভবভূতির তুল্য নহেন, সুতরাং তাহার গ্রন্থ সংস্কৃত মালতীমাধবের সহিত তুলনা করিলে অনেক অপকৃষ্ট বোধ হইবেক; পরন্তু চরিত্র-বর্ণনায় তেঁহ কোন মতে

* শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ-প্রণীত বৃহৎকথার অনুবাদ গ্রন্থে পাঠকবৃন্দ এই বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন।

অক্ষম নহেন। তিনি যে অভিপ্রায়ে যে সকল চরিত্র বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা সর্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বর্ণনাপাঠে তাঁহার অভিপ্রেত-স্বভাবান্বিত মনুষ্যের প্রতিরূপ মনে অবিকল উদিত হয়, কুত্রাপি কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি হয় না। ইহাই রত্নাবলীর প্রধান মাহাত্ম্য এবং এতদর্থই রত্নাবলী সর্বদা সমাদৃতা হইয়া থাকে।

ইহার অনুবাদ প্রথমত উইল্‌সন্‌ সাহেব কর্তৃক ইংরাজি ভাষায় সুসিদ্ধ হয়। তদনন্তর ইহার উপাখ্যানভাগ তারকচন্দ্র চূড়ামণি বংগভাষায় ব্যাখ্যান করেন; উক্ত ব্যাখ্যান পাঠে আমরা কোন মতে সুতৃপ্ত হই নাই; এই প্রযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ পাঠ করিতে আমাদিগের বিশেষ স্পৃহা ছিল না। কোন বন্ধুর অনুরোধে পুস্তকখানি হস্তে লইয়া বৃথা শ্রমের ভয়ে বন্ধুর প্রতি মনে মনে রুষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু আমাদিগের সে রোষ কেবল সৌদামিনীর ন্যায় উদিত হইয়াছিল, গ্রন্থের প্রথমাঙ্ক না শেষ করিতেই লালিত্যরসে তাহা এক কালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তদনন্তর অবিশ্রান্ত পীযূষ-পানের ন্যায় গ্রন্থে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। তর্করত্ন মহাশয় নাটক-রচনায় সুপণ্ডিত; তাঁহার লেখনী সুরস-প্রসূ; তাহা হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হয় তাহাই রসোদ্দীপক ভাব, সুচারু ভংগি, ও কোমলতম বাক্যবিন্যাসে অতীব মনোহর ঠাম ধারণ করে। তাঁহা কর্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য যাদৃশ পরিপাটিরূপে বংগভাষায় প্রকটিত হইয়াছে, বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশ-রূপে সংস্কৃতের চাতুর্য বাংগালাতে রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা অবশ্য স্বীকর্তব্য যে পণ্ডিত মহাশয় স্বীয়ানুবাদে সংস্কৃত পুস্তকের অনেক স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে প্রায় কোন স্থানে সংস্কৃতের বিরুদ্ধভাব ব্যক্ত হয় নাই; বহুধা ভাবের ঐক্য আছে, অথচ বাংগালি-প্রচলিত শ্লেষের প্রয়োগে রসের প্রাচুর্য হইয়াছে। বোধ হয় দুই এক স্থানে সংস্কৃতের অপনয়ন না করিলে রসের বিশেষ প্রাচুর্য হইত, পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা তর্করত্নের সহিত তর্ক করিব না। তাহার কুলীনকুলসর্বস্ব ও বেণীসংহার পাঠ করত আমরা বিশেষ

সন্তুষ্ট ছিলাম; আধুনা তদপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর "মহামূল্য রত্নাবলী"র লাভে আমরা নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছি; তর্কদ্বারা সে আনন্দের বিচ্ছেদ করা কোনমতে সুপরামর্শ নহে।

প্রস্তাবিত নাটিকার প্রধান উদ্দেশ্য রত্নাবলী; অতএব তাহার বর্ণনে গ্রন্থকার সবিশেষ প্রযত্ন করিয়াছেন; এবং সে শ্রমও নিরর্থক হয় নাই। অন্যমনা, প্রেমানুরক্তা অথচ লজ্জাশীলা, সরলা কুলবালার অবিকল প্রতিরূপ নির্দেশিত করিতে হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে তর্করত্নের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারি; তাহাতে সাগরিকা আমাদিগের অবশ্য সহায়তা করিবেন। অভিনয়কালে তিনি যখন গোপনে রাজ-ভবন হইতে উদ্যানে আসিয়া লজ্জা ও বিরহের যাতনায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তখন পাষাণ হৃদয়ও তাঁহার নিমিত্ত অশ্রুপাত করে, সন্দেহ নাই। কেবল পাঠ করিলে ঐ বিচ্ছেদোক্তি তাদৃশ মনোভেদক হয় না, তত্রাপি আমরা নিঃসংশয়ে লিখিতেছি যে নিম্নোদ্ধৃত সাগরিকাবাক্য অবশ্যই পাঠকবর্গের করুণারসের উত্তেজক হইবে।

"সাগরিকা—"(স্বগত) আমি ত বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছি কেউ দেখতো পায় নাই—তা এখন যাই কোথা?—সে কথা সব রাজমহিষী টের পেয়েছেন, সকল সখীরে কাণাকাণি কর্‌ছে, কাকেও আর আমি মুখ দেখাতে পাচ্চিনে! (দীর্ঘনিশ্বাস) বরং প্রাণত্যাগ করব তবুতো লজ্জাত্যাগ করতো পারবো না! (চিন্তা করিয়া সরোদনে) প্রাণত্যাগ কর্‌ল্যেই বা প্রাণ আমাকে ত্যাগ করে কৈ? যখন সমুদ্রে নৌকা ডুবেছিল তখন আমার মরণ হলো না, যদি সে সময় মোর্‌ত্যেম তাহলে আর কোন যাতনাই থাক্‌ত্য না তা বিধাতা আমাকে সে সমুদ্র থেকে রক্ষা কোরে, এখন এই অকূল দুঃখসমুদ্রে ফেলে দিলেন! (অধোবদনে রোদন)।

* * * *

"এইত অশোক গাচ, তা গলায় কি দিব? দড়ি ত আনিনি (নিকটে একটা লতা দেখিয়া) হাঁ! এই যে বিধাতা দয়া কোরে একটা লতা মিলিয়ে দিলেন। তা এইটেই গলায় দি (লতা লইয়া

সরোদনে) হা বিধাতা! কেন আমাকে মনুষ্য দেহ দিছিলে? কেনই বা পরাধীন কোরে এত যন্ত্রণা দিলে? আমি কি অপরাধ কোরেছি? আর কোরেই বা থাকৃবে:—পূর্বজন্মে কত মহাপাতক কোরেছিলাম, তা না হলে কি এমন হয়? যা হউক, হে জগদীশ্বর! হে দয়াময়! আমি প্রাণত্যাগ করি, কিন্তু দয়া কোরে এখনও এই কোরো জন্মান্তরে যেন নারীজন্ম আর না হয়; যদি নারী-জন্মই হয়, তবে যেন আর পরাধীন না হতে হয়; আর যদি তাও হয় তবে যেন আর কোন দুর্লভ বস্তুতে কখন অভিলাষ না জন্মে —এই আমার প্রার্থনা। (লতাপাশে গ্রন্থি দিয়া) হা পিতা! মাতা! এ সময়ে তোমরা কোথায় রৈলে! আমি তোমাদের এত আদরের মেয়ে—আমার অদৃষ্টে এই হলো।"

ভারতবর্ষীয় রাজভবনের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইলে মনুষ্য যে প্রকার কামপরবশ, স্ত্রৈণ, নির্বীর্য ও রাজকার্যে অলস হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে গ্রন্থকার উদয়নের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার আয়াস সার্থক হইয়াছে। যৎসময়ে রত্নাবলী বিরচিত হইয়াছিল তৎকালে ভারতবর্ষে প্রায় সকল রাজাই আলস্যানুরক্ত, ইন্দ্রিয়সুখানুরাগী ছিলেন; এই প্রযুক্তই যবনেরা তাঁহাদিগকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া হিন্দুদিগের স্বাধীনতা একেবারে উৎসন্ন করে। উদয়ন ঐ রাজাদিগের অবিকল আদর্শ; তাঁহার চরিত্রে বীর্যের লেশমাত্র নাই; প্রেমোদ্দেশেও ইনি যন্যাসোপবাসির ন্যায় দুর্বল বোধ হয়। শকুন্তলায় দুষ্মন্ত রাজা, বিক্রমোর্বশীতে পুরূরবা, এবং মালতীমাধবে মাধব যে প্রকার বীরপুরুষের ন্যায় প্রেমানুশাসন করিয়াছেন, উদয়ন তাহার অনুকরণে নিতান্ত অক্ষম; তাঁহাদের ন্যায় ইহার প্রেমও নির্দোষী নহে। তৎ-প্রমাণার্থে রাজা ও রাণীর সহচরী কাঞ্চনমালা এবং সাগরিকার কথোপকথন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; সহৃদয় পাঠক-গণ তৎপাঠেই আমাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইবেন। পরন্তু ইহা মানিতে হইবে, যে এক স্থলে উদয়নের মুখে যে এক সদ্ভাবের বাক্য

নির্গত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে বীর্যের অভাবে ইনি বীর্যের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হয়েন নাই। যখন বিজয়বর্মা আসিয়া কোশলাধিপতির যুদ্ধ ও মৃত্যুর সংবাদ বর্ণন করেন তখন কোশলাধিপের বীর্যবিষয়ে উদয়ন যে সাধুবাদ করেন, তাহা মহত্তের উপযুক্ত হইয়াছে।

রাজসমীপে সুসংগতার আগমন।

"রাজা। (সুসংগতাকে দেখিয়া ভয়ে শীঘ্র চিত্রপট আচ্ছাদনপূর্বক) এস এস—সুসংগতা। —তবে—তবে, আমি এখানে আছি মহিষী কি জান্‌তে পেরেছেন?

"সুসং। হাঁ মহারাজ! তিনি জেনেছেন, আবার আমিও ঐ চিত্রপটের কথাটা বলি গে।

"বিদূ। মহারাজ! ও মাগি ভারি দুষ্ট, ও না পারে এমন কর্ম নেই, আপনি ওকে কিছু দিয়ে—

"রাজা। (সভয়ে সুসংগতার হস্ত ধরিয়া) সখি। তুমি এ কথা মহিষীকে বোলো টোলো না—আমার দিব্য।

"সুসং। (সহাস্য মুখে) না মহারাজ! দিব্য দিবেন না; আমি পরিহাস করলেম্—এ কি বল্‌বার কথা?

"রাজা। (সহাস্য মুখে) তাই তো বলি এ কর্ম কি তোমার যোগ্য, এ আংটিটি পরো—(হস্তের অংগুরীয়ক প্রদান)

"সুসং। (সহাস্য মুখে) মহারাজ! আমাকে কিছু দিতে হবে না—আমার সখী সাগরিকা আমার উপর রাগ করেছেন, কথা কন না, আমি সাধ্য-সাধনা কল্যেম, কিছুতেই হলো না, তা আপনি বরং তাকে এট্টু বলে কয়ে দিন, তা হলেই আমার পারিতোষিক পাওয়া হল্যো।

"রাজা। —(সোৎসুকে) কি বল্‌ল্যে? সাগরিকা কি তোমার সখী? কৈ? তোমার সখী কোথায়?

"সুসং। ঐ বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি এত ডাকলেম্—বলি ঘরের ভিতর আয়—তা কোন মতেই এলো না।

"রাজা। (সত্বর আসিয়া, দেখিয়া স্বগত) এই সেই সাগরিকা আহা মরিমরি এমন রূপ! (প্রকাশ্যে) সুসংগতা তোমার কি অদৃষ্ট —তুমি এমন সখী কোথা পেলে? আহা! রূপ দেখে আমার নয়ন জুড়াল, বোধ হয় বিধাতা একে নির্মাণ করে আপনিই মুগ্ধ হয়ে থাক্‌বেন।

"সাগ। (রাজাকে দেখিয়া ত্রাস, অভিলাষ ও অংগবিলাস প্রকাশপূর্বক স্বগত) এই না সেই চিত্তচোর? (অধোমুখে অবস্থিত)

"সুসং। (সহাস্যমুখে) মহারাজ! এর রূপও যেমন—গুণও তেম্‌নি।

"রাজা। হাঁ, তা প্রত্যক্ষেই দেখ্‌ছি—একবার কটাক্ষ করেই আমার মন হরণ কর্‌লেন্‌—গুণ না থাকলে কি পার্‌তেন্‌?

"সাগ। (সুসংগতার প্রতি ঈর্ষাপূর্বক) এই বুঝি তোমার চিত্রপট আনতে যাওয়া? আমি এখান থেকে চল্‌ল্যেম্‌ (গমনোদ্যোগ)।

"রাজা। কেন? কেন? এত রাগ কেন?

"সুসং। (সহাস্যমুখে) রাগ কেন—ঐ চিত্রপটে ইনি মহারাজকে লিখে দেখ্‌ছিলেন, তা আমি অভাগী মরতে উরির একধারে উরির এক ছবি লিখে দিছি—তাই রাগ।

"রাজা। এই রাগ (স্বগত) এত রাগ নয়—এ যে অনুরাগ। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! আমার কথা রাখ, এমন কোরে যেয়ো না, দ্রুত গমন কর্‌লে তোমার কোমল চরণে বেদনা হবে।

"সুসং। মহারাজ! উনি বড় অভিমানিনী—হাতে না ধরিলে হবে না।

"রাজা। (স্বগত) আমিও ত তাই চাই (প্রকাশ্যে) অবশ্য, তোমার অনুরোধে পায় ধরত্যে পারি—হাতে ধরা কি একটা বড় কথা? (সাগরিকার হস্ত ধারণ)।

"সুসং। সখি! আর কেন? রাজা পর্যন্ত তোর হাতে ধর্‌লেন —তবু কি রাগ পড়ে না?

"রাগ। (সুসংগতার প্রতি) তোমার মরণ নাই?

"রাজা। না না—সুন্দরি! সখীকে এমন রূঢ় কথা বল্‌তে নাই, যা বল্‌তে হয় বরং আমাকেই বল, তোমার রুক্ষ কথা আর মিষ্ট কথা আমাকে যা বল্‌বে আমি তাতেই তুষ্ট হবো, জল শীতলই হউক বা উষ্ণই হউক অগ্নিকে নির্বাণ অনায়াসেই কর্‌তে পারে।

"বিদূ। তাই ত, এর রাগ ত সামান্য নয়। ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত যে রেগেই আছেন।

"সুসং। সখি! আর কেন? ক্ষান্ত হ। এতই কি কত্তো হয় না?

"সাগ। তুই যা, আমি তোর সংগে আর কথা কব না।

"বিদূ। ও, বাবা! এ যে দ্বিতীয় বাসবদত্তা।

"রাজা। (ভয়ে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ করিয়া) অঁ্যা! অঁ্যা! কৈ? কৈ? মহিষী কোথায়?

(সাগরিকা ও সুসংগতার পলায়ন)

কৈ? বসন্তক! মহিষী বাসবদত্তা কোথায়?"

"বিদূ। আপনি স্বপ্নে দেখ্‌লেন না কি? বাসবদত্তা আবার কোথা? ওর বড় রাগ তাই বল্‌ল্যেম—এ যে দ্বিতীয় বাসবদত্তা, রাজমহিষী ত আসেন নাই।

"রাজা। দূর মূর্খ, এমন সময় এমন কথাও বলে।

(সবিষাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস) আহা সে অপরূপ রূপ কি আর নয়নে দেখিতে পাব?"

সাহিত্যদর্পণকার লেখেন যে বিদূষক লোভী, অল্পবুদ্ধি, কৌতুক-তৎপর পেটার্থী ব্রাহ্মণ হইলেই নাটকের সাফল্য হয়। রত্নাবলী বসন্তকের বর্ণনসময়ে মনোমধ্যে এই লক্ষণ জাগরূক রাখিয়াছিলেন, তদ্ধেতুকই ঐ চরিত্র অতি মনোহর এবং স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। আমরা নিতান্ত বিশ্বাস করি যে সহৃদয় পাঠক কেহই তার বিবরণ-পাঠে অতৃপ্ত হইবেন না। তাহার যে কোন কথোপকথনের আলোচনা

করা যায়, তাহাই সর্বতোভাবে কৌতূহলজনক বোধ হয়, কুত্রাপি রসানুভবের ব্যাঘাত ঘটে না।

রাজমহিষী বাসবদত্তা অতীব অভিমানিনী অথচ, ধীরা, গম্ভীরা এবং পতিভক্তিপরায়ণা। তিনি স্বামীর অত্যাচারে স্ত্রীস্বভাবানুরোধে খণ্ডিতা হইয়াও আপন মনোবেদনা মনেই সমাহিত করিয়াছেন; অত্যন্ত রাগের সময়েও রাজার প্রতি কোন মতে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। ইহা যথার্থ মহত্ত্বের লক্ষণ মানিতে হইবে; এবং আহ্লাদের বিষয় এই যে ইহা বঙ্গাঙ্গনাদিগের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পাঠকবৃন্দ অনেকেই তাঁহার চরিত্রের আদর্শ ভদ্রগৃহে অনেক মহিলার আচরণে দেখিতে পাইবেন। ফলত অধুনা আমাদিগের গেহিণীরা অশিক্ষিতা হইয়াও যাদৃশ সচ্চরিত্রা ও উদারচিত্তা, আমাদিগের পুরুষেরা কোন মতে তাদৃশ নহে; অনেকেরই উদয়নের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ বোধ হয়। এই বাক্য সপ্রমাণ করণার্থে আমরা নিম্নস্থ কএক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

রাজা উদয়ন সাগরিকাবোধে বাসবদত্তাকে দেখিয়া বসন্তককে সম্বোধন করিতেছেন "আর চন্দ্রে প্রয়োজন কি ভাই? প্রিয় সাগরিকার নির্মল বদনচন্দ্র উদয় হয়েছে—বিচ্ছেদরূপ অন্ধকার দূরে গেল—আহ্লাদময় কুমুদ প্রফুল্ল হোলো—এখন এই চন্দ্রের বাক্যসুধা লোভেই আমার চিত্তচকোর চঞ্চল হয়ে রয়েছে; প্রিয়ে! একবার কথা কও।"

"বাস। (অসহ্য হইয়া অবগুণ্ঠন উদ্‌ঘাটনপূর্বক) নাথ। সত্যি, আমি সাগরিকাই বটে—তুমি এখন ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধই সাগরিকাময় দেখ্‌বে।

"রাজা। (দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) এ কি। ইনি যে বাসবদত্তা। সাগরিকা ত নয়। কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ! (বিদূষকের প্রতি জনান্তিকে) বসন্তক এ কি কর্‌ল্যে? এখন কি হবে?

"বিদূ। (জনান্তিকে) আর কি হবে মহারাজ। আমারই কপাল ভাঙ্‌লো—আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি যে কর্ম করেছি—যে সব কথা বলেছি, আমাকে কি করেন বলা যায় না।

"রাজা। (অঞ্জলি করিয়া সানুনয়ে) প্রিয়ে বাসবদত্তে! ক্ষমা কর। আমার অপরাধ হয়েছে।

"বাস—সে কি নাথ?—সে কি—সে কি? আমিই এমন সময় এসে অপরাধিনী হয়েছি—আমি আবার কি ক্ষমা কর্‌ব্যো?

"বিদূ। (সানুনয়ে) রাজমহিষি! আমাদের ত আর মুখ নাই—তবু একটা কথা বলি, রাজা আর কখন কোন অপরাধ করেন নাই—তা আপনি অনুগ্রহ কোরে এঁর এই একটা অপরাধ মার্জনা করুন, আপনি বড় লোক, আপনার গুণও বিস্তর—আর আমি অধিক কি বোল্‌বো।

"বাস। ভাই বসন্তক! কি বল্‌ল্যে? আমার আবার গুণ আছে? আমার কর্কশ বাক্যে মহারাজের কর্ণকুহর একেবারে জ্বলে পুড়ে রয়েছে, তা সে কর্কশ বাক্য আর শুনে কাজ নাই, আমি এখান থেকে যাই—সেই ভাল।

"রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে বাসবদত্তে! এবার ক্ষমা কর্‌তে হবে—(চরণসমীপে পতন)

"বাস। ওঠ ওঠ নাথ!—সে কি? সে অতি নির্লজ্জা মেয়ে তোমার মন জেনে আবার তোমার উপর রাগ করে; তা তুমি এখানে আহ্লাদ আমোদ কর—আমি চল্যেম। কাঞ্চনমালা আয় লো—আয় আমরা যাই।

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রস্থান)

"বিদূ! (স্বগত) আঃ রাম বল—আপদ গেল, মাগী যেন অকালের বাদ্‌লা, ক্ষণকালের জন্য এসে সকলকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত কোরে গেল।

"রাজা। মহিষি! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

বিদূ (সহাস্য মুখে) মহারাজ! ও কি হচ্যে? রাজমহিষী ত এখানে নাই, তিনি যে গেছেন, তবে আপনি আর অরণ্যে রোদন কেন করেন?

"রাজা। কি? গেছেন? (উঠিয়া) আর দয়া কোরে গেলেন না?

"বিদূ। (সহাস্ত মুখে) দয়া আর না কোরে গেলেন কেমন কোরে ? মারেন নাই এই যথেষ্ট।"

এই ঘটনার পর আশ্চর্য পতিভক্তি ও ভদ্রতার পরবশ হইয়া রাণী কহেন "সখি। কর্মটা বড় ভাল হয় নি, রাজা পায় পর্যন্ত পড়েছিলেন;— তবুও রাগ কোরে এসেছি তা চল বরং তাঁর কাছে যাই। আহা! আমার নিমিত্তে কাতর হয়ে না জানি কি করেন—চল যাই একবার দেখি গে!" এই কথা কহিয়া তিনি রাজার নিকট আগমন করত শুনিলেন রাজা সাগরিকাকে নানাপ্রকারে কহিতেছেন ; "প্রিয়ে বাসবদত্তাকে যে প্রিয় কথা কহি, সে যে রুষ্ট হইলে তাহার পায়ে পড়ি, 'আহা তুমি কাঁপিতেছ' ইত্যাদি যাহা কহি, সে সকলই আমাদের সম্বন্ধানুরোধে হয়, প্রেমের অনুরোধে নহে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও বাসবদত্তা এই মাত্র কহিলেন, "হে মহারাজ, এই কথাই তোমার উচিত বটে ?" এবং তৎপরে রাজা চরণে পতিত হইলে কহেন, "আর্যপুত্র, উত্থান কর, উত্থান কর। আর জ্ঞাতির সেবা স্বরূপ দুঃখ ভোগ করিবার প্রয়োজন কি ?" ঐ অবস্থায় এ কথা যথার্থ মহৎ ভিন্ন অন্য ব্যক্তির মুখে আসিতে পারে না। শ্রীহর্ষ এই ভাবের প্রয়োগে আপন গ্রন্থের যথার্থ গরিমা সংস্থাপিত করিয়াছেন।

ধনিগণের গৃহস্বামিনীর প্রিয়া কুটিলা দাসী যে প্রকার হইয়া থাকে কাঞ্চনমালায় তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা নাই ; মনে করিবামাত্র অল্প বয়স্ক অনেকেই জীবিতা তাদৃশী দাসীর মনন করিতে পারেন, যেহেতু জীবনযাত্রায় অনেকেই তাদৃশী সহচরী দেখিয়াছেন। বাল্মীকি ঋষি এই প্রকার দাসীর আদর্শস্বরূপে মন্থরার বর্ণন করেন ; এবং তাঁহার অনুকরণে ভারতচন্দ্র সাধী ও মাধীর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কাঞ্চন-মালা মন্থরার তুল্যা নহে, কিন্তু কদাপি সাধী-মাধীর পশ্চাদ্‌গামিনী হইবেক না। যৌগন্ধরায়ণ মুদ্রারাক্ষসোক্ত রাক্ষসের প্রতিরূপ, কিন্তু অবকাশাভাবে তাঁহার ক্ষমতা সুপরিব্যক্ত হয় নাই। নাটিকোক্ত অপর ব্যক্তিরা সকলেই আপন আপন কর্তব্যে সুপারদর্শী, কাহারও কোন

ত্রুটি হয় নাই ; পরন্তু তাহাদের কর্তব্য অধিকও নহে দুষ্করও নহে, সুতরাং তদ্বর্ণনে গ্রন্থকারের কোন বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন হয় না, অতএব গ্রন্থের দোষগুণের আলোচনায় তাহার উল্লেখ বিশেষ আবশ্যক নহে ; এই প্রযুক্ত আমরা তর্করত্ন মহাশয়কে সুচারু বংগীয় রত্নাবলীর নিমিত্ত ধন্যবাদ করত এই স্থলে এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম ।

(৪) "অভিজ্ঞান-শকুন্তল"

রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটক আমরা পাঠ করিয়াছি। তর্করত্ন মহাশয়ের "কুলীন-কুল-সর্বস্ব" নামক নাটক যে ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিয়াছে, তাহার নিকট অভিনব গ্রন্থের প্রশংসা করাই বাহুল্য। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে নবীনা শকুন্তলা সমীচীন হইয়াছে। ভাবের উৎকর্ষ রচনার চাতুর্য ও শব্দের কৌশল, এই সকল গুণে গ্রন্থের যে পর্যন্ত উত্তমতা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার কিছুরই উপস্থিত নাটকে অভাব নাই! কালিদাসকৃত "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" সংস্কৃত নাটকের আদর্শস্বরূপ ; তাদৃশ উৎকৃষ্ট রচনা আর কোন সংস্কৃত কবি সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। কালিদাস স্বয়ং ও তাহার প্রতিরূপ প্রস্তুতকরণে অশক্ত ; তাহা সর্বত্র অনুপম বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তদ্ধেতুকই সুবিখ্যাত কবি গুএটে কহিয়াছেন "বসন্তের * মুকুলকুসুমাদি ও শরতের পরিণত ফল যদ্যপি ঈপ্সিত হয়, আত্মা যাহাতে পুলকিত, মুগ্ধ, পরিসেবিত এবং পরিপুষ্ট হয় তাহা যদ্যপি আকাংক্ষিত হয়—যদ্যপি স্বর্গমর্ত্য একমাত্র নামে নিবিষ্ট করিতে বাঞ্ছনীয় হয়—তাহা হইলে, হে শকুন্তলে আমি তোমার নাম উচ্চারণ করি, তাহাতেই সকল সিদ্ধ হইবে।" এতাদৃশ অনুপম পদার্থকে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত "স্থানে স্থানে অনেক

* কবি স্বদেশনিয়মে নবীন ও বৃদ্ধ বৎসর শব্দ ব্যবহৃত করিয়াছেন ; এতদ্দেশে তাহা বিরুদ্ধ হয় বলিয়া অনুবাদে তাহার পরিবর্তন করা গেল।

তর্করত্নের মঙ্গলাচরণ হইতে উদ্ধৃত।

রস-ভাবাদি পরিবর্ত্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত” করায় কোন মতে বিবেচনার কর্ম হয় নাই। কবিত্ব, বস্তু-স্বভাব-স্ফুটীকরণ ও সম্প্রসারণ গুণ শকুন্তলার প্রধান সৌষ্ঠব, অভিনয়ে যদ্যপি তাহা রক্ষা না পায় তাহা হইলে শকুন্তলার অভিনয় না করাই শ্রেয়। পণ্ডিতমহাশয়েরা অনায়াসে অনেক উজ্জ্বল নাটক রচনা করিয়া অভিনয়ানুরাগিদিগের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন; তন্নিমিত্ত শকুন্তলার কবিত্বের উৎসেদ, তাহার রসভাবাদির আরোপণ, কোন মতে প্রশস্তকল্প মনে হয় না। যদ্যপি তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত আমাদিগের আলাপ নাই, তত্রাপি আমরা তাঁহার গুণগরিমা শ্রবণে গদ্‌গদচিত্ত আছি; যাহাতে তাঁহার মনোবেদনা হইতে পারে এমত বাক্য আমরা কখনও মুখে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু তিনি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিবেন; আমরা কালিদাসে অন্যের ভাব আরোপিত হইলে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়া থাকি। পরন্তু কেবল আমাদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আমরা একথা লিখিতেছি না। অনুবাদকদিগের এই নিয়ম আছে যে তাঁহারা আপন আপন আদর্শের ভাব-রক্ষার্থে সম্যক্ প্রয়াস পাইয়া থাকেন, যেহেতু অনুবাদের প্রধান অভিপ্রায় এই যে কোন অপরিজ্ঞাত ভাষার উত্তম রচনা প্রচলিত ভাষায় বিদিত করা; যাহাতে সাধারণে পরকীয় ভাষা না শিখিয়া অনায়াসে বিদেশীয় বা প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও কবিদিগের রচনার অবিকল রসাস্বাদন করিতে পারেন। এই নিয়মের অন্যথায় কোন আধুনিক গীতি-রচয়িতার সামান্য গাথা কালিদাসের নামে প্রচলিত করা সাধারণের প্রতি বিড়ম্বনা ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। দুই একটা কথার অন্যথা করা কোন ভাষার ব্যবহারানুরোধে হইতে পারে; কিন্তু এক একটি গীত সন্নিবেশিত করা, কেবল “যথেচ্ছাচারিতাই” বোধ হয়। —পণ্ডিতদিগের এমত রীতি আছে যে কোন প্রাচীন রচনায় সামান্য ব্যাকরণ-দোষ থাকিলেও তাহার পরিশুদ্ধি করেন না, যেহেতু তাহাতে প্রাচীনের রচনায় হস্তারোপ করা হয়; বর্ত্তমান ব্যাপারে একের বস্তু অন্যের নামে প্রচলিত করা হইয়াছে। মঙ্গলাচরণে তাহা স্বীকার

পাইলেও দোষের লাঘব হয় না, যেহেতু গ্রন্থের কোন অংশ কালিদাসের এবং কোন অংশই বা অন্যের তাহার কোন বিভেদ নাই।—এই দোষের নিমিত্ত আমরা আক্ষেপ করিলাম, যেহেতু এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ অতীব উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সর্বতোভাবে সমাদরণীয় বটে। শকুন্তলার কএকখানি অনুবাদ অধুনা বর্তমান আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দণ্ডক অনুবাদ এবং তর্করত্ন মহাশয়ের নাটকানুবাদ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

[বিবিধার্থ-সংগ্রহ, ১৭৭৬-৮৩ শক]

দীনবন্ধু মিত্র

(১) নবীন তপস্বিনী নাটক

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র জন-সমাজে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত নহেন, পরন্তু তিনি নূতন গ্রন্থকার নহেন। প্রবাদ আছে যে কএক বৎসর হইল তিনি একখানি নাটক রচনা করত কৃত্রিম নামে প্রচার করেন। উক্ত নাটক সর্বত্র বিস্তার-রূপে পঠিত হইয়াছিল; এবং রচনা-চাতুর্যে তাহা একখানি প্রশংসনীয় গ্রন্থ বলিয়া মান্য আছে; তত্তুলনায় বর্তমান গ্রন্থ কনিষ্ঠ মানিতে হইবে। পরন্তু ভাষা-পারিপাট্যে ইহার সহিত পূর্বেক্ষিত নাটকের সম্যক্ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই প্রচলিত কথিত ভাষার আদর্শে পরিপূর্ণ; এবং তাহাতে উপধানুরোধজাত বৈলক্ষণ্য অল্প দেখা যায়। সম্প্রতি যে সকল নাটক হইতেছে তাহার অনেকেতেই চলিত ভাষা আছে; কিন্তু নাটক লেখন-সময়ে লিখিত ও কথিত ভাষার ভেদ রক্ষা করা দুরূহ, এই প্রযুক্ত অনেকে যাথার্থ্য-জ্ঞান-বিরহে প্রকৃত ভাষার কাল্পনিক ব্যভিচার করিয়া আপন অভিমান প্রকাশ করেন। মিত্রজার গ্রন্থে ঐ দূষণীয় লক্ষণ বিরল-প্রচার। কোন কোন স্থানে উৎকট সংস্কৃত ও ইতর বঙ্গীয় শব্দ একত্রে সংহৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহার সংখ্যা অধিক নহে।

নাটকের আখ্যায়িকা-ভাগ তাদৃশ আশ্চর্য বোধ হয় না। রত্নাবলী প্রভৃতি প্রচলিত নাটক-সকলে যে প্রকার স্ত্রৈণ, অল্পবুদ্ধি রাজা, উদরম্ভরি বিদূষক, দুঃখে নিমগ্ন নায়িকা প্রভৃতি ব্যক্তির নায়কত্ব হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ সকল লক্ষণ দেখা যায়। আখ্যায়িকার সারভাগ সংগ্রহ করিতে আমাদিগের বাল্যকাল মনে উদিত হইল; তৎসময়ে গল্পানুরাগপ্রযুক্ত আমরা প্রত্যহ পিতামহী-সম্পর্কীয় এক প্রৌঢ়া কুটুম্বিনীর নিকট "রূপকথা" শ্রবণ করিতাম। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট সপত্নী ছিল; সেই অনুরোধেই হউক অথবা কল্পনাশক্তির অপ্রাচুর্যেই হউক, তিনি সর্বদাই গল্পারম্ভে কহিতেন "এক রাজার সো, দো, দুই মাগ; ছোট সো মাগকে রাজা বড় ভাল বাসিতেন, দো

মাগকে দেখতে পাত্তেন না।" নবীন তপস্বিনীর গল্প অবিকল তাদৃশ, তাহাতে কথিত আছে, রমণীমোহন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার দো, সো, দুই স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা দো স্ত্রীকে রাজা দেখিতে পারিতেন না, ও কনিষ্ঠা সোর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহার মাতা ঐ জ্যেষ্ঠার দ্বেষ করিতেন, সুতরাং কদাপি জ্যেষ্ঠার প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ হইলে মাতা ও কনিষ্ঠা স্ত্রীর ভয়ে তাহা সংগোপন করিতেন। পরন্তু স্ত্রৈণস্বভাববশতই হউক বা জ্যেষ্ঠার অনন্যপতিভক্তির ক্রমেই বা হউক, তিনি মধ্যে মধ্যে গোপনে তাহার সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু পরে সে গর্ভবতী হইলে মাতাও সো স্ত্রীর ভয়ে তাহার অসতীত্বাপবাদ দেন। ঐ সাধ্বী স্ত্রী অপবাদ অসহ্যজ্ঞানে মহাপ্রস্থানে প্রাণত্যাগ করিতে চেষ্টিতা হন, কিন্তু গর্ভস্থ শিশুর মায়ায় আত্মহত্যায় অশক্তা হইয়া তপস্বিনী-বেশে বনে সপ্তদশ বৎসর যাপন করেন। তৎপরে মাতা ও সো স্ত্রীর লোকান্তর হইলে রাজার পুনর্বিবাহের আয়োজন ও তাঁহার সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়। পরন্তু সভাপণ্ডিত প্রস্তাবিত বিবাহে আপন সহধর্মিণীর অনুমতি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কারণ ঐ স্ত্রী আপন কন্যাটিকে এক অল্পবয়স্ক সুকুমার তপস্বীকে প্রদান করিতে মানস করেন। বিদ্যাভূষণ স্পষ্টত গেহিনীকে নিবারণ করিতে অশক্ত হইয়া রাজমন্ত্রির সহিত পরামর্শ করত ঐ তপস্বীকে কন্যাহরণ অপবাদে রাজসভায় বন্ধনাবস্থায় আনয়ন করেন ; এবং ঐ প্রসংগে তপস্বীর মাতা রাজসভায় আসিলে প্রকাশ হইল যে ঐ তাপস রাজপুত্র এবং তাহার মাতা রাজার জ্যেষ্ঠা পত্নী।

গ্রন্থের প্রধান নায়িকা কামিনী। সে এক দিবস দৈবে কোন সরোবর-সন্নিকটে পুষ্প চয়ন করিতে গিয়া উচ্চশাখাস্থ একটি গোলাপ লইবার জন্য ক্লেশ করিতেছিল ; তদ্দৃষ্টে তপস্বী-বেশধারী রাজপুত্র সেই পুষ্পটি আপনি পাড়িয়া তাহাকে দিতে আইসেন ; কিন্তু লজ্জাশীলা কামিনী অপরিচিত ব্যক্তির হস্ত হইতে পুষ্প না লইয়া মাতৃনিকটে প্রত্যাবর্তন করেন। এই কামিনীর মাতা সরমা তাপস বালকের রূপলাবণ্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাহার মাতার বিবরণ শ্রবণাভিপ্রায়ে

তাহাকে পরদিবস আপন বাটীতে আসিতে আমন্ত্রণ করিলেন। যে গর্ভাঙ্কে এই ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে বাংগালী স্ত্রীদিগের লক্ষণ অবিকল রক্ষা পাইয়াছে। কামিনীর সত্রপতা, সরমার নিষ্কপট দয়াশীলতা, মালতী এবং মল্লিকার নিষ্প্রয়োজন পিপৃচ্ছিষা ও স্বাভাবিক কৌতূহল স্বভাবসিদ্ধ ও পরিপাটি মানিতে হইবে। যে স্থানে সরমা কামিনীকে তপস্বীর ফুল নিতে অনুমতি করাতে সে কহে, "আমি দুটি আপনি তুলে এনেচি," তাহা লজ্জাশীলার অতি উপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তৎপরদিবস কামিনীর তপস্বিনীর বেশ ধারণ করিয়া আপন পিতার উদ্যানে ভ্রমণ করা কোন মতে সে লজ্জার পোষক নহে। একবার মাত্র দেখিয়াই কাহারও প্রতি সৎপ্রেমে মুগ্ধ হওয়া অসাধ্য নহে, এবং ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা তাহার প্রতি নির্ভর করিয়া উষা, দময়ন্তী, বিদ্যা প্রভৃতি নায়িকার একান্তানুরাগ বর্ণন করিয়াছেন; তত্রাপি পঞ্চদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা লজ্জাশীলা ভদ্র গৃহস্থবালার পক্ষে তাহা কমনীয় বোধ হয় না। যদ্যপি কিয়ৎকালাবধি তাপসকে ভিক্ষা করিতে কি প্রতিবাসিত্বে দেখিয়া কামিনীর তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইত, তাহা হইলে অধিক স্বভাবসিদ্ধ ও সম্ভবপর হইত। অপর তাহা না হইলেও কামিনীর পক্ষে তাপসের হস্তে প্রথম দিন ফুল না লইয়া পরদিবস একেবারে "প্রাণবল্লভ—হে তাপস! আমি আপনার জননী দেখিবার জন্য ব্যাকুল হএচি। আমি আপনার বাম পাশে দাঁড়ায়ে তাঁকে মা বলে ডাকি, আমার বড় ইচ্ছে। প্রাণনাথ, তোমার নিকট জননী তাঁর দুঃখের কথা বলেন না; তুমি পুরুষ তা শুন্‌তেও ব্যগ্র হও না; আমি তার মনের কথা বার করে নিতে পারবো" ইত্যাদি কথা কোনমতে সংলগ্ন বা অবিবাহিতা, অল্পবয়স্কা, লজ্জাশীলা বাংলা গৃহস্থ কন্যার উপযুক্ত হয় নাই। বিবাহের কল্পনামধ্যে প্রথম দিবস গোলাপফুল লইবার সময় মল্লিকা একবার কহিয়াছিল—

"হর পূজে বর মিল্লো ভাল,
এতদিনের পর বুঝি তপস্বিনী হতে হলো।"

ইহাতে কামিনী কি প্রকারে তাপসকে প্রাণবল্লভ স্থির করিয়া তাহার

সহিত গাঢ় প্রেম-সম্ভাষণ ও অঙ্গুরী-পরিবর্তন করেন আমরা স্থির করিতে পারিলাম না, কারণ আমাদিগের বিশ্বাস আছে, যে অল্প বয়সে আদিরসের আলোচনা না করিলে ভদ্রগৃহে পঞ্চদশ বৎসর-বয়স্কা অবিবাহিতা অঙ্গনারা কদাপি একেবারে এতাদৃশ নিস্ত্রপ হইতে পারেন না। তৎপরে কামিনীর পাঠশালা ভিন্ন কিছুই উত্তম মনে হয় নাই; পাঠশালায়ও তিনি সুনীতি-শিক্ষার উপদেষ্টা হইতে পারেন নাই। তাঁহার তৃতীয় ছাত্রী বয়ঃক্রম পাঁচ বা ছয় বৎসরের অধিক হইবে না। সে "একটি কবিতা বল" এই প্রশ্নোত্তরে কহে—

"চিনে দিও মন, চিনে দিও মন, পুরুষে চিনে দিও মন,
আগেতে আমার, আমার, শেষে অযতন।"

তাঁহার চতুর্থাটি ঐ প্রকার বয়সে কহে—

"নবীন যৌবনে গভীর যাতনা সই।
গাছে তুলে দিয়ে বঁধু কেড়ে নিলে মই।"

কামিনীর নিজ মুখেও এই কবিতাদ্বয় নিন্দনীয় হইত, কারণ, অবিবাহিত অল্পবয়স্কার এ ভাব জানা কর্তব্য নহে।

প্রস্তাবিত নাটকের প্রধান নায়ক বিজয়; কিন্তু তাঁহার চরিত্র অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে তিনি মাতার আজ্ঞাবর্তী ও অমিত্রাক্ষর-পদ্য-রচনে অক্ষম ভিন্ন অন্য কিছুই উপলব্ধ হয় না। কামিনীর প্রতি তাঁহার প্রেম, তাঁহার প্রতি কামিনীর প্রেমাপেক্ষা লাঘব বোধ হয়।

অপর নায়কদিগের মধ্যে রাজা ও বিদূষক অপদার্থ, যেহেতু তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য কিছুই নাই। রত্নাবলী নাটিকার রাজা ও বিদূষক অবিকল অনুকল্পিত হইয়াছে, এবং অনুকল্পনায় যে প্রকার আদর্শের প্রত্যবায় দেখা যায় এ স্থলেও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। সহকারী মন্ত্রী বিনায়ককে নিদর্শন করা ভার। অর্থমুগ্ধ সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণ স্বজাতীয় ব্যবসায়ীর আদর্শ বটে। পরন্ত তৎভাবতে গ্রন্থকার আপনার কোন বিশেষ কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন

নাই। পুরুষমধ্যে তাঁহার জলধরের চরিত্র প্রকৃত হইয়াছে। অল্পবুদ্ধি "হাঁদালা-পেটা" লম্পটের গ্রন্থকার উত্তম বর্ণন করিয়াছেন। ঐ বর্ণন আদ্যোপান্ত কৌতুকাবহ এবং তাহার পাঠে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। তাহার সহিত জগদম্বা, মল্লিকা ও মালতী এই তিনের বর্ণন একত্র করিলে গ্রন্থকারের প্রকৃত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়, এবং সেই ক্ষমতাদ্বারা তিনি অবশ্য আদরণীয় হইবেন। তাঁহার ঐ বর্ণন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, এবং তিনি তাহা পৃথক্ করিয়া একটি প্রহসন করিলে অমিশ্রিত প্রশংসার ভাজন হইতেন। তাহা না করিয়া আখ্যানের প্রাগল্‌ভ্যের নিমিত্ত গ্রন্থের স্থলে স্থলে বৃথা বাক্যাড়ম্বর করিয়া রসের হানি করিয়াছেন, হোঁদলকুঁৎকুঁতের শাবক আনিবার পত্র দুইবার পঠিত হইয়াছে, পাঁচটি বালিকাকে একই প্রশ্ন পাঁচবার করা হইয়াছে। তিনজনা ঘটক নিষ্প্রয়োজনে পৃথিবীর কন্যার তালিকা করিয়াছে। তপস্বিনীর দীর্ঘ পত্র অভিনয়ে অবশ্য শ্রান্তিজনক বোধ হইবে। রাজা ও তপস্বিনীর মিলনের পর যে স্থলে "বিজয়—কামিনীর জয় হউক" বলা হইয়াছে তাহাই গ্রন্থের প্রকৃত শেষ; তৎপরে তিন পৃষ্ঠা নিরর্থক বৃথা ব্যঙ্গে পূর্ণ হইয়াছে। শ্যামাকে লইয়া গ্রন্থকার কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া বেচারীকে অনর্থক মাধবের ঘাড়ে ফেলিয়াছেন। সে দুইবার "সরভাজা মতিচুর" বলিয়া রমণী পাইবার যোগ্য নহে; আর যোগ্য হইলেও গতযৌবনা প্রাচীনা দাসীর বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ দিবার প্রয়োজন বা কৌতুক কিছুই নাই। অধিকন্তু যে স্থলে রাজমহিষী রাজাকে উপরোধ করিয়া কহিলেন, "প্রাণেশ্বর, শ্যামার ধার কিছুতেই পরিশোধ হইবে না," তথায় রাজা তাহার পুরস্কার না করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের উপহাস করিয়া টাল দেওয়া কোন মতে ভদ্র নহে। পরন্তু এ সকল ত্রুটী অবশ্য সামান্য বলিতে হইবেক, এবং তদর্থে গ্রন্থকারের প্রকৃত প্রশংসার ব্যাঘাত হইবেক না।

[রহস্যসন্দর্ভ, সংবৎ ১৯২০]

(২) "বিয়েপাগলা বুড়ো" প্রহসন

আশু মনে হইতে পারে যে কেবল রহস্য-ব্যঞ্জক রচনা তাদৃশ উৎকট আয়াসের সাপেক্ষ নহে, কয়েকটা হাস্যজনক কথা একত্র করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বস্তুত সে জ্ঞান প্রকৃত সিদ্ধ নহে। ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার প্রকৃত কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা—শক্তি, ও রসবোধ, ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিতা না থাকিলে সেইরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুষ্কর। ফলে যে প্রকারে দেবদূত চিত্র করিতে যে ক্ষমতার আবশ্যক, গর্দভ চিত্র করিতেও সেই ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, গর্দভ সামান্য বস্তু বলিয়া চিত্রকরের ক্ষমতার স্বল্পতায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ যে ক্ষমতায় উৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রস্তুত হয় তাহাই খণ্ডকাব্যে প্রয়োজনীয় হয়। মহাকাব্যকার কালিদাসই সর্বোৎকৃষ্ট "মেঘদূত" প্রস্তুত করেন; অন্যে কেহই তাহার তুল্য খণ্ডকাব্য রচনা করিতে পারেন নাই; ও খণ্ডকাব্য লঘু বলিয়া অল্প ক্ষমতায় কাহার অভিপ্রেত সিদ্ধ হয় নাই। পরন্তু মনুষ্যেন্দ্রিয়ে এক বিশেষ ধর্ম আছে, তদনুরোধে সামান্য বস্তুতে বৃহৎ দোষাপেক্ষা মহৎ বস্তুতে কিঞ্চিৎ দোষই গুরু বোধ হয়। পূর্ণিমার শশীতে কলঙ্ক যে প্রকার অপ্রীতিকর হয়, অমাবস্যায় বা দীপালোকে ভাজনা খোলার অধোদেশও তাদৃশ মনোবেদনাদায়ক বোধ হয় না; সেই হেতুকই ঈষৎ আঁকা পায়স অপেক্ষা হাকুচ নিমঝোল অনায়াসে ভক্ষণ করা যায়। সংগীত—বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ সামান্য ব্যক্তির মুখে মালিনীর গীত, মধ্যমগুণসম্পন্ন কালোয়াতের ধ্রুপদ অপেক্ষা, সেই ধর্মহেতুকই অনেকের মনপ্রীতিকর হয়। কেহ কেহ কহিতে পারেন যে ধ্রুপদ বোধ না থাকাতেই ঐ ঘটনা ঘটে; পরন্তু তাহা প্রকৃত কারণ নহে, যে হেতু তাহা হইলে যাহার টপ্পায় কিছুমাত্র বোধ নাই তাহার মন টপ্পায় আকৃষ্ট হইবার উপায় থাকিত না। প্রস্তাবিত ধর্ম অপরাপর ইন্দ্রিয়ে যে প্রকার প্রবল, মনেও সেই রূপ বলবান, এবং তাহারই অনুরোধে অনেক সামান্য পদার্থ প্রচলিত হইয়া থাকে। প্রহসন পক্ষে মনের এই ধর্মটী স্পষ্ট প্রতীত হয়। যাঁহারা মধ্যম

মহাকাব্য একবার মাত্র স্পর্শ করিতে সম্মত নহেন, তাঁহারা অতি যৎসামান্য প্রহসনও অনায়াসে পাঠ করেন। পরন্তু প্রহসনের প্রচলন হইবার এইরূপ সুবীথি থাকিলেও বংগভাষায় অতি অল্প প্রহসন সভ্যমণ্ডলী মধ্যে গ্রাহ্য হইয়াছে, ও অনেকে তাহার রচনায় বিনিযুক্ত হইলেও সুগ্রাহ্য প্রহসন প্রায় দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তৎসমুদায়ই অসৎ ও অকথ্য বলিয়া ভদ্রের স্পর্শ করিতে রুচি জন্মে না। বিশেষত অনেকের একটা ভ্রম আছে যে অশ্লীলতা হাস্যের প্রণোদক; এবং সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া প্রায় প্রহসনমাত্রেই অশ্লীলতা প্রচুররূপে নিবিষ্ট করেন। তন্নিমিত্তই প্রহসন নাম শ্রবণমাত্রে অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে মিত্রবাবু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তেঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা একবার মাত্রও করেন নাই; অথচ তাঁহার রচনা বিশিষ্ট হাস্যদ্যোতক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

[রহস্য-সন্দর্ভ, সংবৎ ১৯২২]

নীলদর্পণ নাটক

কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণ হৃদয়ে প্রজাবর্গের সর্বস্বাপহরণ করেন; কিরূপে প্রজার চতুর্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসন লীলাছলে কর্ষিত হয়; কিরূপে পিতামাতার একমাত্র আশাস্বরূপ, পতিপ্রাণা কামিনীর সংসার-উদ্যানের অনুত্তম সুবর্ণপুষ্পস্বরূপ, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ কত নবীন যুবক নীলকরের বিষম নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সুস্থ হইয়াছে; কি প্রকারে কত অচতুরা গৃহস্থবালা নীলকর হস্তে সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; কি প্রকারে নীলকরগণ অম্লান বদনে আবালবৃদ্ধবনিতা-পরিপূর্ণ গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকেন; নীলকরদিগের কর্মচারীরা কেমন ভদ্রলোক ও নীল কৃষিকার্যে বঙ্গদেশে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে; সর্বসাধারণকে তাহা সম্যক্‌রূপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য। নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাস-লেখকদিগের প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। যতদিন পৃথিবী-মণ্ডলে বঙ্গভাষা পঠিত ও কথিত হইবে, ততকাল নীলদর্পণ সসম্মানে পরিগৃহীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই নাটক পঞ্চ অঙ্কে ও সপ্তদশ গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। নীলকরের ভয়ানক অত্যাচারে কি প্রকারে বিন্দুমাধব বসুর পিতামাতা ও ভ্রাতা ও প্রিয় বনিতা অসময়ে ধরাশয্যা গ্রহণ করেন, তাহাই করুণ-রস সাহায্যে শোকে শেষ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রথম অঙ্কে নীল-বপন অমতে হিসাব চুকাইবার নিমিত্ত গোলকচন্দ্র বসু নিজ প্রিয় পুত্র নবীনমাধবকে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার অপেক্ষায় গোলাঘরের রোয়াকে বসিয়া নবীনমাধবের অপেক্ষায় রহিয়াছেন এমত সময়ে নবীনমাধব আসিয়া কহিলেন।

নবীন। আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম ত তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি

বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দেও, পরে একবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাবে।

গোলক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলে অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না, অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম সাহেব আমাদের লোকজন লাঙ্গল গরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন কেবল আমাদিগের সংবৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন "তোমরা ত যবনের খাও না?"

সাধু। যারা পেট-ভাতার চাকরি করে তাহারাও আমাদের অপেক্ষা সুখী।

গোলক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়েছি, তবুও নীল করা ঘোচে না। নাচার হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ ত সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাযে কাযেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেইরূপ করিব; কিন্তু আমার মানস একবার মোকর্দমা করা।

ইহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে লাঙ্গল লইয়া রাইচরণ প্রজার প্রবেশ। নীলকরের আমীন কি প্রকারে নিরীহ প্রজারে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে করিতে কুঠিতে লইয়া যায়; নীলকরদিগকে জমীদারী পত্তন দিলে প্রজাবর্গ কেমন সন্তুষ্ট হয় এই গর্ভাঙ্কের নিম্নলিখিত পংক্তি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন।

সাধু। আম্মিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলে' নীলের গাদন বল্যে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পালিয়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এত রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো।

ইহার তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কৃতান্তের কর্মালয়স্বরূপ বেগুনবেড়ের কুঠী। কি প্রকারে নীলকর সাহেবেরা প্রজার সর্বনাশের উপায় উদ্ভাবন করেন,

নীলকর কর্মচারীরা কেমন ভদ্রলোক, কিরূপে প্রজাবর্গের প্রতি শ্যামচাঁদ ব্যবহৃত হয়, এই গর্ভাঙ্ক তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

"বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যম আর রক্ষে নাই।

ইহার প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক যেমন চমৎকার তেমনি স্বভাবসিদ্ধ। ইহার প্রথম কিয়দংশে পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থবালাদিগের গৃহকথা-প্রসঙ্গে নীলকরদিগের অপার চরিত্র বিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

রেবতী। মা ঠাকরুণ আর ত এখানে কেউ নাই, মুই ত বড় আপদে পড়েছি; পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েছিলো।

সাবি। রাম্ রাম্ রাম্!—ও নচ্ছার বিটিকেও কেউ বাড়ী আস্তে দেয়, বিটির আর বাকী আছে কি, নাম লেখালেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই করবো কি, মোর ত আর ঘেরা বাড়ী নয়, মরদেরা খ্যাতে খামারে গ্যালি বাড়ী বল্লিই বা কি, আর হাট বল্লিই বা কি,—গস্তানী বিটী বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্‌চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েছে, আর তার সঙ্গে একবার কুটীর কামরাঙ্গার ঘরে যাতে বলেচে।

আদুরী! থু! থু! থু! গোন্দো! প্যাজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতে পারি? গোন্দো! থু! থু! প্যাজির গোন্দো! মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতে পারি, প্যাজির গোন্দো সইতে পারি নে—থু! থু! প্যাজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম ক'রে দেবে,—পোড়া কপাল টাকার। ধর্ম কি ব্যাচবার জিনিষ, না এর দাম আছে? কি বল্‌বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নলি মেয়ে-নাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক্ হয়েচে, কাল থেকে ঝম্‌কে ঝম্‌কে উঠ্‌চে।

আদুরী। মা গো, যে দাড়ী! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে

ফ্যাবা মারে। দাড়ী পাঁজ না ছাড়্লি মুই তো কখনই যাতি পার্‌বো না। থু! থু! থু! থু! গোন্দো। প্যাজির গোন্দো!

রেবতী। মা, সর্ব্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গে না পেটিয়ে দিসে, তবে নেটেলা দিয়ে ধ'রে লিয়ে যাতে পারে?

সাবিত্রী। মগের মুল্লুক আর কি! ইংরাজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে?

রেবতী। মা, চাষার ঘরে সব পারে। মেয়েলোক ধরে, মরদ্দের কয়েদ করে, নীলদাদনে এ কত্তি পারে, নোজরে ধল্লিও কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চাই নি ব'লে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গিয়েলো।

সাবিত্রী। কি অয়াজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না মা, সে অ্যাকিই লীলের ঘায় পাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখবে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুড়ুল মেরে বস্‌বে।

সাবিত্রী। আচ্ছা, কর্ত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বল্‌বো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নাই। কি সর্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে, সাহেবেরা বড় সুবিচার করে। তা এরা কি সাহেব, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল!

ইহার দ্বিতীয় অঙ্কের গর্ভাঙ্কে বেগুনবেড়ের কুটির গুদাম ঘরে ৫ জন প্রজা কারাবাস ভোগ করিতেছে। তাহাদিগের পরস্পরের হৃদয়ভেদী কথোপকথন শ্রবণ করিলে পাষাণও আর্দ্র হয়, মনোদুঃখে মরুভূমিও সরস হইয়া ওঠে। নীলকর সাহেবেরা কিরূপে প্রজাবর্গকে কারারুদ্ধ করিয়া তদধীনস্থ সমস্ত কুঠীতে প্রেরণ করেন, এই গর্ভাঙ্কে তাহা অবিকল বিন্যস্ত হইয়াছে। যথা,

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমাদিগের সর্বনাশের জন্যই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কানসারণের আর কত কুঠি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ২৪ কুঠির জল খেলাম, এখন কোন্ কুঠিতে আছি তাও ত জানিতে পারিলাম না,

জানবই বা কেমন করে রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে লইয়া যায়, উঃ মাগো তুমি কোথায়)

এ পদগুলিও বিলক্ষণ স্বরূপ বর্ণন।

বেরালচোকো হাঁদা হেম্‌দো।
নীলকুঠির নীল মেম্‌দো॥
জাতি মাল্লে পাদরি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে॥

ইহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পতিপ্রাণা সরলা প্রাণপতি—প্রেরিত পত্র পাঠ করত মনোদুঃখ প্রকাশ করিতেছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কুট্টিনী ময়রাণীর প্রবেশ। ময়রাণী যদিও সাহেবের আদিষ্ট কার্য সম্পাদন করত কিছু কিছু পাইয়া থাকে কিন্তু তাহা তাহার মনোগত নহে। ময়রাণী সাহেবের নিমিত্ত যে কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহা গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারো অবিদিত নাই, এমন কি বালকদিগের দৌরাত্ম্যে ময়রাণীর রাজপথে বাহির হওয়া ভার। যথা,

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই।

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ওকথা বল্‌তে নাই। ৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই॥

নবীনমাধবের প্রবেশ।

পদী। ওমা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম!

(ঘোমটা দিয়া পদীর প্রস্থান)

নবীন। দুরাচারিণি, পাপীয়সি (শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে।

নীলদর্পণ নাটকের তৃতীয়াঙ্কে নীলকর উড সাহেব ও তাঁহার দেওয়ান গোপীনাথ উভয়ে নীল—সংক্রান্ত বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন। ইহার দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গ্রন্থকার পতিপ্রাণা স্ত্রীর প্রকৃতি

চিত্রিত করিয়াছেন। স্বামী নবীনমাধব নীলকরদিগের সহিত বিধি-বিচারে বিগতসর্বস্ব হইয়াছেন। হস্তে এমন কিছুই নাই যে, বিচার-ব্যয় নির্বাহ করেন, কিন্তু এই সময়ে বিচারব্যয় নির্বাহ নিমিত্তে তাঁহার সহধর্মিণী নিজ অলঙ্কারসকল খুলিয়া দিতেছেন। এই অঙ্কের ভাব অতীব রমণীয়। যথা,

নবীন। প্রণয়িনি! তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকুলে দুটি নাই! আহা আমার এমন সংসার এমন হইল! আমি কি ছিলাম কি হলাম! আমার ৭ শত টাকার মুনফার গাঁতি, আমার ১৫ খোলা ধান, ১৬ বিঘা বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাহিনদার, পূজার সময় কি সমারোহ, লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালিকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় কত শত টাকা দান করিয়াছি; আহা! এমন ঐশ্বর্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী—ভাদ্র-বধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ (আক্ষেপ)।

সৈরি। প্রাণনাথ! তোমারে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে (সজল নেত্রে) আমার কপালে এত যাতনাও ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখ্‌তে হলো। আর বাধা দিও না।

(তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি! চুপ কর, (হস্তে ধরিয়া) রাখ ঘরে একদিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ! উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে গহনা হবে।

ইহার তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেব কিরূপে পদী ময়রাণীর সাহায্যে অচতুরা গৃহস্থবালা ক্ষেত্রমণির সতীত্ব—নাশে উদ্যত হন, কিরূপে নবীনমাধব ও তোরাপের সাহায্যে ক্ষেত্রমণি সাহেবের করাল গ্রাস

হইতে মুক্ত হয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। নীলদর্পণের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বসুকুলগৃহিনী সাবিত্রীর বিলাপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহার চতুর্থ অঙ্ক অতীব চমৎকার। প্রথম গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারীর মাজিষ্ট্রেট কিরূপে নীলকর সাহেবদিগের বশতাপন্ন হইয়া হতভাগ্য প্রজানিকরের সর্বস্বান্ত করেন, গ্রন্থকার তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ যোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্ক বিলক্ষণ করুণারস—পরিপূর্ণ। এই গর্ভাঙ্কদ্বয়ে নির্দোষী গোলকচন্দ্র বসুর কারাবাস ও তাঁহার আত্মহত্যার বিষয় পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও আর্দ্র হয়। পঞ্চমাঙ্কে এই নাটকের উপসংহার হইয়াছে। এই অঙ্কটি চারিটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। ইহার আনুপূর্বিক সমুদায় ভাগে করুণা রস প্রবাহিত; এমন কি এক এক স্থান প্রণয়ন—সময়ে লেখকের লেখনী অশ্রুনীরে অভিষিক্তা হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর অনতিপরই নীলকরের সহিত বিবাদ করিয়া নবীনমাধব নিজে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বসুগৃহিনী প্রিয়পতি পুত্র বিনাশ শ্রবণে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং পুত্রবধূরে বিনাশ করিলেন। এই ঘটনা বিলক্ষণ বিস্ময়াকর্ষ। এক সময়ে যে গৃহস্থের কিছুরই অভাব ছিল না, ক্ষেত্রভূমিসমূহ, ধান্যস্তূপ, হল, কৃষাণ ও বলদ উদ্যান,—সংলগ্ন বসতবাটী পুত্র-কন্যা-পরিজনে পরিপূর্ণ ছিল, নীলের কি ভয়ানক অত্যাচার! শুদ্ধ নীলবপনানুরোধে ঐ সুখসংসার শ্রীভ্রষ্ট ও শ্মশানতুল্য হইয়া উঠিল। নীলদর্পণ-গ্রন্থকারকে প্রস্তাবটী অমূলক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হয় নাই। প্রকৃতির সহকারে প্রতিনিয়তই বঙ্গদেশের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগ্রামে এবংপ্রকার ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যহই অভিনীত হইতেছে। অনুরূপকেরা সুসভ্য ইংলিশ সমাজের উদাহরণ স্বরূপ। বিধিবদ্ধ রাজনিয়ম তাঁহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত। নৃশংস রাক্ষসগণ দ্বারা যে কার্য সম্পাদিত হওয়া দুরূহ, বিজ্ঞান-বিহীন পশুচক্ষেও যাহা ঘৃণাবহ বিবেচিত হয়, এই সভ্য রাজেরা অনায়াসে সরল হৃদয়ে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গ নীলদর্পণ নাটকের উপসংহারে বিন্দুমাধবের বিলাপ-বাক্যে বিলক্ষণ বিদিত হইতে পারিবেন।

বিন্দু।—বিপিন আমার বিপদ্‌সাগরে ধ্রুব নক্ষত্র।—(দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীমণ্ডলে মানবলীলা, প্রবল-প্রবাহ-সমাকুলা গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চকূলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব শোভা! লোচনানন্দপ্রদ নবীনদুর্বাদলাবৃত ক্ষেত্র; অভিনব-পল্লব-সুশোভিত মহীরুহ; কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান; কোথাও নবদূর্বাদললোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা, আহা! তথায় ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিততানে এবং প্রস্ফুটিত-বন-প্রসূন-সৌরভামোদিত মন্দ মন্দ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চির্ দর্শন; অচিরাৎ শোভাসহ কূলভগ্ন হইয়া গভীর-নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ। স্বরপুর-নিবাসী বসুকুল নীল-কীর্ত্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল! আহা! নীলের কি করাল কর!

নীলকর-বিষধর বিষপোরা মুখ
অনল-শিখায় ফেলে দিল যত সুখ;
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন,
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন;
পতি-পুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী;
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী;
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার,
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার।
শোকশূলে মাথা হলো বিষ-বিড়ম্বনা,
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা।
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি অনিবার,
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার।
জননি! জননি! ব'লে চারিদিকে চাই,
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই;
মা ব'লে ডাকিলে মাতা অমনি আসিয়ে,
বাছা ব'লে কাছে লন, মুখ মুছাইয়ে;
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা,

রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা।
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই ;
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটী নাই।
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার,
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার।
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়,
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়!
রূপবতী, গুণবতী, পতিপরায়ণা,
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না,
সহাস্যবদনে সতী, সুমধুর-স্বরে,
বেতাল করিত পাঠ মম করে ধ'রে,
অমৃত-পঠনে মন হতো বিমোহিত,
বিজন বিপিনে বন-বিহঙ্গ-সঙ্গীত।
সরলা সরোজ-কান্তি, কিবা মনোহর!
আলো করেছিল মম দেহ-সরোবর ;
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময় ;
হেরি সব শবময় শ্মশান-সংসার,
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।

আহা! এরা দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে করিতে কোথায় গমন করিল? তাহারা আসিলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়। আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন)

যবনিকা পতন।

[রহস্য-সন্দর্ভ, শক ১৭৮৩]

বুঝ্‌লে কি না

প্রহসনের দুই অভিপ্রায়; এক অভিনয়ে দর্শকের মনোরঞ্জন; দ্বিতীয়, পাপানুরাগ, দুষ্কৃতি, অসদ্ব্যবহার প্রভৃতি মন্দের তিরস্কারদ্বারা অপনোদন। এতদুভয়ের একীকরণ সম্যগ্‌রূপে সিদ্ধ হইলে, প্রহসন সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ হয়; তদভাবে তাহার অভীষ্টের কথঞ্চিৎ হানি থাকে। এমত হইতে পারে যে রহস্য-ব্যঞ্জক উপন্যাস-সহকারে প্রহসন রচনা করিলে অনেকের মনোরঞ্জন হইবে; পরন্তু তাহাতে প্রহসনের এক প্রধান উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা হয়। অপর সত্য বটে যে শিক্ষা, উপদেশ, তিরস্কার প্রভৃতি উপায়দ্বারা মন্দের দমন হইতে পারে, পরন্তু তাহা সর্বত্র সাধ্যও নহে; এবং তাদৃশ ফলবানও নহে। অনেক উচ্চপদস্থ গরীয়ান্ ধনবান আছেন যাহাদিগের পাপে ধরণী সর্বদা কম্পান্বিতা; তাঁহাদিগের নিকট শিক্ষা ও উপদেশ কদাপি অগ্রসর হইতে পারে না; এবং দেশে তাদৃশ লোক অল্প আছে যাহারা তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে পারে। অপর অনেকের নানা প্রকার অভ্যাস আছে যাহা পাপকর না হইলেও অশ্লীল, অসভ্য বা দূষনীয় মানিতে হয়। কেহ কেহ আছে যাহারা অকারণে অহরহঃ শিরশ্চালন করিয়া থাকে; কেহ বা মধ্যে মধ্যে স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধ সঞ্চালন করে; কেহ সমাজে বসিয়া পদ-কম্পন না করিয়া থাকিতে পারে না; কেহ প্রতি কথায় কহে "বটে বটে", কেহ সকল কথার মাত্রায় কহে "বুঝেচ" বা "বুঝ্‌লেত" বা "তাই বলি"; পাঠকবৃন্দের অনেকেই ঐরূপ অভ্যাসের উদাহরণ দেখিয়া থাকিবেন। উহা পাপজনকও নহে ও অশ্লীলও নহে; পরন্তু উহা সভ্য ব্যক্তিদিগের বিবেচনায় নিন্দনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ঐ সকল দোষের সমুচ্ছেদজন্য প্রহসন এক প্রধান উপায়। তাহার শর অকাট্য, এবং এমত স্থান নাই যাহা তাহাদ্বারা বিদ্ধ না হয়। অপর উহার এক আশ্চর্য ও অসাধারণ ক্ষমতা আছে। শাণিত অস্ত্রে লৌহ অপেক্ষায় কাষ্ঠ সত্বরে ছেদিত করে; দৃঢ়বস্তু অপর দৃঢ় অপেক্ষা মৃদু পদার্থ অনায়াসে ভেদ করে; বলবান মনুষ্য অন্য বলবান্

অপেক্ষা ক্ষীণ মনুষ্যকে সহজে পরাস্ত করিতে পারে; কিন্তু প্রহসন তাহার বিপরীতরূপে কার্য করে। তাহার শ্লেষরূপ শেল সামান্য ব্যক্তির উপর পতিত হইলে ব্যর্থ হয়, কিন্তু গরীয়ান্‌, ধনবান্‌, মান্য কি উচ্চপদস্থের উপর পড়িলে ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় অমোঘ হইয়া থাকে। মনে করুন—আর মনে করাই বা কি, সকলেই দেখিয়াছেন,—যে আপন আপন পল্লীতে কোন কোন ধনাঢ্য অত্যন্ত মদিরকা-প্রিয়, এবং তাহার ক্রমে প্রতি রাত্রিতে সে স্বয়ং অপারগ বলিয়া ভৃত্যের স্কন্ধ-সহকারে আপন শয্যায় নীত হয়। তাহাকে তিরস্কার করিবার লোক নাই, এবং সে উপদেশ দিলেই যে মদ্যত্যাগ করিবে ইহারও প্রত্যাশা নাই। এমন অবস্থায় দুষ্টের দমনের নিমিত্ত প্রহসন একমাত্র উপায়। প্রচ্ছন্ন বর্ণনে দেশের রাজার নামেও প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে, এবং সাধারণ সমীপে অভিনীত হইলে ঐ রাজার অপরাধ এরূপ স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, যে রাজাও ব্যথিত চিত্তে সে দোষের পুনরনুষ্ঠানে শঙ্কিত হন। নানা প্রকার সামাজিক দোষও এই উপায়ে সংশোধিত হইতে পারে। প্রহসনের এই উপকারই প্রধান; এবং তন্নিমিত্তই ইহার বিশেষ সমাদর হইয়া থাকে। পরন্তু স্মর্তব্য যে প্রহসনে প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কদাপি সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলে যে প্রহসন যত হাস্যদ্যোতক ও আমোদজনক হইবে সে ততই শাস্তা ও নীতি-প্রদর্শক হইবে। হাস্যদ্যোতনের ব্যাঘাত হইলে নীত্যুপদেশেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত হয়। এ বিষয়ে বরং প্রহসন নীতি-প্রদর্শক না হইয়া কেবল প্রমোদদ্যোতক অনায়াসে হইতে পারে, কিন্তু প্রমোদকর না হইয়া কেবল নীতি-প্রদর্শক কদাপি হইতে পারে না। প্রহসনের এই উভয় উদ্দেশ্যের পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ না রাখিলে প্রহসনের দোষগুণ কদাপি সমালোচিত হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে কোন ব্যক্তির গুপ্ত দোষ লইয়া আমোদ করায় ভদ্রতার ব্যাঘাত হয়। পরন্তু তাঁহাদের কর্তব্য যে প্রহসনের লক্ষ্য দোষ; সেই দোষই লোকে হাস্যরূপ অস্ত্রে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে; মনুষ্য তাহার উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং প্রহসনে কোন ব্যক্তির গুপ্ত কথা লইয়া আমোদ করা সিদ্ধ হয়

না। অপর একাধারে বহু দোষ সর্বদা একত্র থাকে না; আর একমাত্র দোষের উল্লেখে প্রহসন প্রাঞ্জল করা দুষ্কর হইয়া উঠে, এই হেতু বিভিন্ন আধারের বিভিন্ন দোষ একত্র করিয়া বর্ণন করার রীতি আছে। ফলে কবিমাত্রেই এই নিয়মের অনুগামী; এবং প্রায় সকলেই আপন আপন নায়ককে বিভিন্ন গুণ বা দোষের আধার করিয়া থাকেন। এই কৌশলের অবলম্বনে প্রহসনকারেরা অনেকে কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা কল্পনার সহকারে আপন আপন নায়কের সৃষ্টি করিয়াছেন—কোন বিশেষ ব্যক্তির আদর্শে তাহার চিত্র করেন নাই। পরন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে কথা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে সকল প্রহসন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহার নায়ক প্রায়ই জনসমাজ হইতে গৃহীত; কেবল গ্রন্থকারের চাতুর্যে বা অক্ষমতা-দোষে তাহার কোন কোন অঙ্গ প্রপঞ্চিত, অধিকীকৃত, পরিবর্ত্তিত বা খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। সাধারণের এরূপ জ্ঞান না থাকিলেও প্রহসনের দোষ-গুণ বিচার-সময়ে তাঁহারা যে নায়ককে আপন পরিচিত বা জ্ঞাত কোন ব্যক্তির সদৃশ বোধ করেন, তাহাই উত্তম হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন এবং যাহা জ্ঞাত ব্যক্তির সদৃশ বোধ করেন না তাহা খণ্ডিত বা অপ্রশংসনীয় বোধ করেন। এই ভাবের প্রত্যাহারে গ্রন্থকারেরা কহেন যে নায়ক স্বভাবসিদ্ধ হইলেই প্রশস্ত, তদন্যথায় বিকৃত হয়। প্রহসনের লক্ষণ, অভিধেয়, তাৎপর্য ও দোষগুণের চিহ্ন এতাবৎ বর্ণন করিয়া আমরা প্রস্তাবিত প্রহসনের সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

উক্ত প্রহসনে অটলকৃষ্ণ বসু নামা কোন ভক্ত-ধার্মিক, কিন্তু প্রকৃত লম্পট, মদ্যপায়ী, ধনপিপাসুর বর্ণন আছে। ঐ ব্যক্তি প্রতি কথার মাত্রার "বুঝ্‌লে কি না" এই বাক্য কহিয়া থাকে এবং তদুদ্দেশ্যেই নাটক খানির নামকরণ হইয়াছে। ঐ বালিশ অন্যে কিছুই বোঝে না এই ভাবিয়া সে সকলকে ঐ কথা বলে এমত নহে, কেবল আপন বাক্য সকল একত্রে সংলগ্ন করিতে পারে না বলিয়া মধ্যে মধ্যে এক ভণিতা বা বালিশ দিয়া সকলকে এক শয্যায় স্থাপিত করে। আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে কএকের ঐরূপ প্রতিকথার মাত্রায় এক একটি

বালিশ দিবার অভ্যাস আছে ; এবং পাঠকবৃন্দ অনেকেই আপন আপন পরিজ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে উহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। বর্তমান প্রহসনের ব্যঙ্গে তাহাদের ঐ কুৎসিত অভ্যাস পরিত্যক্ত হইলে গ্রন্থকারের আয়াস অনেক অংশে সফল হইয়াছে মানিতে হইবে।

কথিত হইয়াছে যে ঐ "বুঝ্‌লে-কি-না" ব্যাক্যানুরাগী ভাক্ত-ছিলেন ; তন্মধ্যে তাঁহার ভাক্তত্ব প্রতিপাদনার্থে গ্রন্থের প্রায় সমস্তই বিনিযুক্ত হইয়াছে ; এবং ধার্মিকতা প্রতিপন্ন করনার্থে তিনি অশিষ্ট-কর্মাদিগের "জাত মারেন" এই রূপ বর্ণন করা হইয়াছে। পরন্তু ধার্মিকমাত্রেরই উচিত যে অশিষ্টের দমন করেন, অতএব তাহা কেবল ভাক্তের লক্ষণ নহে ; গ্রন্থে তাহাই কল্পিত হইয়াছে, ইহা আমাদিগের মতে বিহিত হয় নাই। ধার্মিক হইতে ভাক্ত ধার্মিক স্বতন্ত্র, এবং তাহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। আমাদিগের বোধ আছে যে ভাক্তেরা ধামিক অপেক্ষা ধামিকতার ভাণ অধিক করিয়া থাকে, কেহ প্রতি কথায় "প্রভো তোমার ইচ্ছা" কহিয়া থাকে ; কেহ সময়ে সময়ে "ব্রজরাজ কিশোরের" নামোচ্চারণ করে, কেহ প্রকাশ করে যে ভগবানের সহিত তাহার কথোপকথন হয়, এবং তাহার প্রমাণার্থে অকস্মাৎ গৃহছাদপ্রতি অবলোকন করিয়া কহে "প্রভু কি আজ্ঞা?" এই প্রকার অলঙ্কার বর্তমান নায়কের উপলক্ষে প্রযুক্ত হইলে বোধ হয় বিহিত হইত। সে যাহা হউক, ঐ অটল আপন পল্লীতে ধার্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং অনেক অনাথা বৃদ্ধা প্রতিবাসিনী আপন আপন ধন-সম্পত্তি বিশ্বাসী বলিয়া তাহার নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিত। তন্মধ্যে হাবলের মাতা নাম্নী এক প্রৌঢ়া বিধবা কিঞ্চিৎ অর্থ ঐ অটলের নিকট গচ্ছিত করিয়াছিল। সে একদিন প্রত্যূষে কুমুদিনী নাম্নী এক নবীনা প্রতিবাসিনীর সহিত গঙ্গাস্নানে যাইতেছে, পথিমধ্যে সম্মুখে অটলের বাটী দেখিয়া আপন দুঃখের উল্লেখে কহিতেছে সে অটলের নিকট যে টাকা রাখিয়াছিল সে তাহার আর স্বীকার করে না, এবং ঐ টাকার প্রতিপ্রাপ্তির উপায় নিমিত্ত কুমুদিনীর স্বামী চেষ্টা না করিলে অন্য উপায় নাই। এই প্রস্তাব লইয়া প্রহসনের আরম্ভ হইয়াছে ;

এবং উহার বর্ণনও অতি পরিপাটীরূপে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। হাবলের মাতার কত টাকা আছে এই প্রশ্নের উত্তরে সে অশিক্ষিতা ভীতা স্ত্রীর প্রকৃত লক্ষনানুসারে কহে—"বৌ, আমার মাথা খাও, আর কারো কাছে বলো না, আমি অপ্লেয়ের কাছে এই-এই-এই বারো পোন আর দশদণ্ডা খানি রেখেছি; তা রাখ্‌লে কি হবে বৌ, ও অপ্লেয়ে কি তা আর উপুড় হাত কর্‌বে! হায়! হায়!"

এই কথোপকথন সময়ে অটলকৃষ্ণ চক্ষুমার্জন ও জৃম্ভণ করিতে করিতে আপন বাটীদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; তদ্দৃষ্টে উক্ত দুই রমণী পলায়ন করিল। ঐ সময়ে অটলের পুরোহিত ও সভাপণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার আসিয়া কুমুদিনীকে পাপপঙ্কে লিপ্ত করিবার মানসে সে কুমুদিনীর সহিত কি কথোপকথন করিয়াছিল তাহার বর্ণন ও তৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করে, তাহাতে অটলের দ্বিতীয় দোষ লাম্পট্যের প্রথম পরিচয় প্রদত্ত হয়। ধনাঢ্যদিগের খোসামুদে পারিষদ যেরূপ হইতে হয় তাহা বিদ্যালঙ্কারের চরিত্রে বিলক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তি গ্রন্থকারের প্রকৃত মানসপুত্রমাত্র সন্দেহ নাই, পরন্তু আমরা ইহার আদর্শ বোধ হয় নগরের প্রতি পল্লীতে প্রদর্শন করিতে পারি এবং ইহা গ্রন্থকারের প্রশংসা।

অটলের তৃতীয় দোষ অখাদ্যানুরাগ। তাহার পরিবর্ণনার্থে পিরু কোচমানের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ কথোপকথন হইয়াছে, তাহার মর্ম এই যে পিরু অটলবাবুর নিমিত্ত অশ্বশালায় তিন চারি জাতীয় মাংস ও খেচরান্ন পাক করিয়া রাখিয়াছে। এই ব্যাপারের পর কুমুদিনীর স্বামী দর্পনারায়ণ স্ত্রীর নিকট অটল ও বিদ্যালঙ্কারের কুমন্ত্রণার কথা শ্রবণ করত রাগে উন্মত্ত হইয়া অটলের শাসন-নিমিত্ত যষ্টি হস্তে রঙ্গ স্থলে উপনীত হয়। কিন্তু গৃহদ্বারে অটলকে দেখিবামাত্র তাহার সাহাগ্নি একেবারে নির্বিন্ন হইল, এবং সে প্রহারের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া চক্রান্তরে অটলকে শাস্তি দিবার কল্পনায় নিমগ্ন হইল। গেহিনীর ধর্ম নষ্ট করিবার কুমন্ত্রণাকারকদিগের দর্শনে কোন প্রকৃত পুরুষের পক্ষে কোপের আধিক্য হওয়াই সম্ভাবনা, পরন্তু বোধ হয় বাঙ্গালী বলিয়া

তাহার অন্যথায় কৌশলের অবলম্বন দর্পনারায়ণের পক্ষে বিশেষ অনুমোদনীয় হইয়াছে।

সে যাহা হউক, তাহার অভিপ্রেত সাধনের অবকাশ সেই সময়েই উপস্থিত হইল; সুখী মেতরানী আসিয়া অটলের সমুখে দণ্ডায়মানা, এবং অটল তাহাকে "পূজার কাপড়" দেবার অঙ্গীকারে, রাত্রি-যোগে অশ্বশালায় আসিতে বলিতেছেন। দর্পনারায়ণ ঐ সুখীর সহিত অটলের শাস্তি দিবার পরামর্শে গমন করিলেন। এদিকে বিদ্যালঙ্কার একজন উকিলের কেরানী মদনগোপালকে অটলের নিকট আনিয়া অটলের চতুর্থ দোষ নিষ্ঠুরতা ও ধনপিপাসুতার পরিচয় দিয়াছেন। যেহেতু ঐ সময়ে নীলাম্বর নামা এক পিতৃহীন যুবা আপন মাতুলের সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাহার সমন্বয় করিবার কথা স্থির হইয়াছিল। অটলকৃষ্ণ দলপতি; তিনিই সমন্বয়ের কর্তা; এবং অসৎ দলপতি যেরূপ হইতে হয় তাহার কোন ত্রুটী ছিল না। তিনি ৫০০ টাকা ঋণ দিয়া ১০০০ টাকার "সাফ কবলায়" নীলাম্বরের বসত-বাটীটী লেখাইয়া লইবেন এই মানস করিয়াছিলেন; এবং বিদ্যালংকার ও মদনগোপালের সাহায্যে সেই অভিপ্রায়টী সিদ্ধ করেন। এই প্রস্তাবটী সুচারু হইয়াছে। ইহাতে যে সকল ব্যক্তির প্রসঙ্গ আছে তাহা সর্বতোভাবে স্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ মদনগোপাল অবিকল হইয়াছে মানিতে হইবে। ফলে এ পর্যন্ত আমরা অক্ষুণ্ণচিত্তে গ্রন্থের প্রশংসা করিতে পারি; এবং দৃঢ় বিশ্বাস করি যে পাঠকবৃন্দ সকলেই আমাদিগের সহিত একমত হইবেন।

প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কারম্ভে পিরু কোচমান সন্ধ্যার পর অশ্বশালায় আদিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য এক খাটিয়ার উপর সাজাইবার অবকাশে তাহার কিঞ্চিৎ চাখিয়া অটলবাবুর নিমিত্ত সকল দ্রব্য মহাপ্রসাদ করিয়া রাখে। তদনন্তর দর্পনারায়ণ আসিয়া লুক্কায়িত থাকিবার অভিপ্রায়ে খাটিয়ার নিম্নে শয়ন করিল। ও তৎপশ্চাৎ বিদ্যালঙ্কার ও অটলবাবু ও পরে সুখী মেত্‌রানী আসিয়া তাহা সম্ভোগ করিতে লাগিল। এই

প্রক্রিয়াটীও বিলক্ষণ প্রমোদজনক, এবং অশ্বশালাস্থ বাবুর আনন্দ দেখিয়া অভিনয়-দর্শকেরা অবশ্য অবিরত হাস্য করিবেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু অটলবাবুর আনন্দে ত্বরায় বিঘ্ন ঘটিল। তিনি দুই বোতল মদ্য আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার এক বোতল পিরু কোচমান আপন সেবায় নিযুক্ত করে, অবশিষ্ট বোতলে বিদ্যালঙ্কারের দীর্ঘ তুন্দ তৃপ্ত হইল না; সুখীও "হামাকে আর একটু দেওনা বাবু" বলিতে লাগিল; অটল স্বয়ং টলটল হইয়াও আর কিঞ্চিতের লালসা করিতে লাগিলেন; বিশেষ সুখীর প্রার্থনা রক্ষা না করিলে নয়; অতএব তিনি পিরুর তত্ত্বে বহির্গত হইলেন। এই অবকাশে দর্পনারায়ণ খাটের নিম্ন হইতে নির্গত হইয়া বিদ্যালঙ্কারের বিলক্ষণ লাঞ্ছনা করিল; ও তাহার লাল বনাতে আবৃত হইয়া বসিল। পরে অটল প্রত্যাগমন করিলে পাড়ার লোক দ্বারা ধরা পড়িবার ভয় দেখাইয়া দর্পনারায়ণ তাহাকে উবু করিয়া বসাইয়া একটা ঘোড়ার কম্বল আচ্ছাদন করত পথ দিয়া ভালুক লইয়া যাইতেছি এই ও অপর কথা বলিয়া তাহাকে নানা প্রসঙ্গে খাটিয়ার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে লাগিল। এ ব্যাপারটী সম্ভবপরও নহে, সরসও নহে। অপর দীর্ঘকালব্যাপী বলিয়া অভিনয়ে সুসিদ্ধ ও অনুরাগ-সাধক হইবে এমতও বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গের পাঠে প্রথম হাস্য হইয়া তৎপরেই গ্লানি বোধ হয়। ইহাতে দর্প-নারায়ণ স্বয়ং বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি নানা ব্যক্তির স্বরের অনুকরণ করে, মধ্যে দুই চারি ব্যক্তির শব্দ একবারে এবং অটলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দূরস্থ ও নিকটস্থ ব্যক্তির বাক্য কহে; এই সকল ব্যাপারের অভিনয় করে এমত লোক কলিকাতায় নাই। সে যাহা হউক, দর্পনারায়ণ অবশেষে আপন প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া অটলের নিকট নীলাম্বরের কবালা ও হাবলের মাতার ১০০০ টাকা ফিরাইয়া লয়, সুখীকে দুই শত টাকা দেয়, এবং যুগলমূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত সুখী ও অটলকে খাটিয়ার উপর দাঁড় করাইয়া রহস্য সমাধা করে। ইহাও আমাদিগের বিবেচনায় প্রহসনের উপযুক্ত আমোদজনক হইয়াছে।

[রহস্য-সন্দর্ভ সংবৎ ১৯২৩]

শৈবলিনী

পূর্ণচন্দ্র বসু

চন্দ্রশেখর গ্রন্থাকাশের উজ্জ্বল তারা শৈবলিনী। এ তারাও গোপনে গোপনে এক চন্দ্রের (প্রতাপ) প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতেই এই চন্দ্রের প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ আকৃষ্ট হইয়া দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছিল। তাঁহারা একত্র ক্রীড়া করিতেন, মালা গাঁথিতেন, জলকেলি করিতেন, সর্বদাই একত্র থাকিতেন। তারার অন্ধ অনুরাগ ক্রমশঃই প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। চন্দ্র সকলই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু জানিয়াছিলেন, এ তারার সহিত তাঁহার পরিণয় হইবার যো নাই। যে সম্বন্ধে তাহারা পরস্পর মিলিত, সে সম্বন্ধই তাহাদিগের অন্তরায়। চন্দ্র এই জন্য সরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার মন কাঁদিতে লাগিল। প্রতি সন্ধ্যাকালে তারা গগন-দেশে নিয়মিত উদিত হইয়া চন্দ্রের জন্য সমস্ত গগনক্ষেত্রে সহস্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া বসিয়া থাকিতেন; চন্দ্র যখন রোহিণীর (রূপসীর) পার্শ্বে হাসিতে হাসিতে উদিত হইতেন, তারার সহস্র চক্ষু একে একে উন্মীলিত হইত। তবুও তারা দূর দেশ হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া উজ্জ্বল ও স্থির নয়নে চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া থাকিতেন। একদিন চন্দ্র একেবারে অদৃশ্য হইলেন, কয়েকদিন গগনক্ষেত্র মেঘময় হইয়া রহিল, তারার সহিত চন্দ্রের সাক্ষাৎ নাই। তারা ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। তারা গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ধ্যাবধি চন্দ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষ প্রহরে একদিন চন্দ্রের সহিত তারার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তারা পূর্বদিকে সরিয়া গিয়া চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তখন রূপসী মেঘের আড়ালে ছিল। চন্দ্রের কোল দিয়া তারা হঠাৎ রূপসীকে দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন চন্দ্র রূপসীকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না। তখন তাঁহারা পৃথক হইলেন, চন্দ্র রূপসীকে সঙ্গে করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তারা অশ্রুবর্ষণ

করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে একাকিনী আর এক দেবতার (সূর্য্য-চন্দ্রশেখর) আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

চন্দ্রশেখর গ্রন্থে দুইটি পৃথক উপন্যাস একত্র গ্রথিত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছুই নাই। শৈবলিনীর সহিত দলনীর কোন সম্পর্ক নাই; তাহারা কখন কোন সূত্রে সম্বদ্ধ ও মিলিত হয় নাই। অথচ শৈবলিনীর অন্যদিকে এরূপ একটি সুস্নিগ্ধ তারা উদিত না হইলে, গ্রন্থের শোভা সম্পাদিত হয় না। শুধু শোভা নয়, পাঠক শৈবলিনীর সহিত কাহারও তুলনা করিতে পারেন না। এক দিকে শৈবলিনীর গৌরব, অন্যদিকে দলনীর মহত্ত্ব। দলনীর মৃত্যুকালে একদা তাহার মহত্ত্বে শৈবলিনীর গৌরব পরাজিত হইয়াছিল। শৈবলিনীর প্রণয়স্রোত প্রাবৃট্-কালীয় প্রবাহিণীর ন্যায় প্রবল বেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, সম্মুখে কোন বাধা মানিতেছে না, এবং স্রোতবেগে প্রবাহ-পথ সরল হইয়া যাইতেছে। শত বাধা আসিয়া দলনীর প্রেমস্রোত ফিরাইয়া দিতেছে; তথাচ দলনীর প্রেম সেই সমুদ্রমুখেই যাইতে চাহে; অথচ কোন স্রোতস্বতীর সহিত তাহা মিলিত হইতে চাহে না। সেই সমুদ্রের সহিত মিলিতে পারিল না বলিয়া আপনি বালুকাভূমিতে বিশুষ্ক হইয়া গেল। তথাপি এক পঙ্কিল প্রবাহিণীর সহিত মিশিল না। প্রেমের প্রাবল্য শৈবলিনীকে যথেচ্ছ লইয়া যাইতেছে, এবং ঘটনাজালকে আপন অনুকূল পথে ফিরাইয়া আনিতেছে। ঘটনা দলনীকে প্রেমপথ হইতে লইয়া যাইতেছে। একজন কুটীরবাসিনী বনসুশোভিনী, অন্যজন প্রাসাদ-সুন্দরী রাজোদ্যান-প্রমোদিনী। একজনের রূপে মোহিনী শক্তি এত যে, যে তাহাকে দেখে, সেই বিমুগ্ধ হয়, অন্যজন এমত এক নবাবের মন মোহিত করিয়াছিল, যাহার মন শত শত সুন্দরীতেও মুগ্ধ হয় নাই। একজন দুরবস্থা হইতে প্রেমগৌরবে উচ্চে উঠিতেছেন, অন্যজন ঐশ্বর্যের উচ্চশিখর হইতে দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া প্রকৃত প্রেম-মহত্ত্বেই সকলকে বিমোহিত করিতেছেন। যিনি বলেন, কুটীরের দুঃখ-বিপনিতে প্রকৃত প্রেমও স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রীত হয়, তিনি শৈবলিনীকে

দেখুন ; যিনি বলেন, ঐশ্বর্যের বিলাস-ধামে প্রকৃত পবিত্র প্রেম অতি দুর্লভ, তিনি দলনী বেগমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একজন পূর্বানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, অন্যজন বিরহে কাতরা হইয়া প্রাণ পর্যন্তও বিসর্জন দিয়াছেন। একজনের ভাগ্যে প্রেমবৃক্ষের ফল অতি তিক্ত বোধ হইয়াছে, অন্যজনের ভাগ্যে সেই ফল বিষাক্ত হইয়া প্রাণনাশক হইয়াছে।

শৈবলিনী প্রণয়-আবেগের উত্তেজনায় যেরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভবনীয় করিবার জন্য, বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছেন যে, শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রণয় অত শৈশব হইতে দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল। তাহা পরস্পরের সৌন্দর্য দর্শনে উৎপন্ন হয় নাই। এ প্রণয়ের মূল বালসখ্য-ভাব। বয়ঃক্রমে এই সখ্য-ভাব দাম্পত্য প্রণয়ে পরিণত হইয়াছিল। এই মিলন ও প্রণয় দিন দিন পরস্পরের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছিল। রিপুর প্রকৃতি এই যে, তাহার প্রথম প্রাবল্যের সময় বাধা পাইলেই সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। প্রতাপ এবং শৈবলিনী যখন জলমগ্ন হইয়া মরিতে যান ; তখন আমরা এই প্রণয়ের প্রথম প্রাবল্য দেখিয়াছিলাম। তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রণয়াবেগ অত্যন্ত প্রবল। সেই প্রণয় তখন তরুণ কালের রিপুর ন্যায় কার্য্য করিতেছিল। ক্রমে এই প্রেমের প্রগাঢ়তা জন্মিল। প্রেমের প্রগাঢ়তার সহিত স্নেহ আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। মায়া প্রণয়কে শত বন্ধনে বদ্ধ করে। মায়ার সহিত সহানুভূতি এবং আসঙ্গ লিপ্সা, সকলই শৈবলিনীকে প্রতাপের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল ; শৈবলিনী একদণ্ড প্রতাপকে না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না ; প্রতাপকে দেখিলেও শৈবলিনীর সুখোদয় হইত। তাঁহারা যখন এইরূপ প্রেমে পরস্পর আবদ্ধ, তখন চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। তরুণ কালের তরুণ প্রণয়ের সময় যখন প্রতাপ এবং শৈবলিনী জানিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিবাহ হইবার যো নাই তখন সেই নৈরাশ্যে তাঁহারা জলমগ্ন হইতে গিয়াছিলেন। তরুণ প্রণয়ের সম্মুখে বাধা পড়িলে প্রণয় কিরূপ কার্য্য করে, তাহা

এই স্থলে প্রতীত হইয়াছিল। সেই প্রণয়ের গাম্ভীর্য জন্মিলে—সেই প্রণয়ের সহিত স্নেহ, সহানুভূতি এবং আসঙ্গ-লিপ্সার প্রাবল্য জন্মিলে তাহা বাধা পাইয়া কিরূপ কার্য করে, চন্দ্রশেখরের সহিত বিবাহ হইলে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। চন্দ্রশেখরের নিকট শৈবলিনী দায়ে কুমুড়া কাটিতেন। চন্দ্রশেখর ভালবাসায়, শৈবলিনী আপনার দোষে, শৈথিল্য করিতেন। প্রতাপ যদি নিকটে না থাকিতেন, শৈবলিনী বোধ হয় তাহা হইলে বহুদিন পরে চন্দ্রশেখরের সহিত মিলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহা ঘটিল না। প্রতাপ নিকটে থাকিয়া শৈবলিনীর প্রণয়াবেগ উদ্দীপ্ত রাখিয়াছিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, শৈবলিনীর নিকট তাঁহার অন্তর্দাহ দ্বিগুণিত হইতেছে। যে শৈবলিনী চিরকাল নয়নের আনন্দদায়িনী ছিলেন এখন চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াতে, তিনি অক্ষিশূল হইয়া পড়িলেন। এখন তাহার নিকট হইতে দূরে যাওয়াই ভাল। প্রতাপ এই স্থির করিয়া দূরে গেলেন। শৈবলিনী নয়ন-তারা-হারা হইলেন। বিচ্ছেদের প্রথম আবেগ অত্যন্ত ভয়ানক। শৈবলিনী অনুক্ষণ পন্থা দেখিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রতাপকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। এমন সময় ফষ্টর আসিয়া জুটিল। শুনিলেন ফষ্টরের কুঠি হইতে প্রতাপকে দেখা যায়। স্ত্রীসুলভ অজ্ঞানবশতঃ তিনি ফষ্টরকে ধরা দিলেন।

শৈবলিনী যখন চন্দ্রশেখরের বাটীতে ছিলেন, তখন বোধ হয়, অনেক দিন সুন্দরীর সহিত একত্র বসিয়া কথাবার্তা কহিতেন। আমরা ইহার দৃশ্যমাত্রও চন্দ্রশেখর—মধ্যে দেখিতে পাই না। সুন্দরীর নিকট শৈবলিনী কেমন অকস্মাৎ অজ্ঞাতভাবে আধ আধ হৃদয় খোলেন, এবং তৎক্ষণাৎ চতুরতার সহিত তাহা কেমন আধ আধ ঢাকিয়া লয়েন, এই সুন্দর দৃশ্যটি বঙ্কিমবাবু গোপন রাখিয়াছেন। গোপন রাখিয়াছেন এইজন্য, পাছে পাঠক প্রতাপের প্রতি আজিও পর্যন্তও শৈবলিনীর প্রগাঢ় অনুরাগের আভাস পান। আভাস পাইয়া বুঝিতে পারেন, কেন শৈবলিনী ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেন। বুঝিতে পারিলে, সুন্দরীর সহিত যখন শৈবলিনী গৃহে ফিরিলেন না,

তখন শৈবলিনীর উপর যেরূপ রাগান্ধ হইয়াছিলেন, পাছে সেই রাগ, সেই অসন্তোষের কিছু প্রশমতা হয় এই জন্য গ্রন্থকার প্রথমে শৈবলিনীর হৃদয় পাঠকের নিকট প্রকাশিত করেন নাই। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া, পাঠক যেরূপ কৌতূহল-পরতন্ত্র এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া শৈবলিনীর ভাগ্য দেখিতেছিলেন, সেরূপ ভাব কখনই উদ্রিক্ত হইত না। প্রকাশিত করেন নাই বলিয়া, শৈবলিনীর প্রতি যেরূপ ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, সেই ক্রোধ হেতুই যখন উদ্ধৃতা শৈবলিনী প্রতাপের সমক্ষে হৃদয়-কপাট খুলিয়াদিলেন, তখন শৈবলিনীর হৃদয় অধিকতর সুন্দর বোধ হইল; যখন পাঠক শৈবলিনীকে কলঙ্কে নিরপরাধিনী অনুতাপিনীরূপে দেখিলেন, তখন তাহার যতদূর সন্তোষ ও আনন্দ বোধ হইল, ততদূর হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এইখানে শৈবলিনীর হৃদয়-সৌন্দর্য অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ভাবিলাম, এইরূপ হৃদয় লইয়া স্যাফো ফেয়নের জন্য সিসিলী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ভাবিলাম, এই হৃদয়ে এঞ্জেলিনা, এড্উইনের জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন।

প্রণয় মানবকে সাহসী করে। প্রেম যখন রিপুতে পরিণত হয়, উৎসাহ ও সাহস তখন প্রেমের সহিত যোগ দেয়। অন্ধ রিপু একাকী দুস্তর সাগর পার হয়, বিপদাকীর্ণ অরণ্যে নির্ভয়ে প্রবেশ করে, এবং শঙ্কাকুল অভিসার-পথে অনায়াসে গমন করে। সেই রিপু শৈবলিনীকেও সাহসিনী করিয়াছিল। শৈবলিনী প্রেমের অনুরোধে ফষ্টরের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন, প্রেমের অনুরোধে ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগিনীও হইয়াছিলেন। প্রেমের অনুরোধে একাকিনী প্রতাপের উদ্ধারের জন্য ইংরাজের নৌকাতেও প্রবেশ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন, ফষ্টর ইংরাজ হউক না কেন, প্রেম তাহার জাতীয় রূঢ়তা হরণ করিয়াছিল। তিনি দশ দিন দেখিয়াছিলেন, ফষ্টর তাঁহার নিকট বিনয়ী প্রেমভিখারী, নিরীহ ভালমানুষ মাত্র। ক্রমে পরিচয় এবং অভ্যাস শৈবলিনীকে ভয়-ভাঙ্গা করিয়াছিল। তিনি আর ফষ্টরকে ভয় করিতেন না। ভয় করিতেন না এইজন্য,

যে তিনি ফষ্টরের অগ্রে প্রতাপকে দেখিতেন। কল্পনাময় প্রতাপ তাঁহার ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। যখন ফষ্টরের সহিত বহির্গত হ'ন, তখন তিনি ফষ্টরকে দেখেন নাই, সম্মুখে প্রতাপকে দেখিয়াছিলেন। শৈবলিনীর এখনকার হৃদয়ভাব পাঠকের অগোচর থাকাতে, ফষ্টরের সহিত শৈবলিনীর সম্মিলন-ঘটনায় তিনি চমকিত হইয়া যান। বাঙ্গালী-স্ত্রীলোকের সহিত ইংরেজের সম্মিলন-ঘটনাকে তিনি নিতান্ত অসম্ভবনীয় জ্ঞান করেন। অন্য অবস্থায় বাস্তবিক তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইত। কিন্তু শৈবলিনী এক্ষণে যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সে অবস্থায় তাহা অসম্ভবনীয় নহে। আমরা তাঁহার নিজের কথায় ব্যক্ত করিব। প্রতাপ বলিলেন—"ইদানীং আমি তোমাকে সর্পিনী মনে করিয়া ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমার দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি?"

শৈবলিনী গর্জিয়া উঠিলেন—"বলিলেন, তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ দেবতা মূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না, যে তোমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে? কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি। কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া, কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি? তোমার জন্য। কাহার জন্য গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। নহিলে ফষ্টর আমার কে?"

এই অন্ধকারময় জীবনে শৈবলিনী যে দিকেই একটু আলোক

দেখিতে পাইলেন সেইদিকে ধাবিত হইলেন। প্রতাপের জন্য তাঁহার গৃহধাম যখন শ্মশানতুল্য হইয়াছিল, যখন তিনি সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট ফষ্টরই বা কে, আর অন্য লোকই বা কে? উভয়ই সমান। যে উপায়ে হউক প্রতাপকে লাভ করাই তখন তাঁহার প্রবল ইচ্ছা। এই বলবতী ইচ্ছার অনুসারিনী হইয়া তিনি ফষ্টরকে উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী অন্য উপায়েও প্রতাপের নিকট আসিতে পারিতেন। কিন্তু শৈবলিনীর প্রকৃতি এরূপ ছিল না, সে তিনি কোন গোপনীয় ষড়যন্ত্রে এ কার্য সিদ্ধ করেন। সাহস কখন লুকাইয়া কার্য করেনা, কোন নীচবৃত্তি অবলম্বন করিতে অগ্রসর হয় না। সাহস যে শৈবলিনীর একটা প্রধান গুণ ছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সেই সাহস বরং তাঁহাকে প্রকাশ্য পাপ-পথে যাইতে দিবে, তথাচ গোপনীয় পথে যাইতে দিবে না। যৌবনের ধর্ম এই যে, যৌবন গোপনীয় বিজ্ঞতার পথে বড় যাইতে চাহে না। এজন্য হিন্দুকুলের বিবাহ কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সেই যৌবন ও প্রেম শৈবলিনীর সাহসকে দ্বিগুণিত করিয়াছিল। সেই সাহসভরে, যে উপায় প্রথম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি প্রতাপের নিকট যাইতে অগ্রসারিনী হইলেন। বঙ্কিমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, এক এক জন বালকের প্রকৃতি এইরূপ যে তাহারা জুজু বলিবামাত্র ভয় পায়, এক এক জন আবার সেই জুজু দেখিতে চাহে। আমরাও দেখিয়াছি, এক এক জন নারীর প্রকৃতিই এইরূপ যে, তাহারা গুপ্ত অপ্রকাশ্য পথে যাইতে চাহে না। শৈবলিনীর প্রকৃতি সেইরূপ ছিল। এই জন্য তাঁহার প্রকৃতিতে ফষ্টরের সহিত বহির্গমন নিতান্ত অসম্ভবনীয় বলিয়া আমাদিগের নিকট প্রতীত হয় নাই।*

শৈবলিনী যাহার জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রতাপ হর্ষোৎফুল্ল না হইয়া তাঁহাকে পাপিষ্ঠা

* এস্থলে শৈবলিনীর কার্যের ভাল মন্দ বিচার হইতেছে না, তাঁহার প্রকৃতিরই পর্যালোচনা হইতেছে।

বলিয়া গালি দিলেন, তাঁহার প্রণয় এবং কার্যের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। এই সমস্ত বাক্যে শৈবলিনীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তখন তিনি একান্ত ক্ষুব্ধা হইলেন। ভাবিলেন,—"প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে তাহা জানি না—সে শৈবলিনী—পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহ ত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম, কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

এইরূপ অনুতাপে শৈবলিনী এখন দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এখন বুঝিতে পারিলেন, যে দুর্দমনীয় রিপু তাঁহাকে এতদূর আনিয়াছে সে পাপ-প্রবৃত্তিকে তাঁহার দমন করাই উচিত ছিল। প্রতাপের জন্য যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এখন স্বভাবতঃই তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িল। শৈবলিনী তখন কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেদগ্রামে সেই গৃহ মনে পড়িল; সেই সঙ্গে সেখানকার সকল সুখ একবার স্মৃতিপটে উদয় হইল। চন্দ্রশেখরের চিন্তায় এখন তাঁহার মনে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশিতে লাগিল। ভাবিলেন "আমি তাঁহার যোগ্যা নাই বলিয়া, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে কি তাঁহার কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাঁহার কেহ নহি, পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয় সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন; কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখন ভালবাসি নাই—কখন ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটা কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

শৈবলিনী-হৃদয়ের এই চিত্রখানি কেমন স্বাভাবিক! শৈবলিনী প্রতাপকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন। তাঁহার জন্য সর্বত্যাগিনী

হইয়া তাঁহার নিকট শান্তি-লাভের জন্য উপস্থিত হইলেন; কিন্তু উপস্থিত না হইতে হইতেই সেই ভালবাসার জন্য ভৎর্সিতা হইলেন; সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। যে তাঁহাকে ভালবাসিত, কিন্তু যাঁহার ভালবাসা তিনি তুচ্ছ করিয়া মনোদুঃখ দিয়া আসিয়াছেন, এখন হৃদয় স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি চন্দ্রশেখরের জন্য একবার কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু তৎপরেই ভাবিলেন যে, "প্রতাপ আমাকে যাহাই বলুক, সেই প্রতাপ আমাকে ফষ্টরের হাত হইতে উন্মুক্ত করিয়া আনিয়াছেন। প্রতাপ অবশ্যই আমাকে ভালবাসেন। যে ভালবাসার জন্য প্রতাপ বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ে এখনও সমগ্রভাবে অবশ্য উদ্দীপিত রহিয়াছে। সেই জন্য তিনি ইংরেজের নৌকা হইতেও সাহস করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। উদ্ধার করিয়া আমার সম্মুখেই ইংরেজ-হস্তে বন্দী হইলেন।" শৈবলিনী ভাবিলেন "যিনি আমার জন্য এতদূর কষ্ট করিয়াছেন, এমন বিপদে পড়িয়াছেন, তিনি আমাকে কি ভালবাসেন না?" তাঁহার হৃদয় আবার প্রতাপের জন্য মায়ায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্বস্ব গিয়াছে এবং প্রতাপও গেল, তিনি আর কিসের জন্য সংসারে থাকিবেন! সেই প্রতাপকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। এমত সময় নবাবের লোক আসিয়া দলনী বেগম ভ্রমে তাঁহাকে নবাবের নিকট লইয়া গেল।

(২)

কবি শৈবলিনীর চরিত্রে দেখাইয়াছেন যে, কোন কোন কামিনী— হৃদয়ে কামরিপু কত প্রবলরূপে প্রভুত্ব করে। শৈবলিনী দেখাইয়াছেন যে, যে রিপুকে সুশাসনে রাখিতে হইবে, তাহাকে সুশাসনে না রাখিতে পারিলে সাধ্বী কুলাঙ্গনার কতদূর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অন্য দিকে প্রতাপ দেখাইয়াছেন, সেই রিপুকে কি প্রকারে দমন করিয়া রাখিতে হয়। শৈবলিনী দুর্বল স্ত্রীহৃদয়ের চরিত্র, প্রতাপ পুরুষের মনঃ-সংযমের চরিত্র। শৈবলিনীর দুর্বল হৃদয়ে, রিপুর প্রবলতা

ও অধীরতা, প্রতাপের হৃদয়ে প্রেমের শাসন ও ধৈর্য। শৈবলিনী ছুরিকা হাতে করিয়া, গঙ্গার তরঙ্গ সম্মুখিনী হইয়া, এবং বিপদের উপরে বিপদে পড়িয়াও হৃদয় শাসন করিতে পারেন নাই। তিনি প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই প্রেমতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে বিষম তুফানে ফেলিয়াছে। প্রতাপ মনে করিলেই প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতে পারিতেন, কিন্তু যতবার সেই প্রবৃত্তি-স্রোত তাঁহার নিকট প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ততবারই তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বেদগ্রামে দেখিলেন, শৈবলিনীর জন্য তাঁহার হৃদয় বিষম দুর্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে, তিনি সেই হৃদয়কে দমন করিবার জন্য বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। শৈবলিনী প্রতাপের জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত, প্রতাপ তখনও তাঁহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। শৈবলিনী তাঁহাকে ইংরাজ-হস্ত হইতে বিমুক্ত করিলেন, প্রতাপ তখন দ্বিগুণতর দৃঢ়তার সহিত হৃদয়কে সংযত করিয়া অনতিবিলম্বে শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনীর চরিত্রে পাশব প্রকৃতির ধর্ম, প্রতাপের চরিত্রে পুণ্য প্রকৃতির তেজস্বিতা। একজন ইহলোকেই অধর্ম ফলের সাক্ষ্য, অন্যজন পরলোকের গৌরব।

শৈবলিনীর যখন বিবাহ হইল, প্রতাপ ভাবিলেন, এইবার শৈবলিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু শৈবলিনী তথাপি প্রতাপকে পরিত্যাগ করিলেন না। শৈবলিনী যদি সদাকাল তাঁহার দৃষ্টিপথে না আসিতেন, যদি প্রতাপকে দেখিলে শৈবলিনীর নয়ন মন প্রফুল্ল না হইত, যদি প্রতাপের প্রতি তাঁহার মলিন মুখের কটাক্ষ নিঃশ্বাসভরে না পড়িত, যদি তিনি চন্দ্রশেখরকে লইয়া সুখস্বচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম করিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রতাপের বেদগ্রাম ত্যাগ করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু প্রতাপ বেদগ্রামে দেখিলেন যে, শৈবলিনীর বিষদংশনে তিনি একদণ্ড তথায় আর তিষ্ঠিতে পারেন না। সুতরাং তিনি বেদগ্রাম পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবিলেন, শৈবলিনীকে এইবার বিসর্জন দিলাম। চন্দ্রশেখর তাঁহার যে যে উপকার করিয়াছিলেন তাহারই

প্রত্যুপকার-সাধনার্থ প্রতাপ শৈবলিনীকে ইংরাজের নৌকা হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমুক্ত শৈবলিনী যখন তাঁহার নিকট হৃদয়-কবাট খুলিয়া দেখাইলেন, যে তাঁহাকেই লাভ করিবার জন্য তিনি আপনিই ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হইয়া আসিয়াছেন, তখন প্রতাপ আবার সেই বিষধরীর দংশনে জর্জরিত হইলেন। ইংরাজেরা যখন প্রতাপকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, তখন কি প্রতাপ অহোরাত্র ভাবিতেন না, কিরূপে শৈবলিনীর হাত হইতে তিনি বিমুক্ত হইবেন? এক এক দিন নির্জনে বসিয়া থাকিতেন, আর এই চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইত। তিনি সেইখানেই ভাবিয়াছিলেন, এবারে শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইব, যাহাতে তিনি আমাকে ভ্রাতৃরূপে অথবা পুত্রবৎ ভাবেন। তিনি এই চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন এমন সময়ে সহসা একদিন সেই শৈবলিনী তাঁহাকে ইংরাজ-বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। প্রতাপ সাঁতারিয়া পলাইয়া গেলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, আর কেহ তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু সম্মুখে দেখিলেন—শৈবলিনী। অমনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। তীরে উঠিয়াই ত আবার এই বিষধরীর হাতে পড়িতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। পলায়ন-উৎকণ্ঠার কথঞ্চিৎ তিরোভাব না হইতে হইতে এই ভাবনা তাঁহার মনে প্রবল হইল। তখন তিনি তাড়াতাড়ি সেই উৎকণ্ঠার সময়েই সুযোগে গঙ্গার উপরে শৈবলিনীকে পূর্বকল্পিত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিবার জন্য প্রিয় সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে শৈ বলিয়া সম্বোধন করাতে, শৈবলিনী-হৃদয় গঙ্গার বক্ষে ভাসিতেছিল, তদপেক্ষা শোভনতর চন্দ্র শৈবলিনীর হৃদয়ে সহসা উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ স্মৃতির জ্যোৎস্না তাঁহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিল। কিন্তু কে জানে, ইহা শরতের জ্যোৎস্না মাত্র, ইহা নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ শিখা। যে ঘোর নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকার ইহার পরেই শৈবলিনীর হৃদয় আচ্ছন্ন করিবে, তাহার গাঢ়তা বাড়াইবার জন্যই কবি পূর্বে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গঙ্গার শোভা বর্ণন করিয়াছেন।

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে; চন্দ্রমা গঙ্গার বক্ষে নৃত্য করিতেছে; গঙ্গার প্রসন্ন হিল্লোল সেই চন্দ্রকরে নাচিতে নাচিতে মৃদুমন্দ গমন করিতেছে। সেই জ্যোৎস্নাময়ী গঙ্গার বক্ষে সুন্দরী শৈবলিনী সাঁতার দিয়া যাইতেছেন; প্রতাপের মুখচন্দ্র শৈবলিনীর দিকে ধাবিত হইতেছে। গঙ্গায় আর এক চন্দ্র রোহিনীকে লইয়া যেন ক্রীড়া করিতেছেন। এই দৃশ্যটি সুন্দর, কি মনোহর! ইহা কবির সুন্দর কল্পনা। চিত্রকর এমন সুন্দর দৃশ্যে বর্ণপ্রয়োগ করিতে পারেন কি না সন্দেহ! বেল্‌মণ্টের পথে সুন্দরী জেসিকার সহিত লোরেঞ্জোর কথাগুলি আমাদিগের স্মরণ-পথে উদয় হয়, এবং আমরাও বলি এইরূপ চন্দ্রমাশালিনী রজনীতে শৈবলিনী প্রাণসম প্রতাপকে মুক্ত করিয়া গঙ্গার জলে সাঁতার দিয়া পলাইয়াছিলেন।

এই সুন্দর দৃশ্যে মোহিত এবং প্রতাপের মুক্তিতে আনন্দিত হইয়া আমরা শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের প্রিয় সম্ভাবণ শুনিতেছিলাম। "শৈ" বলিবামাত্র আমাদিগের মনে এক কোমল ভাবের উদয় হইল। শৈবলিনীর শৈশব কাল মনে পড়িল, এবং তৎসঙ্গে সহস্র সুকুমার ভাব একে একে সঞ্চারিত হইল। ভাবিলাম, এতদিনে প্রতাপের মন বুঝি শৈবলিনীর দিকে বিনত হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যাশায় শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমরা প্রতাপকে প্রীতি-নয়নে দেখিতেছিলাম। এমত সময়ে সহসা প্রতাপের কঠোর শপথ-বাক্য শৈবলিনীর নিকট ব্যক্ত হইল। অমনি সহসা পূর্বকার সমুদায় ভাব তিরোহিত হইল। শৈবলিনীর সহিত আমাদিগেরও মনে সহসা কালমেঘে বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হইল। আমরাও শৈবলিনীর সহিত কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইলাম। কি নিদারুণ বাক্য! শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তিনি ক্ষণেক পৃথিবীকে শূন্যময়ী দেখিলেন। ক্ষণেক তারা, চন্দ্র, সকলই নিভিয়া গেল। সর্বাঙ্গ শিথিল বোধ হইতে লাগিল। নীরবে নিশ্বাসবায়ু হৃদয়ভার বহন করিয়া গঙ্গার জলে পতিত হইতে লাগিল। তখন শৈবলিনী মৃদু মৃদু রবে বলিলেন :—

"এ সংসারে, আমার মত দুঃখী কে আছে প্রতাপ? তোমার ঐশ্বর্য

আছে—বল আছে,—কীর্তি আছে,—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ? আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ আমার সর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না, তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব? আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

এত দিনের পরে শৈবলিনীর বিষম মনোভঙ্গ জন্মিল। এতক্ষণে তাঁহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না, প্রতাপ তাঁহাকে এতদূর নৈরাশ্যে ফেলিবেন। যদি জানিতেন, তবে প্রতাপের জন্য তিনি এতদূর করিতেন না। এত দিনের পর নিশ্চয় বুঝিলেন, প্রতাপ তাঁহাকে কখনই গ্রহণ করিবেন না। প্রকৃতির প্রবলতা ধর্মের কঠোরতার নিকট পরাজিত হইল।

শৈবলিনী যে আশাবৃক্ষের উচ্চশিরে উঠিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এক প্রবল বাত্যায় তাহা হইতে বহুদূরে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষণেক চেতনাবিরহিতের ন্যায় রহিলেন। প্রতাপের জন্য তিনি সর্বসংসার পরিত্যাগ করিয়া এক সুবিস্তার সিকতাময় প্রান্তর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই প্রান্তরে যে মরীচিকার প্রতি তিনি এতকাল ধাবিত হইয়াছিলেন, নিকটে গিয়া দেখিলেন, সে মরীচিকার মনোহর দৃশ্য সর্বৈব মিথ্যা। তাঁহার পূর্বের পিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াও পূর্বের ন্যায় অতৃপ্ত রহিল; অথচ প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া দ্বিগুণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সর্বদিকে শূন্য দেখিতে লাগিলেন। মরীচিকার সুন্দর হরিদ্দৃশ্য বিদূরিত হইল। চতুর্দিক বালুকাময়। পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া ভাবিলেন—কেন তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! সংসারে যদি সুখ না থাকে, তবে সুখ আর কোথাও নাই! কিন্তু হায়, সে সংসারকে তিনি অন্যায়ভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন সংসার সুখের উল্লাসে হাসিতেছে। তাহার প্রতি বৃক্ষশাখে পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে প্রণয়-গীত গাহিতেছে। ধর্মের স্বচ্ছ সরোবর প্রতি

আশাবৃক্ষকে জীবন দান করিতেছে। আশা-বৃক্ষে শান্তির শত শত সুবর্ণ ফল সুরঞ্জিত হইয়া শাখীর শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সুখের সমীরণ সুমন্দ হিল্লোলে সরোবরে সুশীতল হইয়া শাখিগণকে আলিঙ্গন পূর্বক আন্দোলিত করিতেছে। সংসারিগণ ভাবনা-চিন্তার আতপ-তাপে তাপিত হইয়া যখন এই সুরম্য কাননে প্রবেশ করে, বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মধুর প্রণয়-গীত শুনিলে তাহাদিগের শ্রবণ-যুগল পরিতৃপ্ত হয়, সরোবরের সুশীতল বায়ু শরীর স্নিগ্ধ করে, এবং শান্তির সুস্বাদু ফল আস্বাদনে সন্তৃপ্ত হইয়া যায়।

এত দিনের পর শৈবলিনীর কল্পনা সংসারকে এইরূপ অনুরঞ্জিত দেখাইল। সেই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন, এই মরুভূমি হইতে কি ঐ সুখধামে আবার প্রবেশ করা যায় না? ভাবিয়া নিরাশ হইলেন। দেখিলেন, সেই সুখধাম ত্যাগ করিয়া এই সিকতাময় প্রান্তরের অনেক দূর আসিয়াছেন। চন্দ্রশেখর তাঁহার স্বপ্নে উদিত হইলেন, কিন্তু সেই স্বপ্নেই আবার বিলীন হইলেন। তাঁহার সংসার-ধাম মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্তু সে চিন্তা নিতান্ত ক্লেশকর হইল। সুন্দরীর কথা মনে হইতে লাগিল, কিন্তু সুন্দরীর কথা ভাবিতে গিয়া আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলেন, লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন, এবং দারুণ অনুতাপ তাঁহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। কেন তিনি সুন্দরীর কথায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, এখন কি বলিয়া তাহাকে মুখ দেখাইবেন? সুন্দরীর শাপ-বাক্য এখন স্নেহ-বাক্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আহা আর কি তিনি সে সুন্দরীকে পাইবেন, পাইলে কি সুখী হইবেন! ফষ্টরকে তিনি শতবার অভিসম্পাত করিলেন। নিজ বুদ্ধিকে ধিকার দিলেন। কিন্তু কিছুতেই সংসারে প্রবেশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। ঘোর নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার কল্পনাকে অন্ধকার করিল।

এতদিনের পর শৈবলিনীর আপনাকে ঘোর পাপীয়সী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরকে পরিত্যাগ করিয়া আসা তাঁহার ভাল হয় নাই, বুঝিতে পারিলেন। তিনি এতদিনে বুঝিতে পারিলেন

যৌবন-মদ নারীর পক্ষে বিষম বিপদ; তখন প্রেমের পুলকে গদ্গদ্ থাকিয়া নারী সকলপ্রকার দুষ্কৃতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। তিনি আরও ভাবিলেন, ফষ্টর যদি জীবিত থাকিত, তাঁহার ভাগ্যে আরও কত অনিষ্টপাত হইত। ফষ্টর হয়ত তাঁহার জীবন-স্রোতকে আর এক দিকে ফিরাইয়া দিতেন; তিনি হয়ত একজন বারাঙ্গনার মধ্যে পরিগণিত হইতেন। কি মহাপাপ করিয়া তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রেমের উন্মত্ততা রমণীগণকে অন্ধ করিয়া কোথায় লইয়া যায় তাহার ঠিক নাই। রমণীর হৃদয়ই তাহার প্রধান শত্রু। শৈবলিনী আর সে হৃদয়কে বিশ্বাস করিবেন না। ভাবিলেন, হৃদয় যে দিকে ইচ্ছা যাউক, তিনি অদ্য হইতে চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিবেন; চন্দ্রশেখরের মূর্তি অন্তরে স্থাপন করিবেন, চন্দ্রশেখরকে পূজা করিবেন; আর প্রতাপকে ভাবিবেন না। চন্দ্রশেখরকে পদে পদে অন্তর্বেদনা দিয়া তিনি তিনি যে দুষ্ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার মনে মহা আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি গঙ্গার উপকূলে বসিয়া সুশীতল সমীরণেও এইরূপ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। একদিকে প্রতাপের ব্যবহার দেখিয়া ঘোর মনস্তাপ, অন্যদিকে চন্দ্রশেখরের জন্য বিষম মনস্তাপ। এই দ্বিবিধ তাপে তাপিতা হইয়া তিনি যথেচ্ছ চলিয়া গেলেন। "যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ, সৌন্দর্য, প্রণয়াদি পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই,—আশা নাই,—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই নিজ স্বভাবগুণে তাহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকট কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল ততদূর চলিয়া গেল।"

(৩)

যে আন্তরিক অন্ধকার এখন শৈবলিনীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যে ঘোর আত্মগ্লানি ও চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছিল, তাহার গাম্ভীর্য, প্রচণ্ডতা ও ভীষণতা দেখাইবার জন্য কবি শৈবলিনীকে পর্বতোপরি লইয়া গেলেন। তথায় পার্বতীয় মেঘ, ঝড় ও অন্ধকারে তাঁহাকে প্রক্ষিপ্ত করিলেন, এবং পরিশেষে শৈবলিনীর আন্তরিক চিত্র প্রকাশিত করিয়া দেখাইলেন, যে সেই চিত্র প্রকৃতির এই বাহ্য ভীষণ মূর্ত্তি হইতেও গম্ভীর, প্রচণ্ড ও ভীষণতর। গ্রন্থের এই ভাগটী যেমন গাম্ভীর্যপূর্ণ, মহান্ ও ভয়ঙ্কর, এমত আর কোন স্থল নহে। আমরা একদা বাহ্য ও আন্তরিক জগতের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হই। সম্মুখে দেখি প্রকাণ্ড পর্বত; পার্বতীয় দেশ মেঘ ও অন্ধকারে পরিপূর্ণ, এবং মহান্ধকারময় গুহা; এবং গুহার মধ্যে ভীষণতর মহাকায় পুরুষ। এইখানে শৈবলিনী একাকিনী প্রস্থিতা হইয়াছেন। শৈবলিনী একাকিনী এই পর্বতের সানুদেশে বসিয়া কি ভাবিতেছেন? তাঁহার হৃদয় অন্ধকারময়, হৃদয়ে ভাবনার প্রবল বাত্যা বহিতেছে। এমত সময় দেখিতে দেখিতে পৃথিবীও অন্ধকারময়ী হইল। নিবিড় কাদম্বিনীজাল গগন-দেশ আচ্ছন্ন করিল, প্রবল বাত্যা উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই অন্ধকার ও ঝটিকার সময় শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশ কে যেন স্পর্শ করিল। শৈবলিনী শিহরিয়া না উঠিতে তাঁহাকে কে যেন ধরাধরি করিয়া অন্ধগুহা মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিল। এ সমুদায় দৃশ্যই ভয়ঙ্কর। কিন্তু তদপেক্ষা ভীষণতর দৃশ্য পরে প্রকটিত হইবে। তাহা শৈবলিনীর প্রদীপ্ত শিরা, জলন্ত কল্পনা, ভীষণ আত্মগ্লানি, নরকের চিত্র, এবং হৃদয়ের দহন ও যন্ত্রণা। একদিকে বাহ্য-প্রকৃতির শাসন, অন্যদিকে ধর্ম-প্রকৃতির মহাদণ্ড; ধর্মের মহাদণ্ড বাহ্যজগতের শাসন অপেক্ষাও গুরুতর হইয়া উঠিল। দৃশ্য গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর হইতে লাগিল। এরূপ ধর্মীয় গাম্ভীর্যের গৌরব, যদি প্রাকৃতিক গাম্ভীর্যের পর চিত্রিত না হইত, তাহা হইলে সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য-চিত্রের শেষ রক্ষিত হইত না, এবং ধর্মেরও গৌরব তাদৃশ উজ্জল বর্ণে প্রকাশিত হইত না।

শৈবলিনী যৎপরোনাস্তি অনুতাপ করিলেন, কল্পনায় রাত্রিদিন নরক দেখিতে লাগিলেন। এই হৃদয়-দহন হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং চন্দ্রশেখরের সহিত পুনরায় মিলিত হইবার জন্য, তিনি ভয়ানক প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হইলেন। এই প্রায়শ্চিত্ত যথাবিধি কায়মনোবাক্যে সম্পন্ন করিলেন। আমরা এরূপ ঘোর আত্মগ্লানি, ভীষণ অনুতাপ, হৃদয়-দহন এবং প্রায়শ্চিত্তের চিত্র আর কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। কল্পনা এরূপ হৃদয়-যন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্তের ভাব অনুমান করিতেও শঙ্কিত হয়। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর যদি বিবাহ না হইত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় এমন জ্বলন্ত অনুতাপের চিত্র কখনই দেখিতে পাইতাম না। কারণ, তাহা হইলে শৈবলিনী আপনাকে ততদূর পাতকিনী জ্ঞান করিতেন না। এমন জ্বলন্ত হৃদয়-দহনের একখানি পরিস্ফুট চিত্র দিবার জন্যই যেন কবি শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ দিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর দেখিলেন, তাঁহার ইহলোকেই নরক ভোগ হইতেছে। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। বলিতে গেলে, এইখানেই এই উপন্যাস—ভাগ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শৈবলিনীর প্রবল-প্রকৃতির (Violent Nature) দৃষ্টান্ত। মানব-প্রকৃতির প্রাবল্য কিরূপ, বুঝাইতে হইলে, আমরা শৈবলিনীর প্রতি নির্দেশ করিব। প্রবলা প্রকৃতির যে দোষ, তাহা শৈবলিনীতে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু প্রবলা প্রকৃতির যে দুর্নিবার বেগ, যে অদমনীয় তেজ, যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ও অবশ্যতা তাহা শৈবলিনীর ছিল। এই প্রকৃতি পদ্মার স্রোতের ন্যায় তীরভূমি ভগ্ন করিয়া, ঝটিকার ন্যায় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভয়ঙ্কর বেগে বহিয়া যায়। সম্মুখের কোন বাধাই মানে না। আমরা এই প্রকৃতির বেগ দেখিয়া স্তম্ভিত হই। শৈবলিনীর এই প্রকৃতি কিছু বিলম্বে জাগরিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর সেই প্রকৃতি যখন একবার সম্যক্ উদ্রিক্ত হইল' বাঙ্গালিনীতেও সেই প্রকৃতি-তেজ কিরূপ দুর্দ্দমনীয় হইতে পারে, শৈবলিনী তাহা প্রদর্শন করিলেন। তেজস্বিনী

শৈবলিনী ফষ্টরকেও ভয় করেন নাই, তাহার নিকট তেজস্বিতার সহিত নিজ সতীত্ব রক্ষা করিলেন, প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নির্ভয়ে নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আশ্চর্য তেজে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রতাপ-উদ্ধারের জন্য বর্মধারিনী হইয়া বহির্গত হইলেন। তেজ যতদূর যাইবার অবাধে যাইতে লাগিল। শেষে যখন একদিকে সেই তেজ সম্যক ব্যয়িত হইল, প্রকৃতি তখন নিস্তেজ হইয়া একবার শান্তভাব ধারণ করিল। এ প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিলে সমুদ্রের ন্যায় শান্ত হয়। সমুদ্রে-চন্দ্র, তারকা, গগন, একবার প্রতিবিম্বিত হইল। শৈবলিনী একবার সমুদয় ভাবিয়া দেখিলেন, কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা দেখিলেন; ততদূর তাঁহার যাওয়া উচিত ছিল না ভাবিলেন; যথায় যাওয়া উচিত, আবার ফিরিলেন। সেই দিকে আবার শৈবলিনীর তেজস্বিনী প্রকৃতি-বল নিয়োজিত হইল। প্রকৃতি আবার সমান বেগে বহিতে লাগিল। এরূপ প্রকৃতির ধর্ম এই যে বিষয়ে নিয়োজিত, তাহার একশেষ করিয়া ফেলে। শৈবলিনীর অনুতাপের প্রবলতা দেখে :ক ? শৈবলিনীর অনুতাপ যতদূর যাইবার গেল। যে কোন উপায়ে চন্দ্রশেখরকে পাইবেন, এখন সেই উদ্দেশ্যে ফিরিতে লাগিলেন। তজ্জন্য যথাকষ্টে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রায়শ্চিত্তে শরীর-পাত করিয়া উন্মত্ত হইয়া গেলেন। চন্দ্রশেখরকে লাভ করিয়া তবে আবার শৈবলিনী নিরস্ত হইলেন।

(আর্যদর্শন, ১২৮৪)

জয়ন্তী

পাঁচকড়ি ঘোষ

(১)

কবির পথ প্রশস্ত, দিগন্ত-প্রসারিত। প্রতিভাবলে তিনি ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, নীচ হইতে উচ্চে, সান্ত হইতে অনন্তে উঠিতে পারেন। "জগতের সার সুখ প্রতিভা; প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।" যে প্রতিভাবলে কুন্দ—সূর্যমুখীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, যার তেজে ভ্রমর-মৃন্ময়ী জন্মিয়াছিল, সেই প্রতিভাই প্রফুল্লমুখীকে গড়িয়াছে, আজি সেই প্রতিভাগুণেই বঙ্গসাহিত্য জয়ন্তীর ভস্মাবৃত অনিন্দ্য রূপমাধুরী, সংসারাসক্তি-বিরহিত, ভগবৎ-প্রেমে চিত্ত-সমর্পিত, নির্মল-নিষ্কাম-ধর্ম-নিয়োজিত ভৈরবী-বেশ দেখিতে পাইতেছে। প্রতিভার স্রোত ফিরিয়াছে, মহান্ হইতে মহত্তর পথে প্রধাবিত হইতেছে। প্রবল স্বদেশানুরাগ ও বিশুদ্ধ শান্তিরসাস্পদ নিষ্কাম ধর্ম সমসূত্রে জড়িত হইয়া কবির প্রতিভা নিত্য নব মোহন চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। "আনন্দমঠে" এ স্রোতের উৎপত্তি, 'দেবীচৌধুরাণী'তে তার বিস্তৃতি, 'সীতারামে' উহার পরিণতি। 'দেবীচৌধুরাণী'র উপসংহারে কবি প্রফুল্লমুখীর মুখ দিয়া 'গীতা'—শাস্ত্রোক্ত ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই কথা বলাইয়াছিলেন।—

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমরা কবির প্রসাদে বর্ষে বর্ষে দুষ্টের দমন, সাধুর পালন, ধর্ম-সংরক্ষণের অবলম্বন ভগবানের অবতার-স্বরূপিণী শান্তিরূপিণী দেবীমূর্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছি! গৃহিণী সাজে সাজাইয়া কবি প্রফুল্লমুখীর দ্বারা প্রজা-বিদ্রোহের শান্তি-সংরক্ষণে, নিষ্কাম কর্মের জলন্ত শিক্ষাদানে যত্ন করিয়াছিলেন; আজি আবার শ্রীকে অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসিনী

জয়ন্তীর দ্বারা মুসলমানের অরাজকতা নিবারণে ও ধর্ম-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সেই পবিত্র কর্মযোগের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' তিন খানিতেই কবি একটু ইতিহাসের ছায়া ফেলিয়াছেন। ফেলা কেন? ঐতিহাসিক অস্ফুট একটু ছায়ার উপর কবি ঐ তিনখানি অদ্ভুত ভাবুকতাময় মহাকাব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন খানিকেই ঐতিহাসিক চক্ষে দেখিতে বলেন নাই। বস্তুত ঐতিহাসিক দুই একটী নাম ও ঘটনার ঈষৎ অস্ফুট আভা ভিন্ন ঐতিহাসিকতা উহাতে কিছুই নাই। "অস্তবিষয়ের প্রকটনে যত্নবান্" হওয়াই কবির কার্য—ইতিবৃত্তের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

"গীতা"—শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী শ্লোকের দ্বারা কবি "সীতারাম" কাব্যের মুখবন্ধ করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের ইতর-বিশেষ অনুভব করিতে না পারিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন যখন সন্দিহান-চিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও কর্মযোগের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করেন, তখন অনন্ত-তত্ত্বজ্ঞ জগদীশ্বরের অংশ-স্বরূপ লোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে কর্মযোগের মূলসূত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন, কবি প্রথমে তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুত শ্রীকে কর্মযোগাভ্যাস শিক্ষা দেওয়াই 'সীতারাম' কাব্যে জ্ঞানময়ী জয়ন্তীর একমাত্র কার্য। কর্মযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই তিন মহান্ যোগসূত্রে সমগ্র 'গীতা'-শাস্ত্র গ্রথিত। কবির কল্পনা-কৌশলে এই তিনই সমভাবে প্রধান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ তিনের ক্রম-বৈষম্য অনুভব করা যাইতে পারে। কর্মই সাধনার প্রথম সোপান, ধ্যানে তাহার অবস্থান, জ্ঞানে উহার পরিণাম। ঐহিক সুখদুঃখানুভূতি বিসর্জন দিয়া, নিকৃষ্ট বৃত্তিসমূহকে বশীভূত করিয়া, আসক্তি-শূন্য হইয়া, ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া, ভগবানে আত্মা-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়া, নিষ্পাপ, নির্মল কার্যানুষ্ঠান করাই সাধনার মূল উপকরণ। ক্রমে ধ্যানবলে সেই নির্বিকার পরমপুরুষে চিত্ত প্রতিনিয়ত যুক্ত রাখিলে,

সাংসারিক বাহ্য লালসা তিরোহিত হয়, কর্মকাণ্ড শিথিল হইয়া পড়ে, চিত্তের সমগ্রগতি ভগবৎ-প্রেমে সংযুক্ত হয়। তখন প্রকৃতির বিনাশ ঘটে, ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হয়, আত্মার সত্তা পরমাত্মায় বিলীন হয়। এই অবস্থাই জ্ঞানযোগ। এ কার্য একদিনে সিদ্ধ হয় না; কর্মানুষ্ঠান ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সিদ্ধি বা জ্ঞান লাভ হয় না। জয়ন্তী কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত সংযত করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানের সীমায় পৌছিয়াছেন; তাঁহার শিক্ষায় শ্রী এখন কর্ম অভ্যাস করিতেছেন, নিষ্কাম হইতে শিখিতেছেন, ভক্তিরসে ডুবিয়াছেন। সাধনার এই মহদুপকরণ দেশে দেশে বিঘোষিত হউক, জয়ন্তীর নিকট সকলে নিষ্কাম কর্ম শিক্ষা করুক।

'সীতারাম' কাব্যের দ্বিতীয় শিক্ষা 'গীতার' দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ কয়েকটী শ্লোকে নিহিত।—বিষয়-চিন্তাশীল পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হইলে ক্রোধ উপজিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি-বিপর্যয় এবং বুদ্ধি-বিপর্যয়ে বিনাশ-সংঘটিত হয়। রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত, বশীকৃত-চিত্ত পুরুষেরা আত্মসংযত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয় সম্ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।—কবি সীতারামের চরিত্রে এই মহত্তত্ত্ব জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সীতারাম এক সময়ে আপন জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া পরের জীবন রক্ষা করিয়া-ছিলেন;—হিন্দুকে হিন্দু রাখা অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম বলিয়া যাঁহার তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল,—বিজাতীয়ের অত্যাচার নিবারণের উপকরণ স্থির করিবার জন্য যাঁহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, ক্ষণেকের জন্য অন্তরাকাশে সত্যের বিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—"অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্বজীবের প্রাণস্বরূপ, সর্বকার্যের প্রবর্তক, সর্বকর্মের ফল-দাতা, সর্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে" যাঁহার চিত্ত সমর্থ হইয়াছিল,—"ধর্মই ধর্ম-সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের উপায়" বলিয়া যাঁর অন্তরে প্রবল প্রতীতি জন্মিয়াছিল, শ্যামপুরের (ওরফে মহম্মদপুরের) সর্বেসর্বা রাজা হইয়া বাহুবলে বাঙ্গালার দ্বাদশ

ভৌমিকের উপর আধিপত্য স্থাপন পূর্বক মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া, সেই উদারচিত্ত, সুকর্মঠ, সত্যনিষ্ঠ সীতারাম রায়ের চিত্ত বিকৃত হইল, —ভোগলালসা প্রবল হইল,—এই সুখের রাজ্যে শ্রীর সুখ-সমাগম দেখিতে, নন্দা-রমার উপর তাঁহাকে পট্টমহিষী করিতে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িল। তাঁহার আর "হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না।" বহুকাল পরে অবস্থা-পরম্পরায় শ্রীকে নিকটে পাইয়াও, তিনি সে লালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না;—তাঁহার রাজ্যের রাজমহিষী, গৃহের গৃহিণী, সেই সেকালের শ্রী না দেখিয়া 'মহামহিমময়ী দেবী-প্রতিমা' দেখিলেন,—তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, রূপ-রশ্মি-তেজে নয়ন ঝলসিয়া উঠিল, কি এক অব্যক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না; কত অনুনয়-বিনয়ে, কত কল-কৌশলে, কত যুক্তি-তর্কে তিনি শ্রীকে আপন মন্তব্য পথে আনিতে চেষ্টা করিলেন,—ডাকিনী শ্রীর (সীতারামের চক্ষে এখন ডাকিনী ভিন্ন আর কি?) মন কিছুতেই টলিল না, তিনি সুখের সংসারে সংযুক্ত হইতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। অগত্যা 'চিত্তবিশ্রাম' প্রমোদ-ভবনে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইল। সীতারাম বিষয়-বৈভব ভুলিয়া, রাজ-কার্য-পরিচালন-কর্তব্যতা বিস্মৃত হইয়া, প্রতিনিয়ত শ্রীর নিকট বসিয়া থাকিতেন; শ্রী সর্বসুখে নিস্পৃহ হইয়া অবিরাম ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন, মধুর হরিনামের তরঙ্গ তুলিতেন,—রূপজ মোহে মুগ্ধ সীতারাম বুদ্ধি-বিপর্যয়বশতঃ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না, সে রস-তরঙ্গে ডুবিতেন না, কেবল অনিমিষ-লোচনে বরবর্ণিনী শ্রীর রূপমাধুরী দেখিতেন, তাঁহার কোকিল-নিন্দিত কলকণ্ঠের মধুরতায় বিভোর থাকিতেন; ভোগাকাঙ্ক্ষা ততই বলবতী হইত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর দেখিলেন, রাজ্য ধ্বংস হয়; সীতারামকে কত বুঝাইলেন, মতি ফিরাইতে কত চেষ্টা করিলেন, কোন ফল ফলিল না। সুবর্ণপিঞ্জরাবদ্ধা শ্রীও প্রজ্ঞাচক্ষু-বলে রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা, রাজার আত্মবিস্মৃতির ফল বুঝিতে লাগিলেন;—তিনিও সীতারামের মোহান্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। এমন সময় দৈবগতিকে জয়ন্তী আসিয়া জুটিলেন; শ্রীর অপূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণতা

হইল, মন্ত্রণার মন্ত্রী মিলিল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া শ্রীর পক্ষে এই পাপ সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয় বলিয়া স্থির করিলেন। কৌশলে শ্রীকে তাড়াইয়া জয়ন্তী চিত্ত-বিশ্রামের অবরোধস্থ হইলেন, অবাধ-বিচরণ-শীলা বিহঙ্গিনী স্বসাধে শৃঙ্খলাবদ্ধা হইলেন। ভোগলোলুপ সীতারামের ভোগবাসনা পূরিল না, তাঁহার ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি ভৈরবীকে শ্রী-নির্বাসন-ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী স্থির করিয়া, তাঁহাকে রাজ্যের প্রকাশ্য স্থলে বিবস্ত্রা করিয়া চণ্ডাল মুসলমান কর্তৃক বেত্রাঘাত করাইতে কৃতযত্ন হইলেন, ক্রোধ, মোহ, আত্ম-বিস্মৃতি, বুদ্ধি-বিপর্যয় একে একে সমস্তই পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল; ক্রমে ধ্বংস;—এত আয়াসলব্ধ, এত সুখের, এত সাধের রাজ্যধন বিনষ্ট হইল, পতিপ্রাণা সহধর্মিণী রমার অকাল-বিয়োগ ঘটিল; নিজেও শোকে, তাপে, মুমূর্ষুভাবে সপরিবারে দেশত্যাগী হইলেন। চিত্ত-সংযম করিতে না শিখিলে, অন্যবিধ সহস্রগুণ-সত্ত্বেও পুরুষের এইরূপ দুর্গতি ঘটে।

(২)

'সীতারাম' কাব্যে প্রধানত চারিটি স্ত্রী-চরিত্রের সমাবেশ—রমা, নন্দা, শ্রী ও জয়ন্তী। দুইটি গৃহিণী, একটি কভু গৃহিণী, কভু ভৈরবী, কভু (মূঢ়ের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে) ডাকিনী,—চতুর্থটি (আমাদিগের সমক্ষে) চির-সন্ন্যাসিনী। ইহাদিগের কাব্যগত চরিত্রের সম্যক্ বিশ্লেষণ করা আমাদিগের সাধ্যাতীত। পাঠকের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, ইহাদিগের পূর্ণাবয়ব, সমগ্র সৌন্দর্য দেখিয়াছেন; যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা দেখিতে অনুরোধ করি; এই অপূর্ণ মূর্তিতে, আমাদিগের ভাঙা-গড়ায়, তাঁহারা যেন প্রতারিত না হয়েন। রমা ও নন্দা সীতারামের গৃহিণী, রাজার রাণী, সংসারের সঙ্গিনী। শ্রী তাহার পরিণীতা পত্নী হইয়াও, বিধির লিপি খণ্ডাইবার অনুরোধে, পরিণয়াবধি তাঁহার সংসার হইতে বিচ্যুতা। জয়ন্তী সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া, ভগবৎ-প্রেমানুরাগিণী সন্ন্যাসিনী। সংক্ষেপে ইহাদিগের প্রত্যেককে একবার দেখিতে চেষ্টা করা উচিত।

রমা, মহারাজ সীতারাম রায়ের কনিষ্ঠা মহিষী। তিনি পতি-প্রেম ও পুত্র-বাৎসল্যের একসূত্র-আকর্ষণে আকৃষ্টা মূর্তিমতী সরলতা। সংসারের ভাল-মন্দ বুঝেন না, পরের সুখ-দুঃখ ভাবেন না; রাজ্যের সম্পদ-বিপদ দেখেন না, মানুষের সারল্য-শঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না,—চাহেন কেবল স্বামী পুত্রের মঙ্গল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যাউক, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই;—তাঁহার মনের সমগ্র চিন্তা কেবল পতি-পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশ। এ প্রেম, এ বাৎসল্য, অবশ্য সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ। ভগ্ন-হৃদয়া বঙ্গপুরমহিলা-মহলে অনেকেরই এইরূপ সংকীর্ণ হৃদয়; সমগ্র সংসারে ভালবাসিবার, আত্মপর সমভাবে দেখিবার, চিত্ত-প্রশস্ততা অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা রমার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রথম নিদর্শন দেখিয়াছি, সীতারামের গঙ্গাস্নান-যাত্রার অঙ্কে, এই গঙ্গাস্নানের অন্তরে যে গূঢ় রহস্য নিহিত ছিল, রমা তাহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি ছলে, বলে, কৌশলে, বাক্‌জালে, চক্ষুর জলে, সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিলেন। যখন জানিলেন, শ্রীর ভাইকে রক্ষা করিবার জন্য সীতারামকে সম্ভবত কাজি সাহেবের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে হইবে, তখন সমূহ বিপদাশঙ্কা করিয়া তিনি সীতারামকে সে পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করাইতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, (শ্রীর ভাই বাঁচুক মরুক, তাঁহার আসে যায় কি?) তিনি, "বিনা অস্ত্রে" যতদূর সম্ভব তদতিরিক্ত কিছু করিবেন না, বলিয়া, সীতারামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তবে স্থির হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অভিনয় সীতারাম ও তোরাব খাঁর বিবাদ-বৈরিতা-পর্বে। দুরন্ত মুসলমানের সহিত বিবাদ বাধাইলে সীতারাম বিনষ্ট হইবেন; এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল, দিবা নিশি ঐ ভাবনায় তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। রাজ্য-ধন বিনষ্ট হউক, সুখ-সম্পদ দূরে যাউক, মান-মর্যাদা অতল জলে নিমগ্ন হউক, সীতারাম "ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়েন", তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, রমার ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা;—আহার বিহারে রুচি নাই, পূজাহ্নিকে মতি নাই, কেবল "হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারে খারে যাক—আমরা আবার

মুসলমানের অনুগত হইয়া দিনপাত করি ; এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর"—ইষ্টদেবের নিকট অনুক্ষণ এই প্রার্থনা। স্বাধীনতাপ্রয়াসী, অসমসাহসী, সমরকুশলী, অতুল-পরাক্রমশালী সীতারামের চক্ষে এ ভাব সম্পূর্ণ বিরক্তিকর হইল ; এত ভালবাসার "রমা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল।" তখন তাঁহার শ্রীর কথা মনে পড়িল ; তাঁহার সহধর্মিণী, "উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্খার ভাগিনী, কঠিন কার্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী" স্ত্রীর চিন্তা অন্তরে জাগিয়া উঠিল ; সহর-প্রান্তে গঙ্গারামের কবর-ভূমিতে "মহামহীরুহের শ্যামল-পল্লব-রাশি-মণ্ডিতা" শ্রীর সেই "চণ্ডীমূর্তি", সেই বায়ুভরে উড্ডীয়মান "অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম", সেই "মধুরিমাময় দেহ", "সেই রণরঙ্গ-বিভোর সিংহবাহিনী বেশ" সেই অঙ্গুল-ঘূর্ণিত, দিগন্ত—নিনাদিত "মার—মার ! শত্রু মার ! দেশের শত্রু,—হিন্দুর শত্রু আমার শত্রু, মার ! শত্রু মার !" শব্দ একে একে সীতারামের মনে উদয় হইল। এ পাপ সংসারে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল ; লঘুচেতা, সংকীর্ণ-হৃদয়া রমার সহবাস তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি চন্দ্রচূড়-প্রমুখ কর্মচারীগণের হস্তে রাজ্যভার এবং নন্দার উপর অন্তঃপুরের ভার দিয়া, সম্রাটের সনন্দ-প্রাপ্তি-ব্যপদেশে স্ত্রীর অনুসন্ধানোদ্দেশে দেশত্যাগী হইলেন। রমার জ্বালায় সীতারাম দেশ ছাড়িলেন, রমা অবশ্য অপরাধিনী—কিন্তু "স্বামী পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহই সে অপরাধের মূল"। মুসলমানের সহিত বিবাদ করিয়া, "পাছে তাহাদের কোন বিপদ ঘটে, এই চিন্তাতেই তিনি এত ব্যাকুল।"

রমার শেষ অভিনয় তোরাব খাঁ কর্তৃক মহম্মদপুর লুণ্ঠন-অধ্যায়। সসৈন্যে সহর-লুণ্ঠনোদ্দেশে তোরাব খাঁর আগমন-বার্তা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরে পৌঁছিল। সংবাদ রমার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন, মুসলমান সহর লুঠ করিয়া, সকলকে "খুন করিয়া", সহর পোড়াইয়া চলিয়া যাইবে, তাঁহার ছেলের দশা কি হইবে,—এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভয়—বিহ্বলতায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া হিন্দুকুল-রমণীর, রাজপুর-বধূর অকরণীয়

কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন ;—দুর্বিনীত গঙ্গারামের কুহক-গ্রস্তপ্রায় হইলেন। এই মহাপরাধের মূলেও সেই একমাত্র অকৃত্রিম পুত্র-বাৎসল্যই প্রবলভাবে প্রোথিত। পাপিষ্ঠ গঙ্গারামের দুরভিসন্ধির অস্ফুট-ছায়া যখন মুরলার ইঙ্গিতে তাঁহার অন্তরাকাশে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া যখন স্বকৃত অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, "মরি, রাজসংসারে মরিব, তথাপি গঙ্গারামের সহায়তায় বাপের বাড়ী গিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিব না"—বলিয়া যখন স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, তখনও সরলার অন্তরে পুত্রবাৎসল্য সমভাবে দেদীপ্যমান, তখনও "ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি (গঙ্গারাম) স্বীকৃত আছেন, সময়ে আসিয়া যেন রক্ষা করেন"—মুরলার দ্বারা সেই পাপিষ্ঠের নিকট এ সম্বাদ পাঠাইতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। সেই পুত্র-স্নেহের অকপট একাগ্রতায় তিনি এই কলঙ্ক-পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইলেন। যখন "আম-দরবারে" গঙ্গারামের বিচারস্থলে লোকারণ্যমধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূকে সাহসে ভর করিয়া আনুপূর্বিক ঘটনা বলিতে হইল, তখন ভীরুস্বভাবা রমণীর সাহসের অন্য কোন অবলম্বন ছিল না, কেবল অঞ্চলের নিধি পুত্ররত্নের মুখ-দর্শনই সমস্ত সাহসের মূল। তিনি দরবারে যাইবার পূর্বে নন্দাকে বলিয়া গেলেন, "কেবল এক কাজ করিও, যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকটে দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।" বাস্তবিক সভাস্থলে রমা "যখন একবার সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিলেন, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিলেন—তখন পরিষ্কার স্বরে স্বর্গীয় অপ্সরা-বিনিন্দিত তিনগ্রাম-সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সংগীতের মত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে (তাঁহার) সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল।" "পরিশেষে" রমা ধাত্রীর ক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ! * * * আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। আপনার ধর্ম আছে, কর্ম আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম এই, যশ

এই, স্বর্গ এই।” পবিত্র হিন্দুকুল-রমণী ভিন্ন এই নির্ম্মল দেবভাবময় পুত্রানুরাগ অন্যত্র দেখা যায় না। এমন মুক্তকণ্ঠে আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণনাতেও যখন মন্দ লোকের সন্দেহ ঘুচিল না, যখন পতিপ্রাণার কলঙ্ক মুছাইবার অন্য উপকরণ নাই, তখনও সেই স্বামী-পুত্রের প্রতি অনুরাগের উপরেই আত্মনির্ভর, তখনও সরলার মুখে সেই একই কথা—“যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি, যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সেই পুত্রমুখ-দর্শনে চিরবঞ্চিত হই, * * * যেন জন্মে জন্মে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামীপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।” বলিতে বলিতে মর্ম্মপীড়ার প্রবল পেষণে পতিপ্রাণা মূর্চ্ছিতা হইলেন, “সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল, রমা আর উঠিলেন না। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতীনাম রক্ষা করিলেন; নাম রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ রহিল না।” চিকিৎসার সহস্র বন্দোবস্ত সত্ত্বেও এই রুগ্নদশায় রমাকে সীতারাম একবার দেখিতে আসেন না—এই দুঃখে তিনি বিনা ঔষধ-সেবনে রোগকে প্রশ্রয় দিয়া জীবন শেষ করিলেন। তিনি একদিন নন্দার বিশেষ জোর-জবরদস্তীতে তাঁহাকে প্রকাশ্যে বলিলেন—“ওষুধ খাই নাই—খাব যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।” রাজাকে তখন ডাকিনীতে পাইয়াছিল, তিনি সহজে আসিলেন না; যখন আসিলেন, তখন চরমাবস্থা। পতিপ্রেমানুরাগিনী সাধ্বী অন্তিমে স্বামীপদ দর্শন করিয়া, স্বামী-সমক্ষে একবার অন্তিম হাসি হাসিয়া, পুত্ররত্নকে স্বামীকরে সমর্পণ করিয়া, জন্মের মত বিদায় হইলেন। সেই অন্তিমেও পতিপ্রেম ও পুত্রবাৎসল্যের পূর্বরাগ সমভাবে প্রদীপ্ত; তখনও স্বামী সমক্ষে শেষ ভিক্ষা, যেন “মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিও না। আশীর্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।”

(৩)

রমার জীবলীলা ফুরাইল। আসুন, আমরা এখন নন্দাকে দেখি। নন্দা সীতারামের মধ্যমা মহিষী, তবে শ্রী সংসারে মধ্যবর্ত্তিনী না থাকা

বিধায়, তিনি মধ্যমা হইয়াও জ্যেষ্ঠা, রাজসংসারের প্রধানা কর্ত্রী। বাস্তবিক তিনি হিন্দুর অন্তঃপুরের কর্তৃত্ব—ভার লইবার যোগ্য গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতি ধীর, স্থির, গম্ভীর, তিনি রমার ন্যায় বালিকাবুদ্ধি নহেন, বিপদের ঈষত্তরঙ্গাঘাতে তাঁহার চিত্ত 'হাবু ডুবু' খায় না। স্বামী পুত্রে অনুরাগ তাঁহারও অন্তরে সমভাবে অক্ষুণ্ণ,—তিনি স্বামীকে "মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা" করেন, কিন্তু তিনি প্রেমাক্ত বা স্নেহাক্ত নহেন। পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিয়োজিত, তাঁহার স্বজাতি—বিহিত কর্মানুষ্ঠানে তিনি অনুক্ষণ ব্যাপৃতা, কিন্তু পুরুষের কোন কার্যের সমালোচনায় প্রস্তুত নহেন। রাজকার্য পরিচালন,—শত্রু-মুখ হইতে পুরী-সংরক্ষণ,—রাজ্য, সংসার, প্রজা ও পরিজনের সুখ-শান্তি-অন্বেষণ প্রভৃতি কায পুরুষের কর্তব্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, সে সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি উদ্যত নহেন। গঙ্গাস্নান-অধ্যায়ে ভিতরের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত রমার ন্যায় নন্দারও কৌতূহল জন্মিয়াছিল। রমার নিকট সীতারামকে 'হার' মানিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু নন্দার নিকট হয় নাই। সীতারাম কথা গোপন রাখিলেন, নন্দার একটু অভিমান হইল, একটু অশ্রু-নিঃসরণ হইল, কিন্তু সীতারাম একবার নন্দার চিবুক ধরিয়া দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া, একটু মধুর আদর করিয়া তাহা হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইলেন। বিপদে ধৈর্যচ্যুত হওয়া নন্দার স্বভাব নহে; মুসলমানদিগের আগমন ও সীতারামের দিল্লী-গমন বার্তায় কাতর হইয়া রমা যখন "রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?—এখন যদি মুসলমান আসে ত, কে পুরী রক্ষা করিবে? (মুসলমানেরা) ছেলেপিলের উপর দয়া করিবে না কি?" প্রভৃতি কথা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, তখন নন্দা অবিচলিত ভাবে, তাঁহাকে আশ্বাস ও অভয় প্রদান করিলেন, শেষে কোন গতিকে "অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িলেন।" এরূপ স্থিরবুদ্ধি রমণী ব্যতিরেকে সংসার চলা অসাধ্য।

একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার চিত্তের অপ্রশস্ততা দেখিতে পাই;—সেটী সপত্নী—দ্বেষ। রমা-নন্দা—উভয়েরই মনে সপত্নী-দ্বেষ সমভাবে

প্রবল। মুসলমানের হস্তে মৃত্যু-ভয়ে রমা যখন হতাশ্বাস, তাঁহার মৃত্যু হইলে "ছেলেকে কে মানুষ করিবে?" ভাবিয়া যখন ব্যাকুল, তখন তাঁহার মনে এইরূপ যুক্তিতর্ক উদয় হইয়াছিল—সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে? ভাল কথা আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি রাখিবে? সেও ত পীর নয়। তা আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে।" সতীনের মৃত্যুকামনা নন্দার অন্তরেও তাদৃশ প্রবল। তোরাব খাঁর আগমন-বার্তায় রমা যখন "ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন," তখন নন্দার মনের ভাব,—"সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি।" পুত্রবাৎসল্যের দারুণ চিন্তায় রমা নন্দার নিকট আত্মীয়তা করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন; স্বামীর আজ্ঞা-পালন-অনুরোধে নন্দা "আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।" একদিকে পুত্রস্নেহ, অপর দিকে পতিভক্তি; নচেৎ উভয়েই উভয়ের বিনাশকামী। সপত্নী-দ্বেষের এই কলুষিত ভাব ত্রেতা হইতে এই কলি পর্য্যন্ত সমভাবে সজীব রহিয়াছে। শ্রীর সহিত একত্রে বাস করিতে হয় নাই, তথাপি সপত্নীভাবের কি অনির্বচনীয় মহিমা, শ্রীর প্রতিও নন্দার সেই একটু হিংসার অস্ফুট ছায়া, একটু শ্লেষময়, ঘৃণাব্যঞ্জক, মর্ম্মভেদী টিটকারী। প্রকাশ্য রাজদরবারে রমাকে "কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে" সীতারাম যখন কুণ্ঠিত, তখন নন্দা বিলক্ষণ একটু ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, "মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?" অপর সর্বত্রই আমরা নন্দার সেই গম্ভীরতা-পূর্ণ, অবিচলিত গৃহিণীপণা দেখিতে পাই।

(৪)

তৃতীয় চিত্র শ্রীর। শ্রী গ্রন্থের নায়িকা, সংসারত্যাগিনী হইলেও সীতারামের জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা মহিষী, প্রতিভাময়ী অসামান্য রূপসী, তাঁহার হৃদয়-সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী সম্রাজ্ঞী। বস্তুত শ্রীই 'সীতারাম'-কাব্যের

অস্থি, মজ্জা, প্রাণ। তিনিই সীতারামের সহিত মুসলমানের বিবাদ বাধাইবার মূল হেতু, তিনিই মুসলমানের অত্যাচার-নিবারণের, হিন্দুরাজ্য-সংস্থাপনের মন্ত্রণা-বিষয়ে সীতারামের দীক্ষাগুরু; জ্ঞানময়ী জয়ন্তীর শিক্ষকতা-কার্যের তিনিই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কাব্যের প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত সুদৃঢ় চরিত্র-সূত্রে গ্রথিত, 'সীতারাম'-গত। শ্রীর চরিত্রে আমরা অনেক স্থলে ঘটনার সমবায় দেখিতে পাই। সামাজিক কলঙ্ক ভয়ে প্রফুল্ল শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়িতা; প্রিয়-প্রাণ-হননের কারণ-আশঙ্কায় শ্রী আপনা হইতে নির্বাসিতা। উভয়েই অতুলনীয়া প্রতিভাসম্পন্না। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের দীক্ষাগুণে কর্মযোগে যোগিনী; শ্রী জয়ন্তীর শিক্ষা-প্রসাদাৎ কর্মকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানপথানুসারিণী।

নদী-সৈকতে স্বামী-মুখে নিজ বিধি-লিপির অখণ্ডনীয় ফল শ্রুত হইয়া, জন্মগ্রহের অবস্থা-দোষে 'প্রিয়-প্রাণ-হন্ত্রী' হইবেন শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে, সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়," সীতারাম তাঁহার "চিরপ্রিয়" —এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার 'শত যোজন' দূরে থাকিবেন, স্থির করিলেন। মুহূর্তমধ্যেই তিনি সীতারামের অভিজ্ঞানস্বরূপ "সুবর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, (নৈশ) অন্ধকারে কোথায় মিশাইলেন, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।" তার পরেই পুরুষোত্তমের পথে জয়ন্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। এইখানেই প্রতিভা উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে উত্থিত হইল, মধুরে মধুর মিলিল, মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। এই স্থান হইতেই শ্রীর শিক্ষা আরম্ভ হইল, নবজীবন লাভ হইল, নিষ্কাম ধর্মের পবিত্র সত্যে পর্যবসিত হইল। শ্রী যখন সাংসারিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া জ্বালা জুড়াইবার জন্য বৈতরণীর এপারেই পাপের বোঝাটার শীঘ্র শীঘ্র "বিলি করিয়া বেলায় পার হইয়া চলিয়া" যাইতে ব্যগ্র, তখন জয়ন্তী দুই চারি পাকা কথায় তাঁহার মন টলাইয়া আপন পথের সঙ্গিনী করিলেন, গৃহিণী-বেশ ছাড়াইয়া রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, রক্তচন্দন পরাইয়া এক অপূর্ব রূপসী ভৈরবী

সাজাইলেন। ক্রমে জয়ন্তীর সংঘর্ষে শ্রীর প্রতিভা সমধিক তেজস্বিনী হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে নির্দ্বন্দ্ব হইলেন, শুভাশুভ ভগবানে সমর্পণ করিতে শিখিলেন, স্বামী ভুলিয়া "স্বামীর স্বামী"কে চিনিলেন, জ্ঞানের সুন্দর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিনে এ কার্য হয় নাই, এক কথায় সন্দেহ ঘুচে নাই, এক মুহূর্তে মনের ময়লা কাটে নাই, এবং ভৈরবী সাজেই সন্ন্যাস সাধন হয় নাই। কত আবর্তন-বিবর্তন ঘটিয়াছিল, কত পাক-চক্রে পড়িতে হইয়াছিল, কত শিক্ষা-দীক্ষা ঝাড়ফট করা গিয়াছিল, তবে "খাঁটী" দাঁড়াইয়াছিল, চিত্তবৃত্তি অন্ধকার হইতে আলোকে পরিণত হইয়াছিল।

জয়ন্তী শ্রীর দীক্ষাগুরু হইলেও এক বিষয়ে তাঁহাকে শ্রীর নিকট ঠকিতে হইয়াছিল। শ্রীর আত্মজীবনী শুনিয়া ঈষৎ ছলছল নেত্রে জয়ন্তী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভালবাসিলে কিসে?" শ্রী তখন জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয়দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?" প্রত্যুত্তরে জয়ন্তী কহিলেন, "আমি ঈশ্বরকে রাত্রিদিন মনে মনে ভাবি।" পতিগতপ্রাণা শ্রী তখন অকপটে কহিলেন, "যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি-দিন ভাবিয়াছিলাম। * * * কেবল মনে মনে দেবতা ভাবিয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া দিয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তার অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া দিন-ভোর কাজ-কর্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলংকার বিক্রয় করিয়া, ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি।"—এই বিশ্ব সেই হিন্দুর প্রতিমা-পূজা, তেত্রিশকোটী

দেবতা,—ভূচর-খেচর-জলচর, তরুগুল্ম-লতাপত্র-পুষ্পফল, নদ-নদী-সমুদ্র, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র, জল-বায়ু-আকাশ সমস্তই তাঁহার আরাধ্য। তিনি মৃন্ময় শিবলিঙ্গে জলসেক করেন না, শালগ্রাম শিলাকে 'ভোগ' দেন না, জলপূর্ণ কলসে মালা চড়ান না; তিনি সর্বত্র সকল সময়ে সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত পরম পুরুষের—সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দের আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া স্নেহ-বাৎসল্যের আবেগে, প্রেম-ভক্তির উত্তেজনায়, কখন ছানা-ননি খাওয়ান, কখন ফুল-বিল্বপত্র দেন, কখন জল-চন্দন চড়ান। পরম জ্ঞানী জয়ন্তীকে একবার এ যুক্তিতে, এই বিশ্বাসে নির্বাক হইতে হইয়াছিল। হিন্দুর এই বিশ্বোদর দেবভাব যে ঘুচাইতে চায়, তাঁহার ন্যায় পরম শত্রু আর নাই।

(৫)

কাব্যের শেষ ও সর্বোচ্চ চিত্র—জয়ন্তী। আমরা সে চিত্র সীতারামের সৌধ-শিখরে গৃহের সুষমা বৃদ্ধি করিতে দেখি নাই,—বনে বনে, পথে পথে, গিরিগুহায়, দেশ-বিদেশে সে চিত্রের সমুজ্জ্বল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক লোকের হৃদয়-ফলকে সে চিত্র অঙ্কিত হউক, হৃদয়ের শোভা হইবে, চিত্রের জ্যোতি-ছটায় চিত্রাধার আলোকিত হইবে। বৈতরণী-তীরে ভৈরবীবেশে জয়ন্তীর সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ। তৎপূর্বে সুবর্ণরেখা-তীরে তাঁহার সহিত শ্রীর আর একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে আমাদিগের অজ্ঞাতে। ভৈরবী, এখনও ভাদ্রমাসের ভরা 'গাঙ'—এখনও তাঁর "তুফানের বেলা হয় নাই।" ভৈরবী অতুলনীয়া সুন্দরী;—নন্দা অপেক্ষা রমা সুন্দরী, রমা অপেক্ষা শ্রী সুন্দরী; ভৈরবী শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ, 'ফানুষের' অভ্যন্তরস্থ আলোকবৎ, সে সৌন্দর্যের জ্যোতি উছলিয়া উঠিতেছিল, ভৈরবীর ফুল্লাধরে মধুর হাসি যেন মেঘাবৃত আকাশে অনুক্ষণ বিজলী খেলিতেছিল। কিন্তু কেবল রূপজ সৌন্দর্য নহে,—আভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যেও তিনি সর্বাপেক্ষা গরীয়সী। জ্ঞান-প্রদীপ্ত চিত্রের সেই ভাস্কর-প্রভাবান্বিতা,

দীপ্তিময়ী মূর্তি যে দেখিয়াছে, সেই চিনিয়াছে,—তিনি কৈলাসচারিণী জয়ন্তী, বৈকুণ্ঠ-বিহারিণী লীলাময়ী মূর্তিমতী দেবী। জয়ন্তীর অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী ভৈরবী মূর্তি দর্শনে বিধর্মী মুসলমানের ভীষণ সৈন্য-সাগরও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষাগুণে সনাতন ধর্মের পুনঃ-'প্রচার' হইল, শ্রীর সঙ্গে সমগ্র হিন্দুর 'নবজীবন' লাভ হইল।

'সীতারাম'এর কবি জয়ন্তীকে বেশী কাজ করান নাই, তাঁহার দ্বারা বেশী কথা বলান নাই। অথচ তাঁহার কথায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্র সীতারামে তাহা নাই—নন্দা, রমা, শ্রী—কাহাতেও তাহা নাই। ক্ষুদ্রকীটের জীব-লীলায় সর্বলোক-বিধাতা ভগবানের বিশ্ব-সৃষ্টিকাণ্ড লক্ষিত হয়; কাব্যের এক ছত্রে কবির শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, মনস্তত্ত্ব সমস্ত প্রকাশ পায়।

১। "তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিতেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না।"

২। "যে অনন্ত সুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মনস্থির করিয়াছি, তাহা ছাড়া অপর কিছুই চিত্তে যেন স্থান না পায়।"

৩। "মনোবৃত্তিসকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই?"

৪। "আর এগার জন (শত্রু) আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস করিয়াছ, দেখিতেছি। যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি। একে কি বলে সন্ন্যাস?"

৫। "রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?"

৬। "তুমি ঈশ্বরে কর্ম সংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযত-চিত্ত হইতে পার, তাই কর।"

৭। "অনুষ্ঠেয় যে কর্ম, আসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্বক তাহার

নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না। স্বামী-সেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে ?"

৮। "যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামী সেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্মানুষ্ঠানে কর্ম ত্যাগ ঘটে না।"

৯। "আমরা সন্ন্যাসিনী—জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

১০। "যদি শোকে কাতর হইবে তবে কেন সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে ?" 'সীতারাম' কাব্যে জয়ন্তী কথিত এই দশ শিক্ষা; এই শিক্ষার উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত, ইহাতেই উহার অস্তিত্ব।

(নব্যভারত, সাল ১২৯৪)

গিরিজায়া

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

বিরহদুঃখকাতরা, মর্মপীড়িতা রাজরাণী মৃণালিনীর পার্শ্বে মিলন-লালসাবতী, আনন্দময়ী ভিখারিণী গিরিজায়া বড়ই সুন্দর শোভা পাইতেছে, যেন স্থির, অচঞ্চল, অগাধ সমুদ্রের পার্শ্বে, একটি মধুরনাদিনী লীলাময়ী তরঙ্গিনী বিরাজ করিতেছে। সমুদ্রে করাল কাদম্বিনীর ছায়া পড়িয়াছে, দুই একবার প্রবল বায়ুতে তাহার তরঙ্গমালা গভীর গর্জন করিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু যেন সমুদ্র 'আপনার বলে আপনি স্থির'—আর তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সুখ-মলয়-হিল্লোলে রঙ্গময়ী হইয়া, তরঙ্গ-ভঙ্গীতে দিগ্বিভাসিত সূর্যকিরণ প্রতিবিম্বিত করিয়া, হাসিতে হাসিতে বহিয়া যাইতেছে। দৃশ্য সুন্দর। কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার পার্শ্বে মনোরমার চিত্রটিও কল্পনা করিয়া লইতে হয়। মৃণালিনী-সমুদ্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গ-মালার গভীর গর্জন শ্রুতিপথে সমাগত হয়, তাহার ইতস্ততঃ সঞ্চালন নেত্র-পথের স্পষ্ট পথিক হয়, তাহার অন্তরস্থ করাল ছায়া সূর্যকিরণে ক্ষণে ক্ষণে অপসারিত হয়, কিন্তু মনোরমা-সমুদ্রে স্থূল-শ্রুতিগোচর তরঙ্গ-গর্জন নাই, স্থূল-দৃষ্টি-গোচর বীচিবিক্ষেপ নাই, তদন্তরস্থ করাল ছায়ায় প্রখর সূর্যকিরণ পতিত হইয়াও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না; তাহার উপরে সুন্দর আলোক, অভ্যন্তরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। গিরিজায়া প্রফুল্লতার সুন্দর প্রতিবিম্ব, মনোরমা বিষাদের করাল ছায়া; আর মৃণালিনী উভয়ের সুন্দর মিশ্রণ। একদিকে মনোরমা, অপরদিকে গিরিজায়া, মধ্যে গ্রন্থাধিকারিণী মৃণালিনী! মানবচরিত্রের কি সুন্দর স্তর-সমাবেশ, কাব্যের কি অপূর্ব সৃষ্টি!

গিরিজায়ার সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ লক্ষ্মণাবতীতে হৃষীকেশ শর্মার বাড়ী। সে সাক্ষাৎটি এইরূপে সঙ্ঘটিত হয়।

আমরা একদিন হৃষীকেশ শর্মার অন্তঃপুরে মৃণালিনী ও মণিমালিনী-লিখিত আলেখ্যদর্শনে ও তাহাদের কথোপকথন-শ্রবণে নিবিষ্টচিত্ত আছি, এরূপ সময় দূর হইতে শুনিতে পাইলাম—কে গাইতেছে—

মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি রে!

সে স্বর অপূর্ব—সে সঙ্গীত অপূর্ব। সেই মৃণালিনী ও মণিমালিনীর কার্যের ও কথোপকথনের সঙ্গে সে লয়ও অপূর্ব! আমরা শুনিতে লাগিলাম—

'কহলো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাগিনী রে।'

সে গায়কের সহিত এক প্রকার পরিচয় হইতেই ভালবাসা হইয়া গেল। কবি অতি সুন্দর কৌশলে, অতি সুন্দর সময়ে, গিরিজায়াকে সঙ্গীতস্বরে আমাদিগের নিকট ভাসাইয়া আনিলেন। গিরিজায়ার প্রথম পরিচয়ে শেষ পরিচয়ের ইঙ্গিত নাই কি?

যাহা হউক, এ পরিচয় লাভ করিয়া আমরা উৎসাহের সহিত তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় রহিলাম। ক্ষণপরে দেখিতে পাইলাম, দূর হইতে গায়িকা যেন ঠিক খুঁজিতে খুঁজিতে, কি শুনিতে শুনিতে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে গান শুনিয়া পূর্বেই তাহার বয়স অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম, পূর্বেই তাহার চক্ষু দুইটির চিত্র মানস-চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলাম, সমস্ত আকারেরও যেন একটা অস্পষ্ট ধারণা মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। যাহা বাকি ছিল, তাহাও এখন দেখিলাম—দেখিলাম, সম্মুখে একটি খর্বাকৃতি, ষোড়শী, প্রফুল্লা, স্মিতনেত্রা, তিলকধারিণী ভিখারিণীর মেয়ে। মুখে গাইতেছে—

'মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি রে!'

লোকের কণ্ঠস্বরেও তাহার চিত্ত-চরিত্রের ছবি থাকে।

বেঁটে কালো ভিখারিণীকে দেখিয়াই যেন তাহাকে বড় দুষ্ট বলিয়া বোধ হইল। বস্তুত কবির সেরূপ বর্ণনা আমাদিগের নেত্রোপরি যেমন একটি সজীব মূর্তি আনিয়া স্থাপন করে, সেইরূপ তাহার চিত্ত-চরিত্রও যেন আমাদিগকে ইঙ্গিতে ব্যাখ্যা করিয়া দেয়।

দ্বিতীয় পরিচয় শেষ হইল। তৃতীয় পরিচয়ে তাহার নাম, ধাম, বাসা সমস্ত জানিতে পারিলাম। এখন এই পরিচিতা রমণীটির চরিত্র পর্য্যালোচনা করা যাউক।

গিরিজায়া বড়ই প্রগল্‌ভা। ভিখারিণীর মেয়ে কিছু প্রগল্‌ভা হইবারই সম্ভব! ভিক্ষার উপর যাহার জীবিকা নির্ভর করে, ভিক্ষার জন্য যাহাকে দশ দ্বারে বেড়াইতে হয়, কথা বলিতে না পারিলে তাহার চলিবে কেন? কাজেই গিরিজায়া বিশেষ বাক্‌পটু।

গিরিজায়া চিরানন্দময়ী, চঞ্চলপ্রকৃতি। যাহাকে ইংরাজীতে gay and light-hearted বলে, গিরিজায়া ঠিক তাহাই; ভিখারিণীর মেয়ে, হয়—প্রলুব্ধা, বিষণ্ণচিত্তা ও গম্ভীরা হয়, নইলে—প্রায়ই চিন্তাশূন্য, প্রফুল্লচিত্ত ও চঞ্চলপ্রকৃতির হইয়া থাকে। তাহার কিছু নাই—মাতা, পিতা, বন্ধু, বান্ধব, দাঁড়াইবার স্থান, উচ্চ আশা—কিছুই নাই—তাই গিরিজায়া সদানন্দ, চিন্তাশূন্য, চঞ্চলপ্রকৃতি। মনোরমার অবস্থার সঙ্গে গিরিজায়ার অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদিগের উপরি-উক্ত কথার দুই দিকই দেখিতে পাওয়া যায়। মনোরমারও কেহই নাই কিন্তু মনোরমা সংসারী মেয়ে। একদিন তাহার সকলই ছিল—এখনও তাহার পশুপতি আছে। তাই, মনোরমা গিরিজায়ার ঠিক অপরপৃষ্ঠ নহে সত্য—মনোরমা প্রলুব্ধা নহে সত্য, তবু মনোরমা গিরিজায়ার অপরপৃষ্ঠ বটে। একটি সুখের, অপরটি দুঃখের চিত্র। গিরিজায়া ভিখারিণীর মেয়ে, তাই গিরিজায়া নিশ্চিন্ত, সুতরাং পরমসুখী। মনোরমা সংসারীর কন্যা, আশৈশব চিন্তাভার-প্রপীড়িতা, সুতরাং পরমদুঃখী। একদিকে, চিন্তার মূর্ত্তি মনোরমা বিষণ্ণবদনে সেই বাপীকূলে উপবেশন করিয়া আমাদিগের মর্ম্মস্থল আলোড়িত করিতেছে—অপরদিকে, চিন্তাশূন্য গিরিজায়া প্রফুল্লবদনে বায়ুর ন্যায় সৌরভ বিতরণ করিয়া চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কি সুন্দর যুগল চরিত্র!

গিরিজায়া অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। তাহার বুদ্ধি দেখিলে, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—তাহার বাক্য-কৌশল দেখিলে, বিমলা ও কমলমণিকে মনে পড়ে। ফলতঃ গিরিজায়াই যদি তদ্রূপ উচ্চঘরে জন্মিয়া শ্রীশচন্দ্রের

ন্যায় পুরুষের পত্নী হইতে পারিত, তাহা হইলে গিরিজায়াতে ও কমলমণিতে কোন প্রভেদ থাকিত না।

গিরিজায়া অতি সুরসিকা। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। গ্রন্থ শেষ হইলে কবির রহস্যোদ্ভাবিনী শক্তির স্থল সমালোচিত হইবে, তখন গিরিজায়ার এ গুণটি পর্যালোচনা করিব। এখন এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, গিরিজায়ার এ রসিকতা তাহার অন্তরের সহিত জড়িত। লোকের সুখে, ক্রোধে, ঘৃণায় গিরিজায়া কখনও রস-ছাড়া হয় নাই। এমন কি, প্রথম দৃষ্টিতে গিরিজায়ার এই গুণটিই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে পাঠকের চক্ষে পড়ে।

যাহার আপনার কেহ নাই, হয়, সে পরের জন্য সর্বদা অস্থির, পরকেই সে আপনার করিয়া লয়, নইলে সে ঘোর স্বার্থপর, পরসুখদ্বেষী ও আত্মসুখান্বেষী হইয়া পড়ে। গিরিজায়া ভিখারিণী—তাহার কেহ ছিল না, তাই সে যেখানে যখন থাকিত, সেইখানকার লোককেই তাহার আপনার করিয়া লইত! দুই দিনে হেমচন্দ্র তাহার আপনার হইতে পারিয়াছিলেন, দুই দিনে রত্নময়ী তাহার আপনার হইয়া উঠিল। আর মৃণালিনী?—সাধ করিয়া গিরিজায়া মৃণালিনীর দাসী হইয়া পড়িল। মৃণালিনীর জন্য সে কি না করিয়াছে? এমন সুন্দর পরময় জীবন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সত্য বটে, গিরিজায়ার দিগ্বিজয়-প্রেমও ইহার মধ্যে অলক্ষ্যে কিছু কার্য করিয়াছিল, কিন্তু তবু গিরিজায়ার মৃণালিনী-সেবা অতুলনীয়া। গিরিজায়ার সমস্ত কার্যই প্রায় মৃণালিনীর জন্য। চিরদিনই গিরিজায়া মৃণালিনীর স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী সহচারিণী।

অত্যাচারীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও বিরাগ, অত্যাচারিতের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি স্বাধীন সৎপ্রকৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। গিরিজায়াকেও দেখ, যখন ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে আক্রমণ করিল, গিরিজায়া নির্ভয়ে পরিণাম-বিপদ আশঙ্কা না করিয়া তাহার কিরূপ দুর্দশা করিল। রহস্যের কথা এই যে গিরিজায়া সে সময়েও রস ছাড়া নহে। রসিকতা গিরিজায়ার যে বাইরের জিনিস নহে—অন্তরের

জিনিস! গিরিজায়া অন্যকে হাসাইবার জন্য জোর করিয়া রসিকতা করিত না—তাহা যেন গিরিজায়ার সঙ্গে অবিভাজ্যরূপে কে মিশাইয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশ যখন মৃণালিনীকে বলিল—

"ভাল, ভাল, ধন্য হইলাম। ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরি! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ।"

তখন গিরিজায়া ক্রোধে অধীর হইয়াও তৎকালীন রসোক্তি ভুলিল না। বলিল, "আর আমি তোমার অর্জুন।"

শুদ্ধ ব্যোমকেশের প্রতিই কি তাহার এরূপ ঘৃণা দেখা গিয়াছে? তাহা নয়। ব্যোমকেশের প্রতি অতি সাধারণ লোকেরও ঘৃণা হইতে পারে। যে হেমচন্দ্রের সহিত তাহার এত সদ্ভাব, যে হেমচন্দ্রের জন্য সে একদিন বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া মৃণালিনীকে অন্বেষণ করিয়াছে, সেই হেমচন্দ্র যখন অকারণে—অন্ততঃ গিরিজায়ার বিবেচনায় অকারণে—মৃণালিনীর প্রতি অনুচিত কঠোর ব্যবহার করিলেন—গিরিজায়ার সরল ও সাধু অন্তর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। আমরা সে স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"গিরি। কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল—তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?"

"মৃ। গিরিজায়া—হেমচন্দ্রের সহিত এ জন্মে আমার সম্বন্ধ ঘুচিবে না। আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম, আজিও তাঁহার দাসী।"

"গিরিজায়ার বড় রাগ হইল— সে উঠিয়া বসিল। বলিল, 'কি ঠাকুরাণি! তুমি এখনও বল তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই'।"

"মৃ। গিরিজায়া—যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানান্তরে তাঁহার নিন্দা করিও। হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই—আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব? তিনি রাজপুত্র—আমার স্বামী, তাঁহাকে পাষণ্ড বলিও না।"

"গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুযত্নরচিত পর্ণশয্যা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল—

'পাষণ্ড বলিব না—একবার বলিব' (বলিয়াই কতকগুলি শয্যা-বিন্যাসের পল্লব সদর্পে জলে ফেলিয়া দিল) 'একবার বলিব—দশবার বলিব' (আবার পল্লব-বিক্ষেপ)—'শতবার বলিব' (পল্লব-প্রক্ষেপ) 'শতবার বলিব' (পল্লব-প্রক্ষেপ) 'শতবার বলিব—হাজার বার বলিব।' এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল 'পাষণ্ড বলিব না? কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন?' "

এই স্থলে গিরিজায়ার কোপটুকু বড় সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রকারে পল্লব-বিক্ষেপ গিরিজায়ার ক্রোধের একটী অতি সুন্দর প্রদর্শন। কবি অতি ক্ষুদ্র কার্য দ্বারা সময়ে সময়ে দুই একটি চরিত্রের অতি কষ্ট-বাচ্য ভাবও সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই স্থলে তদ্রূপ কোন কষ্ট-প্রকাশ্য ভাব পরিব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও পল্লব-বিক্ষেপটি গিরিজায়ার ক্রোধ-প্রদর্শনকে যেন আমাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে।

গিরিজায়ার এই ক্রোধ তৎপ্রতি হেমচন্দ্রের অত্যাচারের জন্য হয় নাই। উপরি-উক্ত কথোপকথনের দুইটি বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত কথায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মৃণালিনীকে অত্যন্ত ভালবাসিত বলিয়াও হেমচন্দ্রের প্রতি গিরিজায়ার এ ক্রোধ হয় নাই—হেমচন্দ্রকেও সে পূর্বে ভালবাসিত। তাহার ক্রোধের প্রধান কারণ হেমচন্দ্রের অবিচারে অত্যাচার। গিরিজায়া সরল ও স্বাধীন-প্রকৃতি—ইহা সহিতে অসমর্থ।

আর একদিন যখন হেমচন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন—

"দূর হও, নচেৎ বেত্রাঘাত করিব!"

গিরিজায়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল—

"বীরপুরুষ বটে। এই রকম বীরত্ব প্রকাশ করিতে বুঝি নদীয়ায় এসেছ? কিন্তু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বসিয়াও দেখাইতে পারিতে। মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরীব দুঃখীর মেয়ে দেখিলে বেত মারিতে।"

কথাগুলি যেন লুন-মাখা। নীচ কার্যে গিরিজায়ার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। হেমচন্দ্র তাহাকে বেত্রাঘাত করিলে, তাহার কষ্ট হইবে, এ ভাবনা তখন গিরিজায়ার মনে হয় নাই। গিরিজায়া হেমচন্দ্রের তদ্রূপ মানসিক অবনতি দেখিয়া তৎপ্রতি ঘৃণাপরায়ণ হইয়াছিল। সেই মনোভাবের সহিত তাহার বাক্‌পটুতা মিশ্রিত হইয়া উপরি-উক্ত ঘোর-বিদ্রূপাত্মক, মর্ম্মস্পর্শী বাক্যগুলি বহির্গত করাইয়াছিল। গিরিজায়া এখানে হেমচন্দ্রের প্রতি কোপ প্রকাশ করে নাই—ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল। তই সো ধীরে ধীরে কথাগুলি বলিল। কবি এই ঘৃণা-ভাবটুকু বিশেষ পরিব্যক্ত করিবার জন্য উক্ত কথাটি বসাইয়া দিয়াছেন। এখানে ঘৃণা ক্রোধ হইতে এক স্তর উপরে। গিরিজায়া প্রেমিকা। গিরিজায়া সবে ষোল বছরে পদার্পণ করিয়াছে, এ বয়সে সাধারণতঃ প্রেমবৃত্তিই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া পড়ে। কবি এ ভাবটিও গিরিজায়াতে বড় সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। তাহার স্থির প্রেম লক্ষ্য বড় একটা প্রকাশ করিয়া দেখান নাই, তাহার মুখে এ প্রেম সম্বন্ধে নিজের মনোভাব খুলিয়া বলান নাই। তাহার ভাবভঙ্গী, তাহার কথাবার্তা, তাহার রসোল্লাস, তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতিতে এ বৃত্তিটি বড়ই সুন্দর করিয়া ফুটাইয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

গিরিজায়া যে সাধ করিয়া মৃণালিনীর দাসী হইল, সে অনেকটা এই প্রেমবৃত্তির জন্য। বিশুদ্ধ প্রেমিকের ধর্মই এই যে, সে সর্বত্রই প্রেমের উপাসক হইয়া পড়িবে। গিরিজায়ার হৃদয়ে সবে প্রেমের উন্মেষ হইতেছিল। সে হেমচন্দ্রের মৃণালিনী-অন্বেষণে আগ্রহ করিয়া সহায়তা করিল। কেন না, সে এখানে সেই স্বীয় অন্তরস্থ ঈষদুন্মেষিত প্রেম-বিকাশের কার্য দেখিতে পাইল। মৃণালিনীর বিকশিত প্রেম গিরিজায়া অন্তরে অন্তরে পূজা করিত।

শুদ্ধ হেমচন্দ্র—মৃণালিনীর মিলন-সহায় হইয়াছিল বলিয়াই কি আমরা এইরূপ বলিলাম? তাহা নহে। আমরা আর কিরূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা নিম্নে বলিতেছি।

যে দিন আমরা গিরিজায়াকে প্রথম দেখি, তাহার আকৃতি ও সঙ্গীতে আমরা এই ভাবের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলাম। সে সঙ্গীতের স্রোত বহিয়া যেন এ ভাবটি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল, সে চোখ-মুখের ভিতর দিয়া যেন এ ভাবটি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল, সে চোখ-মুখের ভিতর দিয়া যেন এ ভাবটি বাহিরে ফুটিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন শুধু সন্দেহ হইয়াছিল। তার পরে গিরিজায়া যখন মৃণালিনীর গান শিখিতে গিয়া বলিল—"চক্ষের জলটুকু শুদ্ধ কি শিখিব?" তখন সন্দেহের মাত্রা বাড়িল। তারপরে যখন গিরিজায়া মৃণালিনীকে বলিল—

'বিশ্বাস হইবে না কেন? কিন্তু সে স্থান (যমালয়) ত আছেই, যখন ইচ্ছা তখনই যাইতে পারিবে। এখন আর একস্থানে যাও না?'

মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা?' গিরিজায়া তদুত্তরে বলিল, 'নবদ্বীপ'। তখন সন্দেহ প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হইল। পরিশেষে যখন যাত্রাকালে গিরিজায়া গাহিল—

"মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে"

তখন সন্দেহ রহিল না। এ গান প্রেমিক ভিন্ন অন্যে গাহিতে অসমর্থ। এ গানের প্রতি কথায়, প্রতি স্বরকম্পনে যেন বলিতেছে—'দেখ দেখ, গিরিজায়ার অন্তর দেখ—দেখ দেখ, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুন্দর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখ!" গান শুনিয়া দিগ্বিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার অনুরাগের কথাও এই প্রথম মনে হইল।

তারপরে আমরা অনুসন্ধিৎসু হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গিরিজায়ার কথাও কার্য পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। বিশ্বাস প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইল। একদিন শুনি, গিরিজায়া ও মৃণালিনী নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন করিতেছে

"গিরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কহিল, 'তবে কি নদীয়ায় তোমার সঙ্গে হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইবে না' ?"

"মৃ। না।"

"গি। তবে যাইতেছ কেন ?"

"মৃ। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।"

"গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না। বলিল, তবে আমি গীত গাই—

'চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ-রতন
দিবনা তোমারে নাথ মিছার যৌবন।
এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥' "

এই যে—"গিরিজায়ার মুখে হাসি ধরিল না"—ইহাতে সমস্ত গিরিজায়াকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এইখানে প্রেমভক্ত, প্রেমিক গিরিজায়া, প্রফুল্ল গিরিজায়া, চিন্তাশূন্য গিরিজায়া, চপলা গিরিজায়া, সবই দেখিতে পাই। পরের গানেই কি গিরিজায়ার অন্তর কম ব্যক্ত হইয়াছে!

গিরিজায়া প্রণয়ের কথা শুনিতে, প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিতে বড়ই কৌতূহলী। যখন মৃণালিনী তাঁহার পূর্ব পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, গিরিজায়া বলিল—

"ঠাকুরাণি! সকল কথা বল না ? আমার শুনিয়া বড় তৃপ্তি হবে।" এই কৌতূহলের সঙ্গে, রহস্যপ্রিয়তা যোগ করিয়া লইলে, হেমচন্দ্রের সহিত গিরিজায়ার প্রথম দিনকার ব্যবহার বুঝা যাইবে। গিরিজায়া মৃণালিনীর সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, হেমচন্দ্র তাহাই জানিবার জন্য প্রায় উন্মত্তবৎ—কিন্তু তবু গিরিজায়া সহসা সে সংবাদ বলিতেছে না।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে—গিরিজায়া ? আশা কি মিটিল ?"

"গি। কার আশা? আপনারা, না আমার?"

"হে। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমার মিটিবে।"

"গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে? লোকে বলে রাজা রাজড়ার আশা কিছুতেই মিটে না।"

"হে। আমার অতি সামান্য আশা।"

"গি। যদি কখন মৃণালিনীর সাক্ষাৎ পাই, তবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গিরিজায়ার এইরূপ ব্যবহার ও ছলনা কেবলমাত্র রহস্যপ্রিয়তা হইতে উদ্ভূত নহে। মৃণালিনী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের অন্তঃকরণ—প্রণয়-পাত্রের জন্য প্রেমিকের উন্মত্ততা দেখিবার অভিলাষই ইহার প্রধান কারণ। গিরিজায়া জানিতেছে যে হেমচন্দ্রের কষ্ট সে ইচ্ছামাত্রই দূর করিতে পারিবে, সুতরাং সে কষ্টের প্রতি সহানুভূতি, গিরিজায়ার রহস্যপ্রিয়তা ও প্রেমোন্মাদ দেখিবার ইচ্ছা নিবারিত রাখিতে পারিল না।

কিন্তু যেখানে আবার প্রকৃত সমবেদনা আবশ্যক, সেখানে কোন প্রকার ঘটনাই গিরিজায়াকে অন্যভাবাপন্ন করিতে পারে না।

যেদিন মৃণালিনীর লিপিখানি হেমচন্দ্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, গিরিজায়া বাটী আসিয়া গৃহের অনতিদূরে এক সোপান-বিশিষ্ট পুষ্করিণীর সোপানোপরি উপবেশন করিয়া গাইতে লাগিল—

"পরাণ না গেলো।
যো দিন দেখু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে
ওঁহি পর পিয় সই কাহে কালা নীরে,
জীবন না গেলো?
ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি,
তখনই না গেলো?"—ইত্যাদি

সে রাত্রিটি শারদীয় পূর্ণিমার রাত্রি—গিরিজায়ার মনের মত উল্লাস ও চাপল্য-ব্যঞ্জক। কিন্তু গিরিজায়ার ঐরূপ সঙ্গীতে যেন জ্যোৎস্নারও সে ভাব ফিরিয়া গেল। সেই পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীও গিরিজায়ার সঙ্গীতে বশ হইয়া যেন মৃণালিনীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহাকেই প্রকৃত মহানুভাবকতা বলে।

গিরিজায়ার প্রেমোন্মেষ আমরা কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলাম পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তখন আমরা গিরিজায়ার সে প্রেমের লক্ষ্য দেখিতে পাই নাই। গিরিজায়াও তখন ইহার স্থির লক্ষ্য দেখিতে পাইয়াছিল কি না জানি না। কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম দিগ্বিজয়ই এই ভিখারিণীর প্রণয়পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন একে একে সব কথা মনে হইতে লাগিল, একে একে সব কথা বুঝিতে লাগিলাম, ও কবির কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। দিগ্বিজয়ের প্রতি গিরিজায়ার এই প্রচ্ছন্ন অনুরাগ বড়ই সুন্দর।

একজনের প্রতি অপরের ভালবাসা কেন জন্মে, তাহার সম্পূর্ণ কারণ কিছু নির্দেশ করা যায় না। তবে, অবস্থাধীন দুই একটি কথা বলা যায় বটে। গিরিজায়া দিগ্বিজয়ে কেন অনুরাগিনী হইয়াছিল, আমরা তাহার একেবারে সঠিক ও সম্পূর্ণ কারণ বলিতে পারি না সত্য, কিন্তু দুই একটি কথা, বোধ হয়, বলা যায়। সে কথাগুলি এই—দিগ্বিজয় হেমচন্দ্রের পরিচারক—গিরিজায়া হেমচন্দ্রের সৌখিন (honorary) পরিচারিকা। এই এক প্রভুর কার্য করিতে গিয়া উভয়ের একটা তুল্য সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। গিরিজায়ার তখন 'প্রথম বয়স'—দিগ্বিজয়ও অবিবাহিত যুবক। তারপরে রসালাপেও দিগ্বিজয় গিরিজায়ার দুই একটি কথার উত্তর দিতে সমর্থ। এরূপ স্থলে গিরিজায়ার দিগ্বিজয়ের প্রতি অনুরাগ অসম্ভব নহে। গিরিজায়া এই অনুরাগের বীজ অন্তরে রোপিত করিয়া, যতই মৃণালিনীর আদর্শ প্রণয় দেখিতে লাগিল, ততই সে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে লাগিল। ততই সেই পূর্বলক্ষ্য দিগ্বিজয় গিরিজায়ার প্রগাঢ় প্রণয়ের পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। মৃণালিনী যখন হেমচন্দ্রকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ যাত্রা

করেন, গিরিজায়াও দিগ্বিজয়কে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। মৃণালিনী সেই সময়ে যখন বলিয়াছিলেন, "তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি"—তখন যে গিরিজায়া মনের মত হাসিয়া গাহিতেছিল—"চরণতলে দিনু" ইত্যাদি, তাহা এই দিগ্বিজয়ের প্রতি প্রণয়টি মনে ছিল বলিয়া মনের মত কথা হইবার জন্য। ভিতরে এইরূপ কিছু না থাকিলে কি প্রেমের কথা ভাল লাগে ?

সুরসিকা ভিখারিণীর এই প্রেমপ্রকাশ কবি কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখিতেছি।

"উপবনগৃহে আর একস্থানে আর একটা কাণ্ড হইতেছিল, দিগ্বিজয় প্রভুর আজ্ঞামত রাত্রিজাগরণ করিয়া গৃহরক্ষা করিতেছিল। মৃণালিনীকে লইয়া যখন হেমচন্দ্র আইসেন, তখন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাহার নিকট অপরিচিতা ছিলেন না। যে কারণে পরিচিতা ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে দেখিয়া দিগ্বিজয় কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা নাই; কি করে। ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল দেখিয়া দিগ্বিজয় ভাবিল, 'বুঝিয়াছি ইহারা দুইজন গৌড় হইতে আমাদিগের দুই জনকে দেখিতে আসিয়াছে। ঠাকুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছেন, আর এ ছুঁড়ি আমাকে দেখিতে আসিয়াছে, সন্দেহ নাই।' এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় একবার আপনার গোঁপ দাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল 'না হবে কেন ?" আবার ভাবিল, "এ ছুঁড়ি কিন্তু বড় নষ্ট, একদিনের তরে কই আমাকে সে ভাল কথা বলে নাই, কেবল আমাকে গালিই দেয়, তবে ও আমাকে দেখিতে আসিবে তাহার সম্ভাবনা কি ? যাহা হউক একটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া একটু শুই, দেখি মাগি আমাকে খুঁজিয়া লয় কি না ?' ইহা ভাবিয়া দিগ্বিজয় এক নিভৃত স্থানে গিয়া শয়ন করিল, গিরিজায়া তাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, 'আমিও মৃণালিনীর দাসী।

মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্রী হইলেন অথবা হইবেন, তবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম করিবার অধিকার আমারই।' এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং যে ঘরে দিগ্বিজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল—মনে বড় আনন্দ হইল, তবে ত গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি গিরিজায়া কি বলে? এই ভাবিয়া দিগ্বিজয় চক্ষু বুজিয়াই রহিল। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুমদাম করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল, 'আঃ মলো ঘরগুলায় ময়লা জমিয়া রহিয়াছে দেখ! একি—এ মিন্‌ষে চোর নাকি? মলো মিনষে, রাজার ঘরে চুরি!' এই বলিয়া আবার সম্মার্জনীর আঘাতে দিগ্বিজয়ের পিঠ কাটিয়া গেল।"

"ও গিরিজায়া আমি! আমি!"

"আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্গাড়া দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।"

"এই বলিবার পর, আবার বিরাশি সিক্কার ওজনে ঝাঁটা পড়িতে লাগিল। 'দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া! আমি দিগ্বিজয়।' "

"আবার চুরি করিতে এসে আমি দিগ্বিজয়! দিগ্বিজয় কে রে মিন্সে?" ঝাঁটার বেগ আর থামে না।"

"দিগ্বিজয় এবার সকাতরে কহিল—'গিরিজায়া আমাকে একেবারে ভুলিয়া গেলে?' "

"গিরিজায়া বলিল, 'তোর আমার সঙ্গে কোন্ পুরুষে আলাপ রে মিন্সে!" দিগ্বিজয় দেখিল নিস্তার নাই, রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল, গিরিজায়া সম্মার্জনী হস্তে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।"

গিরিজায়া একদিন হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে বলিয়াছিল—'তিনি কথার বাণিজ্য করেন—আজ গিরিজায়া, তাঁহার পরিচারিকা, কথার ভার প্রভুকে দিয়া তদ্বিপরীত ব্যবসা আরম্ভ করিল। তাহার প্রণয় কথায় প্রকাশিত না হইয়া কার্যে প্রকাশিত হইল। সুরসিকা পরিচারিকাই উপযোগী কার্যে প্রকাশিত হইল। ইহা সুন্দর নয় কি? কবি 'প্রেম

নানা প্রকার' অধ্যায়ে ইহার বৃত্তান্ত আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত শিরোনামাই আমাদিগের যত বক্তব্য সমস্ত বলিয়া লইয়াছে। অতিরিক্ত বলা নিষ্প্রয়োজন।

গিরিজায়া স্বভাবতই বুদ্ধিশালিনী। তার পরে, এই লুক্কায়িত প্রেমার্তি তাহাকে আরো খরতর করিয়া তুলিয়াছিল। সে প্রণয় সম্বন্ধে অতি গূঢ় কথাও বুঝিত। হেমচন্দ্র-মনোরমা সম্বন্ধে তাহার সেই সুবিখ্যাত স্বগতোক্তি আমাদিগের একমাত্র প্রমাণ। আমরা তাহার সমগ্র উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গিরিজায়াই প্রশ্ন করিতেছে, আবার গিরিজায়াই উত্তর দিতেছে।

"প্রশ্ন। ও লো তুই বসিয়া কে লো? উত্তর—গিরিজায়া লো। (প্র) এখানে কেন লো? (উ) মৃণালিনীর জন্যে লো। (প্র) মৃণালিনী তোর কে? (উ) কেউ না। (প্র) তবে তার জন্য তোর এত মাথা-ব্যথা কেন? (উ) আমার আর কাজ কি? বেড়িয়া বেড়িয়া কি করিব? (প্র) মৃণালিনীর জন্য এখানে কেন? (উ) এখানে তার একটি শিকলিকাটা পাখী আছে। (প্র) পাখী ধরিয়ে নিয়ে যাবি নাকি? (উ) শিকলি কেটে থাকে ত ধরিয়া কি করিব? ধরিবই বা কিরূপে? (প্র) তবে বসিয়া কেন? (উ) দেখি শিকল কেটেছে কি না। (প্র) কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে? (উ) পাখীটির জন্য মৃণালিনী প্রতিরাত্রে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে—আজ না জানি কতই কাঁদ্‌বে। যদি ভাল সম্বাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে। (প্র) আর যদি শিকল কেটে থাকে? (উ) মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাতছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়। পিঁজরা খালি রাখিও না। (প্র) মর ছুঁড়ি ভিখারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! মৃণালিনী যদি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিয়া ফেলে? (উ) ঠিক বলেছিস সই! তা সে 'পারে। বলা হবে না। (প্র) তবে এখানে বসিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া মরিস্ কেন? (উ) বড্ড মাথা ধরিয়াছে ভাই! এই যে ছুঁড়ি ঘরের ভিতর বসিয়া

আছে—এ ছুঁড়ি বোবা—নইলে এখনও কথা কয় না কেন? মেয়ে মানুষের মুখ এখনও বন্ধ?"

ক্ষণেক পরে হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা শুনিয়া গিরিজায়া পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল—

"(প্র) কি বুঝিলে? (উ) কয়েকটি লক্ষণ মাত্র। (প্র) কি কি লক্ষণ? গিরিজায়া অঙ্গুলীতে গুণিতে লাগিল,—এক—মেয়েটি সুন্দরী, আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ় থাকে? দুই—মনোরমা হেমচন্দ্রকে ভালবাসে, নহিলে এত যত্ন করিল কেন? তিন—একত্রে বাস। চার—একত্রে রাত বেড়ান। পাঁচ—চুপি চুপি কথা।"

"(প্র) মনোরমা ভালবাসে; হেমচন্দ্রের কি? (উ) বাতাস না থাকিলে কি জলে ঢেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসিব সন্দেহ নাই। (প্র) কিন্তু মৃণালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে তবে হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই। (উ) যথার্থ। কিন্তু মৃণালিনী অনুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।"

"এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তথায় একটি গীত আরম্ভ করিয়া কহিলেন

'ভিক্ষা দাও গো'।"

অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত হইল।

গিরিজায়ার এই কথোপকথন অতুলনীয় সামগ্রী। ইহাতে সমস্ত গিরিজায়ার প্রকৃতি প্রকাশিত রহিয়াছে। একথায় তাহার সঙ্গীত আছে, তাহার রসিকতা আছে, তাহার সহৃদয়তা আছে, তাহার প্রেমাভিজ্ঞতা আছে, তাহার চাঞ্চল্য আছে, তাহার উল্লাস আছে; নাই কি? এরূপ স্থল অতি অল্প কাব্যেই আছে।

আবার যেদিন গিরিজায়া গাহিয়াছিল 'পরাণ না গেলো'—সেদিন মৃণালিনী গিরিজায়ার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। গিরিজায়া তাহা দেখিল, দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল, কারণ সে বুঝিতে পারিল, "যখন মৃণালিনীর চক্ষে জল আসিয়াছে—তখন তাহার ক্লেশের কিছু সমতা হইয়াছে।"

ইহা সকলে বুঝে কি? প্রেমাভিজ্ঞতা না থাকিলে, হৃদয় না থাকিলে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না।

গিরিজায়ার এবম্বিধ ব্যুৎপত্তির সহিত একদিনকার এক ঘটনার আপাততঃ কিছু বিরোধ দেখা যায়। যেদিন হেমচন্দ্র গিরিজায়ার মুখে মৃণালিনীর বিবাহের সম্বাদ শুনিয়া "অভিমানভরে দুর্দম ক্রোধাবেগে" গিরিজায়াকে বলিয়াছিলেন "তোমার সম্বাদ শুভ," সেদিন গিরিজায়া সে কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। গিরিজায়া ভিখারিণীর মেয়ে, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু ভিখারিণীর কন্যা বলিয়া গিরিজায়া প্রেম-সম্বন্ধে ত কোনদিনও ভিখারিণী নহে। তবে সে একথা বুঝিল না কেন?

আমরা প্রথমে ইহার কোন সদুত্তর না পাইয়া, ইহা গিরিজায়া-চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া ব্যাখ্যা করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষে দেখিতে পাইলাম, গিরিজায়ার উহাই সঙ্গত কার্য হইয়াছে। কবি অতি আশ্চর্য কৌশল দ্বারা গিরিজায়ার আপাতদৃষ্ট কলঙ্কে তাহার আর একটি ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

এই অধ্যায়ে পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। উহা পড়িয়া বুঝিলাম গিরিজায়া মনোরমার প্রতি হেমচন্দ্রের অনুরাগ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। এ সিদ্ধান্ত সত্য হউক, মিথ্যা হউক, গিরিজায়ার অপরিশোধিত প্রেম জন্যই হউক, হইয়াছিল। গিরিজায়া এ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবামাত্র, হেমচন্দ্রের প্রতি অবশ্যই বিরক্ত হইয়াছিল। কারণ, হেমচন্দ্রের প্রতি মৃণালিনীর অনুরাগ সে বিলক্ষণ জানিত। হেমচন্দ্রের এ অনুরাগ তাহার নিকট ঘোর অবিচার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে এইরূপ অবিচারের প্রতি গিরিজায়ার আন্তরিক বিরক্তি জন্মিত। এই সহজ কথার অর্থ না বুঝা, এই আন্তরিক বিরক্তির লক্ষণ।

সিদ্ধান্ত করিয়া গিরিজায়া তাহার সমর্থন জন্য প্রমাণ চাহিল; তোমরা আমরা সকলেই সেইরূপ চাহিয়া থাকি। এইরূপ অবস্থায় লোকের যেরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে, এরূপ আর কোন অবস্থাতেই নহে।

গিরিজায়ার বুদ্ধিবৃত্তি এখন কেবলমাত্র সেই সিদ্ধান্তের সমর্থন জন্য প্রমাণ খুঁজিতে তৎপর রহিল। হেমচন্দ্রের কথাগুলির আভ্যন্তরিক অর্থ যাহা হউক না কেন, ইহার সকল বাক্যার্থ গিরিজায়ার সিদ্ধান্তের অনুকূলে। তাই গিরিজায়া সেই অর্থই বুঝিল, অন্যটি বুঝিল না। বা! কি চমৎকার কার্যকৌশল দেখিলাম।

গিরিজায়ার এই প্রণয়ের কথা বলিতে কবির আর একটি চাতুর্য দেখিতে পাইলাম। গিরিজায়া ভিখারিণীর মেয়ে, সম্ভবতঃ ভিক্ষুক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত। মৃণালিনী, মণিমালিনী ও মনোরমার সমাজ ও তাহার সমাজে প্রভেদ বিস্তর। এরূপ অবস্থায় তাহাকে মৃণালিনী প্রভৃতির ন্যায় বিশুদ্ধ সামাজিক প্রণয়ের অধিকারিণী করা বিহিত নহে, তাই কবি মধ্যে মধ্যে প্রণয় সম্বন্ধে তাহার অপরিশোধিত বা অসামাজিক ভাবও আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। যেখানে আমরা এইরূপ দেখিয়াছি, সেইখানেই কবি আবার মৃণালিনীর মুখ হইতে তাহার শোধিত ভাবও গিরিজায়াকে শুনাইয়া দিয়াছেন। গিরিজায়ার চরমের প্রণয় যেন এইরূপ শিক্ষা হইতে উৎপন্ন। এ সম্বন্ধে গিরিজায়া মৃণালিনীর অজ্ঞাত শিষ্য। আমরা এই কথাটি, গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া, প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

"গিরিজায়া গাইল—

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে॥'

"মৃণালিনী কহিল, 'যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন?'

"গিরিজায়া বলিল, 'আগে কি জানি।' বলিয়া গাইতে লাগিল—

'ভাসল ভরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল—খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাবে রঙ্গে।

এখন—গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে।'

"মৃণালিনী কহিল, 'কূলে ফিরিয়া যাও না কেন?' "

"গিরিজায়া গাহিতে লাগিল—

'মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু, বেষ্টিত ভুজঙ্গে।' "

"মৃণালিনী কহিলেন, 'তবে ডুবিয়া মর না কেন?'

"গিরিজায়া কহিল, 'মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু' বলিয়া আবার গাহিল—

'যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরি
সে কভু দিল না পদ, তরণীর অঙ্গে।' "

"মৃণালিনী কহিলেন, গিরিজায়া এ কোন প্রেমিকের গান।"

"গি। কেন?"

"মৃ। আমি হইলে তরি ডুবাই।"

"গি। সাধ করিয়া?"

"মৃ। সাধ করিয়া!"

"গি। তবে তুমি জলের ভিতর রত্ন দেখিয়াছ।"

অন্যত্র গিরিজায়া কহিতেছে—"মৃণালিনীকে বলিব যে, পাখী হাত-ছাড়া হয়েছে—রাধাকৃষ্ণ নাম শুনিবে ত আবার বনের পাখী ধরিয়া আন। পড়া পাখীর আশা ছাড়, পিঁজরা খালি রাখিও না।"

অন্যত্র গিরিজায়া কহিতেছে—"রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ঘুচিল, তবে আর কার্তিকের হিমে আমরা কষ্ট পাই কেন?"

তারপর গিরিজায়া হেমচন্দ্রের প্রতি মৃণালিনীর কোপসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। বলিল—

"ঠাকুরাণী! আপনার কপাল টিপিয়া দেখ।"

"মৃণালিনী ললাট স্পর্শ করিলেন।"

"গি। কি দেখিলে?"

"মৃ। বেদনা।"

"গি। কেন হইল?"

"মৃ। মনে নাই।"

"গি। তুমি হেমচন্দ্রের অঙ্কে মাথা রাখিয়াছিলে—তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া তোমার মাথায় লাগিয়াছে।"

"মৃণালিনী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন—কিছু মনে পড়িল না। বলিলেন, মনে হয় না; বোধ হয়, আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব।"

"গিরিজায়া বিস্মিতা হইল। বলিল, 'ঠাকুরাণি! এ সংসারে আপনি সুখী।'"

"মৃ। কেন?"

"গি। আপনি রাগ করেন না।"

"মৃ। আমিই সুখী—কিন্তু তাহার জন্য নহে।"

"গি। তবে কিসে?"

"মৃ। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"

এই সব স্থলে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর প্রণয় সম্বন্ধে ঈষদ্ভিন্ন মতগুলি বড়ই সুন্দর। এখানে গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিশোধিত প্রণয় নিজের অন্তরস্থ প্রণয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছে। মৃণালিনী প্রেমরাজ্যে ও—সম্বন্ধেও রাণী বটে।

এইরূপ এক একটি করিয়া আমরা গিরিজায়ার চরিত্রের প্রধান প্রধান বৃত্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া, তৎসমস্তই গিরিজায়ার সামাজিক, আন্তরিক ও পার্শ্বিক প্রভৃতি অবস্থা—তাহার ভিখারিণীত্ব, হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর সঙ্গে তাহার অনুক্ষণ সহবাস, তাহার বুদ্ধি, বয়স, তাহার দিগ্বিজয়-প্রেম ইত্যাদি অবস্থা হইতে উৎপন্ন দেখিতে পাইলাম। এইরূপে চিত্রের স্বাভাবিকত্ব ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। চরিত্র-অঙ্কন সহজ কার্য নহে।

প্রথম দৃষ্টিতে গিরিজায়ার সঙ্গীত, তাহার রসালাপ, তাহার মৃণালিনী-সেবা, তাহার অদ্ভুত প্রেম প্রভৃতিতেই আমাদিগের মনোহরণ করে। তারপরে আমরা যত নিবিষ্টচিত্তে উহা পর্যালোচনা করি, ততই তাহার বিভিন্ন উপাদানে গঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অদ্ভুত সামঞ্জস্য—বিভিন্ন অবস্থার অধীন হওয়া প্রযুক্ত তাহার অদ্ভুত চরিত্রগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি।

পরিশেষে তাহার সমগ্র চরিত্রের সঙ্গে যখন মৃণালিনী ও মনোরমার চরিত্রের তুলনা করি, তখন আনন্দ আমাদিগের অন্তরে ধরে না। গিরিজায়ার চরিত্রে মনোহারিণী বৃত্তি আছে—অবস্থাধীন সেই বৃত্তিগুলির বিকাশেরও সুন্দর কারণ আছে। মৃণালিনী ও মনোরমার সঙ্গে তাহার অপূর্ব সম্বন্ধও আছে। এ ভিখারিণীকে কেহ তুচ্ছ করিবেন না।

এই প্রস্তাবের উপসংহারে গিরিজায়া সম্বন্ধে একটি ঘটনা লইয়া দুইটি বিচিত্র মতের উল্লেখ করিতে হয়। আমারা উল্লেখমাত্র করিব, কোন সিদ্ধান্ত করিব না।

১ম মত। গিরিজায়া এমন সৎপ্রকৃতির লোক, তবে কেন সে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর বিবাহ-সংবাদ না জানিয়া দূতীর ন্যায় তাহাদিগের সাহায্য করিল? ২য় মত। গিরিজায়া বৈষ্ণবের মেয়ে। তাহাদিগের সমাজ ও আমাদিগের সমাজ একপ্রকার নহে। তাহাদের মধ্যে এইরূপ প্রণয় কোন দূষণীয় ভাবের নহে। আর যদি সমাজের কথা না মান, গিরিজায়ার অসামাজিকী বুদ্ধি এই সামাজিক নিন্দা বা কলঙ্ক বুঝিতে পারিত না। ভালবাসার পাত্র ভালবাসার পাত্রকে খুঁজিবে, ইহা তাহার নিকটে অন্যায় বোধ হয় নাই। অন্যায় বোধ হইলে, সে এরূপ করিত না। বস্তুত, গিরিজায়াকে ভিখারিণী করা কবির একটি অতি সুন্দর কৌশল। না হইলে তিনি তদ্দ্বারা এরূপ কার্য করাইতে পারিতেন না।

১ম মত। মানিলাম গিরিজায়ার নিজের সমাজে ইহা কলঙ্কের কথা নহে। কিন্তু গিরিজায়া কি ইহা জানিত না যে হেমচন্দ্রের সমাজে ইহা কলঙ্কের কথা? যদি তাহা জানিত, তবে মৃণালিনীর প্রতি তাহার এইরূপ শ্রদ্ধা অসঙ্গত হইয়াছে।

২য় মত। হেমচন্দ্রের সমাজে যে এইরূপ প্রণয় কলঙ্কের বিষয় ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। আর গিরিজায়া যখন এরূপ কলঙ্ককে অন্যায় মনে করিত তখন মৃণালিনীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অসম্ভব কেন? একজন হিন্দু যদি খৃষ্টান হয়, তবে খৃষ্টানে কি তাহার প্রতি ঐরূপ ঘৃণা করে? মৃণালিনী তৎসমাজের উক্তবিধ কলঙ্ক অবৈধ জানিয়া যদি

গিরিজায়ার সমাজের অনুযায়ী কার্য করে, তবে গিরিজায়া মৃণালিনীকে দোষী ভাবিবে কেন ?

১ম মত। হেমচন্দ্রের সমাজে যে উক্তবিধ কার্য দূষণীয় বোধ হইত, আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি। মণিমালিনী একদিন আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছে। মণিমালিনী মৃণালিনীকে বলিয়াছে—

"এই কথাটি মনে পড়িলেও আমার অসুখ হয়। তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে ?" এই কথা শুনিয়া মৃণালিনীকে এ কলঙ্কক্ষালনার্থ তাহার বিবাহ-বৃত্তান্ত বলিতে হইয়াছিল। তবে প্রমাণাভাব বল কেন ?

২য় মত। আচ্ছা, মাধবাচার্যও হেমচন্দ্রের গুরু। যেমন তেমন গুরু নয়। তাহাকে কি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনিয়াছ ?

১ম মত। মাধবাচার্য নাই বা বলিল। হয় ত সে হেমচন্দ্রের পক্ষে ইহা ততদূর দোষই মনে না করিয়া থাকিবে, হয় ত তাহার অন্য—কার্য-ব্যাপৃত মনে উহা স্থান না পাইয়া থাকিবে, অথবা মাধবাচার্যের চরিত্রেও বা উহা অসঙ্গত কলঙ্ক হইয়া থাকিবে।

২য় মত। তবে আমার শেষের কথা ভাব। মৃণালিনীর এ কার্য গিরিজায়ার চক্ষে অন্যায় বোধ হয় না।

১ম মত। গিরিজায়াকে এ সম্বন্ধে একদিন কিছু ভাবিতেও ত দেখিলাম না।

২য় মত। তা কি করিবে।

(প্রচার, ১২৯৫)

মডেল ভগিনী

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাতের হাঁড়ীতে ম্লেচ্ছের হাত পড়িয়াছে। অন্দরমহলে ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করিয়াছে। স্রোত যদি না ফেরে, তাহা হইলে দেশের আর রক্ষা নাই। "বাবু" কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত। সমাজ সংস্কার করিতেছেন, ধর্ম সংশোধিত করিতেছেন, সভ্যতা আমদানী করিতেছেন, রুচির ব্যবসায় ধরিয়াছেন—ঘরপানে চাহিয়া দেখেন, এমন ফুরসুৎটুকু নাই।

যাহার চক্ষু আছে, হৃদয় আছে, হাত-পা আছে, সে আর কেমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? যাহা দুচ'ক্ষুর শূল, চক্ষু থাকিলে তাহা অসহ্য হইবারই কথা। তাই "মডেল ভগিনী" বাহির হইয়াছে। গ্রন্থকার বাহির করিয়াছেন বলিলে একটু ভুল হয়; অথবা গ্রন্থকারের অবৈধ প্রশংসা করা হয়। কালধর্ম, বিদ্যার বিদ্যাবতী মডেল ভগিনী আপনা আপনি বাহির হইয়াছেন। গ্রন্থকার, লোক-হিতার্থে তাঁহাকে ধরিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থের উপদেশ বিফল না হইলে, গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে।

প্রথম কথা, গ্রন্থের নামকরণ। সময়ের যে রকম গতিক। তাহাতে মা, মাসী, খুড়ী, পিসী প্রভৃতি সম্পর্কগুলা টলটলায়মান। এখন সমস্তই "ভগিনী"। পত্নী ও ভগিনী। গ্রন্থকার একথাটী গোড়াতেই ধরিয়াছেন। এই স্থূল কথায় বিস্তর সূক্ষ্ম ভাব আছে। যিনি ভাবুক, তিনি নাম দেখিয়াই "মডেল ভগিনী"র চালচলন বুঝিয়া লইতে পারিবেন। গ্রন্থের নাম সার্থক হইয়াছে।

গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং সকল কথা বলিবার সময়ও এখন হয় নাই। প্রথম খণ্ড যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে এই কথা আছে,—

কমলিনী একজন ডেপুটীর মেয়ে, পূর্বপুরুষে ইহাদের কেহ না কেহ অবশ্যই হিন্দু ছিলেন। কিন্তু হিন্দুয়ানী এ বংশ হইতে নিশ্চয় অন্তর্ধান

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় প্রণীত প্রসিদ্ধ উপন্যাস "মডেল ভগিনী"র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার এই সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

হইয়াছে। এখন ইঁহারা কোন ধর্মকে পবিত্র করিতেছেন, ইঁহারাই জানেন, ভগবান জানিলেও জানিতে পারেন। এই কমলিনী এখন যুবতী, তাহার উপর ইংরেজীতে শিক্ষিতা, শিক্ষার ফলও গোছা গোছা ধরিয়াছে। কমলিনীর একজন ঘরাও শিক্ষক আছেন, ফিট্‌ফাট ছোকরা, ইংরেজীতে লায়েক, সর্বপ্রকারেই কেতা-দুরস্ত। ইনি কিন্তু মডেল ভগিনীর অনেক উপসর্গের মধ্যে এক উপসর্গ। এক উপসর্গ—আরও আছে; তার মধ্যে ডাক্তার বাবু, উকিল বাবু, আর সর্বাপেক্ষা সাহেব বাবু মিষ্টার চ্যাটার্জী,—পরিচয় করিবার যোগ্য।

কমলিনী বিবাহিতা। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় কমলিনীর স্বামী রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক-করা, ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সুতরাং কমলিনীর উপসর্গ—সম্প্রদায়েরও অসুখ। এতগুলি ভদ্রলোকের অসুখ, সুতরাং রায় মহাশয় পাগল। পাগল না হইলেও পাগল, ইহা বোধ হয়, না বলিলেও চলে।

এই স্বামী-সমাগম এবং সেই উপলক্ষে কমলিনীর উপসর্গবর্গের পরিচয় দিতেই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। কি অপরাধে কি প্রণালীতে রায় মহাশয় পাগল হইতেছেন, কি উপাদানে কেমন আয়োজনে কমলিনী প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা অবশ্যই দেখান হইয়াছে। এখন পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক দেখিলেই হয়। গ্রন্থের পরিচয় ইহার অধিক দিতে হইলে, গ্রন্থখানিকে মাটী করা হয়। সে রস-রঙ্গ-ভরা রচনা-কৌশল, সে চারুচিত্রের ছটা, সে বর্ণসমাবেশের ঘটা,—সমালোচকের আইসে না। মূল না দেখিলে তাহাব আস্বাদন বুঝা যায় না।

লিপি-চাতুর্যে "মডেল ভগিনী"র গ্রন্থকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লেখক বাঙ্গালায় এখন নাই। সদর-অন্দরে-মাখামাখি ভাববিশিষ্ট,—নিচে নরক, উপরে স্বর্গোপম সেই দোতলা বাড়ীখানির বর্ণনা, যে-সে লেখকে করিতে পারে না। কপিল চাকরের পরিচয় গ্রন্থকারের নিজের ভাষা ভিন্ন অন্য কথায় দেওয়া যায় না। আর সেই চ্যাটার্জী সাহেবের চিত্র—সে ফটোগ্রাফ বসিয়া বসিয়া দেখিবার সামগ্রী।

বলা বাহুল্য যে, "মডেল ভগিনী" সমাজ-চিত্র। কিন্তু পরিহাস-রসিক চিত্রকরের তুলিতে আঁকা। সুতরাং অতিরঞ্জিত। শ্লেষকাব্য কেন অতিরঞ্জিত হয়, অতিরঞ্জিত করা কেন আবশ্যক, তাহা কেহ কেহ বুঝেন না। কিন্তু ভবিষ্যতের অনিষ্ট নিবারণের জন্য, ভবিষ্যতের বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের পুষ্টি সহকৃত করিয়া বর্ত্তমানকে অতিরঞ্জিত না করিলে, Prognosis দেখাইয়া রোগের পরিচয় না দিলে, লোকের সতর্কতার শিথিলতা জন্মিবার আশঙ্কা—ইহা মনে রাখিলেই, অতিরঞ্জনের কথাটা আর বিষম সমস্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। তাই এ গ্রন্থের পাত্র-পাত্রীগণও অতিরঞ্জিত। যাহা হইয়াছে, কিম্বা হইতেছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে ব্রতী নহেন। সে কাজ ঐতিহাসিকের। বাঁধ না দিলে বন্যা কোথায় যাইবে, দূরদর্শী বসু তাহাই দেখাইবার যত্ন করিয়াছেন।

লেখকের সুখ্যাতি করিলাম, অখ্যাতি কিছু করিলাম না। ইহাতে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন। এমন লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, গালাগালি না দিলে সমালোচনাই হয় না। সে হিসাবে আমিও গালাগালি দিতে পারি। বলিতে পারি যে, "মডেল ভগিনী"তে অনেক "ভ্রাতা"র চিত্ত-বিকার হইবে, অনেক "ভগিনী"র গা শিহরিয়া উঠিবে। অনেক প্রচ্ছন্ন ভাবুকের ভাব-সাগরে তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে। সে দোষ কিন্তু গ্রন্থকারের নহে, আমারও নহে—দোষ আমার পোড়া কপালের। এক কথায়—বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি যে, কতকগুলি লোক লুকাইয়া লুকাইয়া এ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন, একবার একবার দাঁতে জিব কাটিয়া "ছিঃ" করিবেন, মুচকি মুচকি হাসিবেন—আর লজ্জা যদি থাকে, তাহা হইলে মনে মনে লজ্জিত হইবেন। কিন্তু যিনি পুস্তক পড়িতে জানেন, তিনি লজ্জার কারণ কিছু দেখিবেন না। দুঃখের গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অন্তরে একটু আশ্বাস লাভও করিতে পারেন।

(বঙ্গবাসী, ১২৯৬ সাল)

দামিনী, পালামৌ ও রামেশ্বরের অদৃষ্ট

চন্দ্রনাথ বসু

এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে হইলে প্রায় সকলেই যতদূর সম্ভব সোজা গিয়া থাকে। যেখানে না দাঁড়াইলে চলে না, কেবল সেইখানে এক-একবার দাঁড়ায়। কিন্তু সঞ্জীব বাবু তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই দাঁড়ান, একটা গাছ দেখিবার জন্য, একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা পাতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা বাস দেখিবার জন্য, প্রায়ই দাঁড়ান। কখনও বা পথ ছাড়িয়া একটু এদিকে একটু ওদিকেও যান। এইরূপে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক করিয়া এটি সেটি দেখিতে দেখিতে যাইতে তিনি বড় ভালবাসেন। তাঁহার 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'তে তাঁহাকে এইরূপ চলা-ফেরা করিতে দেখিতে পাই। এ প্রণালীর দোষগুণ দুই আছে। কিন্তু দোষে গুণে এই যে একটি প্রণালী, বোধ হয় বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা এক সঞ্জীব বাবুরই প্রণালী, আর কাহারও নয়। সঞ্জীব বাবুর যথেষ্ট নিজত্ব (originality) আছে।

এ প্রণালীর দোষ কিছু আছে। যে বেশী থামিয়া থামিয়া এটি সেটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে দেখিতে যায়, সকলের তাহার সঙ্গে যাইতে ভাল লাগে না, অনেকে তাঁহার সঙ্গে অধিক দূর যাইতে পারেও না। কিন্তু 'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা'তে এ দোষের পরিমাণ যতই থাকুক, 'পালামৌ'তে ইহা নাই বলিলেই হয়। 'পালামৌ' এই প্রণালীতে লিখিত, কিন্তু উপন্যাস না হইয়াও পালামৌ উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ন্যায় মিষ্ট বোধ হয়। পালামৌর ন্যায় ভ্রমণকাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। আমি জানি, উহার সকল কথাই প্রকৃত, কোন কথাই কল্পিত নয়; কিন্তু মিষ্টতা-মনোহারিত্বে উহা সুরচিত উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত ও সমতুল্য।

এ প্রণালীর অর্থ—সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, বা যেরূপে দেখে না, তাহাই দেখা বা সেইরূপ দেখা। সচরাচর লোকে যাহা দেখে না, সঞ্জীব তাহাই দেখিতে এবং সেইরূপেই দেখিতে ভালবাসিতেন, এবং তাহা সেইরূপ দেখিবার শক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্লে লাতেহার পাহাড়ের 'ক্রোড়ে' বসিবার জন্য সঞ্জীব বাবু ব্যস্ত হইতেন। সে ব্যস্ততা কেমন? না এইরূপ—

"যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে হইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া আনিতে যাইবে"—

ছোট ছোট সামান্য সামান্য নিত্য ঘটনা বোধ হয় অনেকে এমন করিয়া দেখে না—"জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়"—আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয়জন লক্ষ্য করে? সঞ্জীব বাবু এইরূপ বিষয়সকল এমনি করিয়া লক্ষ্য করিতে ভালবাসিতেন, লক্ষ্য করিতে পারিতেন, লক্ষ্য করিতে জানিতেন। এইরূপ দর্শনকার্যে তাঁহার অসাধারণ আসক্তি ও অভিনিবেশ ছিল। 'পালামৌ'তে যে নববিবাহিতা মেয়েটির কথা আছে—যাহার কথা, অতি সামান্য হইলেও পড়িতে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে—বোধ হয়, সঞ্জীব বাবু না লিখিলে সে মেয়েটিকে আমরা পাইতাম না। এইরূপ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা সঞ্জীব বাবু লিখিয়া গিয়াছেন; এমনি করিয়া দেখায় যে ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি সূচিত হয়, সঞ্জীব বাবুতে তাহা যত দেখি, অন্য কোন বাঙ্গলা লেখকে তত দেখি না। এইরূপে দেখা সঞ্জীব বাবুর হাত এবং ধাত, সঞ্জীব বাবুর নিজত্ব।

আর এমনি করিয়া দেখাও যেমন সঞ্জীব বাবুর ধাত, সঞ্জীব বাবুর ভাষাও সঞ্জীব বাবুর ধাত। তাঁহার ন্যায় সরল ভাষা বাঙ্গলা সাহিত্যে অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের কথার ন্যায় সহজ, সরল, মিষ্ট, কারুকার্যহীন। আর এই যে বালকের ন্যায় ভাষা, সঞ্জীব বাবু ইহাতে তাঁহার সামান্য কথাও যেমন লিখিয়াছেন, তাঁহার বড় বড় কথাও তেমনি লিখিয়াছেন। সৌন্দর্যতত্ত্ব খুব একটা বড় কথা,

কিন্তু 'পালামৌ'তে তিনি তাঁহার সৌন্দর্যতত্ত্ব কেমন সরল ভাষায় সরল-ভাবে বুঝাইয়াছেন, দেখুন :—

"আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এইজন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্তা আমাদের বঙ্গ কবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণন করিতে পারেন ; দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমি তাহা পারি না। * * * * আমি যে প্রকার রূপ দেখি, নির্লজ্জ হইয়াও তাহা বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না। অনেক দিনের পর একটি ছাগশিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু ! আমি রূপরাশি কি বুঝিব ! তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

"বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন—অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, পক্ষীতেও সেইরূপ, ছাগেও সেইরূপ। সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না, দেহ দেখিয়া ভুলি না, ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ লতায় থাক্ অথবা যুবতীতে থাক্, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে।"

সৌন্দর্যতত্ত্বের ইহা অতি উচ্চ কথা। এমন উচ্চ কথা, এত সহজ, সরল ও পরিষ্কার ভাষায় অতি অল্প লোকেই কহিতে পারে, কিন্তু ছোট বড় সকল কথাই এইরূপে কওয়া সঞ্জীব বাবুর স্বভাব। এই চমৎকার স্বভাব সঞ্জীব বাবুর নিজস্ব। এই স্বভাবের গুণে তাঁহার

সকল লেখাই আবেগশূন্য, আয়াসশূন্য, ধীরগতি, শান্তভাবাপন্ন। তিনি তাঁহার অতিশয় মর্মস্পর্শী কথাও যেন অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে লিখিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধের জ্ঞান শান্তস্বভাব বালকের ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে নিজত্ব তাঁহার সমান অতি অল্পই দেখিতে পাই।

সঞ্জীব বাবুর সৌন্দর্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না। কারণ তাঁহার সৌন্দর্যতত্ত্ব কেবলমাত্র তত্ত্ব নয়, তাঁহার সৌন্দর্য দেখিবার রীতি বা প্রণালীও বটে। এইজন্যই তিনি 'পালামৌ'র সেই বাইজীতে গেঙ্গোখালির মোহনার সেই পাখীটির রূপরাশি দেখিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি কোলকামিনীদিগের দেহে "কোলাহল" দেখিয়াছিলেন এবং এইজন্যই যখন সমুদ্র শান্ত হইয়া মৃদু মৃদু ডাকিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর ভাবিত, তাহার আনন্দদুলাল কথা কহিতেছে; এবং যখন সেই সমুদ্রের অস্পষ্ট-লক্ষ্য একটি তরঙ্গ উঁচু হইয়া নাচিত, তখন তাঁহার রামেশ্বর মনে করিত, তাহার আনন্দদুলাল নাচিতেছে। সৌন্দর্যের এই সুবিস্তৃত, সুপ্রসারিত, জাতিভেদশূন্য, সর্বসমন্বয়কারী ভাব বড়ই মধুর, বড়ই উদার। এই ভাব সঞ্জীব বাবু তাঁহার সেই অতুলনীয় মৃদুমধুরভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

'কণ্ঠমালা' ও 'মাধবীলতা' যে প্রণালীতে লিখিত, 'দামিনী' ও 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' সে প্রণালীতে লিখিত নয়। শেষোক্ত দুইটিই অতি ক্ষুদ্র গল্প, অতএব কোনটিতেই 'কণ্ঠমালা' বা 'মাধবীলতার' প্রণালী খাটিত না। এই ক্ষুদ্র গল্পে সঞ্জীব বাবুর বেশ ত্বরিতগতি দেখা যায়, স্থানে স্থানে তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুতার পরিবর্তে বিলক্ষণ আবেগ ও উদ্দামভাবও পরিলক্ষিত হয়। রামেশ্বরে ও দামিনী পাগলীতে এই খর উদ্দামভাব বেশ পরিস্ফুট। সঞ্জীব বাবু পাগল-পাগলী গড়িতে বড় ভালবাসিতেন। 'মাধবীলতা'য় পিতম পাগলা আছে, কিন্তু পিতমের পাগলামী দেখিতে দেখিতে কিছু শ্রান্তি বোধ হয়। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট'-এ স্বয়ং রামেশ্বরকে একবার পাগলপ্রায় দেখি।

সে পাগলামী ক্ষণকালের নিমিত্ত এবং দেখিতেও অতি উত্তম। কারণ, উহা উৎকট দাম্পত্য প্রেমের বিকট প্রতিধ্বনি। 'দামিনী'তেও এক পাগলী দেখিতে পাই, সে বড় বিষম পাগলী। পতিশোকে সে আপনি পাগলিনী। তাই যে পতিপ্রাণা পতির জন্য মরে, তাহার পতিকে সে গলা টিপিয়া মারিয়া তাহারই সঙ্গে পরলোকে পাঠাইয়া দেয়।

দেবী চৌধুরাণী

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়

১

"দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থে, বঙ্কিমবাবু এই একটি 'শিক্ষা দিতেছেন যে, পরিবারই নারীধর্মের বিকাশ-স্থান, নারীজীবনের উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র। কিন্তু এই শিক্ষার অপেক্ষাও গুরুতর ও বিশালতর শিক্ষা এই ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। কি করিলে প্রকৃত পূর্ণশিক্ষা হয়, পূর্ণ সর্বাঙ্গীন শিক্ষা কিরূপে নিষ্কাম ধর্মে পরিণত হয়, "দেবী চৌধুরাণী"র গ্রন্থকার তাহাই কল্পনার তুলিকাতে চিত্রিত করিয়াছেন। "নবজীবনে" বঙ্কিমবাবু (abstract-এ) যাহা তর্ক-বিতর্কে প্রথমে ব্যাখ্যা করেন, সেই মতই "দেবী চৌধুরাণীতে" (concrete-এ) উপন্যাসাকারে প্রদর্শিত করিয়াছেন। "ধর্মতত্ত্বে" বঙ্কিমবাবু শিক্ষা দিতেছেন, "নিষ্কাম ধর্মই সুখের উপায়" "যথার্থ কর্ম করিবে, কর্মফলের জন্য করিবে না।" "দেবী চৌধুরাণীতে"ও দেখুন "হরবল্লভ দেবীর সর্বনাশ করিতে নিযুক্ত, তবু দেবী তার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম।" আবার যখন প্রফুল্লমুখী পরিবারের সকলকেই সুখী করিতে লাগিলেন, সূর্যদেব যেমন অপক্ষপাতী হইয়া সকলকে আপনার হাস্য ও জীবনময় আলোক বিতরণ করেন, প্রফুল্ল সেইরূপে যখন পরিবারের সকলেরই উপর আপনার পবিত্র নিষ্কাম স্নেহ বর্ষণ করিয়া সকলকে সুখে প্লাবিত করিতে লাগিলেন, তখন উপন্যাসকার বলিতেছেন, "এই সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য নহে। কেন না, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল, প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা, কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম, অথচ ধর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত।" এখানে, "ধর্মতত্ত্বের"

মত ও শিক্ষা প্রফুল্লজীবনে মূর্তিমতী করিয়া দেখান হইয়াছে। ধর্মতত্ত্বে যাহা অশরীরী, এখানে তাহা শরীরীভূত হইয়াছে; ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার কুসুমকলি প্রফুল্লের কোমল পবিত্র হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার শোভা ও সৌরভে পাঠকের চিত্ত বিমোহিত করিতেছে।

বঙ্কিমবাবু ধর্মতত্ত্বে শিক্ষা দিয়াছেন,—মানুষের সমুদয় শক্তি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও বঙ্কিমবাবু তাহাই দেখাইলেন। দেবী চৌধুরাণীর শারীরিক শক্তির স্ফূর্তি ও পরিণতির জন্য বঙ্কিমবাবু দেবীকে মল্লযুদ্ধ পর্যন্ত অভ্যাস করাইয়াছেন।

গ্রন্থকার জ্ঞানার্জনী বৃত্তির বিকাশের জন্য দেবীকে নানা শাস্ত্রে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং স্ত্রীলোকে চাকুরী না করিলেও তাহার পক্ষে শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছেন। "গৃহ-ধর্ম বিধানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা-প্রকাশের স্থান সে নয়।" দেবী বিদ্যাবতী বলিয়াই গৃহধর্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।

তৎপর "কার্যকারিণী বৃত্তি"—যথা স্নেহ, দয়া, ভক্তি। এইগুলির স্ফূর্তির ও পরিণতির জন্য দেবীকে গ্রন্থকার শেষে শ্বশুরালয়ে লইয়া গিয়াছেন। পরিবারের মধ্যে না থাকিলে স্নেহ, দয়া, ভক্তি ইত্যাদি সহজে ও সুন্দরভাবে স্ফূর্তি ও পরিণতি পায় না। তাই শেষে দেবীর পরিবারে স্থিতি। গ্রন্থকার বলিতেছেন, দেবী সংসারে নিজের সুখের জন্য আসেন নাই। কেন না, তাঁর কোন কামনা ছিল না। অন্যকে সুখী করিবার জন্য, নিজের হৃদয়ের স্নেহ, দয়া, ভক্তি শতধা অবিরল-প্রবাহী করিয়া দিবার জন্য, দেবী সংসারে আসিয়াছিলেন, দেবীর মুখ দিয়া তাহাকে 'যোগ' বলিয়াছেন, আমরা বুঝিলাম। দেবী বলিতেছেন —"যোগ অভ্যাস মাত্র, কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। * * তিনটী অভ্যাসকে যোগ বলি * * জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ।" অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষাতে Intellect,

Will ও Emotion এই সকলগুলিরই সম্যক্ বিকাশ ও চালনা আবশ্যক।

অবশেষে, ধর্মতত্ত্বে যে "চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির" কথা বলা হইয়াছে, তাহাও দেবীর জীবনে স্ফূর্তি পাইয়াছে। সেই কারণে বর্ষার পূর্ণ গঙ্গার মাঝে, বজরার উপরে, জ্যোৎস্নার আলোকে, দেবী বীণাবাদন করিয়াছেন।

দেবীর চরিত্র ও শিক্ষাতে বঙ্কিমবাবু তাঁহার আদর্শ শিক্ষা, বা অনুশীলন, বা যোগ, বা ধর্ম যাহা বল, তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। এই নিমিত্তই আমরা 'দেবী চৌধুরাণী'কে ধর্মগ্রন্থ বলি। আবার, সমুদায় পুস্তকখানিকে একটি রূপক-বর্ণনা বিবেচনা করিলে, তাহার সুন্দর অর্থ হয়।

(২)

বিবেক ও বুদ্ধি

এই রূপকে, ভবানী পাঠক বুদ্ধিশক্তি, চৌধুরাণী বিবেক বা ধর্মজ্ঞান, দস্যুগণ লোভ ঈর্ষাদি রিপু। যখন বুদ্ধিশক্তি "ভবানী", বিবেক "প্রফুল্ল-মুখীর" শাসন না মানিয়া, তাহার অধীন না হইয়া তাহাকে নিজের বশীভূত করে, অথবা প্রকৃতপক্ষে তাহাকে বন্দী রাখিয়া, কেবলমাত্র নামে তাহাকে রাজা বা রাণী প্রচার করিয়া, আপনিই সর্বোচ্চ প্রভু হইয়া হৃদয়ে রাজত্ব করে, তখন হৃদয়ে রিপুদস্যুদিগের অরাজকতা, তখন হৃদয়ে পাপের অন্ধকারময় জঙ্গল; তখন কোথায়ও শান্তি নাই, কুশল নাই, মঙ্গল নাই—তখন চতুর্দিকেই আতঙ্ক ও ভীতি—তখন ন্যায় নাই, বিচার নাই, স্বত্বাস্বত্বের জ্ঞান নাই—তখন "দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন" এই আত্মপ্রতারক কথার নামে, বিবেকহীন বুদ্ধির প্রভুত্বে, কত দিকে কত সর্বনাশ হইয়া যায়, কত নিরীহ ব্যক্তির ধন প্রাণ যায়, কত মুগ্ধ অবলার প্রাণাদপি প্রিয় ধর্ম যায়। দেবী চৌধুরাণী যতদিন ভবানী পাঠকের অধীন, ততদিন দেবীর দ্বারা, অনায়াসলব্ধ ধন বিতরণ ভিন্ন কোন মঙ্গলকার্য সম্পাদিত হয় নাই। বিবেক যতদিন বুদ্ধিশক্তির

অধীন থাকে, ততদিন বিবেক দ্বারা কোন বিশেষ উপকার হয় না। ভবানী যেমন দেবীর নামে রাজত্ব করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, দেবীর সৌন্দর্য ও মহিমা দিয়া লোককে ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সংসারে নাস্তিক বুদ্ধিও অনেক সময় ধর্ম বা ঈশ্বরের নাম লইয়া অন্যকে ভুলাইতে চাহে। কত সময় কুপথগামী নাস্তিক ব্যক্তি, লোককে ভুলাইবার জন্য বক্তৃতাতে বা লেখাতে, ঈশ্বর ও ধর্মের নাম লইয়া থাকে কেন? ধর্মের এমনি মহিমা, সৌন্দর্য ও অধিকার যে, যে স্বয়ং তাহাকে মানে না, তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করে না, তাহাকেও পদে পদে ধর্মের দোহাই দিয়া, অন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। ভবানী অনেক কুতর্ক ও প্ররোচনা দ্বারা দেবীকে আপনার বশে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবীর যেই চোখ মুখ ফুটিল, শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল, তিনি আর ভবানীর অধীনে থাকিয়া নামেও অরাজকতা এবং দস্যু-বৃত্তির সহায়তা করিতে অস্বীকৃতা হইলেন, এবং নিজের স্বাধীনতা, নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিলেন। অনেক সময়, বিবেককেও বুদ্ধি নানাপ্রকার কুতর্কের দ্বারা নিজের অধীনে রাখিতে চাহে। কিন্তু কোনরূপে বিবেকের একটু বল হইলেই বিবেক নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করে। লোকে বলিত দেবী ডাকাইতি করিত, কিন্তু দেবী কখন ডাকাইতি করে নাই, দেবীর নামে ডাকাইতি হইত; তেমনি অনেকে বলেন, বিবেক বা ধর্ম পৃথিবীতে অনেক ডাকাইতি বা অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেক বা ধর্ম কখন ডাকাইতি বা অত্যাচার করে নাই। তবে ধর্মের নামে পৃথিবীতে অনেক ডাকাইতি, অনেক অত্যাচার হইয়াছে বটে। দেবী বিপদে অটল, ধর্মও বিপদে অটল। ধর্ম মৃত্যুকে ভয় করে না, দেবী মৃত্যুকে ভয় করে নাই। ধর্ম পরিবারে বা সংসারে সামঞ্জস্য বিধান করে, প্রতিযোগী অধিকার এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সমবায় স্থাপিত করিয়া আত্মার বিকাশের উপায় করিয়া দেয়। দেবী পরিবারে গিয়া স্বামীর, শ্বশুর-শাশুড়ীর, এমন কি প্রতিযোগিনী সপত্নীদিগের মধ্যে সমবায় করিয়া দিলেন। কোমৎ বলিয়াছেন, "আমাদিগকে অন্যের জন্য জীবন যাপনার্থে প্রবর্তনা ও শিক্ষা দেওয়াই ধর্মের উদ্দেশ্য।" দেবী চৌধুরাণীরও

উদ্দেশ্য তাই। কোমতের মতে, হৃদয় বা সংসার হইতে অরাজকতাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার স্থানে সুনিয়ম, সুশাসন সংস্থাপিত করাই ধর্মের কার্য। ধর্ম—কি হৃদয়ে, কি পরিবারে, কি দেশে—অরাজকতার মধ্য হইতে সুনিয়ম বা সমবায় বিকাশিত করে। কোমৎ বলেন, Religion একরূপ Unity বা Synthesis বা Harmony, ঐক্য বা সামঞ্জস্য বা সমবায়। বঙ্কিমবাবু প্রকারান্তরে ইহাকেই "সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য" বলিয়াছেন। কোমতের মতে, বৃত্তিদিগের মধ্যে সমবায় স্থাপন করাই ধর্মের কার্য। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও এই প্রকার সমবায়, এই প্রকার ধর্ম সংস্থাপন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। আমরা পুস্তকের আরম্ভে তিন স্থানে সুশাসনের বা সমবায়ের অভাব দেখিতে পাইতেছি—দেবীর অন্তরে, দেবীর শ্বশুর-পরিবারে, এবং বাঙ্গলা দেশে। পুস্তকের শেষে, দেবীর অন্তরে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনের সমবায়; তাহার শ্বশুরের পরিবারে পরস্পরের মধ্যে সমবায় বা সদ্ভাব, বাঙ্গলা দেশে সমবায় বা ডাকাতি ইত্যাদির দমন এবং সুশাসন দেখিতে পাইতেছি। যে ধর্ম দেশে অরাজকতার পরিবর্তে সুশাসন,—পরিবারে কলহের স্থানে সদ্ভাব—এবং হৃদয়ে স্বার্থের স্থানে নিঃস্বার্থ পরহিতব্রত আনিয়া দেয়, তাহারই আলোচনা করা, তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য শিক্ষা দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এই ধর্মের উদ্দেশ্য উন্নতি, ভিত্তি সমবায়, উপায় বা মূলসূত্র স্নেহ। এই ধর্ম কোমৎ ঈশ্বর-বর্জিত করিয়া ইউরোপে ব্যাখ্যা করিতে আয়াস পাইয়াছিলেন। এই ধর্ম বঙ্কিমবাবু ঈশ্বরযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা দেশে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৩)

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হউক না কেন, শিল্পীর চক্ষুতে ইহাকে দেখিলে, ইহার অনেক স্থানে অপূর্ণতা, অপরিস্ফুটতা ও নিষ্ফলতা লক্ষিত হইবে।

এই উপন্যাসের প্রধান ব্যক্তি, সর্বোচ্চ চরিত্র, প্রফুল্লমুখী। তিনি গ্রন্থকারের মতে, সুশিক্ষার পরাকাষ্ঠা, নারীচরিত্রের আদর্শ, মানব-হৃদয়ের পূর্ণ বিকাশ, নিষ্কাম ধর্মের অবতার। সুতরাং মনুষ্য-চরিত্রে যাহা কিছু ভাল আছে, যাহা কিছু ভাল থাকা উচিত, তাহাই গ্রন্থকার এই চরিত্রে অবশ্য সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই চরিত্রটী ভাল ফুটে নাই, যেন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন প্রভাত-অরুণের ন্যায়, মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায়, ফুটিব ফুটিব মনে করিয়া ফুটিল না; অনেক আয়োজন ও আশা ও চেষ্টার পর যেন ফাঁসিয়া যাইল। প্রফুল্লমুখীর জীবন তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) মাত্রালয়ে আঠার বৎসর; (২) বনে ভবানী পাঠকের আশ্রয়ে দশ বৎসর; অবশিষ্ট ভাগ স্বামী-সহবাসে। প্রফুল্লমুখীর প্রথম আঠার বৎসর পাঠকের নিকট ঘন অন্ধকার। যে জীবন পরে আদর্শ চরিত্র হইল, নিষ্কাম ধর্মের অবতার-স্বরূপ হইল, তাহার প্রথম আঠার বৎসর কিরূপে অতিবাহিত হইল; তখন কোন্ ঘটনায় কোন্ দিকে চালিত হইল—যৌবনের আরম্ভে, রূপের ও নূতন ভাবের বন্যা যখন জীবনে প্রথম আসে, যখন প্রাণ জগতের সৌন্দর্য ও প্রিয়জনের ভালবাসায় অভিভূত হইবার জন্য, যেন ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, যখন সুখের আকাঙ্ক্ষার সহিত পদে পদে ভ্রম ও বিপদ সংলগ্ন থাকে, সেই সময় প্রফুল্লমুখীর জীবন কিরূপে গিয়াছিল—তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। আঠার বৎসর বয়সে প্রফুল্লমুখী একমাত্র জননীকে সহায় করিয়া, বীরাঙ্গনা প্রমীলার ন্যায়, যখন শ্বশুরপুরী ভেদ করিয়া স্বামীকে অনুসরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরিচিত হইয়াও একরাত্রি যাপন করিয়াও, অভিশপ্তা শকুন্তলার ন্যায় প্রত্যাখ্যাতা হইলেন, তখন তাঁহার কতক পরিচয় পাইলাম। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই ভবানী পাঠক প্রভৃতি ডাকাইত-দিগের জঙ্গলে আমরা আবার তাঁহাকে হারাইলাম। তখন তাঁহাকে আমরা আর বড় একটা দেখিতে পাই না; তবে বঙ্কিমবাবুর মুখে শুনিতে পাই যে তিনি এই এই বই পড়িতেছেন ও এই এই বিষয় শিখিতেছেন। তখন ভাবিলাম, জঙ্গলের অন্ধকারে, প্রফুল্লকে ভাল

দেখিতে পাইতেছি না, বোধ হয় জঙ্গলের বাহিরে যখন প্রফুল্লর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইব। তাহার পর, তাহাকে কয়বার দেখিলাম বটে, তাহার কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু তাহাকে বঙ্কিমবাবুর অনির্বচনীয় সূর্যমুখী বা কুন্দ বা বিমলা বা কপাল-কুণ্ডলার ন্যায় একটি জীবন্ত ব্যক্তি বলিয়া, একটি পরিস্ফুট চরিত্র বলিয়া মোটের উপর ধারণা হইল না।

আমরা বলিয়াছি, প্রফুল্লচরিত্র ভাল ফুটে নাই। কেন তাহা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলিতেছি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লের বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাই নাই। ২৮ বৎসর বয়স পর্যন্তও প্রফুল্লের বিদ্যা-বুদ্ধি কার্যে প্রকাশ পাইল না। ১৮ বৎসর হইতে ২৮ বৎসর পর্যন্ত প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের হাতের গড়া পুতুল। এই সময় তাহার কোনও স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন কার্য, স্বাধীন চিন্তা দেখিতে পাই না। সে কাষ্ঠের পুত্তলি, ভবানী ঠাকুর তাহাকে যে দিকে ফিরাইতেছেন, সে সেই দিকে ফিরিতেছে, কখনও কোন আপত্তি, কোনও প্রতিবাদ করিতেছে না—পরের ইচ্ছার প্রতিকূলে, কখন স্বীয় ইচ্ছা প্রবল করিবার আয়াস পাইতেছে না; তাহার কার্যে কখনও চুক্ দেখিতে পাইতেছি না, চিন্তায় কখনও আবিলতা দেখিতে পাইতেছি না, কর্তব্যের এবং কামনার ভিতর মনুষ্য-জীবনে নিয়ত যে বিবাদ হয়, তাহার কোন লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। জিনোফন বর্ণিত সাইরসের শিক্ষাপ্রণালী, এবং রুসো-কল্পিত এমিলের শিক্ষা-পদ্ধতি, অনেকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বিবেচনা করেন। আমাদিগের বোধ হইতেছে, ঐ দুই গ্রন্থে বর্ণিত শিক্ষাপ্রণালী অপেক্ষা প্রফুল্লের শিক্ষা অধিকতর অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। সে কথা যাউক।

২৮ বৎসর পরেও প্রফুল্লের বিশেষ বুদ্ধিব্যঞ্জক কার্য দেখা যায় না। সাহেবের হাত হইতে শ্বশুর, স্বামী এবং আপনাকে রক্ষা করিবার সময় বোধ হয় যেন গ্রন্থকার একবার প্রফুল্লের বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমবাবু যাহাকে 'গভীর কৌশল' বলিয়াছেন তাহা এত ক্ষুদ্র এবং

অনুপযুক্ত যে আমরা বঙ্কিমবাবুর নিকট তাহা কখনও প্রত্যাশা করি নাই। যখন কোনও গ্রন্থকার তাঁহার কোনও নায়ক ও নায়িকাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সহসা "বৈশাখীর নবীন-নীরদ-মালায় গগন অন্ধকার" করিয়া নদীবক্ষে "প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা" আনয়ন করিতে বাধ্য হন, তখন বোধ হয় কেবল নায়ক নায়িকা বিপন্ন নহে, গ্রন্থকারও বিপন্ন। তখন গ্রন্থকারের কৌশল, এবং নায়ক ও নায়িকার রক্ষার জন্য ভগবানকে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে হয়। তাই বিপন্না প্রফুল্লকে বলিতে হইয়াছে "আমার রক্ষার জন্য ভগবান উপায় করিয়াছেন।" যখন গ্রন্থকার বলিলেন প্রফুল্লের মনের ভিতর গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম না জানি কি একটা কাণ্ড হইবে। ওমা! পরে দেখি কেবল একটী ঝড় উঠিল, আর সেই ঝড়ে যদি কাহারও কিছু কৌশল বা শিক্ষা প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহা প্রফুল্লের নহে, তাহা নাবিকদিগের। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে দেখিলাম, "শ্বশুর শাশুড়ী প্রফুল্লকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও কাজ করিতেন না; তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাঁহাদের এতটা শ্রদ্ধা হইল।" এখানে প্রফুল্লের বিবেচনার প্রমাণের ভার তাহার বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—কি দরিদ্র মাত্রালয়ে, কি দস্যুব্যাপ্ত বিপদসঙ্কুল গহন কাননে, কি শান্তিময় শ্বশুরালয়ে প্রফুল্লের চমৎকারিণী বুদ্ধিমত্তা কার্যে প্রকটিত হইল না, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাইলাম না।

প্রফুল্লের নিষ্কাম ধর্মও কার্যে বড় উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয় নাই। প্রফুল্ল কর্তব্যের অনুরোধে ইচ্ছাপূর্বক কঠিন ত্যাগ স্বীকার করিল, তাহা তাহার কার্যে আমরা কোথায়ও দেখিতে পাই না। প্রফুল্ল দরিদ্র-কন্যা; তাহাতে আবার হিন্দুমহিলা, বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে পতিই দেবতা; তাহার উপর আবার সেই পতি ধনী, রূপবান যুবক—সেই পিতৃমাতৃহীনা, নিঃসহায়া, নিরাশ্রয়া হিন্দু যুবতী কুলবধূর পক্ষে ঈদৃশ পতির অনুসরণ বা ধ্যানে আমরা বিশেষ ত্যাগ-স্বীকার বা নিষ্কাম ধর্ম দেখিতে পাইলাম না। যে কোনও হিন্দু মহিলা

ঐরূপ অবস্থায় পড়িবে, সে যদি কুলটা না হয়, তাহা হইলে, নিষ্কাম ধর্মের বিনা সাহায্যেই আপনা হইতেই স্বামী-সহবাস-লালায়িতা, ভর্তৃ-ভবন-প্রয়াসিনী হইবে। ইহার জন্য নিষ্কাম ধর্মের উত্তেজনার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই; সকাম ধর্মের প্ররোচনাই যথেষ্ট। নিষ্কাম ধর্মের প্রধান পরীক্ষা, ধর্মবলের অভ্রান্ত পরিচয়, ত্যাগ-স্বীকার। প্রফুল্ল যখন বনে থাকিত, তখন অনেক টাকা বিতরণ করিত সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার ত্যাগ-স্বীকার প্রকটিত হয় নাই। কারণ, প্রফুল্ল সহায়হীনা অবলা, দেশ অরাজক; সুতরাং প্রফুল্ল ইচ্ছা করিলেও এই সম্পত্তি স্বয়ং রক্ষা করিতে পারিত না। তাহার উপর আবার তাহার কেহই ছিল না। কাহাকে লইয়া ঐশ্বর্য ভোগ করিবে? একা ঐশ্বর্য ভোগ করা হয় না, এই যথার্থ কথা ভবানীঠাকুর তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং যে অর্থ প্রথমতঃ রক্ষা করাই নিতান্ত কঠিন, দ্বিতীয়তঃ রক্ষা করিতে পারিলেও, সঙ্গ অভাবে যাহাতে সুখভোগের সম্ভাবনা নাই, তাহার বিতরণে আমরা প্রফুল্লের চরিত্রে বিশেষ মহিমা বা ত্যাগ-স্বীকার দেখিতে পাইলাম না। ভর্তৃভবনে তাহার কার্যে ত্যাগ-স্বীকার প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকারের মুখে শুনিতে পাই, কিন্তু চোখের উপর তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না।

নায়ক ব্রজেশ্বরের চরিত্র ঘৃণার্হ, অথচ গ্রন্থকার সুবিধা পাইলেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। পাষণ্ড হরবল্লভ বলিল, "ব্রজেশ্বর, তুমি আজ রাত্রে তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ঝাঁটা মেরে তাড়ায়ে দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।" পাষণ্ড পুত্র অমনি বলিল "যে আজ্ঞা।" হিন্দু পিতৃমাতৃভক্তি কি স্ত্রীকে ঝাঁটা মারিতে উপদেশ দিয়াছে? নিঃসহায়া, নিরপরাধিনী, শরণাগতা ভার্যাকে ঝাঁটা মারিবার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার হওয়া পিতৃভক্তি নহে। তাহা কাপুরুষতা ও নীচতা। যে প্রফুল্লকে পিতার আজ্ঞায় ঝাঁটা মারিতে সম্মত হইয়াছিল, সেই প্রফুল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পিতাকে লুকাইয়া, রাত্রিতে তস্করের ন্যায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল। পবিত্র

পিতৃভক্তি কখন তস্করবৃত্তিতে পরিণত হইতে পারে না। কাপুরুষ ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি ছিল না, পিতৃভয় ছিল।

ব্রজেশ্বর কেবল কাপুরুষ নহেন। ব্রজেশ্বর নিতান্ত নীচাশয়। শ্বশুরের কাছে টাকা ধার লইতে আসিয়াছেন। শ্বশুর টাকা ধার দিলেন না। তাহাতে শ্বশুরের উপর ভারি চোট। চোট করিয়া খুব ধমক খাইলেন। ধমক খাইয়া রাগটা পদলুণ্ঠিতা স্ত্রীর উপর ঝাড়িলেন। স্ত্রীকে লাথি মারায় কিছু লজ্জার বিষয় আছে, তাহা মনে করিলেন না। বঙ্কিমবাবুর অবশ্য এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, আমাদিগের দেশে কুলীন জামাতাগণ ব্রজেশ্বরের মত নীচাশয়, শ্বশুরের নিকট টাকা না পাইলে স্ত্রীকে অপমান করে।

ব্রজেশ্বরের যে অতিরিক্ত সত্যবাদিতা ছিল না, তাহা গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন-(দুই ?) "একটা lie direct সম্বন্ধে অবস্থা বিশেষে তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না।" গ্রন্থকার প্রফুল্লকেও একস্থানে মিথ্যা কথা কহাইয়াছেন। দুই স্থানেই যেন গ্রন্থকার "অবস্থা—বিশেষে" মিথ্যাবাদিতার অনুমোদন করিয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ধর্মনীতির প্রতি ভ্রূকুটি করিয়াছেন। ঐ দুই স্থানে "অবস্থা-বিশেষে" অর্থে নিজের অর্থাৎ ব্রজেশ্বরের ও প্রফুল্লের সুবিধা বুঝায়। সুতরাং গ্রন্থকারের যেন মত এই বোধ হয় যে, নিজের সুবিধার জন্য দুই-একটা মিথ্যা কহিলে দোষ নাই। এই মত অশ্রদ্ধেয়, অবশ্য বলিতে হইবে। আমরা 'দেবী চৌধুরাণী'কে ধর্মগ্রন্থ বলিয়াছি। কারণ নিষ্কাম ধর্ম প্রচারের সহায়তা করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ধর্মগ্রন্থ দুই এক স্থানে ধর্মবিরোধী মতে দূষিত হইয়াছে, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ইহার যাহাই দোষ থাকুক না কেন, বঙ্গভাষার ইহা একটী অমূল্য রত্ন।

(প্রবন্ধ লহরী—১৩০৩)

কালিদাস ও সেক্সপীয়র

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

পাঠকেরা তুলনায় সমালোচনা বড় ভালবাসেন। সেইজন্য আমরা কালিদাস ও সেক্সপীয়র এই দুই জন বড় বড় কবিকে তুলনায় সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। আমরা কালিদাস ও সেক্সপীয়র মধ্যে কে কেমন লিখিয়াছেন, দেখাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটা বিষয় লইয়া দেখিব, কে জিতিয়াছেন, কে হারিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের দুজনের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, কাহার কবিত্ব-শক্তি অধিক, কাহার অল্প, তাহা নির্ণয় করা বড় শক্ত; বিশেষতঃ আমার মত ক্ষুদ্রজীবী লোকের পক্ষে। যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির পার নাই, তাঁহারাই হঠাৎ বলিতে পারেন, সেক্সপীয়র—ছ্যা—কালিদাসের ছাঁইচ পর্য্যন্ত মাড়াইতে পারে না।

কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ্ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরী সাজানতে, আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস বাছিয়া লইতে হইবে, আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সবগুলি ভাল করিয়া খুলিবে, এই দুটি বুঝিতে তাঁহার মত ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে, সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব, এ ভাব তাঁহার মনে কখন উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাব-শোভা কাহাকে বলে, জানিতেন, চিনিতেন এবং সেগুলা বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন।

সেক্সপীয়রের পক্ষে বাছিয়া লইবার কিছু দরকার ছিল না। তাঁহার দুই চক্ষে যাহাই পড়িত, তাহাই লইতেন, কিন্তু কাজের সময় সেগুলিকে ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতেন। সৌন্দর্য বাছিয়া লইবার তাঁহার দরকার ছিল না, যেহেতু, অসুন্দরকে সুন্দর করিবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। পরের লেখা ছাই-ভস্ম পরিষ্কার করিয়া তিনি শিক্ষানবিসি সাঙ্গ করেন; সুতরাং পরের জিনিস

কিরূপে আপন করিতে হয়, সেটুকু তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল। অসুন্দর বস্তুর উপর কালিদাসের এমনি বিতৃষ্ণা যে, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে কোথাও পাপের বর্ণনা বা কোন বীভৎস রসের বর্ণনা নাই। কিন্তু সেক্সপীয়রের পাপের ছবিই সর্বাপেক্ষা সমধিক উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত। আমরা কালিদাসের শ্মশান-বর্ণনা পাই না, নরক-বর্ণনা পাই না, ম্যাকবেথ পাই না, ইয়াগোও পাই না। কিন্তু সেক্সপীয়রের অদ্ভুত পাপ সৃষ্টি কালিবানকে প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কালিদাস হিমালয় বর্ণনা করিতে গিয়া কোথায় হিমালয়ের প্রকাণ্ডতা দেখাইবেন, প্রকাণ্ড বস্তুর বর্ণনে পাঠকের শরীর কণ্টকিত করিবেন, তাহা না করিয়া হিমালয়ে অপ্সরাগণের মতিভ্রম দেখাইতে বসিলেন; সূর্যকিরণ বক্র করিয়া পুষ্করিণীর পদ্ম ফুটাইতে বসিলেন; আরও কত সুন্দর বস্তু দেখাইয়া হিমালয়কে বিলাস-কাননবৎ করিয়া তুলিলেন। কালিদাসের এইরূপ উৎকট সৌন্দর্যপ্রিয়তা হেতুই তাঁহার পুস্তকাবলীতে এত রমণীয় বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এইজন্যই তিনি কটমট ছন্দঃসূত্র লিখিতে গিয়াও সেগুলিকে প্রিয়া-বিশেষণে পদপ্রয়োগে ললিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই—অন্তর্জগৎ—মনুষ্যের মন; আর বাহ্য জগৎ—নির্মল আকাশ, সুদূর-বিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্ব্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয়, এই দুইএর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর, সবই তাঁহার একচেটে। মনুষ্য-জাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ, রমণী-হৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানা প্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যে-গুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে, সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। বাপ ছেলেকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতেছে, বাপ বনে যাবেন শুনিয়া ছেলে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে, বুড়া বাপ কাঁদিতেছে, প্রিয়তমের অকাল-মৃত্যুতে নব-বিধবা মোহপরায়ণা হইয়া পড়িয়া আছে, প্রিয়ার হঠাৎ বিরহে প্রিয় উন্মত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে, আর যাহাকে পাইতেছে,

প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে; কোথাও লতা, কোথাও ময়ুরকে প্রিয়া-বোধে আলিঙ্গন করিতেছে—এ সব মনুষ্য-হৃদয়ের মোহিনীময় ভাব। এ ভাবের প্রকৃত ওস্তাদ কালিদাস। কিন্তু যেখানে দশ পনরটি পরস্পর বিরোধীভাব যুগপৎ উদয় হইয়া অন্তরাকাশকে অন্ধকার করে, যেখানে হৃদয়ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত, যেখানে ভাবসন্ধি ভাবসবল হইবার কথা, সেখানে কালিদাস আসিবেন না, সেখানে সেক্সপীয়র ভিন্ন গতি নাই। একদিকে দুর্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা রাশি রাশি পাপকার্যে রত হইতে বলিতেছে; আর একদিকে স্নেহ, দয়া, কৃতজ্ঞতা বাধা দিতেছে; একদিকে পাপের স্মৃতি অনুতাপের ভরে হৃদয় ভারাক্রান্ত করিতেছে, আর তখনই সে ভার গোপনের জন্য কার্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া যেন সে নয়, এইরূপ দেখাইতে হইতেছে;—এ সব হৃদ্‌বৃত্তির জটিলতা, মনুষ্য-স্বভাবের অস্থিরতা, পরস্পর-বিরোধী ভাবসমূহের যুগপৎ বিকাশ, সেক্সপীয়র ভিন্ন আর কেহ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারেন নাই, পারিবেনও না। সেক্সপীয়র মানুষ সৃষ্টি করিতে পারেন। তুমি যেমন মানুষ চাও, সেক্সপীয়র তেমনি মানুষ তোমায় দিবেন। তুমি শকুন্তলার মত সরলা, মুগ্ধহৃদয়া সামাজিক কুটিলতানভিজ্ঞা বালিকা চাও, মিরন্দা দেশদিমোনা লও। পাকা গিন্নী ঘরকন্নায় মজবুত, ভাঙ্গে না, মচকায় না, এমন মেয়ে চাও, আচ্ছা তোমার জন্য ডেম কুইকলি আছে। পতিপরায়ণা, পতিরতা যুবতী চাও, পোর্সিয়া আছে। জগৎ মোহিত করিবার জন্য মায়াজাল ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, যে জালে পা দিতেছে, তাহারই সর্বনাশ করিতেছেন, এমন দুর্বুদ্ধিশালিনী ভুবনমোহিনী চাও, ক্লিওপেট্রা আছে। দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত-হৃদয়া, লোকের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছায় পাষাণবৎ দৃঢ়সংকল্পা, পুরুষকে পাপে প্রেরণ করিবার জন্য শয়তানরূপিনী পাপিষ্ঠা দেখিতে চাও, লেডি ম্যাকবেথ আছে। দেখিবে, এগুলি সব মানুষ। অমন যে পাষাণহৃদয় ম্যাকবেথপত্নী, যে রাজ্যলোভে ক্রোড়স্থিত স্তন্যপায়ী আপন শিশুকে আছড়াইয়া মারিতে ক্ষুব্ধ হয় না, সেও স্ত্রীলোক। রাজার মুখ আপন পিতার মুখের মত বোধ হওয়াতে স্বহস্তে রাজহত্যা করিতে পারিল না।

কালিদাস এরূপ মনুষ্য সৃষ্টি করিতে অক্ষম। তিনি মনুষ্য-হৃদয়ের সুন্দর অংশ দেখাইতে পারেন। উদাহরণ—তিনি কণ্বমুনিকে শকুন্তলার ঠিক যাত্রার সময় বাহির করিলেন। যেহেতু, কন্যা-প্রেরণের সময় পিতার কান্না বড়ই সুন্দর। সেটি দেখান হইল, অমনি কণ্বমুনি ডিস্‌মিস্। কালিদাস তাঁহাকে একেবারে লুকাইয়া ফেলিলেন, আর বাহির করিলেন না। শকুন্তলার চিত্রটি পরম সুন্দর, এইজন্য আগাগোড়া শকুন্তলা-চরিত্র আমরা পড়িতে পাই। ওরূপ মুগ্ধ বালিকার প্রথম প্রণয় সুন্দর। সেই প্রণয়ের অনুরোধে দারুণ কষ্ট হইলেও, পিতা-মাতা, সমদুঃখসুখ সখী, চিরপালিত হরিণ-শিশু, চিরবর্ধিত নবমালিকা লতা ত্যাগ করিয়া যাওয়া সুন্দর। রাজা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাকে হাবা মেয়ের মত লুকাইবার চেষ্টা সুন্দর। সে সময়ে একটু রাগ (এ রাগে বাহবা নাই) সুন্দর। এত অপমানের পর নিশ্চয় মিলনের আশা সুন্দর, কাশ্যপ-তপোবনে দেখিবামাত্র সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া একেবারে পামর প্রণয়ীর হস্তে আত্মসমর্পণও সুন্দর। কালিদাস বড় কবি, এত সৌন্দর্য কে দেখাইতে পারে! আবার একটি সুন্দর মনুষ্যের চিত্র দেখিবে? বিক্রমোর্বশী খোল। রাজার স্বভাবটি কেমন সুন্দর। রাজা সূর্যদেবের অর্চনা করিয়া সূর্যলোক হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ অপ্সরাদিগের আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। রাজা শুনিলেন, দৈত্য কেশরী অপ্সরা চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কেশরী হস্ত হইতে উর্বশীর উদ্ধার করিলেন। বীরত্ব যেমন মেয়েদের চিত্ত সহসা আকর্ষণ করে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজার বীরত্বে উর্বশীর তাঁর প্রতি অনুরাগ জন্মিল। ওরূপ অনুরাগ সুন্দর নয়? সুন্দরী অপ্সরা বিদ্যাধরীর অনুরাগ প্রায় নিষ্ফল হয় না। রাজারও মন কেমন হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে ধারিণীর প্রতি বীততৃষ্ণ হইলেন। কিন্তু ধারিণী তাঁহাকে অপমানের শেষ করিলেও তিনি ধারিণীকে একটি উচ্চ বাক্যও বলেন নাই। শেষ ধারিণী প্রিয়প্রসাধন ব্রত করিয়া চন্দ্র-সূর্য-দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিল যে, যে অদ্যাবধি আমার স্বামীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে, আমি তাহাকে ভগিনীর মত দেখিব। কেমন এটি সুন্দর নয়?

উর্বশীর সহিত রাজার মিলনের কিছুদিন পরে হিমালয় পর্বতে রম্য স্থানে বিহার করিবার জন্য উভয়ে প্রস্থান করিলেন। সেখানে বসন্তসময়ে পুষ্পবন-মধ্যে নির্জন প্রদেশে নির্ঝরিণীতটে সান্ধ্য সমীরে শিলাপট্টে পরস্পরের সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করেন। একদিন উর্বশী কার্তিকের বাগানে উপস্থিত। কার্তিক চিরকুমার, তাঁহার বাগানে স্ত্রীলোক গেলে পাছে দেবকার্যের ব্যাঘাত বটে, এইজন্য শাপ ছিল, স্ত্রীলোক সেখানে গেলেই লতা হইয়া যাইবে। উর্বশী লতা হইয়া রহিলেন, রাজা তাঁহার বিরহে উন্মত্ত। মেঘ দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি দৈত্য আবার উহাকে চুরি করিয়াছে। মেঘকে কতকগুলা গালাগালি দিলেন। মেঘ তাঁহার মাথার উপর জলধারা বর্ষণ করিল। রাজা বলিলেন, রে পাপ দৈত্য, আমারই সর্বনাশ করিয়াছিস্, আবার আমারই উপর বাণবর্ষণ? সে ভয়ে থামিল। একটা গাছের উপর ময়ূর গলা বাড়াইয়া কি দেখিতেছে, রাজা বলিলেন, অনেক দূর দেখিতেছ, আমার প্রিয়াকে দেখিতেছ কি? ময়ূর বলিল, কক্ কক্। রাজার মহারাগ, আমি মহারাজ পুরূরবা, আমায় চেন না? বল কি না "কঃ কঃ" বলিয়াই ঢিল, ময়ূরও উড়িয়া যাক। রাজা অনেক কষ্টের পর গৌরী-পদভ্রষ্ট অলক্তকমণিসংযোগে উর্বশীর উদ্ধার সাধন করিলেন। উর্বশী বলিলেন, মহারাজ আর না। আপনি রাজধানী চলুন। রাজা বলিলেন, তুমি মেঘ হও, উর্বশী মেঘ হইলেন, রাজা তদুপরি আরোহণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে প্রয়াগে উপস্থিত। ইহা অপেক্ষা চিত্ত-বিনোদন আর কি আছে? যে কেহ কালিদাসের গ্রন্থ পড়িয়া রাজার সহিত কার্তিকের প্রমোদ-কাননে ভ্রমণ করে নাই, তাহার সংস্কৃত পড়াই অসিদ্ধ।

আমরা এতক্ষণ নাটকের কথাই কহিতেছিলাম, আরও কিছুক্ষণ কহিব। নাটক মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্র লইয়াই ব্যস্ত। সে চিত্রে অনেক সৌন্দর্য কালিদাস দেখাইয়াছেন, কিন্তু আরও অনেক বাকী আছে। সেগুলি কালিদাসে মিলিবে না, তাহার জন্য সেক্সপীয়রের শরণ লইতে হইবে। কালিদাস-গ্রথিত সৌন্দর্য সেক্সপীয়রেরও আছে। কালিদাসের

পুরূরবা, কালিদাসের শকুন্তলা মিলিলেও মিলিতে পারে। কিন্তু সেক্সপীয়রের প্রস্‌পারো আর কোথায় পাওয়া যাইবে? প্রস্‌পারোর স্বভাব মনুষ্য-হৃদয়গত সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। যে শত্রু তাঁহাকে জীর্ণ-শীর্ণ ডিঙ্গিমাত্রে চড়াইয়া অগাধ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছে, যাহার জন্য বারো বৎসর রাজ্য হারাইয়া একাকী জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষমা সামান্য ঔদার্যের কথা নহে। প্রস্‌পারোর গুণে সকলেই বাধ্য। কন্যা পিতার একান্ত বশম্বদ। নেপলসের রাজা উঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। ফর্দিনান্দ উঁহাকে দেবতা মনে করে। প্রস্‌পারো সংসারের কার্যে কেমন দক্ষ, সমস্ত নাটকে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। প্রস্‌পারো মূর্তিমান্ শান্তি, পরোপকার। ক্ষমা তাঁহার আভরণ। কালিবানকে শত অপরাধ সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতা দিলেন, যেহেতু সে তাহাই চায়। এরিয়েলের সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্তোনিওর দোষ প্রমাণ করিয়া দিলে তাহার প্রাণদণ্ড হয়, তিনি কেবল একবার ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন। তিনটা মাতাল তাহার ঘর লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারাও ক্ষমা পাইল। প্রস্‌পারো ক্ষমা করিলেন কিন্তু সকলকেই এক একবার জব্দ করিবার পর। প্রস্‌পারোর চরিত্র পাঠ করিলেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। এ একরকম সৌন্দর্য। আবার যখন ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধিতে বিবাদ হয় সে সময়ের বর্ণনা কি সুন্দর নয়? ব্রুট্‌স্, এণ্টনি, হ্যমলেট, এমন কি ম্যাক্‌বেথ এই বিবাদহেতু কোন কাজই করিতে পারিতেছে না, একবার এদিকে একবার ওদিকে করিয়া দোলাচল-চিত্তবৃত্তি হইয়া রহিয়াছে, ইহা কি সুন্দর নয়? উহাদের জন্য কি আমাদের ক্ষুদ্রজীবী মনুষ্যের সহানুভূতি হয় না? ওরূপ সৌন্দর্য কালিদাসের কোথায়?

তাহার পর আর এক কথা। শুদ্ধ সৌন্দর্য হইলেই কি কাব্যের চরম হইল? সৌন্দর্য ছাড়া আরও অনেক জিনিসে কাব্য হয়। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি; পণ্ডিতেরা বলেন তিন পদার্থে কল্পনাজনিত আনন্দের উৎপত্তি হয়,—প্রকাণ্ড বস্তু দেখিলে, নূতন বস্তু দেখিলে, আর

সুন্দর বস্তু দেখিলে। এই কথাটি যেমন বাহ্য জগতে খাটে তেমনি অন্তর্জগতে। অন্তর্জগতে যখন আমরা কাহাকেও লোকাতীত ক্ষমতা-শালী দেখিতে পাই, যখন দেখিতে পাই যে জিনদেব ব্যাঘ্রী জন্য স্বদেহ অর্পণ করিলেন, যখন দেখি যে রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ বনগমন করিলেন, তখনই আমরা প্রকাণ্ড বস্তু দেখি। তখনই আমাদের মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হয় এবং সেই বিস্ময়মিশ্রিত এক অপূর্ব আনন্দ ও ভক্তির উদয় হয়। কালিদাস এরূপ পুরুষ-প্রকাণ্ডের চিত্র দেখাইতে পারেন নাই। রঘু রাজা যখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞে "মৃৎপাত্রশেষমকরোৎ বিভূতিম্", পার্বতী যখন মদন-দহনের কঠোর তপস্যায় তনু অঙ্গে তাপ দিতে লাগিলেন, তখন যেন এইরূপ প্রকাণ্ড চিত্র দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয়; কিন্তু এক পার্বতীর তপস্যা ভিন্ন আর কোথাও বিস্ময় উদয়-করণে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। সেক্সপীয়রের এইরূপ বিস্ময়-উৎপাদক মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্র অসংখ্য। এরূপ উজ্জ্বল চিত্রের সংখ্যা নাই। সর্বপ্রধান লেডি ম্যাকৃবেথ, একবার অনুতাপ নাই বরং প্রতিজ্ঞা, একবার যখন নামিয়াছি দেখা যাক পাতাল কতদূর। একবার হৃদয়-দৌর্বল্য প্রকাশ নাই, মন প্রত্যুৎপন্নমতি! যখন সভামধ্যে ব্যাঙ্কোর প্রেতমূর্তি আসিয়া ম্যাকৃবেথকে বিহ্বল করিয়া তুলিল, যখন ম্যাকৃবেথ ভয়ে, অনুতাপে জড়ীভূত হইয়া অতি গোপনীয় কথাসকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন লেডি ম্যাকৃবেথের কেমন ক্ষমতা! অন্য মেয়ে হইলে, "ওগো আমার কি হোলো" বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হয়। লেডি ম্যাকৃবেথ সভাশুদ্ধ লোককে বুঝাইয়া দিলেন যে রাজার ঐরূপ মূর্ছা মাঝে মাঝে হয়, এ সময়ে কাছে কেহ আসিলে তিনি বিরক্ত হন। এই বলিয়া নিজে ম্যাকৃবেথের কাছে বসিয়া তাহার দুর্বল মনের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এরূপ চরিত্র পাঠ করিলে কাহার মনে বিস্ময়ের উদয় না হয়?

কল্পনাজনিত আনন্দের আর এক কারণ নূতনতা, অর্থাৎ আজগুবি জিনিস বর্ণনা করা। আরব্য উপন্যাসে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। এরূপ নূতন জিনিস কালিদাস বা সেক্সপীয়র কাহারও

নাই। তবে সেক্সপীয়রের স্পিরিট-ওয়ারল্ড বা পরীস্থান; সেটা যেমন নূতন তেমনি সুন্দর। সবই মনুষ্যের মত কিন্তু কেমন পবিত্র আনন্দময়, কোনরূপ শোক দুঃখ নাই। শোক দুঃখ যে বৃত্তি দ্বারা অনুভব হয় সে বৃত্তিও তাহাদের নাই। অথচ কষ্ট দেখিলে মনটা কেমন কেমন হয়।

Ariel. Your charm so strongly works them
That if you now behold them your affection
Would become tender.
Pros. Dost thou think so, spirit?
Ari. Mine would sir, were I human.

যদি আরিয়াল মানুষ হইত, তবে লোকের দুঃখ দেখিয়া তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইত। ওবেরণের অধীন দেবযোনিগণ মনুষ্যের অদৃষ্ট লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, মনুষ্যের কানে এক প্রকার পাতার রস ঢালিয়া দিয়া এর প্রাণটা ওর ঘাড়ে, ওর পিয়ারের লোক তার ঘাড়ে দিয়া কেমন আমোদ করিতেছে; পড়িলে নূতন জগৎ, নূতন আমোদ, নূতন পরিবর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়, পাঠক নিজেও যেন পরীগণমধ্যে বিলীন হইয়া যান। কালিদাসের চিত্রলেখা, সহজন্যা, মিশ্রকেশী, এমন কি উর্বশী সেক্সপীয়রের পরীস্থানে স্থান পায় না।

সেক্সপীয়রের হাস্যরসাকর চরিত্র বর্ণনা এক আশ্চর্য জিনিস। এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। ফলষ্টাফ কতবার অপ্রস্তুত হইল, কিন্তু সে অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। যতবার তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে, ততবারই সে নূতন নূতন চালাকি বাহির করে, ঠকিবার পাত্র ফলষ্টাফ একেবারেই নহে। প্যারোল্‌স, ফলষ্টাফের সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাসের বিদূষকগুলি কোন কর্ম্মেরই নহে। জীবনশূন্য, প্রভাশূন্য খোসামুদে বামুনমাত্র।

এতদূরে আমরা কালিদাস ও সেক্সপীয়রের তুলনার এক অংশ কথঞ্চিৎ শেষ করিলাম। বিষয় এত বিস্তৃত, সমালোচনায় এত আমোদ যে, সংক্ষেপ করিতে গেলেই কষ্ট হয়। যে অংশ সমালোচিত হইল,

ইহাতে হৃদয়ের প্রবৃত্তি বর্ণনায় কাহার কত বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কল্পনাজনিত সুখ তিন কারণে জন্মে, প্রকাণ্ডতা—সৌন্দর্য ও নূতনতা। প্রকাণ্ডতা—বিস্ময়কর হৃদয়-ভাবের ঔজ্জ্বল্য—বর্ণনায় সেক্সপীয়রের অনুকরণেও কেহ সমর্থ নয়। অতি-নৈসর্গিক পদার্থ-সৃষ্টিতে সেক্সপীয়র অতীব মনোহর, হাস্যরসের বর্ণনায় তাঁহার বড়ই ওস্তাদি। সৌন্দর্য-বর্ণনায়ও যেখানে হৃদয়' বৃত্তির জটিলতা, গভীরতা, সেখানে কালিদাস সেক্সপীয়র হইতে অনেক ন্যূন। যে চরিত্র পাঠে মনের ঔদার্য জন্মে, যে চরিত্র অনুকরণ করিয়া শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহার গন্ধও কালিদাসের নাটকে নাই। তবে যেখানে সহজ অবিমিশ্র হৃদয়ভাবের বর্ণনা আবশ্যক, সেখানে কালিদাসের বড়ই বাহাদুরী। কালিদাসের নাটক পড়িলে গেটের সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা করে "যদি কেহ বসন্তের কুসুম, শরতের ফল, স্বর্গ ও পৃথিবী একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলে! তোমায় দেখাইয়া দিব।"

এতক্ষণ পর্যন্ত যাহা দেখা গেল তাহাতে কালিদাস সেক্সপীয়র হইতে ন্যূন বলিয়া বোধ হইবে। কালিদাসের আর এক মূর্তি আছে, সে মূর্তিতে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। বাইরন জাঁক করিয়া বলিয়াছেন Description is my forte, কিন্তু সেই বাহ্য-জগদ্বর্ণনায় কালিদাস অদ্বিতীয়। সেক্সপীয়র বাহ্য-জগদ্বর্ণনায় হাত দেন নাই, বাহ্য জগৎ বড় গ্রাহ্যও করিতেন না। মানুষের হৃদয়ের উপর তাঁহার আধিপত্য সর্বতোমুখ। তাঁহার যেমন অন্তর্জগতের উপর, কালিদাসের তেমনি বাহ্যজগতের উপর সর্বতোমুখী প্রভুতা। যখন স্বয়ম্বর-স্থলে ইন্দুমতী উপস্থিত হন, তখন কালিদাস দুই চারি কথায় কেমন জম-জমাট হইয়াছিলেন। একেবারে কল্পনানেত্র উন্মীলিত হইল। দেখিলাম প্রকাণ্ড উঠান, বহুসংখ্যক মঞ্চ, অর্থাৎ কথকঠাকুরদিগের মত বেদী, নানা কারুকার্য-খচিত, মহার্ঘ বস্ত্রাস্তরণোপপন্ন, তদুপরি পৃথিবীর রাজগণ বিচিত্র বেশভূষা করিয়া স্বীয় সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন।

তাসু শ্রিয়া রাজপরম্পরাসু প্রভাবিশেষোদয়দুর্নিরীক্ষ্যাঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচিদ্বিভক্তঃ পয়োমুচাং পংক্তিষু বিদ্যুতেব॥

যেমন মেঘমালায় একটি বিদ্যুৎ হইলে সমস্ত মেঘ উদ্দীপ্ত হয় এবং সেই নিবিড় নীলনীরদমালার মধ্যে সেই বিদ্যুৎ যেমন গাঢ়োজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করে, তেমনি রাজারা সব মঞ্চোপরি আসীন হইলে রাজসভার কেমন এক গম্ভীরতা-মিশ্রিত লোকাতীত শোভা হইল। সব জম-জম করিতে লাগিল। এমন সময়ে বন্দীরা স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল—

অথ স্তুতে বন্দিভিরন্বয়জ্ঞৈঃ সোমার্কবংশে নরদেবলোকে।
প্রসারিতে চাগুরুসারযোনৌ ধূপে সমুৎসর্পতি বৈজয়ন্তীঃ॥
পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতোদিগন্তান্ তূর্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥
মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং পীতাম্বরাক্লৃপ্তা বিবাহবেশা॥*

কালিদাস রাজসভার কবি, তিনি নিজেও হয়ত একজন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি পুস্তক লিখেন সভাস্থ ওমরাহদিগের তৃপ্তির জন্য, তাঁহার নিকট আমরা রাজসভা, বিবাহ-সভা, দরবার প্রভৃতি বড়মানুষি জিনিসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পাইব, ইহা এক প্রকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বভাববর্ণনায়ও তাঁহার সমান্তরাল কেহ নাই। বাহ্যজগৎ-বর্ণনায় তিনি যে শুদ্ধ সৌন্দর্যমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন এমন নহে, হিমালয় বর্ণনাস্থলে যাহাই করুন, তাঁহার অনেক বর্ণনা এত গভীর যে ভাবিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাবসৌন্দর্য-বর্ণনাই আমরা বড় ভালবাসি এবং তাহাই অধিক।

কালিদাসের আরও একটি নিসর্গ-বর্ণনা এখানে দেখাইতে হইল।

* চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজগণের বংশাবলী পাঠ হইলে পর উৎকৃষ্ট অগুরু চন্দনের ধূম চারিদিকে প্রসারিত হইল। সে ধূম ক্রমশঃ অত্যুচ্চ পতাকা আক্রমণ করিতে লাগিল। মঙ্গলসূচক তূর্যধ্বনি সবলে ধ্বনিত হইল। তাহার সঙ্গে শঙ্খ প্রধ্মাত হইয়া শব্দ-আবর্ত্ত ঘন গাঢ় হইয়া দিগন্ত পরিপূর্ণ করিল। নগরের প্রান্তবর্ত্তী যে ময়ূরেরা ছিল তাহারা মেঘগম্ভীর তূর্য-মিশ্রিত শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ম্বরা রাজকন্যা বিবাহ-বেশ ধারণকরতঃ মনুষ্যবাহ্য চতুষ্কোণ যান আরোহণ করিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এটী কালিদাসের রঘুর ত্রয়োদশ সর্গ হইতে। রাবণবধ ও বিভীষণের অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে। রাম—সীতার অনেক হাঙ্গামার পর পুনর্মিলন হইয়াছে—পুষ্পকরথ প্রস্তুত। সকলে আরোহণ করিল। পুষ্পকরথ আকাশ-পথে উড্ডীন হইল। রাম সীতাকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমেই সমুদ্র।

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিং।
ছায়াপথেনেব শরৎ-প্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥
তাস্তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥*

সমুদ্রে প্রকাণ্ড তিমি মৎস্যসমূহ রহিয়াছে।

সসত্ত্বমাদায় নদীমুখাম্ভঃ সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ
অমী শিরোভিঃ তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ উর্ধ্বং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্।†

প্রকাণ্ড অজগরগণ সমুদ্রতীরে জল-তরঙ্গের সঙ্গে একাকার হইয়া শয়ন করিয়া আছে।

বেলানিলায় প্রসৃতাঃ ভুজঙ্গাঃ মহোর্মিবিস্ফূর্জথুনির্বিশেষাঃ।
সূর্য্যাংশুসম্পর্কসমৃদ্ধরাগৈঃ ব্যজ্যন্ত এতে মণিভিঃ ফণস্থৈঃ।‡

* বৈদেহি, আমার সেতুতে বিভক্ত অনন্ত ফেনিল নীল সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যেন শরৎকালের অগণ্য-তারকা-ঘটিত নির্মেঘ গগনতল হরিতালীতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ দেখ অনন্ত সমুদ্র দশদিক ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। প্রতিক্ষণেই উহার আকার পরিবর্তিত হইতেছে। সমুদ্রের রূপ বিষ্ণুর ন্যায়, কিরূপ ৫ কত বড় কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারে না।

† তিমি মৎস্য সকল বিকট হাঁ করিয়া নদীমুখের জল মুখে পুরিতেছে। শেষ মাথার ছিদ্র দিয়া সে জল বাহির করিয়া দিয়া নদী হইতে আগত সমস্ত জীবজন্তু ভক্ষণ করিতেছে।

‡ বৃহৎ বৃহৎ অজগর সকল সমুদ্রতীরবায়ু সেবন করিবার জন্য লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। সমুদ্রতরঙ্গের সহিত তাহাদের ভেদ নিরূপণ অতীব কষ্টকর। যদি সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া উহাদের মাথার মণি দ্বিগুণ দীপ্তি না করিত, কাহার সাধ্য চিনিয়া উঠে কোনটা সাপ আর কোনটা নয়।

দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের কূল দেখা গেল।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।*

রথ রামের যেমন অভিলাষ তেমনি চলিতেছে। মুহূর্তমাত্রে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। রাম দেখাইলেন, সীতা দেখ—

এতে বয়ং সৈকতভিন্নশুক্তিপর্য্যস্তমুক্তাপটলং পয়োধেঃ
প্রাপ্তা মুহূর্তেন বিমানবেগাৎ কূলং ফলাবর্জ্জিতপূগমালম্।†

আকাশ-নীরধির স্বৈরগামী প্রমোদ-নৌকার ন্যায় রামের পুষ্পক-রথ জনস্থান, মাল্যবান্, পঞ্চবটী, পম্পা, শরভঙ্গাশ্রম প্রভৃতি পার হইয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সংগমস্থলে উপস্থিত। এখানে নির্মল শ্বেতকান্তি গঙ্গাপ্রবাহ কৃষ্ণকান্তি যমুনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কি অপূর্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে।

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥‡

---

* দূর হইতে সমুদ্রের বেলা দেখা যাইতেছে। বেলা কেমন? তমাল ও তালবনে নীলবর্ণ। বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড লৌহচক্রের কানায় সরু কলঙ্কের রেখা দেখা যাইতেছে।

† এই ত আমরা রথবেগ-হেতু মুহূর্তমধ্যে সমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলাম। এই তীরভূমিতে অসংখ্য সুপারিবৃক্ষ ফলভরে অবনত এবং বালুকার উপরে শুক্তি বিভক্ত হওয়ায় চারিদিকে মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে।

‡ হে সর্বাঙ্গসুন্দরী! গঙ্গা যমুনাতরঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া কেমন শোভা হইয়াছে দেখ। কোথাও বোধ হয় মুক্তার হারের মাঝে মাঝে নীলমণি থাকিয়া

এত মিষ্ট, এত সুন্দর, এমন হৃদয়োন্মাদকর বর্ণনা, প্রকৃতির এত সুনিপুণ অনুকরণ, কল্পনার এমন স্নিগ্ধ দীপ্তি আর কোথায় মিলিবে? আমার ইচ্ছা ছিল আরও উৎকৃষ্ট বর্ণনা উদ্ধার করি, কিন্তু বঙ্গদর্শনের স্থান অতি অল্প; সবই যদি ভাল জিনিসে পুরাইয়া দিই ত আর সব ছাই ভস্ম কোথায় যাইবে?

যখন নাটক ছাড়িয়া মহাকাব্যে উপস্থিত হইয়াছি, তখন কালিদাসের হইয়া আর একটি কথা না বলিয়া থাকা যায় না। নাটকে কালিদাস মনুষ্য-হৃদয়ের যেমন একই রকম চিত্র দেখাইয়াছেন, মহাকাব্যে সেরূপ নহে। মহাকাব্যে মনুষ্যচরিত্র বর্ণনায় তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক কারুকরী প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মনুষ্য-হৃদয়ের উদারতা, বিশালতা, জটিলতা, অহম্মুখতা, চিন্তাপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনে তিনি শেক্সপীয়রের ছাত্রানুছাত্রবৎ। তাঁহার কেবল একটি মনুষ্যচিত্র অনুকরণের অতীত। সেটি কুমারসম্ভবের পার্বতী।

সেক্সপীয়র মহাকাব্য লিখিতে গিয়া যেরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কালিদাসকে সেরূপ হইতে হয় নাই। প্রত্যুত তাঁহার মহাকাব্যই তাঁহার মহাকবি খ্যাতিলাভের মূল কারণ। এ সকলের উপর তাঁহার মেঘদূত। সমস্ত সাহিত্য-সংসারে মেঘদূতের মত সারবান্ কাব্য অতি বিরল। আডিশন পোপের রেপ অব দি লক্‌কে "Mere tinsel or the delicious little thing" বলিয়াছেন। তিনি যদি মেঘদূত দেখিতেন তবে Mere tinsel এ নাম রেপ অব দি লকের দুষ্প্রাপ্য হইত।

আপনার প্রভা যেন মুক্তায় লেপন করিয়া দিতেছে। আর এক জায়গায় শাদা পদ্মের মালায় যেন মাঝে মাঝে নীলপদ্ম বসান রহিয়াছে। কোন স্থানে যেন হংস-শ্রেণী মানস সরোবরে যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে কদম্ব হংসও দুই পাঁচটা আছে। আবার কোথাও যেন পৃথিবী সাম্নচন্দনের টিপ কাটিয়া মধ্যে মধ্যে কালাগুরু দিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও বোধ হয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কেবল মাঝে মাঝে ছায়ার অন্ধকার লুকাইয়া আছে। কোথাও যেন শরৎকালের নির্জল মেঘ, মধ্যে মধ্যে ফাঁক দিয়া নীল আকাশ উঁকি মারিতেছে। আবার একস্থান দেখিতে হঠাৎ বিভূতিভূষিত শিব-অঙ্গে কৃষ্ণসর্প বিহার করিতেছে বোধ হইবে।

মেঘদূতের সঙ্গে তুলনায় অন্য কাব্য আতরের তুলনায় গোলাপ জলের মত। একটী উৎকৃষ্ট পদার্থের সার অংশের উৎকৃষ্টভাব-সংগ্রহ, আর একটী গন্ধ-করা জলমাত্র।

এতক্ষণে আমরা কাব্যের বিষয় লইয়া কালিদাস ও সেক্সপীয়রের তুলনা করিতেছিলাম। তাহাতে এই দাঁড়াইল যে কালিদাসের বাহ্য জগতে যেরূপ অসীম আধিপত্য, তাহা সেক্সপীয়র হইতে ন্যূন নহে। যেখানে হৃদয়ের সুন্দর ও কোমল ভাবগুলি বর্ণনা করিতে হইবে সেখানে বোধ হয় কালিদাস অনেক অধিক মিষ্ট লাগে। কিন্তু অন্য সর্বত্র সেক্সপীয়র উপমা-বিরহিত।

বিষয়ের কথা শেষ হইল, এখন কাব্যের আকার লইয়া তর্ক হইতে পারে। এ তর্কেও কাহার কি দাঁড়ায় দেখা উচিত। কাব্য তিন প্রকার, শ্রব্য, দৃশ্য, আর গীতিকাব্য। ইহার মধ্যে গীতিকাব্যে দুজনেই সমান। কেহই গীতিকাব্য লিখেন নাই, কিন্তু সেক্সপীয়র তাঁহার নাটকমধ্যে যে সমস্ত গান দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে উৎকৃষ্ট গীতিলেখক বলা যাইতে পারে। কালিদাসও কয়েকটি গান দিয়াছেন। বিক্রমোর্বশীর পাহাড়িয়া ভাষায় গানগুলি বড় মিষ্ট। তাহার উপর কালিদাসের মেঘদূত। মেঘদূতকে দেশীয় আলঙ্কারিকেরা খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য বলিয়া কাব্য ভেদ করা তাঁহাদের গায়ের জোর মাত্র। মেঘদূত সার ধরিতে গেলে একখানি গীতিকাব্য, এবং উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকে উহাকে গীতিকাব্যই বলিয়া থাকেন। যখন হৃদয়ে আনন্দ বা শোক ধরে না, তখন তাহাকে কাব্যাকারে বাহির করিয়া দেওয়াই গীতিকাব্য। তবে মেঘদূত গীতি-কাব্য কেন না হইবে?

সেক্সপীয়রের শ্রব্য কাব্য প্রায় লোকে পড়ে না। কালিদাসের শ্রব্য কাব্যগুলি রঘু, কুমার, ঋতুসংহার সকলই পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আদরের বস্তু।

দৃশ্যকাব্য নানারূপ। তন্মধ্যে নাটক প্রধান। সংস্কৃত অলঙ্কারে নাটকের আকার লইয়াই বাঁধাবাঁধি—পাঁচ অঙ্ক নয়, সাত অঙ্ক হইবে,

রাজা নায়ক হইবে, মন্ত্রী হইলে হইবে না। নাটকের যেটুকু নহিলে নয় সেটুকুর উপর তত নজর নাই। কথাচ্ছলে বিচ্ছিত্তিপূর্বক হৃদয়ের ভাব প্রকাশ ও সেই ভাব দ্বারা পরহৃদয়ের ভাব আকর্ষণ এই দুইটি নাটকের সার। নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য কোন উন্নত নীতির শিক্ষা। আমাদের কবিদের এ দুটিতে নজর বড় নাই। এমন কি যে বীজ লইয়া নাটক, অনেক সময় বাজে কথায় ৬ অঙ্ক কাটাইয়া ৭ম অঙ্কে সেই বীজের অবতারণা করা হয়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ১ম, ২য় অঙ্ক না থাকিলে নাটকের কোন হানিই ছিল না; নাটকের বীজ তৃতীয় অঙ্কে। চতুর্থ অঙ্কেও নাটকের কোন উপকার নাই। নাটকের জন্য দরকার রাজার প্রণয়—প্রত্যাখান, অভিজ্ঞান ও মিলন। কিন্তু কালিদাস ত নাটক লিখিতে যান নাই, তাঁহার উদ্দেশ্য এই আদরার উপর এই কাটামতে তাঁহার কাব্য-গ্যালারি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র দেখান। তাহা তিনি খুব দেখাইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। শকুন্তলার মত বালিকার প্রথম প্রণয়ে আড়নয়নে চাহনি বড় সুন্দর? না? কালিদাস সেইটি দেখাইবেন। অনেক চেষ্টা হইল, এক অঙ্ক পূরিয়া গেল, সেটা আর দেখান হয় না, ক্রমে একঘেয়ে রকম হইয়া দাঁড়াইল। কালিদাস বিনা প্রয়োজনে একটা হাতী হাতী বলিয়া গোল (নেপথ্যে) তুলিয়া দিলেন। রাজার গল্প ভাঙ্গিবার উপায় হইল, হাতী কালিদাসের উপকার করিল বটে, কিন্তু নাটকের কিছুই করিল না। সেক্সপীয়র কিন্তু একটি সিন, একটি উক্তিও বিনা প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করেন নাই। অনেক অবুঝ লোকে মনে করিত যে ম্যাক্‌বেথে ঐ যে দরজায় ঘা মারা আছে ওটা কেবল সকাল হইয়াছে, জানাইবার জন্য, সুতরাং উহাতে নাটকের কোন উপকার নাই। কিন্তু ডিকুইন্‌সি দেখাইয়া দিলেন যে ঐ দ্বারে আঘাতে অনেক উপকার হইয়াছে। পাপিষ্ঠ দম্পতী হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া পাপচিন্তায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিল; তাহাদের মন তাহাদের ছিল না, তাহারা আপন পার্থিব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল। দ্বারে আঘাত হইবামাত্র তাহাদের বজ্রধ্বনিবৎ বোধ হইল, তাহাদের মন আকাশভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আবার দেহপিঞ্জরে প্রবেশ

করিল। অন্য কবিরা বারবার বজ্রধ্বনি করিয়া যে গাম্ভীর্য উৎপাদনে অক্ষম, সেক্সপীয়ার সময়-মত বার কত দরজায় ঘা মারিয়া তাহার দশগুণ করিলেন। যে বুঝিল তাহার পর্যন্ত হৃৎকম্প হইল।

এক্ষণে কালিদাস ও সেক্সপীয়র এই উভয়ের তুলনায় সমালোচনা শেষ হইল। সেক্সপীয়র Prince of the Dramatists একথা সত্য বলিয়াই হইল। কিন্তু কালিদাস সকল প্রকার কাব্যই লিখিয়াছেন এবং বোধ হয় নাটক ভিন্ন সর্বত্র কৃতকার্য হইয়াছেন। মহাকাব্যে তিনি বাল্মীকির সমান নহেন সত্য, কিন্তু তিনি ফেলা যান না। নাটকেও তিনি যে ভারতবর্ষের কোন কবি অপেক্ষা হীন, এমত বলিতে পারি না। কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনাময় কাব্য ঋতুসংহার লিখিয়াছেন; এক কথায় বলিলে "ভারতের কালিদাস জগতের।" জগতের সর্বত্রই তাঁহার কবিতার সমান সমাদর। তবে তিনি ভারত ছাড়া কোন কথা লিখেন নাই। ভারতের কথাই তাঁহার কাব্য।

আমাদের উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সেক্সপীয়র মেনকা হইতে পারেন—বাল্মীকি উর্বশী হইতে পারেন, হোমার রম্ভা হইতে পারেন, কিন্তু কালিদাস স্বর্লোকদুর্লভা তিলোত্তমা। সকলেরই উৎকৃষ্টাংশ তাঁহাতে আছে—কিন্তু অল্প পরিমাণে প্রবন্ধ শেষ করিবার সময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—

কালিদাস-কবিতা নবং বয়ঃ মাহিষং দধি শশর্করংপয়ঃ।
এণমাংসমবলাচ কোমলা সম্ভবন্তু 'মম' জন্মজন্মনি ॥*

বঙ্গদর্শন,—১২৮৫

* কালিদাসের কবিতা, যৌবন বয়স, মহিষের দধি, দুধে চিনি, হরিণের মাংস, কোমলা অবলা এই কয়টি যেন আমার জন্ম জন্ম হয়।

প্রমীলা ও ইন্দুবালা

নক্ষত্রনাথ দেব

বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে মেঘনাদবধকাব্য ও বৃত্রসংহার অমূল্য রত্ন। এই দুই কাব্যমধ্যে কোনখানি শ্রেষ্ঠ তাহা সমালোচনা করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই কাব্য-কানন হইতে আজ দুইটি মাত্র কুসুম তুলিয়া একের পার্শ্বে অন্যকে রাখিয়া দেখিব। রাবণের পুত্র মেঘনাদ, তাঁহার প্রিয়তমা ভার্যা প্রমীলা। প্রমীলা দানব-কন্যা এবং রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্রবধূ। ইন্দ্রজিৎ বীর, প্রমীলা বীরাঙ্গনা। ইন্দ্রজিতের হৃদয় বীররসে পরিপূর্ণ, প্রমীলা সেই হৃদয়ের প্রিয় প্রতিমা। প্রমীলার হৃদয়ও বীরভাবাপন্ন, চন্দ্রের ন্যায় তেজ ধারণ করিয়া শান্ত ও জ্যোতির্ময়, ইন্দ্রজিতের বীরত্বে পৌরুষ ভাব আছে, প্রতিফলিত তেজে—প্রমীলাতে—সে পৌরুষভাবের বিকাশ নাই। ইন্দ্রজিতের তেজে দাহকতা আছে, কিন্তু সেই তীব্রতা প্রমীলার তেজে নাই। যুদ্ধে একের আনন্দ, অন্যের উৎসাহ (আনন্দ ইন্দ্রজিতের, উৎসাহ প্রমীলার)। বীর পুরুষ না হইলে বীরাঙ্গনা প্রমীলার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে কি না সন্দেহ। বীরাঙ্গনা-প্রমীলা-হৃদয়ে বীররসের সহিত প্রগাঢ় স্নেহরস মিশ্রিত হইয়া কেমন অপূর্ব ভাব হইয়াছে!

সেই স্নেহ সমুদ্রের ন্যায় গভীর হইয়াও, কর্তব্য-পথে যাইতে বাধা দেয় না। বীরাঙ্গনা সমরভীরু পতিকে ভালবাসিতে পারেন না। স্নেহ ও বীরত্ব যুগপৎ মনুষ্য-হৃদয়ে সচরাচর সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দুইটি একত্র সন্নিবেশিত হইয়া যে হৃদয় নির্মিত, তাহার তুলনা কোথায়? তীব্র হীরকখণ্ড স্বতঃ সুন্দর বটে, কিন্তু স্বর্ণ-সহযোগে আরও মনোহর। বীরাঙ্গনা শত্রু-হস্ত হইতে পতিকে উদ্ধার করিতে পারেন; যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিতে পারেন, সকল অবস্থাতে সহবর্তিনী। আবার যুদ্ধ শেষে বিশ্রামে স্নেহময়ী, স্নেহপূর্ণা। হৃদয়ের দ্বার বিমুক্ত করিয়া, প্রাণাধিক পতিকে স্নেহ-সলিলে ভাসাইয়া শান্তি দান করিতে

পারেন। স্নেহময়ী বীরাঙ্গনা বীরপুরুষের উপযুক্তা পত্নী। ইন্দ্রজিতের যোগ্যা পত্নী প্রমীলা। প্রেমিকা বীরনারী, কবির স্বপ্নময় সৃষ্টির অদ্ভুত সন্নিবেশ। ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলার সহবাস-সুখে সমর-শেষে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ধাত্রীবেশ-ধারিণী—"মাধবরমণী" সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শুনাইলেন।

প্রথমে ইন্দ্রজিৎ কিছু আশ্চর্য হইলেন, পরমুহূর্তে তাঁহার হৃদয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।

"ছিঁড়িল কুসুমদাম রোষে, মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে,—"

কবির কল্পনার মাধুরী দেখ। বীর ইন্দ্রজিৎ কুসুম-আভরণে অলঙ্কৃত। কুসুম প্রেমিকের উপাস্য, কুসুম যোগীর হৃদয়ে ধন, কুসুম বীরের হৃদয়ে স্থান পায় না। যেই প্রেমিকের ভাব বীরভাবে আবৃত হইল, তখনই কুসুমের মাধুর্য হৃদয় হইতে দূর হইল। কোমল-প্রাণ কুসুম অমনি বিচ্যুত হইল। সুরক্তিম কুসুম প্রেমিকের আনন্দ দেখিয়া হৃদয়ে দুলিয়া হাসে, কুসুম বীররসের উদয়ে, উত্তপ্ত হৃদয়ের তেজে মলিন হয়। তাই ইন্দ্রজিতের কুসুমহার অসহনীয় হইল। বীর এবং প্রেমিকের প্রভেদ একটীমাত্র কার্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার কিছু পরে ইন্দ্রজিৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—

"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামা-দল মাঝে,
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ।"

এই বলিয়া যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত বীরসাজে সজ্জিত হইলেন, বীর-অলঙ্কারে বীরতনু ভূষিত করিলেন, যুদ্ধে যাইবেন—এমন সময় স্নেহময়ী বীরপত্নী প্রমীলা আসিয়া প্রাণপ্রিয় পতির হস্ত ধরিয়া কাঁদিলেন

"কোথা প্রাণ-সখে,
রাখি এ দাসীরে কহ, চলিলে আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী।"

বীরবর মেঘনাদ স্নেহপূর্ণ বাক্যে প্রাণপ্রতিমা প্রমীলাকে সান্ত্বনা করিয়া চলিয়া যাইলেন। প্রমীলা নিষেধ করিলেন না, বাধা দিলেন না; আবার প্রমীলাতে দুই ভাবের বিকাশ দেখ। প্রেমময়ী বিরহ-ভয়ে কাতরা, তাই বিরহের উল্লেখ করিলেন। সেই প্রমোদ-কাননের আভরণে অলঙ্কৃতা, সেই প্রমোদগৃহের সুখে বিশুদ্ধা প্রমীলার চক্ষুতে যে জল আসিল তাহা প্রণয়ের উচ্ছ্বাস মাত্র। যেই ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রা শুনিলেন, নীরবে ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিলেন। এখানেও ইন্দ্রজিতের বীর-ভাবের বিকাশ পৌরুষ, প্রমীলার শান্ত ও মধুর। ইন্দ্রজিৎ কুসুমহার ছিঁড়িলেন, "হেথা আমি বামা-দল মাঝে" মনে পড়িল। কিন্তু প্রমীলার বিরহ-শঙ্কার শোক বীরভাবের উদয়ে প্রশমিত হইল। গম্ভীরমূর্তি বীরাঙ্গনা, সাশ্রুবদনে অথচ স্থিরভাবে, স্বামীকে বিদায় দিলেন।

আবার এদিকে, বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড়, তাঁহার কোমলপ্রাণা প্রণয়িনী ইন্দুবালা দানব-রক্ষক বৃত্রের কুল-উজ্জ্বলকারিণী অমূল্য রত্ন। রুদ্রপীড় বীর, রণোৎসাহের প্রবল ঝটিকা প্রতিনিয়ত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত; যুবক বীর্য-সর্বস্ব-প্রাণ। কিন্তু ইন্দুবালা বীরাঙ্গনা নহেন। যুদ্ধ-বার্তা শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, দয়ার উদ্রেক হয়, তাঁহার হৃদয় করুণায় গলিয়া যায়। স্নেহময়ী, প্রেম-বিহ্বলা ইন্দুবালা, যুদ্ধসজ্জা দেখিলে, অশ্রুসিক্ত হইয়া, শতবার প্রাণাধিক পতিকে বাধা দেন। আপনার অমঙ্গল-আশঙ্কায় ভীত হন, অন্যের অমঙ্গলে ব্যথিত ও অশ্রুসিক্তা হন। আপনার শুভ চিন্তা করেন, অপরের সুখে দুঃখে কোমল হৃদয় ঢালিয়া সহানুভূতি প্রদান করেন। সরলতা, কোমলতা, স্নেহ, দয়া, ভালবাসা-বিনির্মিত অপূর্ব চারুছবি ইন্দুবালা আশঙ্কায় সতত আকুলা, জীবন-নিধনে ব্যথিতা। পতি যুদ্ধে বহুসংখ্যক প্রাণী

নাশ করিয়া আসিলে, তিনি কাঁদিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করেন। জীবন-সর্ব্বস্ব পতিকে পাইয়া আনন্দ পান, কিন্তু তাঁহার পতির হস্তে অন্য রমণীর বৈধব্য ঘটিয়াছে ভাবিয়া কাঁদিতে থাকেন। পর-দুঃখ-কাতরা ইন্দুবালা বলেন,—

"পুত্র-শোকাতুরা আহা মাতার রোদন ;
সখিরে, বিদরে হিয়া, বিদরে লো প্রাণ
স্বামি-হীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন ;
ভগিনীর খেদস্বর ভ্রাতার বিয়োগে !
হায়, সখি ! বল্ তোরা বল্ কি উপায়ে
দনুজের এ দুর্দশা ঘুচাইতে পারি
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।"

ইন্দুবালা আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে শান্তি দিতে চান। দুঃখের অশ্রু সহিতে পারেন না।

প্রেমময়ী ইন্দুবালা পতিগত-প্রাণা, প্রাণেশকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতে চাহেন। এক মুহূর্ত্ত চক্ষের বাহিরে যাইলে মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন। স্বর্গীয় ভালবাসা ঢালিয়া পতিকে ডুবাইয়া দেন। তাঁহার জীবন, মন, শরীর সকলই পতিময়। তাঁহার জীবন ভালবাসার নির্ঝরিণী, সকল সময়ে ঝর ঝর করিয়া শান্ত শীতল স্নেহবারি ঝরিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, নিত্য সমান-ভাবে ঝরিতেছে। যদি সেই স্নেহে বাধা পাইল, তাহা হইলে উন্মত্ত বেগবতী নদীর ন্যায়, সম্মুখস্থ বাধাসকল অতিক্রম করিয়া, কল কল নাদে উন্মত্তভাবে অনন্ত-স্নেহ-সাগরাভিমুখে ছুটিতে থাকে। যে সময়ে প্রবল বেগে স্নেহ-বারি বহিল, তখন সংসার ভুলিয়া, আপনি তাহাতে নিমগ্ন হইলেন, এবং স্নেহ-পাত্রকে ডুবাইলেন। সেই স্নেহ-উৎসময় হৃদয়ে সকলই স্বর্গীয় সামগ্রী।

বীরাঙ্গনা স্নেহময়ী প্রমীলা যুদ্ধগামী ইন্দ্রজিৎকে কিরূপে বিদায় দিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি। এইক্ষণে কোমলপ্রাণা স্নেহ-প্রবল-হৃদয়া

ইন্দুবালা কি প্রকারে প্রাণপতি রুদ্রপীড়কে বিদায় দিয়াছিলেন তাহা দেখিব।

কোমল-কুসুমময়ী ইন্দুবালা কল্পতরু-ছায়াতে বসিয়া সহচরীদিগের প্রমুখাৎ যুদ্ধ-সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি শ্বেত-পুষ্পমালায় ভূষিতা, শ্বেত শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া কেমন স্বর্গীয়ভাবে বিরাজ করিতেছিলেন। পরদুঃখে বিসৃষ্ট অশ্রুবিন্দুই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। সেই সময় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রুদ্রপীড় প্রাণপ্রিয়ার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন।

"দূর হ'তে দেখি পতি, উঠিলা শিহরি
ছুটিলা উতলা হ'য়ে ইন্দুবালা বামা।"

প্রাণ-সর্বস্ব পতিকে স্নেহভরে জড়াইয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন—

"হে নাথ, আবার কেন দেখি হেন সাজ!
রণ-সাজে কেন পুনঃ সাজালে সুতনু।"
"খোল প্রভু রণ-সাজ না পারি সহিতে
—কি নিষ্ঠুর হায় তুমি!"

বিহ্বলা বালা প্রাণাধিককে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না; অশ্রুসিক্ত নয়ন পতির পানে তুলিয়া উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীর পুরুষের হৃদয় স্নেহে গলিয়াও অটল, প্রতিজ্ঞাপালনে স্থির। রুদ্রপীড় পত্নীর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন; অশ্রুপূর্ণ হইলেন ও স্নেহময় অশ্রুসিক্ত মুখে তরুণীকে স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। শেষে কর্তব্য-পথে যাইবার নিমিত্ত বিদায় চাইলেন, এবং বিদায় হইলেন। ইন্দুবালা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, কোমল কুসুমহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, শীতল ছায়া সহিতে পারিলেন না, ব্যথিত হৃদয়ে রোদনশীলা ইন্দুবালা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"আকুল সরলা বালা ব্যথিত চঞ্চল,
থাকিতে নারিলা স্থির স্নিগ্ধ শিলাতলে,
স্নিগ্ধ কুসুমের দাম অন্তরে নিক্ষেপি
তরু-ছায়া ত্যজি, গৃহে করিলা প্রবেশ।"

ইন্দ্রজিৎ কুসুমহার ছিঁড়িলেন একভাবে আর ইন্দুবালা ছিঁড়িলেন অন্যভাবে। কার্য্য এক, কিন্তু কারণের বিভিন্নতা আছে। কবি-কল্পনা-সম্ভূত চিত্র সুন্দর, কিন্তু চিত্রের সন্নিবেশে আরও সুন্দর হয়। ইন্দুবালার কুসুমে এত বিরাগ কেন? বিরহ-কাতরা, কুসুমহার পীড়িত বক্ষে ধারণ করিতে পারিলেন না; সুতরাং ইন্দুবালা ফুলহার বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রমীলা বীরাঙ্গনা ও স্নেহময়ী, ইন্দুবালা বীরপত্নী, কিন্তু বীরাঙ্গনা নহেন। প্রেমময়ী সরলা বালা প্রিয়তমের বিপদে রোদন করিতে পারেন; বিচ্ছেদে মরিতে পারেন, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারেন না। সুতরাং গৃহে বসিয়া অশ্রুবিসর্জন তাঁহার কার্য। প্রমীলা স্নেহের আধিক্যে হৃদয়-বেগ সহিতে পারেন না। কি শত্রুশিবির, কি যুদ্ধক্ষেত্র, সকল স্থানেই বীরবালা উন্মাদিনীর ন্যায় প্রবেশ করিয়া প্রণয়ীকে হৃদয়ে ধারণ করেন।

ইন্দ্রজিৎ শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রমীলা ব্যগ্র হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ক্রমে বিলম্ব হইতে লাগিল, দানব-কন্যা চঞ্চলা হইতে লাগিলেন। পতিকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হইল, লঙ্কাপুরে যাইবেন স্থির করিলেন। সখীগণ নিষেধ করিল, কারণ লঙ্কা যে সেই সময় শত্রু-পরিবেষ্টিত। বীরাঙ্গনা নিষেধ শুনিলেন না, গর্বিতা ক্রোধে উত্তর দিলেন।

"—পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী জলধি উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি, নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি।"

বীরাঙ্গনা এই বলিয়া বীরসাজে সাজিয়া সখীদিগকে সঙ্গে লইয়া

শত্রুর হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া গভীর নিশাতে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। প্রমীলার সাহস ও পতিভক্তি দেখিয়া, শত্রু, মিত্র, সকলেই ধন্য ধন্য করিল। প্রমীলার বীরত্বে বীরশ্রেষ্ঠ রামও ভীত হইয়াছিলেন। বীর ইন্দ্রজিৎ চিরস্নেহময়ী প্রমীলাকে ঘোর নিশীথকালে রণ-সাজে সজ্জিত দেখিয়া হাসিয়া কৌতুকে বলিলেন—

"রক্তবীজে বধি বুঝি এবে বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর
পড়ি পদতলে তবে, চিরদাস আমি
তোমার চামুণ্ডে!"

কবি সেই সময় কি সুন্দর বীরত্বময় স্নেহে প্রমীলাকে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠক চেষ্টা করিলেও সেই মূর্তি ভুলিতে পারিবেন না। সকল সময়েই সেই চিত্র অন্তরে জাগিবে।

এদিকে বিরহ-কাতরা, স্নেহ-প্রাণা ইন্দুবালা স্বামী যুদ্ধে গিয়াছেন, সেই চিন্তায় অস্থির, কিছুতেই অস্থির হৃদয় স্থির করিতে পারিলেন না। পতির মঙ্গল-কামনায় অশিবনাশক মহাদেবকে পূজা করিয়া তাঁহার স্থানে পতির মঙ্গলের নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিবেন স্থির করিলেন।

"পতি-গত-প্রাণা সতী ভাবিলা তখন,
করিবে শিবের পূজা পতির মঙ্গল
কামনা করিয়া চিতে, লভি শুভ বর,
নিবারিবে চিন্তাবেগ শান্তির সলিলে।"

সখীগণকে সঙ্গে করিয়া শুদ্ধমতি সাধ্বী, বিধিমত পূজাগারে যাইয়া, মঙ্গলময় স্বয়ম্ভুকে পূজা করিতে লাগিলেন। দৈব-বিপাকে মহাদেবের মস্তকের উপর মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া পড়িল, বিল্বপত্র মস্তক-চ্যুত হইল, তাহা দেখিয়া ধর্মভীতা সাধ্বী ইন্দুবালা শিহরিয়া উঠিলেন। পতির অকুশল ভাবিয়া,

"দর দর দুনয়নে ঝরিল সলিল,
শিহরিল শীর্ণতনু; "হে শম্ভু" বলিয়া
ভূতলে পড়িলা বামা পতিমুখ স্মরি।"

সখীরা ত্বরায় তাঁহাকে দেবালয় হইতে বাহিরে আনিল। রতি আসিয়া নানামত সান্ত্বনা করিলেন। শেষে অপেক্ষাকৃত ধীর হইলেন।

ইন্দ্রপ্রিয়া শচীর সহানুভূতি পাইয়া অশ্রুজল মুছাইলেন। শচী শত্রুর রমণী, তাহা তাহার জ্ঞান নাই; তাঁহার পদতলে বালিকার ন্যায় বসিয়া স্বর্গের এবং দেবতাদিগের বিষয় শুনিতে লাগিলেন।

"প্রভাতের শশী, চারু ইন্দুবালা
শচী-পদতলে, বসি কুতূহলে,
হেরিছে শচীর বিমল বদন,
শুনিছে কৌতুকে বালিকা যেমন
ইন্দ্রাণীর মৃদুমধুর বাণী।"

এদিকে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিবেন সেই আশায় আশান্বিত। জননীর পদে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে আসিলেন, সঙ্গে প্রমীলা।

মাতার করে প্রিয় পত্নীকে সমর্পণ করিয়া যাইলেন। যজ্ঞগৃহে অন্যায় যুদ্ধে লক্ষ্মণের হস্তে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইল। লঙ্কা শোকে হাহাকার করিতে লাগিল। প্রমীলা বীরাঙ্গনা স্বামীর মৃত্যুতে কাঁদিলেন, অস্থির হইলেন, তথাপি শোকে দহিয়া মৃতপতির সহিত জ্বলন্ত অনলে পুড়িয়া মরিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিলেন। আয়োজন হইল, আত্মীয়-বন্ধু মেঘনাদের মৃতদেহ সিন্ধুতীরে লইয়া গেল। অগুরুচন্দন, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি কুসুম সমুদ্রতটে নীত হইল; প্রমীলা বীরাঙ্গনা, বীরসাজে সাজিয়া চিতারোহণ করিবার জন্য সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

"উতরি সাগর-তীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধ চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দন কক্ষে, ঘৃত ভারে ভারে।"

পবিত্র জলে স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, পবিত্র কুসুমমালা গলে দোলাইলেন, অশ্রুময় চক্ষে গুরুজনের পদের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সখীদিগকে মধুর বচনে সম্ভাষণ করিলেন, অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন। গম্ভীর মূর্তি, অকম্পিত, অটল, জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। পতির পবিত্র পদযুগল ধারণ করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। আত্মা অনন্ত স্বর্গে স্বর্গীয় নারীদিগের সহিত অনন্তকাল বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কীর্তিমাত্র সংসারে থাকে, কীর্তিই থাকিল। এই পবিত্র সহমরণ দেখিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবের আশীর্বাদ-ধ্বনিতে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিময় হইল। অপূর্ব চিত্র ও অপূর্ব প্রণয়! অপূর্ব বীরত্ব!

করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র-অশ্রুনীরে,
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।"

প্রমীলার ও ইন্দ্রজিতের জীবন-অভিনয় ফুরাইল, আমরাও দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম। প্রমীলা বীরনারী, মৃত্যুতেও সাহস এবং বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

অন্যদিকে আবার, বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় দেবতার সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করিতে-ছিলেন। আকাশ প্রশংসার ধ্বনিতে কম্পিত। পরিশেষে ইন্দ্রের হস্তে রুদ্রপীড় প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবাসুর, শচী, চপলা সকলেই শোকাকুল হইলেন, তাঁহার মৃত্যুতে

"উঠিলা সমর-ক্ষেত্রে হাহাকার ধ্বনি,
আকুল দনুজ-দল, বক্ষ ভিজাইয়া জল
পড়িতে লাগিল স্রোতে ভাসায়ে নয়ন
নীরব অমর-দল বিষণ্ণ বদন।

উঠিল সে কোলাহল ক্রন্দন-কল্লোলে
কনক সুমেরু-শিরে, নেত্র-যুগে ধীরে ধীরে
শচীর শোকাশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল
সহসা বিবর্ণ-তনু চপলা কাঁপিল।"

হঠাৎ অস্ফুট স্বরে চপলা যেই রুদ্রপীড়ের নাম উচ্চারণ করিলেন, অমনি সেই শব্দ কর্ণে যাইতে না যাইতে পতিপ্রাণা ইন্দুবালা শচীর ক্রোড়ে শেষ শয্যায় প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, কবি কাঁদিয়া গাহিলেন—

"শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল
হায় রে সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে ফুটিবে না আর
ছিন্ন যেন শচী-কোলে, লাবণ্যের হার।"

ভালবাসায় যে আত্মায় আত্মায় সংযোগ তাহাতে পার্থিব গ্রন্থি নাই। এ জগতে এবং জগতান্তরে দুই সেই এক, সুতরাং একের বিয়োগে অন্যেরও বিয়োগ। তাই ইন্দুবালার আত্মা, সেই শান্তি-নিকেতনে, চিরমঙ্গলময় রাজ্যে, স্বর্গীয় জ্যোতিতে আভান্বিত হইয়া, মৃত-পতির আত্মাতে লীন হইয়া, দুইয়ে একটি উজ্জ্বল তারকারূপে সৃষ্টির অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতে লাগিল। প্রেমের পবিত্র চিত্র,—ইন্দুবালার মৃত্যুতেও ভালবাসা!

প্রমীলা ও ইন্দুবালা উভয়েই বীর-জায়া; কিন্তু একে যাহা আছে, অন্যে তাহা নাই। প্রমীলা স্নেহ ও বীরভাবে গর্বিতা, ইন্দুবালায় সবই স্নেহ, সবই মমতা। একজনের হৃদয়, গ্রীষ্মের প্রদোষের ন্যায় জ্যোতির্ময়, শীতোষ্ণ—মধুর। অন্যের হৃদয় শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় তীব্রতা-শূন্য, পূর্ণ মধুর। প্রমীলার হৃদয়ে তীব্র উজ্জ্বলতা আছে, তাহা স্থির মধুরতায় বিভাসিত। কিন্তু ইন্দুবালা কোমল-প্রাণা, আশঙ্কাময় প্রণয়ের উদার মানসিকতায় উজ্জ্বল। ভারতীয় কবিগণ আদর্শ রমণীর চিত্র আঁকিতে অসাধারণ পারদর্শী। সীতা, শকুন্তলা এবং দ্রৌপদী প্রভৃতি জীবিত চিত্রবৎ আজিও ভারতে বিরাজিত। কিন্তু সীতা-চরিত্রে যাহা আছে তাহা শকুন্তলায় কিম্বা দ্রৌপদীতে নাই। আবার দ্রৌপদীতে যাহা আছে তাহা অন্য চরিত্রে নাই। স্নেহ, দয়া, লজ্জা, প্রণয় ও ধর্ম সকল চরিত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, বীরত্ব সহজসাধ্য নহে। কোমলতার সার-সামগ্রীতে সীতা-চিত্র উজ্জ্বল, তাহাতে তীব্রতার রেখাও নাই। রাম-প্রেমমুগ্ধা সীতা, রাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও শতবার রাম

নাম করিয়া আত্ম-বিস্মৃতা হইয়াছেন, অভিমান কি অবিনয় অনুমাত্র নাই। দ্রৌপদী ভালবাসার তীব্র অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও, গর্বিতা, আত্ম-বিস্মৃতা হইতে পারেন নাই। অভিমানে গর্বিতা সাধ্বী প্রণয়-পাত্রের নাম মুখে আনিতে আপনাকে অপমানিতা জ্ঞান করেন। মহাভারত বা কালিদাসের শকুন্তলার সহিত সীতার সাদৃশ্য নাই। বিনয়ে তিনিও সীতার নিকট পরাজিতা। এই তিন চরিত্রে যেমন মিল নাই, তেমনি প্রমীলা ও ইন্দুবালা বিভিন্ন-প্রকৃতি। একে যাহা আছে অপরে তাহা অপ্রাপ্য। উভয় চরিত্রের এত প্রভেদ কেন, জিজ্ঞাস্য। কবির ইচ্ছাসৃষ্টি বলিলে, মাহাত্ম্য কমিয়া গেল। সুকবির কল্পনা হৃদ্-বিজ্ঞানের অধীন। তাঁহার কার্য কাল্পনিক হইয়াও প্রকৃত। তন্নিমিত্ত উভয় চরিত্রের সামঞ্জস্যের এত অভাব কেন, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব। দুই জনের স্বামীই বীর, তবে একে কেন বীর-ভাব স্ফুটিত হইল এবং অন্যে কেবল স্নেহের উৎকর্ষ সাধিত হইল? ইন্দ্রজিৎ বীর; কিন্তু তাঁহার বীরত্বের পরিচয়ে এবং রুদ্রপীড়ের বীরত্বের পরিচয়ে প্রভেদ আছে। রাবণের আক্রোশ দেবতাদিগের উপর, অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন নহে। রাবণের প্রধান সেনাপতি ইন্দ্রজিৎ, অহঙ্কারী পিতার অহঙ্কারী পুত্র। ইন্দ্রজিৎ দেবশত্রু বটেন, কিন্তু তাঁহার শত্রুতায় স্থায়ী প্রতিজ্ঞা নাই। আজ ইন্দ্রকে জয় করিলেন দেখাইবার নিমিত্ত যে ইন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার যুদ্ধ-কৌশল অধিক। কাল কালপরিমেতা সূর্যকে বন্দী করিলেন, দেখাইবার নিমিত্ত যে সময়ে অসময়ে নিয়তি-চক্রের গতিকে বাধা দিয়া তাহাকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী করিতে পারেন।

কিন্তু বৃত্রের দেবাক্রোশ, অহঙ্কার ও ঈর্ষাজনিত। রুদ্রপীড় বৃত্রের প্রধান সেনাপতি। বৃত্র দেবরাজ ইন্দ্রকে পদতলে রাখিলে, অমরাবতী নিজের হইবে, দেব নির্যাতন করিয়া, দেবতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, বিক্রমবান স্বর্গ-রাজ্যে সিংহাসন স্থাপন করিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। তাই তাঁহার দেব-বৈরিভাবে স্থির আসক্তি আছে। লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী দস্যুর ন্যায় দুই এক দিনের যুদ্ধে ইচ্ছা নাই। ইন্দ্রজিৎ চির-যুদ্ধ-জয়ী, ইন্দ্রকে

জয় করিয়াই ইন্দ্রজিৎ নাম গ্রহণ করিলেন। জগতে ইন্দ্রজিৎ অদমনীয় বীর, তাঁহার গৌরবের হ্রাস, তাঁহার গৌরবের লাঘব কিছুতেই নাই। প্রমীলা বুঝিলেন যে তাঁহার চিরন্তন জয়ী পতির প্রাণের আশঙ্কা নাই; তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ে সাহস অধিক। কিন্তু রুদ্রপীড়ের অবস্থা অন্যরূপ। তিনি বীরের ন্যায় পিতার কার্য উদ্ধার করিতেছেন, কখন দেবতারা জয়ী, কখন দৈত্যেরা জয়ী। তিনি বীর বটেন, কিন্তু জয় সর্বদা তাঁহার অনুচর নহে। আর দেবতারা অমর, দৈত্যগণ মর। তাহাতেই ইন্দুবালার হৃদয়ে আশঙ্কা সম্ভব। এদিকে প্রমীলা জানেন যে নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সমাপন করিলে, তাঁহার পতির কিছুতেই বিপদ নাই, তাহাতেও প্রমীলার আর এক সাহস। অন্যদিকে ইন্দুবালা দেখিতেছেন যে, দেবসেনা একবার জয়লাভ করিতেছেন, দৈত্যসেনা অন্যবার। চিরস্থায়ী জয় কোন পক্ষেই নাই। তিনি জানেন বটে যে তাঁহার পতি বীর, অসাধারণ বীর, কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ অজেয় সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ অসঙ্গত নহে। সহজেই তাঁর মন আশঙ্কাময়। প্রমীলার ও ইন্দুবালার এই প্রভেদ বাহ্যিক-অবস্থাগত।

প্রমীলাতে যে প্রণয়, ইন্দুবালাতেও সেই প্রণয়; কিন্তু একের প্রণয় অন্যের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোমলতর। প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যানে বাসন্তীর নিকট নিজের দুঃখের গীত গাইতেছেন। তাঁহার মন নিজ ভিন্ন পরকীয় দুঃখে কাতর নহে। প্রমীলা যে পরের দুঃখে দ্রবীভূত হইতে পারেন না তাহা নহে; কিন্তু কখনও পরের দুঃখের কথা মনে স্থান দেন নাই।

প্রমীলার হৃদয়ে আপন ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা নাই। রাবণ-বংশ প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। পতি, পুত্র, ভ্রাতা-বিয়োগ-কাতরা রমণীর রোদনে লঙ্কা হাহাকার করিতেছে, তথাপি প্রমীলা তাহাতে অনুমাত্র ব্যথিতা নহেন! লঙ্কার অবস্থা একবারও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। আপনার আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার নয়নে স্নেহের অশ্রু দেখা দেয় নাই।

শচীর সহিত ইন্দুবালার আচরণ কি দেব-ভাব-পূর্ণ! শচীর

অপমানে ইন্দুবালা লজ্জিতা, কিম্বা শচীর মন কিসে ভাল থাকিবে, কিসে তাঁহাকে শান্তি ও সুখ দিতে পারিবেন সেই চিন্তায় নিজ দুঃখ শতবার ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সীতার বিষয়ে একটিমাত্র কথা প্রমীলার মুখে নাই। তাঁহার দুঃখে এক মুহূর্ত প্রমীলার মন আর্দ্র হয় নাই। লঙ্কায় যাইয়াও সীতাকে চিন্তা করেন নাই। প্রমীলার প্রণয়ে স্বার্থপরতা এবং বিলাসিকতা আছে। কিন্তু ইন্দুবালার ভালবাসা উদারতাময় ও ইন্দ্রিয়-পরতা-বিহীন।

প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলাকে এবং কল্পতরুছায়ায় ইন্দুবালাকে এক সঙ্গে তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে কাহার হৃদয় স্বার্থময় ও কাহার হৃদয় উদারতাময়। ইন্দুবালার স্নেহ যে স্বার্থশূন্য তাহার সুন্দর পরিচয় অন্যস্থানেও আছে। রুদ্রপীড় যুদ্ধে উন্মত্ত, শচী প্রভৃতি দেব-চক্ষে সেই যুদ্ধ দেখিতে পাইতেছেন।

কোমলপ্রাণা ইন্দুবালা তাঁহাদিগের নিকট বসিয়া অশ্রু-বিমোচন করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভীত কণ্ঠে যুদ্ধের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—সেই চিত্র দেখ।

"পদতলে ইন্দুবালা মলিন-বদনী
শীর্ণালস-কলেবর, অস্ফুট কুসুম থর
মধ্যাহ্নের সূর্য-তাপে বিরস বদন
নিশ্চল, অলস, অর্দ্ধ-মুদিত-নয়ন।"

যুদ্ধ ক্ষেত্রের কোলাহল শুনিয়া—

"জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি
কে পড়িলা রণস্থলে
কোন্ রামা-হৃদি-তলে
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার,
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে সুখের সংসার"

এই কয়েকটি কথা ইন্দুবালার বিশ্বব্যাপী স্নেহের পরিচয় দিতেছে। ভালবাসা ও দয়ার মূর্তিমান্ প্রকাশ ইন্দুবালা—সংসারে দুর্লভ। প্রমীলা-চরিত্র ইন্দুবালার স্বর্গীয় চরিত্রের সহিত তুলনীয় নহে।

ইন্দুবালা দেবকন্যা। প্রমীলা মানবী। কবি বাছিয়া বাছিয়া সমুদয় কোমল সামগ্রী দিয়া ইন্দুবালাকে চিত্রিত করিয়াছেন। বালকের পবিত্র হাস্য, স্বর্গের সুধাময় সঙ্গীত, যুবতীর উন্মত্ত প্রেম, মাতার অপূর্ব স্নেহ, এই সকল উপকরণে জ্যোৎস্নাময়ী ইন্দুবালা নির্মিত। ইন্দুবালা স্মৃতির পরম আদরের দ্রব্য, চিন্তার সুখময়ী মূর্তি। ইচ্ছা করিয়া, শতবার দূরে সরাইয়া দিলেও স্মৃতি মুহূর্তে আনিয়া দিবে। বিস্মৃতি দূরে লইতে পারে না। আবার বলি ইন্দুবালা জগতে অপ্রাপণীয়া। কবির কল্পনা ভিন্ন এই প্রকার রমণী কচিৎ দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায়। কবির সঙ্গীতে জগৎ মুগ্ধবৎ, এবং কবির চিত্রে বিশ্ব প্রত্যক্ষবৎ। যাহা নাই তাহা দেখা যায়, যাহা আছে, তাহা হৃদয়ময় ও চক্ষুময় হইয়া থাকে, সুতরাং এই চিত্র জগতের শিক্ষাস্থল। কল্পনা-সম্ভূত আদর্শ রমণীকে অনুকরণ করিলে সংসারে আদর্শ রমণী হইতে পারে।

কবি ও উপন্যাসলেখক জগতের শিক্ষাগুরু। তাঁহাদিগের নির্জন-প্রসূত চিন্তাতে যত উপকার হইতে পারে এমন কিছুতেই হয় না। তাঁহারা নির্জনে যে ছবি চিত্র করিয়া জগতে পাঠাইয়া দেন, দুর্বল মনুষ্য তাহাতে শিক্ষা পায়। ধর্ম-প্রচারককে দীর্ঘ বৎসরে উপদেশ দিয়া যাহা যাহা করিতে হয়, কবি সেই কার্য অল্পসময়ে করিতে পারেন। ধর্ম হইতে নীতি-শিক্ষা এবং কবিতা হইতে নীতি-শিক্ষার এই প্রভেদ।

প্রমীলার ও ইন্দুবালার চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা হইতে পারে না। এই দুই চিত্র কত দূর, তাহা এক সঙ্গে ধরিলে বুঝিতে পারা যায়। দূর হইতে ভ্রমণশীল পথিকের চক্ষে দুইটীই সুন্দর। চিন্তাশীলের চক্ষে তারতম্য আছে। ইঁহারা কাব্যের প্রধান নায়িকা নহেন। কাব্যে ইঁহাদিগের কার্য অল্পই আছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে চরিত্র প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। সমুদয় কার্যেরই সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম না করিলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তবে প্রমীলার ও ইন্দুবালার চরিত্র যতদূর বুঝিতে এবং জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এই দুই নারী কাব্যের কি কোন উপন্যাসের প্রধান নায়িকা হইলে, কিরূপ হইতেন তাহা কতক অনুমান করিতে পারা যায়।

প্রমীলা বীরাঙ্গনা এবং পতিপ্রেমমুগ্ধা। কিন্তু যদি কোন কাব্যের প্রধান নায়িকা হইয়া প্রণয়-পাত্রের ভালবাসায় নিরাশ হইতেন, তাহা হইলে নিরাশ প্রণয়ের যন্ত্রণায় জীবন বিসর্জন করিতে পারিতেন না।

অভিমানিনী হৃদয়বেগ সহিয়া এবং তাহা গোপন করিয়া আত্মাভিমানে জ্বলিয়া যান, বিনয়ের পরিবর্তে অহঙ্কার দেখান। ঘৃণায়, অপমানে, প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন। তবে যে আপনার হৃদয়ময় ভালবাসা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যান তাহা নহে। প্রণয়ের প্রতিযোগিনী থাকিলে তাহাকে বঞ্চিতা করিতে, ছল বল উভয়ই দেখাইতে প্রমীলা কুণ্ঠিতা হইতেন না। ইন্দুবালা সেই অবস্থায় পতিত হইলে কি করেন? ইন্দুবালা আপনার প্রেম লইয়া সতত মুগ্ধা, প্রণয়ীকে ভালবাসা দান করিয়াই সুখী। নৈরাশ্য মনে স্থান দিতে পারেন না। কারণ প্রণয়ীর প্রতি বিশ্বাস হারাইলে আপনাকে ও তাহাকে নীচ করিতে হয়। সুতরাং তাহা পারেন না। ভালবাসায় নিরাশ হইলে আপনার অসীম ভালবাসা প্রতিনিয়ত নীরব ভাষায়, স্নেহপূর্ণ রোদনে প্রকাশ করেন। অভিমান নাই, গর্ব নাই—জীবনে মরণে সেই স্নেহ, সেই প্রেম। আত্মময় ভালবাসা অনন্তকাল সমান—বিন্দুমাত্র অস্নেহ দেখাইতে জানেন না। শেষ মুহূর্তে পবিত্র ভালবাসা লইয়া ইহজগৎ হইতে স্বর্গে যান। এবং পরলোকেও তাহা লইয়া বিহ্বলা। ইন্দুবালা এতই প্রেমবিমুগ্ধা যে, প্রণয়ীর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেও তাহা জগতে গোপন করিয়া, পরলোকের শান্তিময় হাসি হাসিয়া যান। সেই সময়ও কোমলতা ও রমণীর প্রেম। মৃত্যুর মুহূর্তে স্নেহভরে চুম্বন করিতে পারেন। ইন্দুবালা সকল সময় সম্পূর্ণ স্নেহ-প্রতিমা। প্রতিদানে ভালবাসা সকলেই দিতে পারে। কিন্তু নৈরাশ্যের ঘোর যাতনা সহিয়া, অভিমান-গর্ব ভুলিয়া যে ভালবাসিতে পারে, সেই সম্পূর্ণ ভালবাসার প্রতিকৃতি।

ইন্দুবালা ও প্রমীলার কত প্রভেদ তাহা সহজেই অনুমেয়। চিন্তাশীল পাঠক উভয় চরিত্র চিন্তার সহিত আলোচনা করিলে অবশ্যই বুঝিবেন দেবী ও মানবীতে কত প্রকৃতিগত বিভিন্নতা। তবে প্রমীলা উচ্চস্থানে গর্বিতা রাজ্ঞীর ন্যায় বিরাজ করিতে পারেন। পাপীর দৃষ্টিতে

তাহার চরিত্র দূষিত হইবার নহে, চক্ষুর সেই গর্বিত দৃষ্টিতে তিনি পাপীকে নিক্ষেপ করিতে জানেন।

মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার আদর্শ চরিত্র প্রমীলাকে নির্দোষ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পবিত্র প্রেম অঙ্কিত করিতে দুই একস্থানে ইন্দ্রিয়-সুখের কথা বলিয়াছেন। আত্মাতে আত্মাতে যে প্রণয় তাহাই প্রণয়ের পবিত্র আদর্শ। ভালবাসায় আত্মার সম্মিলন মাত্র, তাহা ইন্দ্রিয়ময় হইলেই তাহার মাহাত্ম্য হ্রাস করিয়া ফেলে। সুতরাং প্রমীলার স্নেহে যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেইখানেই উচ্চতা কমিয়া গিয়াছে। কাব্যের সেই সকল অংশ তুলিয়া প্রমীলার মুখে শুনাইতাম, কিন্তু কবির দোষ-কীর্তন এই সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। রত্নাকর হইতে অমৃত ও বিষ উভয়ই পাওয়া গিয়াছিল। এই কাব্যে অনেক রত্ন আছে। সুতরাং দোষ খুঁজিয়া বাহির করা অসুখ-জনক কার্য।

বৃত্রসংহার সন্ধান করিলে ইন্দুবালার চরিত্রে দোষের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলই নির্মল, সকলই প্রীতিকর। কবি নির্দোষ তুলিকায় ইন্দুবালায় আঁকিয়াছেন। এমন পবিত্র ভাব, এমন বিশুদ্ধ চিন্তা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রধান প্রধান কোন কোন কবি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেখানেই কবিত্বের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, সেইস্থানেই সাংসারিক ইন্দ্রিয়সুখের উল্লেখ করিয়াছেন। কি প্রণয়-বর্ণনা, কি সৌন্দর্য-বর্ণনা, সমুদয়ই প্রায়ই ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রাবল্যে পরিপূরিত। কিন্তু বৃত্রসংহারের কবি সেই ব্যাধিমুক্ত ও উচ্চস্থানীয়। তাঁহার লেখনী বিশুদ্ধ ও পবিত্র।

আর্যদর্শন,—১২৮৫

সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী*

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ উপন্যাস আর দেখা যায় না। বিষবৃক্ষ বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের প্রকৃত ও সুন্দর ছবি।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দুই প্রকার।

প্রথম: ছায়াময়ী কল্পনাময়ী কল্পনার প্রাচুর্যে ও মোহন সৌন্দর্যে, হৃদয়ের অর্ধপ্রস্ফুটিত ভাবগুলিকে শিশিরস্নাত করিয়া ফুটাইয়া তোলা;—দক্ষিণের মেঘের মত হৃদয়ে গোধূলির ম্লানছায়ারঞ্জিত একটী অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া দেওয়া, ও ধীরে ধীরে তূলিকার মৃদুস্পর্শে ও সজোর আঘাতে, তাহাকে বিভাসিত করিয়া হৃদয়কে মাতাইয়া তোলা। নিকট হইতে কেবল বিক্ষিপ্ত বর্ণের সমাবেশ; দূর হইতে একটী সুন্দর ছবি। এইরূপ উপন্যাস ভাবপ্রধান। স্পেন দেশেও কতকটা ফরাশী দেশে এই উপন্যাসের প্রাধান্য।

দ্বিতীয়: প্রকৃত জীবনের রহস্যময়, চিরপরিবর্তনশীল ঘটনাসমূহের সন্নিবেশ। মনুষ্য-চরিত্রের ক্রমবিকাশ, ক্রমপতন, অনুতাপের দাহকারী অনল, আশার ছলনা, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকার, বাসনার অতৃপ্তি, সুখের বিদ্যুৎ-লহরী, দুঃখের সুতীব্র যাতনা, প্রেমের লীলা, সমাজের আবর্ত, হৃদয়ের আবর্ত, জীবন-সংগ্রাম, এক কথায় জীবনের পঞ্চাঙ্ক অভিনয় দেখানই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। জীবনের মহাপথে এই উপন্যাস পথপ্রদর্শক; ইহার বর্ণ সত্যের ন্যায় সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। ইংলণ্ড দেশে এই উপন্যাসের প্রাধান্য। বিষবৃক্ষ শেষোক্ত প্রকারের উপন্যাস। ইহা বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের, বাঙ্গালীর নারীর মাধুরী-মাখা ফুটন্ত ছবি। কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী, ইহার দুইটী সুন্দর চরিত্র।

---

* এই প্রবন্ধ সুহৃৎসমিতির অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

একদিকে লজ্জাশীলা, ভীরুস্বভাবসম্পন্না, আত্মঘাতিনী, সুন্দরী, চপলা বালিকা, অন্যদিকে নিঃস্বার্থপরায়ণা, বুদ্ধিমতী, সংযতা, সাধ্বী, পতিব্রতা স্ত্রী। মমতাহীন সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে, সূর্যমুখী শিক্ষিতা, ধীরা, গম্ভীরা,—অসহ্য পৈশাচিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আপনাকে সামলাইতে সক্ষম। কুন্দ সংসারের বড় ধার ধারে না, সংসার সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা অতি অল্প; সে সরলা, চপলা, মুখচোরা বালিকা; যাকে ভালবাসে, তাকে চায়, ভালবাসার প্রতিদান না পাইলে কাঁদে; আবার সময়ে সময়ে অভিমান ক'রে জলে ডুবিয়া মরিতে যায়। কুন্দনন্দিনী সরলতার মূর্তিমতী ছবি; সূর্যমুখী কর্তব্যতার পূর্ণাভাস। সূর্যমুখী মুখরা ছিল না, কিন্তু যন্ত্রণার তীব্র বিদ্যুৎ-কম্পন যখন তাহার হৃদয় দিয়া বহিয়া যাইত, তখন সে ছুটিয়া গিয়া কমলমণি কিম্বা নগেন্দ্রনাথের কাছে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিত; তাহাতে তাহার কষ্টের কিছু উপশম হইত। কিন্তু কুন্দফুলের উপর যখন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইত, তখন সে কি করিত! কি আর করিবে; আপন দুঃখে আপনি গুমরিয়া মরিত। কুন্দের কথা কহিতে গেলে কথা বেধে যায়, বলি বলি ক'রে বলিতে যায়, কিন্তু বলা আর হয় না—সরমে জড়সড়, নয়নের জল নয়নে রুধিয়া কুন্দ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। কুন্দ প্রাণ খুলে কথা না কহিলেও, তাহার হৃদয়ের অশ্রুসিক্ত হিমবাদল, আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি; তার বুকফাটা নীরব আর্তস্বর আমরা শুনিতে পাই। কুন্দের কাছে পৃথিবী একটী অজানা দেশ; সে অতি সঙ্কোচে, অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া চলে—তার পদে পদে ভয়; সূর্যমুখী আপন কর্তব্য-পথে অস্খলিত চরণে বিচরণ করে,—সে যেখান দিয়া চলিয়া যায়, সেখানে ফুল ফুটিয়া উঠে, ভূমি শস্যশ্যামলা হয়।

কুন্দ উষাময়ী, সূর্যমুখী সন্ধ্যাময়ী। সন্ধ্যার গাম্ভীর্যমাখা শ্রীর সহিত সূর্যমুখীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কুন্দশ্রীতে উষার কমনীয় চঞ্চল ভাব আছে—বালিকা-ভাব উভয়ই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কুন্দ ফুলের কুঁড়ি; সূর্যমুখী ফোটা ফুল। "মাধ্যং কুন্দং"; দুঃখের হিমরাত্রে কুন্দের জন্ম, তাই সে ফুটিতে না ফুটিতে মুকুলেই ঝরিয়াছে।

আর একদিক। একদিকে সূর্যমুখীর প্রবল, অবিরাম, অবিরল, অপ্রতিহত দাম্পত্য প্রেম; অন্যদিকে কুন্দর রূপজ মোহ না হউক, স্বাভাবিক পূর্বরাগ। বঙ্কিমবাবু যাহাকে প্রকৃত ভালাবাসা বলেন, অর্থাৎ যে ভালবাসায় অন্যের সুখের জন্য আত্মবিসর্জন হয়, সেই ভালবাসার পূর্ণতা আমরা সূর্যমুখীতে দেখিতে পাই। সূর্যমুখী স্বামী-সুখে আত্মহারা, স্বামীর চরণে লুণ্ঠিতপ্রাণা, স্বামীর মঙ্গলার্থে আত্ম-বিসর্জন-সক্ষমা। কুন্দের ভালবাসা স্বার্থবিজড়িত না হউক, কিন্তু, নিঃস্বার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ নহে। পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার মঙ্গল বলি দিতে সূর্যমুখী সহজেই পারে, কুন্দ একটু ইতস্ততঃ করে, আপনার সুখের দিকে ছল ছল নয়নে একবার ফিরিয়া তাকায়। কমল বলিল, "সোনার সংসার ছারখার গেল;" কুন্দ বুঝিল; সে কমলের সঙ্গে যাইতে রাজী হইল, চক্ষু মুছিয়া বলিল, "যাব।" কুন্দের এই এক স্বার্থত্যাগ। আর একবার বাপীতটে বসিয়া সূর্যমুখীর কষ্টের কারণ আপনাকে স্থির করিয়া, ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল—এই আর একবার স্বার্থত্যাগ। পতিপ্রাণা, ক্ষমাশীলা, সূর্যমুখীর মত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ, গভীর, প্রাণদায়িনী ভালবাসা কুন্দনন্দিনীতে নাই, না থাকিবারও কথা;—সূর্যমুখী বিবাহিতা, বিবাহের পরেও কুন্দর স্বামী-মঙ্গলের জন্য উত্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই না। কুন্দ নয়ন দিয়া দেখিবার সামগ্রী, হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। কুন্দ বাহিরের সৌন্দর্য; তাহাকে লইয়া ঘরকন্না চলে না। কুন্দ মানবী, বালিকা,—আমরা তাহাকে স্নেহ করি, ভালবাসি, তাহার জন্য অশ্রু ফেলি। সূর্যমুখী দেবী, সংসারী, তাহাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, প্রণাম করি। সূর্যমুখী বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অহঙ্কার, নারী হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

যতক্ষণ হাতে পাই, ততক্ষণ আদর নাই। হাতছাড়া হইলেই মিলন-বাসনা, আকুল-ব্যাকুল তপ্তনিশ্বাস, নিদ্রা-হীন অলস নয়ন, মরণ-আকাঙ্ক্ষা। নগেন্দ্র এককালে সূর্যমুখীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন; হৃদয় দিয়া সান্ত্বনা করিতেন, কি এক মোহিনী মায়া-ডোরে সূর্যমুখীকে

বাঁধিয়াছিলেন,—সূর্যমুখী তাঁর ভালবাসার তীর্থস্থান ছিল। দেখিতে দেখিতে কুন্দ-মোহ-আবরণ নগেন্দ্রের চোখে আসিয়া পড়িল; নগেন্দ্র প্রণয়-বন্যায় গা ভাসাইয়া দিলেন; দেবী-প্রতিমা সূর্যমুখীকে পায়ে করিয়া ঠেলিলেন;—সূর্যমুখী এখন প্রাণপ্রিয়-পরিজন-পরিত্যক্ত, চির সন্তপ্তহৃদয়, অনাশ্রয়, কাঙ্গাল, গৃহত্যাগিনী। সুখবিহ্বল নগেন্দ্র, অকূল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে যখন কিনারায় আসিয়া পড়িলেন, তখন চোখ খুলিলেন, দেখিলেন, প্রাণের সূর্যমুখী আর নাই, তখন তাঁর হৃদয়ে সুখ নাই, শান্তি নাই, মনে মনে বলিলেন, "সূর্যমুখী আমাকে বরাবর ভালবাসিত।" সূর্যমুখী ত তোমাকে বরাবর ভালবাসিত, কিন্তু "বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?" নগেন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি অনুতপ্ত বেশে, পথশ্রমে, মৃত্যুময় জীবন লইয়া, নিশ্বাসকম্পিত, চির-উপেক্ষিত জীবনের ভগ্নাবশেষ খুঁজিতে বাহির হইলেন। অতি দূর হইতে না দেখিলে চিত্রের যথার্থ সৌন্দর্য যেমন উপভোগ করা যায় না, সেইরূপ বিরহের শ্মশান-মন্দিরে না দাঁড়াইলে, মিলনের সুখ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। রাত নাই, দিন নাই, নগেন্দ্র সূর্যমুখীর মিলনাশে ঘুরিতে লাগিলেন, প্রাণে একটা ক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, হয় ত, একটী শ্রীহীন, সুখহীন, শান্তিহীন, কালিমা-মাখা মুখ দেখিতে পাইবেন; দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া, তাহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন—কিন্তু কই! তাহা ত নগেন্দ্রের ভাগ্যে ঘটিল না। সূর্যমুখী আর নাই, নগেন্দ্র যখন এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি নিরাশ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিল, সে সকল ত্যাগ করিবেন, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া সূর্যমুখীর জন্য কাঁদিতে লাগিলেন; সূর্যমুখী স্বামীর কষ্ট দেখিয়া, মান অপমান ভুলিয়া, পতিচরণে লুটাইয়া পড়িল। এদিকে কুন্দ নগেন্দ্রের উপেক্ষায় মর্মাহত হইয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিল।

বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে দুইটী সুন্দর চিত্র দেখাইয়াছেন; একটী পাপীর প্রায়শ্চিত্ত, অন্যটী পত্নীর আত্ম-বিসর্জন। তার মাঝখানে

কুন্দমোহাবরণ। কুন্দের জন্য আমাদের অশ্রুবারি ঝরে, কুন্দ ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া গিয়াছে—নয়ন মেলিতে না মেলিতে নয়ন মুদিয়াছে। সূর্যমুখী, হৃদয়ের শোণিত পরের জন্য হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছিল, যখন সব শুকাইয়া গেল, তখন সে মাটীতে মিশাইল। কুন্দ চটুল স্রোতস্বিনী, সূর্যমুখী গভীর সমুদ্র।

কুন্দমুখী চটুল স্রোতস্বিনী; ক্ষুদ্রপ্রাণা তটিনী যেমন ক্ষীণ স্রোতে, পবনহিল্লোল-শিহরণে, চারিদিকের ঘনশ্যাম অন্ধকার বুকে বাঁধিয়া, আনমনে যেন কাহার অন্বেষণে ছুটিয়া যায়, ও অবশেষে দূর শ্যামল প্রান্তরে কোথায় মিশিয়া পড়ে,—কেহ দেখিতে পায় না; সেইরূপ, শোকতপ্তহৃদয়া কুন্দ, অতৃপ্তবাসনা লইয়া, আশা-নৈরাশ্যময়, আলো-ছায়াময় প্রেম বুকে বাঁধিয়া, নগেন্দ্রের তরে দিন রাত ঘুরিয়া, অবশেষে জীবন-মধ্যাহ্নে কোথায় সরিয়া পড়িল, আর তাকে দেখিতে পাইলাম না। সূর্যমুখী গভীর অসীম সমুদ্র; সমুদ্রের ন্যায় তার প্রেম উদার। সূর্যমুখী নিশিদিন বলিতেছে, "প্রেম চাও, প্রেম দিব, সুখ চাও, প্রাণ দিয়া সুখী করিব।"

কুন্দ-সৌন্দর্যের বাহিরে চমক আছে, কিন্তু যিনি সূর্যমুখীর অগাধ প্রেম-রহস্যে একবার ডুবিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে সূযমুখী জগতের অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত, মনুষ্য-হৃদয়ের অতি আদরের বিরল সম্পত্তি।

কমল পরিপূর্ণ প্রফুল্লতার মূর্তিমতী কল্পনা। কমল সংসারের কাজ খুঁৎখুঁৎ করিয়া করে না; সে যাহা করে, সকল হৃদয় দিয়া হাসি মুখে করে। কমল! ব্যথিত জনের সুখ-শান্তি-কুঞ্জবন। কাতর হৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার জন্য কমলের জন্ম। সূর্যমুখী যখন নগেন্দ্রের বিশাল হৃদয়ের এক পার্শ্বে একটু মাত্র স্থান অন্বেষণ করিয়া জানিত, যে চির-পরিতৃপ্ত, কুন্দ-সৌরভ-পরিপূর্ণ নগেন্দ্র-হৃদয়ে, তাহার একবিন্দু অশ্রুবারি ধরিবারও স্থান নাই; তখন, সে কমলের কাছে ম্লান-মুখে আসিত; কমল হৃদয়ের পার্শ্বে স্থান দিয়া তাহাকে সুখী করিত। কমল যে কেবল শোকে সান্ত্বনা ছিল, তা নয়। অসময়ে বন্ধু ছিল,

বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিত। সূর্যমুখী যখন দেখিল যে, নগেন্দ্র মান-অপমান ভুলিয়া কুন্দর দিকে আকৃষ্ট, তখন মনের দুঃখে কমলকে লিখিল,— "পৃথিবীতে আমার যদি কোন সুখ থাকে ত, সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে যদি আমার কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে। * * * একথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁর মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক, সহজেই বুঝিতে পারি।" উত্তরে কমল লিখিল,—"স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না; স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরাই মঙ্গল।" সূর্যমুখী ভাবিল, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামী-চিত্ত প্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব, তাঁহার চিত্ত অচল পর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত। বোধ হয়, তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল, কমলের উপদেশে আশ্বস্ত হইল। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও সূর্যমুখী যে স্বামীকে কখনও দোষ দেয় নাই ইহাই সূর্যমুখীর হৃদয়ের উদারতা—ইহার জন্যই আমাদিগের সূর্যমুখীকে দেবী বলিয়া ভ্রম হয়।

অম্লানবদনে বলিতে পারি সূর্যমুখী সুন্দরতম, কুন্দ সুন্দরতর; কমল-মণি সুন্দর বলিতে মন উঠে না—কেমন বাধো বাধো ঠেকে। সৌন্দর্য আপেক্ষিক; সৌন্দর্য সৌন্দর্যগ্রাহীর সৌন্দর্য-উপভোগ-ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বেলফুল আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, গোলাপফুল তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে, রজনীগন্ধা তৃতীয় ব্যক্তির সবচেয়ে ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া বলিতে পারি না যে, বেল কিম্বা গোলাপ

কিম্বা রজনীগন্ধা সকলেরই ভাল লাগে। সৌন্দর্য্যের absolute standard নাই। যাহা আমার কাছে নিরুপম সৌন্দর্য, তোমার কাছে তাহা ঠিক বিপরীত হইতে পারে। সময়ে সময়ে দুইটি বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্যও দৃষ্ট হয়। সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, দুইটি বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য।

পতিব্রতা স্ত্রী কাহাকে বলে? না, যিনি "আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা। মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" যে স্ত্রী স্বামীর দুঃখে দুঃখিত, স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীর বিরহে মলিনা ও কৃশা, স্বামী-মরণে মৃতা হইয়া থাকে, সেই স্ত্রী যথার্থই পতিব্রতা। ভালবাসা পাইবার জন্য হৃদয়ের কাতরতা কিম্বা যাকে ভালবাসি, তার উপেক্ষায় মর্মদাহন, পাতিব্রত্যের লক্ষণ নহে—সুখে দুঃখে স্বামীর সহিত আপনাকে সম্পূর্ণ একীকরণই পাতিব্রত্যের লক্ষণ। চাপা দুঃখ—নীরব অন্তর্জ্বালা, পাশ্চাত্ত্য দেশেও ত দেখা যায়; কিন্তু স্বামীর সুখের নিমিত্ত একপ্রাণ, কেবল আমাদের দেশের স্ত্রীতে দেখা যায়, আর আমাদেরও ভাল লাগে। সূর্যমুখীর ন্যায় সাধ্বী, পতিব্রতা স্ত্রী আর কোথাও নাই। জর্জ এলিয়টের টেসার চরিত্রের সঙ্গে কুন্দ-চরিত্রের অত্যল্প সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—সেও কুন্দের ন্যায় একজন সরলা, চপলা বালিকা ও ভালবাসার জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছে। কিন্তু সূর্যমুখীর ছায়াও (অবশ্য সেক্সপীয়র ছাড়া) অন্য কোন দেশের লেখকের চিত্রে দেখা যায় না। সমুচ্চ পর্বতের আশ-পাশে মেঘে ছাইয়া ফেলিলেও, তাহার শিরোভাগ যেমন সূর্যের কনকরশ্মিরূপ মুকুট পরিয়া জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ যন্ত্রণার ভীষণ অন্ধকার সূর্যমুখীর চতুর্দিকে ঘনাইয়া আসিলেও তাহার হৃদয় স্বর্গের আলোকে সমুদ্ভাসিত ছিল।

অনেকে বলেন যে, "সূর্যমুখী এদেশে তত দুর্লভ নহে, কিন্তু সূর্যমুখী অন্য দেশে নিশ্চয় সুদুর্লভা; তদপেক্ষা কমলমণি, এবং কমলমণি অপেক্ষা কুন্দনন্দিনী।" আমার ত মনে ইহা ঠিক নয়। সূর্য্যমুখী এ দেশেও দুর্লভ, কিন্তু যদি কোন দেশে সূর্যমুখী দেখিতে পাওয়া যায়, ত কেবল

এ দেশেই। কমলমণি এদেশে সুলভা হইলেও পাশ্চাত্ত্য দেশে বিরল নহে। কুন্দনন্দিনী এদেশে দুর্লভা, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সুলভা। উপন্যাস-নায়িকা কুন্দনন্দিনী পাশ্চাত্ত্য দেশের সামগ্রী, কিন্তু গৃহবধূর আদর্শস্থল সূর্যমুখী আমাদের দেশের সামগ্রী—তাহার উপর আমাদের একাধিপত্য আছে—অন্যদেশ এইরূপ নারী হইতে বঞ্চিত।

(সাহিত্য, ১৩০২)

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(১)

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্য-শাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। তাঁহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদয় সাহিত্য-শাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ, পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্যপদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ; মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

কোন দেবতার, অথবা সদ্বংশজাত, অশেষসদ্‌গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক সর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন মহাকাব্য আদ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; এক এক সর্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত। সর্গের অবসানে এক, দুই অথবা অধিক অন্য অন্য ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সর্গই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত, এমন নহে। মহাকাব্যে এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও একছন্দে রচিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সর্গ নানা ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সর্গসকল অতি সংক্ষিপ্ত অথবা অতিবিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্ত-সূচনা থাকে। মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা বীররস-প্রধান, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দেশ হয়।

সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাস—প্রণীত রঘুবংশ তৎ-সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশ কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি, আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাসকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ এবংবিধ সম্পূর্ণরূপে স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর, বোধ হয় কোন দেশের কোন কবি উপমা বিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করেন যে পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনা সংস্কৃত-রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা তাঁহার উত্তর-কালে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কি কবি, কি গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত, তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ

এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ বর্ণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সেই সমুদায় সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কালিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। ইহা সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একেবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—এমন অপ্রচলিত যে ঐ দশ সর্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সর্গ, কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও যে, এরূপ অপ্রচলিত ও অপরিজ্ঞাত হইয়া আছে তাহার হেতু এই বোধ হয় জগৎপিতা ও জগন্মাতা সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে।

রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে উৎকর্ষ ও প্রাথম্য অনুসারে, সর্বাগ্রে কিরাতার্জুনীয়ের নির্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের রচনা অতি প্রগাঢ়, কিন্তু কিঞ্চিৎ দুরূহ, কালিদাসের রচনার ন্যায় সরল নহে। ভারবি কবিত্ব-বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা ন্যূন বটেন; কিন্তু ভারতবর্ষের একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন তাহার কোন সংশয় নাই।

শিশুপালবধ কিরাতার্জুনীয়ের প্রতিরূপ-স্বরূপ। মাঘ কিরাতার্জুনীয়কে আদর্শ-স্বরূপ করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোন সংশয় নাই। ভারবি যে প্রণালীতে কিরাতার্জুনীয় রচনা করিয়াছেন, মাঘ শিশুপালবধ রচনাকালে আদ্যোপান্ত সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন।

মাঘ অতি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ও অতি অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি পাইয়াছিলেন। যদি তাঁহার, কালিদাস ও ভারবির স্থায়, সহৃদয়তা থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃত ভাষায় সর্বপ্রধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েই বহু বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাসকল আরম্ভে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসিতেন যে, শেষাংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে দেখিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না। কখন কখন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, একটি শ্লিষ্ট অথবা সুশ্রাব্য শব্দের অনুরোধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন আর কোন অংশেই কোন চমৎকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক, কিন্তু কালিদাসের অথবা ভারবির স্থায় পরিপক্ক নহে।

শ্রীহর্ষের যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়তা ছিল না। তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যুক্তিতে এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার রচনা এমন মাধুর্যবর্জিত, লালিত্যহীন, সারল্যশূন্য ও অপরিপক্ক যে ইহাকে কোন ক্রমেই অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দেশ, অথবা পূর্বোল্লিখিত মহাকাব্য-চতুষ্টয়ের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় না।

শ্রীহর্ষ অত্যন্ত অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনুপ্রাস সাতিশয় মধুর হইয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত অধিক হইলে অত্যন্ত কর্কশ হইয়া উঠে। সুতরাং অনুপ্রাস-বাহুল্য দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন না হইয়া সাতিশয় কার্কশ্যই ঘটিয়া উঠিয়াছে।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দেশ করেন নাই।

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর। বিশেষতঃ দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে হৃদয়গ্রাহিনী শরদ্বর্ণনা আছে, তদ্দারা গ্রন্থকর্তার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু

ব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শন গ্রন্থকর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্তই ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। যদি তিনি ব্যাকরণের উদাহরণ প্রদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া, কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে ভট্টিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই।

এই ছয় মহাকাব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহারাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত প্রচলিত। ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অনুশীলন আছে।

গীতগোবিন্দ জয়দেব-প্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণ-মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনা-বিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্ব-শক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তৎসর্বোৎকৃষ্ট।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সঙ্গীত-সমূহে রাগতানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা ভাষা-সঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলংকারিকেরা তাহাকে খণ্ডকাব্য বলেন। খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের

প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোন কোন খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের ন্যায় সর্গবন্ধে বিভক্ত হয়। আর যে সকল খণ্ডকাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক নহে।

সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্বাংশে সর্বোৎকৃষ্ট। এই অষ্টাদশাধিক শত শ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য কালিদাস—প্রণীত। মেঘদূত এইরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী, এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষ-পত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইত। মেঘদূতের রচনা কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ।

কালিদাস প্রণীত 'ঋতুসংহার' খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলে না। কেহ কেহ ঋতুসংহারকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী এই সকল সর্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার রঘুবংশাদি অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যূন বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কার—বর্জ্জিত ও

সহৃদয় পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতু-সংহারে সেই সমস্ত গুণের সমুদায় লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণন অতিশয় মনোহর।

সংস্কৃত ভাষায় গদ্য সাহিত্য—গ্রন্থ অধিক নাই। যে কয়েকখানি গদ্য-গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাদম্বরী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাদম্বরী গদ্যে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য মধ্যে পরিগণিত। এই গ্রন্থ বাণভট্ট প্রণীত। বাণভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় মহাপণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশাস্ত্রে যে সকল বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থে তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই অসাধারণ। তাঁহার বর্ণনাসকল কারুণ্য, মাধুর্য, ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ়। রচনার বিশেষ প্রশংসা এই, বাণভট্ট যে সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটিও পরিবর্ত্তসহ নহে।

কাদম্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষস্পর্শশূন্য নহে। বানভট্ট মধ্যে মধ্যে শব্দশ্লেষ—ও—বিরোধাভাস—ঘটিত রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও ঐরূপ রচনাকে চিত্তরঞ্জন জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ সকল স্থল যে দুরূহ ও নীরস, ইহা অবশ্যই স্বীকার হইবেক। এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-সমাস-ঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য আছে। এই দ্বিবিধ দোষস্পর্শ না থাকিলে কাদম্বরীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থ অতি অল্প পাওয়া যাইত।

দশকুমারচরিত এক অত্যুত্তম গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু কাব্যাংশে তাদৃশ উৎকৃষ্ট নয়। রচনা অতি উত্তম বটে, কিন্তু কাদম্বরীর রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী নহে। এই গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু বর্ণনা সকল যেরূপ কৌতুকবাহিনী, সেরূপ রসশালিনী নহে। পাঠ করিলে প্রীত ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত সেরূপ গ্রন্থ নয়।

(২)

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায় এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রব্যকাব্য বলে। নাটকের শ্রব্যকাব্যের ন্যায় শ্রবণ হয়; অধিকন্তু, রঙ্গভূমিতে নটদ্বারা অভিনয়কালে, দর্শন হইয়া থাকে। এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য দ্বিবিধ; রূপক ও উপরূপক। রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি দশবিধ। উপরূপক নাটিকা ত্রোটক প্রভৃতি অষ্টাদশবিধ। আলংকারিকেরা দৃশ্যকাব্যের এই যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ ভেদগ্রাহক তাদৃশ কোন লক্ষণ নাই।

প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধর, অর্থাৎ প্রধান নট, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া কবির ও নাটকের নাম নির্দেশ করে এবং প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে। যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পর্যন্ত অঙ্ক-সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত এক ভাষায় রচিত নহে; ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাষাবিশেষে সঙ্কলিত হইয়া থাকে; স্ত্রী, বালক ও অপ্রধান পুরুষদিগের ভাষা প্রাকৃত। প্রাকৃত সংস্কৃতের অপভ্রংশ। অশুভ ঘটনার দ্বারা সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নাই। সংস্কৃত ভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরসপ্রধান নাটক অনেক।

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্যের ন্যায়, সংস্কৃত ভাষায় নাটক ও অনেক আছে। কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সেই সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। এই অপূর্ব নাটকের, আদি

অবধি অন্ত পর্যন্ত, সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। ইহাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুর্থে শকুন্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলার দুষ্মন্ত-সমীপন ও প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শকুন্তলার সহিত পুনর্মিলন; এই সকল স্থলে কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির ঐ সকল স্থল পাঠ করিলে অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা অপূর্ব পদার্থ।

ভারতবর্ষীয়েরাই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন এমন নহে; দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুন্তলার এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা করিয়াছেন। নানাবিদ্যাবিশারদ, অশেষ—দেশভাষাজ্ঞ, সুবিখ্যাত স্যার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা পাঠ করিয়া এমন প্রীত হইয়াছেন যে কালিদাসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কবি সেক্সপীয়রের তুল্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং জার্মান দেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও অতি প্রধান কবি, গেটে, শকুন্তলার স্যার উইলিয়াম জোন্সকৃত ইংরেজী অনুবাদের ফষ্টরকৃত জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া, লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; তাহা হইলে হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"

বিক্রমোর্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে পুরুরবাঃ ও উর্বশীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। বিক্রমোর্বশীর আদ্যোপান্ত শকুন্তলার ন্যায় সর্বাঙ্গসুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়া, পুরুরবাঃ তদীয় অন্বেষণার্থে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বর্ণন আছে, তাহা অত্যন্ত মনোহর—এমন

মনোহর যে, কোন দেশীয় কোন কবি তদপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। মালাবিকাগ্নিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু শকুন্তলা ও বিক্রমোর্বশী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

(৩)

বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব,—এই তিন নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি একজন অতিপ্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিনী ও অতি চমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতি—প্রণীত নাটক-ত্রয়ের রচনা সেই সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি অন্যান্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই যে অন্যান্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান। অনাবশ্যক স্থলে কোন ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি বিশেষ দোষও আছে। রচনার দোষে স্থানের স্থানের অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট; এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘ—সমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে অর্থবোধ ও রসস্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দূষ্য।

বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণবধান্তর অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু

যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, তৎসমুদায় তাদৃশ অধিক নাই। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ লইয়া অন্যান্য কবিরা যে সকল নাটক রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত সেই সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে উত্তম, তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তরচরিতে বীরচরিত—বর্ণিতাবশিষ্ট রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। উত্তরচরিত ভবভূতির সর্বপ্রধান নাটক। এই নাটক করুণরসাশ্রিত। বর্ণনাসকল কারুণ্য, মাধুর্য ও অর্থের গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ়। ফলতঃ শকুন্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরসবিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে ও মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপাত করিতে হয়।

মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি এই নাটকে আপন অসাধারণ রচনাশক্তি ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গর্বিত বাক্যে কহিয়াছেন, "যাহারা আমার এই নাটকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে, তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাব্যের ভাবগ্রহণ-সমর্থ কোন ব্যক্তি এই অসীম ভূমণ্ডলের কোন স্থানে থাকিতে পারেন অথবা কোন কালে উৎপন্ন হইতে পারেন।" * কিন্তু ভবভূতি অসাধারণ উৎকর্ষ সম্পাদার্থে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহংকার প্রদর্শন করিয়াছেন, মালতীমাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই। ইহাতে রচনার চাতুর্য ও মাধুর্য আছে এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য আছে যথার্থ বটে; কিন্তু কালিদাস ও শ্রীহর্ষদেব দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, বৎসরাজ ও রত্নাবলীর উপাখ্যান যেরূপ মনোহর করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতি সেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ, অর্থবোধের কষ্ট ও

* যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

অতিদীর্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদায় মালতীমাধবেই ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়।

রত্নাবলী এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক—এমন উৎকৃষ্ট যে অনেকে রত্নাবলীকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, উৎকর্ষ অনুসারে পৌর্বাপর্যক্রমে গণনা করিতে হইলে, শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নাম নির্দেশ করা উচিত। রত্নাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত। এই নাটকে বৎসরাজ ও সাগরিকার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজদর্শনানন্তর সাগরিকার বিরহ, সাগরিকার সহিত অকস্মাৎ রাজার সাক্ষাৎকার ও রাজমহিষী বাসবদত্তার বেশে সাগরিকার রাজসমাগম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় বর্ণনকালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, বোধহয়, শকুন্তলা ও উত্তরচরিত ভিন্ন প্রায় আর কোন নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মৃচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণনা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মৃচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। গ্রন্থকর্তার নাম শূদ্রক। শূদ্রক বিক্রমাদিত্যের পূর্বে ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক-লেখক সৎকবি ও সংস্কৃত রচনায় অতি প্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের স্থানে স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে; শ্লোক সকল অতি সুন্দর; আদ্যোপান্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল। সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য বটে; কিন্তু সর্বাংশে প্রশংসনীয় নাটক বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, উত্তরচরিত ও রত্নাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্রন্থ আছে, তাহাদিগের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখিত হইল। সংস্কৃত কবিরা আদিরস ও শান্তরস সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস-সংক্রান্ত বর্ণনা তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ তাঁহারা মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ, উদ্ধত, ওজস্বী

ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তদনুরূপ নিপুণ নহেন। নায়ক-নায়িকার প্রথম দর্শন, পূর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগ্য, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী; যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা তদনুযায়িনী নহে।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র
বিষয়ক প্রস্তাব, সংবত (১৯১৩)

অভিজ্ঞানশকুন্তলা

চন্দ্রনাথ বসু

ইহার নাটকত্ব

দুর্বাসার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা। এই ঘটনা আছে বলিয়া শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। নচেৎ উপন্যাস মাত্র হইত। বলা অনাবশ্যক যে উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। আরব্য উপন্যাস নামক গ্রন্থে সহস্রাধিক উপন্যাস আছে; কিন্তু আরব্য উপন্যাস নাটক নহে। যে উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্য—চরিত্রের আভ্যন্তরিক মূল প্রদর্শন করান তাহাকেই নাটকের উপন্যাস বলে। একেই আমি বলি নাটকের নাটকত্ব। সকল নাটকের কথা বলিতেছি না। নাটকের শ্রেণী—বিশেষের কথা বলিতেছি। সেক্সপীয়রের Merchant of Venice এবং কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাটকত্ব কোথায় দেখা যাউক।

নাটকখানির নাম সত্ত্বেও আমার মতে অভিজ্ঞানশকুন্তল একখানি নায়ক—প্রধান নাটক। শকুন্তলা বড় কম নন; কিন্তু দুষ্মন্তই অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রধান চরিত্র। দেখা যাউক এই দুষ্মন্ত কে। কোন একটি মনুষ্যের মন এবং হৃদয় বুঝিতে হইলে অগ্রে তাহার শরীরখানি বুঝিয়া দেখিতে হয়। মন এবং শরীর এ দুইয়ে অতি নিকট সম্বন্ধ। মনের চিত্র শরীরে আঁকা থাকে। অধিকন্তু যাহার যে রকম মানসিক ভাব এবং রুচি তাহার শারীরিক কার্য্যসকলও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নির্জন—চিন্তাপ্রিয় তাহার দেহের স্থির, ক্লিষ্ট এবং সঙ্কুচিত ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উদ্যমপূর্ণ এবং কার্য্যপ্রিয় তাহার দেহের সজীব, চঞ্চল, ঈষদুগ্র এবং বলিষ্ঠ ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়সেবানুরক্ত তাহার দেহের কোমল, অসহিষ্ণু

এবং আলুলায়িত ভাব হইয়া থাকে। কালিদাস দুষ্মন্তকে ইন্দ্রিয়—শাসনাধীন করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরের এবং শারীরিক কার্যানুরাগের একখানি চিত্র আমাদিগকে দিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে দুষ্মন্তকে দেখিয়া তাঁহার সেনাপতি মনে মনে ভাবিতেছেন।

অনবরত ধনুর্জ্জ্যাস্ফালনক্রূরকর্ম্মা
রবিকিরণসহিষ্ণুঃ স্বেদলেশৈরভিন্নঃ।
অপচিতমপি গাত্রং ব্যায়তত্বাদলক্ষ্যং
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥

দুষ্মন্ত রাজা ভারতের অতুল-মহিমা-সম্পন্ন চন্দ্রবংশীয় রাজগণের মধ্যে একজন প্রখ্যাতনামা রাজা; তিনি রত্নগর্ভা ভারতভূমির অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। ঐশ্বর্যসুলভ বিলাসরাশি মনে করিলেই তাঁহার হইতে পারে; কিন্তু তিনি বিলাস-বিদ্বেষী। তিনি বীরোচিত-কার্যনিরত। তিনি শারীরিক সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জ্যা-সম্পন্ন ধনুক হস্তে প্রচণ্ড রবি-কিরণে বীরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকেন। বিলাস মগ্নের ন্যায় তাঁহার দেহ জীবনপ্রভাহীন, শিথিল-গ্রন্থি নয়। গিরিচর হস্তীর ন্যায় সে দেহ কেবলমাত্র বলব্যঞ্জক। এই ছবিখানি দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, চিত্রিত ব্যক্তি অসার-বিলাসপ্রিয় বা ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র। এ কি একজন জিতেন্দ্রিয়, পুরুষকারপূর্ণ পুরুষের ছবি নয়? আবার শুধু তা নয়। যখন সেনাপতি দুষ্মন্তকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহার শারীরিক বীরভাবের এইরূপ প্রশংসা করিতেছেন, তখন দুষ্মন্তের মানসিক অবস্থা কি? শকুন্তলারত্ন দেখিয়া তখন তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্বদাই ভাবিতেছেন, সেই পবিত্র রত্ন তাঁহার হইবে কিনা। বিদূষক আমাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি পূর্বরাত্রে নিমেষমাত্র নিদ্রা লাভ করেন নাই। এবং আমরাও তাহাকে মুহূর্তাগ্রে শয়ন-গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন এবং আসিয়া প্রিয় বিদূষকের নালিশটি শুনিয়াও শুনিতেছেন না। আবার সেই মুহূর্তেই ত সেনাপতি•

আসিলেন; কিন্তু তিনি ত এই বিষম হৃদয়-ব্যথার চিহ্নমাত্রও দুষ্মন্তের শরীরে বা মুখাবয়বে দেখিতে পাইলেন না। তবে ত দুষ্মন্ত শুধু কর্মবীর নহেন। তবে ত তিনি কর্মবীর এবং চিত্তবীর দুইই। তিনি যে শুধু প্রচণ্ড রবি-কিরণ সহ্য করিতে পারেন তা নয়; চিত্ত সংযমও তাঁহার তেমনি অভ্যস্ত এবং স্বেচ্ছাধীন। ফলতঃ কালিদাস এই অদ্ভুত চিত্ত-সংযমের চিত্র-অতিশয় জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়াছেন।

শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া আশ্রমের তরুলতায় জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন এবং কত কি কথা কহিতেছেন। দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া দেখিতেছেন এবং মুগ্ধ হইতেছেন। সর্বলোক-প্রিয় ভ্রমরটি শকুন্তলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া, দুষ্মন্ত মনে মনে ভাবিতেছেন—

যতোযতঃ ষট্‌চরণোহভিবর্ত্ততে ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।
বিবর্ত্তিতভ্রূরিয়মদ্য শিক্ষ্যতে ভয়াদকামাহপি হি দৃষ্টিবিভ্রমম্॥

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করং ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী॥

এ বড় সহজ ভাব নয়। যে ভাবে ভোর হইলে মানুষ চিত্তসংযমে প্রায়ই বিফল-যত্ন হয়' এ সেই ভাব। দুষ্মন্ত এখন সেই ভাবে ভোর। কিন্তু এখনি তাঁহাকে সেই সখীত্রয়ের সম্মুখীন হইতে হইল। এমন অবস্থায় পড়িলে সে রকম ভাব ভরিয়া উঠে, না কমিয়া যায়? প্রিয়ম্বদা বলুক দুষ্মন্তের কি হইয়াছে।

"হলা অনসূএ কোম্ব কৃখু এসো দুরবগাহগম্ভীরাকিদী
মহুরং অলিবস্তো পহুত্তদাকিখন্নং বিতথারোদি।"

ইন্দ্রিয়সন্তপ্ত ব্যক্তির কি এই রকম প্রভাময় গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ মুখ ভাব হইয়া থাকে? ধন্য দুষ্মন্তের চিত্তসংযম, ধন্য তাঁহার আত্মজয়! এখনও কিন্তু দেখিবার বাকি আছে। পাঠক! অভিজ্ঞানশকুন্তলের

তৃতীয় অঙ্কটি মনে কর। শকুন্তলা অসহ্য জালায় জলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে সেই মহাপুরুষকে না পাইলে আমি জীবনান্ত করিব। দুষ্মন্ত অনলপূর্ণ মনে এই সকল দেখিতেছেন এবং শুনিতেছেন, এত যাতনার পর মিলন হইল। কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ করিবার উদ্যম-মাত্রে গুরুজনসমাগমাশঙ্কায় শকুন্তলাকে স্থানান্তরিত হইতে হইল। তখন দুষ্মন্তের কি অবস্থা। তখন তিনি প্রজ্বলিতান্তঃকরণে প্রতি নিঃশ্বাসে অনল শ্বাসিয়া ফেলিতেছেন। সহসা রাক্ষসপীড়িত তাপসগণের ভয়ার্ত্ত রব শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়াই—"ভো ভো তপস্বিনো মাভৈস্ট মাভৈস্ট অয়মহমাগত এব—" এই আশ্বাসবাক্য স্থির গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে রাক্ষস-বধে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যেন শকুন্তলার নামও শুনেন নাই। তাঁহার কিছু হয় নাই। আশ্চর্য পুরুষ।

এই অদ্ভুত ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দুষ্মন্তচরিত্রের প্রশস্ত ভিত্তি, অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা বুঝিতে পারা যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মানুরাগ এবং কর্তব্য-জ্ঞানই সেই অলৌকিক চরিত্রের মূল ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। তখন বুঝিতে পারা যায় যে ধর্মপালন এবং কর্তব্য-সাধনের কাছে দুষ্মন্তের বিবেচনায় আর কিছুই কিছু নয়—তিনি নিজেও কিছু নয়, তাঁহার শকুন্তলাও কিছু নয়, তাঁহার নিজের কিছুই কিছু নয়। তাঁহার ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রতি নিঃশ্বাসে সুমিষ্ট। মৃদুমন্দ মলয় বায়ুর ন্যায় নির্গত হয়। ঋষিগণের সন্তোষার্থ মৃগানুসরণে নিবৃত্ত হইয়া দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—

> "অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলানিহাস্মাকং
> অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি সর্ব্বত্র।"

অয়ে শান্তমিদমাশ্রমদং—তিনটি কি চারিটি বই কথা নয়, কিন্তু শুনিলে প্রাণটি জুড়াইয়া যায়। মনে হয় যেন আমরাই সেই শান্তি-

রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। মনে হয় যেন সেই পবিত্র শান্তিময় তপস্যাশ্রম এবং দুষ্মন্তের প্রশস্ত মন একই পদার্থ। আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সখীত্রয়কে দেখিলেন—তাঁহারা তাপসোপযোগী বল্কল-পরিধানা মণিমুক্তা-বিহীনা, মহামূল্য বস্ত্র এবং অঙ্গরাগবর্জিতা। দুষ্মন্ত রাজা, ভারতের মণিমাণিক্য সকলই তাঁহার, তাঁহার অন্তঃপুর মণিমাণিক্যের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। তিনি একবার মনে করিলেন, এ ঠিক হয় নাই। মনে করিয়াই আবার ভাবিলেন—

> সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
> মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
> ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
> কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥
> কঠিনমপি মৃগাক্ষ্যা বল্কলং কান্তরূপং
> ন মনসি রুচিভঙ্গং স্বল্পমপ্যাদধাতি।
> বিকচসরসিজায়াঃ স্তোকনির্মুক্তকণ্ঠং
> নিজমিব কমলিন্যাঃ কর্কশং বৃন্তজালম্॥

কি মনোহর ভাব! কিবা সুরুচিসঙ্গত কল্পনা! কি ন্যায়পরায়ণ হৃদয়! সৌন্দর্য নিজেই সুন্দর—তাহার আবার পরিচ্ছদ—পারিপাট্য কি? এ কথা কয়জনের মুখে শুনা যায়? এ কথা যে না বলে সে সৌন্দর্যের অবমাননা করে। একথা যে বলে, সে সৌন্দর্যের যাহা প্রাপ্য তাহা সৌন্দর্যকে দেয়, তাহারই রুচি যথার্থ ধর্মমূলক; সৌন্দর্যের সুন্দররূপ ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। দুষ্মন্ত একজন হিন্দু রাজা, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। আশ্রম-প্রবেশ-কালে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল এবং তিনি হিন্দু বলিয়া তাহাতে ভবিতব্যতার কথা মনে করিলেন। পরক্ষণেই যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মতন শাস্ত্রভক্তের মনে সহজেই এমন ভাব জন্মিতে পারে যে বুঝি সেই ভবিতব্যতার সূত্রপাত হইতেছে। আবার শুধু দেখা নয়, যাহা শুনিলেন তাহাতে বুঝিলেন যে শকুন্তলা তপস্বিনীর ন্যায় কাল কাটাইবেন

না। তখন মনোধর্ম তাহার ধর্মসংস্কারকে দূরীভূত করিয়া তুলিল এবং ধর্মসংস্কার মনোধর্মকে প্রশ্রয় দিতে লাগিল। তখন তাঁহার মিলন-স্পৃহা জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। কিন্তু সে স্পৃহা এখনও মিলন-স্পৃহারূপে পরিপুষ্ট হয় নাই; কেবল সৌন্দর্যবোধেই নিহিত রহিয়াছে। দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন—

"অবিতথমাহ প্রিয়ংবদা। তথাহ্যস্যাঃ
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ।।"

তার পরেই শুনিলেন শকুন্তলা চূতবৃক্ষাশ্রিতা কুসুমিতা সহকার-লতাটিকে দেখিয়া বলিতেছেন—

হলা, রমণীও কখু কালো ইমস্‌স পাদবমিহুণসস রদিঅরো সম্বত্তো জেণ নবকুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅং পি বহুফলদাএ উঅভোঅকখমো সহআরো।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গেল; রুচিতে রুচিতে মিলিয়া গেল; ভাবে ভাবে মিলিয়া গেল। কিন্তু একটি বিষয়ে মিল হইল না। শকুন্তলা সহকার—লতাটির আশ্রয়লাভের কথা বলিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্বন্ধে সেটি এখনও বলেন নাই এবং বলিতেও পারেন নাই। দুষ্ট প্রিয়ংবদা সেই অভাবটি পুরাইয়া দিল। দুষ্মন্ত বুঝিলেন যে শকুন্তলা অভিলাষবতী হইয়াছেন। কিন্তু তিনি আহ্লাদে আটখানা না হইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন বুঝি শকুন্তলা কণ্বদুহিতা ব্রাহ্মণী, তাঁহার সহিত শকুন্তলার মিলন হইতে পারিবে না। যেমন অভিলাষ ফলবতী হইয়া উঠিল অমনি ধার্মিকের ধর্মচিন্তা উদয় হইল। এইখানে সুচতুর মহাকবি জগদ্বিখ্যাত ভ্রমর-তাড়না ঘটনাটি সংযোজন করিলেন। সে ঘটনাটির অর্থ—শারীরিক মিলন, শারীরিক সম্ভোগ। অভিলাষীর মনকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে ইহার অপেক্ষা সুরুচিসঙ্গত অথচ বলবৎ কৌশল অবলম্বন করা যায় কিনা সন্দেহ। দুষ্মন্তের বিচলিত মন আরো বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে

শকুন্তলার জাতি-উৎপত্তি-বিষয়ক সন্দেহ আরো বলবৎ হইয়া উঠিতেছে। বোধ হয় দুষ্মন্তের ধর্মানুরাগ এবং আত্মসংযম-শক্তি কম হইলে সেই দণ্ডেই পবিত্র তপস্যাশ্রম কলুষিত হইয়া যাইত। তারপর সকলের একত্রে বসিয়া কথোপকথন। তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার বৃত্তান্ত শুনিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে কণ্বের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। জানিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভার মোচন হইয়া গিয়াছে। তিনি তখন সাহস পাইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় বুঝিয়াছে যে—

আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

এমন সময়ে প্রিয়ম্বদার কথায় শকুন্তলা রাগ করিয়া 'সব বলিয়া দিব' বলিয়া গৌতমীর কাছে যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্তের হৃদয় আকুলিত হইয়া শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে বলিয়া যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই তখনি আবার সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—

অহো চেষ্টানুরূপিণী কামিজনচিত্তবৃত্তিঃ। অহং হি
অনুযাস্যন্মুনিতনয়াং সহসা বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ
স্বস্থানাদচলন্নপি গত্বেব পুনঃ প্রতিনিবৃত্তঃ॥

দুষ্মন্ত শকুন্তলার মন বুঝিয়া থাকুন আর নাই থাকুন শকুন্তলার উপর এ পর্যন্ত তাঁহার কোন অধিকার জন্মে নাই। তিনি গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কে? যে রকম কথাবার্তা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলাকে চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কেন না দেখিয়া শুনিয়া হৃদয় ভয়ানক আবেগমান হইয়া উঠিয়াছে। দুষ্মন্ত ধর্মবীর.। তাঁহার হৃদয়ের বল্গা তাঁহারই হাতে। সেই হৃদয়ের অশিষ্ট উদ্যম সেই হৃদয়েই নিঃশেষিত হইয়া গেল। পান থেকে চূনটুকু ও খসিল না। ধন্য দুষ্মন্ত! ধন্য কালিদাস!

তারপর বিদূষকের সহিত কথা। সেকালের বিদূষক সেকালের রাজাদের 'ইয়ার'। রাজাদিগকে সর্বদাই রাজ-ঠাটে থাকিতে হইত,

মনের কথা সকলের কাছে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু বিদূষকের ঠাটভাট থাকিত না; প্রাণের কথা প্রাণ ভরিয়া বলিতেন। মাধব্য দুষ্মন্তকে যেন কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

ভো জঙ্গসা তবস্সিকণ্ণয়া অনত্তুত থণীয়া তা কিং তাএ দিঢঢআত্র।

তেমনি দুষ্মন্ত যেন বিষধর-দংশিতের ন্যায় মর্মপীড়িত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ধিঙ্‌মূর্খ!
নিবারিতনিমেষাভির্নেত্রপংক্তিভিরুন্মুখঃ।
নবামিন্দুকলাং লোকঃ কেন ভাবেন পশ্যতি॥
ন চ পরিহার্য্যে বস্তুনি দুষ্মন্তস্য মনঃ প্রবর্ত্ততে।

তারপর রাজা পূর্বদিনের সকল কথা মাধব্যকে বলিলেন। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল দেখি মাধব্য, কি অছিলা করিয়া সেই আশ্রমে যাই। মাধব্য বলিলেন কেন, আমার ষষ্ঠাংশ চাই, বলিয়া যাও। দুষ্মন্ত রুদ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

মূর্খ! অন্যমেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো
মে নির্বপন্তি যো রত্নরাশীনপি বিহায়াভিনন্দ্যতে।
পশ্য—যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম
তপঃ ষড়্‌ভাগমক্ষয্যং দদত্যারণ্যকা হি নঃ।

কি গম্ভীর, কি দুর্জয় ধর্মভাব! কি মনোহর ধর্মানুরাগ! যে শকুন্তলার জন্য হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সে শকুন্তলাও এই ধর্মানুরাগের কাছে কিছুই নয়! শকুন্তলা যতই কেন প্রিয় হউন না, তা বলিয়া তাহার জন্য পবিত্র ধর্মের অবমাননা করা হইবেক? তা বলিয়া কি ধর্মকে প্রেমের কুটিল কৌশলে পরিণত করিয়া ঘৃণাস্পদ করিতে হইবেক? বিদূষকের কাছেও এ কথা বলিতে দুষ্মন্তের ঘৃণা হয়।

তারপর কয়েকজন তপস্বী আসিয়া দুষ্মন্তকে রাক্ষস কর্তৃক আশ্রম-পীড়ার সম্বাদ দিলেন। দুষ্মন্ত তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া রথসজ্জা

করিবার আজ্ঞা দিলেন; রথ সজ্জিত হইল। এমন সময় রাজধানী হইতে মাতৃ-আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারই কল্যাণার্থ রাজমাতা ব্রত করিবেন, অতএব তাঁহাকে যাইতে হইবেক। দুষ্মন্ত সঙ্কটে পড়িলেন। ঋষিগণ যেমন মাননীয়, রাজমাতাও তেমনি মাননীয়া। "ইতস্তপস্বিনাং কার্য্যমিতো গুরুজনাজ্ঞা উভয়মনতিক্রমণীয়ম্।" তিনি জানিতেন যে রাজমাতা মাধব্যকে বরাবরই পুত্রবৎ ভালবাসেন। অতএব স্নেহ এবং ভক্তিপূর্ণ মনে মাধব্যকে রাজমাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কবি একটি কৌশলে তাঁহার আখ্যায়িকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করিলেন এবং তাঁহার দুষ্মন্ত যে কাহারও প্রতি কর্তব্য-বিমুখ নন, তাহাও সুন্দররূপে দেখাইয়া দিলেন।

দুষ্মন্ত রাজা। কিন্তু কালিদাস কি তাঁহার রাজকার্যের কথা কিছুই বলেন নাই। সে কথাটি না জানিলে ত কিছুই জানা হইল না। মুনিঋষিকে সম্ভ্রম করিয়া থাকেন, পিতামাতার ন্যায় গুরুজনকে ভালবাসেন এবং সম্মান করেন; তিনি চিত্তসংযমে অমিতবাস, ধর্মসেবায় একাগ্রচিত্ত; প্রণয়ে বিশুদ্ধমনা, শত্রু-পাশে অসীম-বিক্রম; শরীর-পালনে কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তিনি রাজকার্যে কিরূপ? কালিদাস তাহাও আমাদিগকে বলিয়াছেন। কিন্তু যে প্রণালীতে বলিয়াছেন সেটি কি চমৎকার! কঞ্চুকী পার্বতায়ন, অক্ষয়-নামা মিবার-মন্ত্রী ভামাসার ন্যায়, রাজসরকারে থাকিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন। যে যষ্টি যৌবন-কালে তাঁহার উচ্চ পদবীর চিহ্নস্বরূপ ছিল, সেই যষ্টি এখন তাঁহার অন্ধের নড়ি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে যষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে এখন তিনি পদচালনে অক্ষম। তিনি যে শুধু দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন এমত নয়। দুষ্মন্তের পিতা, পিতামহ, হয় ত প্রপিতামহকেও দেখিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার কাছে 'কালিকার ছেলে' বই নয়। শার্ঙ্গরব প্রভৃতি রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজদর্শনের প্রার্থনা জানাইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ বহুদর্শী কঞ্চুকী ভাবিতেছেন—যে প্রজাবৎসল নরপতি রাজকর্মরত, পরিশ্রান্ত হইয়া এইমাত্র অবকাশ লাভ করিলেন, আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে এখনি ঋষিকুমারদিগের

আগমন-সংবাদ দিব? কি স্নেহ! পিতাও সন্তানের ক্লেশে এতদূর কাতরতা প্রকাশ করেন কি না সন্দেহ। দুষ্মন্তের প্রজাপালন-কার্যানুরাগের ইহার অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কবি ইহার অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী প্রমাণ দিয়াছেন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী একবার মাত্র স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পরক্ষণেই সুদৃঢ়চিত্তে বলিতেছেন—

অথবা কুতো বিশ্রামো লোকপালানাম্।

তিনি কি রকম রাজা যাঁহার কর্মচারীর এত কর্তব্য-নিষ্ঠা, এত রাজনীতিপ্রিয়তা, এত সাহস ও দৃঢ়তাপূর্ণ মন? কঞ্চুকি, তুমি যথার্থই অনুপম রাজার অনুপম কর্মচারী! বৃদ্ধবর! তুমি দুষ্মন্তকে 'কচি ছেলে' বলিয়া মাপ করিবার লোক নহ। তুমি যখন দুষ্মন্তকে এত ভালবাস তখন দুষ্মন্ত যথার্থই সমস্ত জগতের ভালবাসার পাত্র এবং পৃথিবীর রাজাদিগের আদর্শস্থান।

দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শকুন্তলা দুর্বাসা কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইলেন। অবশিষ্ট আখ্যায়িকাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবেক। শাপোচ্চারণ হইতে অঙ্গুরীয়ক-পুনঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত এক ভাগ; অঙ্গুরীয়ক-পুনঃপ্রাপ্তি হইতে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন পর্যন্ত আর এক ভাগ। কি জন্য এইরূপ ভাগ করিতে হইল বুঝাইতেছি।

দুর্বাসা বলিয়াছিলেন যে, দুষ্মন্ত-প্রদত্ত নিদর্শনটি দেখিলে তাঁহার মনে পড়িবে, নতুবা মনে পড়িবে না। শকুন্তলা সেই নিদর্শনাঙ্গুরীয়ক হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু জানেন না হারাইয়াছেন। এ ঘটনার যে কি চমৎকার অর্থ তাহা পরে বলিব, এখন নয়। অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া শকুন্তলা তাঁহার পবিত্র বিশ্বমনোমুগ্ধকারী রূপরাশি লইয়া দুষ্মন্তের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

পাঠক! তোমাকে এইক্ষণে একবার সেই বল্কল-পরিধানা, কুসুমিতা যৌবনা, পবিত্রনয়না, লতামৃগানুরাগিনী, আশ্রমবাসিনী

তাপসবালার রূপরাশি মনে করিতে হইবেক। যে রূপরাশি দেখিয়া ধর্মবীর দুষ্মন্ত সেদিন দুর্নিবার—শরবিদ্ধ হইয়াছিলেন. সেই রূপরাশি একবার মনে করিতে হইবেক। এখনও সেই রূপরাশি দুষ্মন্তের নয়ন মন বিমুগ্ধ করিতেছে।

অয়ে অত্র

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা
মধ্যে তপোধনানাং কিশলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্॥

তবে কেন তিনি এখন সেই রূপরাশিসম্পন্না শকুন্তলাকে অস্পর্শনীয়া বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন? শাপ-প্রভাবে তিনি শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু যে চক্ষু সেদিন শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আজও ত তাঁহার সেই চক্ষু, সেই মন রহিয়াছে। তবে কেন আজ শকুন্তলা তাঁহার কাছে কৌশলকুটিলা অস্পর্শনীয়া কলঙ্কিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন? কৈ, সেখানে আর যাহারা আছে তাহারা ত অবিচলিত-চিত্ত নয়। প্রতিহারী শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপরাশি দেখিয়া ভাবিতেছে—

অম্মো ধম্মাবেক্‌খিণো ভট্টিণো ঈদিসং
নাম সুহোবণদং ইত্থিআরঅণং
পেক্‌খিঅ কো অণ্ণো বিআরেদি

দুষ্মন্তও সেই রূপরাশি দেখিয়া মুগ্ধ—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তিম্
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেত্যধ্যবস্যন্
ভ্রমর ইব নিশান্তে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন খলু সপদি ভোক্তুং নাপি শক্নোমি মোক্তুম্।

তিনি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে হইল না যে শকুন্তলা তাঁহার। তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত ফণিনীর ন্যায়

বিষময় বাক্যে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিলেন। তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঋষিকুমারদ্বয় তাঁহার উপর শাপাগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঋষি-কোপানল যে কি ভয়ানক পদার্থ দুষ্মন্ত তাহা বিলক্ষণ জানেন। তিনি নিজেই সেদিন মাধব্যকে বলিয়াছেন—

শমপ্রধানেষু তপোধনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্য্যকান্তাস্তে হ্যন্যতেজোঽভিভবাদ্দহন্তি॥

আজ সেই গূঢ়নিহিতানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকেই দগ্ধ করিতে আসিতেছে। কিন্তু আজ তিনি সে কোপানলকে ভয় করিতেছেন না। কেন, তিনি কি আর সে দুষ্মন্ত নন? তাঁহার চিরাভ্যস্ত গুরুজনগত ভীতি-সম্ভ্রম সকলি কি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তা নয়! সে সকলই তাহার আছে; কিন্তু গুরুজন আজ তাঁহাকে পরস্ত্রী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মবীর, তিনি ভাবিতেছেন, যেখানে ধর্ম্মের বিপর্যয়, সেখানে ভুবনমোহিনী রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিপ্রভ মহাঋষিও তুচ্ছ। কি ধর্মানুরাগ! কি চিত্ত-সংযম! অতুল রূপরাশি তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। নইলে, কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না। দূষিতচিত্ত হইলে তিনিও লইতেন। প্রতিহারী যথার্থই বলিয়াছিল—

অম্মো ধম্মবেক্‌খিণো ভট্টিণো ইদিসং নাম সুহোপনদং
ইত্‌থিআরঅণং পেক্‌খিঅ কো অন্নো বিআরেদি।

দুষ্মন্তের প্রথম পরীক্ষা শেষ হইল। সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইলেন। সেই জয়ে কালিদাসেরও জয়। কালিদাস ভারতের ব্রাহ্মণ। ভারতের ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি দেখাইলেন যে ধর্ম্মের কাছে ভারতের ঋষি—তপস্বীও কিছু নয়! কালিদাস! তুমি ভারতের ব্রাহ্মণ নও—তুমি জগতের ব্রাহ্মণ।

দুষ্মন্ত পুনরায় নিদর্শনাঙ্গুরীয়কটী দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তখন আর এক প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ হইল, কিন্তু এ পরীক্ষাও বড় সহজ নয়। শকুন্তলার কথা মনে হইয়া

তাঁহার মন অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে রকম নিষ্ঠুরভাবে তিনি শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দিবা-রাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার শান্তি নাই। তিনি সর্বদাই প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অনুতাপানলে সন্তপ্ত। তাঁহার স্বাভাবিক আমোদ-আহ্লাদ আর ভাল লাগে না। তিনি বসন্তোৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। রাজভক্ত, রাজমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কঞ্চুকীর ন্যায় রাজকর্মচারী-দিগের প্রতিও যেন অশ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ কঞ্চুকী যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে !
শয্যোপান্তবিবর্তনৈর্বিগময়ত্যুন্নিদ্র এব ক্ষপা ॥
দাক্ষিণ্যেন দদাতি বাচমুচিতামন্তঃপুরেভ্যো যদা।
গোত্রেষু স্খলিতস্তদা ভবতি চ ব্রীডাবনম্রশিরঃ ॥

ভাবিয়া ভাবিয়া দুষ্মন্তের শরীর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার গম্ভীর প্রভাময় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয় দুষ্মন্ত আর সে দুষ্মন্ত নাই! সেই পবিত্র আশ্রমে দুষ্মন্ত যেমন তাঁহার শকুন্তলার যন্ত্রণাদগ্ধ দেহখানি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আজ বৃদ্ধ কঞ্চুকী দুষ্মন্তের অনুতাপদগ্ধ দেহস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় কাতর মনে ঠিক তেমনি বলিতেছেন—

প্রত্যাদিষ্টবিশেষমণ্ডনবিধিবামপ্রকোষ্ঠে শ্লথং
বিভ্রৎকাঞ্চনমেকমেব বলয়ং শ্বাসোপরক্তাধরঃ ॥
চিন্তাজাগরণপ্রতাম্রনয়নস্তেজোগুণৈরাত্মনঃ
সংস্কারোল্লিখিতো মহামণিরিব ক্ষীণোপি নালক্ষ্যত ॥

এই শোচনীয় অবস্থায় আজ দুষ্মন্ত রাজোদ্যানে গভীর চিন্তানিমগ্ন। বৃদ্ধ কঞ্চুকী সকলই জানেন, সকলই বুঝেন। কিন্তু আজ পুরুবংশের দুর্দিন দেখিয়া, অসংখ্য ভারতবাসীর দুর্দিন দেখিয়া ভয়াকুলিতবাৎসল্যপূর্ণ মনে তিনি ভাবিতেছেন—বুঝি একটু 'খেলাধূলা' করিলে দুষ্মন্ত কিছু 'আনমনা' হইবেন। এই মনে করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে

বিলাসভূমিতে যাইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অশীতিবর্ষী পলিত-কেশ কুল-কর্মচারীর মুখে এ রকম কথা শুনিলে, বিরহকাতর যুবাপুরুষের কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইবার কথা। বোধ হয় সেইজন্য বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে কিছু না বলিয়া দুষ্মন্ত বেত্রবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—বেত্রবতি! মদ্‌বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রুহি অদ্য চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিধর্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতমার্যেণ পৌরকার্যং তৎ পত্রমারোপ্য প্রস্থাপ্যতামিতি।

এত যাতনায়, এত সন্তাপেও দুষ্মন্ত রাজকার্য ভুলেন নাই। এত ক্লিষ্টমনেও তাঁহার বিচার কার্য পর্যালোচনা করিবার ইচ্ছা কত বলবতী। এত অনলদগ্ধ হইয়াও দুষ্মন্ত অঙ্গারাবশেষ হন নাই।

তারপর সেই মনপ্রাণহারী চিত্র-দর্শন। চিত্র দেখিতে দেখিতে দুষ্মন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চিত্রিত শকুন্তলাকে তাঁহার জীবনময়ী শকুন্তলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্থানজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। অমনি যেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, এইরূপ স্থির গম্ভীর ভাবে কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া প্রধানামাত্যের ভ্রম সংশোধন করিয়া ধর্মসঙ্গত বিচার করিয়া দিলেন। শুধু তা নয়। সেই অপুত্রক মৃত বণিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব নিরূপণোপলক্ষে তিনি সমস্ত প্রজাগণের মঙ্গলার্থে স্নেহবান পিতার ন্যায় এই স্নেহপূর্ণ আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন বন্ধুনা।
সঃ স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি ঘুষ্যতাম্॥

আজ্ঞা লইয়া বেত্রবতী চলিয়া গেলেন। তখন দুষ্মন্তের অপুত্রকাবস্থা স্মরণ হইল। স্মরণ করিয়া তাঁহার মন পূর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিল। দুষ্মন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ এবং ধর্মভীরু। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের কথা মনে পড়িল। তাঁহাদের পবিত্রাত্মার শোচনীয় পরিণাম মনে হইল। তিনি যন্ত্রণাবিহ্বল হইয়া মূর্ছিতের ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। অসহ্য শকুন্তলাচিন্তাও সেই গিরিচর-গজবৎ বাসনার দেহস্তম্ভকে ভূতলশায়ী করিতে পারে নাই! এই পতনেই দুষ্মন্তের দুষ্মন্তত্ব দেদীপ্যমান!

মূর্ছিতপ্রায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় বিপন্নের ভয়ার্ত রব শ্রুত হইল। অমনি কর্মবীর দুষ্মন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আর তাঁর শকুন্তলা-চিন্তা নাই। আর তাঁর শকুন্তলা-চিন্তাজনিত শারীরিক দুর্বলতাও নাই। এখন তিনি যে দুষ্মন্ত সেই দুষ্মন্ত। বিপরীত বিক্রম সহকারে তিনি ধনুর্বাণ সাপটিয়া লইলেন। নিমেষ-মধ্যে সকল কথা অবগত হইয়া তিনি দেবতাদিগের সাহায্যার্থে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া অসুরনাশে শূন্যপথে উঠিলেন।

এখন দুষ্মন্তের হৃদয়ও আশাশূন্য, অনন্ত যন্ত্রণাগার। কিন্তু অসুরবধে আহূত হইবামাত্র তিনি যেন সে সকলই ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে যুদ্ধসজ্জা করিলেন। করিয়া বিদূষককে বলিলেন,—

> বয়স্য অনতিক্রমণীয়া দিবস্পতেরাজ্ঞা তদ্‌গচ্ছ পরিগতার্থং
> কৃত্বা মদ্বচনাদমাত্যপিশুনং ব্রূহি।
> ত্বন্মতিঃ কেবলা তাবৎ প্রতিপালয়তু প্রজাঃ।
> অধিজ্যমিদমন্যস্মিন্ কর্মণি ব্যাপৃতং ধনুঃ॥

বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দুষ্মন্ত নিজের সুখ দুঃখ সকলই ভুলিতে পারেন কিন্তু যে কোটি কোটি হৃদয়ের সুখদুঃখ অনতিক্রমণীয়া নিয়তির বলে তাঁহার হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের সুখদুঃখ ভুলিতে তিনি নিতান্তই অক্ষম। মহাকবি দুষ্মন্তকে সামান্য মনুষ্যের ন্যায় মহা পরীক্ষায় প্রবিষ্ট করিয়া অতুল-জ্যোতি দেবতার ন্যায় উত্তীর্ণ করাইলেন! ইহাকেই বলে নাটকের নাটকত্ব!

২। দুষ্মন্ত—নাটকের চরিত্র

অনেক প্রথম শ্রেণীর নাটকে দুই রকম নাটকত্ব থাকে। এক রকম নাটকত্ব দৃশ্যমান।—নাটকের আখ্যায়িকা পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায়। আর এক রকম নাটকের নাটকত্ব অদৃশ্যমান—নাটক পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং বুঝিতে ভিতরে

প্রবেশ করিতে হয়। এক রকম নাটকত্ব কায়াতে আঁকা থাকে—দেখিতে ইচ্ছা কর আর নাই কর, নাটক পড়িতে গেলে দেখিতে হইবেক। আর এক রকম নাটকত্ব নাটকের গায়ে আঁকা থাকে না—ইচ্ছা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইচ্ছা করিয়া যুক্তি দ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হয়। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নামক নাটক পড়িলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবরাজ হ্যামলেটের মন তাঁহার দুরাত্মা পিতৃব্যের সম্বন্ধে রোষপূর্ণ, ঘৃণাপূর্ণ, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ—বাসনাপূর্ণ, কিন্তু প্রতিশোধ-সাধনে "দৃঢ়সঙ্কল্প—পিতৃব্য-প্রাণ-সংহারে অনিশ্চিত-হস্ত। দেখিতে পাওয়া যায় নাটকখানির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত হ্যামলেট নাটকের দৃশ্যমান নাটকত্ব—নাটকখানি পড়িয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায়,—পড়িয়া গেলেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই দৃশ্যমান নাটকত্বের মূলে একটী গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব আছে—এই দ্বিভাবের মূলে একটি দ্বিভাবোৎপাদক মানব-প্রকৃতি আছে। যে বিশেষ মানস প্রকৃতির বলে, যে বিশেষ মনোগঠনপ্রণালীর গুণে কার্যক্ষেত্রে ইচ্ছা এবং সঙ্কল্পের মধ্যে এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহাই হ্যামলেট নাটকের গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব। শকুন্তলা-য় এই গূঢ় বা অদৃশ্যমান নাটকত্ব আছে, এখন তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব প্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্ত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সার মর্ম একবার বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। দুষ্মন্ত কণ্বের তপোবনে প্রণয় করিতে বসিয়াছেন—একটী অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী বালিকার সহিত প্রণয় করিতে বসিয়াছেন। এই প্রণয় করিতে বসিয়া দুষ্মন্তের মহা-পরীক্ষা হইয়া গেল। এ কিসের পরীক্ষা? একি দুষ্মন্তের প্রণয়ের পরীক্ষা? বোধ হয় অনেকে বলিবেন—হাঁ তাই। বোধ হয় অনেকে বলিবেন যে দুষ্মন্ত জনশূন্য তপোবনে একটী অল্পবয়স্কা, সরলমনা, রাজ-মাহাত্ম্য-মুগ্ধা তাপসবালাকে দেখিয়া প্রণয় করিয়াছেন বলিয়া পাছে কেহ কিছু মনে করে, সেইজন্য মহাকবি পরীক্ষা দ্বারা জানাইলেন যে, সে প্রণয় পবিত্র প্রণয়। এ কথায় একটি উত্তর এই যে, কালিদাসের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবিগণ দূষিত প্রণয় লইয়া কখনও

কাব্য বা নাটক লেখেন না।* দ্বিতীয় উত্তর এই যে, জলসেচন-কার্য-নিরতা শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণ-কন্যা মনে করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ সম্বন্ধে দুষ্মন্ত যেরূপ সন্দেহ-সংক্ষুব্ধ হন, তাহাতেই সপ্রমাণ যে দুষ্মন্ত দূষিতান্তঃকরণে শকুন্তলার সহিত প্রণয় করিতে বসেন নাই। তৃতীয় উত্তর এই যে, দুষ্মন্ত গান্ধর্ববিধানে বিবাহ করিয়া বিবাহের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার নামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়ক শকুন্তলাকে দিয়া যান। চতুর্থ উত্তর এই যে উপন্যাসের প্রারম্ভেই কবি দুষ্মন্তকে যেরূপ শান্ত এবং পবিত্র মূর্তিতে দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা সমর্থন করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা এইটুকু স্বীকার করি যে, এই পরীক্ষায় গাঢ় পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মনুষ্য হৃদয়ের প্রকৃতি—প্রকট করা নাটক মাত্রেরই উদ্দেশ্য বটে! কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, শুদ্ধ পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য মহাকবি দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে প্রকৃতি বুঝাইতে হইলে নাটক লিখিতে হইবেক, এমন কোন কথা নাই। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি লংফেলোর Evangeline নামক ঔপন্যাসিক কাব্য এই কথার একটি প্রমাণ। আমরা জানি যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা মহাপরীক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণাময়—

* সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সমালোচক Dr. Ulrici সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েট নামক নাটক সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন :—

"That the leading interest of this drama is centered in the loves of Romeo and Juliet, is clear even to a child. I can not persuade myself that the meaning of the whole piece is exhausted in the deification and entombment of love, and that this idea constitutes the groundwork of the play. On the contrary, Shakespeare can scarcely have designed to deify love merely as an inexpressible feeling—an intoxicating passion. That were, indeed, an idolatry of which art could never be guilty, even though, like the African with his fetish, it should destroy its idol with its own hand."

Dr. Ulrici প্রণীত Shakespeare's Dramatic Art, p. 175.

আমরা জানি যে, এই পরীক্ষায় পড়িয়া দুষ্মন্ত অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়া কোন্ নৈতিক নিয়মে যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। অতএব পবিত্র প্রণয়ের প্রকৃতি দেখাইবার জন্য যন্ত্রণাময় পরীক্ষা হইল, এ কথা মনে করা সমস্ত নীতিশাস্ত্রের, সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ।

তবে এ পরীক্ষা কিসের পরীক্ষা? প্রশ্নটী বড় গুরুতর। অতএব কিঞ্চিৎ বাহুল্য-ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রথম প্রস্তাবে দুষ্মন্তের প্রণয়োপাখ্যান যে রকম বিবৃতি করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। আমরা দেখিতে পাই দুষ্মন্ত প্রেমে উত্তেজিত হইবামাত্রই প্রেমানুভবের সুখাস্বাদনে অক্ষম। আমরা দেখিতে পাই, যে দণ্ডে দুষ্মন্তের হৃদয় প্রেমবিহ্বল, সেই দণ্ডেই দুষ্মন্তের মন ধর্মভয়ে ভীত। প্রেম কি? না শারীরিক বিকারযুক্ত হৃদয়ের ভাববিশেষ। প্রেম একটি passion। ধর্মভয় জ্ঞানমূলক। সকলেই জানেন যে জ্ঞান এবং ভাব প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা বলেন যে sensation and perception bear an inverse ratio to each other রোমিও জুলিয়েটের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখেন নাই। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রেমের পথে যে সকল কণ্টক থাকিতে পারে তাহা বুঝিয়া দেখেন। ইহাতেই এক রকম বুঝা যায় যে, সেক্সপীয়রের নায়ক ভাবের শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট, কালিদাসের নায়ক ভাবের শাসনেও জ্ঞানের শাসনাধীন। ইহাতেই বুঝা যায় সেক্সপীয়রের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী কিছুই নাই; কালিদাসের নায়কের মনে তাঁহার ভাবের বিরোধী জ্ঞান এবং জ্ঞানমূলক ধর্মভয় আছে। তাই বলিতেছিলাম যে, দুষ্মন্তের প্রণয়ের সূত্রপাত হইতেই তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ। এইখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। সেক্সপীয়রের নায়কের প্রেমের বিঘ্ন, বাহ্যবস্তুসম্ভূত, মণ্টেগিউ এবং কেপুলেট বংশদ্বয়ের চিরশত্রুতাজনিত। কালিদাসের নায়কের প্রেমে বাহ্যকারণসম্ভূত বিঘ্ন কিছুই নাই। দুষ্মন্ত

দেখিতেছেন, শকুন্তলার হৃদয়ানুলিপ্তা সুখদুঃখভাগিনী প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার বিবাহের ঘটকালীতে নিযুক্ত। তিনি বুদ্ধিমান—বুঝিতেছেন যে আশ্রমের অধিনায়িকা গৌতমী সব জানিয়াও ভান করিতেছেন যেন কিছুই জানেন না। তিনি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে স্বয়ং ভগবান কণ্ব কেবল উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। বস্তুত দুষ্মন্তের প্রেমের একমাত্র বিঘ্ন দুষ্মন্তের অন্তর্জগতের জ্ঞানমূলক ধর্মভাব।

তারপর আমরা দেখিতে পাই যখনই দুষ্মন্ত শকুন্তলাভাবে ভোর তখনই মহাকবি, তাঁহাকে সেই ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা দেখিতে পাই, যখন দুষ্মন্ত মোহাভিভূত, তখনই মহাকবি তাঁহাকে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছেন। সকলেই জানেন যেখানে মোহাধিক্য সেইখানেই কার্য-শক্তির নাশ—সেইখানেই মনুষ্য প্রায় উদ্যমহীন। একবারমাত্র শকুন্তলাকে দেখিয়া পুনরায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুষ্মন্ত লালায়িত হইয়াছেন। হইয়া ঋষিদিগের আহ্বানে পুন দর্শনাশায় উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছেন। এমন সময় রাজমাতার নিকট হইতে গৃহ-প্রত্যাগমনের আজ্ঞা আসিয়া উপস্থিত হইল—অর্থাৎ আত্মভাব এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য কি? বলা অনাবশ্যক যে শুধু মাধব্যকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য কবি এইরূপ ঘটনাকৌশল অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু এটি বলা আবশ্যক যে এই আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষে আত্মেতরভাবেরই জয় হইল। দুষ্মন্তের প্রেমশক্তির পরীক্ষা।

আবার আমরা যখন দেখি দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়াও না পাইয়া প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় প্রেমালাপ উদ্‌গার করিতেছেন, তখনই মহাকবি তাঁহাকে বিপন্নের ভয়ার্ত রব শ্রবণ করাইলেন। আবার সেই আত্মভাব এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ। এবং আবার সেইরকম আত্মভাবের লয় হইয়া আত্মেতরভাবের ঘোরতর উদ্রেক। আবার সেইরকম প্রেমশক্তির প্রবলতা চিত্রিত না হইয়া সামাজিক স্নেহের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবলতা চিত্রিত হইল।

আর বলিবার আবশ্যক নাই। পূর্ব প্রস্তাবটী স্মরণ করিলেই অবশিষ্ট ঘটনাবলীর এবংবিধ অর্থ-গুরুত্ব এবং ভাবগাম্ভীর্য অনুভূত হইবেক।

এখন বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে দুষ্মন্তের পরীক্ষা তাঁহার প্রেমশক্তির পরীক্ষা নয়, তাঁহার জ্ঞান এবং সৎপ্রবৃত্তিমূলক ধর্মভাব এবং অনাত্মপরতার পরীক্ষা। বিনা পরীক্ষায় বিনা সংঘর্ষে তেজ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কে না জানে যে সেই চিত্রদর্শনের পর ভূপতিত বিহ্বলহৃদয়, বিহ্বলজ্ঞান, দুষ্মন্ত যখন বিপন্নের আর্ত-নাদ শুনিয়া বীরবিক্রমে ধনুর্বাণ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন বোধ হইল যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া উঠিল। তবে দুষ্মন্তের মনের সংঘর্ষ কিসের সংঘর্ষ হইতে পারে? আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের আত্মভাবের এবং আত্মেতর ভাবের সংঘর্ষ। আমাদের বোধ হয় এ সংঘর্ষ সেই মনের এক অংশের সহিত আর এক অংশের সংঘর্ষ। সেক্সপীয়রের সর্বপ্রধান প্রেমতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক, রোমিও এবং জুলিয়েট, এ রকমের নয়। রোমিওর মনের সংঘর্ষের কারণ-দুইটি বংশের চিরশক্রতা-বাহ্যজগৎমূলক। রোমিওতে এক দিকে একটী রিপূন্মত্ততা আর একদিকে বাকী সমস্ত মনটা। দুইটী পরীক্ষার প্রণালী দুইরকম। কোন প্রণালীটা উৎকৃষ্ট, পরে বলিব।

আমরা দেখিলাম যে, দুষ্মন্ত একটী আত্মেতরভাবের বা সামা-জিক-ভাব প্রধান চরিত্র। আমরা দেখিলাম যেখানেই দুষ্মন্ত-মনের আত্মভাবের এবং আত্মেতরভাবের সংঘর্ষ সেখানেই তাঁহার আত্মেতর-ভাব বিজয়ী। আমরা দেখিলাম, যেখানেই আত্মসম্ভোগ এবং সামাজিক ধর্মের বিরোধ সেইখানেই দুষ্মন্তের সামাজিক ধর্ম প্রবলতর। এমন কেন হয়? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে, সেই সামাজিক ধর্মভাবের প্রকৃতি বুঝিয়া দেখিতে হইবেক।

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, মনুষ্যের সামাজিক প্রকৃতি দুই প্রকার—একটী ভাবমূলক, আর একটী যুক্তিমূলক। সামাজিক ধর্মাধর্ম—সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করিতে

হইলে জগতের কতকগুলি লোক নিজের যুক্তিশক্তি প্রয়োগ না করিয়া পরের মতাবলম্বী হইয়া চলেন; আর কতকগুলি লোক পরের মতানুসরণ না করিয়া নিজের যুক্তিশক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পরের মতানুসরণ করিয়া সংসারধর্ম করা মোহের কার্য। সে মোহ শ্রদ্ধাতিশয়মূলক। ভারতে এ পর্যন্ত এই মোহমূলক সমাজপ্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা সকলেই জানি যে এই প্রাণিসঙ্কুল লোকসাগরতুল্য ভারতভূমিতে অতি পূর্বকাল হইতে ব্রাহ্মণবাক্যই সামাজিক ধর্মাধর্মের একমাত্র সূত্র, একমাত্র নিয়ামক। এখানে ধর্মাচার্য যাহাকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্যক্ষেত্রে ধর্ম বলিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এখানে ধর্মাচার্য যাহাকে অধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন কোটি কোটি মানব তাহাকেই কার্যক্ষেত্রে অধর্ম বলিয়া ঘৃণাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। উন্নতিশীল ইউরোপেও এই দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে। দুই কি তিনশত বৎসর পূর্বে সমস্ত ইউরোপবাসী ভারতের প্রণালীতে সংসার-ধর্ম করিত—রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণের বাক্যই সমস্ত ইউরোপে একমাত্র ধর্মসূত্র, একমাত্র ধর্মনিয়ামক ছিল। এখনও অর্ধাধিক ইউরোপবাসীর মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত। এই মানব-প্রকৃতি-রহস্যের মূল কি? আমাদের বোধ হয় ইহার একটি মূল, মনুষ্য মনের একরকম স্বাভাবিক অলসপ্রিয়তা—অনুসন্ধান করিবার শ্রম-কাতরতাজনিত ইচ্ছাশক্তি বা will power এর খর্বতা। আর একটি মূল, চিরদৃষ্ট উৎকৃষ্টতার সম্বন্ধে মনুষ্যমনের শ্রদ্ধার ভাব। এই প্রকৃতির বলে ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট বিপ্লব; ভারতে বুদ্ধদেবের সমাজ-সংস্কার। এই দুইটি মানব-প্রকৃতির কোনটিই পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু দুইটি একত্রীভূত না হইলে সমাজের বিষম অমঙ্গল ঘটে। সমাজ হয় ভারতের ন্যায় জমাট বাঁধিয়া উন্নতিসাধনে একেকালে অক্ষম হইয়া উঠে, নয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের ন্যায় অনন্ত বিপ্লবাবর্তে ঘুরিতে থাকে। মনুষ্যজাতির এই দুইটি প্রকৃতিরই আবশ্যক। এবং মনুষ্যজাতির ভাল জিনিস প্রাচীন হইলে অনেকে

স্বভাবতই তাহাতে সম্ভ্রমের সহিত আসক্ত হয়। সে আসক্তি একটী মোহের স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সে মোহে অর্ধাধিক জগৎ মুগ্ধ। সে মোহ খণ্ডন করা একরকম অসাধ্য বলিলেই হয়। আর কতকগুলি লোক যুক্তিদ্বারা ধর্মাধর্ম নিরূপণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্বোক্ত মোহে মুগ্ধ নন। তাঁহারা প্রাচীন মত, প্রাচীন পদ্ধতি, প্রাচীন বস্তুকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। এটীও মনুষ্যমনের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এবং মনুষ্যজাতির ইতিহাসেও দেখা যায় যে মনুষ্যজাতি সততই এই দুইটি প্রকৃতির সামঞ্জস্য-সাধনের দিকে ধাবমান। ইউরোপে এবং এশিয়ায় মধ্যে মধ্যে যে সকল ভয়ানক সমাজবিপ্লব এবং ধর্মবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, সেই সকল বিপ্লব মনুষ্যজাতির এই স্বাভাবিক সামঞ্জস্য-সাধন-স্পৃহার বলবৎ সাক্ষী। কালিদাসের দুষ্মন্ত এই সামঞ্জস্য-সাধনস্পৃহারূপ মানবপ্রকৃতির প্রতিকৃতি। দুষ্মন্তে এই সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে। সেইটি বুঝাইতেছি।

হিন্দুশাস্ত্রে দুষ্মন্তের অগাধ ভক্তি। তাঁহার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইল; তিনি ভাবিলেন—

"অয়ে শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্মাকং
অথবা ভবিতব্যানাং ভবন্তি দ্বারাণি সর্বত্র।"

এ ভক্তি বড় কম ভক্তি নয়। আমরা এরকম ভক্তিকে কুসংস্কার বলি। আমরা এইরূপ বুঝি যে পৌরোহিত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া জ্ঞানভ্রষ্ট না হইলে এরকম ভক্তি মনে স্থান পায় না।

দুষ্মন্ত এমন বিশ্বাস করেন যে অন্যে যাগযজ্ঞ করিলে, তিনি তাহার ফলভোগী হইতে পারিবেন। তিনি বলেন—

"অক্ষয়মেব ভাগধেয়মেতে তপস্বিনো মে নির্বপন্তি।"

দুষ্মন্ত প্রচলিত প্রথার পক্ষপাতী। বৃদ্ধ কঞ্চুকীর কাছে শার্ঙ্গরব প্রভৃতির আগমনবার্তা পাইয়া তিনি বলিতেছেন—

তেন হি বিজ্ঞাপ্যতাং মদ্বচনাদুপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ অমূনাশ্রমবাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপি এতান্ তপস্বিদর্শনোচিতপ্রদেশে প্রতিপালয়ামি।

দুষ্মন্ত হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত কর্মকাণ্ড মানিয়া থাকেন। তাঁহার গৃহে পবিত্র আহ্বনায়াগ্নি সযত্নে রক্ষিত—

রাজা। উত্থায়। বেত্রবতি! অগ্নিশরণমাগ্যমাদেশয়।

দুষ্মন্ত মনে করেন যে ভারতের মুনিঋষিগণ দেবতুল্য। তিনি মুনিঋষিকে দেবতানির্বিশেষে ভয় করেন, ভালবাসেন এবং সম্ভ্রম করেন। তিনি জানেন যে—

শমপ্রধানেষু তপোবনেষু গূঢ়ং হি দাহাত্মকমস্তি তেজঃ।
স্পর্শানুকূলা অপি সূর্যকান্তা স্তেহন্যতেজোহভিভবাদ্দহন্তি ॥

দুষ্মন্তের কাছে মুনিঋষির আজ্ঞা দেবাজ্ঞার ন্যায় মাননীয় এবং পালনীয়। তিনি মৃগয়ার খরতর ঔৎসুক্যে প্রধাবিত হইয়া ভয়কুণ্ঠিত, পলায়নপর মৃগোপরি অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করেন, এমন সময় ঋষিদিগের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। অমনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সেই আজানুলম্বিত উষ্ণশোণিতোত্তেজিত বলসার বাহু গুটাইয়া লইয়া তিনি সেই বীরহস্তোপযোগী শাণিত শর তূণীরের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

ভো ভো রাজন্ আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ।
ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে তুলারাশাবিবাগ্নিঃ।
ক্ব বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতি লোলং
ক্ব চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥
তদাশু কৃতসন্ধানং প্রতিসংহর সায়কম্
আর্তত্রাণায় বঃ শস্ত্রং ন প্রহর্তুমনাগসি ॥

রাজা। সপ্রণামম্। এষ প্রতিসংহৃত এব। ইতি যথোক্তং করোতি।

বলিতে গেলে, দুষ্মন্ত প্রায় প্রণাম করিতে করিতেই সেই দুর্দমনীয় শর শরাধারে ফেলিয়া দিলেন। মৃগয়োন্মত্ত বীরচূড়ামণি যেন একটা জঠরানলপ্রক্ষিপ্ত কেশরীর ন্যায় একটা বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা আহত হইয়া নিমেষমধ্যে বিনষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। শকুন্তলা নাটকের প্রতি

শব্দেতে দুষ্মন্ত চরিত্রের যেটি প্রধান লক্ষণ, অর্থাৎ বিরোধিভাবের অবিরোধ অবস্থান, সেটি প্রতিপন্ন। এমন নাটক কি আর হয়।

আর বিস্তার না করিয়া এক কথায় বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর ১২০ কোটি মানবের মধ্যে এখনও ৭০ কোটি মানব যেমন পুরাতন প্রথার কাছে এবং পুরাতন প্রথার যাজকদিগের কাছে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাভিভূত, কালিদাসের দুষ্মন্তও ঠিক তাই। কিন্তু তাই বলিয়া দুষ্মন্ত কি সেই ৭০ কোটি মানবের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টিহীন? না, দুষ্মন্ত সে প্রকৃতির লোক নন। শার্ঙ্গরব তাঁহাকে বলিলেন যে পূজ্যপাদ মহাঋষি কণ্ব তাঁহার সহিত শকুন্তলার পরিণয়কার্যের অনুমোদন করিয়া শকুন্তলাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন—

অয়ে। কিমমিদমুপন্যস্তম্

এ কি! মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছেন যে তিনি শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে তাপসকুলসম্ভ্রমকারী, তাপসকুলপক্ষপাতী, তাপসকুলভীত, তাপসকুলরক্ষক দুষ্মন্তের কি এই উত্তর? আবার শুধু তাই? এই অসঙ্গত উত্তরটী শুনিয়া শার্ঙ্গরব ঈষৎ রোষান্বিত হইয়া বলিলেন—

কিং নাম কিমিদমুপন্যস্তমিতি। নমু ভবন্ত এব সুতরাং লোকবৃত্তান্ত নিষ্ণাতাঃ।

সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং
জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ।

এই কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত কি বলিলেন—তিনি বলিলেন,

কিমত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্বা।

এত সেই অগ্নিপ্রভ, সনাতনধর্মনিরত ঋষিকুমারকে এক রকম মিথ্যাবাদী বলা! শার্ঙ্গরব ভারতের একজন তেজস্বী ঋষিকুমার। মর্মাহত হইয়া

তিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা দুষ্মন্তকে শ্লেষপূর্ণবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কিং কৃতকার্যদ্বেষাদ্ধর্মং প্রতি বিমুখতোচিতা রাজ্ঞঃ ?

দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন—

কুতোহয়মসংকল্পনাপ্রশ্ন ?

ভারতের ঋষিতপস্বী প্রবঞ্চক ? আজ দুষ্মন্ত তাও মনে করিতে সক্ষম ? ইহার অর্থ কি ? ইহার অর্থ এই—যেখানে ভারতের ঋষি-তপস্বী সত্যের বিরোধী, কুনীতি-শিক্ষক, ধর্মের বিপর্যয় করিতে উদ্যত, সেখানে ঋষিকুলপক্ষপাতী, ঋষিকুলসম্ভ্রমকারী, দুষ্মন্ত ঋষিবাক্যেও হতশ্রদ্ধ। ইহার অর্থ এই—যেখানে পবিত্র ঋষির বাক্য সনাতন সত্যের, অপরিবর্তনীয় অনপলাপ্য নীতি এবং ধর্মতত্ত্বের বিরোধী, সেখানে দুষ্মন্তের কাছে ঋষিপ্রদত্ত ব্যবস্থা অপরিগ্রহণীয়া, নিজযুক্তিসঙ্গত নীতি-তত্ত্বই অনুসরণীয়। কিন্তু দুষ্মন্ত ঋষিবাক্য অসত্য বুঝিয়াও ঋষিদিগের প্রতি কোপাবিষ্ট নন—ঋষিদিগের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ নন। শার্ঙ্গরব মিথ্যা কথা কহিতেছেন বুঝিয়াও দুষ্মন্ত বলিতেছেন—

ভো তপস্বিন্ চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি।
তৎকথমিমামভিব্যক্তসত্ত্বলক্ষণাং প্রত্যাত্মানং ক্ষেত্রিণমাশঙ্কমানঃ
প্রতিপৎস্যে।

ঋষির মুখে কথা শুনিয়াও দুষ্মন্ত ঋষিচরিত্রের পবিত্রতা মনে করিয়া এখনও ঋষির প্রতি আস্থাবান—এখনও ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেছেন, কথাটা সত্য কি না। মনুষ্যের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যেখানে স্বাধীন চিন্তা সেইখানে প্রাচীনপ্রথানুরাগী আচার্যকুলের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা—সেইখানে পূর্বাপর-প্রচলিত প্রথার প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণাপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বীদিগের কাছে পোপের নাম Anti-Christ এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম শয়তানের ষড়যন্ত্র। বুদ্ধের কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এবং বেদপুরাণমূলক ধর্ম পৌরোহিত্য-দূষিত কুসংস্কার-কুণ্ড। দুষ্মন্তে জগতের দুইটি সামাজিক মানবপ্রকৃতি একত্রীভূত ; কিন্তু তাহাদের সংঘর্ষে কর্কশতা নাই—সমাজদগ্ধকারী অগ্নিশিখা উঠে না। এরূপ সংঘর্ষ অসম্ভব নয়। আধুনিক মনুষ্যসমাজ বিনাবিরোধে এই

প্রতিদ্বন্দ্বীভাবাপন্ন মানবপ্রকৃতির সামঞ্জস্যসাধনের দিকে ধাবমান দেখা যাইতেছে। কোম্‌তের সমাজদর্শনের আবির্ভাব এই স্পৃহার প্রধান নিদর্শন। দুষ্মন্ত এই গূঢ় ঐতিহাসিক নিয়মের চিত্র। দুষ্মন্ত এই অদ্ভুত ঐতিহাসিক মানব-প্রকৃতির প্রতিমূর্তি। দুষ্মন্ত সমগ্র ঐতিহাসিক মনুষ্য সমাজের গূঢ়ার্থবোধক চরিত্র। দুষ্মন্ত ভূতকাল এবং ভবিষ্যৎকাল—উভয় কালের সমষ্টি। দুষ্মন্ত সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাসলক্ষিত নিয়তির কবিকল্পিত প্রতিমা।* এত বড় চরিত্র জগতের আর কোন নাটকে আছে কিনা সন্দেহ। কালিদাস বোধ হয় এত ভাবিয়া লেখেন নাই। কিন্তু কবির প্রতিভায় ভবিষ্যৎ ইতিহাসও নিহিত থাকে। কবি ভাবের চক্ষে মানবপ্রকৃতির অনন্ত তত্ত্ব দেখিয়া থাকেন এবং প্রতিভার গুণে মনুষ্য-চরিত্রের সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য অনুভব করেন। তবে কালিদাসের সম্বন্ধে একটা কথা বলা যাইতে পারে। তিনি বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর জন্মগ্রহণ করেন।

দুষ্মন্ত প্রচলিত মত এবং প্রচলিত প্রথার অনুরাগী অথচ স্বাধীন চিন্তাশীল। ইহার অর্থ কি? আমরা দেখাইয়াছি যে প্রচলিত প্রথার প্রতি অনুরাগ মনুষ্যহৃদয়ের একটি মোহের স্বরূপ। মোহ অন্ধ—যাহাকে অধিকার করে তাহাকে কিছুই দেখিতে দেয় না। দুষ্মন্ত সেই মোহের বশবর্তী হইয়াও স্বাধীন। ইহার অর্থ দুষ্মন্ত অন্ধ হইয়াও অন্ধ নন। অর্থাৎ আবশ্যক হইলেই দুষ্মন্ত জ্ঞানের দ্বারা মোহের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন—দৃষ্টিনাশকারিতা দেখিতে পান। কিন্তু শুধু তা হইলেই কি হয়? এমন লোক আছেন, যাঁহারা দুষ্প্রবৃত্তির প্রকৃতি বুঝিতে পারেন। কিন্তু বুঝিয়াও দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। না পারিবার কারণ কি? একটি কারণ তাঁহাদের সৎপ্রবৃত্তির শক্তিহীনতা; আর একটি কারণ অভিভূতাবস্থা হইতে উত্থানশক্তির অভাব। মনের এক অবস্থা

* বোধ হয় প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক প্রণালীতে মানব-প্রকৃতি নিরূপণ করিবার রীতি ছিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। যে ব্যক্তি ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে সামাজিক চরিত্রের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, তিনি যে ইতিহাস পাইলে সেই তত্ত্ব ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন স্থলে সে ব্যক্তির মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝাইলে কোন দোষ পড়ে না।

হইতে অবস্থান্তরে যাইতে হইলে চেষ্টা বা উদ্যমের আবশ্যক। যে অবস্থা পরিত্যাগ করা যায় সে অবস্থা যতই অভিভবকারী হয়, তাহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা ততই বলবৎ করা চাই। এই চেষ্টার মূল—ইচ্ছাশক্তি বা will power।

দুষ্মন্তের মুনিঋষির প্রতি প্রেম এবং শ্রদ্ধা যে রকম প্রবল দেখিয়াছি তাহাতে তাহাকে মোহ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মুনিঋষি অপেক্ষা ভাল জিনিষের প্রয়োজন হইলে, দুষ্মন্ত সহজেই সেই মোহ কাটিয়া ফেলিয়া সেই উৎকৃষ্টতর বস্তুটী লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইহার অর্থ এই যে দুষ্মন্ত সৎপ্রবৃত্তির আধার। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি প্রখর বলিয়া তিনি সহজেই মোহের অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারেন! বুঝিতে পারিলেই সৎপ্রবৃত্তি তাঁহার মনকে অধিকার করে। অধিকার করিলে পর তাঁহার আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি বিনা আয়াসে মোহমুগ্ধাবস্থা হইতে অভিলষিত উৎকৃষ্ট অবস্থায় গমন করিতে পারেন।

দুষ্মন্তের চিত্তসংযম-শক্তি এত প্রবল কেন? না দুষ্মন্ত পুরুষ প্রধানের ন্যায় জগতের প্রতি সদ্ভাবপূর্ণ হইয়া, প্রখর বুদ্ধির অধিকারী হইয়া পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করত ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া। এইটী দুষ্মন্তের মনোগঠন প্রণালীর গূঢ়তত্ত্ব—গূঢ় নাটকত্ব।

শকুন্তলা-নাটকের পঞ্চমাঙ্ক-বর্ণিত প্রত্যাখ্যান দৃশ্যটা দেখিয়াই আমরা দুষ্মন্ত চরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম। সে দৃশ্যটী দুষ্মন্তের সামাজিক জীবন-প্রণালীর উদাহরণ স্বরূপ। কিন্তু সে দৃশ্যের হেতু দুর্বাসার শাপ। তাই আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে দুর্বাসার শাপ শকুন্তলার উপন্যাসের প্রধান ঘটনা এবং সেই ঘটনা আছে বলিয়াই শকুন্তলার উপন্যাস নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

(বঙ্গদর্শন,—১২৮৭)

উত্তরচরিত

(ভূদেব মুখোপাধ্যায়)

(১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তরচরিতের এক সংস্করণ করেন। তিনি ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বানভট্টের পর তদীয় নাম নির্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে।" কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছিলেন, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নাম নির্দেশ হওয়া উচিত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই সময়ের এই দুই প্রকার অভিমতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাম যে,—

কালান্তরাদ্‌বা বয়সোঽন্তরাদ্‌বা
প্রায়ো ভবেদ্‌ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

উত্তরচরিত বৃহৎপুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে তাহা অতি বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এই জন্য আমরা পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কটী মাত্র সমালোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

সীতার ছায়াময়ী মূর্তি এই তৃতীয় অঙ্কের প্রাণ। এই অঙ্কে ছায়াময়ী সীতা তমসার সহিত, এবং রাম বনদেবী বাসন্তীর সহিত কথোপকথন করেন। সীতা, তিন জনকেই দেখিতে পান, কিন্তু তমসা ভিন্ন স্বয়ং কাহারও দৃষ্টিপথবর্তিনী হয়েন না। রাম নিরন্তর সীতাচিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সীতাসহবাস—বিশ্রম্ভসাক্ষী পদার্থসমূহকে চতুর্দিকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার শরীর-স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন। এমন কি, এক সময়ে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া বাসন্তীর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথচ কবির ঐ সীতা ছায়াময়ী।

এস্থলে লোক-লোচনের অদৃশ্যা রামের সহ-বনবিহারিণী ও আশ্বাস প্রদায়িনী ঐ ছায়ামূর্তি কিরূপ তাহা বিচার্য বলিয়া সহজেই উপলব্ধ হয়। অতএব তাহা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাউক। ছায়াময়ী সীতামূর্তি যে একটি অপূর্ব সৌন্দর্য-সৃষ্টি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ও কথা বলায় অর্থবোধের কিছু আধিক্য হয় না। উহা কবির কল্পনা এ কথা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকল কাব্যেরই সারাংশ কবির কল্পিত বস্তু বই আর কিছুই নহে; এবং কোন কবির কোন কল্পিত বস্তু কোন কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাবে সংঘটিত হয় নাই—হইতেও পারে না। অতএব ভবভূতির ঐ ছায়াময়ী সীতার প্রকৃত উপাদান কি, তাহা অনুসন্ধেয় হইতেছে।

(২)

সীতা 'হা আর্যপুত্র' বলিয়া মূর্ছিত হইলে, তমসা কর্তৃক আশ্বস্তা হইয়া যেই রামের কণ্ঠস্বর শুনিলেন, অমনি ঐ স্বর যে কাহার তাহা চিনিয়া বলিলেন,—

জলপূর্ণ মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীর এবং মাংসল এই বাক্যধ্বনিতে আমার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল, এবং মন্দভাগিনী আমাকে ঝটিতি উচ্ছ্বাসিত করিল।

তমসা বলিলেন—

"অয়ি বৎসে।

যেমন মেঘের শব্দে ময়ূরী উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ কোথায় হইতে আগত এই অব্যক্ত শব্দে কেন তুমি এরূপ চকিত এবং উৎকণ্ঠিত হইলে?"

সীতা কহিলেন,—

"ভগবতি! ইহা কি অপরিস্ফুট? আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি, আর্য্যপুত্রই কথা কহিতেছেন।"

এস্থলে অতি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর এবং পদশব্দাদি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারসকল অন্যের অপরিচিত হইলেও

ঘনিষ্ঠ হৃদয়গ্রাহিতানিবন্ধন যে প্রণয়ীর অতিপরিচিত হইয়া থাকে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। আমরা এ স্থলে ভবভূতির মানবচিত্তাভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সীতা অত স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া যদি ভগবতি! কি বলিলে ইহা অপরিস্ফুট? এই পর্যন্ত বলিয়াই অবনতমুখে থাকিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত— তাঁহাদিগের মতে অধিকতর রমণীয়ই হইত।

তমসা পরেই বলিয়াছেন,

"শুনিয়াছি তপস্যাকারী শূদ্রকের প্রতি দণ্ডপ্রদানার্থ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জনস্থানে আগত হইয়াছেন।"

এস্থলে তাঁহাদের জিজ্ঞাসা এই, তমসার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দেশ করার কারণ কি হইতে পারে? যাহার নাম করিলে কাহারও শোক দুঃখ প্রভৃতি মনোবিকার প্রতীয়মান হইয়া উঠে, তাহার সমক্ষে লোকে স্পষ্ট করিয়া তদীয় নাম উচ্চারণ করে না, প্রয়োজন হইলে যথাসম্ভব ঘুরাইয়াই বলিয়া থাকে। তমসা সেই জন্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা যদি পূর্বেই আত্মীয়তাসূচক "আর্যপুত্র" বলিয়া রামের নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে তমসার ঐরূপ ঘোরফের করিয়া বলা সুসঙ্গত হয় না তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন। উহার পরেই সীতাও বলিয়াছিলেন—

"ভাগ্যক্রমে সেই রাজার রাজধর্মপালনের ব্যতিক্রম হয় নাই।" তাঁহাদিগের বিবেচনায় এস্থলে রামকে রাজা বলিয়া নির্দেশ করা অবশ্যই আন্তরিক অভিমান-ব্যঞ্জক; সুতরাং প্রথমে তাঁহার প্রতি আর্যপুত্র সম্বোধন অসঙ্গত। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবির রচনাই সমীচীন হইয়াছে। সীতার মনোমধ্যে যতই অভিমান থাকুক, রামের প্রতি সে অভিমান কখনই স্বতঃব্যক্ত হয় না। অন্যের কথায় তাদৃশ অভিমানের হেতু-উদ্বোধ ব্যতিরেকে তিনি নিয়তই রামপ্রেমমুগ্ধা হইয়া থাকেন। অতএব যখন প্রথমে রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাকে

চিনিলেন, অমনি প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া ফেলিলেন। যাহাদের ওরূপ কোমল প্রকৃতি অপরে তাহাদিগের হইয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্যই তমসার অপ্রণয়ব্যঞ্জক 'ঐক্ষ্বাকো রাজা' এবং তাহার পর সীতার নিজের উক্তিতে "রাআ"। ভবভূতি সীতার প্রকৃতি কেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। সপ্তম অঙ্কে সীতার ঐ ভাব অধিকতর সুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অরণ্যে পরিত্যক্তা এবং প্রসববেদনায় কাতর হইয়া ভাগীরথীজলে শরীর বিসর্জন করিলে পৃথিবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভাগীরথীকে বলেন,—

"ইহা কি রামভদ্রের পক্ষে উচিত কার্য হইয়াছে ?

"বাল্যে পাণিপীড়ন, আমি, জনক, অগ্নি, চিরানুবৃত্তি এবং সন্ততি এ সকলের কিছুই প্রমাণ হইল না ?"

সীতা ঐ অবস্থাতেও রামের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,— "হা ! আর্যপুত্রকে মনে পড়িল।"

সর্বংসহা পৃথিবীও কন্যার এরূপ অভিমান-শূন্যতা সহিতে পারিলেন না। ধমকাইয়া উঠিলেন,—

"আঃ কে তোর আর্যপুত্র ?'

সীতা অমনি জড়সড়—বলিলেন,—

"মা যা বল

এও সেই সীতা—রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আযপুত্র না বলিয়া কি থাকিতে পারে ? এবং তমসার মুখে "ঐক্ষ্বাকো রাজা" শুনিবার পর "রাজা" বলিবে না ত আর কি বলিবে ? এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনন্তর রাম প্রিয়াসহচর হইয়া যে পঞ্চবটীতে পূর্বে বাস করিয়া-ছিলেন, তথাকার বৃক্ষ, মৃগ, গিরিনির্ঝর, কন্দর প্রভৃতি দর্শনে উদ্দীপিত-বিরহ-শোক হইয়া, হা প্রিয়ে জানকি ! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাস-প্রিয়-সখি, হা দেবি বিদেহরাজপুত্রি বলিয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ ও অধীরভাবে পতিত হইলে সীতা তমসার চরণে ধরিয়া বলিলেন,—

"ভগবতি তমসে। পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর, আর্যপুত্রকে বাঁচাও।" তমসা কহিলেন—

"হে কল্যাণি, তুমিই জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর, তোমার পাণি প্রিয়স্পর্শ, তাহাতে সঞ্জীবন।"

সীতা বলিলেন,—"জং হোদু তং হোদু জহা ভঅবদী ভণাদী।"

"যা হয় হউক, ভগবতী যেরূপ বলিতেছেন।"

"এই 'জং হদু তং হোদু' কথাটি কি চমৎকারভাবপূর্ণ। এতদ্দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, অকারণ পরিত্যাগ-জনিত গূঢ় অভিমানে এবং কোমলপ্রকৃতিসুলভ ভয়ে সীতার হৃদয় পূর্ণ ছিল। সীতা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি পরিত্যক্তা পত্নী, স্বামীর শরীর-স্পর্শে আমার অধিকার কি? আমি স্পর্শ করিয়াছি জানিতে পারিলে তিনি কুপিত হইতেও পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যা হইবার হউক, অর্থাৎ আমার ভাগ্যে যাহা হইবার হউক বলিয়া রামের শরীর স্পর্শ করিতে গেলেন। রাম সীতা কর্তৃক শরীরস্পর্শমাত্রে আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইলেন। রাম বলিলেন,—"হরিচন্দনপল্লবসমূহের রক্তস্রাবরূপ কি নিষ্পীড়িতচন্দ্রকরকলাপের অভিষেক, কি আমার তাপিত জীবিত-তরুর পরিতর্পণস্বরূপ সঞ্জীবনৌষধিরস আমার হৃদয়ে প্রবিষিক্ত হইল। এই যে আমার সঞ্জীবন এবং মনোমুগ্ধকর স্পর্শ, ইহা আমার পূর্ব-পরিচিত, ইহা হঠাৎ সন্তাপ জন্য মূর্ছা বিনাশ করিয়া আনন্দ দ্বারা আমাকে পুনরায় জড় করিয়া ফেলিতেছে।

সীতা শুনিলেন, এবং ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন; বলিলেন,—"এক্ষণে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

রাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা তমসাকে কহিলেন, "ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া যাই। আমি বিনা অনুজ্ঞায় সমীপবর্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমার প্রতি অধিকতর কুপিত হইবেন।"

রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রিয়ে জানকী বলিয়া ডাকিলেন।

সীতা একটু রাগ করিয়া গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন,—"আর্য্যপুত্র নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা—সেই সেই বৃত্তান্তের পর।"

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যল্পক্ষণস্থায়ী, তাই তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের "নিশ্চয়ই অসদৃশ" এই দুইটি শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। শেষের "সেই সেই বৃত্তান্তের পর"—এই কয়টি শব্দ রামকৃত অকারণ পরিত্যাগরূপ অপরাধের আবরণ;—কেবল তাহাই নহে, ঐ শব্দগুলি সীতার স্বামীত্যাগজনিত আন্তরিক লজ্জারও পরিব্যঞ্জক। তিনি বাষ্পদিগ্ধনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"অথবা অধিক কি! আমি বজ্রময়ী!—মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ প্রিয়ভাষী, জন্মান্তরেও দুর্ল্লভদর্শন, স্নেহময় আর্য্যপুত্রের উপর আমি কি নির্দয় হইব?"

সীতা স্বামীর প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই আপনাকে তিরস্কার করিয়া বজ্রময়ী বলিয়াছিলেন, বিরহ-বেদনায় গতপ্রাণা হয়েন নাই ভাবিয়া আপনাকে বজ্রময়ী বলেন নাই। তিনি বিগতক্রোধ হইয়া বলিলেন,—"আমি উহাঁর হৃদয় জানি এবং উনিও আমার হৃদয় জানেন।"

সীতার প্রেমময় হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি যেন সেই বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই তমসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবতি তমসে! ইনি অকারণে সেরূপ পরিত্যাগ করিলেও ইহাঁর এবম্বিধ দর্শনে আমার হৃদয়ের যে কিরূপ অবস্থা হইতেছে, তাহা আমি জানি না।"

তমসা বলিলেন,—দীর্ঘ বিরহে তোমার হৃদয় এতদিন রামদর্শনে নৈরাশ্যহেতু উদাসীন ছিল এবং রামের পরিত্যাগ জন্য বিপ্রিয়বশে কলুষভাব ধারণ করিয়াছিল; এক্ষণে ঝটিতি রামদর্শন-ঘটনায় আনন্দে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদীয় সৌজন্যে প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল, দয়িতের করুণ বাক্যে গাঢ় করুণ রসের আশ্রয় পাইয়াছে, এবং প্রেমে একেবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িয়াছে।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মনে এ কি ভাব হইল জানিতে

পারিতেছি না। তমসা বলিলেন, "বাছা, তুমি জান না, কিন্তু আমি ইহার ভুক্তভোগী—আমি জানি। আমাতে দীর্ঘকালের পর বর্ষাগম, এবং পর্ব্বতস্থ নীহার সংঘাতে দ্রবীভূত হইলে ঐরূপ "হড়কা বান" আসিয়া থাকে।" তমসা যে নদী, তাহা কবি নিজেও ভুলেন নাই; পাঠককেও ভুলিতে দিলেন না।

ভবভূতি আরও একটি কথা পাঠকের হৃদ্‌গত করাইতে বিস্মৃত হন নাই। নদী তমসা যেমন আপনার সাদৃশ্যে সীতার তাৎকালিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন, রামও সেই সময়ে স্বমুখে তাঁহার নিজের কি হইয়াছে বলিলেন। তিনি সীতাদর্শনচেষ্টায় অকৃতকার্য হইয়া প্রথমতঃ বলেন,—"তোমার মূর্ত্তিমান প্রসাদস্বরূপ স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ এখনও আমাকে আর্দ্র করিতেছে, কিন্তু হে আনন্দিনি! তুমি কোথায়?"

সীতা রামের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি আর্যপুত্রের অগাধ স্নেহসম্ভূত আনন্দনিস্যন্দী যে সকল বিলাপ শ্রবণ করিলাম; তদ্দ্বারা অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যে বিদ্ধ হইলেও আমার জন্মলাভ সার্থক বিবেচনা করিলাম।

আর অভিমান নাই—অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যবিদ্ধ হইলেও আপনার জন্মলাভ সার্থক মানিলেন। ইহার পর রাম বলিলেন, "অথবা প্রিয়তমা কোথায়? ইহা রামের কল্পনাভ্যাসপটুতাজনিত ভ্রম।" অর্থাৎ কবি রামের মুখ দিয়াই বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার রামের ভ্রম মাত্র, ইহার পরেই বাসন্তীর সেই উৎকণ্ঠোক্তি "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতাদেব্যাঃ" ইত্যাদি।

(৩)

তৃতীয়াঙ্কে বনদেবী বাসন্তীর প্রথমোচ্চারিত "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" এই স্থল হইতে দ্বিতীয়োচ্চরিতবৎ প্রতীয়মান "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" পর্যন্ত যে ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত ক্ষণকালমাত্রেই নির্বাহিত, ইহা বুঝা গিয়াছে; এবং উপসংহারে কবিও রামের মুখ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছায়াময়ী সীতা কর্তৃক রামের অঙ্গস্পর্শ রামেরই ভ্রমমাত্র। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তৃতীয় অঙ্কের ঐ ভাগটীর সহিত

সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের একটী অতি বিচিত্র সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমেত প্রকাণ্ড বনস্পতি তাহার পত্রৈকমধ্যে প্রতিভাত থাকে, যেমন এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সুবৃহৎ সৌরজগতেরই অনুরূপ, সেইরূপ তৃতীয়াঙ্কের এই ভাগটী সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেরই প্রতিরূপস্বরূপ। পাঠক দেখিবেন যে, সমুদায় তৃতীয়াঙ্কে যে যে কথা আছে, তৎসমুদায় এই ভাগের বিস্তৃতি বই আর কিছুই নহে। রাম যে পঞ্চবটী বনে সীতার সহিত পূর্বে বাস করিয়াছিলেন, সেই বনের পূর্বপরিচিত মৃগ, পক্ষী, স্থানসন্নিবেশাদি, বিশেষতঃ সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক, ময়ূর, মৃগ, কদম্ববৃক্ষাদি, এবং তাঁহাদের অধ্যুষিত সেই সেই স্মরণীয় শিলাতল এবং লতাগৃহাদি দর্শনে সীতাবিরহশোক রামের অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে; তাঁহার একান্ত ম্লান ভাব লক্ষিত হয়, তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হন, এবং সেই মোহে প্রসন্নহৃদয়া সীতার অনুগ্রহস্পর্শ লাভ করিয়াছেন মনে করেন এবং তাঁহার সেই অনুতাপদগ্ধ হৃদয়মধ্যে বিগতমন্যু সীতা যেন পুনর্জন্ম লাভ করেন। পূর্বভাগেও এই কথা, এবং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেও এই কথা। অতএব তৃতীয়াঙ্কের ঐ পূর্বভাগকে সংক্ষিপ্তাঙ্ক বা উপাঙ্ক বলা যাইতে পারে।

উপাঙ্কের প্রথমে, পোষিত করিশাবকের প্রতি রামসীতার পুত্রভাবের অঙ্কুর আছে। পাঠক দেখিবেন, ভবভূতি ঐ অঙ্কুরটী মাত্র লইয়া কি অপূর্ব কবিত্বকুসুমশোভিত বনভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহাতে প্রণয়িযুগলের স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয় পরিদৃষ্ট, এবং দুইটী হৃদয়তন্ত্রীর এক সুর লয়সংযোগে আকর্ণিত হইতেছে।

কাব্যে এমন অনেক স্থল থাকে, যেখানে কিছু বলা অপেক্ষা কিছু না বলায় বা অল্পমাত্র বলায় অধিকতর ভাব ব্যক্ত হয়। এইটী সেইরূপ একটী স্থল। করিকরভের কান্তানুবৃত্তিদর্শনে রামের বিরহ উপলক্ষ করিয়া কত কথাই বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভবভূতি সীতার উক্তিতে করিণীর সহিত "অবিযুক্ত" থাকুক, করিকরভের প্রতি এই আশীর্বচন-প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহাতেই অন্যে যাহা কিছু বলিতে পারিত, তাহা সমুদয় বলা হইয়াছে

—আর অন্যে যাহা বলিতে পারিত না, এমন একটু বিশেষ কথাও বলা হইয়াছে। বিবেচক পাঠক অবশ্যই ভাবিবেন যে, স্বয়ং বিরহিনী সীতা আশীর্বচন মুখ্যতঃ বধূর প্রতি প্রয়োগ না করায় কবি কি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন—তিনি সীতার হৃদয়ে নিজের দুঃখানুভব অপেক্ষা রামের সহিত অধিকতর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, না ছায়াময়ীর মুখ দিয়া রামেরই আর একটি কণ্ঠোক্তি ব্যক্ত করিলেন?

ভবভূতি এস্থলে যে সকল ভাব অব্যক্ত রাখিলেন এবং পাঠকের নিজের শক্তির উপর অনুভব করিবার অধিকার দিলেন, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিবার যো নাই। কবি রামের পূর্বগত দুইটী উক্তিতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সীতার মনে যে ভাব সমুদিত হইতেছে, রামের মনেও সেই সেই ভাব উঠিতেছে। কবি ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ সময়ে রামের মানস চক্ষে সীতা প্রত্যক্ষবৎ উপস্থিতা হইয়াছেন। কিন্তু কবি এই পর্যন্ত করিয়াই কিয়ৎক্ষণ রামের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির করিলেন না, তাঁহাকে একেবারে নীরব করিয়া রাখিলেন। রাম আর বহিঃস্থ বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কিম্বা অন্তরস্থ সীতামূর্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটী কথাও বলিলেন না। তাদৃশভাবাপন্ন রামকে তাদৃশ বাক্‌শূন্য করিয়া রাখায় কবি যেন পাঠককে 'মাথার দিব্য' দিয়াই ঐ সময়ে রামের মনে কি হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম তখন করিশাবকের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য দর্শন করিয়াছেন, সেটী যে সীতার পালিত এবং তাঁহার পুত্রভাবপ্রাপ্ত তাহা জানিয়াছেন, বহুবর্ষ পূর্বে সীতা যখন তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়ের মূর্তিও রামের মনে সমুদিত হইয়াছে—তখন রাম নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?—রামের মনে—নিজের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্যের প্রথম শিক্ষা হইতে কোটি কোটি অত্যদ্ভুত ঘটনাবলীর পর সীতার গর্ভধারণ এবং তাঁহার গর্ভজাত সন্ততি এক্ষণে কেমন হইত, ইত্যাদিরূপ অনুস্মৃতি কি আলোড়িত হইতেছিল?—হইতেও পারে, কারণ দেখা গিয়াছে যে, সীতা এবং রাম উভয়ের মনেই একই ভাব একই সময়ে

সমুদিত হইতেছিল, এবং এই সময়ে সীতা তমসাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

এত এই প্রকার হইয়াছে, সেই কুশ লব এত কালে না জানি কিরূপ হইয়াছে।

তমসা উত্তর করিলেন,

এ যে প্রকার, তাহারাও সেইরূপ হইয়াছে।

সীতাও তমসাকে কহিলেন—"অপত্যস্মরণে আমার স্তন্যক্ষরণ হইতেছে এবং সেই পুত্রদিগের পিতার সন্নিধানে থাকিয়া যেন আমি ক্ষণমাত্র সংসারিণী হইয়াছি।"

ইহার পরেই কবি তমসার মুখ দিয়া সন্তান যে দম্পতী-প্রণয়ের পরম বন্ধন, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন। যথা

কি বলিব—সন্তান স্নেহের পরাকাষ্ঠা, এবং পিতামাতা পরস্পরের পরম বন্ধন।

সন্তান স্নেহের আশ্রয়-প্রযুক্ত দম্পতী অন্তঃকরণের সুখময় গ্রন্থিস্বরূপ উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে।

ফলকথা ভবভূতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে অপত্যবাৎসল্য নিবন্ধন দম্পতীর হৃদয়ে একাত্মতা জন্মে, এবং তিনি সেই ভাবেরই আনুপূর্বিকক্রমে বর্ণন করিলেন।—

সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক দর্শনে রামের অন্তঃকরণে সীতার পূর্ব মূর্তির সংস্মরণ এবং বর্তমান অবস্থার চিন্তা সমুদিত হইবার আভাস প্রদান পূর্বক ক্ষণকালের নিমিত্ত সীতার সহিত রামের যে একাত্মতা জন্মিয়াছিল, ভবভূতি তাহা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাবের অপগমে ক্রমশঃ বিরহশোকেরই প্রবলতর উদ্দীপন এবং উপাঙ্গে রামের যে মলিন ভাবের সূচনা আছে, তাহা উপলক্ষ করিয়া কবি অপূর্ব শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

(৪)

রাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর, পুনর্বার বাহ্যজগতে তাঁহার অনুভূতির সঞ্চার হইল। বনদেবী বলিলেন,—

ইতোহপি দেবঃ পশ্যতু—
অতরুণমদতাণ্ডবোৎসবান্তে
স্বয়মচিরোদ্গতমুগ্ধলোলবর্হঃ।
মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে
নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী ॥

দেব! এদিকেও অবলোকন করুন—

নবজাত-মনোহর-চঞ্চল পুচ্ছবিশিষ্ট উন্নতশিখার শোভায় মণিময়-মুকুটধারি-রূপে প্রতীয়মান বধূসহায় সেই এই শিখণ্ডী মহানন্দে নৃত্যোৎসব সমাধা করিয়া কদম্ববৃক্ষে কেকারব করিতেছে।

রাম পূর্বে যেমন সীতাপালিত করিশাবককে করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন, এবারেও সেইরূপ সীতার পোষিত ময়ূরকে ময়ূরীর সহিত ক্রীড়ারসে মগ্ন দেখিলেন। এবারেও রামের চিত্তপটে সীতার পূর্বমূর্তি জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তচক্ষুঃ
প্রচলিতচতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈ মুগ্ধয়া নর্ত্তমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি।

নৃত্য মধ্যে ঘূর্ণনকালে চঞ্চলবিলাসশালিনী ভ্রূভঙ্গী দ্বারা পুটমধ্যে ঘূর্ণিত নিজ চক্ষুর মণ্ডন সাধনপূর্বক করপল্লবের তালে মুগ্ধা সীতা সুতের ন্যায় সস্নেহান্তঃকরণে তোমাকে নাচাইত আমি তাহা স্মরণ করিতেছি।

কালিদাস মেঘদূতে সুন্দরীকর্তৃক নর্ত্যমান একটী ময়ূরের চিত্র দিয়াছেন, যথা—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥

সেই দুই রক্তাশোকের মধ্যে একটী স্বর্ণময় যষ্টি প্রোথিত আছে। তাহার মূলদেশ মরকত মণিদ্বারা বদ্ধ এবং অগ্রভাগে একখানি স্ফটিকময় ফলক নিবদ্ধ আছে। তোমাদিগের সুহৃৎ নীলকণ্ঠ দিবাবসানে ঐ ফলকে উপবেশন করিলে আমার প্রিয়া বলয়শিঞ্জাসংকৃত হস্ততাল দ্বারা তাহাকে নাচাইয়া থাকে।

দুইটি চিত্র অতি সুন্দর, এবং যথাযোগ্য। তবে একটী বনবিহারিণী, জীবপালিকা, পালিতগতপ্রাণা, বিশুদ্ধাত্মিকা, আনন্দময়ী রমণীর চিত্র এবং অপরটী ভাগ্যবানের গৃহলক্ষ্মীর ছবি। একটী চিত্রে ময়ূরের নৃত্যের সহ নর্তনকারয়িত্রী সুন্দরীর মুখ চক্ষু হস্তাদি সর্বাঙ্গের বৈচিত্র্য এবং মনের বৎসলভাব পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়; অপর চিত্রে ময়ূরের আসন, ময়ূরটী এবং সোনার বালা হাতে টুকটুকে গোলগাল দুটী বাহু মাত্র দৃষ্ট হয়।

রাম বলিতে লাগিলেন—

হন্ত তির্যঞ্চোঽপি পরিচয়মনুরুধ্যন্তে।
কতিপয়কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ
প্রিয়তময়া পরিবর্দ্ধিত য আসীৎ।
স্মরতি গিরিময়ূর এষ দেব্যাঃ
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি॥

হায়! তির্যক্ জাতিরাও পরিচয়ের অনুরোধ রাখে।

এক্ষণে যাহার কতিপয় পুষ্পোদ্গম হইয়াছে, সেই কদম্বতরু যে প্রিয়তমাকর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিত, এই গিরিময়ূর তাহা স্মরণ করিতেছে, যেহেতু আত্মীয়ের ন্যায় এই কদম্ববৃক্ষে এ প্রমোদ লাভ করিতেছে।

পাঠক দেখুন যে, প্রোজ্জ্বলা চক্ষুদ্রূপা সীতামূর্তি রামের হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেটী যেন কিঞ্চিৎ দূরগতা হইয়াছে এবং সীতাকে তুমি না বলিয়া প্রিয়তমা অথবা দেবী বলিয়া উদ্দেশে নির্দেশ করা হইতেছে, এবং যে ময়ূর পূর্বপরিচয়ের অনুরোধে সীতা-

পরিবর্ধিত কদম্ববৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহার তাদৃশ আচরণ-দর্শনে রামের যেন শোকেরই উদ্রেক হইতেছে।

বনদেবী বলিলেন—

অত্র তাবদাসনপরিগ্রহং করোতু দেবঃ।
এতত্তু দেব কদলীবনমধ্যবর্তি
কান্তাসখস্য শয়নীয়ং শিলাতলং তে।
অত্রস্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা ততো হরিণকৈর্ন বিমুচ্যতে স্ম।

এইখানে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন। যখন কান্তা তোমার সমভিব্যাহারে ছিল, তখনকার সেই এই কদলীবনমধ্যবর্তী তোমার শয়নীয় শিলাতল; এইখানে থাকিয়া সীতা এই সকল হরিণকে বহুবার তৃণ প্রদান করিয়াছিলেন, এই প্রযুক্ত ইহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না।

রাম পূর্বে সীতাসহ যে শিলাতলে শয়ান হইতেন, তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যত্র গিয়া বসিলেন, এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ নিস্তব্ধাবস্থায় রামের মনে কিরূপ ভাবনা উদিত হইতে পারে? তিনি হয়ত এরূপ ভাবিতেছিলেন যে, ইহা সেই পঞ্চবটীবন, এখানকার এই মৃগ পক্ষী বৃক্ষাদি পূর্বে কতই আনন্দ উৎপাদন করিত, এক্ষণে এগুলি কেবল ক্লেশের কারণ হইতেছে। এই সব থাকিতেও যেন কিছুই নাই। জীবলোকের কি উৎকট পরিবর্ত।

কবি সীতার মুখ দিয়া ঐরূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন।

ছায়াময়ী বলিলেন,—

"হা ধিক্, হা ধিক্ সেই এই আর্যপুত্র, সেই এই পঞ্চবটীবন, সেই এই প্রিয়সখী বাসন্তী, আমাদের বিবিধ বিশ্রম্ভ-সাক্ষী সেই এইসকল গোদাবরী-কানন-প্রদেশ, সুতনির্বিশেষে পালিত সেই এইসব মৃগ পক্ষী পাদপ রহিয়াছে, কিন্তু এগুলি মন্দভাগিনী আমার দৃশ্যমান হইয়াও এক্ষণে

যেন সে সব এ কিছুই নয় বোধ হইতেছে। অতএব জীবলোকের এই প্রকারই পরিবর্ত !”

রাম নিস্তব্ধ,—জীবলোকের উৎকট পরিবর্ত্ত এবং আপনার মানসিক ভাবের পরিবর্ত চিন্তা করিতে করিতে নিজের শরীরে যে সকল পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছিল, তাহাও তাঁহার মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি এরূপও মনে করিয়া থাকিবেন যে, এরূপ অবস্থায় সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কিনা, অথবা অতি কষ্টেই চিনিবেন, সন্দেহ নাই।

বাসন্তীর মুখেও কবি ঐভাব ব্যক্ত করিলেন ;—

“সখী সীতে! রামের অবস্থা দেখিতেছ না? যিনি তোমার অনায়াসদৃশ্য হইলেও নীলোৎপলবৎ স্নিগ্ধ অঙ্গ দ্বারা তোমার নয়নে প্রতিবারই নব নব প্রীতি উৎপাদন করিতেন, সেই এই রাম, এক্ষণে এরূপ বিকলেন্দ্রিয়, পাণ্ডুবর্ণ ও শোকভরে দুর্বল হইয়াছেন যে, তাঁহাকে সেই রাম বলিয়া অতি কষ্টে চেনা যায় ; তথাপি কেমন নয়নপ্রিয় !”

পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, রামের মনের যে ভাব, তাহাতে সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, যদি এরূপ কথা ঐ সময়ে তাঁহার মনে উঠিয়া থাকে, তবে সীতা কেমন চক্ষে তাঁহাকে দেখিতেছেন, এবং ঐ চক্ষু কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা অবশ্যই তাঁহার অন্তকরণে চিত্রিত হইয়া উঠিবে। চক্ষু জীবাত্মার গৃহের বাতায়ন স্বরূপ, মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা যেমন চক্ষুর ভাবে প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। সীতার ভালবাসা কত, রাম তাহা জানেন, সেই সীতা তেমন মর্মান্তিক দুঃখিনী ; এবং তিনি নিজেও তাদৃশাবস্থ। রামের প্রতি প্রযুক্ত সীতার চক্ষু ক্রোধ কিম্বা অভিমান অথবা ভয় প্রকাশ করিতে পারে না, পূর্ণ নিরীহতা, প্রগাঢ় শোক এবং দৃঢ় অনুরাগই প্রকাশ করে। কবি সীতার মুখ দিয়া যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সীতার চক্ষুও সেই কথাই কয়।

“হা দৈব! ইনি আমা ছাড়া এবং আমি ইঁহা ছাড়া থাকিব, এরূপ কে সম্ভাবনা করিয়াছিল? যাহা হউক, মুহূর্তের জন্য যেন জন্মান্তরে আমি

ইহার দর্শনলাভ করিলাম, অতএব অশ্রুজলের পতন এবং উদগম ইহার মধ্যবর্তী অবকাশে স্নেহবান আর্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই।”

যে চক্ষুদুটি ঐ ভাব প্রকাশ করে, সে দেখিতে কেমন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি বলিয়া দিলেন।

‘প্রবল ধারায় বিগলিত আনন্দ-শোকাশ্রুবর্ষণকারিণী, দর্শনলালসায় বিস্ফারিত এবং দীর্ঘবৎ প্রতীয়মান স্নেহস্রাবিনী, অতিশয় ধবল এবং মনোহারিণী তোমার দৃষ্টি জীবিতেশ্বরকে আর্দ্রীভূত করিতেছে।’

খুব শাদা ডাগর ডাগর এবং ডবডবে চক্ষু। শুধু কাজল নাই বলিয়াই যে শাদা, তাহা নহে, মনের যে ভাবে চক্ষু রক্তাভ হয়, তাহার কাছেও যায় না বলিয়া চক্ষু আরও শাদা।

রাম যেন বহুক্ষণ ধরিয়া ঐ দুঃসহ শোকব্যঞ্জক চক্ষুর ভাব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাহ্য জগতের প্রতি মন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন।

বনদেবী বলিলেন,—

“মধুবর্ষী বৃক্ষসকল পুষ্পফল দ্বারা অর্ঘ প্রদান করুক; বিকসিত-কমল-সুরভি কাননসমীর প্রবাহিত হউক; প্রীতিভরে গ্রীবা উন্নমিত করিয়া পক্ষী সকল অবিরল অস্ফুট মধুর ধ্বনি করুক; যেহেতু পুনরায় রাম স্বয়ং এই বনে আসিয়াছেন।”

রাম ঐ স্থানে বসিলেন। কিন্তু বোধ হয় কিছুতেই সীতার সেই গলদশ্রু ভুলিতে পারিলেন না। যাহা দেখেন, তাহাই সীতাবিরহশোক প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। এমন কি ঐ সকল স্থানে যে প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার সহিত বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্মরণেও মনের শান্তি হইল না।

ফলতঃ, সমুদয় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল।

(৫)

রাম পূর্বে পঞ্চবটীবনে যখন সীতাসহ পরম সুখে বাস করেন, তখন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাঁহার সহচর ছিলেন। অতএব সেই বনে পুনর্বার আসিলে পর সীতার সংস্মরণাবসরে অবশ্যই এক আধ বার লক্ষ্মণকেও তাঁহার মনে পড়িল! বনদেবী একবার লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ

রামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাম তাহা শুনিতে পান নাই, সীতার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। বনদেবী পুনরায় দৃঢ়তররূপে বলিলেন—"মহারাজ জিজ্ঞাসা করি, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত ?"

রাম মনে মনে ভাবিলেন—

অয়ে! মহারাজ! এই সম্বোধন প্রণয়শূন্য, বাষ্পগদগদ এই প্রশ্ন কেবল লক্ষ্মণের কুশল-সংবাদ-জিজ্ঞাসাতেই পর্যবসিত; অতএব ইনি সীতা-বৃত্তান্ত অবগত আছেন, বোধ হইতেছে। পরে বলিলেন,—"কুমারের কুশল।"

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, কবি কি সুন্দর কৌশল করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মণের নামের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্বেই দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থলে দেখাইতেছেন যে রামের পক্ষে সমুদয় বাহ্য জগতের মধ্যে এক সীতা ভিন্ন সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর যে লক্ষ্মণ সেই লক্ষ্মণের স্মৃতিও তাঁহার সর্বাপেক্ষা তিক্ত বোধ হইয়াছে। লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, সীতা আর নাই, এই চিন্তাটী রামের মনে উঠাইয়া দিয়া কবি রামের বিরহশোকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, লক্ষ্মণের স্মরণে লক্ষ্মণের দ্বারাই যে তিনি সীতাকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন এখনও সেইরূপ ভাব উদিত হওয়ায় আত্মগ্লানি তাঁহার মনে উদ্বোধিত হইল। সীতাকে বিবাসিত করিয়া রাম মনে মনে জানিতেন যে, তিনি পাপকর্ম করিয়াছেন। তাঁহার মনে সেই ভাবের উদয়মাত্রেই বনদেবী বলিলেন—

অয়ি দেব! কিমিতি দারুণং খল্বসি ?
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈ রনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ ইতি মূর্চ্ছতি।

হে দেব, তুমি কি কঠিন-হৃদয়!

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের জ্যোৎস্না, তোমার স্পর্শ আমার অঙ্গের অমৃত, ইত্যাদি শত শত প্রিয়বাক্য দ্বারা যাহাকে প্রীত করিতে, সেই মুগ্ধাকেই—দূর হউক, সে কথার আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন।

এই কবিতাটী যে কত মিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য! বোধ হয় উত্তর-চরিত পাঠক এমন কেহই নাই, যাঁহার এই শ্লোকটী, অন্ততঃ ইহার প্রথম চরণতিনটী কণ্ঠস্থ নাই। চতুর্থ চরণটীর অধিকাংশই পাদপূরণার্থ প্রস্তুত, এবং যখন কবি বাসন্তীকে মূর্চ্ছিত করিতেছেন, তখন তাহার মুখ দিয়া কেবল পাদপূরণার্থ শব্দ প্রয়োগ না করাইলেই ভাল হইত। বাসন্তী চতুর্থ চরণের "তামেব" পর্যন্ত বলিয়াই কবিতাপূরণ রামের মুখ দিয়াই হইতে পারিত।

এই সামান্য কৌশল যে ভবভূতির অপরিজ্ঞাত ছিল, এমন নহে। তিনি বহুল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা কবিতার পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এস্থলে মহাকবির বিশেষ দৃষ্টি অন্যদিকেই ছিল। তিনি যে বাসন্তীকে মানুষীভাবে সাজাইতেছিলেন, তাহা যেন এস্থলে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া বাসন্তী যে বনদেবী—সমুদয় প্রকৃতির প্রতিরূপস্বরূপা, এবং পাপরূপ অনৈসর্গিক কার্যের সমক্ষে সঙ্কুচিতা বা মূর্চ্ছাপন্ন—এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

রাম অলোকসামান্যা, পরমপবিত্রা, পতিপরায়ণা ধর্মপত্নীকে বিবাসিত করিয়া অতি অনৈসর্গিক কার্যই করিয়াছিলেন। এইজন্য এস্থলে বনদেবীর মূর্চ্ছা কল্পিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ভবভূতির মনে ঐ ভাব কিছু অধিক প্রবল হইয়াছিল এবং তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্যই তিনি বাসন্তীর মানুষীভাব বিস্মৃতকল্প হইয়াছেন। যাহা হউক, ভবভূতি অনৈসর্গিক কার্যকেই পাপ কার্য বলিয়া যেন স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিলেন।

(৬)

তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষণকালমধ্যেই নিষ্পন্ন, এবং তৃতীয়াঙ্কের উক্তি-প্রত্যুক্তি

সকল এক রামহৃদয়েরই বিলোড়নস্বরূপ এমন ভাবে আভাসিত। সুতরাং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কটী রামের বিরহমোহেরই রূপক-বর্ণনায় পর্যবসিত এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইতেছে না। শোকাদি যে কোন ভাব অতি প্রবলরূপে মানব-মনে অধিষ্ঠিত হইলে জড়জগৎ যে জীবিত-রূপে প্রতীয়মান হয়, বাসন্তী ও তমসা বিরহশোকমুগ্ধ রামের সেই ভাবের ব্যঞ্জক। ছায়াময়ী সীতা রামের প্রেমময় হৃদয়ের সেই অবস্থার পরিচায়ক।

পঞ্চবটী বনে রাম একাকী, তাঁহার সীতা-বিয়োগ-শোক উদ্দীপিত, সেই শোকের সময়ে বাহ্যজগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তর্জগৎ ছায়াময়ী সীতারূপে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছিল, কবি তৃতীয়াঙ্কে তাহাই দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এরূপ বর্ণনায় নাটকের কোন্ প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তৃতীয়াঙ্কটী যে উত্তরচরিতের সর্বপ্রধান অঙ্ক, সেই উত্তরচরিত নাটকের উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত—কেবল ইহার একটী কথা রামায়ণ হইতে ভিন্ন। সে কথাটী রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন। রামায়ণ-প্রবন্ধে রামকর্তৃক সীতার পরিত্যাগ, এবং তদনন্তর সীতার রসাতল-প্রবেশ, এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় শোক এবং ভয়ের আবির্ভাব না হয়? সীতা যেমন সাধ্বী, তেমন রাম-প্রেমময়ী নায়িকা; রাম যেমন অগাধসত্ত্ব মহাপুরুষ, তেমন অনুকূল নায়ক, তথাপি তাঁহাদের সংসারযাত্রার পরিণাম যে তেমন শোচনীয় হইল, ইহা ভাবিয়া সংসারিমাত্রেরই হৃদয় ভীতি এবং সংশয়ে সমাকুল হয়। ঐরূপ ভয় এবং সংশয়ে সংসারের প্রতি গৃহীজনের অনাস্থা জন্মিতে পারে। জাতিবিশেষের ও ধর্মবিশেষের প্রকৃতি অনুসারে সংসারের প্রতি তাদৃশ অনাস্থা যদিও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু আর্যপণ্ডিতগণের মতে তাদৃশ অনাস্থা সংসারাশ্রমের নীতির অনুগত নহে। এইজন্যই অনেকানেক আর্যপণ্ডিত রামায়ণের

আখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল কার্য যে ঈশ্বরের লীলামাত্র, এই ভাব প্রকটনপূর্বক উল্লিখিত ভীতি-সংশয়াদির নিরাকরণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি যথাসাধ্য লৌকিক ভাব রক্ষা করিয়াই উত্তরচরিতে রাম-সীতার পুনর্মিলন সাধনপূর্বক লোকের সংশয়াদির উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন বোধ হয়। কবির মনের এই ভাবটি সপ্তমাঙ্কে রাম এবং লক্ষ্মণের উক্তিতে যেন প্রকাশিত দেখা যায়। সীতা রসাতলগামিনী হইলে রাম বলিলেন,—"কিন্তু বৈদেহী বিলয় প্রাপ্ত হইলেন। হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাস-প্রিয়সখি! হা দেবচরিত্রে! তুমি লোকান্তর প্রস্থান করিলে?" এই বলিয়া মূর্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন। এই কি তোমার কাব্যের প্রয়োজন?"

লক্ষ্মণ প্রাণের দায়ে পরিত্রায়স্ব বলিয়া যে চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই যেন রামায়ণ—পাঠকসাধারণের হৃদ্গত শোকের পরিচায়ক, এবং সেই শোক-নিবারণের প্রার্থনা। রামায়ণ-পাঠকের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, সীতার ন্যায় গৃহিণী ও রামের ন্যায় গৃহীর সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে সংসার-সুখের বাসনা আর কে করিবে?—সুতরাং তাঁহাদের মতে রামায়ণের নির্বহণ-কার্য অন্যরূপ হইলে ভাল হইত। ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্যেই তিনি বাল্মীকির হইয়া রামসীতার পুনর্মিলন সাধনপূর্বক সেই শোক-নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, রামসীতার পুনর্মিলনের পক্ষে রূপকময় তৃতীয়াঙ্কের উপযোগিতা কতদূর।

ভূতধাত্রী পৃথিবী এবং ত্রিলোকপাবনী গঙ্গাও যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—'যাঁহার সংসর্গ-লাভে আমরাও পবিত্র হইয়াছি' এমন সীতাকে যে রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইলে লোককে অবশ্যই দেখাইতে হইবে যে,

রাম সীতাকে গতপ্রাণা জানিয়া তাঁহার জন্য প্রকৃত দুঃখে দুঃখী এবং নিজ দুষ্কৃতিবশতঃ প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত।

যদি অনুতাপাদি প্রকাশ ব্যতিরেকে সীতাকে আনিয়া রামের সহিত মিলান হইত, তাহা হইলে লোকের মনস্তুষ্টি হইতে পারিত না। প্রত্যুত সীতার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিত।

রামসীতার পুনর্মিলন সম্বন্ধে ভবভূতি কোন খুঁত রাখেন নাই। তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশোক-বর্ণনাবসরে রামসীতার পুনর্মিলনের পথ সম্যকরূপেই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিলন-সময়ে সপ্তমাঙ্কে অরুন্ধতী সীতাকে মূর্চ্ছাপন্ন রামের নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন,— "বৎসে সত্বর হও, লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ কর; আইস প্রিয়স্পর্শ হস্ত দ্বারা আমার বাছাকে বাঁচাও।

সীতা অমনি সসম্ভ্রমে গিয়া রামের শরীর স্পর্শপূর্বক বলিলেন,— "আর্যপুত্র, সমাশ্বস্ত হও।"

কিন্তু যদি তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত রামের বিলাপাদি পূর্বে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ কথা এবং ঐ কাযটী বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত।

অতএব ভবভূতির পক্ষে সীতাকে গতপ্রাণাবস্থাবৎ করিয়া রামের বিরহদুঃখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু পক্ষান্তরে সীতা একান্ত রামপ্রেমময়ী, রামের নিকট তাঁহার ক্রোধ নাই, তেজ নাই, এমন কি, প্রায় অভিমান পর্যন্তও নাই বলিলেই হয়। তাঁহার জীবনের জীবন পর্যন্ত রামরূপ মোহন মন্ত্রের বশ। রামকৃত অত্যাচারে তাঁহার যতই দুঃখ হউক, তিনি সমুদয় আপনার ভাগ্যের দোষ বলিয়াই মনে করেন। অন্যে তাঁহার হইয়া রামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সেই বিরক্তিতে তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি হয় না। তবে তাহা হয় না বলিয়া আপনি মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েন বটে, এবং ঐরূপ লজ্জামধ্যে যে দুর্বিভাব্য অভিমানের গুণীভূত উন্মেষ থাকে, রামের প্রতি সীতার অভিমান সেইটুকু মাত্র।

এমন কোমল অপেক্ষাও কোমল অভিমানটীকে, এমন পবিত্র

অপেক্ষাও পবিত্র প্রকৃতিটীকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবভূতিকে রামসীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের বোধে এই জন্যেই ভবভূতির তৃতীয়াঙ্কের অবতারণা, এবং তাহাতে ভাগীরথীর বরপ্রাপ্তা, লোকলোচনের অগোচরা ছায়াময়ী সীতার কল্পনা।

(৭)

রাম আপনার দুঃখ মনে করিতে করিতে অবশ্যই ভাবিয়া থাকিবেন, সীতাও অবিকল এইরূপ বিরহ-যাতনা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাহা ভাবুন বা না ভাবুন, কবি দেখাইলেন যে, এই অবস্থা হইতেই সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। অনন্তর যাহাদের জন্য তাঁহাদিগের এত দুঃখ, সেই পৌরজানপদদিগকে রামের মনে পড়িল, একটু ক্রোধ হইল, কিন্তু ক্রোধের ছিটা মাত্র—অভিমানই অধিক। প্রজার উপর রামের যে ক্রোধ হইতে পারে না, সে জন্য হউক বা না হউক, এখন রাম শোকে এবং অনুতাপে দগ্ধ, ক্লিষ্ট এবং মলিন, এ অবস্থায় লোকের মনে ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানই অধিক হয়, সুতরাং ক্রোধের স্থানে অভিমান দেখা দিল। রাম বলিলেন,—"হে পৌরজানপদ মহাশয়েরা! দেবীর গৃহে অবস্থিতি তোমাদের অভিমত হয় নাই; এজন্য শূন্য বনে তৃণের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি; এবং ত্যাগ করিয়াও অনুশোচনা করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল পঞ্চবটী প্রভৃতি পদার্থনিচয় আমাকে বিকলচিত্ত করিতেছে। অতএব এখনও প্রসন্ন হও, আমি নিরুপায়ভাবে এইরূপ ক্রন্দন করি—অর্থাৎ সীতার জন্য আমি কাঁদিতেছি বলিয়া অপ্রসন্ন হইও না।"

রাম এরূপ বলায় সীতার মনে কি হইতে পারে? যাহাদিগের কথায় রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল লোকের প্রতি রামের ক্রোধ এবং অভিমান প্রকাশিত হওয়ায় সীতার যে অবশ্যই কিছু মনস্তুষ্টি হওয়া সম্ভব তাহার সন্দেহ নাই। ভবভূতি কি নিপুণ বুদ্ধিতেই ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা সীতার চরিত্র বুঝিয়াছিলেন! তিনি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া এস্থলে কোন কথাই বাহির

করিলেন না। কেন করিলেন না? সীতা যে পৌরজনদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি রামের বিরক্তি দেখিলে তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন দিবেন না বলিয়া? না রামের মন পৌরজনদিগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিতা ছায়ামরী সুতরাং অন্তর্হিতা হইলেন, সেইজন্য?

বনদেবী রামকে অতিক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্যাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে রাম বলিলেন,—ধৈর্যের কথা কি বলিতেছ? এই সীতাশূন্য জগতে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল; সীতার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে!" অর্থাৎ রামের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধৈর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

রামের এরূপ বাক্য-শ্রবণে সীতার মনে সহানুভূতি অবশ্যই এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহাতে তাঁহার মনে যেন একটু ভ্রম জন্মিতেও পারে। রাম যে তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন বলিয়াই দুঃখভোগ করিতেছেন, এ ভাবটি সীতার মনে আর স্থান পাইবে না। রামও যেমন মধ্যে মধ্যে অতি দুঃখে কাতর হইয়া সীতার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে 'নিষ্করুণে' 'কোপনে' 'চণ্ডি' প্রভৃতি নির্দয়শীলতাব্যঞ্জক সম্বোধন করিয়া থাকেন, রামহৃদয়বাসিনী সীতা নিজেও যে কখন কখন সেইরূপ আপনার প্রতি দোষারোপ করিবেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত আমারই জন্য ইনি এত কষ্ট পাইতেছেন, ভাবিয়া কখন কখন সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানি জন্মিবে। কবি ছায়ামরী এবং তমসার মুখে ঐ ভাব ব্যক্ত করিলেন। ছায়ামরী বলিলেন,—

"আর্যপুত্রের এই সকল বচনে মোহিত হইয়াছি।"

তমসা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন,—"স্নেহার্দ্র কিন্তু দুঃসহ শোকব্যঞ্জক এই সকল কথা কেবল প্রিয় কথা নয়; এই সকল বাক্যালাপ বিষদিগ্ধ মধুধারাস্বরূপ হইয়া তোমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

এইবার ছায়াময়ীর মুখ দিয়া সীতাহৃদয়ের অবশ্যম্ভাবিনী আত্মগ্লানি স্পষ্টই প্রকাশিত হইল,—আমি এমন মন্দভাগিনী, আবার আর্যপুত্রের আয়াসকারিণী হইলাম!

রাম আপনার দুঃখসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে দিতে বলিয়াছেন, "পূর্বপরিচিত সেই সেই প্রিয় বস্তু দর্শনে আমার এই আবেগ।" অতএব রামের বলা হইল যে, প্রিয়-বস্তু-দর্শনই তাঁহার আবেগের কারণ, এবং ঐ আবেগ ঐ কারণে ঐ দিনই ঘটিয়াছে। রাম নিজ দুঃখপ্রাবল্যের বিশেষ হেতু এবং কালের উল্লেখ করাতে বিরহদুঃখপ্রাবল্যের যে তাদৃশ কোন কারণ সীতার সম্বন্ধে সে সময়ে উপস্থিত হয় নাই, এরূপ আভাস দিয়াছেন।

অতএব দয়াময়ীর মুখে বাহির হইল—

আর্যপুত্রের এই অনিবার্য এবং দুঃসহ দুঃখাবেগে আমার নিজ দুঃখ যেন প্রস্ফুরিত হইয়া আমার হৃদয় কম্পিত করিতেছে।

পাঠক দেখুন, এই কথায় যদিও রামের দুঃখে সীতার সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে বটে, তথাপি সহানুভূতির আতিশয্যে পূর্বে যে আত্মগ্লানির অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধ হইয়াছিল, সে আত্মগ্লানির লক্ষণ, রামের ওরূপ কথার পর আর কিছুই নাই। এখন সীতার দুঃখকে রামের দুঃখ হইতে স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাম নিজ দুঃখের যে হেতুনির্দেশ এবং সীমাবন্ধন করিয়াছিলেন, কবি তাহার উচিত ফলই দেখাইলেন।

(৮)

ভবভূতি কেমন নিখুঁত করিয়া রাম—সীতার পুনর্মিলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইবে।

তিনি অনুতাপাগ্নিদগ্ধ রামের প্রতি সীতার সহানুভূতির সঞ্চার, রামের দুঃখে সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানির উদ্বোধ, এবং তৎসহ সহানুভূতির বৃদ্ধি; পরে রামের সহিষ্ণুতার সম্যক্ পরিহার এবং তাঁহার মোহ—ক্রমান্বয়ে এই ভাবগুলির বর্ণন করিয়া এক্ষণে সীতার মনে রামসহ পুনর্মিলনাভিলাষের আতিশয্যে যেরূপ হইতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্রমশঃ তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম মূর্ছিত হইলে, ছায়াময়ীও সুতরাং মূর্ছিতা হইলেন। রাম-হৃদয়ে সীতার প্রথম উদ্বোধনস্বরূপ বনদেবী উচ্চৈস্বরে ডাকিলেন,—

হা প্রিয়সখী সীতে! কোথায় আছ? আপনার জীবিতেশ্বরকে বাঁচাও।

দয়াময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামের হৃদয় এবং ললাটে স্পর্শ করিলেন।

রাম বলিলেন, "অমৃতময় প্রলেপ দ্বারা সর্বশরীরকে যেন ভিতর বাহিরে লিপ্ত করত, স্পর্শ আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আনন্দোৎপাদন দ্বারা অকস্মাৎ অন্যবিধ মোহ বিস্তার করিতেছে।

"সখি বাসন্তি! বড় সৌভাগ্য।"

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেব! কিরূপ?"

রাম উত্তর করিলেন,—"অন্য আর কি, জানকীকে আবার পাইয়াছি।"

বাসন্তী। "হে দেব, কই তিনি?"

রাম। "দেখ, এই আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।"

বাসন্তী। "মর্মচ্ছেদকারী নিদারুণ এ সকল প্রলাপ কি জন্য?"

রাম। "সখি! প্রলাপ কোথা?"

"বিবাহ সময়ে কঙ্কনধর যে কর আমি পূর্বে ধারণ করিয়াছিলাম, অমৃতের ন্যায় শীতল যে কর স্বেচ্ছাধীন স্পর্শদ্বারা চিরপরিচিত, তুষার এবং করকার তুল্য স্নিগ্ধ লবলীনবপল্লববৎ কোমল তাঁহার সেই এই কর আমি লাভ করিয়াছি।"

মোহগ্রস্ত রাম এই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যেন সীতার হাতটী ধরিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম জড়ীভূত হইয়াছে। আমি বিকল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব তুমি ইহাঁকে ধারণ কর।

বাসন্তীর হস্তে তুলিয়া দিবার সময় ছায়াময়ী সুতরাং আপনার হস্ত সরাইয়া লইলেন। রাম এতক্ষণে সীতার স্পর্শসুখ এমন গাঢ়ভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, হাতটি সরিয়া গেলে বলিলেন,—"তাঁহারসেই

জড়ীভূত কম্পমান স্বেদযুক্ত করপল্লব সহসা আমার জড়ীভূত কম্পযুক্ত স্বেদবিশিষ্ট কর হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।"

বাসন্তী। হে দেব প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, প্রিয়াবিয়োগ শোক পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব স্বীয় অলৌকিক ধৈর্যদ্বারা আপনাকে শান্ত কর। আমার প্রিয়সখী এখানে কোথায়?

রাম। সত্যই নাই, অন্যথা বাসন্তীও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? ইহা কি তবে স্বপ্ন? কিন্তু আমি ত নিদ্রিত নই। অথবা রামের স্বপ্ন কোথায়? বারম্বার কল্পনা-প্রসূত ভ্রমই পুনঃ পুনঃ আমার অনুসরণ করিতেছে।

সীতা। নিষ্ঠুর, আমাকর্তৃকই আর্যপুত্র প্রতারিত হইতেছেন।

পাঠক দেখুন, যে অবস্থায় সীতার মনে পুনর্বার আত্মগ্লানির উদয় হইতে পারে, কবি আবার যেন তাঁহাকে সেই অবস্থায় আনিলেন। সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানির ঢেউ কেমন করিয়া উঠে, এবং পড়ে ও আবার উঠে, ভবভূতি প্রেমিকের হৃদয়ের এই লহরীলীলাটি দেখাইলেন।

(৯)

রামের সীতাবিরহ-শোক যেরূপ বর্ণিত হইলে সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার হয়, এবং সেই সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানি জন্মে, এবং আত্মগ্লানিনিবন্ধন পুনর্মিলনের অভিলাষ উদ্রিক্ত হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া কবি তাহার পর ঐ অভিলাষ যাহাতে বর্ধিত এবং ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে চলিলেন।

কবি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সীতার জন্য রাম পূর্বে যে যে কঠিন কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমতঃ স্মরণ করাইলেন। বনদেবী বলিলেন,—"হে দেব! দেখ দেখ জটায়ুকর্তৃক ভগ্ন কৃষ্ণলৌহ-নির্মিত রাবণের এই রথ পড়িয়া আছে। আর সম্মুখভাগে এই সকল পিশাচের ন্যায় বদনবিশিষ্ট রথাশ্ব অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়া আছে। এইখান হইতে রাবণ খড়্গদ্বারা জটায়ুর পক্ষ ছিন্ন করিয়া প্রদীপ্তরূপা

সীতাকে বহনপূর্বক চঞ্চল তড়িদ্‌গর্ভ অম্বুদের ন্যায় আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল।

রামের স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়ে পূর্বঘটনাগুলি একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন ভয়ব্যাকুল সীতার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার 'পরিত্রাহি' ডাক শুনিতে পাইলেন, এবং জটায়ুহন্তা সীতাপহারী রাবণকে যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অপরাধীর দণ্ডদানার্থে বেগে উত্থিত হইলেন। কিন্তু পরেই বলিলেন—

অনর্থ এবায়মধুনা প্রলাপো বর্ততে—

উপায়ানাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরো
বিমর্দৈর্বীরাণাং জগতি জনিতাত্যদ্ভুতরসঃ।
বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুঘাতাবধিরভূৎ
কথং তূষ্ণীং সহ্যো নিরবধিরয়ং ত্বপ্রতিবিধঃ॥

এক্ষণে এই প্রলাপ অনিবার্য ই হইতেছে—

যে বিয়োগে সীতাপ্রাপ্তির উপায়সমস্তের সদ্ভাবপ্রযুক্ত বিরহ-দুঃখাপনয়নের সম্পর্ক ছিল, যে সীতাবিয়োগ বীরদিগের পরস্পর সংগ্রামদ্বারা জগতে উৎকট অদ্ভুত রসের উৎপাদন করিয়াছিল, মুগ্ধাক্ষী সীতার সেই বিপ্রয়োগের সীমা শত্রুনাশ পর্যন্তই ছিল। কিন্তু এখনকার এই বিরহের আর সীমা নাই, এবং কিছুতেই ইহার আর প্রতিবিধানও হইতে পারে না। অতএব কেমন করিয়া স্থিরভাবে এরূপ বিরহ সহ্য করা যায়?

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামের সীতাবিরহ ঘটিয়াছিল, তাহার সীমা ছিল, এবারকার বিরহের সীমা নাই। এই নিরবধিত্বের প্রতীতিই রামের বিশেষ দুঃখ, সুতরাং ছায়াময়ীর ক্রন্দনেরও কারণ। কবি নিরবধি শব্দের পুনরুক্তি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া করাইয়া দেখাইলেন যে, ঐ সকল পূর্ব-বিবরণ-স্মরণে রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন হয় এরূপ অভিলাষ অবশ্যই অধিকতর বর্ধিত হইবে।

রাম বলিতে লাগিলেন—

হা কষ্টম্!

ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্য্যং হরীণাং বৃথা
প্রজ্ঞা জাম্ববতোঽপি যত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি।
মার্গং যত্র ন বিশ্বকর্ম্মতনয়ঃ কর্তুং নলোঽপি ক্ষমঃ
সৌমিত্রেরপি পত্রিণামবিষয়ে তত্র প্রিয়ে ক্বাসি মে॥

হা কষ্টম!

যেখানে বানররাজ সুগ্রীবের সখ্য ব্যর্থ—কপিসৈন্যদিগের বল-বিক্রমের কোন ফল নাই—যেখানে জাম্ববানের বুদ্ধি খাটে না, যেখানে পবনপুত্র হনুমানের গতি নাই—বিশ্বকর্মার পুত্র নলও যেখানে পথ করিতে অক্ষম, যে স্থান সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণেরও বাণের অবিষয়ীভূত, প্রিয়ে! এক্ষণে এমন কোন্ স্থানে তুমি রহিয়াছ?

যে সীতার জন্য সেই সমস্ত অসাধ্যসাধন করা হইয়াছিল, যে সীতার জন্য জগজ্জেতা রাবণকে জয় করা হইয়াছিল, সেই সীতা কেবল প্রেমময়ী কোমলা বরবর্ণিনী মাত্র নহেন, তিনি মহাগৌরবান্বিতা ও বহুসম্মানিতা। রামের মনে এই ভাবের উন্মেষ কবি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া ব্যক্ত করিলেন:—

বহুমণ্ণাবিদম্হি পুব্ববিরহং।

পূর্ব বিরহ আমি শ্লাঘ্য বলিয়া মানিতেছি।

এদিকে সীতার আত্মগৌরববুদ্ধিই যে রাম সহ পুনর্মিলনের সহকারী ভাব হইবে, তাহাও দেখান হইল।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই পর্যন্ত হওয়াতেই যথেষ্ট হইল। বাস্তবিক, সহানুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব এই কয়টি ভাবকে ক্রমান্বয়ে আনিয়া রামসীতার পুনর্মিলনের পথ অতি পরিষ্কারই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইহার পর রাম বনদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামের হৃদয় উদ্ঘাটিত হইতে দেওয়ায় লোকে তাঁহার প্রতি বিগতমন্যু এবং সীতাসহ

তাঁহার পুনর্মিলন হয়, এরূপ ইচ্ছাযুক্ত হইয়াছে। তমসা আর রামকে ঐক্ষ্বাক রাজা বা 'জগৎপতি' বলেন না। বাসন্তীও অনেকক্ষণ হইতে 'মহারাজ' 'দারুণ' 'কঠোর' প্রভৃতি অপ্রণয় বা নিন্দাব্যঞ্জক সম্বোধন প্রয়োগ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রামের প্রতি অতিরিক্ত হৃদয়াসক্তি নিবন্ধন ছায়াময়ীর মুখ দিয়া আর লজ্জাব্যঞ্জক উক্তি বাহির হয় না।

কিন্তু ভবভূতির সমীচীন বিবেচনায় আরও একটু বাকী ছিল। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, রাম সীতার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবন্ধন এবং রাবণ প্রভৃতি বিজয়—যে সকল অবদান-পরম্পরা সাধন করিয়াছিলে তাহা অবিমিশ্ররূপে সীতার গৌরবখ্যাপন করে না। ঐ সকল কার্যে সীতার উদ্ধার হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ সকল কার্য সীতার জন্যই বটে, কিন্তু তদ্দারা বৈর-নির্যাতন, কুলগৌরব-রক্ষা, বীরত্বপ্রকাশ, ত্রিলোকের আধিপত্য-লাভ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনও সংসাধিত হইয়াছিল। অতএব যাহাতে সীতার বিশুদ্ধ আত্মগৌরবই জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পায়, সেরূপ কোন ব্যাপারের অবতারণা করা আবশ্যক। কবি এক্ষণে তাহা করিতে চলিলেন এবং সেই জাজ্বল্যমান দীপ্তির সহিত কোন কোন প্রণয়ক্ষেত্রে যে একটি কালিমময় ছায়া পড়িয়া থাকে, সেই ছায়াটুকুও ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। রাম বনদেবীর স্থানে বিদায় প্রার্থনাপূর্বক বলিলেন—

অস্তি চেদানীমশ্বমেধায় সহধর্মচারিণী মে—

এক্ষণে অশ্বমেধের নিমিত্ত আমার সহধর্মচারিণী আছেন। রামের মুখে ওরূপ কথা শুনিলে প্রকৃত সীতার যে ভাব হইতে পারে রাম-হৃদয়বাসিনী ছায়াময়ীরও তাহাই হইল। ছায়াময়ী কাঁপিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

অজ্জউত্ত, কা সা?

—আর্যপুত্র, কে সে?

এই ভাবটি প্রেমগৌরবে গৌরবান্বিতা সৌভাগ্যবতীদিগের হৃদয়ের তামসী নিশা। যখন যখন তাঁহারা এই অন্ধকারে পড়েন, তখন

তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—আর জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা বলেন যে, প্রণয়ক্ষেত্রমাত্রেই এই ছায়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু ভবভূতি জানিতেন যে তাহা নহে। এই ছায়া প্রেমের সৌভাগ্যক্ষেত্রেই পরিণত হয়। যেখানে সোহাগ অধিক, এরূপ ঈর্ষ্যা সেইখানেই দেখা দেয়। যদি সীতা পূর্বেই রামের সোহাগে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া না মনে করিতেন, যদি 'বহুমণ্ণাবিদিহ্মি' না বলিতেন, তবে এখানকার 'অজ্জউত্ত কা সা' কথাটি তেমন অতি সুসঙ্গত হইত না। রাম বলিলেন—

হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ
—সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি।

ভবভূতি বর্ণন করিলেন যে, রামের এই কথায় অমনি ছায়াময়ীর সমুদায় হৃদয়কোষ শূন্য করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল এবং চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি বলিলেন—

অজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অম্হহে উকখাণিতং মে দাণিং পরিচ্চাঅলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ।

এক্ষণে তুমি আর্যপুত্র। অহো আর্যপুত্র এক্ষণে আমার পরিত্যাগ-জনিত লজ্জাশল্য উদ্ধার করিলেন।

এই এতক্ষণে—অর্থাৎ রাজসভামধ্যে প্রকাশ্যরূপে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে—লজ্জাশল্য সমূলে উৎখাত হইল। রাম বলিতে লাগিলেন—

তত্রাপি তাবৎ বাষ্পদিগ্ধং চক্ষুর্বিনোদয়ামি।

তাহাকে দেখিয়াই এক একবার বাষ্পকলুষিত চক্ষুকে বিনোদিত করি। কবি ছায়াদেবীকে দিয়া বলাইলেন—

ধণ্ণা সা জা অজ্জউত্তেণ বহু মণাইঅদি, জাঅ অজ্জউত্তং বিনোদঅন্তী আসাণিবন্ধণং জাদা জীঅলোঅস্স।

সেই ধন্যা, যে আর্যপুত্র কর্তৃক সম্মানিতা হইয়াছে, এবং যে আর্যপুত্রকে বিনোদিত করিয়া জীবলোকের আশার কারণ হইয়াছে।

তমসা বুঝাইয়া বলিলেন—

অয়ি বৎসে! এবমাত্মা স্তূয়তে।

—বৎস! ইহাতে যে আপনারই স্তব করা হইল।

কবির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ছায়াময়ী আর আপনাকে মন্দভাগিনী মনে করিতে পারিলেন না। পরিত্যাগে লজ্জার কারণ নাই, প্রত্যুত বিশুদ্ধ আত্মগৌরবের কারণই দেখা দিল,—পুনর্মিলনের পথ সর্বতোভাবেই পরিষ্কৃত হইল।

কবি ইহার পর তমসার মুখ দিয়া সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের তাৎপর্য বুঝাইয়া বলিলেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা-
দ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা-
নম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎসমগ্রম্॥

জল যেমন ঘূর্ণি, ফেণ, তরঙ্গ প্রভৃতি রূপভেদ আশ্রয় করে, কিন্তু তৎসমস্তই জল, সেই প্রকারে এক করুণ রসই নিমিত্তভেদে ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পরিবর্ত্ত বা মূর্তিভেদ ধারণ করে।

ইহার নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে, এই তৃতীয়াঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তাহা এক করুণ রসেরই প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সমালোচনের পরিসমাপ্তিকালে আমরাও বলিব—

নৃণাং হৃদ্গতগূঢ়তত্ত্বকলনে প্রীতেঃ প্রকাশে ক্রমা-
দ্বদ্ধগ্রন্থিগণস্য, ভেদকথনে পাপস্য পুণ্যস্য চ।
সাধ্বীবীরচরিত্রয়োঃ প্রকটনে, চান্যোপমাবর্জ্জিতা-
মন্যস্তেহস্য বুধা কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥